বিমল মিত্র

আসামী হাজির

বিমল মিত্র

'আসামী হাজির' প্রসঙ্গে

১৯৭১-এর নভেম্বর থেকে "আসামী হাজির" সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। সেই থেকে শুরু করে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত আগাগোড়া আমি ছিলাম উপন্যাসখানির নিয়মিত পাঠক। পড়তে পড়তে এই দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি যে কত অনায়াসে বিমল মিত্রের কলমে একটি Positive good man জীবন্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য এ-ধরনের চরিত্র-চিত্রণ তাঁর হাতে এই প্রথম নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস "সাহেব বিবি গোলাম"-এ, যে বই থেকে তাঁর খ্যাতির জয়-যাত্রা শুরু, তার ভূতনাথ চরিত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি উপন্যাসে নানা নামে নানা বেশে এই সক্রিয় ভাল মানুষটির আনাগোনা আমরা দেখেছি। আসলে প্রতিবাদের এই বলিষ্ঠ কণ্ঠ লেখকের মধ্যে সর্বদাই মুখর। হতাশা, গ্লানি অন্যায়কে তিনি নির্দয় ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন আমাদের সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রে কত দুর্নীতি দুরাচার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে ; কিন্তু শুধু ওই দিকটা দেখিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন না তিনি। আলোর দিকেও তাঁর চোখ আছে। সবাই যখন অন্ধকারের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করছে তিনি তখন দু'হাত প্রসারিত করে ধরেছেন আলোর উদ্দেশে। পরম নৈরাশ্যের মধ্যে এমন করে তিনি বিশ্বাসের প্রদীপটি তুলে ধরেন যে, তাঁকে সেই মুহূর্তেই মনে হয়, তিনি মানুষের একজন চিরকালের অকৃত্রিম বন্ধু। জনতার কাছ থেকে জনপ্রিয়তার শিরোপা তাই তো তিনি এমন অনায়াসে অর্জন করেছেন।

আজ যখন অন্যান্য সাহিত্যরথিগণ অন্ধকারকেই আমাদের অনিবার্য নিয়তি বলে বলছেন তখন বিমল মিত্রের এই আলোর দিকে, বিশ্বাসের দিকে প্রসারিত অতন্দ্র দৃষ্টিকে আমরা ক্রমশই আরো প্রখর হয়ে উঠতে দেখছি ; দেখছি যে "ভাল মানুষ" চরিত্রগুলো এতদিন অসহায় বিভ্রান্ত মানুষগুলোর পাশে পাশে প্রদীপ হাতে নিয়ে তাদের আলো দেখিয়ে চলত সেই সীমিত ও খণ্ডিত চরিত্রগুলো ক্রমশঃ অখণ্ড ও সম্পূর্ণ হতে চেয়ে তাঁর উপন্যাসে নায়কের ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। যেমন "রাজাবদল"-এর গৌর পণ্ডিত মশাই, "শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন"-এর লোকনাথ এবং আলোচ্য উপন্যাসের সদানন্দ।

Positive good man-কে নায়ক করে উপন্যাস লেখা, দস্তয়েফস্কি বলেছেন, সব চেয়ে কঠিন কাজ। এ কাজে যিনি সফল হন তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। শিল্পীর এই শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা সহজ নয়। ''On the Modern Element in Literature'' গ্রন্থে Mathew Arnold বলেছেন ঃ

> And everywhere there is connexion, everywhere there is illustration : no single event, no single literature, is adequately comprehended except in relation to other events, to other literature.

ম্যাথু আরনল্ড-এর এই উক্তির তাৎপর্য আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি "আসামী হাজির" পড়তে পড়তে। আমার কেবল মনে হয়েছে Positive good man সম্পর্কে আগে থেকে পাঠকের যদি যৎকিঞ্চিৎ ধারণা তৈরি না থাকে তো "আসামী হাজির"-এর নায়ককে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। একটা নেলা-ক্ষেপা বোকা-পাগলা মানুষের অধিক বড় জোর একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ বলে মনে হবে তাকে। এই এলোমেলো চরিত্রটির যে একটা "grotesque beauty"—একটা রহস্যময় খেয়ালী সৌন্দর্য আছে, তা না বোঝাই

থেকে যাবে। সদানন্দের চেয়ে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্ররাই তখন মনে ছাপ ফেলবে বেশী করে ; এমন দুরূহ শিল্পকৃতিত্বের কিছুই পাঠক বুঝতে পারবেন না।

Positive good man-কে সম্যক আয়ত্ব করতে অনেক লেখকই পারেন নি। Positive good man বলতে সব আগে আমাদের মনে পড়বে চৈতন্যদেব অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে। ইওরোপের খৃশ্চিয়ান জগৎ একবাক্যে স্মরণ করবেন যীশুকে। কিন্তু এই মহামানবদের আদলে চরিত্র আঁকতে চাইলে তা হয়ে যাবে মহামানব নিয়ে উপন্যাস, তা আর তখন রস-সাহিত্য হবে না। দস্তয়েফস্কি বলেন, রসসাহিত্যের কাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে 'সাধারণ নয়' এমন একটি মানুষকে উপস্থিত করা। সে হবে শিশুর মতন সরল, পবিত্র এবং স্বভাবতই সৎ অথচ সে থাকবে (যেহেতু মহামানব নয়) "Screened with human weakness." পাঠক তার সম্পর্কে যত জানবেন ততই তার আত্মীয় হয়ে উঠবেন এবং ততই অনুভব করবেন যে এ মানুষটি তার নিজের জাতের নয়, এ মানুষটির ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না, এ যেন কেমন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, একলা। একে বন্ধু, সমাজ, বাপ-মা এমন কি শেষপর্যন্ত তার স্ত্রীও ত্যাগ করে চলে যায়, কারো সঙ্গেই সে সহ-অবস্থান করতে পারে না, সমঝোতায় আসতে পারে না। আপোস বলে যে একটা কথা আছে, তা যেন তার অভিধানে থাকতে নেই।

কিন্তু এহেন জটিল চরিত্র প্রথমেই কোন লেখক কল্পনা করেন নি। প্রথমে তাঁদের কল্পনায় Positive good man হিসেবে একটি সরল বিশ্বাসের অটল মানুষই ধরা পড়েছিল। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তার সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ষোড়শ শতকে। লেখক একজন স্পেনিস। একাধারে কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক সারভাঁতে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি "ডন কুইক্সট"-এর জন্যে অমর হয়ে আছেন। দস্তয়েফস্কি লিখেছেন—"of all the good characters in christ an literature, Don Quixote stands as the most finished of all. But he is good solely because he is ludicrous at the same time comical." Comical হওয়াতে চরিত্রটির ওজন কমে গেছে অতিমাত্রায়। তার সততা সারল্য ও নিষ্ঠা পাঠকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তথাকথিত হিরোইজমের প্রতি শ্লেষ হিসেবেই চরিত্রটিকে পাঠক ভালবেসেছে কিন্তু তার Positive goodness চোখে পড়ে নি কারো। Tom Jones-এর ভাগ্যেও জুটেছে সেই ক্লাউনেরই জনপ্রিয়তা। নাম-চরিত্রের ওই উপন্যাসটি লেখেন হেনরি ফিলডিং। ১৭৪০-এর কাছাকাছি প্রকাশিত এই বইটিতে একটি সরল মানুষের সহজ বিশ্বাসের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ে এমন ব্যঙ্গ কৌতুক করা হয়েছে যে এই ভাঁড়ামির তলায় একটি বিশুদ্ধ সৎ চরিত্র সমূলে চাপা পড়ে গিয়েছে। অন্যপক্ষে ডিকেনসের 'পিকউইক' অনবদ্য চরিত্র হলেও ডন কুইক্সটের তুলনায় অনেক দুর্বল। তবু মোটামুটি ভাবে এ সব চরিত্র পাঠকের মন কেড়েছে কেবল তাদের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার জন্যে। সৎ ও সরল মানুষকে সবাই ভালবাসে। সবাই যাকে উপহাস করে কিংবা হুগোর "লে মিজেরাবল"-এর নায়ক জাঁ ভালজাঁর মতন যে কেবল ভাগ্যদোষে অত্যাচারই কুড়োয়, কারো কাছে এতটুকু স্নেহ-মমতা পায় না, স্বভাবতই সেই অনন্যোপায় মানুষটির জন্যে পাঠকের মন করুণায় ভরে ওঠে। সেকালের হিউমারের গোপন লক্ষ্যটিও ছিল তাই "...to aroise compassion." অর্থাৎ পাঠকের মনে করুণা উদ্রেক করা।

কিন্তু অসহায়ের প্রতি এই করুণাকে বড় ভয়ের চোখে দেখেছেন দস্তয়েফস্কি। বলেছেন, নায়কের প্রতি পাঠকের করুণার উদ্রেক হলে তার অন্তর্নিহিত সত্য স্বরূপ করুণার নিচে চাপা পড়ে যায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাঠক তথা সমস্ত আয়োজনটাই তাঁর পণ্ড হয়ে যায় তখন।

তাই হুগোর 'horrible beauty' হয়েটস্-এর 'terrible beauty'র চেয়ে 'grotesque beauty'-র মধ্যেই দস্তয়েফস্কি দেখলেন "avenue to spiritual reality in art."

Positive good man-এর প্রসঙ্গে আর্টে রিয়ালিজমের প্রশ্ন যখন এল তখনই এর good man চরিত্রে জটিলতা দেখা দিল। চরিত্র থেকে বাদ চলে গেল নির্বুদ্ধিতা ও ভাঁড়ামির অংশটা, যুক্ত হল মনুষ্যোচিতদুর্বলতা আর উৎকেন্দ্রিকতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই জটিল Positive good man চরিত্রটির সফল চিত্র যিনি আমাদের প্রথম উপহার দিলেন তাঁর নাম দস্তয়েফস্কি। চরিত্রটি 'ইডিয়ট'-এর প্রিন্স মিসকিন। সেই থেকে এই পজিটিভ চরিত্রে হাত দিয়েছেন অনেকেই, সফলও হয়েছেন কোন কোন লেখক, অবশ্য ততদিনে সাহিত্যও তার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করেছে। যুদ্ধ আর এটম বোমার আঘাতে মানুষের বিশ্বাস গেছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে, নিরবলম্ব মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে একটা চাপিয়ে দেওয়া অনিচ্ছার বোঝা, বেঁচে থাকা হয়ে উঠেছে এক হাস্যকর অবাস্তব ব্যায়াম। এই চিন্তার প্রতিফলক-সাহিত্যে জীবন নেতিবাদের অন্ধকারে তার নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। তবু তারই মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষণপ্রভার মতন দু'একটি পজিটিভ চরিত্র আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। তেমনই একটি চরিত্র ১৯৫৯ সালের রচিত ইয়োনেসকোর নাটক 'রাইনোসেরাস'(গণ্ডার)-এর নায়ক বেরেঁজের। বন্ধু, সমাজ, শেষ পর্যন্ত স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে গেছে তবু আত্মসমর্পণ করে নি বেরেঁজের। অবমানুষ হবার বিরুদ্ধে শেষ অবধি সে একলা লড়াই করে গেছে। একলা লড়াইতে ফাঁকি থাকে না। তাই পজিটিভ চরিত্রে ফাঁকির অবকাশ নেই। আর realism-এ ফাঁকির সুযোগই বা কোথায়!

পজিটিভ চরিত্র নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার আগে এই realism কী ব্যাপার তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, "রাজাবদল"-এর গৌর পণ্ডিত মশায়, "শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন"-এর লোকনাথ এবং "আসামী হাজির"-এর সদানন্দ বিভিন্ন কোণ থেকে আমাদের মনে যে ছাপ ফেলেছে, সে আসলে একটি মানুষেরই ছাপ, সে মানুষ 'a positive good man'। এই যে সাধারণ মানুষ থেকে বেছে অন্য একটি সাধারণ মানুষ খুঁজে বের করা যে সর্বপ্রকারে সাধারণ হয়েও উৎকেন্দ্রিকতাবশত অ-সাধারণ, দস্তয়েফস্কি বলেছেন এটাই আর্টে realism in a higher sense অর্থাৎ "to find the man in a man."

বিখ্যাত সমালোচক কনসট্যানটিন মোচুল্‌স্কি realism-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,...the new reality created by the artist of genius, real, because, it reveals the very essence of existence.

এখানে বলা দরকার realistic আর realism-এ পার্থক্য আছে। Realistic লেখা হচ্ছে বাস্তবের ফটোগ্রাফিক অনুকৃতি (কার্বন কপি)। Reality in art অন্য ব্যাপার। এখানে লেখক সংসারে সমাজে নিত্য ঘটা ঘটনার বিবৃতি মাত্র দেন না, তিনি অনুরূপ ঘটনা নির্মাণও করেন। সে ঘটনার ভাষ্যের ভিতর দিয়ে একটি চরিত্র ক্রমাগত বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক বাস্তবতায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়ার কথা যত সহজে বলা হল ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কথাশিল্পের সমস্ত সম্ভাব্য দিকগুলো। বিশেষ করে ভাবতে হবে কী ভাবে বলব। যে ভাবে বললে idea ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে, কাহিনীর শেষে নায়কের গা থেকে ঘটনার নামাবলী খসে গিয়ে নিঃসঙ্গ সেই নিরাবরণ মানুষটি পাঠকের মনের দেয়ালে ছবি হয়ে ঝুলে থাকে—তাকেই বলি সার্থক রচনা। কিন্তু সে বড় সহজ কাজ নয়। তল্‌স্তয় তাঁর War and peace শেষ করে ডায়েরীতে লিখেছিলেন—I cannot call my composition a tale, because, I

do not know how to make my characters act only for the sake of proving or clarifying any one idea or series of ideas.

তল্‌স্তয় যা পারেন নি বলে বলেছেন এক্ষেত্রে 'আসামী হাজির'-এর লেখক কিন্তু তা পেরেছেন। তিনি তাঁর প্রতিটি ঘটনাকে একটি মুল ঘটনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং একটি প্রত্যয়কে প্রমাণ অথবা প্রাঞ্জল করার জন্যে সব চরিত্র ও ঘটনা সেদিকে সক্রিয় করে তুলেছেন। ঘটনাগুলো বহু শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হতে হতে চতুর্দিক থেকে এগিয়ে এসে শেষে উদ্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে লয় পেয়েছে। এইভাবেই নিজস্ব প্যাটার্ন ও টেকস্‌চারের টানাপড়েনে 'আসামী হাজির'-এর লেখক তাঁর ফিক্‌শনাল য়ুনিভার্স অর্থাৎ কাহিনীর বিশাল জগৎ গড়ে তুলেছেন। এই বাবদে তিনি বালজাক, ডিকেনস, গোগোল, দস্তয়েফস্কির সঙ্গে তুলনীয়। বিশেষ করে grotesque beauty প্রসঙ্গে দস্তয়েফস্কি তো অবশ্যই। পজিটিভ গুড ম্যান-এর চরিত্র থেকে যখন ব্যঙ্গাত্মক অংশটা বাদ দেওয়া হল, যোগ করা হল উৎকেন্দ্রিকতা, তখনই ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনার শূন্যস্থান পূর্ণ করল অনৈসর্গিক উপস্থাপনা। যেমন 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন'-এ নায়ক লোকনাথ ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করছে। যেমন 'আসামী হাজির'-এ সদানন্দ তার দ্বিতীয় সত্তাকে অর্থাৎ হাজারি বেলিফকে খুন করেছে। এইসব অনৈসর্গিক ঘটনার সন্নিবেশ দেখেই সেকালের দস্তয়েফস্কিকে এবং একালের বিমল মিত্রকে অনেক সমালোচক অতিরঞ্জনের দোষে অভিযুক্ত করেছেন ; কিন্তু এ দোষ যে দোষ নয় বরং বিশেষ এক ধরনের গুণ দস্তয়েফস্কিই তার জবাব বেঁচে থাকতে দিয়ে গেছেন। যাঁদের তা মনে নেই কিংবা যাঁরা তা জানেন না তাঁদের অবগতির জন্যে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, "All art consist in a certain portion of exaggeration provided...one does not exceed certain bounds."

এই bounds, এই সীমারেখা নির্দেশ করা বড় কঠিন ; তবে সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে কিন্তু বোঝা যায় লেখকের বিশেষ আধ্যাত্মিক বাস্তবতার লক্ষ্য অনুধাবন করলে। যদি দেখা যায় তিনি তাঁর সেই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন তখন অতিরঞ্জন আর অতিরঞ্জন থাকে না।

পাঠক ও সমালোচকদের স্মরণার্থে বলছি, অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয় তখনই যখন পরিবর্তনশীল উপরিভাগের অব্যবহিত নিচেকার অপেক্ষাকৃত স্থির ও স্থিতিশীল মানবিক অস্তিত্বকে দেখানো আবশ্যক হয়ে ওঠে—কেবল অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম কিংবা ধূসর জিনিসকে দৃষ্টিগোচরে আনতে হলে তাকে বর্ধিতায়তন করাই দরকার। ডিকেনস্ বলেছেন—What is exaggeration to one class of mind and perception is plain truth to another. দস্তয়েফস্কি বলেছেন—The important thing is not in the object, but in the eye; if you have an eye, the object will be found ; if you don't have an eye, if you are blind—you won't find anything in any object.

বিষয়ের এই অন্তর্নিহিত গুণটি দেখবার চোখ যাঁর আছে তিনিই realism-এর শিল্পী। তাঁর হাত দিয়েই যুগে যুগে মূর্ত হয়ে উঠবে Positive good man. বিমল মিত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন সত্য দর্শনের সেই দুরাসদ দৃষ্টি তাঁর আছে।

শিল্পীর এই দুরাসদ দৃষ্টিগোচর Positive good man প্রসঙ্গে Mochulskey বলেছেন ঃ In the "world of darkness" comes a man not of this world...He is not an active fighter contending in the struggle with evil forces, not a tragic hero challenging fate to combat, he does not judge and does not accuse, but his very appearance provokes a tragic conflict. One personality

is set in opposition to the entire world.

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি 'আসামী হাজির'-এর নায়ক সদানন্দর দিকে তাকাই তো সদানন্দর তিনটে ডাইমেনশানই (স্তর) একসঙ্গে আমাদের চোখে পড়বে। তিনজন সদানন্দকে আমরা একটি অবয়বে বিধৃত দেখতে পাব। চোখ মেললেই যেটা চোখে পড়বে সে তার সাধারণ চেহারা। আর পাঁচজন সমবয়সীর মতন স্বাভাবিক আচার-আচরণ। লেখাপড়া করে, স্কুলে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে সকলের মতন তারও বয়েস বাড়ে। কিন্তু এই ওপরের স্তরের নিচে সদানন্দ কিন্তু আসলে অন্য রকম। তার প্রশ্ন সাধারণের প্রশ্ন নয়, তার দেখার চোখও নয় সাধারণের চোখের মতন। সদানন্দর চোখে আরও কিছু, এমন কিছু ধরা পড়ে যা আর কারও চোখে পড়ে না। চোখে পড়লেও যার তাৎপর্য আর কেউ বোঝে না। শেষ স্তরের সদানন্দর এই যে অবহিতি-বোধ, এবং ভ্রষ্টত্ব সম্বন্ধে প্রখর সচেতনতা, এর থেকেই ঘটতে থাকে তার অহং-এর উত্তরণ। সদানন্দর এই তিনটি স্তর কিন্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, এই ত্রিস্তর মিলিয়েই সদানন্দ সম্পূর্ণ একটি মানুষ। কী করে জানলাম? বিমল মিত্র সদানন্দ সম্পর্কে কি একটা দার্শনিক বক্তৃতা দিয়েছেন? না। তবে? হ্যাঁ, এইখানেই বিমল মিত্রের শিল্প-বৈদগ্ধ্য। তিনি বক্তৃতা দেন না, তিনি Maupassant-র ভাষায় "To produce the effect he seeks, that is, the feeling of simple reality, and I to bring out the lesson he would draw from it, that is, the revelation of what contemporary man really is to him, he will have to employ facts of constant and unimpeachable veracity...the achievement of such a goal consists, then, in giving the complete illution of reality following the ordinary logic of facts, and not in transcribing slavishly in the pell-mell of their occurance. (Preface to "Pierre et Jean") অর্থাৎ বিমল মিত্র দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-ঘটা সাদামাটা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রকে উপস্থিত করেন কিন্তু সে সাদামাটা ঘটনাও আসলে মোপাশ্যাঁর ভাষায় ওই উপরিউক্ত বাস্তবেরই অধ্যাস এবং আদৌ বিশৃংখল কতকগুলি ব্যাপার মাত্র নয়। বিমল মিত্রের উদ্ভাবিত ঘটনা বা সিচুয়েশান বস্তুত ঘটনা নয়, ইলাসট্রেশান অর্থাৎ উদাহরণ। এবং তারও সব সময় থাকে তিনটে স্তর—প্রতিক্রিয়া, তাৎপর্য এবং প্রভাব।

উদাহরণ স্বরূপ কপিল পায়রাপোড়ার ঘটনাটাই উল্লেখ করা যাক। পাঁচ বছরের সদানন্দ কৈলাস গোমস্তার সঙ্গে হাটে গেছে। সেখানে কপিল বেলুন বেচছিল। সদানন্দ বেলুন চাইলে, সে দাম নিলে না, এমনিতেই একটা বেলুন দিয়ে দিল তাকে। কিন্তু কৈলাস গোমস্তা হিসেবের খাতায় চার পয়সা খরচ লিখে সেই পয়সা চারটে নিজে রাখলে। দু'দিন বাদে সেই বেলুনটা চুপসে গেলে সদানন্দ বায়না ধরলে তার আর একটা বেলুন চাই। একমাত্র বংশধরের আবদারের কাছে কঞ্জুস জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীর মনে কৃপণতর ছিটেফোঁটাও থাকে না। তখুনি চাকর পাঠানো হল রেল-বাজারে। চাকর দু'পয়সা দিয়ে একটা বেলুন কিনে নিয়ে এল। বেলুনের দাম দু'পয়সা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন নরনারায়ণ চৌধুরী, আর একবার হিসেবের খাতাটা মিলিয়ে দেখলেন—হ্যাঁ, কপিল দু'পয়সা বেলুনের দাম চারপয়সা নিয়েছে তাঁর নাতির কাছ থেকে। কপিল ঠগ, কপিল জোচ্চোর! হুকুম হল কপিলকে ধরে নিয়ে আসবার। বিনে পয়সার বেলুনের দাম হিসেবের খাতায় চার পয়সা লিখে যে চুরি করেছিল সেই কৈলাস গোমস্তাই ছুটল তাকে গ্রেপ্তার করে আনতে।

তারপর? কপিল পায়রাপোড়ার আর্তনাদ শুনে সদানন্দ ছুটে গিয়েছিল কিন্তু তার কথায় তার প্রতিবাদে কেউই কান দিলে না, শুনতে চাইলে না কেউ অপরিণত বালকের কথা,

টেনে বের করে নিয়ে এল তাকে ঘর থেকে। কপিল পায়রাপোড়া শুধু মারই খেলে না, তার তিন বিঘের সামান্য জমিটুকুও গেল। জমিদারের নির্দয় ক্রোধ তাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়লে। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে অসহায় মানুষটা অনন্যোপায় হয়ে শেষমেশ গলায় দড়ি দিয়ে মরল। সে দৃশ্য দু'দিন পরেই সবাই ভুলে গেল। এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা এমনই গা-সওয়া হয়ে গেছে মানুষের যে, এসব ঘটনা কেউই আর মনে রাখলো না।

কিন্তু সদানন্দ বলে, "দেখ প্রকাশ মামা, আজকাল সবাই তার কথা ভুলে গেছে। ....ওই বারোয়ারীতলায় যখন সে আত্মঘাতী হল সবাই তা দেখেছে, দেখে শিউরে উঠেছে, কিন্তু আজকে কারো সে কথা মনে নেই........"

শুনে প্রকাশ মামা হো হো করে হেসে উঠেছে, বলেছে, "তুই তো দেখছি একটা আস্ত পাগল। অত কথা মনে রাখতে গেলে মানুষের চলে! তুই তো আমায় অবাক করলি সদা।"

সদা বলে, "কিন্তু মামা আমি কেন কিছুই ভুলতে পারি নে? আমার কেন সব মনে পড়ে যায়?"

না—সদানন্দর শুধু মনেই পড়ে না, তার তীব্র বোধের কাছে, তীক্ষ্ণ অবহিতির কাছে চৌধুরীবংশের পাপের ইতিহাস সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার মধ্যে পুকুরের জল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়। তারা তাকে চৌধুরীবংশের পাপের ইতিহাস শোনায়।

কপিল পায়রাপোড়ার এই প্রাসঙ্গিক কথার মধ্যে আমার উপরিউক্ত তিনটি স্তর পর-পর এইভাবে সাজানো—(১) চারটে পয়সাও চুরি করতে ছাড়ে না এমনই হীন এই জমিদার সেরেস্তার মানুষ (২) কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে জমিদারের ক্রোধ চরম হয়ে ওঠে (৩) তার ফলে একটি শিশুর সামনে এই জগৎ ও জীবনের ওপরকার পলেসতারাটা কী ভাবে ভেঙে যায়, কী ভাবে ভেতরের বীভৎস চেহারাটা বেরিয়ে আসে। বিমল মিত্র কোন ঘটনা অকারণে তো বলেননি না অধিকন্তু তিনটে ডায়মেনশন না থাকলে তার অবতারণাও করেন না। তাঁর লক্ষ্য সব সময় সেই ঘটনার দিকে যার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় বাঙালী মানসের যন্ত্রণা, তার নৈতিক সংকট। অন্ধকারটা যত তীব্র হয়ে ওঠে আলোর জন্যে আকূতি ততই ঐকান্তিক হয়। অতএব তাঁর উদ্ভাবিত ঘটনার মধ্যে একটা আলোর আভাসও শেষ-মেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সদানন্দর এলেবেলে মনোভাব ও ছন্নছাড়া আচার আচরণকে চিরাচরিত পথে সুস্থ করে তোলার জন্যে প্রকাশ মামা একদিকে তার বিয়ের জন্যে সদানন্দর বাপ-মাকে সুপারিশ করে আর একদিকে তাকে লায়েক করে তোলার জন্যে যাত্রা, কবিগান, ঢপ শোনাতে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় বাজারে-মেয়ে-মানুষের বাড়িতে। যার হাতে একদিন আট দশ লাখ টাকার সম্পত্তি আসবে তাকে সেই টাকার সুখভোগ করতে হবে তো! আর তখন তার হাতেও কোন্ দু'এক লাখ টাকা না আসবে! পৃথিবীর সব দালালরাই এই রকম এক এক জন প্রকাশ মামা।

সদানন্দর অন্তরদৃষ্টি প্রকাশ মামাকে চিনতে ভুল করে না,—প্রকাশ মামাও একজন মানুষ। সদানন্দ ভাবে, কেউ প্রকাশ মামাকে মানুষ ছাড়া জানোয়ার বলবে না। মানুষের মতন দুটো হাত, পা, চোখ, কান। মানুষেরই মতন মুখের ভাষা। সংসারে ও-রকম লোককে সবাই মানুষ বলেই জানে। অথচ প্রকাশ মামা কি সত্যিই মানুষ!

সত্যিকারের মানুষ তার দাদু নরনারায়ণ চৌধুরীও না। এবং তার বাপও না। নরনারায়ণ চৌধুরী পনেরো টাকা মাইনের নায়েব ছিলেন কালীগঞ্জের জমিদার হর্যনাথ চক্রবর্তীর।

হর্যনাথ চক্রবর্তীর শেষ জীবনে চৈতন্যোদয় হয়েছিল, তিনি সজ্ঞানে গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করলেন এবং নরনারায়ণের সৌভাগ্য কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর ওয়ারিশানদেরও মৃত্যু ঘটল। রইল শুধু হর্যনাথের বিধবা, কালীগঞ্জের বউ। সেই বিধবার সর্বস্ব তিলে তিলে গ্রাস করে নায়েব নরনারায়ণ চৌধুরী হলেন কালীগঞ্জ আর নবাবগঞ্জ—এই দুই বিশাল ভূমির একচ্ছত্র জমিদার। শেষ বয়েসে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন নরনারায়ণ চৌধুরী, তবু টাকার সিন্দুকটা—চুনী পান্না হীরে জহরতে বোঝাই সিন্দুকটা আগলে বসেছিলেন তিনি। এবার তিনি একমাত্র বংশধর নাতি শ্রীমান সদানন্দকে বিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ে এই বিশাল জমিদারী আর এই মস্ত সিন্দুকটা সঁপে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত ; কিন্তু এদিকে যে পাপের বীজটি বিশাল এক মহীরূহ হয়ে উঠেছে তিনি তা গ্রাহ্যই করতে চান নি। কিন্তু সদানন্দ ছাড়লে না। সে যখন জানলে দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কালীগঞ্জের বউ দাদুর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিয়েছে, সে দাদুকে চেপে ধরলে,—তোমার সিন্দুক বোঝাই টাকা, কেন তুমি তবে বিধবা বুড়ো মানুষটাকে ঘোরাচ্ছ, টাকাটা দিয়ে দাও।

দাদুর যুক্তি—দাও বললেই দেওয়া যায়? আমি কি দেব না বলেছি, দেব, ঠিক দিয়ে দেব। তুই বিয়ে করে আয়...

যার কাছে হিসেবই ধর্ম হিসেবই মোক্ষ, যার কাছে স্বর্গ বলতেও টাকা সে কখনো সহজে টাকা ছাড়ে! অথচ সেই টাকাই মুঠো মুঠো খাওয়াতে হল পুলিসের দারোগাকে। একটা খুন চাপা দিতে আরও পাঁচটা খুন করতে হল। কেননা অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক স্বার্থ ক্রমাগত মানুষকে এক নিদারুণ ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছে মানুষ। যত সে অসহায় বোধ করছে ততই সে পাপীর গোষ্ঠী বাড়াচ্ছে, সেই দলের পুষ্টিবিধান করছে। একদিকে এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলবান হচ্ছে আর একদিকে অসহায় মানুষ তারই শিকার হয়ে হয় আত্মবিসর্জন দিচ্ছে নয় তো তাদের দালাল হয়ে দল ভারী করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে positive good man ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, সরে যচ্ছে negation-এর দিকে, বৈরাগ্যের দিকে। শুভ রাত্রির মধুর ক্ষণটিতেই তাই একটি নিষ্পাপ নববধূর জীবনে নেমে এল অন্ধকার।

শোষণভিত্তিক সমাজে যে শোষণ করে না সে শোষিত হয়। আর যে এই শোষণকে পাপ বলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও শোষিতের জন্যে দুঃখ পায়, সমাজ তাকে কায়দা করে মুঠোয় পুরতে চায়, না পারলে তাকে সেখানে তিষ্ঠতে দেয় না। আসলে তার বিবেকই তাকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঘটেও ছিল তাই। নরনারায়ণ চৌধুরী সদানন্দকে আয়ত্তে আনিতে পেরেছেন ভেবে খুশী হয়েছিলেন। সে নববধূর ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়েছে। এতএব আর চিন্তা কী! এখন থেকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশপরম্পরা তিনি অমর হয়ে থাকবেন, অনন্তকাল ধরে নিজের রক্তের ধারার মধ্যে অখণ্ড পরমায়ু লাভ করবেন। কিন্তু তিনি জানলেন না তাঁদেরই পাপের প্রতিবাদ ও প্রায়শ্চিত্ত করতে ফুলশয্যার পালঙ্ক থেকে নেমে সকলের অগোচরে আকাশের নিচে কণ্টক শয্যা পাততে বেরিয়ে গেছে সে। কিন্তু পাপের বিরুদ্ধে জেহাদ জানিয়ে একটা মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই তো তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কাজ থেমে যায় না। থেমে যেতে দিতেও চান না নরনারায়ণ চৌধুরীর যোগ্যপুত্র হরনারায়ণ চৌধুরী। তাই তিনি নিজেই পরিত্যক্তা পুত্রবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। এখানে লেখকের সংযম ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। সুপরিচিত এবং সম্পর্কযুক্ত শব্দের মাধ্যমে সাধারণ-গ্রাহ্য যুক্তির পথ ধরে তিনি অনায়াসে এক নিদারুণ সংকট উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন।

সত্যকে দেখার এবং সেই সত্যের সামাজিক ও ব্যক্তিগত বাস্তব রূপ তুলে ধরার ক্ষমতা

শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লক্ষণ সন্দেহ নেই কিন্তু সংকটের সত্যকে টুকরো টুকরো করে দেখলে সংকটের পূর্ণ চেহারা যেমন দেখা যায় না, তেমনি, Positive good man, যাকে কেন্দ্র করে সংকট প্রকট হয়ে ওঠে তাকেও সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের আর এক প্রমাণ এই তাত্ত্বিক সত্য তাঁর শুধু জ্ঞাতই নয়, এর স্বরূপও তাঁর অনায়াস-আয়ত্ত। তাই তো তিনি সদানন্দর মাধ্যমে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সামাজিক সংকটের জটিল রূপটি সামগ্রিক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। আর সামাজিক সংকট সামগ্রিক ভাবে ফুটে ওঠার দরুন সদানন্দ চরিত্রও স্বচ্ছন্দে স্বতঃই পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছে।

এই যে যুগপৎ চিত্র ও চরিত্র আঁকা, এ এক দুর্লভ গুণ। লেখক আমাদের সামনে যুগসংকট তুলে ধরতে চান ; কিন্তু কী ভাবে? যুগসংকটকে আমরা নিজেরাই কি দেখতে চাই যে কেউ দেখালেই দেখব? দৈনন্দিন জীবনে এত অসংখ্য অন্যায় আমরা দেখছি আর ভুগছি যে আমাদের বোধশক্তিটাই ভোঁতা হয়ে গেছে, চোখে পড়ে গেছে চালশে। এখন আর কোন অসঙ্গতিই আমাদের চোখে পড়ে না, কোন মর্মান্তিক ঘটনাই আর দাগ কাটে না আমাদের মনে। অতএব লেখককে আনতে হয়েছে এমন একজন মানুষকে যে এই সমাজ-সংসারে একেবারেই আগন্তুক। আগন্তুকের চোখে সবই ধরা পড়ে। অথচ আগন্তুক যেহেতু এই সমাজ-সংসারের সুখ-দুঃখের শরিক নয় তাই সে সব কিছু দেখবে খোলা চোখে সাদা মনে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। তাই তার সেই দেখায় কোথাও গাম্ভীর্য বা গুরুত্ব নেই। থাকলেও Positive good man যেহেতু রাজনীতি বোঝে না, তার চোখের দেখা দুরূহ ব্যাপারগুলোও তখন আর গুরুভার হয় না। কৌতুকে-শ্লেষে মিলে মিশে এক উপাদেয় রসবস্তু হয়ে ওঠে, যার নাম দেওয়া যায় grotesque beauty. পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই শ্লেষ ও কৌতুক মেশানো রচনার grotesque beauty শুধু নায়ক সদানন্দর মধ্যে নয়, গ্রন্থের সর্বত্র সমস্ত চরিত্র ও ঘটনার মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান।

তবে কি শুধু কৌতুকে বিদ্রূপে আমাদের এই যুগসংকটের অন্ধকারটাকেই প্রকট করার জন্যে positive good man-এর মাধ্যম ব্যবহার? না। তমসো মা জ্যোতির্গময়ো—উপনিষদের এই প্রার্থনাই লেখকের শিল্প-প্রেরণা। positive good man-এই আলোরই প্রদীপ। যুগ-সংকটেই এদের আবির্ভাব ঘটে। এরা এলেই সংকটের সামগ্রিক চেহারাটা আমাদের সামনে প্রকট হয়, আমরা শিউরে উঠি, আমরা আলোতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রার্থনায় নতজানু হই। আর সেই তো আমাদের পরিত্রাণ।

শ্বশুরের লালসাকে ধিক্কার দিয়ে, তাঁর মর্যাদার মুখোশটাকে খুলে জনতার সামনে দু'পায়ে থেঁতলে দিয়ে নয়নতারা তার স্বামীর ভিটে জন্মের মতন ছেড়ে এসেছিল বটে কিন্তু সেই থেকে তাকে হতে হয়েছিল পরস্পরবিরোধী দুই প্রবণতার শিকার। অসুস্থ সদানন্দকে রাস্তা থেকে বাড়িতে কুড়িয়ে এনে নয়নতারা তাকে প্রাণপাত সেবা করে এবং তজ্জনিত লাঞ্ছনা সয়ে তাকে সুস্থ করে তোলে অথচ সে নিজে তখন নিখিলেশের স্ত্রী। নিখিলেশ ততদিনে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, তাকে অফিসে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে। নিখিলেশ তাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করেছে। সে তাই নিখিলেশকে ভালবাসে। কিন্তু সদানন্দকে?...

সদানন্দ নয়নতারাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপুল অর্থ দিয়েছিল বটে কিন্তু সে কি নয়নতারা তাকে রোগে সেবা করেছিল বলে? কিম্বা সে কি নয়নতারাকে সে বিনা দোষে ত্যাগ করেছিল বলে? নাকি...

ফাউস্টকে বাজী রেখেছিলেন ঈশ্বর। শয়তান বলেছিল, এই পৃথিবীকে আমি বাড়ি গাড়ি নারী সম্পদ আর খেতাব খয়রাৎ দিয়ে দখল করে ফেলেছি, ব্যভিচার যুদ্ধ আর মহামারী

ছড়িয়ে মানুষদের এমন কোণঠাসা করে রেখেছি যে, সবাই আমাকে ষোড়শোপচারে পূজো করছে। অতএব এই দুনিয়াদারী আমার। ঈশ্বর বললেন, তুমি যদি ওই পবিত্র-প্রাণ ফাউস্টের আত্মাকেও আয়ত্ত করতে পারো, নিভিয়ে দিতে পারো তার বুক থেকে প্রেমের দীপশিখা তবেই স্বীকার করব এই পৃথিবী তোমার। শয়তান ফাউস্টের আত্মা কিনে নিয়েছিল, তাঁকে ভোগ সুখ ও জগতের যাবতীয় বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ফাউস্ট তাঁর প্রাণের সেই প্রেমের দীপশিখাটি কিছুতেই নিভতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত তাই ফাউস্টেরই জয় হল। শয়তান আর পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারল না।

ফাউস্টের সেই পবিত্র প্রেমের শিখাটিই বুঝি দু'চোখের দৃষ্টি-প্রদীপে ধরে পৃথিবীর অন্ধকার পায়ে পায়ে পার হয়ে সদানন্দও তার লক্ষ্যস্থলের দিকে হেঁটে চলছিল। আর ওদিকে তখন কলকাতার অভিজাত পল্লী থিয়েটার রোডের এক সুরম্য সৌধে পড়ে-পাওয়া বিপুল অর্থে কেনা সুখের কুষ্ঠ-ব্যাধিতে ভুগছিল নয়নতারা।

দিব্য প্রেমের পবিত্র আলোটি নিয়ে আজ থেকে এক হাজার ন'শ তিয়াত্তর বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রথম Positive good man. তিনিও ওই সদানন্দর মতই পৃথিবীর পথে পথে সেদিন হেঁটে চলেছিলেন। তিনিও মানুষের কল্যাণই চেয়েছিলেন। মানুষের কল্যাণের জন্যে তিনি তাঁর সারা জীবনের তপস্যার ফল মানুষকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। সে-তপস্যার ফল মানুষের কী কী কল্যাণ করেছে সদানন্দর মতন তিনিও তা দেখতে বেরিয়েছিলেন তখন। হাঁটতে হাঁটতে একদিন তিনি সেদিনের থিয়েটার রোডের এক সুরম্য সৌধে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজকীয় উৎসবে সেখানে তখন ফরিশীর পুরোহিতরা সকলে উপস্থিত—দীয়তাং ভুজ্যতাংএর রব উঠছে চারদিকে। হঠাৎ তারই মধ্যে এক ছন্নছাড়া ছিন্নবাস মানুষের উপস্থিতি যেন সব কিছু হঠাৎ তছনছ করে দিলে। কেউ তাঁকে সহ্য করতে পারলে না, কেউ তাঁকে স্বীকার করতেও চাইলে না—এমন কি নয়নতারাও না। কেবল সমবেত পাপের হিংস্র ক্রোধ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ছুটে এল তাঁর দিকে—তাঁকে রক্তাক্ত করে ছাড়ল। নিহত মানুষটির সেই রক্তে স্নান করে তখন পবিত্র হল নয়নতারা। নয়নতারার সুখের কুষ্ঠব্যাধি মিথ্যের খোলসের মতন সেই মুহূর্তেই খুলে পড়ল তার শরীর থেকে। প্রেমে জ্যোতিষ্মতী হয়ে উঠল সে। পাপের পাথর চাপা সত্য তখন মুক্তি পেল কণ্ঠে—নয়নতারা নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করল—'ইনি আমার স্বামী'।

কিন্তু একালের যীশু তখনও চিৎকার করে বলে চলেছে—'আমি তোমাদের মতন হতে পারি নি, তোমরা আমার সেই অক্ষমতার বিচার কর, তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে না পারার অপরাধের বিচার কর। আমি আসামী, আমি হাজির হয়েছি।'

অনুরূপ আর এক কণ্ঠস্বর শুনি আমরা ইয়োনেসকোর "গণ্ডার" নাটকের নায়কের মুখে—"I'm the last man left, and I'm staying that way until the end. I'm not capitulating."

* * *

বিমল মিত্র তাঁর এই উপন্যাসে যে বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি চরিত্র এমনই বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী যে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই এই জগতের সামিল হয়ে যাই কিংবা কখন যেন, কেমন করে যেন, এ জগৎ আমাদেরই জগৎ হয়ে ওঠে। সব কিছুর মধ্যে এখানে আমরা আমাদের নিজেদেরই দেখতে পাই, আমরা অবহিত হয়ে উঠি। আর এমন করে যিনি আমাদের আত্ম-অবহিত করে তোলেন, নিঃসন্দেহে তিনি আমাদেরই লেখক, আমাদের প্রিয় লেখক।

৯ এপ্রিল ১৯৭৩ — যজ্ঞেশ্বর রায়

মহড়া

"আমি অতি সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষের কথা আজকালকার ক্ষমতালোভী মানুষেরা শুনিবে কিনা জানি না। ক্ষমতা পাইবার লোভে মানুষ যখন আজকাল যে-কোনও অন্যায় আচরণ করিতে প্রস্তুত সেই সময় আমার মত সাধারণ মানুষের কাহিনী শুনিবার মত লোক নাই জানিয়াও আমি আমার এই জীবন লিখিতে বসিয়াছি। এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও একজন বিশ্বাসী-প্রাণ মানুষ আছে। সে মানুষ এখনও সততা এবং সত্যবাদিতাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে এবং বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। এই তিন শক্তিকে যে বিশ্বাস করে না তাহার জন্য আমার এ-কাহিনী নয়। তাহারা আমার এই কাহিনী না পড়িলেও আমি দুঃখ করিব না। ঈশ্বর যদি একজন যিশুখৃষ্টের জন্য হাজার-হাজার বছর অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার মত নগণ্য লোক একজন সৎ পাঠকের জন্য লক্ষ-লক্ষ বছর অনায়াসেই অপেক্ষা করিতে পারিব। আমার বয়স এখন..."

এই পর্যন্ত লিখেই সদানন্দবাবু থামলেন। বয়েসটা হিসেব করতে হবে। বয়েস কত হলো তাঁর? ভাবতে ভাবতে সদানন্দবাবু ভাবনার তলায় তলিয়ে গেলেন। কম দিন তো হলো না। অত দিনের সব কথা মনে রাখা কি সহজ! অথচ মনে করতেই হবে। মনে না করতে পারলে জীবনী লেখা ব্যর্থ হবে। সব কথাই তাঁকে খুলে লিখতে হবে। কোথাও কথা গোপন করা চলবে না তাঁর। যে-জীবন থেকে সরে এসে তিনি এখানে এই চৌবেড়িয়াতে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করছেন সেই ফেলে আসা জীবনের কথা তাঁকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আবার মনে করতেই হবে। আবার তাঁর ফেলে আসা জীবনটাকে আগাগোড়া পরিক্রমা করতে হবে।

তাঁর সেই ছোটবেলার কথাটাও তিনি মনে করতে চেষ্টা করলেন।

তিনি লিখতে লাগলেন—"আপাতদৃষ্টিতে সেই ছোট বেলা হইতেই আমার কোনও অভাব ছিল না। যাহাকে সংসারী লোক অভাব বলে তাহা আমার ছিল না। আমি নবাবগঞ্জের প্রবল-প্রতাপ জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পৌত্র, আর হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সদানন্দ চৌধুরী, যাহা চাহিতাম তাহাই পাইতাম। চাহিয়া না পাওয়ার দুঃখ যে কী ভীষণ অসহনীয় তাহা আমাকে কখনও বুঝিতে হয় নাই। অথচ সেই আমার কপালেই না-চাহিয়া সব পাওয়ার বিপর্যয় যে এমন মর্মান্তিক ট্রাজেডি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা আমি সেই অল্প বয়সে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।"

লিখতে লিখতে সদানন্দবাবুর ভাবতে বড় ভালো লাগলো। নবাবগঞ্জের সেই বাড়িটা, সেই গাছ-পালা-পুকুর, সেই বারোয়ারি-তলা, আর সেই চণ্ডীমণ্ডপ। কথাগুলো যেন ভোলা যায় না। অথচ ভুলতেই তো চেয়েছিলেন তিনি। ভোলবার জন্যেই তো এই চৌবেড়িয়া গ্রামে এসেছিলেন।

ঘরের মধ্যে একটা ছোট তক্তপোষ। তের টাকায় কিনে এনেছিলেন চৌবেড়িয়ার বাজার থেকে। তার ওপর একটা মাদুর। যখন এখানে এসেছিলেন তখন কিছুই সঙ্গে আনেন নি। তাঁর কিছু থাকলে তবে তো সঙ্গে আনবেন। নবাবগঞ্জ থেকে ট্রেনে উঠে একবার শুধু তিনি সুলতানপুরে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে কেষ্টনগর। কেষ্টনগর থেকে নৈহাটি। আর তারপর ভাসতে ভাসতে কলকাতা হয়ে একেবারে এই এখানে।এখানে তখন কে-ই বা ছিল! একেবারে যেন পৃথিবীর ওপিঠ। না আছে একটা হাট, আর না আছে একটা স্কুল।

প্রথম আশ্রয় পেলেন পালেদের আড়তে। রসিক পাল ধার্মিক মানুষ। তিনি আপাদমস্তক ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেন। বললেন—আপনার নাম?

—সদানন্দ চৌধুরী!

—ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

—ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনে খুব খাতির করে বসতে বললেন। তারপর নানা খবরাখবর নিলেন। কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, কী উদ্দেশ্যে চৌবেড়িয়ায় আগমন, বিদ্যা কতদূর। সব শুনে বললেন—ঠিক আছে, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন আর কোনও ভাবনা নেই, আপনি এখানে থাকুন—

রসিক পাল মশাই চৌবেড়িয়ার বনেদী কারবারী। পাট, তিসি, তিল মেস্তার কারবার করে তিনি বড়লোক হয়েছেন। বিরাট আড়ত ছিল তাঁর। সেই আড়তে বসে তিনি কারবার করতেন আর মহাজনী-কারবারের নামে নানা লোককে সাহায্যও করতেন। চৌবেড়িয়া গ্রামের সাধারণ মানুষ পাল মশাইকে ছাড়া তাদের জীবনযাপনের কথা কল্পনাও করতে পারতো না। বাড়িতে উৎসবে-অনুষ্ঠানে বিবাহে, শ্রাদ্ধে, অন্নপ্রাশনে, পৌষ-সংক্রান্তিতে সব ব্যাপারেই রসিক পাল মশাই-এর কাছে এসে হাজির হতো। বলতো—যাবেন পাল মশাই, আপনি গিয়ে একবার পায়ের ধুলো দেবেন—

সেই রসিক পালের বড় ইচ্ছে হয়েছিল চৌবেড়িয়াতে একটা স্কুল হোক। গ্রামের ছেলেদের বাইরের গ্রামে গিয়ে লেখাপড়া করতে হয়, এটা তাঁর ভালো লাগতো না। নিজে তিনি লেখাপড়ার ধার ধারতেন না। কিন্তু তার জন্যে তাঁর দুঃখ ছিল। ছেলেদের কলকাতার হোস্টেলে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বরাবর। কিন্তু গ্রামে স্কুল করতে গেলে মাস্টার দরকার। এমন মাস্টার চাই যার সময় আছে ছাত্র পড়াবার। কিন্তু তেমন বেকার লোক কোথায় পাবেন? কে মাস্টারি করতে রাজি হবে?

তা শেষ পর্যন্ত এই সদানন্দ চৌধুরীকে পেয়ে গেলেন। রসিক পালের আড়তে অনেক লোক খাওয়া-দাওয়া করে। ব্যাপারীরা কাজে-কর্মে আড়তে এলে তাদেরও খাওয়া-শোওয়ার বন্দোবস্ত রাখতে হয়। সদানন্দ সেখানেই থাকুক।

কিন্তু সদানন্দ হাত-জোড় করলে। বললে—তার চেয়ে পাল মশাই আমি বরং স্বপাক আহারের ব্যবস্থা করি। আমার চাল-ডাল-নুন-তেলের ব্যবস্থাটা শুধু আপনি করে দিন। আমি বরং মাইনেই নেব না—

রসিক পাল তাজ্জব হয়ে গেলেন কথা শুনে। বললেন—মাইনে নেবে না?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে তোমার খরচ চলবে কেমন করে?

সদানন্দ বললে—আমার তো খরচের কিছু দরকার নেই। আমি নেশা-ভাঙ করি না, চা খাই না, পান-তামাক-বিড়ি কিছুরই দরকার হয় না আমার। মাছ-মাংস খাওয়া আমার নিষেধ। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর আলুভাতে পেলেই আমার চলে যাবে—

রসিক পাল অনেক কাল ধরে অনেক লোক চরিয়ে বুড়ো হয়েছেন। এমন কথা কারো মুখে কখনও শোনেননি। আবার ভালো করে আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন সদানন্দর। তাঁর মনে হলো এখনও যেন তাঁর অনেক দেখতে আর অনেক শিখতে বাকি।

বললেন—আচ্ছা, আজ রাত্তিরটা তো আড়ত-বাড়িতে থাকো, তারপর কাল যা-হয় করা যাবে—

বলে তিনি সে-রাত্রের মত বাড়িতে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। আড়তের ক্যাশবাক্সে

চাবি পড়লো। চাবি নেবার আগে হরি মুহুরিকে বললেন—ওই লোকটাকে একটু যত্ন-আত্তি কোরো হরি, লোকটা ভালো মনে হচ্ছে—

হরি মুহুরিই সদানন্দের সব বন্দোবস্ত করে দিলে। পরের দিন রসিক পাল হরি মুহুরিকে জিজ্ঞেস করলেন—কালকে রাত্তিরে ওই ছোকরার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

হরি মুহুরি রসিক পালের আড়তের পুরোন লোক। আড়তে বহু লোকের আনাগোনা দেখেছে, বহু লোকের তদ্‌বির তদারক করেছে।

বললে—আজ্ঞে অসুবিধে হবে কেন? অসুবিধে হবার কথা তো নয়।

—কী খেতে দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে ভদ্দরলোক কিছুই খান না। বলতে গেলে উপোস। উপোসই এক রকম।

—কী রকম?

—আজ্ঞে, একখানা রুটি আর সিকি বাটি ডাল। আর কিছু নিলেন না।

—মাছ হয়নি কাল?

—আজ্ঞে হয়েছিল, কিন্তু উনি মাছ-মাংস-ডিম কিছুই ছোঁন্‌ না।

—শোওয়ার কোনও অসুবিধে হয়নি? নতুন জায়গা তো!

—অসুবিধে হলে কি আর গান গাইতেন?

—গান?

রসিক পাল অবাক হয়ে গেলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন—গান? কী গান?

হরি মুহুরি বললে—ঘুমোতে ঘুমোতে অনেকের গান গাওয়া যেমন অভ্যেস থাকে তেমনি আর কি।

—কী, গানটা কী?

হরি মুহুরি বলল—কবির গান আজ্ঞে—ছোটবেলায় হরু ঠাকুরের কবির গান শুনেছিলুম, সেই গান—

—হরু ঠাকুরের কোন্‌ গান?

হরি মুহুরি গানটা বললে—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।
শ্যামের পীরিতি গরল মিশ্রিত,
কারো মুখে যদি শুনিতাম ॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম ॥

রসিক পাল সাদাসিধে মানুষ। কবি নয়, কিছু নয়, সহজ সাধারণ মানুষের গানের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান গায়, পাগল নাকি হে?

হরি মুহুরি বললে—গানও করতে লাগলেন আবার কথাও বলতে লাগলেন। সারা রাত গান আর কথার জ্বালায় আমাদের কারো ঘুম হয়নি কর্তামশাই—

—গান তো হলো, কিন্তু কথা? কথা কিসের আবার?

হরি মুহুরি বললে—সে সব অনেক কথা, সব কথার মানে বুঝতে পারিনি। কখনও আবার একজন মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে, আবার কখনও...

—মেয়েমানুষ? মেয়েমানুষ মানে? চরিত্র খারাপ নাকি লোকটার?

হরি মুহুরি বললে—আজ্ঞে তা বলতে পারবো না, তবে যে-মেয়েটার নাম ধরে ডাকছিলেন তার নামটা ভারি নতুন—

—কী রকম?

হরি মুহুরি বললে—নয়ন। কখনও নয়ন বলছিলেন, কখনও আবার নয়নতারা—মনে হলো নিশ্চয়ই কোনও মেয়েমানুষের নাম হবে। রাত্তির বেলা ঘুমোতে ঘুমোতে মেয়েমানুষের নাম ধরে কথা বলে, পীরিতের গান গায়, এ তো ভালো লক্ষণ নয় কর্তামশাই, আপনি কেন অমন লোককে আড়তে ঠাঁই দিলেন বুঝতে পারছি নে, কাজটা কি ভালো হলো?

রসিক পাল তখন আর কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন। এতদিন সংসারে বাস করে এসে এত লোক চরিয়ে তিনি কি শেষকালে ভুল করলেন নাকি! হরি মুহুরির কথার কোনও সোজা উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন—ঠিক আছে, তুমি একবার ওঁকে আমার গদিতে পাঠিয়ে দিও তো—

গদিবাড়িতে রসিক পাল রোজ সকালে এসে কয়েক ঘণ্টা বসেন। সেই সময়ে খাতক পাওনাদার পাড়া-প্রতিবেশী নানা রকম লোক নানা আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে আসে। কেউ টাকা খয়রাতি চায়, কেউ শুধু মুখটা দেখাতে আসে। তারপর আসে ব্যাপারীরা। কারবারের লেনদেন নিয়ে কথাবার্তা হয় সেই সময়। রসিক পাল মশাই তখন কুঁড়োজালির মধ্যে হাত পুরে মালা জপ্‌ করেন আর মুখে কথা চলে। রসিক পালের সব কাজই ঘড়ি ধরা। সকাল বেলা উঠেই গঙ্গাস্নান। তখন ঘড়িতে ভোর ছ'টা! পাল মশাইকে দেখেই সবাই বুঝতো তখন ঘড়িতে ছটা বেজেছে। কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা তার কোনও ব্যতিক্রম হতো না। তারপর গদিবাড়িতে এসে যখন বসতেন তখন ঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় আটটা। তারপর যখন ঘড়িতে সকাল ন'টা তখন একবার হাঁচবেন।

এ-রকম ঘড়ি মিলিয়ে কাজ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সেই লোকেরই একদিন সকাল ন'টার সময় হাঁচি পড়লো না।

সে এক বিস্ময়কর কাণ্ড! ঘটনাটা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। এ কী হলো! এমন তো হয় না! সকলেই বুঝলো এবার একটা কিছু সর্বনাশ ঘটবে।

রসিক পাল হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—হরি—

এক ডাকেই আড়ত থেকে হরি মুহুরি এসে হাজির। হরি মুহুরি আসতে পাল মশাই বললেন—হরি, একবার বলাই ডাক্তারকে ডাকো দিকিনি। বলবে আমার শরীর খারাপ, আমি এখুনি বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি—

তারপর ডাক্তার এলো। পাল মশাইকে পরীক্ষা করলো। হয়ত ওষুধ-বিষুধও দিলে। কী ওষুধ দিলে ডাক্তার তা কারো জানবার কথা নয়। কেন ঘড়িতে ঠিক ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাঁচি সেদিন পড়লো না, ডাক্তারি-শাস্ত্রে তার নিদান আছে কিনা তাও কেউ জিজ্ঞেস করলে না। কিন্তু দু'দিন পরে আবার সবাই দেখলে ঠিক ঘড়িতে যখন কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টা তখন তিনি গঙ্গাস্নানে চলেছেন। তারপর ঠিক আটটার সময় গদিবাড়িতে এসে বসলেন। আর ঠিক তারপর যখন ন'টার ঘরে ঘড়ির বড় কাঁটাটা ছুঁয়েছে তখন 'হ্যাচ-চো' শব্দে তাঁর হাঁচি পড়লো। তখন সবাই নিশ্চিন্ত।

সদানন্দর ঠাকুরদাদা নরনারায়ণ চৌধুরীরও ঠিক এমনি ঘড়ির কাঁটা ধরা কাজ ছিল। নদীতে স্নান করে এসে বসতেন কাছারি-ঘরে। তখন কৃষাণ, খাতক, পাওনাদার, গ্রামের আরো পাঁচ-দশজন গণ্যমান্য লোক এসে বসতো। বিরাট কাছারি-ঘর। কাছারি-ঘরের পেছনে ঢাকা বারান্দা। সেই বারান্দার লাগোয়া সিঁড়ি দিয়ে নরনারায়ণ চৌধুরী দোতলায় উঠতেন। দোতলায় ছিল তাঁর শোবার ঘর। সেই শোবার ঘরের মধ্যেই ছিল তাঁর লোহার সিন্দুক।

সদানন্দ একদিন বলেছিল—দাদু, তোমার কত টাকা!

টাকা! শুধু টাকা নয়, থাক্ থাক্ নোট। তার পাশে হীরে পান্না চুনি মুক্তো! আরো কত দামী-দামী জিনিস।

নরনারায়ণ যখন সিন্দুক খুলেছিলেন তখন দেখতে পাননি যে তাঁর নাতি কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন সদানন্দর বয়েস পাঁচ কি ছয়। পাঁচ ছ' বছর বয়েস থেকেই নাতি যেন কেমন সব লক্ষ্য করতো। সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, সব জিনিস সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাবে। বলবে—তোমার দাড়ি সাদা কেন দাদু?

কর্তাবাবু বলতেন—একে নিয়ে তো মহা মুশকিল হলো দেখছি—ওরে কে আছিস, কোথায় গেলি সব—

দীনু চৌধুরী-বাড়ীর পুরনো ভৃত্য। দীননাথ। দীননাথ এসে তখন নাতিকে টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেত।

কর্তাবাবু বলতেন—যা দীনু, ওকে নিয়ে পুকুরের হাঁস দেখা গে যা—

সত্যিই তখন অনেক কাজ নরনারায়ণ চৌধুরীর। একগাদা লোক কাছারি-বাড়িতে। টাকাকড়ির কথা হচ্ছে তখন খাতকদের সঙ্গে। সুদের কড়াক্রান্তির চুল-চেরা হিসেব। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই লোকসান হয়ে যাবে দাদুর। টাকার ব্যাপারে নরনারায়ণ চৌধুরীর কাছে সব কিছু তুচ্ছ। অন্য সময়ে দাদুর খুব ভালোবাসা। অন্য সময়ে নাতি না হলে দাদুর চলে না। কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করেন—সদা কোথায় গেল, সদাকে দেখছি নে যে—

রসিক পাল মশাইকে দেখে সদানন্দর সেই কর্তাবাবুকেই মনে পড়তো কেবল। ঠিক তেমনি কারবার, ঠিক তেমনি ব্যবহার।

পরের দিন হরি মুহুরি এল।

বললে—কেমন আছেন বাবু, ঘুম হয়েছিল তো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

—আপনাকে কর্তামশাই একবার ডেকেছেন গদিবাড়িতে—

কথাটা শুনেই সদানন্দ সোজা গদি বাড়িতে যাচ্ছিল। হরি মুহুরি বললে—না না, এখন যাবেন না। এখন নয়—

সদানন্দ বললে—কেন, এখন নয় কেন? এখন ঘুম ভাঙেনি বুঝি তাঁর?

হরি মুহুরি বললে—ঘুম? ঘুম কর্তামশাই-এর ভোর চারটেয় ভেঙেছে, তারপর ছ'টার সময় গঙ্গাস্নান করেছেন, তারপর আহ্নিক সেরে আটটায় গদিবাড়িতে এসে বসেছেন—

সদানন্দ বললে—তা এখন তো সাড়ে আটটা, এখন যাই—

—না, এখন না। ন'টা বাজুক, ন'টার সময় কর্তামশাই হাঁচবেন—

—হাঁচবেন?

—হ্যাঁ।

—হাঁচবেন মানে?

হরি মুহুরি এই বেকুফকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়লো। বললে—আরে আপনি কি বাংলা কথাও বোঝেন না? হাঁচি মশাই হাঁচি। সর্দি হলে যে-হাঁচি মানুষ হাঁচে সেই হাঁচি। আপনি কখনও হাচেঁন না?

সদানন্দ বললে—হাঁচবো না কেন?

—সেই রকম কর্তামশাইও হাঁচেন। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় ঘড়ি মিলিয়ে হাঁচেন।

সদানন্দ তখন চৌবেড়িয়াতে নতুন। তাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—একেবারে ঘড়ি ধরে ন'টার সময়?

হরি মুহুরির তখন হাতে অনেক কাজ। সে-কথার উত্তর দেবার সময় ছিল না তার। সে নিজের কাজে চলে গিয়েছিল আড়তঘর ছেড়ে। তারপর আড়তঘরের ঘড়িতে যখন ন'টা বাজলো ঢং ঢং করে তখন সদানন্দ সবে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় পাশের গদিবাড়ি থেকে একটা বিকট হাঁচির শব্দ এলো। একেবারে ঘর-কাঁপানো কান-ফাটানো হাঁচি। ঘড়ির সঙ্গে সদানন্দ আর একবার মিলিয়ে দেখে নিলে হাঁচির টাইমটা। তারপর গদিবাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

পাল মশাই-এর ডান হাত তখন কুঁড়োজালির ভেতরে মালা জপতে ব্যস্ত আর বাঁ হাত দিয়ে কাগজপত্র দেখছেন আর সামনে বসা লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় সদানন্দকে দেখেই বাঁ হাতের খাতাটা সরিয়ে পাশে রাখলেন।

বললেন—এই যে, এসো এসো, বোস—

সদানন্দ তক্তপোশের ওপর পাতা মাদুরের ওপর পা গুটিয়ে বসলো। যারা এতক্ষণ সামনে ছিল তার একটু নড়ে-চড়ে সরে বসলো।

—বলি, তুমি যে সঙ্গীত-সাধনা করো তা তো আমাকে আগে বলোনি, তোমার দেশ কোথায়, দেশে কে কোথায় আছেন, কে নেই সব বলেছ আর আসল কথাটাই বলো নি তো। তুমি গানের চর্চাও করো নাকি আবার?

গান! সদানন্দ কথা বলতে গিয়ে একটু থমকে গেল। বললে—গান?

—হ্যাঁ হ্যাঁ গান। হরি মুহুরি সব বলেছে আমাকে। আড়তঘরে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি গান গেয়েছ, নয়নতারার সঙ্গে কথা বলেছ, আরো কী-কী সব করেছ, ও সব বলেছে আমাকে। তুমি কি কবির দলে ছিলে নাকি?

সদানন্দ লজ্জায় পড়ে গেল। কী বলবে বুঝতে পারলে না।

পাল মশাই আবার বললেন—তোমার চেহারা দেখে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি তুমি গান গাইতে পারো। আমি ভেবেছিলুম অভাবে পড়ে এখানে এসেছ, আমার কাছে আশ্রয় চাও, তাই তোমাকে ইস্কুলের কথা বলেছিলুম। গাঁয়ের ছেলেরা লেখা-পড়া করতে পারে না...তা নয়নতারা তোমার কে?

সদানন্দ বললে—নয়নতারা? আমি বলেছি?

—হ্যাঁ, গান গেয়েছ, নয়নতারার নাম ধরে কথা বলেছ। ঘুমোতে ঘুমোতে তোমার গান গাওয়ার অভ্যেস আছে বুঝি?

সদানন্দ কোনও উত্তর দিলে না। আর উত্তর দেবেই বা কী? উত্তর দেবার কিছু থাকলে তবে তো উত্তর দেবে?

—কী গানটা যেন বললে হরি মুহুরি। দাঁড়াও মনে করি। ছোটবেলায় আমিও গানটা শুনেছি—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম ॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম ॥

লজ্জায় মাথা কাটা গেল সদানন্দর। পাল মশাই গানের কলিগুলো বলছেন আর আশেপাশের সবাই শুনছে।

রসিক পাল মশাই আবার বলতে লাগলেন—কিন্তু বাপু, তোমায় বলে রাখছি গান-টান করলে তো আমার চলবে না। গান গাইতে ইচ্ছে করে অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ। আমি গান-টান বিশেষ পছন্দ করি নে। আর গান যদি ভক্তিমূলক গান হয় তাও বুঝি। এ-সব গান তো চাপল্যের গান হে—কী বলো, তোমরা কী বলো?

রসিক পাল সকলের দিকে চেয়ে তাদের মতামত চাইতে তারাও সবাই একবাক্যে বললে— হ্যাঁ কর্তামশাই, আপনি তো হক্ কথাই বলেছেন—

—ওই দেখ, সবাই আমার কথায় সায় দিলে। আমি অন্যায্য কথা কখনও বলিনে, তা জানো?

তারপর বাঁ হাত দিয়ে আবার হিসেবের খাতাটা কাছে টেনে নিলেন। খাতকরা যে প্রাণের দায়ে তাঁর অন্যায্য কথাতেও সায় দিতে বাধ্য এ-কথা সদানন্দর পক্ষে মুখ ফুটে বলা অন্যায়। তাই আর সে কোনও কথা বললে না। চুপ করে রইল।

রসিক পাল মশাই খাতার হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে এতবার বললেন—যাও, তুমি এবার যাও—

সদানন্দ আর সেখানে বসলো না। তক্তপোশ থেকে উঠে সোজা গদিবাড়ির বাহিরে চলে গেল। রসিক পালের তখন আর ও-সব কথা ভাববার সময় ছিল না। মুহূর্তে হিসেবের গোলকধাঁধার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। রসিক পাল আর নরনারায়ণ চৌধুরীদের কাছে হিসেবটাই ছিল সব। হিসেবই ধর্ম, হিসেবই অর্থ, হিসেবই ছিল মোক্ষ কাম এবং সব কিছু। হিসেব করতে করতেই নরনারায়ণ চৌধুরী একদিন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। তখন আর উঠতে পারেন না তিনি।

মনে আছে তখনও পাল্কী করে কালীগঞ্জের বৌ আসতো দাদুর কাছে। সদানন্দ দেখতে পেলেই পাল্কীর কাছে দৌড়ে আসতো। বেশ ফরসা মোটাসোটা মানুষ, সাদা থান পরা। অমন ফরসা মেয়েমানুষ সদানন্দ আর জীবনে দেখেনি। নয়নতারাও ফরসা। সদানন্দর মা, হরনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রী, তিনিও ফরসা। কিন্তু কালীগঞ্জের বৌ শুধু ফরসা নয়, দুধে-আলতায় মেশানো ফরসা। গায়ের রং-এর দিকে একবার চাইলে কেবল চেয়েই দেখতে ইচ্ছে করে। পাল্কীটা উঠোনে থামতেই কালীগঞ্জের বৌ নামতো। মুখের ওপর একগলা ঘোমটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে বারান্দায় ঢুকতো। সঙ্গে থাকতো একজন ঝি। ঝি আগে আগে চলতো আর পেছনে কালীগঞ্জের বৌ। চলতে চলতে একেবারে সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় দাদুর ঘরে চলে যেত।

নরনারায়ণ তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে হিসেবের খাতা দেখছেন। আর মাথার কাছে সেই সিন্দুকটা। ওটা তিনি কাছছাড়া করতে পারতেন না।

—কে?

তারপর ঠাহর করে দেখেই যেন বিচলিত হয়ে উঠতেন।

—আমি নায়েব মশাই, আমি। কালীগঞ্জের বৌ।

—ও!

বলে যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়তেন। একটু নড়ে-চড়ে সরে শুতে চেষ্টা করতেন।

বলতেন—তা আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন বৌ-মণি! আমি তো বলেই ছিলুম আপনাকে আর আসতে হবে না—

কালীগঞ্জের বৌ বলতো—কিন্তু আর তো আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। নায়েবমশাই। আর কত দিন অপেক্ষা করবো? এই দশ বছর ধরে আপনি বলে আসছেন আমাকে আসতে হবে না, আমাকে আসতে হবে না। শেষকালে আমি মারা গেলে কি আমার

টাকাগুলো দেবেন? তখন সে-টাকা আমার কে খাবে? সে টাকায় কি আমার পিণ্ডি দেওয়া হবে?

—আঃ, বৌ মণি আপনি বড় রেগে যাচ্ছেন! আমি যখন বলেছি আপনার টাকা দেব তখন দেবই।

—কিন্তু কবে দেবেন তাই বলুন! আজই টাকা দিতে হবে আমাকে। এই আমি এখানে বসলুম। এখান থেকে আমি নড়ছি না আর যতক্ষণ না আমার দশ হাজার টাকা পচ্ছি—

বলে কালীগঞ্জের বৌ সেইখানে সেই মেঝের ওপরেই বসে পড়লো।

হঠাৎ দাদুর নজরে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে—ওরে, খোকা এখানে কেন? ওরে কে আছিস, খোকাকে এখান থেকে নিয়ে যা, ও দীনু—

দীননাথ কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে সদানন্দর হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যেত। সদানন্দ আর দেখতে পেত না কালীগঞ্জের বৌকে। কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারতো না দৃশ্যটা। থেকে থেকে কেবল কালীগঞ্জের বৌ-এর চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠতো। ঘুমের ঘোরেও মনে হতো ওই বুঝি কালীগঞ্জের বৌ এল!

একদিন দীনুকে জিজ্ঞেস করেছিল—ও বউটা কে দীনুমামা?

দীনুমামা বলেছিল—চুপ, ও-কথা জিজ্ঞেস করতে নেই—

তবু ছাড়েনি সদানন্দ। জিজ্ঞেস করেছিল—ও দাদুর কাছে টাকা চায় কেন? কীসের টাকা? দাদু ওকে টাকা দেয় না কেন? ও কে?

দীনু বলেছিল—ও-সব কথা তোমার জানতে-নেই। ও কালীগঞ্জের বৌ—

এর বেশী আর কিছু বলতো না দীনু। শুধু দীনু নয়, ওই কালীগঞ্জের বউ বাড়ীতে এলেই বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যেত। দাদু থেকে শুরু করে বাবা মা সবাই কেমন চুপ করে থাকতো। কারোর মুখে আর কোনও কথা বেরোত না তখন। ও যেন কালীগঞ্জের বৌ নয়, যম। যেন নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বাড়িতে সাক্ষাৎ যম এসেছে চৌধুরীবাড়ীর সর্বনাশ করতে। যেন সে চলে গেলেই সবাই বাঁচে।

কিন্তু রসিক পাল মশাই-এর এখানে অন্য রকম। রসিক পাল মশাই চৌবেড়িয়ার সুখী মানুষ। ধর্মভীরু। সবাইকে দয়া-দাক্ষিণ্য করেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। আড়তে যেমন বহু লোক থাকে খায় শোয়, তেমনি আবার সুদের একটা পয়সা পর্যন্ত ছাড়েন না। বলেন—না হে, ওটি পারবো না। দাতব্য করতে বলো করছি কিন্তু সুদের হিসেবে গরমিল করতে পারবো না—ওটা পাপ—

রসিক পাল মশাই সত্যিই রসিক পুরুষ।

হঠাৎ হঠাৎ তাঁর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। সেদিনও তেমনি। কাজ করতে করতে আবার হঠাৎ ডেকে উঠলেন—হরি—

পাশের আড়তঘর থেকে হরি মুহুরি দৌড়ে এল। বললে—আজ্ঞে ডাকছেন, আমাকে?

রসিক পাল বললেন—দেখ হরি, ওই যে লোকটা, ওর নামটা কী যেন...

—আজ্ঞে কার কথা বলছেন?

—ওই যে, কাল বিকেলবেলা আমার গদিবাড়িতে এসেছিল। রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান গাইছিল? আমি তাকে ডেকে সব জিজ্ঞেস করেছি। তা আমি ভাবছি কি জানো, আসলে ছেলেটা খারাপ নয়, বুঝলে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান গাইলে ওর কী দোষ বলো? ঘুমোলে তো আর কারো জ্ঞান থাকে না! ঘুম না মড়া।

হরি মুহুরি বললে—আজ্ঞে, তা তো বটেই—

—তবে যে তুমি বললে ছেলেটা ভালো নয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পীরিতের গান গায়,

মেয়েমানুষদের নাম ধরে ডাকে!

হরি মুহুরি বললে—আজ্ঞে যা ঘটেছে আমি তাই-ই আপনাকে বলেছি—

—না হে, আমি ভেবে দেখলাম ওর কিছু দোষ নেই। ওর জন্যে তোমাদের যদি ঘুমের ব্যাঘাত হয় তো ওর বিছানাটা না-হয় তোমরা অন্য ঘরে করে দাও—

হরি মুহুরি বললে—কিন্তু কর্তামশাই, তিনি তো চলে গেছেন—

—চলে গেছেন মানে?

—আজ্ঞে তিনি যে বললেন আপনি তাকে চলে যেতে বলেছেন!

—আমি? তাঁকে চলে যেতে বলেছি?

—আজ্ঞে তিনি তো তাই বললেন। বলে আড়তঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

রসিক পাল রেগে গেলেন। বললেন—তোমাদের কি কোনও আক্কেল বলে কিছু নেই? তিনি বললেন আর তোমরাও তাঁকে যেতে দিলে? কোথায় যাবেন তিনি? তোমরা জানো তাঁর কোনও যাবার জায়গা নেই? তাঁকে জিজ্ঞেস করেছ তিনি যাবেন কোথায়? তাঁর কোনও চুলোয় কি কেউ আছে যে সেখানে তিনি যাবেন?

হরি মুহুরি আর সেখানে দাঁড়াল না। সোজা একেবারে দৌড়তে লাগলো রাস্তার দিকে। সামনের বড় রাস্তাটা একেবারে গিয়ে পড়েছে গঙ্গার কাছে। তখনও সদানন্দ কোথায় যাবে ঠিক করতে পারেনি। গঞ্জের মুখে খানকয়েক দোকান। সেখানে গিয়েই ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়। সেই কোথায় নবাবগঞ্জ আর কোথায় সেই নৈহাটি আর কোথায় সেই সুলতানপুর। সব জায়গা থেকে ভাসতে ভাসতে একেবারে এই অজ গ্রামে চৌবেড়িয়াতে এসে হাজির হয়েছিল। এবার এখান থেকেও চলে যেতে হলো।

হঠাৎ পেছনে হরি মুহুরির গলা শোনা গেল।

—ও মশাই, ও মশাই—

ডাকতে ডাকতে সামনে এসে হাঁফাতে লাগলো বুড়ো মানুষটা।

বলল—আপনি তো খুব ভদ্রলোক মশাই, কর্তামশাইকে কিছু না বলে কয়ে চলে এলেন, এদিকে আমার হয়রানি, চলুন—

তখনও সদানন্দ ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারেনি।

হরি মুহুরি সদানন্দর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। ধরে টানতে লাগলো। বললে—আর বোঝবার কিছু নেই, চলুন কর্তামশাই আপনাকে ডাকছেন—

বলে টানতে টানতে একেবারে গদিবাড়িতে কর্তামশাই-এর সামনে হাজির করলো।

রসিক পাল বললেন—তুমি চলে যাচ্ছিলে যে?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে আপনি যে চলে যেতে বললেন—

—তুমি বলছো কী? আমি তোমাকে চলে যেতে বলেছি? এই যে এতগুলো লোক এখানে রয়েছে, এরাও তো শুনেছে, এরা কেউ বলুক তো আমি তোমাকে কখন চলে যেতে বললাম? বলুক এরা—

তা তার দরকার হলো না। সদানন্দ আবার রয়ে গেল চৌবেড়িয়াতে। তার জন্যে অন্য একটা ঘরের বন্দোবস্ত হলো। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হলো। গভর্নমেন্ট থেকে প্রাইমারি স্কুলের টাকাও ধার্য হলো শেষ পর্যন্ত। সবই করে দিয়েছিলেন সেই রসিক পাল মশাই।

হায়, কিন্তু কোথায় গেলেন সেই রসিক পাল, আর কোথায় রইল তাঁর সেই স্কুল। সে-সব চলে গেছে এখন। সেই নরনারায়ণ চৌধুরী, সেই হরনারায়ণ চৌধুরী, সেই নয়নতারা, সেই নিখিলেশ, সেই কালিগঞ্জের বৌ, সবাই কে কোথায় চলে গেল তা জানবার প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়ে গেছে আজ। সেই রসিক পালের দেওয়া ঘরখানাতেই তাঁর দিন কাটে এখন,

এই চৌবেড়িয়ার রসিক পালের এস্টেট থেকেই তাঁর ভরণ-পোষণটা এসে যায়। আর সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেটে যায় কী করে কাটে তারও খেয়াল থাকে না সদানন্দবাবুর। রসিক পালের এস্টেটের টাকায় জীবন চলছে তাঁর। শুধু তাঁর নয়, অনেকেরই জীবন চলে। এ যেন ধর্মশালার মত অনেকটা। এককালের মাস্টার মশাই এখানকার অনেকেরই মাস্টার মশাই, তাঁকে মানে সবাই। ভাত আসে অতিথিশালা থেকে, আর তিনি রুটিন বেঁধে জীবন-যাপন করেন। বেশ শান্তিতেই আছেন তিনি। এই জীবনটার কথাই তিনি লিখে যাবেন। অনেক পাতা লেখা হয়েও গেছে। সেদিন আবার তিনি খাতাটা নিয়ে লিখতে বসেছেন।

তিনি লিখতে লাগলেন—"আমি এখন ঘরেও নাই, ঘরের বাইরেও নাই। ঘরই আমার নিকট পর, আবার পরই আমার নিকট ঘর। আমার চাওয়ারও কিছু নাই, তাই পাওয়ার পর্বও আমার চুকিয়া গিয়াছে চিরকালের মত। আজ এত দুর হইতে বাল্যকালের দিনগুলির দিকে চাহিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার আর কিছু করিবারও নাই। যাহা কিছু ইহ-জীবনে করিয়াছি তাহা ভাল করিবার উদ্দেশ্যেই করিয়াছি। পরের ভালো ব্যতীত আর কিছু ভাবি নাই, তবে......"

হঠাৎ ঘরের দরজায় একটা টোকা পড়লো।

লিখতে লিখতে থেমে গেলেন সদানন্দবাবু। জিজ্ঞেস করলেন—কে?

বাইরে থেকে কেউ উত্তর দিলে না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কে?

তবু উত্তর নেই।

সদানন্দবাবু এবার উঠলেন। উঠে দরজাটা খুলতেই দেখলেন একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় তাঁরই বয়েসী। হাতে একটা পুঁটুলি।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কাকে চাই?

—আপনার নাম কি সদানন্দ চৌধুরী?

সদানন্দবাবু বললেন—হ্যাঁ—

—আপনার পিতার নাম কি হরনারায়ণ চৌধুরী?

সদানন্দবাবু আবার বললেন—হ্যাঁ—

—আপনার নিবাস কি নবাবগঞ্জে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলতেই ভদ্রলোক আর কোনও কথা না-বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বললে—আরে মশাই, আপনাকে আজ পনেরো বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর আপনি এখানে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছেন—

বলে তক্তপোশের ওপর বসে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলো।

সদানন্দবাবু তখনও বুঝতে পারছেন না কিছু। বললেন—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না আপনার কথা—

—আরে মশাই, আমার নাম হাজারি বেলিফ, আমি ফৌজদারি-আদালত থেকে আসছি। আপনার নামে হুলিয়া আছে। আপনি খুন করে এখানে লুকিয়ে আছেন, ভেবেছেন কেউ টের পাবে না—

সদানন্দবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আমি খুন করেছি? বলছেন কী আপনি? কাকে?

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলো। যেন বেশ একটা মজার বিষয়বস্তু পেয়েছে সদানন্দবাবুর কথার মধ্যে।

বললে—দাঁড়ান মশাই, আজ এত বছর ধরে আপনার পেছনে লেগে পড়ে আছি, আপনার জন্যে আমার চাকরি যায়-যায় অবস্থা—

সদানন্দবাবু ভদ্রলোকের হাল-চাল দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বললেন—দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন—

ভদ্রলোক বললে—কেন, আমি তো সোজা বাংলা ভাষাতেই কথা বলছি, আপনি নিজেও তো বাঙালী মশাই। আপনার নিবাস নদীয়া জেলার নবাবগঞ্জ গ্রামে, আপনার পিতামহের নাম নরনারায়ণ চৌধুরী, আপনার পিতার নাম হরনারায়ণ চৌধুরী, আপনারা নবাবগঞ্জের জমিদার, আমি কি কিছু জানি না বলতে চান?

সদানন্দবাবু তখনও অবাক হয়ে দেখছিলেন ভদ্রলোকের মুখখানা। মনে হলো কোথায় যেন আগে দেখেছিলেন লোকটাকে। ভদ্রলোক তখন একটা মোটা ঝাড়নের মত রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছে ঘষে ঘষে। অনেক দুর থেকে হেঁটে এসেছে লোকটা মনে হলো।

ভদ্রলোকের যেন হঠাৎ নজরে পড়লো। বললে—আরে, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না, আপনার তো এখন কোনও কাজকর্ম নেই, কেবল খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন—রসিক পালের পুষ্যিপুত্তুর হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছেন—

কথাগুলো সদানন্দবাবুর ভালো লাগলো না। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বললেন—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলুন তো—

—আমাকে কোথায় আর দেখবেন। কোর্টেই দেখেছেন।

—কোর্টে? কোর্টে তো আমি কখনও যাইনি।

—তাহলে কালেক্টরি অফিসে দেখেছেন। আমি কোর্টে যাই, কালেক্টরিতে যাই, দুনিয়ার সব জায়গাতেই যে আমায় যেতে হয় মশাই। দুনিয়াতে যে-যে কিছু সম্পত্তি করেছে তার কাছেই আমাকে যেতে হয়। আমার কাজই তো আসামীকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করা। যেমন আপনি! আপনি একজন আসামী বলেই আপনার কাছে এসেছি—

তারপর একটু থেমে বললে—এক গ্লাস জল দিতে পারেন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

সদানন্দবাবু বললেন—আপনি বসুন, আমি জল আনি—

রসিক পালের এস্টেটে বন্দোবস্ত সব পাকা। আগে আরো পাকা ছিল। তখন রসিক পাল বেঁচে ছিলেন। কাছারি-বাড়িতে পাকা খাতায় সকলের নাম লেখা থাকতো। কে আজ খাবে, কী তার নাম, ক'জন খাবে, কী কাজে তারা চৌবেড়িয়ায় এসেছে, হরি মুহুরির লোক সব কিছু খাতায় লিখে রাখতো। রসিক পালের টাকাও যেমন ছিল, তেমনি আবার সে-টাকার সদ্ব্যবহারও ছিল। যেদিন স্কুল উঠে গেল, সেদিন রসিক পাল বড় কষ্ট পেয়েছিলেন মনে মনে। কিন্তু উঠে যাবার কারণও ছিল। রসিক পাল সুদখোর মানুষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষটাকে যে ভালো ভাবে না চিনেছে সে রসিক পালকে বুঝতে ভুল করবে। রসিক পাল কথায় কথায় বলতেন—আমি কি টাকা নিয়ে দান-ছত্তোর করতে বসেছি হে যে সুদের টাকা ছেড়ে দেব?

কিন্তু হরি মুহুরি যখন এসে খরচের কথা বলতো তখন রেগে যেতেন। বলতেন—খরচ হবে তো খরচ হবে, আমি কি টাকা নিয়ে স্বগ্যে যাবো? আমি সঙ্গে করে টাকা নিয়েও আসিনি, সঙ্গে করে নিয়ে যাবোও না। যা খরচ হবে তা হবে। চালের দাম বাড়ছে বলে

কি আমি অতিথিশালা তুলে দেব ভেবেছ?

লোক বলতো—পাগল, পাল মশাই একজন আস্ত পাগল।

সদানন্দবাবু সব ভালো করে দেখতেন। এমন লোক আগে কখনও দেখেননি তিনি। দেখলে তাঁর জীবনটা অন্য রকম করে গড়ে উঠতো। হয়ত এমন করে এভাবে জীবনটা শেষ করতেও হতো না।

আত্মজীবনীটা লেখবার সময় ওই রসিক পাল সম্বন্ধে অনেকগুলো পাতা লিখতে হবে। যে-পৃথিবী ঘেন্নায় ছেড়ে এসে এখানে এমন করে আশ্রয় পেয়েছেন এখানকার সেই আশ্রয়দাতার কথা না লিখলে তাঁর লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্কুল যেদিন উঠে গেল সেদিন রসিক পাল বড় দুঃখ করে বলেছিলেন—মাস্টার, আমি পারলুম না—

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—আপনি যে পারবেন না পাল মশাই তা আমি জানতুম।

—কী করে জেনেছিলে?

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—কারণ কেউ-ই পারেনি। কেউ পারেনি বলেই আপনি পারলেন না।

—তার মানে? রসিক পাল অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিলেন মাস্টারের দিকে।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—মানে হুঁকোর খোল-নলচে খারাপ হয়ে গেলে কি তামাক ধরে, না ধোঁয়া বেরোয়!

রসিক পাল কথাগুলো তবু বুঝতে পারেননি সেদিন। রসিক পাল দেদার টাকাই উপায় করেছিলেন, কিন্তু টাকার ওপর আসক্তি তাঁর কমেনি। টাকার আসক্তি যার আছে তার দ্বারা টাকার সদ্ব্যয় কেমন করে হবে? তাই ছেলেরা স্কুলে আসতো না, সদানন্দবাবু বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ডেকে আনবার চেষ্টা করতেন।

শেষকালে সদানন্দবাবু একদিন হাল ছেড়ে দিলেন।

বললেন—এবার স্কুল তুলে দিন পাল মশাই, আর আমাকেও মুক্তি দিন—

—কেন? কী বলছো তুমি?

সদানন্দবাবু বললেন—আমি গোড়াতেই আপনাকে বলেছিলুম এসব কাণ্ড আরম্ভ না করতে, কিন্তু আপনি কিছুতেই শুনলেন না। এখন কেউ লেখাপড়া করবে না। এখন লেখাপড়া না করেই ছেলেরা হাজার টাকা মাইনের চাকরি চাইবে—

—ওটা তোমার রাগের কথা মাস্টার, তুমি আর একটু চেষ্টা করে দেখ না। মাসে মাসে আমি এতগুলো টাকা দিচ্ছি, গভর্মেন্টের ঘর থেকেও টাকা আনবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, দেখবে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে—

কিন্তু ঠিক শেষ পর্যন্ত হলো না। যত দিন যেতে লাগলো ততই যেন কারা সব গ্রামে আসতে লাগলো লুকিয়ে লুকিয়ে। অচেনা সব মুখ তাদের। রাতের অন্ধকারে তারা গঙ্গার ধারে গঞ্জের হোটেলে এসে ব্যাপারী সেজে রইল। তারপর একদিন কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ রসিক পাল মশাই-এর বসত বাড়ির ভেতর থেকে একসঙ্গে একটা আর্তনাদ উঠলো।

সে অনেক রাত তখন!

তারপর পুলিস এল, এনকোয়ারি হলো। কয়েকদিন ধরে চৌবেড়িয়াতে খুব হইচই হলো। লোকজনকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চললো। কয়েকজন গ্রেফতারও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুরই ফয়সালা হল না। যে মানুষ একদিন সামান্য অবস্থা থেকে নিজের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে দশজনের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁকে খতম করে দেশকে পাপ-মুক্ত

করা হলো।

তারপরও কিছুদিন স্কুল চলেছিল। কিন্তু পাশের গ্রামে আর একটা স্কুল হলো। একদিন তারা এখানকার সব ছেলে ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেল।

রসিক পাল মশাই-এর ছেলে ফকির পাল বললে—মাস্টার মশাই, এবার কী করবো তা হলে?

সদানন্দবাবু বললেন—আর কী করবে? এবার স্কুল বন্ধ করে দাও, আর আমাকেও এবার মুক্তি দাও—

ফকির বললে—কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন?

সদানন্দবাবু বললেন—আমি আর কোথায় যাবো বাবা, যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই চলে যাবো। তোমাদের ঘাড়ে কতদিন বসে বসে খাবো, বলো?

ফকির বললে—তা হবে না মাস্টার মশাই, আমি জানি আপনার কোথাও যাবার জায়গা নেই—

সদানন্দবাবু বললেন—ও-কথা বোল না ফকির ; মানুষের সমাজে জায়গা না হোক, বনে-জঙ্গলে জানোয়ারের সমাজে তো জায়গা হবেই—

তবু ফকির পাল ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রসিক পালের সব ক্রিয়াকর্মই ফকির চালিয়ে যাচ্ছে। বার-বাড়ির উল্টোদিকে অতিথিশালা ছিলই আগে থেকে। কখনও সেখানে কেউ থাকতো, আবার কখনও কেউ থাকতো না। তীর্থের গুরুমহারাজ কিম্বা পাণ্ডাঠাকুর কেউ এলে তাঁদের অতিথিশালার একটা মহলেই আশ্রয় দেওয়া হতো। তাঁদের জন্যে যেমন ব্যবস্থা ছিল, মাস্টার মশাই-এর জন্যেও ঠিক সেই তেমন ব্যবস্থাই হলো।

সদানন্দবাবুর সেই দিন থেকে আর কোথাও যেতে পারলেন না। এই চৌবেড়িয়াতেই রয়ে গেলেন।

হরি মুহুরি প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল।

বলেছিল—আচ্ছা মাস্টার মশাই, নয়নতারা কে?

সদানন্দবাবু একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। বললেন—কেন মুহুরি মশাই? নয়নতারার কথা তুমি জানলে কেমন করে?

—আপনি নিজেই বলেছেন।

বলে হরি মুহুরি হাসতে লাগলো।

সদানন্দবাবু বললেন—ও বুঝতে পেরেছি, আমার ওই এক বদ্ অভ্যেস, ঘুমোতে-ঘুমোতে কথা বলি। আজকে পাল মশাইও তাই বলছিলেন আমাকে। আমি নাকি গান গেয়েছিলুম—

—আমিই তো বলেছি কর্তামশাইকে। আমি তো আপনার পাশের ঘরে শুয়েছিলুম, তাই মাঝরাত্তিরে আপনার হরুঠাকুরের কবিগান শুনে চমকে উঠেছিলুম। ভাবলুম সেকালের গান একালে এত রাত্তিরে কে গায়! তা আপনি কবিগানের দলে ছিলেন নাকি?

সদানন্দবাবুর হাসি পেল। মুখে বললেন—না না, কবির দলে ছিলুম না। কবির দলে থাকতে যাবো কোন্ দুঃখে! গানটা শুনেছি তাই মনে আছে—

—আপনার দেশ কোথায় মাস্টার মশাই? আপনার বাড়ি?

এই চৌবেড়িয়াতে আসার পর থেকে এই প্রশ্ন তাঁকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে। আরো যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই হয়তো শুনতে হবে। রসিক পালও জিজ্ঞেস করতেন প্রথম প্রথম। অজ্ঞাতকুলশীল মানুষকে নিজের আস্তানায় আশ্রয় দিতে গেলে তার কুলুজি জানতে হয়। কোথায় নিবাস, পিতার নাম, সব কিছু।

রসিক পাল বলতেন—ঠিক আছে বাবা, তোমার কিছু বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি কোথাও তোমার একটা ঘা আছে—

—ঘা?

—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, এতদিন মহাজনী কারবার করছি আর লোক চিনতে পারবো না? তোমায় কিছু বলতে হবে না। কবিগানের কথাও বলতে হবে না, নয়নতারা কে তা-ও বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি—

বলেই একটা লম্বা হাঁচি হাঁচলেন। আর সদানন্দবাবু ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বেলা ন'টা।

হাঁচির পরেই মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠলো রসিক পালের। হাঁচির সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা মিলে গেছে এমন ঘটনায় রসিক পাল বরাবরই প্রসন্ন হয়ে উঠতেন।

সদানন্দবাবু চৌবেড়িয়াতে যাবার পর থেকেই রসিক পাল মশাই-এর মেজাজ যেন কেমন মিষ্টি হয়ে গেল। তিনি দু'হাতে দানছত্র করতে লাগলেন। ফকির পাল বাবার কাণ্ড দেখে একদিন বাপকে বললে—এখন দিনকাল বদলে গেছে, এখন কি আর এত খরচ বাড়ানো উচিত বাবা?

রসিক পাল আশেপাশের লোকজনদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—দেখ দেখ, ফকিরের কথা শুনলে তোমরা! আজকালকার ছেলে তো, কেবল কোট-প্যান্ট পরতেই শিখেছে। আরে, আমি আমার নিজের টাকা খরচ করবো তাতে তোর কী? তুই কথা বলবার কে? আমার রোজগার করা টাকা আমি খরচ করবো তাতে তোর অত মাথাব্যথা কেন শুনি?

তা এদিকে তখন ঘরের মধ্যে বসে হাজারি বেলিফ্ অপেক্ষা করছিল। আসামী কি পালালো নাকি? জল আনতে গেল তো গেলই। এতক্ষণ লাগে এক গেলাস জল আনতে! ভদ্রলোক হাতের পোঁটলাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কে যেন যাচ্ছিল উঠোন পেরিয়ে।

ডাকলে—ও গো, কে তুমি? একবার ইদিকে এসো তো ভাই—

অতিথিশালার লোক। ডাক শুনে কাছে এল। ভদ্রলোক বললে—তুমি এ বাড়ির লোক তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী নাম তোমার?

—গণেশ।

—গণেশ! বেশ নাম। ভাই গণেশ, তুমি বলতে পারো এই ঘরের সদানন্দবাবু কোথায় গেলেন?

—আমাদের মাস্টার মশাই-এর কথা বলছেন?

ভদ্রলোক বললে—সদানন্দবাবু বুঝি তোমাদের মাস্টার মশাই?

—আজ্ঞে, এখন আর মাস্টারি করেন না, আগে করতেন। তাঁকে দরকার?

—হ্যাঁ ভাই, এক গ্লাস জল চেয়েছিলুম তাঁর কাছে। অনেক দূর থেকে আসছি কিনা আমি। বড্ড জল-তেষ্টা পেয়েছিল—

গণেশ বললে—আপনি মাস্টার মশাই-এর কাছে জল চেয়েছিলেন? তবেই হয়েছে! আজকে তাহলে আর জল পেয়েছেন!

—সে কী? কেন? তিনি যে আমাকে বসতে বলে চলে গেলেন?

গণেশ বললে—তাঁকে নিজেকেই কে জল দেয় তার ঠিক নেই, তিনি আনবেন জল! তিনি নিজের হাতে কখনও জল গড়িয়ে খেয়েছেন? তাঁর নিজের জল-তেষ্টা পেয়েছে কি না তাই-ই বলে তিনি বুঝতে পারেন না কখনও।

কথাগুলো শুনে হাজারির বেশ মজা লাগলো। বললে—তাহলে মাস্টারি করতেন কী করে এখানে?

গণেশ বললে—ওই জন্যেই তো কর্তামশাই-এর ইস্কুলটা উঠে গেল।

—পড়াতে পারতেন না বুঝি?

—পড়াতে পারবেন না কেন? বড্ড ভালো মানুষ যে, তাই কেউ তাঁকে মানুষ বলেই মানতো না। একটু ভয়-ভক্তি না করলে কি ইস্কুল চালানো চলে? অত ভালো মানুষ বলেই তো বুড়ো কর্তামশাই ওঁকে অত ভালবাসতেন।

ভদ্রলোক বললে—তাহলে তো দেখছি মুশকিলে পড়া গেল—

গণেশ বললে—মুশকিলে আর কেন পড়বেন, আমি জল এনে দিচ্ছি—

বলে গণেশ ভেতর দিকে কোথায় চলে গেল। দুপুর বেলা। সাধারণত এমন সময় সকলেরই একটু বিশ্রাম। সকাল থেকে কাজ চলতে চলতে দুপুর বেলাতে এসেই কাজের চাকা যা একটু থামে। তারপর বিকেল বেলা সেই যে শুরু হবে, তার শেষ হবে অনেক রাত্রে পৌঁছিয়ে। নবাবগঞ্জের বাড়িতেও ঠিক এমনি হতো। অথচ সংসার বলতে তো ওই তিনটে প্রাণী। নরনারায়ণ চৌধুরী, বাবা, মা আর ওই সদানন্দ। অনেকে নামটা ছোট করে দিয়ে ডাকতো—সদা।

চৌধুরী বাড়িতে নতুন বউ এসেছে। পালকী আসছে রেলবাজার থেকে। ট্রেন থেকে বর আর বউকে নামিয়ে তোলা হয়েছে পালকীতে। ছ' ক্রোশ রাস্তা উঁচু-নিচু এবড়ো খেবড়ো মেঠো পথ।

চৌধুরী মশাই-এর শ্যালক ছিল সঙ্গে। সে-ই বর-বৌকে সঙ্গে করে আনছিল। তার সঙ্গে আসছিল নরনারায়ণ চৌধুরীর গোমস্তা, একেবারে সামনের পালকীতে। আর একেবারে সকলের সামনে-সামনে দীনু—

গোমস্তা আগে আগে চলেছে। কৈলাশ গোমস্তাকে লোকে দূর থেকে নমস্কার করছে। এক-একটা গ্রামে ঢোকে তারা আর গাঁয়ের বৌ-ঝি-ছেলে-বুড়ো সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বলে—গোমস্তা মশাই, বউরাণীকে একবার দেখবো—

কৈলাস গোমস্তা বলে—আরে না না, এখন না, কাল চৌধুরী-বাড়িতে বউরাণীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেখাবো তোদের—

—ওমা, তা এখন কি সাজগোজ নেই?

—তা থাকবে না কেন? এখন সেই কেষ্টনগর থেকে রেলে চড়ে বৌ ঘেমে-নেয়ে আসছে, এখন কি কেউ দ্যাখে রে? কালকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখবো বউমাকে তখন দেখিস—

এমনি সারা রাস্তা। সকলকে ঠাণ্ডা করতে করতেই কৈলাস গোমস্তা অস্থির।

পেছনের পালকীতে প্রকাশমামা মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো—একটু পা চালিয়ে—পা চালিয়ে দীনু—

যেন প্রকাশ মামারই বিয়ে। তার সাজগোজের বাহার বরকে পর্যন্ত হার মানিয়েছে।বিয়ের উৎসবের ক'দিন ধরে তার খাটুনিরও যেমন শেষ নেই, আবার উৎসাহেরও তেমনি কামাই নেই।

হইচই করতে করতে বর-বৌ নবাবগঞ্জের চৌধুরীবাড়ির উঠোনে এসে ঢুকলো। গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোকজন এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

কৈলাস গোমস্তা মার মার করে উঠলো—সরো গো, সরো সবাই, সরো। বৌ-এর দম আটকে আসবে সরো, ভেতরে হাওয়া ঢুকতে দাও—

প্রকাশ মামাও কম যায় না। কোঁচানো ধুতি আর ঢিলে পাঞ্জাবি নিয়ে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাচ্ছে। সে-ও বলে উঠলো—যাও, যাও, যাও, ওদিকে যাও ভাই সব, এদিকে ভিড় নয়, এদিকে ভিড় নয়—

গৌরী পিসীর আর তর সইলো না। সে কারো মানা শুনবে না। একেবারে দৌড়ে এসে পালকীর দরজার সামনে নিচু হয়ে বৌ-এর ঘোমটা তুলে মুখখানা দেখলে।

নয়নতারাও চমকে গেছে। এ আবার কে? শাশুড়ী নাকি?

বউ দেখে গৌরী পিসীর খুশীর আর শেষ নেই। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ওলো, জোরে জোরে উলু দে, জোরে জোরে উলু দে তোরা—

সত্যিই নয়নতারার রূপের বাহার দেখে গাঁ-সুদ্ধ লোক অবাক। এমন রূপও হয় নাকি! দোতলার ঘরে নরনারায়ণ চৌধুরী তখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর প্রথম নাত-বৌ বাড়িতে এসেছে। তাঁকেই প্রথমে প্রণাম করতে হবে।

—চলো বৌমা, তোমার কর্তাবাবুকে আগে পেন্নাম করবে চলো—

নরনারায়ণ চৌধুরীর বহুদিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে তখন। অনেক অভিশাপ তিনি কুড়িয়েছেন! এবার যাবার সময় নাত-বৌ-এর মুখ দেখতে পেলেন। এবার তাঁর বংশের ধারা আবহমান কাল ধরে চলুক। বংশ-পরম্পরায় নবাবগঞ্জের চৌধুরী বংশের গৌরব আরো বৃদ্ধি হোক। অনাগত কালের মানুষ বলুক—এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরনারায়ণ চৌধুরী মানুষের সমাজে সত্যিই ছিলেন এক নরনারায়ণ। তিনি ছিলেন দানবীর, কর্মবীর, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, মহাপুরুষ! এই তাঁর পৌত্র, এই সদানন্দ চৌধুরীরই একদিন সন্তান হবে, সেই সন্তানেরও আবার একদিন সন্তান হবে। এমনি করে সন্তানের পর সন্তানের জন্ম হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পুরুষানুক্রমে তাদের বংশাবলীর মধ্যে দিয়েই তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। এ-বয়সে এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় এই-ই তাঁর একমাত্র কামনা, এই-ই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা—এই-ই তাঁর একমাত্র সুখ!

হঠাৎ কৈলাস গোমস্তা এসে খবর দিলে—কর্তাবাবু, কালীগঞ্জের বৌ এসেছে—

—কে?

—আজ্ঞে কালীগঞ্জের বৌ!

—তা কালীগঞ্জের বৌ হঠাৎ আজকে এল কেন? তাকে কি তোমরা নেমন্তন্ন করেছিলে?

—আজ্ঞে, সে কী কথা! তাকে নেমন্তন্ন করতে যাবো কেন? আপনি তো তাকে নেমন্তন্ন করতে বারণ করেছিলেন?

—তাহলে খবর পেলে কী করে যে আজকে আমার নাতির বিয়ে?

—তা জানি নে, তবে নতুন বউয়ের মুখ দেখবার জন্যে একখানা শাড়ি আর এক হাঁড়ি মিষ্টিও এনেছে। নতুন বউ-এর মুখ দেখতে চাইছে—

সমস্ত বাড়িময় তখন উৎসবের আবহাওয়া। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের লুচি ভাজার গন্ধে বাড়ি তখন একেবারে ম-ম করছে। আত্মীয়-কুটুম এসে গেছে দূর দূর থেকে। এমন সময় কি না কালীগঞ্জের বউকে এ-বাড়িতে আসতে হয়!

নরনারায়ণ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন—বংশী ঢালী কোথায়?

—ডেকে দেব?

—ডেকে দাও, আর দেখো যেন আমার ঘরের কাছে এখন কেউ না আসে, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে। যাও—

তা বংশী ঢালী এল। কর্তাবাবুর বাড়ির বিয়েতে সে পরনের কাপড়খানা রঙীন করে ছাপিয়েছে। মাথার চুলগুলো তেল-চকচকে করে আঁচড়ে নিয়ে বাহার করেছে।

সামনে এসে দাঁড়াতেই কর্তাবাবু কৈলাস গোমস্তার দিকে চেয়ে বললেন—কালীগঞ্জের বৌ যা-কিছু এনেছে, সন্দেশ শাড়ি সব নেবে, খুব খাতির করে নেবে। বুঝলে?

—বৌ দেখাবো?

—হ্যাঁ। আর দেখ, খাতিরের যেন কমতি না হয়, যেমন করে বাড়ির আত্মীয়-কুটুমদের খাতির করা নিয়ম, কালীগঞ্জের বৌকেও ঠিক তেমনি করে খাতির-যত্ন করবে। যেন কোথাও কোনও ত্রুটি না থাকে। বুঝলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি এখন যাও, গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো, দেখবে যেন এদিকে কেউ না আসে—

কৈলাস গোমস্তা চলে যেতেই কর্তাবাবু চাইলেন বংশী ঢালীর দিকে। বললেন—বংশী, আগে তুই তো আমার ইজ্জত অনেকবার বাঁচিয়েছিস্। আর একবার বাঁচাতে পারবি?

—হ্যাঁ হুঁজুর, আপনি যখন যা বলবেন তাই করবো। বলুন, কার ঘাড় থেকে কটা মাথা নিতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—তাহলে ঘরে ঢোকবার দরজাটা বন্ধ করে দে, তোকে আজ একটা কাজের ভার দেব—

বংশী ঢালী দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হুড়কো লাগিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে নবাবগঞ্জের চৌধুরী বংশের ঝাড়-লণ্ঠনের সব বাতি যেন এক ফুৎকারে নিবে গিয়ে দিকবিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। কর্তা নরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পৌত্র, ছেলে হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সদানন্দ চৌধুরী তখন উৎসব-অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে একেবারে দূরে সরে এসেছে। একদিন আগে কেষ্টনগরের একটা বাড়িতে একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের সম্প্রদান হয়েছে, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতরা ভুরিভোজে পরিতৃপ্তির উদ্‌গার তুলতে তুলতে যে যার বাড়িতে চলে গেছে। বাসরঘরের চার-দেয়ালের মধ্যে সে নববধূর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে। ভেবেছে এ কাকে সে বধূ করে নিয়ে চলেছে তার বাড়িতে! এ-ও কি সংসারের আর পাঁচজন মানুষের মত যান্ত্রিক মানসিকতার একটা অতি সাধারণ প্রতীক! এ-ও কি কলের পুতুলের মত সুতো টানলে হাত-পা নাথা নাড়াবে, কল টিপলে খাবে ঘুমোবে আর যান্ত্রিক নিয়মে কেবল সন্তানের জন্ম দিয়ে চৌধুরী-বংশের লোকসংখা বাড়িয়ে যাবে!

সেদিন কালরাত্রি। গ্রামের লোক সবাই বৌ দেখে দলে দলে যে যার বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। সদানন্দ অন্ধকার বার-বাড়ির উঠানের পাশ দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যচ্ছিল। জায়গাটা বড় নিরিবিলি নির্জন। হঠাৎ মনে হলো সামনের চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে চোর-কুঠুরির ভেতর থেকে কে যেন হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে উঠলো—আঃ—

একটা মেয়েলী গলার চাপা আর্তনাদ। কিন্তু আর্তনাদটা একবার গলা ছিঁড়ে বার হবার পরেই যেন আবার হঠাৎ মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো কে যেন কার গলা টিপে ধরেছে।

সদানন্দ খানিকক্ষণ হতবাক্ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চোর-কুঠুরিটা থেকে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসতেই তার যেন কেমন সন্দেহ হলো। সদানন্দ চোর-কুঠুরির দিকে দৌড়ে যেতেই দেখলে সামনে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন বেরিয়ে আসছে।

সদানন্দ চিনতে পারলে না লোকটাকে। বললে—কে? কে তুই? কে? কে কেঁদে উঠলো চোর-কুঠুরির ভেতরে?

প্রথমে কেউই উত্তর দিলে না। চারদিকে অন্ধকার। ওদিকে বিয়েবাড়ির আলোয় পশ্চিম দিকটা ঝলমল করছে। পূর্ব-উত্তর কোণাকুণি দিকটাতেই অন্ধকার বেশি। চণ্ডীমণ্ডপটা পূবদিক-ঘেঁষা। নরনারায়ণ চৌধুরী যখন নবাবগঞ্জে জমিদারি পত্তন করেছিলেন তখন হাতে অনেক কাঁচা টাকা আসতে লাগলো। কিন্তু টাকা এলে কী হবে, মানুষটার ব্যবহার সেই আগেকার মতই রয়ে গেল। এককালে যখন কালীগঞ্জে গোমস্তার কাজ করেছেন, তখনও যেমন, আবার জমিদারি পত্তনের পরও তেমনি। এই নবাবগঞ্জ একদিন কালীগঞ্জের পত্তনির মধ্যেই ছিলো। তখন নরনারায়ণ চৌধুরী এইখানে বসে একটা একতলা বাড়ির বৈঠকখানার মধ্যে গোমস্তাগিরি করতেন। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে নবাবগঞ্জের সেই একতলা বাড়িটার সামনে একটা বিরাট দু'মহলা দোতলা বাড়ি উঠলো। তখন আগেকার সেই একতলা বাড়িটা হয়ে গেল চণ্ডীমণ্ডপ। আর তার আধখানায় কাজ চলতে লাগলো চণ্ডীমণ্ডপের। আর বাকিখানায় হলো চোর-কুঠুরি। সে সিকিখানা প্রায়ই ব্যবহার হতো না। বছরের বেশির ভাগ সময় তার দরজায় তালা-চাবি দেওয়া পড়ে থাকতো। একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাব গাছ সে ঘরখানাকে দিনের বেলায় অন্ধকার করে রাখতো। আর রাত্তিরে তার চেহারা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেত।

লোকটা তখন সামনে এসে পড়েছে একবারে।

সদানন্দ মুখখানা একবার লোকটার মুখের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

বললে—কে? কে রে তুই? কথা বলছিস না কেন?

—আজ্ঞে আমি!

এবার গলার আওয়াজে চিনতে পারলে সদানন্দ। বংশী ঢালী।

—বংশী ঢালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ খোকাবাবু।

—তা তুই এই অন্ধকারে এখানে একলা কী করছিস? খেয়েছিস?

বংশী ঢালী বললে—কাঁচা-ফলার খেইচি, একটু পরে পাকা-ফলার খাবো।

তা বটে। কর্তাবাবুর বাড়ির কাজ, সবাই তিন-চারদিন ধরে চারবার পেটভরে খাবে। এটাই রেওয়াজ। জমি-জমার দখল নিয়ে যখন কোথাও কোনও গণ্ডগোল বাধে তখন বংশী ঢালীরই ডিউটি পড়ে। বদমাইশ প্রজাকে টিট করতেও বংশী ঢালীর ডিউটি পড়ে।

—তা পাকা-ফলারের পাতা তো পড়েছে, খেতে যা—

সে কথার উত্তর না দিয়ে বংশী ঢালী অন্য কথায় চলে গেল। এক গাল হাসি হেসে বলল—আপনার বৌ খুব সোন্দর হয়েছে খোকাবাবু, একেবারে মা-দুর্গার মত—

কিন্তু বংশী ঢালীর হাসিতে সদানন্দর মন ভুললো না। বললে—তা হবে, তুই আগে খেয়ে নিগে যা—

বংশী ঢালী চলে গেল বটে, কিন্তু সদানন্দর মনের সন্দেহ গেল না। বংশী ঢালী চলে যেতেই সদানন্দ চোর-কুঠুরিটার দিকে আরো এগিয়ে গেল। বাইরে থেকে চোর-কুঠুরির দরজায় তালা ঝুলছে তখনও। তাহলে আর্তনাদটা কোন্ দিক থেকে এলো? কে চেঁচিয়ে

কেঁদে উঠলো?

মানুষের ইতিহাসে এই রকম করে কতবার কত বংশী ঢালী নিঃশব্দে কত জমিদারের চোর-কুঠুরিতে ঢুকেছে, আর নিষ্কলুষ মুখোশ নিয়ে কতবার চোর-কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে এসেছে তা কোনও ভাষার ইতিহাসে লেখা থাকতে নেই। কিন্তু হিসেবের কড়ি বাঘে খেয়েছে এমন কথা যেমন কোথাও লেখা থাকে না, আসল আসামী ধরা পড়েছে এমন নজিরও কোনও আদালতের নথিপত্রে নেই। কারণ আসল আসামীরা ধরা পড়ে না। নকল আসামীদের সামনে এগিয়ে দিয়ে আসল আসামীরা বরাবরই আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাদের কোনও শাস্তি হতে নেই। তারা রায়-বাহাদুর হয়, রায়-সাহেব হয়, তারা পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ হয়, তারা শ্বেত-পাথরের মূর্তি হয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে শহরের শোভা বাড়ায়। কবে একদিন হয়ত নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীও এমনি শোভা হয়ে উঠতো, রায়-বাহাদুর হতো, রায়-সাহেব হতো, পদ্মভূষণ হতো, পদ্মশ্রী হতো। এ-যুগে জন্মালে তা হবার চেষ্টাও হয়ত করতো। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতার কোন্ এক দুর্লঙ্ঘ্য আইনে আসামী একদিন হঠাৎ ধরা পড়লো। আর ধরা পড়লো বলেই রাত জেগে জেগে তার বংশধরকে নিয়ে এই উপন্যাস লেখবার প্রয়োজন আজকে আমার পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠলো।

কিন্তু সন্দেহটা দৃঢ় হলো আরো অনেক পরে। উত্তর-পূব দিক দিয়ে ঘুরে আবার পূবদিকে ভেতর-বাড়িতে আসবার কথা। কাল এই সারা বাড়ি অতিথি-অভ্যাগতে ভরে উঠবে। গতকাল থেকেই ভিড় শুরু হয়েছে। মাঝখানে একটা দিন শুধু কাল-রাত্রি। তারপরেই ফুলশয্যা।

গৌরী পিসী হঠাৎ সদানন্দকে দেখতে পেয়েছে। বললে—হ্যাঁ রে, তুই এখানে, আর ওদিকে যে সবাই তোকে খুঁজছে বাবা! রাত-বিরেতে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? গাব গাছের তলায় কী করছিলি?

ওদিকে দোতলায় ছেলে হরনারায়ণ কর্তাবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলে—বৌমা কেমন দেখলেন?

কর্তাবাবু বললেন—ওসব কথা এখন থাক, তোমার নতুন বেয়াই-বেয়ানকে আনতে যাবে কে?

ছেলে বললে—প্রকাশকে বলেছি।

—প্রকাশ? প্রকাশ কে?

—আমার সম্বন্ধী।

—তোমার সম্বন্ধী! তোমার সম্বন্ধী আবার কবে হলো? তোমার তো সম্বন্ধী ছিল না, বৌমা তো বেয়াই-এর একই সন্তান!

হরনারায়ণ বললে—আজ্ঞে, আমার আপন সম্বন্ধী নয়, আপনার বৌমার মামার ছেলে। আপনার বৌমার মামাতো ভাই—

—ও—

যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কর্তাবাবু। ছেলের সম্বন্ধীর কথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন। তা চমকে ওঠবারই কথা। এত ভেবে-চিন্তে তিনি ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন, মাত্র একটা উদ্দেশ্য নিয়েই। উদ্দেশ্যটা হলো বাড়িতে শুধু যেন বউই না আসে। তার সঙ্গে যেন অর্দ্ধেক রাজত্বও আসে। না, অর্ধেক রাজত্ব কথাটা ভুল। কর্তাবাবু যখন ছেলের বিয়ে

দিয়েছিলেন, তখন এটা জেনেশুনেই দিয়েছিলেন যে ছেলে একদিন শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

—চক্রবর্তী মশাই কখন আসছেন?

—কাল সকালে আসবার কথা। রজব্ আলীকে বলেছি রেল-বাজারে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতে—

ভাগলপুরে বউমার বাপের যে সম্পত্তি আছে তা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পাঁচ-ছ' লাখ টাকার মতন। তার ওপর কর্তাবাবুর নবাবগঞ্জের নিজের সম্পত্তি। একুনে সব মিলিয়ে আরো কয়েক লাখ। তিনি যখন এ সংসার থেকে বিদায় নেবেন তখন এই ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে তাঁর বংশধারা আর তাঁর বংশের ঐশ্বর্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ অক্ষয় অব্যয় অম্লান হয়ে বিরাজ করবে। তারপর যখন তাঁর ছেলেও আর থাকবে না, তখন নাতি থাকবে। সেই নাতিই নরনারায়ণ চৌধুরীর বংশের জয়ধ্বজা চিরকাল আকাশে উঁচু করে তুলে রাখবে।

তা দোতলার একটা ঘরের মধ্যে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকলে কী হবে, তাঁর নজর কিন্তু সব দিকে। একদিন এক জমিদার বাড়িতে সামান্য গোমস্তার কাজ করে প্রথম জীবন কাটিয়েছেন। তখন থেকেই বুঝেছেন কাকে বলে পয়সা। পয়সার যে কী মূল্য তা তখন থেকেই চিনতে শিখেছিলেন তিনি। তখনই বুঝেছিলেন যে প্রচুর পয়সার মালিক না হলে আর বেঁচে থেকে কোনও সুখ নেই। তাই তখন থেকেই পয়সার সাধনাতেই মন দিলেন তিনি। এমন করে মন দিলেন যে লোকে বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ সাধক বটে। শেষে একদিন যখন সিদ্ধিলাভ করলেন তখনই পেছনে লাগলো শনি। অত পয়সা করেও তাঁর শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। যখন পয়সার পাহাড়ের ওপর বসে আছেন, যখন আত্মীয়-স্বজন, পাইক-লাঠিয়াল-বরকন্দাজ নিয়ে নবাবগঞ্জের সকলের মাথায় উঠেছেন তখনও মনে শান্তি নেই। হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই, একদিন দীনু কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মুখের চেহারা দেখেই কর্তাবাবু বুঝতে পারেন কী হয়েছে।

তবু জিজ্ঞেস করেন—কী রে, কী হয়েছে?

দীনু মুখ নিচু করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে—আজ্ঞে আবার কালীগঞ্জের বৌ এসেছে—

রেগে যেতেন কর্তাবাবু। গলা চড়িয়ে বলতেন—তা বলা-নেই কওয়া-নেই ওমনি হুট করে এলেই হলো? হঠাৎ আবার এলো কেন? আমি টাকা কোথায় পাবো? আমার কি টাকার গাছ আছে? আমি টাকার চাষ করি? আমি এখন কী করবো? তুই গিয়ে কালীগঞ্জের বউকে বল এখন দেখা হবে না—আমার শরীর ভালো নেই—

দীনু বলতো—আজ্ঞে আমি যে বলেছি আপনি ভালো আছেন!

—কেন বললি ভালো আছি? আমি ভালো আছি না খারাপ আছি তুই জানলি কী করে? তুই কি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলি?

বুড়ো মানুষ দীনু লোকটা। ফাই-ফরমাশ খাটাই তার কাজ। সে এত মতলব-ধান্দা ফন্দি-ফিকির কিছু বোঝে না।

বললে—না আজ্ঞে, আপনাকে তা জিজ্ঞেস করিনি—

—তাহলে! তাহলে কী করে বুঝলি যে আমার শরীর ভালো আছে?

—আজ্ঞে আমার ভুল হয়েছিল। আমি সেই কথা গিয়ে বলে আসি যে আমার ভুল হয়েছিল। কর্তাবাবুর শরীর ভালো নেই। তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না—

—হ্যাঁ, তাই বলে আয়।

দীনু চলে যাচ্ছিল। কর্তাবাবুর আবার কী মনে হলো। ডাকলেন। বললেন—দীনু, শোন,

ওকথা বলতে হবে না, তুই বরং তাকে ডেকেই নিয়ে আয়—

এমনি কতবার। কোথায় সেই ইছামতী পেরিয়ে কালীগঞ্জ। আর কোথায় এই নবাবগঞ্জ। পাকা প্রায় পঁচিশ ক্রোশ রাস্তা। তা মধ্যে আবার ইছামতী। কথায় বলে একা নদী বিশ ক্রোশ। এই এতখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে আসতো সেই কালীগঞ্জের বৌ। আর এসেই সেই টাকা! টাকার তাগাদা। যেন কর্তাবাবুর কানে স্মরণ করিয়ে দিতে আসতো যে তুমি জমিদারই হও আর যে-ই হও আসলে তুমি আমার অনুগত কর্মচারী। আমার ভৃত্য।

আর সদা এসে ঠিক তখনই দাঁড়াতো সেখানে। তখন খুব ছোট সে। পাশের সিন্দুকটা খুলতেই সে দেখতে পেতো ভেতরে কত সোনা, কত মোহর, কত টাকা, কত নোট। দেখতে দেখতে সেই ছোটবেলাতেই সদানন্দর চোখ দুটো পাথর হয়ে যেতো। যত লোক আসে দাদুর কাছে, তাদের সকলের যথাসর্বস্ব এনে ওইখানে ঢেলে দিত। সে সব জমা হয়ে ক্রমে ক্রমে দাদুর সিন্দুকের ভেতরে পাহাড় হয়ে যেত। আর দাদু তত বলতো—আমার টাকা কোথায়? টাকা কোথায় আমার? আমার কি টাকার গাছ আছে? আমি কি টাকার চাষ করি?

কালীগঞ্জের বৌ বলতো—কিন্তু আমার যে পাওনা টাকা নারায়ণ!

—তা পাওনা টাকা বললেই কি হুট বলতে টাকা দিতে হবে?

—কিন্তু তুমি যে আমাকে আসতে বলেছিলে আজ?

—তখন আসতে বলেছিলুম, ভেবেছিলুম টাকা থাকবে আমার কাছে। কিন্তু এখন দেখছি টাকা নেই আমার।

হঠাৎ পাশ থেকে সদানন্দ বলে উঠলো—না দাদু, তোমার টাকা আছে, আমি দেখেছি তোমার সিন্দুকের ভেতর যে অনেক টাকা আছে—

কর্তাবাবু হঠাৎ পাশের দিকে নজর দিয়ে দেখেন নাতিটা কোন্ ফাঁকে সেখানে এসে বসে বসে এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিল।

বললেন—ওরে, ও দীনু, কোথায় গেলি তুই, ও দীনু, একে এখানে আসতে দিলি কেন? ও দীনু,—

দীনু তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে সদাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু সদা যেতে চাইত না, দীনুর টানাটানিতে ঘর থেকে যেতে যেতেও চীৎকার করে বলতো—তুমি মিথ্যে কথা বলছো দাদু, তুমি মিথ্যেবাদী—তুমি মিথ্যেবাদী—তোমার অনেক টাকা আছে—

তারপর একসময় কালীগঞ্জের বৌ আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলে যেত।

সদানন্দ পালকীটার পেছন পেছন ছুটতো—ও কালীগঞ্জের বৌ, কালীগঞ্জের বৌ, আমার দাদু মিথ্যেবাদী, দাদু তোমায় মিথ্যে কথা বলেছে, দাদুর অনেক টাকা আছে, সিন্দুকের ভেতর দাদুর অনেক টাকা আছে—আমি দেখেছি—

কিন্তু ছুটতে ছুটতে বেশি দূর এগোতে পারতো না। দীনু এসে সদাকে ধরে নিয়ে অন্দরমহলে চলে যেত। আর পালকীটা রাস্তায় নেমে খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে চলতো। তারপর খেয়া পেরিয়ে পঁচিশ ক্রোশ দূরে একেবারে সোজা কালীগঞ্জ—

এসব অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর মাইনর ইস্কুল থেকে পাশ করে সদানন্দ কেষ্টগঞ্জের রেলবাজারের ইস্কুলে পড়তে গেছে। সে ইস্কুল থেকে পাসও করেছে। তারপর কলেজ। কলেজ থেকে বি-এ পাসও করেছে। তারপরে তার বিয়ে। এ সেই বিয়ের পরের

দিনেরই কাণ্ড।

গৌরী পিসী বললে—সবাই ওদিকে আনন্দ করছে, বাড়িতে নতুন বৌ এসেছে, আর তুই কি না এখানে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—আয় আয় এদিকে আয়—

বলে সদানন্দকে টানতে টানতে ভেতর-বাড়ির উঠোনের দিকে নিয়ে চললো। তখন সত্যিই সেখানে যজ্ঞি-বাড়ির ধুম চলেছে। আলোয় আলো হয়ে গেছে জায়গাটা। পাকা-ফলার খেতে বসেছে এ-গ্রাম সে-গ্রামের মুনিষরা। তাদেরই তো আসল আনন্দ। কর্তাবাবুর একমাত্র নাতির বিয়ে তো তাদেরই উৎসব। তারা ক'দিন ধরেই খাবে। তাদের নিজেদের বাড়িতে রান্না-খাওয়ার পাট আজ ক'দিন ধরে বন্ধ থাকবে। সকাল বেলা খাবে আবার রাত্তিরেও খাবে। প্রকাশমামা নিজে দই-এর হাঁড়ি নিয়ে সবাইকে দই দিচ্ছে। কাঁধে তোয়ালে কোমরে গামছা। মুখে খই ফুটছে। বলছে—খা খা খা, পেটভরে খা সবাই—

হঠাৎ সদানন্দর দিকে নজর পড়তেই বলে উঠলো—আরে, এ কী হয়েছে? রক্ত কীসের? রক্ত কেন তোর গেঞ্জিতে?

—রক্ত!

আরো সবাই চেয়ে দেখলে সেদিকে। বললে—সত্যিই তো, রক্ত এল কোত্থেকে? এত রক্ত?

সদানন্দও চেয়ে দেখলে তার গেঞ্জিতে সত্যিই রক্ত লেগে রয়েছে। এত রক্ত এল কোত্থেকে? তার হাতেও রক্ত।

গৌরী পিসীও এতক্ষণে নজর করে দেখলে—এ কী রে, কীসের রক্ত?

হঠাৎ যেন চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠলো—রক্ত! এ কীসের রক্ত! আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ সব জায়গা থেকে একসঙ্গে ঝড়ের মত প্রশ্ন আসতে লাগলো—রক্ত, রক্ত! দোতলা থেকে নরনারায়ণ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন—রক্ত! রক্ত! হরনারায়ণ চৌধুরীও পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন। বললেন—আরে, এত রক্ত এল কোত্থেকে? দীনু দৌড়ে এল—এ কী খোকাবাবু, এ কীসের রক্ত? কৈলাস গোমস্তাও ভাল করে নজর করে দেখলে—তাই তো, রক্ত কীসের? রজব আলী পাকা-ফলার খাচ্ছিল একমনে। সেও বলে উঠলো—রক্ত! সদানন্দর অতীত জিজ্ঞেস করলে—রক্ত! সদানন্দর বর্তমান জিজ্ঞেস করলে—রক্ত! সদানন্দর ভবিষ্যৎ জিজ্ঞেস করলে—রক্ত! সদানন্দর শিক্ষা-দীক্ষা-অস্তিত্বও প্রশ্ন করলে—রক্ত! ইতিহাস ভূগোল সমাজ—সমস্ত ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, অধস্তন উত্তরপুরুষ একযোগে সবাই প্রশ্নের ঝড় বইয়ে দিলে—রক্ত রক্ত রক্ত!!!

গণেশ হঠাৎ মাস্টার মশাইকে দেখতে পেয়েছে।

—আরে মাস্টার মশাই, আপনি এখেনে? আর ইনি আপনার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির! আপনি এঁকে ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছেন—

সদানন্দ হাজারি বেলিফের দিকে চাইলেন। এতক্ষণে যেন সব মনে পড়লো আবার।

বললেন—আমি আপনার জন্যে জল আনতে এসেছিলুম, কিন্তু গেলাস খুঁজে পাচ্ছিলুম না—

গণেশ বললে—আপনি গেলাস খুঁজে পাবেন কী করে? আপনি কি কখনও নিজের হাতে জল গড়িয়ে খেয়েছেন? যান, আপনি ঘরে যান, আমি জল এনে দিচ্ছি—

যে-গেলাস খুঁজতে সদানন্দবাবুর রাত পুইয়ে গিয়েছিল, সেই গেলাস খুঁজে জল এনে

দিতে গণেশের এক মিনিটও লাগলো না।

জল খেয়ে হাজারি যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। বললে—যাক্ গে, এবার আর দেরি নয় মশাই, চলুন। এখন পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হবে, বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ুন—

সদানন্দবাবু বললেন—আজকেই যেতে হবে?

হাজারি বেলিফ বললে—তা যেতে হবে না? আপনার নামে হুলিয়া রয়েছে আমার কাছে আজ পনেরো বছর ধরে আর আপনি বলছেন আজকেই যেতে হবে কিনা? শেষকালে হাকিমকে খবর দিলে যে আপনার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে তারা। তখন কি ভালো দেখাবে? তার চেয়ে ভালোয়-ভালোয় আমার সঙ্গে চলুন, বেশী ঝামেলা হবে না। আমি বাজে ঝামেলা পছন্দ করি না—

সদানন্দবাবু বললেন—কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি যে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে? বাদী কে?

হাজারি বললে—বাদী কে আবার, পুলিস!

—আর আমার অপরাধ?

হাজারি বললে—অপরাধ? অপরাধের কথা বলছেন? হরনারায়ণ চৌধুরীর নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ, তিনি তো আমার বাবা!

—আপনি তাঁকে খুন করেন নি?

—খুন? আমি? আমি আমার বাবাকে খুন করেছি?

—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ, আর শুধু কি তাই? আপনি আট লাখ টাকা তহবিল তছরূপ করেছেন, তারও প্রমাণ আছে কোর্টের কাছে—

—আট লাখ টাকার তহবিল তছরূপ? বলছেন কী আপনি?

—আর নয়নতারা? নয়নতারাকে চেনেন?

—হ্যাঁ।

হাজারি বেলিফ বললে—তার সব্বোনাশ কে করেছে?

—তার সব্বোনাশ হয়েছে! কে সব্বোনাশ করেছে তার? কী সব্বোনাশ হয়েছে?

হাজারি বললে—আপনি ভালো মানুষ সেজে থাকলে কী হবে, এক গেলাস জল পর্যন্ত নিজে গড়িয়ে খেতে পারেন না, কিন্তু আপনার শয়তানি জানতে কোর্টের বাকি নেই মশাই। আজ পনেরো বছর ধরে আপনার নামে হুলিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আপনি এখানে সাধু সেজে লুকিয়ে বসে আছেন। কী কাণ্ড বলুন দিকিনি!

সদানন্দবাবু হতবাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মুখ দিয়ে যেন আর কোনও কথা বেরোতে নেই।

বললেন—তাহলে আমি আসামী?

হাজারি বললে—আসামী না হলে আপনার নামে হুলিয়া বেরোল কেন? কই, আর কারো নামে তো হুলিয়া বেরোচ্ছে না! আপনি ভেবেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে জল খাবেন আর কেউ তা জানতে পারবে না? তাহলে মশাই আর কোর্ট-কাছারির সৃষ্টি হয়েছে কেন? আর তা ছাড়া এখন হয়েছে কী! এখন তো সবে 'মহড়া'—

—'মহড়া' মানে?

হাজারি বললে—কবির গান শোনেন নি? প্রথমে 'মহড়া' দিয়ে শুরু হবে, তারপরেই 'চিতেন'। ওই 'চিতেনে'ই তো যত মজা। তারপর 'পর-চিতেন', তাতে আরো মজা। তারপরে সকলের শেষে আছে 'অন্তরা'। এখন নিচের ছোট কোর্টে শুরু হবে মামলা, তারপরে যখন

সেই মামলা বড়-আদালতে যাবে তখনই তো মজা।

সদানন্দবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—একটা কথা রাখবেন আমার?

—কী কথা!

—আমাকে দু-চারদিন সময় দেবেন?

—দু'চারদিন?

—হ্যাঁ, আমি দেখে আসবো একবার সুলতানপুরে গিয়ে যে সত্যিই আমি হরনারায়ণ চৌধুরীকে খুন করেছি কি না। দেখে আসবো আমি আট লাখ টাকা তছরূপ করেছি কি না। তারপর একবার যাবো নবাবগঞ্জে। আর নয়নতারার কথা বললেন? কিন্তু আমি তো তার কোনও সর্বনাশ করিনি। আমি তো বরাবর তার ভালো করবারই চেষ্টা করেছি। তাকেও আমি একবার দেখতে যাবো নৈহাটিতে।

—আর আমি? আমি কি এখানে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো নাকি? আপনি যদি মশাই পালিয়ে যান? আপনাকে আর আমার বিশ্বাস নেই—

সদানন্দবাবু বললেন—পালালে তো আগেই পালাতে পারতুম হাজারিবাবু। আর এই তো আমি সংসার ছেড়ে চৌবেড়িয়াতে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু জীবনের যন্ত্রণা থেকে কি রেহাই পেয়েছি? এও তো এক জেলখানা। এই জীবনই তো আমার কাছে জেলখানা। এই জেলখানা থেকে না-হয় আর একটা জেলখানাতে গিয়ে ঢুকবো। জেলখানাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু আমি জানতে চাই আমি কী অন্যায় করেছি। বুঝতে চাই আমি কী পাপ করেছি। দেখতে চাই আমি কার কী ক্ষতি করেছি, কার কী সর্বনাশ করেছি! নিজের চোখে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই আমার এত চেষ্টা, এত অধ্যবসায়, এত ত্যাগ কেন এমন করে মিথ্যে হয়ে গেল, কে আমার সব ইচ্ছেকে এমন করে পণ্ড করে দিলে? এর কারণটা কী?

—আর আমি?

—আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আজ পনেরো বছর আমার পেছনে নষ্ট করেছেন, এবার আর দু'টো দিন নষ্ট করতে পারবেন না?

সঙ্গে নেবার মত কিছুই ছিল না। তবু টুকিটাকি কিছু নিতে হলো। সদানন্দবাবু বেরোলেন। পেছনে ভদ্রলোকও সঙ্গে চলতে লাগলো। বললে—দুগ্যা, দুগ্যা, এ কী এক ঝামেলায় ফেললেন মশাই আমাকে, চলুন চলুন, পা চালিয়ে চলুন—

গণেশ দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল।

বললে—কোথায় যাচ্ছেন মাস্টার মশাই? যাচ্ছেন কোথায়?

সদানন্দবাবু বললেন—হরি মুহুরি মশাইকে বলে দিও গণেশ যে দু'দিনের জন্যে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—

—দু'দিন পরে আবার আসছেন তো?

সদানন্দবাবু বললেন—তা কি বলা যায় কিছু! সারা জীবন এত হিসেব করে চলেও যখন একদিন সব হিসেব বেহিসেব হয়ে গেল তখন ঠিক করে কিছুই আর বলতে ভরসা হয় না। তবে এলে তো তোমরা দেখতেই পাবে—

বলে গঙ্গার ঘাটের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন। চলতে চলতে তাঁর মনে হতে লাগলো যেন আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ সব একসঙ্গে ঝড়ের মত প্রশ্ন করে চলেছে—এ কীসের রক্ত! দোতলা থেকে নরনারায়ণ চৌধুরী প্রশ্ন করছেন, প্রশ্ন করছেন হরনারায়ণ চৌধুরী। প্রশ্ন করছে দীনু, কৈলাস গোমস্তা, গৌরী পিসী, রজব আলী, সবাই। সদানন্দবাবুর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎও যেন একই প্রশ্ন করে চলেছে। একই প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা-

অস্তিত্ব। প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর ইতিহাস-ভূগোল-সমাজ। প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর অধস্তন উত্তরপুরুষ। একযোগে সকলের প্রশ্ন সদানন্দবাবুর মনে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে—এ কীসের রক্ত!

আর তাদের সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন নয়নতারাও সদানন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করে চলেছে—এ কীসের রক্ত!

চিতেন

রেল-বাজার থেকে নবাবগঞ্জ পাঁচ ক্রোশ রাস্তা। পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হলে কী হবে ওটুকু পথ লোকে হেঁটেই মেরে দেয়। এখন অবশ্য বাস হয়েছে। কুড়িটা নয়া দিলে একেবারে নবাবগঞ্জের আগের গ্রামে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে ওই দেড় মাইলটাক রাস্তা হেঁটে চলে যাও একেবারে সোজা নবাবগঞ্জে পৌঁছে যাবে।

তা সেই রেলবাজারের ইস্টিশানে ট্রেন থেকে একদিন একজন ভদ্রলোক নামলো। বেশ ধোপ্-দুরস্ত চেহারা। হাতে একটা ছোট সুট্‌কেসের গায়ে সাদা রং দিয়ে ইংরিজি অক্ষরে লেখা রয়েছে—পি সি রায়। ট্রেনটা চলে যাবার পর ভদ্রলোক কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা বাজারের রাস্তায় পড়লো। তারপর বাঁয়ে ঘুরে একটা মিষ্টির দোকানে। দোকানী এগিয়ে এল।

—কী দেব বলুন?

ভদ্রলোক বললে—সন্দেশ কত করে?

—সাড়ে সাত টাকা।

—ওরে বাবাঃ, একেবারে সাড়ে সাত টাকা! গলা-কাটা দর করে দিলেন যে। আগে আপনাদের দোকানে কত সন্দেশ-রসগোল্লা-রাজভোগ খেয়েছি, তখন তো আড়াই টাকা করে সের ছিল।

দোকানদার সবিনয়ে বললে—সে-সব দিনের কথা এখন ভুলে যান। তখন সাত টাকা মণ দুধ পাওয়া যেত।

ভদ্রলোকের এ-সব কথা ভালো লাগলো না। বললে—না মশাই, এ একেবারে গলাকাটা দর করে দিয়েছেন। তা সিঙ্গাড়া কত করে?

—তিন আনা পিস্—

ভদ্রলোক বলে উঠলো—তা সিঙ্গাড়া তো আর দুধের খাবার নয় মশাই, সিঙ্গাড়ার এত দাম করেছেন কেন? আমি কি ভেবেছেন নতুন এসেছি এখেনে—আজ কুড়ি-তিরিশ বছর ধরে আসছি। এককালে আপনাদের দোকানে আমি এক টাকা সের সন্দেশ খেয়েছি, তাও আমার মনে আছে—

এতক্ষণে দোকানদারের যেন মন ভিজলো। জিজ্ঞেস করলে—আপনার দেশ কি এখেনে?

ভদ্রলোক বললে—আমার নিজের দেশ নয়, আমার জামাইবাবু নবাবগঞ্জের জমিদার—

—নবাবগঞ্জের জমিদার?

—আরে হ্যাঁ মশাই, ছোটবেলা থেকে দিদির বাড়ি আসতুম, আর এইখান থেকে কাঁচাগোল্লা কিনে নিয়ে যেতুম। এককালে এখানে রোজ আসতুম।

—আপনার দেশ?

—ভাগলপুর। এখানে নবাবগঞ্জে আমার ভগ্নীপতির বাড়ি। জমিদার হরনারায়ণ চৌধুরীর নাম শুনেছেন? তিনিই ছিলেন আমার ভগ্নীপতি।

—তা তিনি তো নবাবগঞ্জ থেকে জমিজমা বেচে চলে গিয়েছেন। ভাগলপুরে আছেন এখন—

ভদ্রলোক বললে—তাহলে তো সবই জানেন দেখছি। সেই ভগ্নীপতিই এখন মারা গেছেন।

—মারা গেছেন!

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, সে এক ভীষণ কাণ্ড! সেই ব্যাপারেই আমরা সব বিব্রত। এখন যাচ্ছি নবাবগঞ্জে আমার ভাগ্নের খবর নিতে—

—ভাগ্নে মানে? সেই সদা! সদানন্দ!

—হ্যাঁ, সদানন্দকে এদিকে দেখেছেন নাকি? তাঁকে খুঁজতেই তো যাচ্ছি। যা'হোক, তাহলে মশাই আপনার সন্দেশ আর খাওয়া হলো না। সাড়ে সাত টাকা সেরের সন্দেশ খাবার ক্ষমতা নেই আমার—

দোকানদার বললে—তাহলে সিঙ্গাড়া খান, তিন আনার চেয়ে সস্তা দেওয়া যায় না, আলুর যা দাম বাড়ছে—

—তা দু'আনা করে হোক না—

দোকানদারের কী মনে হলো। বললে—ঠিক আছে, আপনি চা খাবেন তো? দু'আনায় এক কাপ চা। চা খেলে একখানা সিঙ্গাড়া দু'আনায় দিতে পারি। আপনি আমাদের পুরোন লোক—দেশের লোক, এতদিন পরে এসেছেন। ওরে, বাবুকে এক কাপ চা আর একটা গরম সিঙ্গাড়া দে—

তা তাই-ই সই। বেশী দরাদরি করা ঠিক নয়। সন্দেশটা সস্তা করে দিলেই ভালো হতো অবশ্য শেষ পর্যন্ত একখানা সিঙ্গারা দিয়ে এক কাপ চা-ই নিলে ভদ্রলোক। বললে—তাহলে চা'য়ে একটু বেশি করে চিনি দেবেন মশাই, আমি আবার চিনি একটু বেশী খাই—

চা আর সিঙ্গাড়া খেয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক উঠলো। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমেছে। এবার একটু রোদ উঠেছে। এখনও পাঁচ ক্রোশ রাস্তা ঠেঙ্গাতে হবে। রেল-বাজারের রাস্তায় তখন মানুষের রীতিমত আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে—

তারপর রাস্তায় নামবার আগে দোকানদারকে লক্ষ্য করে বললে—ফেরবার সময় আবার আসছি, তখন কিন্তু একটু কন্‌শেসন করতে হবে, বুঝলেন—

তা এই হলো প্রকাশ রায়। সদানন্দ চৌধুরীর প্রকাশ মামা। আপন মামা ঠিক নয়। তা না হোক, আপন মামার চাইতেও বড়। মা'র এক মামার ছেলে। ছোট বেলা থেকে নবাবগঞ্জে আনাগোনা করতো। বড়লোক ভগ্নীপতি। দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি হলেও ভগ্নীপতি তো! একটা সম্পর্ক তো আছে, তা সে যত ক্ষীণ সম্পর্কই হোক। সেই ক্ষীণ সম্পর্কটাকে ঘন-ঘন দেখা-সাক্ষাৎ আসা-যাওয়া দিয়ে সে রীতিমত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত করে তুলেছিল। বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ-হঠাৎ এসে উদয় হতো প্রকাশ। বড়লোক দিদি। থাকা-খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। প্রকাশ এলেই নবাবগঞ্জের লোকেরা বলতো—ওই চৌধুরী মশাই-এর শালা এসেছে—

অনেকে আবার আদর করে শালাবাবুও বলতো।

শালাবাবু এলে নবাবগঞ্জের লোক ধরে বসতো—শালাবাবু, আমাদের বারোয়ারিতলায় যাত্রা হবে, চাঁদা দিন—

তা চাঁদা দিতে কখনও কার্পণ্য করে নি শালাবাবু। বলতো—বেশ তো, কত চাঁদা দিতে হবে আমাকে, বলো—

—দশ টাকা চাই আপনার কাছে—

তা দশ টাকা দিতেও আপত্তি করতো না শালাবাবু। নবাবগঞ্জের জমিদারের শালা, সুতরাং সারা গ্রামের লোকেরই শালা। তার মতন লোকের কাছে দশ টাকা চাঁদা চাইবার হক আছে

বইকি গ্রামের লোকের। শালাবাবুর ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, আর ঢেউ খেলানো তেড়ি, এ-সব দেখে যে-কোনও লোকই বুঝতে পারতো শালাবাবু পয়সা-ওয়ালা লোক। আসলে কিন্তু এ পয়সা যোগান দিত দিদি। শালাবাবু এসেই বলতো—দিদি, এবার আর তোমার ইজ্জৎ থাকবে না—

দিদি বুঝতে পারতো না। বলতো—কেন রে, কী হলো?

—নবাবগঞ্জের ক্লাবের ছেলেরা আবার চাঁদা চাইছে। একেবারে দশ টাকা চাঁদা ধরেছে আমার নামে।

দিদি বলতো—কেন, আবার চাঁদা কীসের? এই তো সেদিন যাত্রার জন্যে তুই দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেলি। এরই মধ্যে আবার চাঁদা কিসের?

শালাবাবু বললে—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করলুম, আবার চাঁদা কীসের? তা ওরা বললে—এবার বারোয়ারিতলায় কবির গান লাগাবে—

—কবির গান? ওদের বুঝি কাজ-কম্ম কিছু নেই, কেবল যাত্রা থিয়েটার আর গান!

শালাবাবু বললে—দিয়ে দাও দশটা টাকা। দশটা টাকা তোমার কাছে কিছ্ছু না, কিন্তু ওরা আমাকে শালাবাবু বলে এখনও মান্য-গণ্য করে তো, টাকা না দিলে সেটাও আর করবে না, তখন তোমারও ইজ্জৎ নষ্ট, বলবে চৌধুরীমশাই কিপ্‌টে লোক—চৌধুরীমশাই-এর বউও কিপ্‌টে, তার শালাটাও কিপ্‌টে।

দিদি ভাই-এর কথায় হেসে ফেলতো। বলতো—তোর বুদ্ধি তো খুব প্রকাশ—

প্রকাশ দিদির কাছে তারিফ পেয়ে অহঙ্কারে আরো ফুলে উঠতো। বলতো—তুমি আর আমার বুদ্ধির কতটুকু দেখলে দিদি। জানো, এই যে এতবার ভাগলপুর থেকে এখানে আসি, তুমি কি ভেবেছো আমি রেলের টিকিট কাটি নাকি?

—টিকিট কাটিস না!

প্রকাশ গর্বে বুক ফুলিয়ে দিদির দিকে চেয়ে বলে—না। টিকিট কাটতে যাবো কোন্ দুঃখে বল তো! আমি গাড়িতে চড়লেও রেল চলবে, না-চড়লেও চলবে। আমি চড়ি বলে কি আর রেলের ইঞ্জিনের কয়লা বেশি পোড়ে?

দিদি অবাক। বলে—তাহলে তুই যে আমার কাছ থেকে টিকিটের টাকা নিস্?

প্রকাশ বলে—তোমার দেখছি বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছ্ছু নেই দিদি। তোমার কাছ থেকে টিকিটের টাকা নিই বলে সত্যি সত্যি রেলের টিকিট কাটতে হবে? তুমি বলছো কী? ওই রকম বোকা হলেই হয়েছে আর কী! পৃথিবীতে লোকের সঙ্গে একটু ভালোমানুষি করেছ কি সবাই তোমায় পিষে গুঁড়িয়ে চেপ্‌টে মেরে ফেলে দেবে। তুমি তো দেশের মানুষগুলোকে এখনও চিনলে না, তাই ওই কথা বলছো! খবরদার খবরদার, ওই বোকামিটি কখ্‌খনো কোর না দিদি, রেলে চড়লে কখ্‌খনো টিকিট কাটবে না। রেলগাড়ি মানে কী জানো তো?

—কী?

—জোচ্চোরের বাড়ির ফলার। পেলে ছাড়তে নেই।

—তা তুই সে টাকাগুলো নিয়ে কী করিস?

প্রকাশ বলে—খাওয়াই—

—খাওয়াই মানে? কাকে খাওয়াস?

প্রকাশ বলে—ওই টিকিট চেকারদের। এক-একদিন যখন ধরে ফেলে তখন চা-সিগ্রেট খাওয়াতে হবে না? সবাই তো আর আমার বউ-এর ভাই নয় যে আমার মুখ দেখে ছেড়ে দেবে! দু'একটা আবার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আছে, জানো, তারা মিষ্টি কথাতেও ভুলবে না,

চা-সিগ্রেটও খাবে না, আবার ঘুঁষও নেবে না। সেই সব বেয়াড়া লোকগুলোকে নিয়েই হয় মুশকিল!

—তখন কী করিস?

—তখন কী আর করবো? গাঁট-গচ্চা দিতে হয়—

কথাগুলো বলবার সময় দিদিও যত হাসে, প্রকাশও তত হাসে। ভাইএর বাহাদুরিতে দিদি অবাকও হয়ে যায়। যখন প্রকাশ নবাবগঞ্জে আসে তখন অনেক সময় রেলবাজারের মিষ্টির দোকান থেকে এক হাঁড়ি কাঁচাগোল্লা নিয়ে আসে। দিদি বলে—এ কী রে, তুই আবার কুটুম লোকের মত মিষ্টি নিয়ে আসিস কেন? তুই কি কুটুম-বাড়ি আসছিস নাকি?

প্রকাশ বলতো—না দিদি, তুমি কাঁচাগোল্লা খেতে ভালবাসো তাই আনলুম। তিন টাকা সের, বেটারা গলা-কাটা দাম রেখেছে—

দিদি সন্দেশটা নেয় বটে, কিন্তু ভাই-এর দেওয়া জিনিসের দামও সঙ্গে সঙ্গে শোধ করে দেয়। আর তা ছাড়া প্রকাশ টাকা পাবেই বা কোথায়? তার তো আর ভগ্নী-পতির মত নিজের ঢালাও জমিদারি নেই যে দিদিকে রোজ-রোজ এক সের করে কাঁচাগোল্লা খাওয়াবে! আর প্রকাশও জানতো যে সেই কাঁচাগোল্লা দিদি নিজে যতখানি খাবে, তার চেয়ে বেশি খাবে প্রকাশ নিজে।

ওই সদা যখন হলো তখন ওর ভাতের সময় করা-কর্মা যা কিছু সবই করেছিল ওই প্রকাশ। অবশ্য তখন প্রকাশ নিজেও ছোট। সদানন্দর সেই ছোটবেলা থেকে তার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজেই প্রকাশ। জমিদারবাড়ির একমাত্র ছেলে। আদর করবার লোকেরও অভাব যেমন নেই, ছেলের সাধ-আহ্লাদ-শখ মেটাবার জন্যে টাকারও তেমনি অভাব নেই। যত ইচ্ছে খরচ করো না তুমি, ছেলে যদি তাতে সুখী হয় তো আমার কোনও আপত্তি নেই। আরো টাকা নাও নবাবগঞ্জের চৌধুরী বংশের কুল-তিলক সদানন্দ, তার জন্যে নরনারায়ণ চৌধুরীর কোনও কার্পণ্য নেই।

যেদিন সদানন্দ জন্মালো নরনারায়ণ চৌধুরী তখন রাণাঘাটের সদরে মামলার তদ্বির করতে গেছেন। সদরে তাঁর নিজের বাড়ি ছিল। মামলা-মকর্দমার জন্যে তাঁকে যেতেই হতো। ওখানে গেলে কিছুদিন ওই বাড়িতেই কাটাতেন। লোকজন ছিল তাঁর। কাছারি-বাড়ির কাজ হতো ওইখানে। তার জন্যে লোক-লস্কর সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল।

সেদিন উকিল-মুহুরি নিয়ে কাছারি-ঘরে তিনি খুবই ব্যতিব্যস্ত। নব্বুই হাজার টাকার একটা বিলের মামলার ডিক্রী হয়েছে। তাই নিয়ে সাক্ষী-সাবুদের ঝামেলায় একেবারে নাজেহাল, তখন হঠাৎ নবাবগঞ্জ থেকে দীনু দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে খবর দিলে—বউমার ছেলে হয়েছে—

প্রথমটায় যেন মনে হলো ভুল শুনছেন। তারপর উকিল-মুহুরির দিক থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কী বললি?

—আজ্ঞে বউমার ছেলে হয়েছে।

তবু যেন কর্তামশাইএর বিশ্বাস হলো না। বললেন—ছেলে, না মেয়ে?

—আজ্ঞে ছেলে।

—তুই ঠিক জানিস—ছেলে?

দীনু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মঙ্গলা দাই নিজে আমাকে বলেছে। ছোট-মশাই তাই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে।

কথাটা শুনে কর্তামশাই প্রথমে কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তারপর কৈলাসকে ডাকলেন। কৈলাস গোমস্তা যে তাঁর পাশেই বসে আছে, উত্তেজনায় সে-খেয়ালও তাঁর ছিল

না। আবার ডাকলেন—কৈলাস, কৈলাসের টিকি দেখতে পাচ্ছি নে কেন, সে যায় কোথায়?

পাশ থেকে কৈলাস বলে উঠলো—আজ্ঞে এই তো আমি।

—ও তুমি পাশেই রয়েছ, তা আমি যে এত চেঁচিয়ে মরছি তুমি রা কাড়ছো না কেন? তোমরা কি সব কানে তুলো দিয়ে রেখেছ? তোমাদের কি সব সময় কেবল ফাঁকি! ফাঁকি দেওয়া তোমাদের স্বভাব হয়ে গিয়েছে—

একগাদা নথিপত্র নিয়ে কৈলাস তখন হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছিল। তিন দিন তিন রাত ধরে সেই সব নথিপত্র নিয়েই কেটেছে সকলের। একবার কাছারি আর একবার কোর্ট করেছে। জমিদারী-সেরেস্তার কাজে তার মত বিশ্বস্ত লোক পাওয়াও কর্তামশাই-এর একটা ভাগ্য। কিন্তু তবু তার বকুনি খাওয়ার কপাল।

কর্তামশাই বললেন—ওসব নথিপত্র এখন রাখো,—

কৈলাস গোমস্তা বললে—আজ্ঞে, কাল যে মুনসিফের কোর্টে এ-মামলার শুনানী আছে—

কর্তামশাই বললেন—রাখো তোমার শুনানী। জীবনে অনেক মামলা করেছি, তুমি আমাকে আর কোর্ট দেখিও না। আমি কি কোর্ট-এর নাম শুনলে ভয় পাবো? না-হয় ও বিলটা যাবে। জীবনে অনেক বিল্ দেখেছি, আবার অনেক সম্পত্তি চলেও গিয়েছে আমার। আর আমি যদি বেঁচে থাকি অমন বিল্ আমি আরো দশটা নীলামে ডেকে নেব। এখন ও-সব থাক্, শুনছো নাতি হয়েছে আমার, তুমি এখন আমাকে কোর্ট শোনাচ্ছো। যাও, ও-সব রাখো। আমি আজকেই নবাবগঞ্জে ফিরে যাবো, তার ব্যবস্থা করো—

—এখুনি যাবেন?

—এখুনি যাবো না তো কি একদিন পরে যাবো? পরে গেলে দেরি হবে না? এ কি দেরি করার কাজ? যাও, গাড়ির বন্দোবস্ত করো, আর আমার বাক্স-বিছানা সব দীনুকে দিয়ে গুছিয়ে ফেল। রজব আলীকে ডেকে গাড়িতে গরু জুততে বলো—

এর ওপর আর কথা বলা চলে না। কৈলাস গোমস্তা বাইরে যাচ্ছিল সব বন্দোবস্ত করতে।

কর্তামশাই আবার ডাকলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা, তার আগে আর একটা কাজ করো দিকিনি। বাজারের সনাতন স্যাকরাকে চেনো তো, তাকে গিয়ে বলো দশ ভরির সোনার হার যদি একটা তৈরি থাকে তো সেটা নিয়ে যেন এখুনি একবার আমার কাছে আসে—

তা সেইদিনই কর্তামশাই সেই দশভরি সোনার হার নিয়ে রজব্ আলীর গাড়িতে চড়ে গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। খাওয়া-ঘুমনো মামলা সব কিছু মাথায় রইলো। সব কিছু ফেলে কর্তামশাই নবাবগঞ্জে এসে ওই দশ ভরির সোনার হার দিয়ে নাতির মুখ দেখেছিলেন। এ নাতি যে তাঁর কত আদিখ্যেতার নাতি তা আর কেউ না জানুক, কর্তামশাইএর অজানা ছিল না। ছেলের বিয়ে তিনি অল্প বয়েসেই দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি নাতি-নাতনীতে ভরে যাবে। তার সংসার বিলাস-বৈভবে ঐশ্বর্যে জাঁক-জমকে জমজমাট হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হয় নি। তিনি অনেক খুঁজে-পেতে সুলতানপুরের জমিদার কীর্তিপদ মুখুজ্যের একমাত্র সন্তানকে নিজের ছেলের পাত্রী হিসেবে পছন্দ করে বউ করে নিজের বাড়িতে এনেছিলেন।

কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন কেটে গেল, তবু সন্তানাদি কিছু হলো না দেখে বড় মুষড়ে পড়েছিলেন।

এই প্রকাশ তখন সবে হয়েছে। বাপ-মা মারা যাবার পর পিসীমার কাছেই থাকতো।

পিসেমশাই কীর্তিপদ মুখুজ্জের ছেলে ছিল না বলে আদর-যত্ন পেত ছেলের মত। তারপর যখন প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে সে নবাবগঞ্জে চলে গেল তখন ছোট ছেলের মত প্রকাশও দিদির সঙ্গে দিদির শ্বশুরবাড়িতে এল।

কিন্তু এ-সব জটিল-কুটিল বংশতালিকার শুকনো বর্ণনা না দেওয়াই ভালো। তাতে গল্প দানা বাঁধতে পারে না। গল্প আত্মীয়স্বজনের ডালপালার ঘা লেগে হোঁচট খেয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তার চেয়ে প্রকাশের যে পরিচয় দিচ্ছিলাম তাই দেওয়াই ভালো। কারণ এ উপন্যাস যাঁরা পড়ছেন তাঁদের এখন থেকেই জানিয়ে দেওয়া ভালো যে প্রকাশ রায় ভবিষ্যতে এ উপন্যাসে আরো অনেকবার উদয় হবে। পাঠক-পাঠিকারা এই চরিত্রটির সম্বন্ধে যেন একটু বিশেষ অবহিত থাকেন।

এদিকে সদানন্দ যখন বড় হলো তখন প্রকাশ রায় এ বাড়িতে রীতিমত আসর জমিয়ে বসেছে। এখানে একবার আসে একমাস দু'মাস থাকে, আর দিদির কাছ থেকে কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে আবার কিছুদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যখন নবাবগঞ্জে থাকে তখন সদানন্দকে নিয়ে ঘোরে। কোথায় যাত্রা হচ্ছে, কোথায় কবির লড়াই হচ্ছে, পাঁচালী হচ্ছে, সেখানে ভাগ্নেকে সঙ্গে করে তার নিয়ে যাওয়া চাই।

নরনারায়ণ চৌধুরী হাজার কাজের মধ্যেও নাতির খবর নেন। বলেন—খোকা কোথায় গেল, খোকা? খোকাকে দেখছি নে যে?

কৈলাস গোমস্তা বলে—আজ্ঞে, খোকাবাবু শালাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছে—

জিনিসটা কর্তামশাইএর পছন্দ হয় না। কিন্তু কিছু বলতেও পারেন না। বউমার ভাই। কুটুম সম্পর্ক। শুধু বলেন—তোমাদের শালাবাবু লোকটা সুবিধের নয়, সিগ্রেট-টিগ্রেট খেতে দেখেছি—

কিন্তু প্রকাশের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। স্টেশন থেকে সোজা এসেই একেবারে কর্তামশাইএর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায়।

কর্তামশাই প্রত্যেকবারই হক্‌চকিয়ে যান।

বলেন—কে?

—আজ্ঞে আমি প্রকাশ।

—প্রকাশ! নামটা যেন অনেকক্ষণ চিনতে পারেন না। তারপর একেবারে না চিনলে খারাপ দেখায় তাই বলেন—বেয়াই মশাই কেমন আছেন? বেয়ান? সবাই ভালো আছেন তো?

তারপরে আর কর্তামশাইএর সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করে না সে। সোজা চলে যায় দিদির কাছে। একেবারে অন্দর মহলে গিয়ে বলে—দিদি এলুম—

এক একদিন হাসতে হাসতে ঢোকে দিদির ঘরে। বলে—জানো দিদি, তোমার ছেলে খুব ইনটেলিজেন্ট হয়েছে—

দিদি বলে—কি রকম?

প্রকাশ বলে—ওকেই জিজ্ঞেস করো না—

দিদি খোকার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে খোকন?

খোকন বলে—আমি গান শিখেছি মা—

—ওমা তাই নাকি? কই গাও দিকি?

প্রকাশও উৎসাহ দিলে ভাগ্নেকে। বললে—গাও গাও, গেয়ে শোনাও মাকে, শোনাও—

খোকন দু'হাত তুলে এঁকে-বেঁকে নাচতে শুরু করে দিলে। তারপর গান গাইতে আরম্ভ করলে—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
করো মুখে যদি শুনিতাম
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম।।

গান শুনে ভেতর-বাড়ি থেকে আরো অনেকে দৌড়ে এসেছিল। গৌরী পিসী ছেলের বুদ্ধি দেখে আর থাকতে পারলে না। একেবারে দুই হাতে খোকনকে কোলে তুলে মুখময় চুমু খেতে লাগলো। বললে—ওমা, কী চমৎকার গলা খোকন-মণির, বড় হলে খোকন আমাদের বড় গাইয়ে হবে বউদি—

আরো যারা দেখছিল তারাও সবাই একবাক্যে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো!

অহঙ্কারে তখন শালাবাবুর বুক দশ হাত হয়ে গেছে। বললে—এবার সেই গানখানা গাওতো খোকন, সেই যেখানা আমি শিখিয়েছি—।

—কোন্ গানটা?

—সেই যে—আর নারীরে করিনে প্রত্যয়—

খোকন গাইতে লাগল—

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়
নারীর নাইকো কিছু ধর্মভয়
নারী মিলতে যেমন ভুলতে তেমন
দুই দিকে তৎপর
মজিয়ে পরে চায় না ফিরে
আপনি হয় অন্তর—

শালাবাবু নিজেই গানের তারিফ করতে লাগলো। বললে—বাঃ বাঃ বাঃ—

কিন্তু হঠাৎ হরনারায়ণ ঘরে ঢুকলেন। বললেন—কে গান গাইছিল, খোকা না?

শালাবাবু বললে—হ্যাঁ জামাইবাবু,—আপনি আর একবার শুনবেন গানটা?

হরনারায়ণ বললেন—না, ও সব গান ওকে কে শিখিয়েছে?

শালাবাবু বললে—কবির গান শুনতে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেখানে শিখেছে। কী ইন্‌টেলিজেন্ট্ হয়েছে খোকন দেখেছেন! একবার মাত্তোর গানটা শুনেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সুরটা মুখস্থ করে ফেলেছে। আমি তো জামাইবাবু আমার বাপের জন্মে এমন ইন্‌টেলিজেন্ট্ ছেলে দেখি নি, ভেরি ভেরি ইন্‌টেলিজেন্ট্ বয়—

প্রকাশের সামনে হরনারায়ণ কিছু বললেন না বটে, কিন্তু রাত্রে শোবার ঘরে এসে স্ত্রীর কাছে মুখ খুললেন। বললেন—খোকনকে কি তুমি প্রকাশের সঙ্গে কবির লড়াই শুনতে পাঠিয়েছিলে?

প্রীতিলতা প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন বলো তো?

—না, তাই জিজ্ঞেস করছি। যে-সব গানগুলো খোকন গাইছিল, এগুলো তো খুব ভালো গান নয়। বাবা শুনলে রাগ করবেন। খোকনকে আর যার-তার সঙ্গে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া ঠিক নয়। অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে—

প্রীতিলতা বললে—কীসের অভ্যেস?

—ওই সব বাজে গান গাওয়ার অভ্যেস।

প্রীতিলতা বললে—ছেলেমানুষ গান শুনেছে আর শিখে ফেলেছে, এতে অভ্যেস খারাপ হবার কী আছে? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ছেলেমানুষ একটু গান গাইলেই দোষ?

হরনারায়ণ এর পরে আর ও-বিষয়ে কোনও কথা বললেন না। আর তা ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত বেশি সময়ও ছিল না তাঁর। কিন্তু মনে মনে কেমন যেন, চিন্তিত হলেন।

সেদিন খোকনের আর একটা বুদ্ধির অকাট্য প্রমাণ দিলে প্রকাশ। দিদির কাছে খোকনকে নিয়ে এসে বললে—উঃ, তোমায় কী বলবো দিদি! খোকন একটা জিনিয়াস হবে নির্ঘাত, দেখে নিও—

দিদি বুঝতে পারলে না। বললে—জিনিয়াস! তার মানে?

—মানে একটা ধুরন্ধর প্রতিভা।

—কেন, আবার কী করেছে?

—আরে কৈলাস গোমস্তার হুঁকোটো ছিল চণ্ডীমণ্ডপে, কলকেতে তখনও আগুন জ্বলছে। ও একটানে হুঁকো থেকে ধোঁয়া টেনে নাক দিয়ে বার করে ছেড়েছে—

দিদিও অবাক ছেলের বুদ্ধির বহর দেখে। বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ দিদি, আমি কাণ্ড দেখে তো অবাক। আমি এই বলে দিচ্ছি দিদি, এ ছেলে তোমার বংশের নাম রাখবে, এমন বুদ্ধি আমি বাপের জন্মে কারো দেখি নি, সত্যি—

দিদি খোকনের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ রে খোকন, তোর কাশি হলো না?

খোকন ঘাড় নাড়লে। বললে—না—

—বলিস কী? একটুও কাশি হলো না?

খোকন গর্বের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে আবার বললে—না—

গৌরী পিসীও এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও শুনে বললে—না বউদি, আমি তোমাকে বলেছিলুম এ ছেলে তোমার একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হয়ে যায় না—

রাত্রে হরনারায়ণ ঘরে আসতেই প্রীতি বললে—ওগো, খোকনের কী বুদ্ধি জানো?

হরনারায়ণ বললেন—কী?

—আজকে গোমস্তা মশাইএর হুঁকো টেনে খোকন নাক দিয়ে গল্-গল্ করে ধোঁয়া ছেড়েছে, একটুও কাশে নি!

খোকন পাশেই ছিল। সেও বাবার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি একটুও কাশি নি—

হরনারায়ণ কথাটা শুনে কিন্তু হাসতে পারলেন না। আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কে ওকে হুঁকোয় মুখ দিতে বলেছিল?

স্ত্রী বললে—কে আবার বলবে, ও নিজেই মুখ দিয়েছে।

—কিন্তু ওর সঙ্গে কেউ ছিল?

স্ত্রী বললে—হ্যাঁ, প্রকাশ সঙ্গে ছিল, সে সাক্ষী আছে, সে নিজের চোখে দেখেছে—

হরনারায়ণ এ-কথার কোনও উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলেন না। তবে আরো যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরের দিনই কেষ্টগঞ্জের স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন।

এই সেই প্রকাশ রায়। এককালে এই প্রকাশ রায় যখন-তখন ছুট্ করে এই নবাবগঞ্জে আসতো। আসতো আর নবাবগঞ্জের মানুষজনদের কাছে রাজা-উজির মারতো। ভাগ্নেকে নিয়ে যাত্রা শুনতে যেত, কবির গান শুনে তারিফ করতো। ভাগ্নেকে গান শেখাতো, তামাক খেতে তালিম দিত। তা সে-সব অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর সেই নরনারায়ণ চৌধুরী মারা গেলেন, সেই দিদিও আর নেই। আর সেই ভাগ্নে সদানন্দও তখন নেই। ছিল মাত্র এক জামাইবাবু, এবার সেই জামাইবাবুও চলে গেল। প্রকাশ রায়ের সময় এখন খারাপ পড়েছে। সেই খারাপ-সময়ের সুরাহা করতেই প্রকাশ রায় আবার এসেছে রেলবাজারে।

সামনেই বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আগে এই রাস্তাটুকু বরাবর হেঁটেই মেরে দিয়েছে সে। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে। এখন গতরও আগের চেয়ে অনেক ভারি হয়েছে। সোজা বাসের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—নবাবগঞ্জে যাবে ভাই, নবাবগঞ্জে?

—নবাবগঞ্জে যাবে না। মবারকপুর থেকে হাঁসখালি চলে যাবে—

—মবারকপুর কত ভাড়া?

—কুড়ি পয়সা।

—কুড়ি পয়সা! কুড়ি পয়সায় এক কাপ চা, আর দুটো সিগারেটও হয়ে যেত। যাক্ গে, কপালে পয়সা নষ্ট আছে, কে খণ্ডাবে? ঠিক আছে, মবারকপুরেই নেমে যাবে সে। প্রকাশ রায় সুটকেসটা নিয়ে বাসে উঠে পড়লো।

মবারকপুরে বাস থেকে নেমে প্রকাশ রায় যখন নবাবগঞ্জে এল তখন আরো বেলা বেড়েছে। নবাবগঞ্জে সেদিন হাটবার। কিন্তু হাট বসতে বসতে সেই যার নাম বেলা দেড়টা। সকাল বেলার দিকে তেমন লোকজন থাকে না। কিন্তু যত বেলা বাড়ে তত চারিদিকের গ্রাম গঞ্জ থেকে ব্যাপারী-চাষা-খদ্দের এসে জোটে। আর আসে ভেনডাররা। কলকাতার কোলে-মার্কেট থেকে সোজা চলে আসে কেষ্টগঞ্জে। কেউ-কেউ নামে মদনপুরে, কেউ আড়ংঘাটায়, আবার কেউ বগুলায়। বেগুন, মুলো, পটল, কপি, কিম্বা আম-কাঁঠাল কিনে ঝুড়ি ভর্তি করে ট্রেনে চাপিয়ে সোজা শেয়ালদা। সেখান থেকে কোলে-মার্কেট।

তখন হাটে আসে ডাক-পিওন। আসে মবারকপুরের ডাক্তার কার্তিকবাবু। আসে কেষ্টগঞ্জ ইস্কুলের হেডমাস্টার। কেউ আসে সাইকেলে চড়ে, কেউ চলে আসে হেঁটে, আবার কেউ বা বাসে চড়ে। এক হপ্তার বাজারটা হয়ে যায় নবাবগঞ্জের হাট থেকে।

—সপ্তাহের ওই দিনটা শুধু হাট করার দিন নয়, পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করবার দিনও বটে। এ সেই নরনারায়ণ চৌধুরীর আদি আমল থেকেই এমনি চলে আসছিল। বলতে গেলে তিনিই এই হাট বসান এখানে। আগে নবাবগঞ্জের লোকজন বড়-হাট করতে যেত সেই রেলবাজারে আর নয়তো বাজিতপুরে। অবশ্য হাট করার রেওয়াজ তখন এত ছিল না। আলুটা রেলবাজার থেকে নিয়ে এলেই হতো। আলু আর কেরাসিন। বাকি শাক-পাতা-মাছ ওই নবাবগঞ্জের ঘরে বসেই মিলতো সকলের। মালো-পাড়া থেকে আসতো মাছ বিক্রি করতে। আর যার যার বাড়ির উঠোনে গজাতো শাক পাতা-কলা-মুলো। তখন কর্তাবাবু নতুন করে বাড়ি করেছেন। পাকা দোতলা বাড়ি। কৃষাণ খাতক ব্যাপারী মহাজন দর্শনার্থী প্রার্থী নানা লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। নবাবগঞ্জের নামধাম হয়েছে এ দিগরে। তিনি বললেন,—এ কী কথা, নবাবগঞ্জে হাট নেই, এটা তো ভালো কথা নয়! দশটা গ্রামে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানান্ দিয়ে দিলেন যে, এবার থেকে প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবারে নবাবগঞ্জের বারোয়ারি-তলায় হাট বসবে। ব্যাপারীরা যারা হাটে বেচা-কেনা করতে আসবে, জমিদার তাদের কাছ থেকে কোনও তোলা নেবেন না, ব্যাপারীদের কাজ-কারবারে সব রকমের সুবিধে দেওয়া হবে।

যতদিন কর্তাবাবু ছিলেন ততদিন তিনি দেখে গেছেন নবাবগঞ্জের শনি-মঙ্গলবারের হাট বেশ জমজমাট হয়ে চলছে। তারপর কর্তাবাবুর ছেলে হরনারায়ণের আমলেও হাট রমারম হয়ে উঠেছে। হাটে আরো ব্যাপারী আরো খদ্দের আরো দূর-দূর দেশ থেকে এসে জড়ো হয়েছে। সেই কর্তাবাবু আজ নেই, সেই কর্তাবাবুর ছেলে হরনারায়ণ চৌধুরীও আজ আর নেই। এমন কি হরনারায়ণ চৌধুরীর অত যে আদরের ছেলে, সেও আর নবাবগঞ্জে নেই। ওই হাটের দিন সদানন্দ আসতো দীনুর সঙ্গে, কৈলাস গোমস্তাও আসতো এক-একদিন। কৈলাস গোমস্তা আসা মানেই স্বয়ং হরনারায়ণ চৌধুরীর আসা। কৈলাস গোমস্তা হাটে এলে

কারো কোনও জিনিসের জন্যে দরদস্তুরের প্রয়োজন হতো না। অনেক সময় সঙ্গে কর্তাবাবুর নাতি। সদানন্দ আবদার ধরতো—কৈলাস কাকা, আমি বেলুন নেব—

রেলবাজার থেকে রবারের বেলুন নিয়ে এসে বেচছিল কপিল পায়রাপোড়া। আবদারের কথা শুনেই সে বললে—এই ন্যান্ গোমস্তা মশাই, খোকাবাবুর জন্যে বেলুন ন্যান্—

কৈলাস গোমস্তা বেলুন নিলে।

জিজ্ঞেস করলে—কত দাম রে কপিল?

কপিল পায়রাপোড়া বললে—দামের কথা বলে লজ্জা দেবেন না গোমস্তা মশাই, আমি খোকাবাবুকে এমনই খেলতে দিলুম—

—খেলতে দিলুম মানে? খোকাবাবু তোর কাছে ভিক্ষে নেবে নাকি? খোকাবাবুর পয়সার অভাব?

কপিল পায়রাপোড়া বললে—আজ্ঞে, বাবুদের খেয়ে পরেই তো আমরা বেঁচে আছি, খোকাবাবু খেলতে চেয়েছেন তাই দিলুম ওনাকে—

বেলুন পেয়ে মহাখুশী সে। দীনুমামা আর কৈলাস কাকার সঙ্গে সারা হাট ঘুরতে লাগলো বেলুন নিয়ে। সদানন্দ যেখানে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনও মাথার ওপর চলতে থাকে। সেই বেলুন নিয়েই কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বাড়ির ভেতর মাকে গিয়ে বেলুন দেখালে, চণ্ডীমণ্ডপে বাবাকে গিয়ে দেখালে। কাছারি বাড়িতে কর্তাবাবুকে গিয়ে দেখালে। যেন এক মহা সম্পত্তি পেয়েছে সে। বাড়িময় তার বেলুন নিয়ে খেলা। কিন্তু পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলে সেটা চুপসে গেছে। তখন শুরু হলো নাতির কান্না।

কর্তাবাবুর কানে কান্না যেতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—খোকা কাঁদে কেন রে? কী হয়েছে? মেরেছে নাকি কেউ?

দীনু বললে—আজ্ঞে, খোকাবাবুর বেলুন চুপসে গেছে...

শেষ জীবনে কর্তাবাবু নাতি-অন্ত প্রাণ হয়ে গিয়েছিলেন। যে বায়না ধরতো তাই-ই যোগান দিতেন। কখনও বেলুন, কখনও পাখি, কখনও ঘুঁড়ি, কখনও সাইকেল। সুদখোর মানুষ কারো সুদের একটা পয়সা ছাড়তেন না। কিন্তু নাতির জন্যে যত টাকাই হোক তাঁর খরচ হওয়াটাকে খরচ বলে কখনও মনে করতেন না।

বলতেন—আহা, ছোটো ছেলে, আবদার ধরেছে, দাও না ওকে কিনে—

বাবা বলতো—আদর দিয়ে দিয়ে কর্তাবাবুই খোকার সর্বনাশ করবেন দেখছি—

তা কান্নাকাটির কারণ শুনে কর্তাবাবু তখনই লোক পাঠালেন রেল-বাজারে। দীনু গেল সেখানে। নাতির আবদার রাখবার জন্যে একটা লোক পাঁচ ক্রোশ হেঁটে দু-পয়সার একটা বেলুন কিনে নিয়ে এল। তখন নাতি ঠাণ্ডা। তখন আবার তার মুখ দিয়ে হাসি বেরোল। তখন আবার সেই বেলুন নিয়ে সারা বাড়িময় মাতামাতি চললো।

কর্তাবাবুর কাছে দীনু আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—এনেছিস, বেলুন এনেছিস?

দীনু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—খোকাকে দিয়েছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দিইছি—

—কত দাম নিলে?

—আজ্ঞে দু'পয়সা।

—দু'পয়সা!

দু'পয়সা দাম শুনেই চমকে উঠলেন কর্তাবাবু। বললেন—সেদিন কপিল পায়রাপোড়া যে কৈলাসের কাছে চার পয়সা নিয়েছিল!

তবু সন্দেহ হলো। হিসেবের খাতাটা বার করে দেখে নিলেন। হাটে যা কিছু কেনা-কাটা হতো তার হিসেব দিতে হতো কর্তাবাবুর কাছে। তিনি সেগুলো নিজের হাতে লিখে সিন্দুকের মধ্যে খাতাটা রেখে দিতেন। হিসেবের খাতায় স্পষ্ট লেখা হয়েছে কপিল পায়রাপোড়ার কাছে চার পয়সা দিয়ে খোকার জন্যে বেলুন কেনা হয়েছে। ডাকলেন—কৈলাস? কৈলাস কোথায় গেল?

কৈলাস গোমস্তা এল। কর্তাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কৈলাস সেদিন কপিল পায়রাপোড়ার কাছে তুমি বেলুন কিনেছিলে ক'পয়সা দিয়ে?

—আজ্ঞে, আপনাকে তো আমি খরচের হিসেব দিয়েছি।

কর্তাবাবু বললেন—তুমি বলেছ চার পয়সা। আমার খাতাতেও তাই-ই লেখা রয়েছে। কিন্তু আজ দীনু রেল-বাজার থেকে খোকার জন্যে আর একটা বেলুন কিনে এনেছে—সেটা দু'পয়সা নিয়েছে। কপিল পায়রাপোড়া লোকটা তো দেখছি চোর। আমাকে দু'পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছে। এ কি মগের মুলুক পেয়েছে! আমার পয়সা কি সস্তা ভেবেছে সে!

কৈলাস গোমস্তা সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে হুজুর, কী আর বলবো, আজকাল পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস নেই, সব বেটা চোর।

কর্তাবাবু বললেন—তা চোর বললে তো আমি শুনবো না, চুরি করতে হয় অন্য কারো বাড়িতে সিঁধ কাটো, তা বলে আমার বাড়িতে? সে পেয়েছে কী? ভেবেছে আমি ধরতে পারবো না? আমি বোকা? আর আমার পয়সা বুঝি পয়সা নয়? আমাকে বুঝি মুখে রক্ত উঠিয়ে টাকা উপায় করতে হয় নি?

তারপর একটু থেমে বললেন—ওর কাছে জমি-জমা কী আছে আমার?

কৈলাসের হিসেব সবই মুখস্থ থাকে। বললে—বিলের ধারে এক লপ্তে তিন বিঘে ওর ভাগে আছে, আর ওর কাকার ভাগে বাকি সাত বিঘে—

—ওর আর কী-কী সম্পত্তি আছে?

—সম্পত্তি বলতে ওই আমাদের তিন বিঘে জমিই ওর ভরসা। ওতে ওর সারা বছর চলে না। মা-ষষ্ঠীর কৃপায় আবার ওর সংসারও অনেক বড়। একটা বউ মরে যাবার পর আবার নতুন করে একটা বিয়েও করেছে। ও-পক্ষের তেরটা আণ্ডা-গ্যাণ্ডা, তার ওপর এ পক্ষেরও একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি—

কর্তাবাবু বললেন—তাহলে তো খুব কষ্টেসৃষ্টে চালায়। খাজনা ঠিক সন্-সন্ দিয়ে যাচ্ছে তো?

—আজ্ঞে, দিতে পারবে কী করে? দু'এক সন মাঝে-মাঝে বাকি পড়েও যায়। খুব ধমক-টমক দিলে তখন গরু-বাছুর বেচে জমিদারের পাওনা-শোধ করে কোনও রকমে। সেইজন্যেই তো হাট-বারে কখনও বেলুন কখনও বিস্কুট-ল্যাবেনচুষ নিয়ে বসে, তাতে যা দু'পয়সা হয়—

কর্তাবাবু বললেন—তা বলে আমাকে ঠকাবে? আমারই খাবে পরবে আবার আমাকেই ঠকাবে? এ তো ভালো কথা নয়। তুমি ওর জমি খাস করে নাও—

—খাস করে নেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খাস করে নেবে! আমি অত দয়ার অবতার হতে পারবো না। আমার অত পয়সা নেই। আজই খাস করে নেবে—বুঝলে?

তা সেইদিনই খবর গেল কপিল পায়রাপোড়ার কাছে। সে তখন সারা দিনের খাটুনির পর তার বাড়ির চাতরায় ভাত খেতে বসেছে। খবরটা শুনেই খাওয়া তার মাথায় উঠলো। খাওয়া ফেলে তখনই ছুটলো কাছারিতে। কৈলাস গোমস্তা তাকে বললে—তা আমি কী করবো বাপু, আমার কি জমি? যাঁর জমি তিনি যদি হুকুম করেন তো আমি কী করতে

পারি? তুই কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে তোর আর্জি পেশ কর গে—

কপিলের তখন মাথায় বজ্রাঘাত। বললে—আপনিই সব গোমস্তা মশাই, আপনি বললে কর্তাবাবু জমি ফিরিয়ে দেবেন। ওই জমিটুকু চলে গেলে আমি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে খাবো কী? আমার সংসার চলবে কী করে?

একটা পাঁচ ফুট লম্বা পুরুষ-মানুষ যে অত গলা ফাটিয়ে হাউ হাউ করে কান্নাকাটি করতে পারে না দেখলে সদানন্দ কল্পনাও করতে পারতো না। বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই জানতে পারলো কপিল পায়রাপোড়ার জমি কর্তাবাবু খাস করে নিচ্ছেন। কিন্তু কেন খাস করে নিচ্ছেন তা কেউ জিজ্ঞেস করলে না। সবার কাছেই যেন জিনিসটা স্বাভাবিক। এ তো হবারই কথা। জমিদারের হক্ আছে জমি খাস করে নেবার। তা সে অন্যায় করুক আর না করুক। খাজনা দিক আর না দিক। আমার মর্জি হয়েছিল তাই তোমায় জমি চাষ করতে দিয়েছিলুম। আবার এখন মর্জি হয়েছে, এখন তোমার কাছ থেকে জমি কেড়ে নেব। জমির মালিক তুমি, না আমি?

সদানন্দ দীনুমামার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—দীনুমামা, কপিলকে মারছে কেন দাদু?

দীনুমামা বললে—মারবে না? কপিল যে কর্তাবাবুকে ঠকিয়েছে!

—ঠকিয়েছে? কী করে ঠকালো?

—দু'পয়সার বেলুন কেন চার পয়সায় সে বিক্রি করেছে? সেই একই বেলুন আমি রেলবাজার থেকে যে দু'পয়সায় কিনে এনেছি—

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে—কই, বেলুন তো কপিল বেচে নি। আমি বেলুন নেব বলে আবদার ধরেছিলুম বলে ও তো মাগনা দিয়ে দিলে। পয়সা তো নেয় নি ও। আমি নিজের চোখে যে দেখেছি, আমি তো তখন হাটে ছিলুম—

কিন্তু দীনুর কাছ থেকে কোনও প্রতিকার পাবে না জেনে আর সেখানে অপেক্ষা করলে না। একেবারে সোজা দাদুর ঘরে গিয়ে পৌঁছোল। সেখানে তখন বীভৎস কাণ্ড চলছে। ঘরের মধ্যে দাদু নিজের লোহার সিন্দুকটার পাশে বসে আছে, আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কৈলাস কাকা। আর তাদের সামনে বংশী ঢালী কপিল পায়রাপোড়ার মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে আছে আর বলছে—বল্, কর্তাবাবুকে কেন ঠকালি বল্—

কিন্তু কপিল বলবে কী? তাকে কথা বলবার ফুরসৎই দিচ্ছে না বংশী ঢালী। এক হাতে চুলের ঝুঁটি ধরে অন্য হাতে পটাপট্ মুখে ঘুষি মেরে চলেছে—। আর দাদু বংশীকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে—মার মার বেটাকে, মেরে ফেল্, আমার সঙ্গে শয়তানি, আরো মার—

সদানন্দ আর থাকতে পারলে না। একেবারে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো দাদুর সামনে। বললে—দাদু, ওকে মারছো কেন? ও তো বেলুনের দাম নেয় নি, অমনি দিয়েছে। ওই তো কৈলাস কাকা জানে, কৈলাস কাকাকে জিজ্ঞেস করো না—ও কৈলাস কাকা, তুমি বলছো না কেন, ও কৈলাস কাকা—

কিন্তু কর্তাবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন নাতির কথায়। প্রথমটায় তিনি যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন—আরে, এখানে তুই এলি কেন? ও দীনু, দীনু কোথায় গেলি? ও দীনু, খোকাকে এখানে আসতে দিলি কেন, ওরে দীনু ওকে নিয়ে যা এখন থেকে—

সদানন্দ নাছোড়বান্দা। বললে—আমি যাবো না এখান থেকে, আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও—

সদানন্দও যাবে না, কর্তাবাবুও ছাড়বে না। ততক্ষণে দীনু এসে গেছে। এসে জোর করে হাত ধরে টানতে টানতে চ্যাংদোলা করে সদানন্দকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। কিন্তু তখনও ঘরের ভেতর থেকে কপিলের কান্নার আওয়াজ তার কানে আসছিল।

এ-সব কতকালকার আগেকার কথা। তবু সদানন্দর যেমন মনে আছে, নবাবগঞ্জের সেকালের যারা আজো বেঁচে আছে তাদেরও মনে আছে। মনে আছে শেষকালে ছেলে-মেয়ে-বউকে খেতে না দিতে পেরে সেই কপিল পায়রাপোড়া একদিন নবাবগঞ্জ থেকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেউ টের পেলে না। কপিল পায়রাপোড়ার কাকা প্রথমে কিছুদিন তার ছেলে-মেয়েদের দেখেছিল। তারপর দেখা গেল একদিন ওই বারোয়ারি-তলার বটগাছের ডালে কপিলের ধড়টা ঝুলছে। একটা গরু-বাঁধা দড়ি দিয়ে গলাটা বেঁধে কখন হয়ত ঝুলে পড়েছিল কেউ দেখতে পায় নি।

তারপর পুলিস-থানা-দারোগা-কোর্ট-কাছারি অনেক কিছু হলো তাই নিয়ে। আবার সে ঘটনার ঢেউ একদিন থেমেও গেল। কিন্তু সদানন্দর মন থেকে তা আর মুছলো না।

এ-সব ছোটখাটো ঘটনা। কিন্তু ছোটখাটো ঘটনাগুলোই সদানন্দর মনের ভেতরে জমে-জমে পাহাড় হয়ে উঠতে লাগলো। প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে, তুই কী ভাবিস রে এত?

তখন সদানন্দ একটু বড় হয়েছে। বলতো—আচ্ছা মামা, তোমার এই সব ভালো লাগে?

প্রকাশ মামা তো অবাক। সে শুধু জানে ফুর্তি করা আর খাওয়া-দাওয়া হই-হুল্লোড় করে কাটিয়ে দেওয়া। ভালো খাও, ভালো পরো, দু'হাতে টাকা উপায় করো আবার দুই হাতে সেই টাকা খরচ করো। ভাগ্নের কথা শুনে বললে—কী ভালো লাগে?

সদানন্দ বললে—এই তুমি যা করো সারাদিন?

—আমি সারাদিন কী করি?

—এই আরাম করে খাও, বারোয়ারিতলায় গিয়ে আড্ডা দাও, তাস খেলো, তারপর গাণ্ডে-পিণ্ডে খাও। খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও, তারপরে ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যেবেলা এ-গাঁ ও-গাঁ করে বেড়াও ; আর তারপর রাত্তিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ো।

প্রকাশ মামা বললে—আমি যা করি এ তো সবাই করে রে। কেন, এতে দোষটা কী? আমি চুরিও করছি না কারো, বাটপাড়িও করছি না। আমার বাপ-কাকা-জ্যাঠা চোদ্দ পুরুষ চিরকাল এই জিনিসই করে এসেছে, আবার আমিও তাই করবো। আবার তুইও যখন বড় হবি তখন তুইও তাই করবি। এই-ই তো নিয়ম রে—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার যে ও-সব করতে ভালো লাগে না মামা। জানো, কপিল পায়রাপোড়াকে তুমি চিনতে?

—কপিলকে? সেই শয়তানটাকে? চিনবো না? ব্যাটা এক নম্বরের আহাম্মক ছিল একটা। শেষকালে তাই অপঘাতে মরতে হলো। যেমন কম্ম তেমনি ফল!

সদানন্দ বললে—দেখ প্রকাশ মামা, আজকাল সবাই তার কথা ভুলে গেছে। আমার বাবা-মা কারোরই হয়ত মনে নেই। আমার দাদুরও হয়ত মনে নেই তার কথা। ওই বারোয়ারীতলায় যখন সে আত্মঘাতী হলো সবাই-ই তা দেখেছে। দেখে সবাই-ই শিউরে উঠেছে। কিন্তু আজকে আর কারো সে-কথা মনে নেই, জানো—

প্রকাশ মামা হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই তো দেখছি একটা আস্ত পাগল রে, অত কথা মনে রাখতে গেলে মানুষের চলে! সংসারে একদিন তো সবাই মরবে। সকলেরই বাবা মরবে, ঠাকুর্দাদা মরবে, মা মরবে। প্রথম প্রথম লোকে সেজন্যে একদিন

কাঁদবে। কিন্তু তারপর? তারপর বেশি কান্নাকাটি চালিয়ে গেলে সংসার চলে? আমার তো বাবা-মা যাবার পর খুব কেঁদেছিলাম, তা এখন কি আর কাঁদছি? আমায় কাঁদতে দেখেছিস কখনও সেজন্যে? তুই যে আমাকে অবাক করলি সদা!

সদানন্দ বললে—কিন্তু মামা, আমি কেন কিছুই ভুলতে পারি না। আমার কেন সব মনে থাকে? কপিল পায়রাপোড়ার কথা আমার সব সময়ে যে মনে পড়ে। রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে ভাবি, দিনের বেলা ইস্কুলে পড়তে পড়তে ভাবি, ভাত খেতে খেতে ভাবি...

প্রকাশ মামা ভাগ্নের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। বললে—এই রে খেয়েছে...

সদানন্দ বললে—কেন? কী করলুম আমি?

—তোর তো দেখছি মাথা খারাপের লক্ষণ! এ তো ভালো কথা নয়! ডাক্তার দেখাতে হয়—

সদানন্দ বললে—কিন্তু সে তো কোনও দোষ করে নি মামা। তাকে যে দাদু মিছিমিছি মারলে। বংশী ঢালীকে দিয়ে বেকসুর অপমান করলে। সে তো কিছুছু করে নি—

প্রকাশ মামা যেন সব ভেবে-চিন্তে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এসেছে। বললে—নাঃ, এবার জামাইবাবুকে তোর বিয়ের কথা বলতে হবে দেখছি!

—বিয়ে? বিয়ে আমি করবো না মামা।

—সে কী রে? তুই ঠাকুর্দার সবে-ধন নাতি, বাপের চোখের মণি একমাত্র ছেলে। বিয়ে করবি না? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? জানিস তোর মতন পাত্তোর পেলে মেয়ের বাপরা লুফে নেবে?

সদানন্দর ও-সব কথা ভালো লাগতো না। বিকেল বেলা যখন ইস্কুল থেকে হেঁটে-হেঁটে আসতো, এক-একদিন শীতের দিনে বাড়ি আসতে আসতে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতো। তখন মনে হতো কে যেন তার পেছনে-পেছনে আসছে। শুক্নো পাতার ওপর হাঁটতে যেমন মড়-মড় শব্দ হয় তেমনি শব্দ করতে করতে তার পিছু পিছু আসছে কেউ। অনেক দিন মনে হয়েছে গাঁয়েরই কোনও লোক ক্ষেত-খামার থেকে ফিরছে। কিংবা কোনও বাড়ির বউ গাঙ থেকে জল নিয়ে ফিরছে। না, তা নয়, অনেক সময় রাস্তার আশেপাশে-সামনে-পেছনে-কাছে-দূরে কেউ-ই থাকে না, অথচ কে যেন তার পেছনে-পেছনে হাঁটে।

একদিন ধরে ফেলেছিল। লোকটা একেবারে আসতে আসতে তার গায়ে এসে পড়েছিল। সদানন্দ চম্‌কে উঠেই চেঁচিয়ে উঠেছে—কে?

—আমি!

'আমি' কথাটা কেউ বললে কিনা বুঝতে পারলে না সে। কিংবা হয়ত তার নিজের মনের আতঙ্কটাই শব্দ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। এক মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সেই অদৃশ্য হওয়ার আগেই যেটুকু দেখতে পেলে তাতে মনে হলো সে আর কেউ নয়, সে হলো কপিল পায়রাপোড়া।

ঘটনাটা প্রকাশ মামাকে বলতেই প্রকাশ মামা আর দেরি করলে না। সোজা জামাইবাবুর কাছে চণ্ডীমণ্ডপে চলে গেল। বললে—জামাইবাবু, সদার বিয়ে দিতে হবে—

—বিয়ে! জামাইবাবু কথাটা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দিদিও তেমনি। বিয়ে তো সদার দিতেই হবে। তা বলে এখনি? এত তাড়াতাড়ি?

প্রকাশ বললে—বিয়ে না দিলে তোমার ছেলে শেষকালে সন্নিসী হয়ে বনে চলে যাবে, তখন ঠ্যালা বুঝবে—

তা প্রকাশের কথায় কেউ কান দেয় নি। গরীবের কথায় প্রথমে কেউ কান দেয়ও না তেমন। তাই কথায় আছে গরীবের কথা বাসি হলে তবে লোকে তার দাম দেয়। শেষকালে

কর্তাবাবু যখন কথাটা তুললেন তখন সকলের টনক নড়লো। আর কর্তাবাবুর তখন দুটো পা-ই পড়ে গেছে। একেবারে পঙ্গু। সিন্দুকটার কাছে শুয়ে শুয়েই দৈনন্দিন কাজকর্ম চালান। তাঁর ইচ্ছে চোখ বোজবার আগে তিনি নাতির ছেলের মুখ দেখে যেতে চান। দেখে যেতে চান যে তাঁর বংশের ধারা অক্ষয় হয়ে রইল।

কথাটা শালাবাবুর কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠেছে। দিদির টাকায় সে বসে বসে খায় আর তার বদলে একটু কিছু উপকারও করতে পারবে না? দিদির উপকার করবার সুযোগ পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল।

বললে—কুছ পরোয়া নেই, কী রকম পাত্রী চাই সেইটে শুধু আমায় বলে দাও—

কর্তাবাবুর হুকুম পাত্রী হবে ডানা-কাটা পরী। ডানা-কাটা পরী মানে পরীর মতন দেখতে শুনতে বলতে কইতে হওয়া চাই, শুধু পরীদের যে ডানা থাকে সেটা থাকবে না।

—আর?

—আর পরীর মতন উড়লে চলবে না।

প্রকাশ বললে—তা ডানাই যদি না থাকে তো উড়বে কেমন করে? আর যদি উড়তে চায় তো তুমি না হয় তার পায়ে শেকল লাগিয়ে দিও।

দিদি হাসতে লাগলো। বললে—আজকালকার মেয়ে কি শেকল মানবে ভাই?

হয়ত শ্বশুর-শাশুড়ীকেই মানতে চাইবে না। এ তো আর আমাদের কাল নয়। আমাদের দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তখন কোমর থেকে কাপড়ের কষি খুলে যেত, শাশুড়ী তাই শেষকালে গেরো দিয়ে বেঁধে দিত তবে লজ্জা রক্ষে হতো—

প্রকাশ বললে—তাহলে সেই রকম দশ বছরের মেয়েই এনে দেব—তুমি যেমন অর্ডার দেবে, তেমনি বউ পাবে—

দিদি বললে—তাই দে ভাই, নইলে কর্তাবাবু আবার কবে আছেন কবে নেই, একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির কর্ তুই—

তা শেষ পর্যন্ত সেই রকম মেয়েই পাওয়া গেল। বয়েসও কম, দেখতেও ডানা-কাটা-পরী। আরও একটু বয়েস কম হলে অবশ্য ভালো হতো। কিন্তু ঠিক তোমার অর্ডার মাফিক পাত্রী কোথায় পাবো? তাহলে তো কুমোরকে ডেকে ফরমায়েশ করতে হয়। কৃষ্ণনগরের কাছে বাড়ি। বাপ পণ্ডিত। সংস্কৃত শাস্ত্র জানা মানুষ। স্বামী আর স্ত্রী, আর সংসার বলতে ওই একটি মেয়ে। সেকালে পূর্বপুরুষকে দেওয়া রাজাদের দু'শো বিঘের মত জমি-জমা আছে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার। নগদ কিছু দিতে পারবো না। যদি মেয়ে পছন্দ হয় তো রাঙা সুতো হাতে দিয়ে নিয়ে যান। তারপর মেয়ের ভাগ্য আর ঈশ্বরের ইচ্ছে।

এই-ই হলো নয়নতারা। এ গল্পের আসামী সদানন্দ চৌধুরীর স্ত্রী। আমাদের নায়িকা।

প্রকাশ রায় এই নতুন বিয়ের কনে নয়নতারাকে নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই একদিন নবাবগঞ্জে এসেছিল। নবাবগঞ্জের জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি যেতে গেলে এই বারোয়ারিতলার হাটের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। এই রাস্তা দিয়েই একদিন নয়নতারা চৌধুরীবাড়ির বউ হয়ে এসেছিল, আবার ঠিক সেই বধূ বেশেই এই রাস্তা দিয়েই চলে গিয়েছিল। এই রাস্তা দিয়েই একদিন সেকালের এক সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী পরিবারে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি এসে উদয় হয়েছিল, আবার নয়নতারার সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তা দিয়েই তা অস্ত গিয়েছিল চিরকালের মত। এই-ই সেই চিরকালের উদয়-অস্তের শাশ্বত পথ, সেই রেলবাজার থেকে নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলার হাট পর্যন্ত। এবার সেই ঘটনার কতকাল পরে প্রকাশ রায় আবার উদয় হলো এই নবাবগঞ্জে। মোবারকপুরে বাস থেকে নেমে পায়ে হাঁটা পথে। এখন আর আগেকার সেই মোবারকপুর নেই। সেই মোবারকপুর কেন, সেই

নবাবগঞ্জও নেই। নবাবগঞ্জে চৌধুরীদের সেই বাড়িটাও আর চৌধুরীদের নেই। নরনারায়ণ, হরনারায়ণ, চৌধুরীবাড়ির গিন্নি, প্রকাশ রায়ের দিদি, তারাও কেউ নেই। একদিন রেলবাজারের পাটের আড়তদার প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই জলের দরে অত বড় তিনমহলা বাড়িটা কিনে নিলে। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ শা'ও তা রাখতে পারলে না। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি, বিশেষ করে বসতবাড়ি কিনতে নেই। এমন কি জলের দরে পেলেও না। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই সে-কথা শুনলে না। ভাবলে ভারি লাভ করলুম! কিন্তু এখন? সেই প্রাণকৃষ্ণ শা'ও একদিন জন্মাষ্টমীর দিন সাপের কামড়ে অপঘাতে মরলো। তার পর থেকে সেই চৌধুরীবাড়ি এখন ভুতের বাড়ি হয়ে খাঁ খাঁ করছে। দিনের বেলাতেও লোকে সেদিকে মাড়াতে ভয় পায়। বলে—ও-বাড়িতে ব্রহ্মদত্যির অভিশাপ আছে, ওদিক মাড়িও না—

পাশের দোকানঘর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো—মশাই-এর কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

প্রকাশ রায় সুটকেসটা নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। বললে—আমি আসছি ভাগলপুর থেকে। এই নবাবগঞ্জ এসেছি একটা কাজে—

—এখানে কার বাড়িতে যাওয়া হবে?

প্রকাশ রায় বললে—কারো বাড়িতে যাবো না, আমি এসেছি সদানন্দর খোঁজে, সদানন্দ চৌধুরী—

সদানন্দ চৌধুরীর নামটা উচ্চারণ করতেই দোকানের আশেপাশে যারা ছিল তারা কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। এ কোথাকার লোক! কী এর পরিচয়। সদানন্দ চৌধুরীর খোঁজ করে, এ তো সাধারণ লোক নয় হে!

চৌধুরী-মশাই চলে যাবার পর নবাবগঞ্জে কেউ তো সদানন্দ বেঁচে আছে কিনা, খেতে পাচ্ছে কিনা সে-খোঁজও কখনও নেয় নি।

—তা আপনি এতদিন পরে সদার খোঁজ করছেন কেন?

—জিজ্ঞেস করতে এসেছি সে কোথায় আছে আপনারা জানেন কিনা। আমাকে তার সন্ধান দিতে পারেন কিনা। তাকে আমার বড় দরকার—

পরমেশ মৌলিক এতক্ষণ একমনে হুঁকো টানছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন—আপনার নিবাস?

প্রকাশ বললে—ভাগলপুর। আমি হচ্ছি সদানন্দর মামা—

—প্রকাশ মামা? শালাবাবু? তাই বলুন, এতক্ষণ বলেন নি কেন? বসুন বসুন, তা এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? চুল পেকে গেছে। ওঃ কতকাল পরে দেখা হলো। তা চৌধুরী-কর্তা কেমন আছেন?

চৌধুরীমশাই মানে হরনারায়ণ চৌধুরী। প্রকাশ রায় বললে—জামাইবাবু গেল হপ্তায় মারা গেছেন।

মারা যাওয়ার খবর শুনেই সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—মারা গেছেন?

পরমেশ মৌলিক হরনারায়ণ চৌধুরীর কাছারিতেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। খবরটা শুনে তিনি সকলের চেয়ে বেশি চমকে উঠলেন। বললেন—সে কী? মারা গিয়েছেন? শেষকালে কী হয়েছিল?

প্রকাশ রায় বললে—তেমন কিছুই হয় নি, বেশ ভালোই ছিলেন। ক'দিন ধরে দেখছিলুম তিনি বাইরে বেরোচ্ছিলেন না, একদিন ঘরের দরজা খুলে দেখি তিনি মরে পড়ে আছেন। কেউ জানতেও পারি নি আমরা...

নতুন লোকের আমদানি দেখে ততক্ষণে আরো কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছিল।

হরনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যুর খবর শুনে অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেললে। অনেকেই তাঁকে দেখেছে। যারা দেখে নি তারা নাম শুনেছে। চৌধুরী-বংশের কাহিনী শুনেছে। সেই হরনারায়ণ চৌধুরীর মর্মান্তিক পরিণতির বর্ণনা শুনে সবার মুখ দিয়েই অজান্তে একটা 'আহা' শব্দ বেরিয়ে এল। এমনিই হয় গো। যত বড়লোকই হও, সকলের পরিণতি ওই মৃত্যুতে। ওর থেকে কারোর মুক্তি নেই। এই পুরোন কথাটাই যেন আবার সকলের নতুন করে মনে পড়ে গেল।

প্রকাশ রায় বললে—তা এখন সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমি এসেছি সদাকে খুঁজতে। কোথায় গেলে তাকে পাই বলতে পারেন? কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখানে তারাও তার কোনও সন্ধান জানে না, তাই নবাবগঞ্জে এলাম, এখন এর পর কোথায় গেলে তাকে পাবো তাও বুঝতে পারছি না—

পরমেশ মৌলিক বললেন—সদা কি আর বেঁচে আছে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। শেষকালের দিকে তার অবস্থা বড় খারাপ হয়েছিল। একদিন মাত্র এসেছিল এ-গাঁয়ে—তাও সে অনেক কাল হলো—

—কেন?

নিতাই হালদার পাশেই দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে আর থাকতে পারলে না। বললে—কেন ভালো থাকবে? আপনারা কি তার কোনও খোঁজখবর নিয়েছিলেন? নিজের বাপ যাকে দেখতো না, সে কী করে ভালো থাকবে? তাকে কি কেউ খেতে পরতে দিত? এখন তার বাপ মারা গেছে, তাই সম্পত্তির লোভে তার খোঁজখবর নিতে এসেছেন আপনারা! কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন?

পরমেশ মৌলিকও তাই বললেন—হ্যাঁ শালাবাবু, শেষকালের দিকে সদার বড় কষ্টে দিন কেটেছে—অত বড় বংশের ছেলে, তার কিনা এই দশা। শেষকালে একটা যাত্রার দল এসেছিল গাঁয়ে, তাঁদের পেছন পেছন সে চলে গেল—

প্রকাশ রায় যেন এতক্ষণে খানিকটা সুরাহা পেলে। বললে—যাত্রার দলের সঙ্গে? কোথায় গেল তাদের সঙ্গে?

—তা কি ছাই দেখেছি? যাত্রার দল কি আর এক জায়গায় বসে থাকে শালাবাবু? তারা তো ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। আজ আছে হুগলী, কালই হয়ত আবার চলে গেল আসামের দিকে—

—তবু একটা আপিস তো আছে তাদের কোথাও। যাত্রাদলের নামটা জানতে পারলেও না হয় তাদের হেড-অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে পারি—

পরমেশ মৌলিক বললেন—কত যাত্রার দলই তো আসে! ও যাদের সঙ্গে গিয়েছিল তাদের নামটা ঠিক মনে ঠিক মনে পড়ছে না।

তারপর অন্য যারা আশেপাশে ছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা জানো নাকি হে কেউ নামটা?

নিতাই হালদার পাশেই ছিল। সে আর থাকতে পারলে না। বললে—তা এতদিন কোথায় ছিলেন আপনারা শালাবাবু? এতদিন তো আপনারা একবারও তার খোঁজ নিতে আসেন নি? এখন চৌধুরী মশাই মারা গেছেন তাই তাঁর অগাধ টাকার ওয়ারিশানকে খুঁজে বার করতে এসেছেন। আমরা সব বুঝতে পেরেছি—

প্রকাশ রায় কথাগুলো শুনে যেন কেমন চুপসে গেল।

নিতাই হালদার তবু থামলো না। বলতে লাগলো—চৌধুরী মশাই-এর লাখ লাখ টাকা এখন সবই তো পাবে সদানন্দ, তাই তার জন্যে এখন আপনাদের এত দরদ উথলে উঠেছে,

না? তাই এখন খোঁজ পড়েছে তার। ভেবেছেন পাগল ভাগ্নেকে সামনে খাড়া করে টাকাগুলো নিজেদের পেটে পুরবেন। তা মতলোব আপনাদের খুবই ভালো শালাবাবু। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি, সদানন্দর যা হয় হোক, এতে আপনাদেরও কিন্তু কিছু ভালো হবে না। আপনাদের এ টাকা ভোগে আসবে না। কারণ এখনও আকাশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে, ভুলে যাবেন না মাথার ওপর ভগবান বলে এখনও একজন আছেন—

পরমেশ মৌলিক নিতাই হালদারকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—নিতাই তুই থাম—

নিতাই মুখফোঁড় ছেলে বরাবর। বললে—কেন থামবো খুড়োমশাই? আমি কি কিছু অন্যায় কথা বলেছি? এখানে তো আরো দশজন গাঁয়ের লোক আছে। সদানন্দকে কে না দেখেছে? সবাই জানে কত নাকাল হয়েছে আত্মীয়স্বজনের কাছে। নিজের বাপ যখন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এক মুঠো ভাত দিয়ে ছেলেকে বাঁচায় নি, তখন এই মামা তো এসে তাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দেন নি। যতদিন দিদি ছিল, যতদিন টাকা যুগিয়েছে, ততদিন খুব খাতির, ততদিন শালাবাবু ঘরের লোক, আর যেই দিদি মারা গেল আর উধাও—

প্রকাশ রায়ের কথাগুলো ভালো লাগলো না। সুটকেসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—আমি তাহলে উঠি—

নিতাই হালদার বললে—আমাদের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে না কিনা তাই উঠে যাচ্ছেন। কড়া কথা কারই বা শুনতে ভালো লাগে, বলুন?

প্রকাশ রায় আমতা আমতা করে বলতে লাগলো—না, মানে সদানন্দকে খুঁজতেই তো আমি এখানে এসেছিলাম, তা সে যখন এখানে নেই তখন অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখি গে—

নিতাই বললে—হ্যাঁ, অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করুন, খুঁজে বার করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলুন, তুলে জামাই-আদরে রেখে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে দিয়ে একটা যা-তা কাগজে সই করিয়ে নিন, তারপর তাকে লাথি-ঝাঁটা মেরে দূর করে দিন গে, কেউ কিছু জানতে পারবে না, মাঝখান থেকে জামাইবাবুর লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আপনাদের হাতে এসে যাবে—

সেদিন গ্রামের লোক যে-কথাগুলো বললে তার একটাও কিন্তু মিথ্যে নয়। সবাই জানতো হরনারায়ণ চৌধুরী শ্বশুরেরও অনেক টাকা পেয়েছিলেন। নবাবগঞ্জের অত সম্পত্তি সব কিছু বিক্রি করে যা পেয়েছিলেন সব নিয়ে গিয়ে তিনি ভাগলপুরে উঠেছিলেন। সদানন্দর ঠাকুর্দা মা, সবাই তখন মারা গেছে। নয়নতারাও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে তখন কেষ্টনগরে তার বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সমস্ত বাড়িটা যেন তখন রাতারাতি শ্মশান হয়ে গেছে। চৌধুরী মশাই এই নবাবগঞ্জে তখন সারা বাড়িতে একলাই কাটাতেন। আর সদানন্দ তখন কোথায় থাকতো কে জানে! কেউ তার কোনও খোঁজও রাখতো না।

ওই পরমেশ মৌলিক যেখানে বসে আছেন, এই বারোয়ারিতলার মাচার ওপর সদানন্দ অনেক দিন অনেক রাত কাটিয়েছে।

নিতাই হালদার জিজ্ঞেস করতো—ছোটবাবু, আপনি বাড়ি যাবেন না? রাত যে অনেক হলো?

তখন হরনারায়ণ চৌধুরী মশাই মস্ত বাড়িটাতে একলা থাকতেন। নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলা থেকে দেখা যেত চৌধুরীদের বাড়িটা। সারা বাড়িতে অসংখ্য ঘর। চারমহলা বাড়ি। দক্ষিণ দিকে সেই পুকুরটা। একেবারে বাড়ির লাগোয়া। পুকুর থেকে উঠতেই পাড়ের ওপর সার সার ধান চাল ডালের মরাই। পুকুর আর মরাই-র মাঝখানে অনেকখানি লম্বা

জায়গা জুড়ে শাক-সব্জির বাগান। লাউ-কুমড়ো-উচ্ছের মাচা। কয়েকটা পেঁপে গাছ, বেগুনের ক্ষেত। যখন চৌধুরী-বাড়ি জমজমাট ছিল তখন ওইখানে বাড়ির মেয়েদের শাড়ি শুকোতো সার সার। শুকোবার পর গৌরী পিসী এসে আবার বিকেলের দিকে সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে ভেতর-বাড়িতে যার যার ঘরে সাজিয়ে রেখে দিত। যখন রাত হতো তখন ও জায়গাটায় আর যেতে পারা যেত না। ভয় করতো। কিন্তু তার পাশেই ছিল গোয়ালঘর। সেই রাত্তির বেলা অনেকদিন সদানন্দ ওই পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের ওপর চুপ করে বসে থাকতো। তার মনে হতো পুকুরের জলের মধ্যে থেকে যেন কারা দল বেঁধে উঠে আসছে তার দিকে। মানুষের মত চেহারা তাদের, কিন্তু ঠিক যেন আবার মানুষও নয়।

কাছে আসতেই সদানন্দ ভয় পেয়ে যেত। চেঁচিয়ে বলে উঠতো—কে তোমরা? তোমরা কারা?

লোকগুলো হাসতো। বলতো—আমাদের তোমরা চিনতে পারবে না গো, আমাদের চিনবে না তুমি—

সদানন্দ বলতো—কিন্তু তোমরা এখানে কী করতে এসেছো? বাড়ির ভেতরে যাবে নাকি?

লোকগুলো আরো হেসে উঠতো। বলতো—আমরা সব জায়গায় যেতে পারি—

—কিন্তু তোমরা এখানে কী করতে এসেছ?

—দেখতে।

—কী দেখতে?

—দেখতে এসেছি তোমরা কেমন আছো! দেখতে এসেছি নবাবগঞ্জের সব মানুষ কেমন আছে!

—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—এই নবাবগঞ্জেই আমাদের বাড়ি ছিল একদিন। কিন্তু এখানে আর আমাদের কোনও বাড়ি নেই। এখন সব জায়গাতেই আমাদের বাড়ি, এখন আমরা সব জায়গাতেই যেতে পারি।

—তবে কি তোমরা ভূত?

লোকগুলো সদানন্দর প্রশ্ন শুনে হেসে উঠতো। বলতো—ভয় পাচ্ছো বুঝি? ভয় পেয়ো না। আমরা রোজ রোজ এখানে আসি, আমরা রোজ রোজ এখানে আসবো। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। এখানে আগে তো আসতে পারতুম না। আমরা চৌধুরী মশাই-এর কাছারি-বাড়িতে এসে এককালে তার সামনে হাতজোড় করে বসে থাকতুম। খাজনা মকুব করতে বলতুম। আগে আমরা ছিলুম কালীগঞ্জের জমিদারবাবুর প্রজা, পরে আমরা হলুম চৌধুরী মশাই-এর প্রজা। আমরা খরার সময় খাজনা দিতে পারি নি। যেবার ঝড়ে আমাদের বাড়ি পড়ে গিয়েছিল, আমরা চৌধুরী মশাই-এর ঝাড় থেকে বাঁশ কেটেছিলুম, তার জন্যে আমাদের নামে সদরের কাছারিতে ফৌজদুরি মামলা হয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর আমাদের জমি খাস হয়ে গিয়েছে, আমাদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এই দেখ, এর দিকে চেয়ে দেখ, এর গলায় কীসের দাগ দেখছো?

—কীসের দাগ?

সদানন্দ সেই অন্ধকারের মধ্যেই লোকটার গলার কাছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। অস্পষ্ট ছায়া সব। তবু মনে হলো সেখানকার ছায়াটা যেন আরো ঘন, আরো গভীর হয়ে উঠেছে।

—এ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

কথাটা শুনেই সদানন্দ আঁতকে উঠলো। গলায় দড়ি দিয়েছিল?

—হ্যাঁ, বারোয়ারিতলার বটগাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল।

—এর নাম কী?

—কপিল পায়রাপোড়া।

নামটা কানে যেতেই সদানন্দ একটা আর্তনাদ করে সেই ইঁট-বাঁধানো পৈঁঠের ওপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। কিন্তু কেউ তা টের পেলে না। সন্ধ্যেবেলা যখন হরিহরবাবু ছাত্রকে পড়াতে এসেছেন তখন খোঁজ পড়লো খোকাবাবু নেই। খুঁজে বার করো সদানন্দকে। হরিহরবাবু সেই তিন ক্রোশ দূর থেকে সাইকেল ঠেঙিয়ে রোজ নবাবগঞ্জে পড়াতে আসেন। সকলেরই সে-কথা জানা। বাড়িময় খোঁজ পড়লো। বড় অন্যমনস্ক ছেলে। খেয়ালী রকমের মানুষ। অনেক সময় ইস্কুল থেকে আসতে আসতেই কারো বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাদের ঘানি-গাছে চড়ে বসতো। তখন আর বাড়ির কথা ক্ষিধের কথা মনে পড়তো না। সেদিন সব জায়গায় খোঁজা হলো। চণ্ডীমণ্ডপে চৌধুরী-মশাই প্রজা পাঠকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন—কই, আমি তো দেখি নি তাকে। আমার কাছে তো কই আসে নি সে। তবে সে ইস্কুল থেকে এসেছিল তো? গৌরী পিসী নিজের হাতে তাকে মুড়ি-বাতাসা আর সন্দেশ খেতে দিয়েছে। তাহলে সে যাবে কোথায়? দীনুও ছুটলো বারোয়ারিতলায়, সেখানেও নেই। প্রকাশ মামা দিদির কাছে এসেছিল। বাইরে কোথায় ঘুরছিল। বাড়িতে এসেই শুনলো ভাগ্নেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার দৌড়লো বাইরে। যাবে কোথায় সে? উড়ে তো যেতে পারে না। দিদিকে বললে—কিছু টাকা দাও—

দিদি বললে—টাকা কী হবে রে?

প্রকাশ বললে—নানান জায়গায় যেতে হবে, টাকা হাতে থাকা ভালো, বুঝলে? সব সময় কিছু টাকা হাতে রেখে দিও, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সব সুরাহা হয়ে গেছে।

টাকা নিয়ে প্রকাশ রায় বেরোল। কিন্তু আসলে খুঁজে বার করলে গৌরী পিসী। গৌরী পিসী গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছিল ঘুঁটে আনতে। হঠাৎ চাঁদের আলোয় দেখতে পেলে কে যেন ঘাটের পৈঁঠের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। একবার যেন কীরকম সন্দেহ হলো। তারপর বললে—কে রে? কে রে ওখানে শুয়ে আছিস? কে তুই?

উত্তর না পেয়ে পায়ে-পায়ে কাছে গিয়ে দেখে খোকা। খোকাকে ওই অবস্থায় দেখে আর সেখানে দাঁড়ালো না। দৌড়তে দৌড়তে বাড়ির মধ্যে এসে খবর দিতেই সবাই দৌড়ে গেছে। চৌধুরী মশাইও চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে এলেন। প্রজা পাঠক যারা ছিল তারাও এলো। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে এসে তুললো ভেতর-বাড়িতে। তারপর ডাক্তার-বদ্যি আসার পর যখন তার জ্ঞান হলো সবাই জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছিল তোর? সন্ধ্যেবেলা ওখানে গিয়েছিলি কী করতে? ভয় পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—কে ভয় দেখিয়েছিল?

সদানন্দ বললে—কপিল পায়রাপোড়া।

এ-সব সদানন্দর জীবনের ছোটবেলাকার ঘটনা। প্রকাশ মামা যখন কেষ্টনগরে সদানন্দের পাত্রী দেখতে গিয়েছিল তখন এইসব কথাই উঠেছিল। বেয়াই মশাই সরল সাদাসিধে মানুষ। নবাবগঞ্জের চৌধুরী বাড়ির একমাত্র ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে শুনে তিনি খুব

খুশী হয়েছিলেন। সারা জীবন ইস্কুলে ছাত্রদের সংস্কৃত শিখিয়েছেন। কাকে বলে ধাতুরূপ তা জানেন। কাকে বলে ব্যাকরণ আর কাকে বলে অলঙ্কার তাও জানেন। খাওয়া-পরার কিছু ভাবনা যেমন ছিল না, তেমনি অভাবও ছিল না কিছু। তিনি বলতেন—অভাব বললেই অভাব। নইলে কোনও অভাব নেই আমার। আমি যদি কিছু না চাই তো আমার অভাব থাকবে কী করে? আমার তো ওই একটা মেয়ে নয়নতারা। নয়নতারাকে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে। নয়নতারার বিয়ের জন্যে তোমাদের কাউকে ভাবতে হবে না।

গৃহিণী বলতেন—কিন্তু তা বলে বিয়ের চেষ্টা তো করতে হবে—

ব্যকরণতীর্থ পণ্ডিত মানুষ ওই কালীকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি বলতেন—চেষ্টা করবার আমি কে বলো তো? যিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তাঁর যা মনোবাঞ্ছা তাই-ই হবে।

প্রকাশ মামা যখন নিজে সম্বন্ধটা নিয়ে গিয়েছিল তখন কালীকান্ত ভট্টাচার্য তাকেও সেই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমি কে বলুন? আর আপনিই বা কে? আমরা কেউ-ই কিছু নই। নিমিত্ত মাত্র। নয়নতারার মা আমাকে তাগিদ দেন। বলেন—মেয়ের বিয়ের জন্যে তুমি কিছু ভাবছো না। আমি বলি—মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমি ভাববার কে? যিনি ওঁকে আমার সংসারে পাঠিয়েছেন তিনিই ভাবছেন। তা দেখুন, কোথায় ছিলেন আপনি আর আমি কোথায় ছিলাম, হঠাৎ আপনি নয়নতারার সম্বন্ধ নিয়ে এলেন—আর এমন পাত্র পাওয়া তো আমার পক্ষে ভাগ্যের কথা রায় মশাই—

তারপর থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা আপনি হলেন পাত্রের কে?

—মামা!

—হরনারায়ণ চৌধুরী মশাই-এর শ্যালক আপনি?

—আজ্ঞে না। আমি হলাম চৌধুরী মশাই-এর গৃহিণীর মামার ছেলে। অর্থাৎ মামাতো ভাই। তবে আসলে বলতে গেলে নিজের ভাই-এর মতই। ছোটবেলা থেকে চৌধুরী মশাই-এর শ্বশুর কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় আমি তাঁর বাড়িতে ছেলের মতই মানুষ হয়েছি। তাই জন্যেই এত ঘনিষ্ঠতা। দিদি আমাকে বলে দিয়েছিল আমার ভাগ্নের জন্যে একজন ডানা-কাটা-পরীর মত পাত্রী চাই। তা অনেক খুঁজেছি। প্রায় শ'খানেক মেয়ে দেখেছি এ পর্যন্ত। আমার ভগ্নীপতির তো টাকার প্রয়োজন নেই, টাকা তাঁর অনেক আছে, কিন্তু তাঁর একমাত্র বাসনা পুত্রবধূটি যেন ডানা-কাটা-পরী হয়, আর কিছু নয়—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—তা আমার মেয়েকে কেমন দেখলেন?

প্রকাশ মামা বললে—ওই যে এক-কথায় বললাম ডানা-কাটা-পরী—

—আপনার পছন্দ হয়েছে?

প্রকাশ বললে—আপনার মেয়েকে যার অপছন্দ হবে সে হয় কানা আর নয় তো মিথ্যেবাদী।

কালীকান্ত ভট্টাচার্যের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। তিনি কী করবেন বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন—আপনি আর দু'টো সরভাজা নিন্ বেয়াই মশাই—

—তা দিন। খেতে আমার কোনও কালেই আপত্তি নেই। একবার সম্বন্ধটা হয়ে যাক তখন দেখবো আপনি আমাকে কত সরপুরিয়া সরভাজা খাওয়াতে পারেন—

কথাটা বলে প্রকাশও যত হাসতে লাগলো ভট্টাচার্য মশাইও তত। সঙ্গে সঙ্গে আরো সরপুরিয়া এলো, আরো সরভাজা। আরো কথা হলো, আরো হাসি। প্রথম দিনেই প্রকাশ মামা হাসিতে গল্পে পাত্রীর বাবার মন ভিজিয়ে দিলে। সেখান থেকে বেরিয়েই সোজা ট্রেনে উঠে একেবারে রেল-বাজারে নামলো। বারোয়ারিতলায় আসতেই লোকজন ধরলে। কী শালাবাবু, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

শালাবাবু বললে—ওহে, তোমাদের সব বলে রাখি, আসছে অঘ্রাণে সদার বিয়ে, এই পাত্রী পছন্দ করে এলুম। তোমরা সব যাবে, তোমাদের সব নেমন্তন্ন রইলো—

কথা শুনে সবাই অবাক। সদানন্দর বিয়ে। চৌধুরী মশাই-এর একমাত্র ছেলের বিয়ে।

—নেমন্তন্ন হবে সকলের, যাওয়া চাই কিন্তু—

কোথায় বিয়ে, কবে কোন্ তারিখে বিয়ে, তার ঠিক নেই, শুধু পাত্রী দেখলুম আর বিয়ে হয়ে গেল! বিয়ে কি অত সহজে হয়? আর তা ছাড়া যার বিয়ে সেই চৌধুরী-মশাই-এর ছেলেই তো বলে বিয়ে করবে না সে। রাস্তায় ঘাটে কত লোক সদানন্দকে দেখেছে। সকলের সঙ্গে নদীতে চান করবার সময়ও অনেকে জিজ্ঞেস করেছে—কীরে সদা, কাল কোথায় ছিলি তুই? সবাই যে তোর খোঁজাখুঁজি করছিল? কোথায় গিয়েছিলি?

সদানন্দ বলেছে—কালীগঞ্জে—

—কালীগঞ্জে? কালীগঞ্জে কী করতে?

—বেড়াতে।

কালীগঞ্জে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। আর বেড়াবার জায়গা পেলে না সদানন্দ, বেড়াতে গেল কি না কালীগঞ্জে! তার চেয়ে বারোয়ারি-তলায় নিতাই হালদারের দোকানের সামনে মাচায় তাস খেলতে এলেই হয়। কিম্বা 'নল-দময়ন্তী' থিয়েটার করছে ক্লাবের ছেলেরা সেখানে গিয়ে মহড়া শুনলেই হয়। তা নয়, একলা-একলা ক্ষেতে-খামারে ঘুরে বেড়ানো!

একজন বললে—এবার চৌধুরী মশাইকে বলবো তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে, তখন বাড়িতে মন বসবে তোর—

সদানন্দ বলেছে—আমি বিয়ে করবো না—

—বিয়ে করবি না তো এই এত জমি-জমা, এত টাকা-কড়ি কে খাবে?

—আমার দাদু খাবে, আমার বাবা খাবে।

—কিন্তু যখন তোর ঠাকুর্দা থাকবে না, তোর বাবা-মা কেউ থাকবে না, যখন তুইও থাকবি না, তখন কে খাবে?

সদানন্দ বলতো—তাহলে তোমরা আছো কী করতে? তোমরা খাবে!

—আমরা? আমরা খাবো? আমাদের কি অমন কপাল? অমন কপাল হলে তো আমরা বড়লোকের বাড়িতেই জন্মাতুম রে!

লোক হাসতো। চৌধুরী মশাই-এর ছেলের কাণ্ড দেখে সবাই হাসতো। বলতো—ছোটবেলায় অমন সবাই বলে হে! তারপর দেখবে যখন বড় হবে, বিয়ে হবে, সংসার হবে তখন ওর বাপ-ঠাকুর্দার মত বাকি খাজনার দায়ে আমাদের নামে আবার কাছারিতে গিয়ে নালিশ ঠুকে দেবে। ও-রকম অনেক দেখা আছে হে। অনেক দেখা আছে—

কিন্তু ক্রমে সেই সদানন্দর বয়েস হয়েছে, যাকে বলে সাবালক তাই-ই হয়েছে, স্কুল থেকে পাস করে কলেজে পড়তে গেছে, কিন্তু তখনও সেই একই রকম। আগেও যা ছিল পরেও তাই। তা সেই সদার এখন বিয়ে। বারোয়ারীতলার আড্ডায় রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। হরনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ির বিয়ে নয় তো যেন নবাবগঞ্জের সমস্ত লোকেরই বাড়ির বিয়ে। গ্রামসুদ্ধ লোকই কোমর বেঁধে লেগে গেল আলোচনা করতে। কোথা থেকে মিষ্টি আসছে, কোন্ গয়লাবাড়িতে দই-এর বরাত গেছে, কোন্ কুমোরবাড়িতে হাঁড়ি-কলসী-জালার বায়না গেছে, কোন্ সদর থেকে গোরা-বাজনার দল আসছে সব খবর মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। তাক্ লেগে গেল শালাবাবুর গরম মেজাজ দেখে। পাত্রী পছন্দ করানো থেকে

শুরু করে নুন-কলাপাতাটুকু পর্যন্ত সবই যেন তার দায়। নরনারায়ণ চৌধুরী ভেতরে দোতলায় বসে বসে হুকুমজারি করেই খালাস। নাতির বিয়ে হবে, সে-বিয়ে তিনি দেখে যেতে পারবেন, তাঁর কাছে তার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছু নেই। ছেলে হরনারায়ণ নিজে গিয়ে কন্যাকে হীরের মুকুট দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছে। ওদিক থেকে কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাইও নিজের সাধ্যমত একটা সোনার বোতামের সেট দিয়ে পাত্রকে আশীর্বাদ করে গেছেন। তাঁর নিজের অবস্থার চেয়ে হাজার গুণ বড় অবস্থার বংশের সঙ্গে কুটুম্বিতে করছেন সেটা তাঁর পক্ষেও মহা আনন্দের ঘটনা। দুপক্ষই খুশী। আর দুপক্ষের মাঝখানে যোগসূত্রের মত প্রকাশ মামা একবার কেষ্টনগর আর একবার নবাবগঞ্জ করছে। ছেলে-মেয়ে-বউ সবাইকে নিয়ে এসে তুলেছে এখানে। নরনারায়ণ চৌধুরীর বেয়াই কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ও সুলতানপুর থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। কিন্তু সব কিছুর দায়িত্ব বলতে গেলে যেন শালাবাবুরই একলার। একবার ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে হাজির হয় আর একবার দিদির কাছে। বলে—শ'পাঁচেক টাকা দাও তো দিদি—

দিদি টাকা দিতে দিতে শুধু মাত্র জিজ্ঞেস করে—আবার পাঁচশো টাকা কী হবে? তোর জামাইবাবুর কাছেই চাইলে পারতিস—

টাকাগুলো পকেটে পুরতে পুরতে প্রকাশ বলে—জামাইবাবুকে এখন কোথায় খুঁজে পাই বলো দিকিনি—! আমারই বা অত সময় কোথায়? শেষকালে সব হিসেব দিলেই তো হলো—

বলে হন্-হন্ করে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই কোথায় উধাও হয়ে যায়। নাইবার খাবারও সময় নেই তার। নরনারায়ণ চৌধুরী এক-একবার জিজ্ঞেস করেন—কৈলাস, সব কাজ-কর্ম ওদিকে ঠিক চলছে তো?

কৈলাস গোমস্তা বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু, প্রকাশ মামা আছেন, তিনি সব করছেন—

নরনারায়ণ চৌধুরী চিনতে পারেন না। জিজ্ঞেস করেন—প্রকাশ মামা? সে আবার কে?

—আজ্ঞে আমাদের বৌমার ভাই।

—বৌমার ভাই মানে? নারায়ণের শালা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তা বেয়াই মশাই-এর তো পুত্রসন্তান ছিল না। শালা কোত্থেকে এল?

—আজ্ঞে বৌমার মামাতো ভাই, আমাদের বেয়াই মশাই-এর কাছেই মানুষ, ছেলেবেলাতেই বাবা-মা মারা গিয়েছিল কিনা—

—ও—বলে তিনি চুপ করলেন। অনেকবার শুনেছেন তিনি কথাটা, তবু শেষের দিকে অনেক কিছুই তিনি ভুলে যেতেন।

যখন বিয়ে-বাড়ি এমনি জম্-জমাট, চৌধুরী বাড়িতে লোক-জন গম্ গম্ করছে, তখন গ্রামের লোকের কানে গেল শাঁখ বাজার শব্দ। লোকজন সবাই ভিড় করে এল। গায়ে-হলুদ এসেছে। গায়ে-হলুদ এসেছে। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও! গায়ে-হলুদের দলের সঙ্গে এসেছে অনেক লোক। এসেছে সকাল আটটার আগেই। পুরুতমশাই পাঁজি দেখে সময় বলে দিয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে ছেলের গায়ে-হলুদ না হলে ওদিকে মেয়ের গায়ে-হলুদও হবে না। এদিকে টাইম দেওয়া হয়েছে সকাল আটটা, আর ওদিকে সেই হিসেব করে মেয়ের গায়ে-হলুদ হবে সকাল ন'টার সময়। হিন্দুর বিয়ে বলে কথা। এর নড়-চড় হবার উপায় নেই। হলে অকল্যাণ হবে। অকল্যাণ হবে বর-কনের। অকল্যাণ হবে চৌধুরী বংশের,

অকল্যাণ হবে ব্যাকরণতীর্থ কালীকান্ত ভট্টাচার্যের বংশেরও।

কৃষ্ণনগর থেকে নবাবগঞ্জ। মাঝখানে রাণাঘাটে একবার ট্রেন বদল করতে হয়। সময়ও লাগে অনেক। তারপর আছে রেলবাজার থেকে এতখানি রাস্তা।

গায়ে-হলুদের দল যখন কেষ্টনগরে ফিরলো তখন বিকেল পুইয়ে গেছে। সামনের রাস্তার দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে ছিলেন ভট্টাচার্যি মশাই। বাড়ির ভেতরেও সকলের উদ্বেগ ছিল। কুটুমবাড়ি থেকে ঘুরে আসছে, ওদের মুখ থেকে অনেক খবর শোনা যাবে।

—কি গো বিপিন, গায়ে-হলুদ হলো? কী রকম খাতির করলেন বেয়াই মশাইরা?

বিপিনের মুখটা যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর।

—কই, কথা বলছো না যে কিছু?

বিপিন বললে—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, খাতির খুব ভালোই পেয়েছি, পেটভরে খেয়েছি সবাই আমরা, কিন্তু...

কী বলতে গিয়ে যেন বিপিন থেমে গেল।

পণ্ডিত মশাই বুঝতে পারলেন না। বললেন—কিন্তু কী...

—আজ্ঞে গায়ে-হলুদ হয়নি।

—গায়ে-হলুদ হয়নি মানে? এদিকে নয়নতারার যে গায়ে-হলুদ হয়ে গেল সকাল ন'টার সময়। ওদিকে আটটার সময় ছেলের গায়ে-হলুদ হবার কথা, সেই হিসেব করে আমরাও যে মেয়ের গায়ে-হলুদ দিয়ে দিয়েছি। সেই রকম ব্যবস্থাই তো করা ছিল—

বিপিন মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে, বরবাবাজীকে পাওয়া গেল না—

—পাওয়া গেল না মানে?

বিপিন বললে—আগের রাত্তির থেকেই বরবাবাজী কোথায় বেরিয়ে গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না—

—শেষ পর্যন্ত? শেষ পর্যন্ত কী হলো আগে তাই বলো! শেষ পর্যন্ত বরকে পাওয়া গেল?

—আজ্ঞে না, পাওয়া গেল না। আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো, তাই আমরা চলে এলুম—

খবরটা কানে যেতেই ভট্টাচার্যি-গৃহিণীও ছুটে বাইরে এলেন। বললেন—কী হলো গো? গায়ে-হলুদ হয়নি? এদিকে যে নয়নতারার গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে। তাহলে কি বর আসবে না নাকি?

বলে বিপিনের দিকে চাইলেন তিনি।

ভেতরের একটা ঘরে নয়নতারা তখন চুপ করে বসেছিল। তার কানেও গেল কথাটা। কানে যেতেই সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে এল। বর আসবে না!

কিন্তু না, বোধ হয় পণ্ডিত কালীকান্ত ভট্টাচার্যের পূর্ব-পুরুষের বহু পুণ্যফল ছিল, তাই তাঁর কন্যার বিয়েতে কোনও বিপর্যয় ঘটলো না। কিংবা বিপর্যয়টা সাময়িকভাবে না ঘটলেও হয়ত অদূর ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবী রইল। জীবনে দুর্যোগ যখন আসে তখন আপাতত তার আসার রকমটা দেখে অনেক সময় মনে হয় সেটা বুঝি হঠাৎই উদয় হলো। কিন্তু ঝড় আসবার অনেক আগে থাকে ঝড়ের সঙ্কেত। ঘরের চালে যখন আগুন লাগে, সে আগুনের উদ্ভব যে তার কত আগে কারো তামাক-খাওয়ার নেশার তাগিদে, আমরা তার খোঁজ রাখি না।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একেবারে শেষ ট্রেনটাতে বর এসে পৌঁছুলো। বিপিন দৌড়ে এসে খবর দিয়ে গেল পণ্ডিত মশাইকে। পণ্ডিত মশাই

আবার খবর দিলেন বাড়ির ভেতরে। বিয়ে-বাড়িতে তখন চাপা-কান্নার রোল উঠেছিল। সুখবর পেয়ে সেই বাড়িই আবার গম্‌গম্‌ করে উঠলো। আবার হাসি ফুটে উঠলো সবার মুখে। কে যেন বলে উঠলো—ওরে শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, উলু দে,—উলু দে—বর এসেছে—

হ্যাঁ, কালীকান্ত ভট্টাচার্যির বাড়িতে বর এসেছে, নয়নতারার বর এসেছে—

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে প্রকাশ মামা তখন সদানন্দকে আগ্‌লে আগ্‌লে আসছে। ভাগ্নে আবার না পালায়! পাশে হরনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন। তিনিই বরকর্তা। পেছনে পেছনে নাপিত।

প্রকাশ মামা বললে—আপনি কিছু ভাববেন না জামাইবাবু, আমি সদাকে আগলে আছি—

প্ল্যাটফরমে কিছু লোক বর দেখতে ভিড় করেছিল। প্রকাশ মামা তাদের দিকে চেয়ে তেড়ে গেল। বললে—আপনারা কী দেখছেন মশাই? আপনারা কি বর দেখেন নি কখনও? একটু রাস্তা দিন, রাস্তা দিন আমাদের—সরুন—

কিন্তু সদানন্দর তখন অন্য চিন্তা। প্রকাশ মামা তার দিকে চেয়ে বললে—কিচ্ছু ভাবিস নি তুই। বিয়ে করতে ভয় কীসের? আমি তো আছি! এই দ্যাখ্ না, বিয়ে কে না করেছে। আমি বিয়ে করেছি, তোর বাবা বিয়ে করেছে, তোর ঠাকুর্দা বিয়ে করেছে, তোর ঠাকুরদার বাবাও একদিন বিয়ে করেছিল। বিয়ে করতে ভয়ের কিচ্ছু নেই। এই আমার কথাই ধর না, আমি তো একবার বিয়ে করেছি, এর পর যদি দরকার হয় আরো দশবার বিয়ে করবার হিম্মত রাখি, আমি কি কাউকে পরোয়া করি?

সেদিন প্রকাশ মামার কথায় মনে মনে হেসেছিল সদানন্দ। প্রকাশ মামাও তো একজন মানুষ। কেউ তাকে মানুষ ছাড়া জানোয়ার বলবে না। মানুষের মত দুটো হাত, পা, চোখ, কান। মানুষেরই মতন মুখের ভাষা। সংসার ও-রকম লোককে সবাই মানুষ বলেই জানে। অথচ প্রকাশ মামা কি সত্যিই মানুষ! কতদিন সদানন্দকে সিগারেট খাইয়েছে, তামাক খাইয়েছে, বিড়ি খাইয়েছে। যাত্রা থিয়েটার শুনতে কত দূর দূর গ্রামে নিয়ে গিয়েছে। তারপর অন্য গ্রামে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে। বাড়ি আসবার আগে ভাগ্নেকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে—খবরদার, কাউকে যেন বলিস নি এসব কথা—

সদানন্দ তখন ছোট। মামার কথা ঠিক বুঝতে পারতো না। জিজ্ঞেস করতো—কী সব কথা?

প্রকাশ মামা বলতো—এই কার ঘরে রাত কাটিয়েছিস—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করত—কেন? বললে কী হয়েছে?

প্রকাশ মামা বকতো। বলতো—দূর হাঁদা। মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটালে কাউকে বলতে নেই—

—কেন? মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটালে দোষ কী? ও মেয়েমানুষটা কে?

প্রকাশ মামা বলতো—দূর, তুই দেখ্‌ছি সত্যিই একটা হাঁদা-গঙ্গারাম। দেখলি না ওটা একটা বাজারের মেয়েমানুষ!

—বাজারের মেয়েমানুষ মানে?

প্রকাশ মামা অধৈর্য হয়ে উঠতো। বলতো—আরে, তোকে নিয়ে দেখছি মহা মুশকিলে পড়া গেল। বাজারের মেয়েমানুষ কাকে বলে তাও এত বড় ছেলেকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

দেখলি নে মাগীর কী রকম ঠাট্?

—ঠাট্ মানে?

প্রকাশ মামা বলতো—নাঃ, তোকে দেখছি আর মানুষ করতে পারলুম না। তুই বড় হয়ে যে কী করবি তা বুঝতে পারছি না। শেষকালে তুই কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে বসিস। যখন তোর বাবা মারা যাবার পর লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক হবি, তখন দেখছি সবাই তোকে সব ঠকিয়ে নেবে—

সদানন্দ ছোটবেলায় প্রকাশ মামার কথা শুনে অনেক জিনিস জানতে পারতো। সে জানতে পারতো যে, তাদের অনেক টাকা। তার ঠাকুরর্দা আর তার বাবা মারা যাবার পরই সে নাকি লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যাবে! আর শুধু যে তার বাবার টাকা তাই-ই নয়, তার দাদামশাই-এর নাকি অনেক টাকা। দাদামশাই-এর মৃত্যুর পর সে-টাকাও নাকি সদানন্দ একলাই সব পাবে। তখন তার বয়েস পনেরো কি ষোল, সেই সময়েই সে এই সব কথা শুনলো। রানাঘাটের বাজারের একটা বাড়িতে তখন তাকে নিয়ে গেছে প্রকাশ মামা। সারা রাত যাত্রা শুনেছে মামার সঙ্গে। যাত্রা যখন শেষ হয়েছে তখন মাঝরাত। ঘড়িতে বোধ হয় রাত তখন দুটো। সেই অত রাত্রে সদানন্দর খুব ঘুম পেয়েছে। প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, খুব ঘুম পেয়েছে?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ।

—তা হলে আয় তোকে বিছানায় শুইয়ে দিই গে। আয় আমার সঙ্গে—

বলে বাজারের গলির ভেতরে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলে—রাধা, রাধা, ও রাধা—

অনেক ডাকাডাকির পর একজন মেয়েমানুষ চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দরজা খুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—এ কী, এত রাত্তিরে? এ কে?

প্রকাশ মামার হাব-ভাব দেখে মনে হলো যেন মেয়েমানুষটা তার খুব চেনা। কথা বলতে বলতে একেবারে তার বিছানায় গিয়ে বসে পড়লো। সদানন্দ তখনও মেয়ে-মানুষটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। যাত্রা শুনতে শুনতে তখন যে তার অত ঘুম পাচ্ছিল, সেখানে সেই মেয়েমানুষটার বাড়িতে গিয়ে কিন্তু সে-সব যেন কোথায় হাওয়ায় উড়ে গেল।

—কী রে, রাধার দিকে চেয়ে অমন করে কী দেখছিস?

প্রকাশ মামা হাসতে হাসতে সদানন্দকে কথাটা বলতেই সে মাথা নিচু করে নিয়েছিল। তার সেই ওই অল্প বয়সেই মনে হয়েছিল যে, অমন করে কোনও অচেনা মেয়েমানুষের দিকে চেয়ে থাকতে নেই।

তারপর প্রকাশ মামার কথাতেই তার যেন আবার জ্ঞান ফিরে এলো। প্রকাশ মামা তখন মেয়েমানুষটার দিকে চেয়ে বলে চলেছে সদানন্দর কথা। লাখ লাখ টাকার জমিদার এর বাবা। বাবার এক ছেলে, বুঝলে? বাপ মারা গেলে এই ছেলেই সেই অত টাকার সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হবে।

—তা ওকে নিয়ে আমার এখানে কেন এসেছ? ওর বাবা-মা জানতে পারলে কিছু বলবে না?

প্রকাশ মামা হেসে উঠলো। বললে—কেন, তোমাদের এখেনে আসা কি খারাপ?

রাধা বললে—না, তোমার কথা বলছি নে। তুমি তো এ-লাইনে পাকা ঘুঘু। শেষকালে ভাগ্নেকেও এ-লাইনে নিয়ে এলে, তাই বলছি—

প্রকাশ মামা সদানন্দর দিকে চাইলে। বললে—এ-লাইনে এলে ক্ষতি কী! তোমারও লাভ, আমারও লাভ—

—তোমার কিসের লাভ?

—লাভ নয়? এত টাকা এ একলা খেতে পারবে? পরের গলায় গামছা দিয়ে টাকা করেছে এর ঠাকুর্দা। কালীগঞ্জে এর ঠাকুর্দা পনেরো টাকা মাইনেতে গোমস্তার চাকরি করতো। মাত্তোর পনেরো টাকা। গোমস্তা বললে খারাপ শোনাতো বলে সবাই এর ঠাকুর্দাকে নায়েবমশাই বলে ডাকতো। সেই পনেরো টাকায় শুরু করে আজ পনেরো লাখ টাকার জমিদারির মালিক তিনি। আর এই নাতিই হলো তাঁর সেই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্তোর ওয়ারিশন্।

খবরটা যেমন রাধার কাছে বিস্ময়কর, তখন সেই ছোটবেলায় সদানন্দর কাছেও তেমনি। প্রকাশ মামার সেই সেদিনকার কথাতেই সে প্রথম জানতে পারলো যে, তাদের কত টাকা। সে কত বড়লোক।

রাধা বললে—কিন্তু তুমি এই বয়সেই ওকে এই লাইনে নিয়ে এলে! ও তো বয়স হলে সব ওড়াবে—

—সে গুড়ে বালি। বুঝলে গো, টাকা ওদের বংশে কারোর হাত দিয়ে গলে না।

রাধা বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তাই তো আমি আমার দিদির কাছ থেকে যা পারি হাতিয়ে নিই। এর বাবা, আমার জামাইবাবু এক-পয়সার ফাদার-মাদার। সেই জন্যেই তো এই ভাগ্নেটাকে এ লাইনে এনে একটু মানুষ করার চেষ্টা করছি। দেখি, এখন আমার হাতযশ আর এর কপাল—

সদানন্দ তখনও রাধার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার মনে হলো মেয়েমানুষটার মধ্যে কিছু যেন অস্বাভাবিকতা রয়েছে একটা। তাদের নবাবগঞ্জের অন্য মেয়েমানুষদের মত নয় যেন। শেষ পর্যন্ত সেদিন আর ঘুমনোই হয়নি সদানন্দর। ওই রকম জায়গায় কারো ঘুম হয় নাকি?

মনে আছে বাড়িতে ফিরে আসতেই মা জিজ্ঞেস করলে—কীরে, সমস্ত রাত কোথায় ছিলি? কোথায় ঘুমোলি?

প্রকাশ মামা বললে—ঘুম হবে কী করে? সাধুদের আশ্রমে কি ঘুম হয় কারো? সবাই কেবল খোল-কর্তাল বাজাচ্ছিল—

—সাধুদের আশ্রমে? সাধুদের আশ্রমে মানে?

প্রকাশ মামা বললে—যাত্রা তো শেষ হয়ে গেল রাত দুটোর সময়, তখন কোথায় যাই? সদা বললে ওর ঘুম পেয়েছে। তাই ওকে নিয়ে রাণাঘাটের একটা সাধুদের আশ্রমে গেলুম। কিন্তু সেখানে সবাই এমন হেঁড়ে গলায় 'রাধা-কৃষ্ণ' 'রাধা-কৃষ্ণ' করতে লাগলো যে, বাপ-বাপ্ বলে আমাদের ঘুম পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো—

দিদি হাসতে লাগলো। বললে—তা আমাদের সদরের উকিলবাবুর বাড়ি থাকতে সাধুদের আশ্রমে তোরা গেলিই বা কেন?

প্রকাশ মামা বললে—গেলুম সদাকে দেখাতে। যখন বড় হয়ে হাতে ওর অনেক টাকা আসবে তখন যাতে না ঠকে তাই এখন থেকে জোচ্চোরদের চিনিয়ে রাখলুম—

কথাটা শুনে দিদিও হাসতে লাগলো, প্রকাশ মামা নিজেও হাসতে লাগলো। কিন্তু সদানন্দ সেদিন হাসতে পারেনি প্রকাশ মামার কথা শুনে। তখনও সেই রাণাঘাটের বাজারের মেয়েমানুষটার কথা মনে পড়ছিল তার।

হঠাৎ প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করলে—জামাইবাবুকে তুমি যাত্রা শুনতে যাওয়ার কথা বলোনি তো?

সত্যিই তখনকার দিনে কেউ-ই জানতো না প্রকাশ মামার সঙ্গে বাড়ির বাইরে সে কোথায় কোথায় যেত। চৌধুরী বংশের কুলতিলকের পক্ষে যেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ সেখানেও যে সেই বয়েসেই গিয়ে সে সব-কিছু বিধি-নিষেধ অমান্য করে বসে আছে—এ-কথা গুরুজনদের কারোরই তখন গোচরে আসেনি। জীবন দেখা কি এতই সোজা! প্রকাশ মামা না হলে কি জীবনের উল্টো-পিঠটা সে দেখতে পেত? একদিকে নরনারায়ণ চৌধুরীর অর্থ-লালসা, আর তার বাবার বৈষয়িক কূট-কৌশলী বুদ্ধি, আর অন্যদিকে প্রকাশ মামার বেপরোয়া জীবনভোগ। একদিকে কালীগঞ্জের বৌ এসে পালকি থেকে নামতো আর দাদুর কাছে গিয়ে টাকা চাইতো, আর একদিকে সেই টাকাই প্রকাশ মামার হাতের ফুটো দিয়ে রাণাঘাটের বাজারের চালাঘরে গিয়ে নিঃশেষ হতো। মানুষের জীবনের এই অঙ্কটা সে কিছুতেই কষতে পারতো না।

এক-একদিন মা'কে জিজ্ঞেস করতো—মা, ও বউটা কে পালকি করে আসে আমাদের বাড়িতে? কেবল দাদুর কাছে টাকা চায় কেন?

মা বলতো—ও কালীগঞ্জের বউ।

—কালীগঞ্জের বউ কালীগঞ্জে থাকে না কেন? আমাদের নবাবগঞ্জে কেন জ্বালাতে আসে?

মা তাড়াতাড়ি ছেলেকে চুপ করিয়ে দিত। বলতো—চুপ, চুপ, ও-কথা বলতে নেই, কর্তাবাবু শুনতে পেলে রাগ করবেন।

সদানন্দ বলতো—তা কালীগঞ্জের বৌ-এর পাওনা টাকা দিয়ে দিলেই হয়। যখনই কালীগঞ্জের বউ টাকা চায় তখনই দাদু বলে টাকা নেই। দাদু কেন মিথ্যে কথা বলে? দাদুর তো অনেক টাকা আছে, আমি দেখেছি—

এ-সব কথার কোনও উত্তর তার মা দিতে পারেনি।

প্রকাশ মামাকেও সে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে—তুমি কেন ওখানে যাও মামা?

প্রকাশ মামা ভাগ্নের কাছে এমন প্রশ্নের আশা করতো না। বলতো—তুই কী বুঝবি কেন যাই! তুই যখন বড় হবি তখন তুইও যাবি—

সেই ছোটবেলায় যখন রাধার বাড়িতে প্রথম গিয়েছিল সে তখন সেই গানটা শুনিয়েছিল। সেই গানটা—আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।

আসবার সময় রাস্তায় প্রকাশ মামা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কী রে, কীরকম গান শুনলি?

সদানন্দ বলেছিল—ভালো—

—ভালো তো বুঝলুম, কিন্তু, কী রকম ভালো তাই বল না—

সদানন্দ বলেছিল—খুব ভালো—

প্রকাশ মামা বলেছিল—তা দ্যাখ, দিদি যদি তোকে জিজ্ঞেস করে কোথায় রাত কাটিয়েছিলি তাহলে কিন্তু রাধার কথা বলিসনি, বুঝলি? তোর বাবাকেও বলবি না, তোর দাদুকেও বলবি না।

সদানন্দ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তাহলে তুমি কেন ওখানে যাও মামা?

প্রকাশ মামা বলেছিল—জীবনটাকে ভোগ করতে।

—ভোগ করতে মানে?

প্রকাশ মামা বলেছিল—ওই তো তোর বড় দোষ! বলছি তুই বড় হলে সব বুঝতে পারবি! তবু বার-বার সেই এক কথা। তোর ভালোর জন্যেই তোকে এসব শেখাচ্ছি। নইলে তোর হাতে যখন টাকা আসবে তখন তুই খরচ করবি কী করে?

সদানন্দ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? টাকা খরচ করা কি শক্ত?

প্রকাশ মামা বলেছিল—নিশ্চয়ই, টাকা খরচ করা কি সোজা নাকি! তোর দাদুর তো অত টাকা, তাহলে কালীগঞ্জের বৌকে তার পাওনা টাকা দেয় না কেন বল্?

সদানন্দ বলেছিল—সত্যিই বলো তো, কালীগঞ্জের বৌকে দাদু টাকা দেয় না কেন?

একটা হাসির শব্দে হঠাৎ যেন সদানন্দর সম্বিৎ ফিরে এলো। চারিদিকে অনেক লোক, অনেক আলো। অনেক বাজনা। ঢোল-কাঁসির আওয়াজে জায়গাটা তখন সরগরম হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আছে শাঁখ আর উলুর শব্দ।

—বেয়াই মশাই, আমি তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম—

প্রকাশ মামা এগিয়ে এল ভট্টাচার্যি মশাই-এর দিকে। বললে—কেন, ভয় পেয়েছিলেন কেন?

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—আমাদের বিপিন গিয়েছিল, তার মুখেই শুনলাম বাবাজীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না সকাল থেকে।

কথাটা শুনে হো-হো করে হেসে উড়িয়ে দিল প্রকাশ মামা। জামাইবাবুর দিকে চেয়ে বললে—শুনুন জামাইবাবু, বেয়াই মশাই-এর কথা শুনুন, বরকে যদি পাওয়াই না যাবে তাহলে এখন বর এল কী করে?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই বললেন—বুঝতেই তো পারছেন, আমি হলুম মেয়ের বাপ, আমার তো একটা দুশ্চিন্তা থাকে—তা গায়ে-হলুদ নির্বিঘ্নেই হয়েছিল তো শেষ পর্যন্ত?

বরকর্তা চৌধুরী মশাই সাধারণত বেশি কথা বলেন না। গায়ে-হলুদের কথা শুনে মুখ খুললেন। বললেন—গায়ে-হলুদ না হলে বিয়ে হবে কী করে বেয়াই মশাই? অশাস্ত্রীয় ব্যাপার তো আমাদের বংশে চলবে না।

নিরঞ্জন পরামানিক বরের সঙ্গে গিয়েছিল। কনের বাড়ির পরামানিক বিপিন এসে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলে—শুনছিলাম কী নাকি হয়েছিল আপনাদের ওখানে—?

—কীসের কী?

—আমি তো গায়ে-হলুদ নিয়ে গিয়েছিলুম নবাবগঞ্জে তখন তো বরকে পাওয়া যাচ্ছিল না, তারপর কখন পাওয়া গেল?

নিরঞ্জন বললে—আরে খোকাবাবু তো খেয়ালী মানুষ, হঠাৎ কালীগঞ্জে চলে গিয়েছিল—

—কালীগঞ্জে? তা বিয়ের দিন বর-বাবাজী কালীগঞ্জে চলে গিয়েছিলই বা কেন?

কেন যে সদানন্দ সেদিন কালীগঞ্জে চলে গিয়েছিল তা কি সদানন্দ নিজেই জানতো? এ এক বিচিত্র মানসিকতা। আগের দিনও সে জানতো না যে, সে কালীগঞ্জে যাবে। প্রকাশ মামা তাকে সব জায়গাতেই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকে সে মামার সঙ্গে কত জায়গাতেই তো গেছে। কালীগঞ্জেও গেছে। রেলবাজার থেকে নবাবগঞ্জে এসে আরো কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে যাও তবে কালীগঞ্জ পড়বে। কালীগঞ্জে পোস্টাফিস আছে, থানা আছে, বাঁধা বাজার আছে। বলতে গেলে নবাবগঞ্জের চেয়ে কালীগঞ্জ আরো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সদানন্দ জানতো ওইখান থেকেই কালীগঞ্জের বউ তার দাদুর কাছে আসতো। জানতো দাদুর কাছে এসে কালীগঞ্জের বউ টাকা চাইতো, আর যতবার টাকা চাইতো ততবার দাদু বলতো টাকা নেই। কেন যে বউ টাকা চাইতো আর কীসের টাকা, তা সদানন্দ জানতো না। কাউকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ স্পষ্ট জবাব দিত না।

বিয়েবাড়িতে তখন লোকজনের ভিড় হয়েছে খুব। ভাগলপুর থেকে দাদামশাই এসেছে। তাঁর নাতির বিয়ে। বুড়ো মানুষ। বেশি নড়া-চড়া করতে পারেন না। তিনি বললেন—কই,

খোকাকে তো দেখতে পাচ্ছিনে—

দীনু ডেকে নিয়ে এল খোকাকে। দাদু শুয়ে ছিলেন সামনে। বললেন—দাদুকে প্রণাম করো—

—থাক থাক—বলে কীর্তিপদবাবু পা-জোড়া সামনের দিকে একটু এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—বেঁচে থাকো বাবা, আশীর্বাদ করি সুখী হও—

সদানন্দ তখনও সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কীর্তিপদবাবু আবার বলতে লাগলেন—এসে পর্যন্ত তোমাকে দেখতেই পাইনি মোটে, খুবই ব্যস্ত বুঝি—

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—না, ও আবার ব্যস্ত কীসের! ও তো বরাবরই ওই রকম। আমিই বলে আজকাল দেখতে পাইনে ওকে, অথচ একই বাড়ির মধ্যে থাকি। ওকে কেউই দেখতে পায় না—

কীর্তিপদবাবু বললেন—তা তো পাবেই না, এখন ওদের বয়েস হয়েছে, বুড়োদের সঙ্গে থাকতে ওদের আর ভালো লাগবেই বা কেন? যাও, যাও, তোমার নিজের কাজে যাও বাবা, কাল তোমার বিয়ে, আর কোথাও বেরিও না—

সদানন্দ ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেল যেন। সে চলে যাবার পর কীর্তিপদবাবু বললেন—অনেকদিন পরে দেখলাম খোকাকে, খুব বড় হয়ে গেছে—আর চেনা যায় না—

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—বড় হলে কী হবে, বৈষয়িক বুদ্ধি-টুদ্ধি তেমন হয়নি—

কীর্তিপদবাবু বললেন—এইবার বিয়ে হচ্ছে, কাঁধে জোয়াল চাপলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ছোট বয়সে সবাই ও-রকম একটু হয়েই থাকে—পরে দেখবেন তখন ও-ই আপনাকে শেখাবে। আমি যখন ছোট ছিলুম তখন আমিই কি জমিদারির কিছু বুঝতুম—

দুই বেয়াই-এর বহুদিন পরে দেখা। দুজনেরই অনেক সম্পত্তি। একদিন এই দুজনের সব সম্পত্তিরই মালিক হয়ে বসবে সদানন্দ। কীর্তিপদবাবুর একমাত্র সন্তান এই সদানন্দর মা। আর নরনারায়ণ চৌধুরীরও একমাত্র সন্তান এই সদানন্দর বাবা। সদানন্দ নিজেও হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। সুতরাং দুই বেয়াই-এরই একমাত্র ভরসা এই সদানন্দ। তাই দুজনেরই এক কামনা। দুজনেরই কামনা সদানন্দ দীর্ঘজীবী হোক, সদানন্দ সুখী হোক, সদানন্দ সংসারী হোক, সদানন্দ বৈষয়িক হোক।

কিন্তু হায় রে মানুষের জীবন আর হায় রে মানুষের জীবনের ইতিহাস! নইলে সেদিন নবাবগঞ্জ আর ভাগলপুরের সেই দুই দুর্ধর্ষ জমিদার-পুঙ্গব কি কল্পনা করতেই পেরেছিলেন যে তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীমান সদানন্দ চৌধুরী লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও কপর্দকশূন্য অবস্থায় এক অখ্যাত চৌবেড়িয়া গ্রামের রসিক পালের অতিথিশালায় অন্নদাস হিসেবে শেষ জীবনটা কাটাবে! নইলে ঠিক বিয়ের আগের দিনই কেউ নিজের বাড়ি ছেড়ে পালায়, না নরনারায়ণ চৌধুরীর শেষ জীবনের চরম শত্রু কালীগঞ্জের বৌ-এর কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়!

কালীগঞ্জের বৌ-এরও তখন চরম অবস্থা। নিঃসন্তান বিধবা মানুষ তিনি। এককালে স্বামীর জীবিতাবস্থায় তিনি অনেক সুখ অনেক ঐশ্বর্য দেখেছেন। দুটি ছেলে হয়েছিল তাঁর। তারাও তখন আর নেই। কালীগঞ্জে যেবার কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল সেবার দুই ছেলেই তাঁর চোখের সামনেই মারা গিয়েছিল! স্বামীর মৃত্যু, দুই ছেলের মৃত্যু, সবই তিনি সহ্য করেছেন বুকে পাথর বেঁধে। তখন ওই নরনারায়ণ চৌধুরীই ছিল কালীগঞ্জের জমিদারের

নায়েব। তাঁর হাতেই সব কিছুর ভার দিয়ে কালীগঞ্জের বউ বড় নিশ্চিন্ত ছিলেন। পনেরো টাকা মাইনে পেতেন তখন নরনারায়ণ চৌধুরী। সামান্য নায়েব মাত্র। অতি কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলতো তাঁর। কিন্তু সন্তান-হারা বিধবার হাতে জমিদারির ভার পড়ার পর থেকেই নরনারায়ণ চৌধুরীর অবস্থা ফিরতে লাগলো। তিনি নায়েবগিরি করেন কালীগঞ্জে কিন্তু একখানা ছোট কোঠাবাড়ি করলেন নবাবগঞ্জে, নিজের গ্রামে। মাসে পনেরো টাকা মাইনে পাওয়া নায়েবের কোঠাবাড়ি করবার সামর্থ্য হয় কী করে সে প্রশ্ন জমিদারির বিধবা মালিক কালীগঞ্জের বৌ-এর মাথায় আসেনি। এলে আর নরনারায়ণ চৌধুরী আজ এত বড়লোক হতে পারতেন না। আর তখন সে-প্রশ্ন উঠলে আজকের এই আসামী সদানন্দ চৌধুরীকে নিয়ে উপন্যাস লেখবার প্রয়োজনও এমন করে অনিবার্য হয়ে উঠতো না।

তা সেদিন সেই সদানন্দ চৌধুরীর বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ কালীগঞ্জের বৌ সদানন্দকে তার বাড়িতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি মানুষ, ভালো করে তখন চোখেও দেখতে পায় না। বিরাট বাড়ি। কিন্তু ওই বিরাট বাড়িটাই শুধু আছে তখন। আর কিছু নেই। সব ঘরগুলোতে ভালো করে ঝাঁটও পড়ে না। আগেকার সেই সব লোক-লস্করও নেই আর তখন। একটা ঝি শুধু হাতের কাজগুলো করে দেয়। আগে গোয়াল-ভরা গরু ছিল, বলদ ছিল চাষবাসের। আর ছিল কিছু লোকজন, যারা এককালে কর্তাদের নিমক খেয়েছে। তারা কৃতজ্ঞতার তাগিদে বাড়ির আনাচে-কানাচে কোনও রকমে তখনও বাসা বেঁধে আছে। দরকার হলে ভাঙা পালকিটায় করে গিন্নীমাকে এখানে-ওখানে নিয়ে যায়। তাও পালকিটার তখন রং চটে গেছে, একটা পায়া ভেঙে গেছে। কোনও রকমে মেরামত করে করে সেটা একটু চালু আছে।

—তুমি কে বাবা?

সদানন্দ একেবারে নিচু হয়ে বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে।

—আমি সদানন্দ। আমি নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীর নাতি, আর হরনারায়ণ চৌধুরী আমার বাবা।

কালীগঞ্জের বৌ তখন বিস্ময়ে হতবাক। যেন কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না বুড়ির।

বললে—তা আমার কাছে যে তুমি হঠাৎ? নায়েবমশাই কি তোমার হাত দিয়ে আমাকে টাকা পাঠিয়েছে?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে তুমি কী করতে এয়েছ?

—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি কালীগঞ্জের বৌ! আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি। আমার কালকে বিয়ে, এবার থেকে আমি তোমার কাছেই থাকবো।

কালীগঞ্জের বৌ কথাগুলো শুনে কেমন যেন আকাশ থেকে পড়লো। কী করবে বুঝতে পারলে না। তখনও আহ্নিক সারা হয়নি তার। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এবার বসে পড়লো বুড়ি। বললে—তোমার বিয়ে? কাল?

—হ্যাঁ—

—তা কাল তোমার বিয়ে যদি হয় তো তুমি বাবা আজকে আমার বাড়িতে এলে কেন? কাল সকালেই তো তোমার গায়ে-হলুদ হবে, তখন তো তোমার খোঁজ পড়বে। তখন তো আমার নামেই দোষ পড়বে যে, আমি তোমাকে আমার কাছে আটকে রেখেছি। তা নায়েব মশাই জানে যে, তুমি আমার কাছে এসেছ?

সদানন্দ বললে—না। আমি কাউকেই জানাইনি এখানে আসার কথা। কাউকে আর

জানাবোও না। আমি আর ও-বাড়িতে যাবোও না।

কালীগঞ্জের বৌ বললে—তোমার হলো কী বাবা? তুমি কি বাড়ির সঙ্গে রাগারাগি করেছ?

—না কালীগঞ্জের বৌ, আমি তোমার এখানে থাকবো বলেই এসেছি। এবার থেকে আমি বরাবর তোমার এখানেই থাকবো। নবাবগঞ্জে আর যাবো না।

কালীগঞ্জের বৌ বললে—তুমি দেখছি ছেলেমানুষ আছো এখনও। আমার এখানে যে তুমি থাকবে তা খাবে কী? তুমি বড়লোকের বাড়ির ছেলে, আমি গরীব মানুষ, আমি কি তোমাকে খাওয়াতে পারবো বাবা? তুমি ছেলেমানুষি কোর না, বাড়ি চলে যাও—। একে তো তোমার দাদু আমাকে দেখতে পারে না, এর পরে যদি তোমাকে আমার এখানে দেখতে পায় তো আমাকে আর আস্ত রাখবে না, আমাকে আর তোমাদের বাড়িতেও ঢুকতে দেবে না—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি দাদুর কাছে যাও কেন? কেন তুমি দাদুর কাছে ভিক্ষে করতে যাও? ভিক্ষে করতে তোমার লজ্জা করে না?

কালীগঞ্জের বৌ বললে—কিন্তু আমার পাওনা টাকা চাইতে যাওয়াও ভিক্ষে? তোমার দাদু তো আমার সর্বস্ব নিয়েছে। আমার জমি-জমা কিছুছু আর বাকি রাখেনি। কেবল এই ভিটেটুকু ছাড়া আর আমার নিজের বলতে কিছুছু নেই। আমার লাখ-লাখ টাকার সম্পত্তি সব তোমার দাদু নিয়ে নিয়েছে, তাই শেষকালে আমি অনেক কান্নাকাটি করাতে তোমার দাদু বলেছিল আমাকে হাজার দশেক টাকা দেবে। তাই শুনে আমি মামলা তুলে নিয়েছিলুম। তা এখন সেই টাকাটা চাওয়াও নাকি আমার অন্যায়! আমি তো আর দুদিন পরে মরে যাবো, তখন টাকা দিলে আমার কী লাভ হবে বলো বাবা? সে টাকা কি আমার ছেরাদ্দে খরচ হবে?

সদানন্দ বললে—তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি—

—তুমি সব জানো বাবা? সব জানো তুমি? বুড়ির যেন আনন্দে গলা বন্ধ হয়ে এলো।

সদানন্দ বললে—সব জানি বলেই তো আমি এসেছি—

—কী করে জানলে তুমি? কে বললে তোমাকে? কে আমার এমন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে বাবা? আমি জানতুম, আমার কেউ নেই। কর্তা গেছেন, নিজের পেটের দুটো ছেলে থাকলেও আজ আমার এই দুর্দশা হতো না। তাই ভাবি, মানুষ এমনি করেই মানুষের সর্বোনাশ করে? কই, তোমার দাদুর তো কোনও ক্ষতি হয়নি? তাঁর তো ছেলে বেঁচে রয়েছে! তুমি তাঁর নাতি, তোমারও তো কাল বিয়ে হবে, তারপর একদিন তোমারও ছেলে-পুলে হবে, ঘর-সংসার ভরে উঠবে তোমাদের। তখন তো একবার কেউই ভাববে না কার টাকায় এসব হলো, কার সর্বোনাশ করে তোমাদের এত বাড়-বাড়ন্ত হলো। কিন্তু আমার কী হলো? আমি তোমার দাদুর কাছে কী অপরাধ করেছি যে তিনি আমার এত বড় সর্বোনাশটা করলেন। দেখ বাবা, আমি তাই তাঁকে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে এসেছি—

—শাপ দিয়ে এসেছো? কাকে?

—তোমার দাদুকে। ওই নায়েব মশাইকে রাগের মাথায় শাপ দিয়েছিলুম। শাপ দিয়ে বলেছিলুম যে আপনি নির্বংশ হবেনই, বামুনের শাপ নিষ্ফল হবে না। তা রাগ হলে কি মানুষের জ্ঞান থাকে বাবা? আমিও তাই রাগের মাথায় ওই কথা বলে ফেলেছিলুম। তাই আমার ওপর তোমার দাদুর অত রাগ। এখন বলছে আর টাকা দেবে না—

সদানন্দ বললে—আমি তোমার টাকা সব মিটিয়ে দেবো—আমি তোমাকে তো সেই কথা বলতেই এসেছি—

—তুমি আমার টাকা মিটিয়ে দেবে? তা আমি মরে গেলে আমার টাকা মিটিয়ে দিলে আমার কী লাভ? বেঁচে থেকেই যদি খেতে না পেলুম তো আমি মারা গেলে সে টাকা কে খাবে? ভূতে খাবে?

হঠাৎ একটা শব্দে সদানন্দর যেন চমক্ ভাঙলো। হঠাৎ বাইরে কে যেন বলে উঠলো—ওরে বাজনা বাজা—বাজনা বাজা—

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বেজে উঠলো বাইরে। তখন সম্প্রদান হচ্ছে। পুরুত-মশাই মন্ত্র পড়তে শুরু করেছেন—

যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম

নয়নতারার হাতের পাতাটা ধরে আছে সদানন্দ আর পুরুত-মশাই নিজের মনেই গড় গড় করে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। কিন্তু একটা কথাও যেন আর তখন কানে যাচ্ছে না তার। তার তখন কেবল মনে পড়ছে সেই রাধার গাওয়া গানটা। রাণাঘাটের বাজারের রাধা।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম।
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম॥

সদানন্দর মনে হলো প্রকাশ মামার রাধা সেদিন গানটা ঠিক গায়নি। 'শ্যামের পীরিত' নয়, ওটা হবে 'টাকার পীরিত'। 'টাকার পীরিত গরল মিশ্রিত' বললেই যেন ঠিক হতো। টাকার জন্যেই তো আজ তার দাদু বড়লোক, টাকার জন্যেই তো তারা জমিদার, টাকার জন্যেই তো আজ এই সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। অথচ এ টাকা তারও নয়, তার বাবারও নয়, তার দাদুরও নয়। এই সমস্ত যা কিছু তাদের সম্পত্তি সব তো কালীগঞ্জের বৌ-এর।

পুরুত-মশাই তখনও মন্ত্র পড়িয়ে চলেছে—যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং......

কোথা দিয়ে যে সেদিন কী ঘটে গেল তা সদানন্দ জানতেও পারলো না। কিম্বা হয়ত জানতে চাইলোও না। সব সময় প্রকাশ মামা পাশে দাঁড়িয়ে। কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলো, কী রে, অমন গোমড়া মুখ করে আছিস কেন? কী হয়েছে তোর? দেখছিস কত মেয়েছেলে রয়েছে চারদিকে, একটু চেয়ে দেখ!

চৌধুরী মশাই ভোরের ট্রেনেই চলে এলেন। আসবার সময় প্রকাশকে কাছে ডাকলেন। প্রকাশ সারারাত জেগেছে। বিয়ের সম্প্রদান থেকে শুরু করে একেবারে বাসর-ঘর পর্যন্ত। নিরঞ্জন পরামাণিকও ছিল সঙ্গে। নিরঞ্জনের ঘুমোলে চলবে না। একেবারে বাসর-ঘরের দরজার সামনেই কাছাকাছি কোথাও থাকতে হবে। যেন সে নজর রাখে একটু। যেন সদানন্দ পাগলামি না করে।

প্রকাশ বলেছিল—আমিও তো আছি জামাইবাবু, আমি রাত্তিরে ঘুমোব না।

তা নিরঞ্জন আর প্রকাশ মামা দু'জনের ভরসাতেই চৌধুরী মশাই-এর জন্যে ব্যবস্থা-

বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি রাখেননি। পাকা বন্দোবস্ত একেবারে। নিজে আলাদা বসিয়ে তাঁকে খাইয়েছেন। চৌধুরী মশাই যে নিজে আসবেন এটা কালীকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে কল্পনার বাইরে ছিল। অত বড় রাশভারি মানুষটাকে নেহাৎ বেকায়দায় পড়েই ছেলের বরকর্তা হয়ে এত দূরে আসতে হয়েছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগেও জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আমি শুতে যাই প্রকাশ?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি শুতে যান জামাইবাবু। আপনি কী করতে জেগে থাকবেন? আমি তো আছি, আমি আছি, নিরঞ্জন আছে—

তবু যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না চৌধুরী মশাই। বললেন—দেখো প্রকাশ, যেন আবার কেলেঙ্কারি না হয়!

প্রকাশ বললে—কেলেঙ্কারি? আমি থাকতে কী কেলেঙ্কারি হবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—মানে আবার যদি খোকা পালিয়ে যায় সেই কথাই বলছি—

—আর পালাবে না।

চৌধুরী মশাই বললেন—কীসে বুঝলে?

প্রকাশ একটু ইঙ্গিত-পূর্ণ হাসি হাসলো। বললে—বুঝি জামাইবাবু, আমি বুঝি—

—খুলে বলো না কীসে বুঝলে?

প্রকাশ বললে—সদার বউ পছন্দ হয়েছে—

—তাই নাকি? খোকা তোমায় বললে?

প্রকাশ বিশেষজ্ঞের মত ভঙ্গি করে বলে উঠলো—ও কি আর মুখে বলবার জিনিস জামাইবাবু? ও বুঝে নিতে হয়।

চৌধুরী মশাই বললেন—তাহলে তো আর কোনও ভাবনাই নেই—

প্রকাশ বললে—না, কোনও ভাবনা নেই, আপনি নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে যান।

এর পরে চৌধুরী মশাই-এর কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তারপর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যাবার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যাবার আগে আবার ডেকে পাঠালেন প্রকাশকে। শুধু প্রকাশ নয়, তার সঙ্গে নিরঞ্জন পরামাণিকও এলো।

তাদের জন্যেই চৌধুরী মশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন—কী খবর প্রকাশ?

প্রকাশ বললে—যা বলেছিলুম তাই—

—তার মানে?

প্রকাশ বললে—তার মানে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, জিজ্ঞেস করুন এই নিরঞ্জনকে—একে বাসর-ঘরের কাছেই একটা বারান্দায় শুতে বলেছিলুম। ও শুয়ে শুয়ে সব শুনেছে—

চৌধুরী মশাই নিরঞ্জনের দিকে চাইলেন।

নিরঞ্জন বললে—হ্যাঁ বড়বাবু, শালাবাবু যা বলেছেন ঠিক বলেছেন। খোকাবাবু কাল বাসর-ঘরে কথা বলেছেন।

—কী কথা?

—আজ্ঞে বাসর-ঘরে কাল রাত্তিরে মেয়েরা গান গাইছিলেন তো, আমি বারান্দা থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলাম। গানের পর মেয়েরা বরকে জিজ্ঞেস করলেন—গান কেমন লাগলো!

—তা খোকা কী উত্তর দিলে?

—খোকাবাবু মনে হলো খুব খুশী। খোকাবাবুর গলা শুনতে পেলুম। খোকাবাবু বললেন—খুব ভালো।

যাক, সুখবরটা শুনে চৌধুরী মশাই খুশী হলেন। তাহলে আর ভয় নেই।

প্রকাশ বললে—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম জামাইবাবু, ও কনের মুখ দেখলে সদার সব পাগলামি বাপ্ বাপ্ বলে পালিয়ে যাবে। অমন ডানাকাটাপরী দেখলে মুনি-ঋষিদের ধ্যান পর্যন্ত ভেঙে যায় তো আমাদের সদা তো কোন্ ছার—

ততক্ষণে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী মশাই আর থাকতে পারলেন না। ট্রেনে ওঠবার আগে প্রকাশ চৌধুরী মশাই-এর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললে—একটা কথা ছিল জামাইবাবু—

—কী?

—কিছু টাকার দরকার ছিল। আজ তো আবার বর-কনেকে নিয়ে যেতে হবে। অনেক খরচ হবে। মেয়েদের শয্যা-তুলুনি আছে, ওদের পরামাণিককে কিছু টাকা দিতে হবে। তারপর.....

চৌধুরী মশাই বললেন—কিন্তু তোমার হাতে যে কাল তিনশো টাকা দিলুম—

—আজ্ঞে তিনশো টাকায় কী হবে? সে টাকা তো আছে। তবু হাতে একটু বেশি টাকা থাকলে বুকে বল-ভরসা হয়—

চৌধুরী মশাই জামার ভেতরের পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বার করলেন। করে এক এক করে গুনতে লাগলেন। বার বার গুনে বললেন—এই নাও—প্রকাশ টাকাটা নিয়ে বললে—কত?

—আরো একশো দিলাম—

—একশো মোটে? একশোতে কী হবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা এত টাকা তোমার কীসে লাগবে শুনি? রজব্ আলী তো ইস্টিসানে এসে হাজির থাকবে, তারপর পালকি-ভাড়া বর-কনে বাড়ি পৌঁছুলে সব মিটিয়ে দেব—

তা তাই-ই সই। নোট ক'খানা গুনে প্রকাশ সেগুলো পকেটে পুরে ফেললে। টাকা নিয়ে বেশি ছেঁড়াছিঁড়ি করতে নেই তা প্রকাশ জানে। তাতে কাজ হাঁসিল হয় না।

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিলে।

এসব কবেকার ঘটনা। আজ এতদিন পর অতীতের সমস্ত পথগুলো পরিক্রমা করতে গিয়ে সেদিনকার সবকিছু খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগলো সদানন্দ চৌধুরীর। সেদিনকার সেই ছেলেটাকে যেন চেষ্টা করলে এখনও চেনা যায়। চেনা যায় তার ছোটখাটো কথা আর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ঘটনাগুলো। অথচ কেউই তাকে চিনতে পারেনি। তার দাদু, তার বাবা, মা, প্রকাশ মামা, সবাই তাকে তাদের প্রচলিত নিয়মের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা পৃথিবী থেকে নির্বাসন দিয়েছিল। নির্বাসন দিয়ে তার মাথার ওপর শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত দায় থেকে নিজেদের বিবেককে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। তারা ভেবেছিল তাদের ছাঁচে সদানন্দকে ঢালাই করে শুধু বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। সদানন্দ তাদের প্রতিনিধি হয়ে দিনের পর দিন সেই একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি করে যাবে, যে-নিয়মের প্রবর্তন করে এসেছেন সমস্ত মানুষ জাতের পূর্বপুরুষ। সদানন্দ সেই দিন থেকেই ভেবেছিল এতদিনকার সেই নিয়ম সে ভাঙবে। সে ভেবেছিল সে বলবে আমি তোমাদের কেউ নই! তোমাদের পাপের ভাগীদার যেমন আমি নই, তেমনি তোমাদের পুণ্যের

ভাগীদারও নই আমি। তোমাদের সমস্ত পাপ-পুণ্যের দুষ্কৃতি-সুকৃতি নিয়ে তোমরা সুখে থাকো, শুধু আমাকে মুক্তি দাও তোমরা। আমি যেমন তোমাদের সাহায্য চাই না তেমনি চাই না তোমাদের উত্তরাধিকারের অধিকারও।

অথচ সমস্ত অপরাধ থেকে দায়মুক্ত হয়েও আজ সে একজন আসামী। ভাগ্যের বোধ হয় এও এক বিচিত্র পরিহাস।

ভদ্রলোক পাশে পাশে আসছিল। ভদ্রলোক সারাজীবন আসামী আর ফরিয়াদী নিয়ে জীবন কাটিয়েছে। অনেক আসামী দেখেছে আবার অনেক ফরিয়াদীও দেখেছে। কিন্তু এমন আসামী আর দেখেনি।

বললে—একটু পা চালিয়ে চলুন—পা চালিয়ে চলুন—

সদানন্দবাবু হাসলেন। যেন পা চালিয়ে চললেই বেশি এগিয়ে যাওয়া যায়! তার দাদু, তার বাবা, তার মা, তার প্রকাশ মামা, তার দাদামশাই, সবাই তো সংসারে একটু পা চালিয়েই চলতে চেয়েছিল। তারা সবাই-ই ভেবেছিল পা চালিয়ে চললেই বুঝি তারা আরো একটু এগিয়ে যেতে পারবে। ভেবেছিল আরো টাকা, আরো ক্ষমতা, আরো আয়ু পাবে আর একটু পা চালিয়ে চললেই! তারা পা চালিয়েই চলতে চেয়েছিল, কিন্তু থেমে থেমে এগিয়ে যাওয়ার প্রজ্ঞা তাদের আসেনি। তারা জানতো না যে যারা থেমে থাকে তারাই চলা-লোকদের হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়।

আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল তাদের। তাদের সকলের।

সদানন্দর মনে আছে রসিক পালের বাড়িতে যেমন আজকে কাছারির পেয়াদা এসে হাজির হয়েছে সমন নিয়ে, ঠিক তেমনিই একদিন ওই প্রকাশ মামা তার কাছে এসে হঠাৎ হাজির হয়েছিল। সদানন্দ তখনও এখনকার মত নিঃস্ব নিঃসহায়। কলকাতার এক ধর্মশালায় তখন অন্নদাস হয়ে জীবন কাটছে তার।

প্রকাশ মামা তাকে দেখে অবাক। বললে—আমি তো তোকে খুঁজতেই বেরিয়েছি রে? তুই এখানে রয়েছিস?

সদানন্দ বললে—কেন? আমার সঙ্গে আবার তোমার কী দরকার?

প্রকাশ মামা বললে—তোর জন্যে কোথায় কোথায় গিয়েছি জানিস?

সদানন্দ বিরক্ত হয়ে উঠলো প্রকাশ মামার ওপর। বললে—ও-সব কথা থাক, তুমি আমার খোঁজ করছো কেন তাই বলো।

প্রকাশ মামা বললে—কেন, তোর এত তাড়া কিসের? আমি তো তোর ভালোর জন্যেই এসেছি, আমার নিজের তো কিছুই না—

সদানন্দ বললে—আমার তুমি অনেক ভালো করেছ মামা, আর আমার ভালোর দরকার নেই। তুমি আমার ভালোর জন্যেই আমার বিয়ে দিয়েছিলে, আমার ভালোর জন্যেই তোমরা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তোমরা আমার ভালোর জন্যেই কপিল পায়রাপোড়াকে ভিটে মাটি ছাড়া করেছিলে, আর আমার ভালোর জন্যেই তোমরা কালীগঞ্জের বৌ-এর সর্বনাশ করেছিলে, আবার আমার ভালোর জন্যেই তোমরা সেই বংশী ঢালীকে দিয়ে তাকে খুনও করিয়েছিলে। দয়া করে তোমরা আর ভালো করতে চেয়ো না মামা। আমার যথেষ্ট ভালো করেছ, আর ভালো করতে হবে না—

কথাগুলো প্রকাশ মামার ভালো লাগলো না। বললে—তুই তো বেশ কথা বলতে

শিখেছিস, অথচ জামাইবাবু বলতো—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন তো বেশ সেয়ানা মানুষের মত কথা বলছিস তুই!

সদানন্দর বেশী কথা বলতে সেদিন ভালো লাগেনি।

বললে—তুমি কি করতে আমার কাছে এসেছ তাই আগে বলো—

প্রকাশমামা হঠাৎ বলে উঠলো—তোর বাবা মারা গেছে—

খবরটা শুনে সদানন্দর চমকে যাওয়া উচিত ছিল। অন্তত কিছুটা হতবাক হওয়া। কিন্তু সেদিন কিছুই হয়নি তার। সে শুধু প্রকাশমামার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল। আর যেন কিছু করবার ছিল না তখন তার।

প্রকাশমামা বললে—আমি এখন নবাবগঞ্জ থেকে আসছি। সেখানেও তোকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। শেষকালে এলুম কলকাতায়। ভাবলুম এখানে তোকে কোথাও পাবো। তা এখেনেও অনেক জায়গায় খুঁজেছি। শেষে ভাগ্যি ভালো তাই হঠাৎ বউবাজারের সেই পুলিসের বড়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম মানদা মাসির খোঁজে। সেখানে তাদের বাড়ির চাকর মহেশের কাছে এই ধর্মশালার খবর পেলুম। তা এখন চল্ আমার সঙ্গে—

—কোথায়?

—ভাগলপুরে। তোর মামার বাড়িতে।

—সেখানে গিয়ে কী হবে? আমার কেউ নেই, আমি কোথাও যাবো না।

প্রকাশমামা বললে—কেউ নাই বা থাকলো, কিন্তু তোর বাবার সম্পত্তি তো আছে। অত লাখ টাকার সম্পত্তি তুই ছেড়ে দিবি! সে-সম্পত্তি তো সবই তোর রে, তুই তো বাবার একমাত্র ছেলে, একমাত্র ওয়ারিশন—

—কিন্তু টাকা নিয়ে কী করবো? আমার টাকার দরকার নেই—

কিন্তু সদানন্দ ছাড়তে চাইলেও প্রকাশমামা ছাড়বার লোক নয়। বললে—তুই টাকা না নিলে কে নেবে সে টাকা? এত টাকার সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে তুই ধর্মশালায় বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবি? আর টাকা যদি তুই না নিস তো আর কাউকে দানপত্র করে দে! আমি গরীব লোক, তোর টাকার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো টাকার দরকার আছে রে, আমি তো আর তোর মত সন্নিসী হয়ে যাইনি! তোর না হয় মাগ ছেলে কেউ নেই, কিন্তু আমার তো আছে!

এতক্ষণে সদানন্দ বুঝলো কিসের তাগিদে প্রকাশমামা তার খোঁজে সেই ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে সারা দেশ ঘুরে কলকাতায় এসেছে। আর কলকাতা কি ছোট জায়গা! কলকাতার মত জায়গায় কি কাউকে খুঁজে বার করা সহজ! যতদিন মা বেঁচে ছিল ততদিন প্রকাশমামার টাকার অভাব হয়নি। দিদির কাছে হাত পেতেছে আর টাকা নিয়ে পকেটে পুরেছে আর রাণাঘাটের বাড়িতে গিয়ে ফুর্তি করেছে। সারা জীবনটাই ফুর্তি করে বেড়িয়েছে প্রকাশমামা। এখন যখন তার জামাইবাবু মারা গেছে এখন এসেছে ভাগ্নের খোঁজে। এখন ভাগ্নের জন্যে দরদ উথলে উঠেছে তার।

সেই জন্যেই তো অনেকদিন ধরে সে ভেবেছিল যে সে তার জীবন-কাহিনীটা লিখে যাবে। লিখে যাবে যে, সে পাগল নয়। পাগল তোমরা। যে পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, যে-মানুষ কেবল কপিল পায়রাপোড়াদের গলায় দড়ি দিতে সাহায্য করে, যে-মানুষ কেবল কালীগঞ্জের বউদের বঞ্চনা করে নিজের পুঁজিপাটা বাড়ায় সেই মানুষ পাগল না হয়ে পাগল হয় কিনা সদানন্দ!

সদানন্দ বলেছিল—তা হলে চলো—

প্রকাশমামা সেদিন আদর করে সদানন্দকে ভাগলপুরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কি

প্রকাশমামা জানতো যে তার জামাইবাবুর সমস্ত সম্পত্তি অন্য একজনের ভোগে লাগবে। জানলে বোধ হয় আর ভাগ্নের সন্ধানে আসতো না প্রকাশ রায়।

কিন্তু সে-সব কথা এখন যাক্। সে-সব অনেক পরের কথা। তখন নয়নতারারও অনেক বয়েস হয়েছে। তারও তখন নতুন করে সংসার হয়েছে। সে-সব কথা বলবার সময় পরে অনেক পাবো। এখন আজকের কথা বলি। এই নয়নতারার বিয়ের কথা।

এই নয়নতারার বিয়ের দিনে সে-সব বিপর্যয়ের কথা ভাবতে নেই। সে-সব অকল্যাণের কথা এই শুভদিনে বুঝি ভাবাও অন্যায়। আজ শুধু আনন্দ করো তোমরা সবাই। আজ শাঁখ বাজাও, আজ উলু দাও, আজ বলো—যদিদং হৃদয় তব তদিদং হৃদয় মম, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—

আজ কালীকান্ত ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তানের বিয়ে। যে নয়নতারার রূপ দেখে সকলের চোখের পাতা পড়তে চাইতো না, যে-মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পণ্ডিতমশাই আর তার গৃহিণীর রাত্রে ঘুম ছিল না, সেই নয়নতারারই আজ বিয়ে। সেই বিয়েতে তোমরা আজ এসো, এসে নয়নতারাকে আশীর্বাদ করো। বলো—তুমি জন্ম-জন্ম স্বামী-সোহাগিনী হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে অক্ষয় পুণ্য অর্জন করো মা। আশীর্বাদ করো—আমার নয়নতারা যেন সুখী হয়, আমার নয়নতারা যেন স্বামী-সোহাগিনী হয়। আশীর্বাদ করো—আমার নয়নতারা যেন সিঁথির সিঁদুর নিয়ে জন্ম-জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে কাটায়—

তখন বেলা বেড়েছে।

প্রকাশমামা বেয়াই-মশাইকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। বললে—কোথায়, বেয়াই মশাই কোথায়?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য ক'দিন থেকেই ব্যতিব্যস্ত। তাঁর বিশ্রাম নেই, তাঁর দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। কোন্ দিক দেখবেন ঠিক করতে পারছেন না। প্রকাশমামার কাছে আসতেই প্রকাশমামা একেবারে ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন—কী বেয়াই মশাই, এখন জামাই পেয়ে যে আমাকে একেবারে চিনতেই পারছেন না দেখছি—আমি খেলুম কি খেলুম না, কিছুই দেখছেন না আর—

—না না, সে কী কথা বেয়াই মশাই, আপনিই তো সব! আপনি না থাকলে কি এ বিয়ে হতো?

প্রকাশমামা বললে—তা কেমন জামাই হলো বলুন? পছন্দ হয়েছে তো?

—আপনিই বলুন আপনার বৌমা কেমন হলো?

—আপনিই বেয়াই মশাই কেবল আপনার নিজের মেয়ের গর্বেই গেলেন। কেন, আমাদের ছেলে কি ফ্যাল্‌না?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—না না, তা কেন বলবো। আমার নয়নতারার অনেক পুণ্যফল ছিল তাই অমন স্বামী পেয়েছে। আমাদের কেষ্টনগরের সবাই একেবাক্যে বরের প্রশংসা করে গেছেন।

প্রকাশমামা বললে—তা হলে যাত্রার সময়টা কখন?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—পুরুতমশাই তো পাঁজি দেখে সময় ধার্য করে দিয়েছেন।

—দেখবেন যেন বেশী দেরি না হয়, ওদিকে আবার রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদল করতে হবে। সে ট্রেন মিস্ করলেই মুশকিল—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—না, সেদিকে কোনও গোলযোগ হবে না। আমি আমার লোক দিয়ে ট্রেন ধরিয়ে দেব—

তারপর হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেল। বললেন—আপনি সিগারেট-টিগারেট ঠিক পাচ্ছেন তো?

—কোথায় আর পাচ্ছি! আপনি জামাই পেয়ে গেছেন, এখন আর আমাকে কে দেখবে, আমি তো এখন পর হয়ে গেছি—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ওরে কে আছিস? ও নিতাই, ও কেষ্টধন, ও বিপিন, কে রে ওদিকে? বেয়াই মশাইকে সিগারেট দেয়নি কেউ? যেদিকে আমি দেখবো না সেই দিকেই গাফিলতি, ওরে কেষ্টধন.........

বলতে বলতে ভেতর বাড়ির দিকে সিগারেটের সন্ধানে চলে গেলেন।

নিরঞ্জন এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এতক্ষণে কাছে এল। বললে—শালাবাবু, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে—

—কাণ্ড? কীসের কী কাণ্ড?

নিরঞ্জন বললে—তেমন কিছু কাণ্ড নয়। ছোটবাবু এয়োদের সব বলে দিয়েছে—

—কী বলে দিয়েছে সদা?

—বলে দিয়েছে যে, পরশু ছোটবাবু কালীগঞ্জের বৌ-এর কাছে গিয়েছিল, সেইজন্যে গায়ে হলুদের সময় বাড়ি ছিল না।

প্রকাশমামা অবাক হয়ে গেল সদার বোকামি দেখে। বললে—সে কি রে? বলে দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তুই জানলি কী করে?

—আমাকে ওদের নাপিত বিপিন জিজ্ঞেস করছিল। ছোটবাবুকে নাকি বাসরঘরে মেয়েরা জিজ্ঞেস করেছিল—গায়ে-হলুদের সময় তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তা ছোটবাবু নাকি বলেছে—কালীগঞ্জের বৌ-এর কাছে। তাই মেয়ে-মহলে কানাঘুষো হয়েছে। তাই বিপিন জানতে চাইছিল আমার কাছে কালীগঞ্জের বউ কে? কালীগঞ্জের বৌ-এর বয়েস কত, এই সব.....

—তা তুই কী বললি?

নিরঞ্জন বললে—আমি আর কী বলবো। আমি শুধু বললুম সে এক বুড়ি থুত্থুড়ি মেয়েমানুষ।

তা জিজ্ঞেস করলে না বর কেন গিয়েছিল সেখানে?

—না, তা জিজ্ঞেস করেনি। আর জিজ্ঞেস করলেও তো আমি কিছু বলতে পারতুম না! আমি বলতুম বর কালীগঞ্জের বৌ-এর কাছে কেন গিয়েছিল তা আমি নাপিত মানুষ কী করে জানবো?

প্রকাশমামা কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। নিরঞ্জনকে সেখানে ছেড়ে ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটলো। ভেতরে তখন অনেক মেয়ে-পুরুষের ভিড়। প্রকাশমামা সেই দিকে যেতেই মেয়েরা মাথার ঘোমটা টেনে দিলে।

কে একজন দৌড়ে এসে প্রকাশমামার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিলে। বললে—নিন সিগারেট নিন—

সিগারেট নিয়ে প্রকাশমামা বললে—সিগারেট নিচ্ছি, কিন্তু বর কোথায় গো তোমাদের? একবার ডেকে দাও তো আমার কাছে—কী করছে এখন বর?

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে রাস্তা হয়ে গেল বেয়াই মশাইয়ের জন্যে। বরকর্তা বরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একটু জায়গা ছাড়ো গো, রাস্তা দাও। ও রাঙাদিদি, একটু নড়ে বোস,

একটু গতর ওঠাও। বরকর্তা বরের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে—

চারিদিকে বাসি লুচি আর তরকারির গন্ধ। ছোট বাড়িতে লোক বেশি হলে যা হয় সেই অবস্থা। শেষকালে বরের ঘরে যেতেই দেখলে সদানন্দ একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। সারারাত ঘুম না হলে যেমন হয় সেই রকম চেহারা। উস্কো-খুস্কো চুল। ম্রিয়মাণ হয়ে বসে ছিল সে আর সামনে অনেকগুলো মহিলা।

—সদা!

প্রকাশমামার গলা শুনে যেন অকূলে কূল পেলে সদানন্দ। মুখ তুলে চাইলে। বললে—কী?

প্রকশমামা বললে—একবার আমার সঙ্গে এদিকে আয় তো।

সদানন্দ সমস্ত রাত এতটুকুও ঘুমোয়নি। সমস্ত রাতই মেয়েরা বিরক্ত করেছে, কথা বলেছে। গান গাইবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে। এক-একবার তার মনে হয়েছে এখান থেকে সে অন্য কোথাও চলে যায়। কিন্তু কেমন করে যাবে! এবার এতগুলো অচেনা লোকের মধ্যে কাটিয়ে খুব আড়ষ্ট হয়ে ছিল। এবার প্রকাশমামাকে দেখে যেন একটু সহজ হলো।

প্রকাশমামা আগে আগে চলতে লাগলো। সদানন্দও তার পেছন-পেছন।

প্রকাশমামা চলতে চলতে পেছন না ফিরেই জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে তোর ঘুম হয়েছিল রে?

সদানন্দ বললে—না—

—ঘুম হয়নি ভালোই হয়েছে। আমার বিয়ের সময় আমারও বাসর-ঘরে ঘুম হয়নি। ওর জন্যে ভাবিসনি। কেমন বৌ দেখলি? পছন্দ হয়েছে তো?

বাসর-ঘরের মধ্যে একজন কে বলে উঠলো—ও লো, ও লোকটা বরের কে লো?

কনের এক মাসী বললে—ওই তো হলো আসল কর্তাগো, বরকর্তা, বরের মামা। ওই মামাই তো এই বিয়ের সম্বন্ধটা করেছে—

প্রকাশমামা সদানন্দকে নিয়ে তখন বার-বাড়ির একটা ঘরের একান্তে এসে দাঁড়ালো। আশে-পাশে কেউ নেই দেখে প্রকাশমামা বললে—আয় বোস, এখানটা একটু নিরিবিলি মতন আছে—

কালীগঞ্জের জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তী প্রায়ই গৃহিণীকে বলতেন—তোমার ভাবনা কী, দুই ছেলে রইলো, তারাই তোমাকে দেখবে—

চক্রবর্তী মশাই-এর একবার শরীর ভেঙে গিয়েছিল। প্রায় যায়-যায় অবস্থা। তখন গৃহিণী বড় মুষড়ে পড়েছিলেন। তখন থেকেই কেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জমিদারিই থাক আর টাকাকড়ি থাক মানুষের জীবন এই আছে এই নেই। বুঝতে পেরেছিলেন এই এত শক্ত-সমর্থ মানুষটা এ ক-দিনের অসুখেই যদি এমন কাতর হয়ে পড়েন তা হলে আসল হচ্ছে স্বাস্থ্য, আসল হচ্ছে পরমায়ু। আর সব চেয়ে আসল সত্য হচ্ছে ভগবান। তাই তখন থেকেই চক্রবর্তী-গৃহিণী পুজো-পাঠ নিয়ে মেতে উঠলেন।

অসুখ মানুষের হয় বটে, কিন্তু আবার সেরেও ওঠে একদিন। সেই মানুষ গৃহিণীর কাতরতা দেখে অভয় দিতেন। বলতেন—তোমার ভাবনা কী বৌ, আমি না-ই বা থাকলুম, তোমার দুই ছেলে তো রইল, ওরাই তোমাকে দেখবে—

গৃহিনী বলতেন—ওরা আর কত বড়, ওরা কী-ই বা বোঝে—

চক্রবর্তী মশাই বলতেন—যতদিন ওরা বড় না হয় ততদিন নারায়ণ আছে, আমার নায়েবমশাই আছে—

চক্রবর্তী মশাই নরনারায়ণকে নারায়ণ বলে ডাকতেন।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন, আর আশ্চর্য মানুষের বিশ্বাস! মানুষের জীবনেরও যেমন স্থিরতা নেই, মানুষের বিশ্বাসেরও তেমনি কি কোনও স্থিরতা থাকতে নেই? সত্যিই কত না বিশ্বাস করতেন তিনি নায়েব মশাইকে! আর নিজের নায়েবকেই যদি বিশ্বাস না করতে পারবো তো কাজ-কর্মই বা চলবে কেমন করে!

আর নরনারায়ণও ছিলেন তেমনি বিশ্বস্ত নায়েব। হিসেবের একটা পয়সা যেন তার এদিক ওদিক হতে নেই। নিজের ছেলেকেও বোধ হয় অমন করে বিশ্বাস করা যায় না যতখানি বিশ্বাস করা যেত নরানারায়ণ চৌধুরীকে। সেই পনেরো টাকা মাইনের কর্মচারী সেদিন যে শুধু বিশ্বাসী ছিলেন তাই-ই নয়, পিতার মতন ভক্তিশ্রদ্ধাও করতেন চক্রবর্তী মশাইকে।

যখন সেই চক্রবর্তী মশাই একদিন হঠাৎ মারা গেলেন তখন তাঁর গৃহিণীর মাথায় আকাশ থেকে একেবারে বাজ ভেঙে পড়লো। দুইটি মাত্র নাবালক ছেলে তখন তাঁর। কিন্তু তারা জমি-জমার কাজ-কর্ম কিছুই বোঝে না। ওই নরনারায়ণই তখন একমাত্র ভরসা। ওই নরনারায়ণই তখন গৃহিণীর কাছে এসে সান্ত্বনা দিয়েছিল। বলেছিল—আপনি কাঁদবেন না মা, আমি তো আছি, আপনার ভাবনা কী! আমি আপনার ছেলের মতন—

তাই সেদিন রাত্রে যখন সেই নায়েব-মশাইয়ের নাতিই তার কাছে এসে হাজির হলো তখন তাঁর মনে পড়তে লাগলো সেইদিনকার কথাগুলো। সেই কথাগুলো যেন তখনও তাঁর কানে বাজছে— আপনি কাঁদবেন না মা, আমি তো আছি, আপনার ভাবনা কী, আমি আপনার ছেলের মতন—

তা সেদিনকার সেই নারায়ণ এখন নরনারায়ণ হয়ে নবাবগঞ্জের জমিদার হয়েছে। নারায়ণ তখন সকাল বেলা রোজ এসে চক্রবর্তী মশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো। আপত্তি করলে নারায়ণ বলতো—আপনি আমাকে পায়ে হাত দিতে আপত্তি করবেন না, আমার বাবা-মা নেই, আপনারাই আমার বাবা-মা, সব কিছু—

তখন কত বিনয়ী ছিল নারায়ণ। মাঝে মাঝে নানান কাজে বাড়ির মধ্যেও আসতো। এসে বাড়ির ছেলের মত ব্যবহার করতো। চক্রবর্তী মশাই-এর গৃহিণীর কাছে এসে ছেলেমানুষের মত খেতে চাইতো।

বলতো—মা-জননী, কিছু খেতে দিন আমাকে, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে—

তখন অনেক সময় দিনের পর দিন কালীগঞ্জেই থেকেছে নারায়ণ, জমি-জমা-হিসেব-পত্র কিংবা মামলা-মকর্দমার কাজে অনেক সময় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বুক দিয়ে খেটেছে। কখনও মাইনে বাড়াতে পর্যন্ত বলেনি। চক্রবর্তী মশাই তার মাইনে বাড়ানও নি। তা মাইনের দরকারই বা তার কী ছিল? খাওয়া-দাওয়া-থাকা-শোওয়া থেকে শুরু করে জামা-কাপড় সবই তো তিনি দিতেন। পাল-পার্বণে নারায়ণের কাপড়-জামা-গামছা ছিল বাঁধা।

কিন্তু সেই নারায়ণই আবার অন্য রকম হয়ে গেল চক্রবর্তী মশাই-এর মৃত্যুর পর। মাঝে মাঝে মা-জননীর মনে হতো অমন করে নায়েব মশাইকে বিশ্বাস না করলেই ভালো হতো হয়তো। কিন্তু তখন সেই বিপদের দিনে তিনি মেয়েমানুষ হয়ে বিশ্বাস না করেই বা কী করতেন!

একদিন গিয়েছিলেন নবাবগঞ্জে। দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এত বড় বাড়ি করেছে

নারায়ণ! এত লোকজন! মনিবের বিধবা গৃহিণীকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল নারায়ণ।
বললে—আপনি আবার এলেন কেন মা-জননী?

মা-জননী বললেন—না এসে কী করবো বাবা, কতবার তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছি, তুমি একবার দেখাও করলে না। তাই নিজেই এলুম—আমার জমিজমার হিসেব-টিসেবগুলো একবার দেখতুম। আমার কী আছে না-আছে তাও বুঝতে পারছি না। আমার যদি টাকা-কড়ি থাকতো ব্যাঙ্কে তাহলে তোমাকে আর এমন করে বিরক্ত করতাম না বাবা—নেহাত বিপাকে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—

নারায়ণ বললে—আপনি আজকে যান, আমি আপনাকে যা বোঝাবার একদিন কালীগঞ্জে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসবো। আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না—

নায়েবমশাই-এর কথায় বিশ্বাস করে সেদিন চক্রবর্তী গৃহিণী ফিরে চলে গেলেন। কিন্তু নারায়ণ আর এলো না। তাঁর কথা রাখলো না। তাঁর স্বামীর অত বড় সম্পত্তি যে কোথায় কর্পূরের মত উড়ে গেল কেমন করে সব অদৃশ্য হয়ে গেল তা তিনি জানতেও পারলেন না! লোকে বলতে লাগলো—কালীগঞ্জের নায়েব জমিদারকে ঠকিয়ে নবাবগঞ্জে নিজের জমিদারি করেছে।

যারা ভালোমানুষ লোক তারা জিজ্ঞেস করলে—কালীগঞ্জের বৌকে নায়েব ঠকালে কী করে? বৌ জানতে পারলে না?

লোকে বললে—আরে, বউ তো ভালো মানুষ, তার ছেলে মেয়ে-জামাই কেউ নেই, কী করে জানতে পারবে?

তা সত্যি কথা। কালীগঞ্জের বউ কি কোর্ট-কাছারি করবে? নায়েবের নামে কাছারিতে নালিশ করবে?

কিন্তু নরনারায়ণ চৌধুরীকে যত খারাপ লোক ভাবা গিয়েছিল তত খারাপ সে নয়। কালীগঞ্জের বউ যখন টাকার তাগাদায় আসতো তখন তাকে নারায়ণ একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দিত না। কখনও দশ টাকা, কখনও পাঁচ টাকা, আবার কখনও বা পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছে। বলেছে—আর তোমার এখানে আসতে হবে না মা জননী, এবার আমি সব টাকাটা নিজে গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসবো—

কথাটা শুনে কালীগঞ্জের বউ-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বলেছিল—তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এলে তো খুবই ভালো হয় বাবা, আমার তাহলে আর এ হেনস্থা হয় না।

নরনারায়ণও ভেবেছিলেন বুড়ি আর কতদিনই বা বাঁচবে! এই রকম স্তোক-বাক্য দিয়ে দিয়ে যতদিন কাটানো যায়। তারপর একদিন বউ মারা যাবে। তখন আর কেউই তাগাদা করতে আসবে না। তখন একেবারে চিরকালের মত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কালীগঞ্জের বউ-এরও বোধ হয় অক্ষয় পরমায়ু। তারপর সেই নারায়ণের সন্তান হলো। সেই সন্তানের আবার বিয়েও হলো। তারও আবার ছেলে হলো। কিন্তু পাওনা টাকা কালীগঞ্জের বউ পেলে না। তখনও আসতো সেই কালীগঞ্জের বউ। তার আসার খবর পেয়েই নরনারায়ণ চৌধুরী রেগে যেতেন।

বলতেন—আবার এসেছে বুড়ি?

কৈলাস গোমস্তা বলতো—চলে যেতে বলবো?

কর্তাবাবু বলতেন—হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যেতে বলো? বলো আমার শরীর খারাপ, এখন দেখা হবে না।

সেই সময়েই একদিন ছোট একটা ছেলে পালকির কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বলেছিল—আমি পালকিতে চড়বো—

কালীগঞ্জের বউ বলেছিল—এ কে গো? কার ছেলে?

দীনু বলেছিল—এই তো কর্তাবাবুর নাতি—

কালীগঞ্জের বউ সদানন্দকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলেছিল—তুমি পালকি চড়বে?

সদানন্দ বলেছিল—হ্যাঁ—

সেদিন সদানন্দকে পালকিতে চড়িয়েছিল কালীগঞ্জের বউ। পালকি চড়ে সদানন্দ খুব সুখী। বলেছিল—আমাকে আরো দূরে নিয়ে চলো একেবারে নদীর ঘাটের দিকে।

—নদীর ধারে গেলে যদি তোমার দাদু বকে?

সদানন্দ বলেছিল—বকুক গে। আমি দাদুকে ভয় করি না—

সেইদিনই কালীগঞ্জের বউ ছোট ছেলেটার সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীনু বলেছিল—খোকাবাবু কাউকে ভয় করে না, খুব দুষ্টু হয়েছে—

সেই-ই প্রথম পরিচয়। তারপর যতবার কালীগঞ্জের বউ নবাবগঞ্জে তাদের বাড়িতে এসেছে, ততবারই পালকি চড়বার বায়না ধরেছে। আর তাকে পালকিতে চড়িয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে কালীগঞ্জের বউ। পালকি চড়বার কেমন একটা নেশা হয়েছিল সদানন্দর। এলেই দৌড়ে যেত সদানন্দ। পালকিটা আসতে দেখলেই সদানন্দ চিনতে পারতো। ডাকত—ও কালীগঞ্জের বউ, কালীগঞ্জের বউ—

কালীগঞ্জের বউ পালকি থেকে নেমেই সদানন্দকে কোলে করতো।

বলতো—আমি যে কালীগঞ্জের বউ তা তোমাকে কে বললে খোকাবাবু?

সদানন্দ বলতো—তোমার নাম তো কালীগঞ্জের বউ। আমাকে গৌরী পিসি সব বলেছে—তুমি কালীগঞ্জেই তো থাকো—

—তুমি কালীগঞ্জে যাবে? যাবে আমাদের কালীগঞ্জে?

—যাবো। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

—কিন্তু কালীগঞ্জে গেলে তোমার দাদু যে বকবে!

—দাদু বকুক! দাদু খুব দুষ্টু, দাদু তো আমাকে রোজ বকে! তবু আমি ভয় পাই না!

—তোমাকে কেন বকে দাদু?

সদানন্দ বলতো—আমি দুষ্টুমি করি বলে!

—কেন তুমি দুষ্টুমি করো?

সদানন্দ বলতো—বেশ করবো দুষ্টুমি করবো! দাদু তোমাকে টাকা দেয় না কেন?

কালীগঞ্জের বউ অবাক হয়ে যেত সদানন্দর কথা শুনে।

সদানন্দ বলতো—জানো, দাদু কাউকে টাকা দেয় না। দাদুর অনেক টাকা, তবু দাদু টাকা দেয় না কাউকে।

কালীগঞ্জের বউ কেমন অবাক হয়ে যেত বাচ্চা ছেলের মুখের কথা শুনে। বলতো—কী করে বুঝলে দাদু আমাকে টাকা দেয় না?

সদানন্দ বলতো—গৌরী পিসী বলেছে—

গৌরী পিসী! কালীগঞ্জের বউ এ বাড়ির মেয়েদের বিশেষ কাউকেই চিনতো না! অন্দর-মহলেও কোনও দিন ঢোকবার সুযোগ হয়নি। এ-বাড়ির সমস্ত লোকজন বরাবর তাকে

দেখলেই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করতো—গৌরী পিসী কে?

সদানন্দ বলতো—এ মা, গৌরী পিসীকে তুমি চেনো না? সে তো আমাকে খাইয়ে দেয়! ভাত খাইয়ে দেয়, দুধ খাইয়ে দেয়, মাছ খাইয়ে দেয়। আমি যদি না খাই তাহলে গৌরী পিসী আমাকে ভয় দেখায়—

—কী ভয় দেখায়?

—বলে জুজুবুড়িকে ডেকে ধরিয়ে দেবে।

এত দুঃখের মধ্যেও কালীগঞ্জের বউ-এর মুখে হাসি আসতো ছোট ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা শুনে।

কালীগঞ্জের বউ-এর পালকিতে বসে সদানন্দর মুখে যেন কথার খই ফুটতো। অনেক কথা বলে যেত গড়-গড় করে। বলতো—জানো, আমি যখন বড় হবো তখন তোমাকে টাকা দেব।

—আমাকে তুমি টাকা দেবে?

হ্যাঁ তোমাকে টাকা দেব, মানিক ঘোষকে টাকা দেব, দুলে মাটকে, কপিল পায়রা-পোড়াকে সবাইকে টাকা দেব। তোমাদের জমি আমি খাস করে নেব না। জমি দেব তোমাকে, ধান দেব, গুড় দেব, তোমাকে সব দেব!

আশ্চর্য ছোট বয়েসের মন আর ছোট বয়সের সঙ্কল্প। কালীগঞ্জের বউ-এর মনে হতো ছোট বয়েসে বোধ হয় সবাই এই রকমই থাকে। ছোট বয়েসে সবাই-ই উদার হতে পারে, দাতা হতে পারে। তারপর বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি যত গোল বাধে আর যত স্বার্থচিন্তা আর জটিলতা এসে হাজির হয়। ছোট বয়েসে কালীগঞ্জের বউও তো সকলকে বিশ্বাস করতো। শুধু ছোট বয়েসে কেন, অনেক বেশি বয়েস পর্যন্ত যে-যা চেয়েছে সবাইকে সব কিছু দিয়েছে কালীগঞ্জের বউ। সকলকেই বিশ্বাস করেছে। নইলে এই নায়েব মশাই-ই কি এমন করে তার সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারতো! দশটা আমবাগান তিনটে বড় বড় বিল, আর জমি যে কত বিঘে তার কোনও হিসেবই রাখবার দরকার হতো না। আর তার হিসেব যে কোনও দিন রাখতে হবে তাও কখনও কালীগঞ্জের বউ স্বপ্নেও ভাবেনি। নায়েব মশাই-ই সব দেখতো আর নায়েব মশাই-ই সব আদায় করতো। খাজনা যেমন আদায় করতো তেমনি খাজনা দিতও সবকারী কাছারিতে। জমিতে কত ধান হচ্ছে আর কত পাট, কত ছোলা, কত সরষে তার হিসেব নেবার দরকারও কখনও হয়নি কালীগঞ্জের বউয়ের।

কিন্তু শেষকালের দিকে কালীগঞ্জের বউ-এর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তবু সেই ভাঙা শরীর নিয়ে নবাবগঞ্জে আসতো!

একবার বড় রাগ হয়ে গিয়েছিল কালীগঞ্জের বউ-এর। আর থাকতে পারে নি। বলে ফেলেছিল—তবে কি আমার টাকাটা তুমি ঠকিয়েই নিলে নায়েব মশাই? এই-ই ছিল তোমার মতলব? তাহলে আগে বললে না কেন?

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—কেন, আগে বললে কী করতে?

—আগে বললে এই হয়রানিটা আর হতো না আমার। এই পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আমায় ঘোরাচ্ছো, ভাবছো মাথার ওপর ভগবান নেই?

নরনারায়ণ তখন শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন সব সময়ে। কথাটা শুনে তাঁর ভালো লাগলো না।

বললেন—কেন, ভগবান থাকলে আমার কী করতো?

কালীগঞ্জের বউ বললে—ভগবান তুমি মানো আর না মানো, আমি মানি। আমি সেই ভগবানের নাম করে বলে যাচ্ছি বামুনের মেয়েকে তুমি ঠকিয়েছ, এতে তোমার ভালো হবে

না নারাণ, তোমার সর্বনাশ হবে—

—তার মানে?

—তার মানে তুমি আমার যেমন সর্বনাশ করেছ তেমনি তোমারও সর্বনাশ হবে।

নরনারায়ণ চৌধুরীর চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠলো। বললেন—তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি—

তারপর ডাকতে লাগলেন—দীনু, ও দীনু—

কালীগঞ্জের বউ বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—দীনুকে ডাকছো কেন? আমাকে সে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে বলে?

—কী জন্যে ডাকছি তা দীনু এলেই দেখতে পাবে, আমাকে আর মুখে বলতে হবে না। ও দীনু দীনু—ও দীনু—

কালীগঞ্জের বউ বললে—তার আর দরকার হবে না। আমার দশ হাজার টাকার জন্যে তোমাকে আর মহাপাতক হতে হবে না! তার আগেই আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু.....

বলতে বলতে যেন একটু দম নিয়ে নিলে কালীগঞ্জের বউ। বললে—কিন্তু আমি যদি বামুনের বংশে জন্মে থাকি, আর আমি যদি এক বাপের মেয়ে হই তো আমি এই তোমাকে শাপ দিয়ে গেলুম যে তুমি নির্বংশ হবে নারাণ, তুমি নির্বংশ হবে। তুমি যাদের জন্যে টাকা জমিয়ে রাখছো এ কারো ভোগে লাগবে না, কারো ভোগে লাগবে না—

বলে কালীগঞ্জের বউ এক নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় দীনুর সঙ্গে সদানন্দ এসে ঢুকলো।

—কালীগঞ্জের বউ, ও কালীগঞ্জের বউ!

কর্তাবাবু দীনুকে দেখে ধমকে উঠলেন—এই দীনু, আমি তোকে ডাকলাম তা তুই আবার খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি কেন এখেনে?

সদানন্দ বললে—বেশ করেছে আমাকে নিয়ে এসেছে, তুমি বলবার কে? আমি কালীগঞ্জের বউকে দেখতে এসেছি—

তারপর কালীগঞ্জের বউ-এর দিকে চেয়ে বললে—আমাকে পালকি চড়াবে না কালীগঞ্জের বউ? পালকি চড়াবে না আমাকে?

কালীগঞ্জের বউ সদানন্দকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তারপরই আবার যেমন সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল তেমনি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল। সদানন্দও তার পেছন-পেছন ডাকতে ডাকতে চলতে লাগলো—ও কালীগঞ্জের বউ.....

নরনারায়ণ চৌধুরী রেগে উঠলেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস দীনু? খোকাকে ধর্, খোকা যে চলে গেল রে, খোকা যে চলে গেল কালীগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে, ধর ওকে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ওকে ধরে আন্—কিন্তু ততক্ষণে কালীগঞ্জের বউ বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে তার পালকিতে উঠে পড়েছিল। চারজন বেহারা পালকিটা কাঁধে তুলতে যাচ্ছে।

এমন সময় সদানন্দও পেছনে গিয়ে ডাকলো—আমাকে আজ পালকি চড়ালে না কালীগঞ্জের বউ?

বেহারা চারজন পালকিটা তুলতে গিয়ে একটু বুঝি থেমে গিয়েছিল। কিন্তু ভেতর থেকে কালীগঞ্জের বউ ধমক দিয়ে উঠলো—কইরে দুলাল, পালকি তোল্—

—আজ্ঞে মা ঠাকরুণ, খোকাবাবু যে পালকিতে উঠতে চাইছে—

কালীগঞ্জের বউ ধমকে উঠলো—যে সে পালকিতে উঠতে চাইলেই অমনি ওঠাবি তোরা? না, ওঠাতে হবে না—আমি যা বলছি তাই কর—

দুলালরা আর দেরি করলে না। পালকি কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলে।

সদানন্দ কাঁদতে কাঁদতে পেছনে-পেছনে ছুটতে লাগলো—ও কালীগঞ্জের বউ, কালীগঞ্জের বউ—

ছুটতে ছুটতে বোধ হয় সদানন্দ পালকির সঙ্গে বার-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল। চৌধুরী মশাই চণ্ডীমণ্ডপে বসে ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন—ওরে, খোকা যে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ ধর ওকে, ওরে কে আছিস, দীনু—

গৌরী ভেতর-বাড়ি থেকে দৌড়ে এল—ও খোকা, খোকা, কোথায় যাচ্ছো?

ওদিকে যেতে নেই, আমি তোমাকে পালকি চড়াবো, তুমি এসো আমার কাছে—

বলে খপ করে সদানন্দকে ধরে ফেলেছে। সদানন্দও কেঁদে উঠেছে—কালীগঞ্জের বউ চলে গেল, আমাকে পালকি চড়ালে না—

গৌরীর কোলে উঠেও সে কাঁদতে লাগলো। আর ততক্ষণে দীনুও কর্তাবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বার-বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হয়েছে।

চৌধুরী মশাই চণ্ডীমণ্ডপ থেকে দীনুকে দেখে বলে উঠলেন—কোথায় থাকিস রে তুই দীনু, আর একটু হলেই খোকা এখ্খুনি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছিল—

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই কৈলাস গোমস্তা চণ্ডীমণ্ডপে এল দৌড়তে দৌড়তে। বললে—ছোটবাবু, কর্তাবাবু কেমন করছেন, আপনি একবার আসুন—

—বাবা? বাবার কী হয়েছে?

কৈলাস গোমস্তা তখনও হাঁপাচ্ছিল। বললে—এই কালীগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে রাগারাগি করে কথা বলতে গিয়েই কর্তাবাবু কেমন হাঁপিয়ে উঠেছেন, আমার সুবিধে মনে হচ্ছে না—

চৌধুরী মশাই আর দাঁড়ালেন না। সোজা ভেতর-বাড়িতে ঢুকে একেবারে কর্তাবাবুর ঘরে চলে গেলেন। দেখলেন কর্তাবাবু চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছেন, চোখ দুটো বোঁজা। বুকটা জোরে জোরে উঁচু-নিচু হচ্ছে। যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কৈলাস গোমস্তাও পাশে এসে দাঁড়ালো। দীনু এল। গৌরী পিসি এল। বাড়িময় খবর রটে গেল কর্তাবাবুর অসুখ হয়েছে।

তারপর রাণাঘাট থেকে ডাক্তার এল, কবিরাজ মশাই এল। ওষুধের বন্যা বয়ে গেল। ডাক্তার কবিরাজ দুজনেই বলে গেল একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

তারপর থেকে নিয়ম হলো কালীগঞ্জের বউ যদি এর পর আসে তো আর তাকে কর্তাবাবুর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। কালীগঞ্জের বউ-এর জন্যেই এই বিপর্যয় ঘটলো।

কিন্তু সেই থেকেই সদানন্দের কৌতূহল হলো—ওই কালীগঞ্জের বউ কেন দাদুর কাছে আসে? কীসের টাকা চায়? কার টাকা? দাদু কালীগঞ্জের বউকে টাকা দেয়ই না বা কেন?

এমন প্রশ্নের কেউই ঠিকমত জবাব দিত না।

দীনু বলতো—কালীগঞ্জের বউ খুব দুষ্টু—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—কেন, কেন দুষ্টুমি করে কালীগঞ্জের বউ?

দীনু বলতো—যারা দুষ্টু লোক তারা তো কেবল দুষ্টুমিই করে, আর তো কিছু করে না।

—কিন্তু দাদু তার টাকা দেয় না কেন? টাকা না পেলে কালীগঞ্জের বউ চাল কিনবে কী করে? কাপড় কিনবে কী করে?

যত দিন যেতে লাগলো এই সব প্রশ্নই তার মাথায় ঢুকতে লাগলো। তারপর বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই সে জানতে পারলো। জানতে পারলো দাদু শুধু কালীগঞ্জের বউকেই ঠকায় নি, কপিল পায়রাপোড়াকেও ঠকিয়েছে, মানিক ঘোষকেও ঠকিয়েছে, ফটিক প্রামাণিককেও ঠকিয়েছে। জানতে পারলো রাণাঘাটের সদরে তাদের উকিল-বাড়ি আছে, সেখানে তাদের উকিলটা কেবল মামলা করে। মামলা করে করে নবাবগঞ্জের লোকদের জমি-জমা নিলেমে ডেকে নেয়, বাকি খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি খাস করে নেয়। বংশী ঢালীকে দিয়ে লাঠিবাজি করায়। তারপর চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে অনেককে তালাচাবি বন্ধ করে উপোস করিয়ে মারে। সে-সব কেউ টের পায় না। সদানন্দ অনেক দিন সেই দিকে যেতে চেয়েছে। কিন্তু জায়গাটা ঝোপ-ঝাড়-ঘেরা বলে সন্ধ্যেবেলা যেতে ভয় করতো তার খুব। আর যখন বংশী ঢালীকে ওদিক থেকে আসতে দেখতো তখন সদানন্দরও যেন কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠতো।

সে বংশী ঢালীকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো বংশী, এ-ঘরে থাকতে তোমার ভয় করে না?

বংশী ঢালী হাসতো সনানন্দর কথা শুনে।

বলতো—ভয় করবে কেন খোকাবাবু, ওখানে তো আমি রাত্তিরে ঘুমোই—ওই তো আমার ঘর—

সদানন্দ আবদার ধরতো—আমি তোমার ঘরে যাবো বংশী—

—আমার ঘরে কী করতে যাবে? আমি গরীব লোক, আমার ঘরে থাকতে তোমার কষ্ট হবে—

বলে ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত। তারপর বলতো—চলো খোকাবাবু, তোমাকে আমি মাছ ধরা দেখতে নিয়ে যাই—

বলে বিলের ধারে খ্যাপ্‌লা জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখাতে নিয়ে যেত।

এতদিন পরে কালীগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে সদানন্দর সেই সব কথা বলতে-বলতেই অনেক রাত হয়ে গেল। কালীগঞ্জের বউ নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে দিলে সদানন্দকে। বললে—এবার বাবা তুমি নবাবগঞ্জে ফিরে যাও—তোমার দাদু এতক্ষণে তোমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে—

—না, আমি আর যাবো না।

কালীগঞ্জের বউ বললে—কিন্তু তুমি যদি না যাও বাবা তো শেষকালে আমার নামেই দোষ পড়বে। সবাই বলবে আমিই তোমাকে আটকে রেখেছি—আর তা ছাড়া কাল তোমার বিয়ে। সকাল-বেলাই গায়ে-হলুদ হবে, তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে অধিবাসের তত্ত্ব আসবে—

সদানন্দ বলল—সে আসুক, কিছুতেই যাবো না, আমি এখানেই শুয়ে রইলুম।

বলে কালীগঞ্জের বউ-এর বিছানাতেই গা এলিয়ে দিলে। একগুঁয়ে পাগল ছেলেকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়লো কালীগঞ্জের বউ। দুলালকে ডেকে তোশক-বালিশ পেড়ে আবার তার জন্যে নতুন করে বিছানা করে দিতে হলো।

সে-রাতটা একরকম করে কাটলো। কালীগঞ্জের বউ ভাবলে ভোরবেলাই না-হয় দুলালকে দিয়ে নবাবগঞ্জে খবর পাঠিয়ে দেবে যে খোকা এখানে এই কালীগঞ্জে এসে উঠেছে।

দুলালও সেই রকম তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু সকাল বেলা থেকেই দুলালের নানা কাজ থাকে। সে কাজের মানুষ। ভোররাত্রে

উঠে তাকে গরুকে শানি দিতে হয়। তারপর তিন ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে বাঁশের ক'টা খুঁটি তৈরি করে আনবার কথা ছিল। তখন রাত অনেক। দুলাল ভেবেছিল সকাল হবার আগেই বাঁশ কেটে আবার ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু বাঁশঝাড়ের মালিক বাড়ি ছিল না। তিনিও বুঝি কোন জরুরী কাজে রাত থাকতে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্যে বসে বসে যখন শেষ পর্যন্ত মালিক এল তখন রোদ উঠে গেছে।

সেই বাঁশ বাছাই করে কেটে যখন দুলাল আবার বাড়িতে ফিরে এল তখন দেখলে বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে।

দুলালকে দেখেই গিন্নীমা বলে উঠলো—হ্যাঁ রে দুলাল, তোকে আমি পইপই করে বলেছিলুম নবাবগঞ্জে গিয়ে নায়েব-বাড়িতে খবরটা দিয়ে আসবি যে খোকাবাবু এখানে এসেছে। আর তুই কিনা বাঁশ আনতে গিয়েছিলি? আজই তোর বাঁশ আনবার জন্যে এত জরুরী দরকার পড়ে গেল? এখন আমি লোককে কী বলে কৈফিয়ত দেব? নবাবগঞ্জ থেকে যে লোক এসে হাজির হয়েছে সে আমাকেই দুষছে....

সত্যিই, দুলাল দেখলে এক ভদ্রলোক বসে আছে বাড়ির উঠোনে একটা চৌকিতে—

কালীগঞ্জের বউ বললে—এই দেখ বাবা, এই দুলালকে আমি ভোরবেলা নবাবগঞ্জে গিয়ে কর্তাবাবুকে খবর দিতে বলেছিলুম যে খোকাবাবু এখানে আছে—তা আমার তো ওই এক দুলাল ভরসা, আর তো কোনও লোক নেই যে তাকে পাঠাবো—

ততক্ষণ সদানন্দ উঠে এসে দাঁড়ালো।

প্রকাশমামা রেগে আগুন।

—কী রে, তুই এখেনে এসে লুকিয়ে আছিস! আজ তোর বিয়ে! অধিবাস নিয়ে কেষ্টনগর থেকে লোক এসে হাজির হয়েছে, গায়ে-হলুদের সব রেডি আর তুই কিনা এই রকম পাগলামি করছিস! চল্—চল্—আর কথা বলবার সময় নেই আমার। চূড়ান্ত বেইজ্জতি হয়ে গেছে। কুটুমবাড়ির লোক সেখানে গিয়ে কী বলবে বল্ দিকিনি, তারা কী ভাববে?

সদানন্দ বললে—ভাবুক গে, আমার কী? আমি যাবো না, আমি এখানে থাকবো—

প্রকাশমামা বললে—ইয়ারকি করার আর জায়গা পাসনি—

বলে সদানন্দর হাত ধরে টান দিলে একটা। টেনে বাইরের রাস্তার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সদানন্দ হাত ছাড়িয়ে নিলে। বললে—তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ প্রকাশমামা? অমি যাবো না তোমার সঙ্গে—কী করবে তুমি?

কালীগঞ্জের বউ বললে—আমি কাল থেকে ওই কথা ওকে বোঝাচ্ছি বাবা যে বিয়ের ব্যাপারে এমন করতে নেই। এখন সব যোগাড় যন্তর হয়ে গেছে। এখন লোক-হাসাহাসির ব্যাপার করা উচিত নয়। তা....

প্রকাশমামা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি থামো, আমি তোমার সব মতলব ফাঁস করে দেব, দাঁড়াও, আগে বিয়েটা হয়ে যাক্, তখন যা করতে হয় আমি করবো—সে আমার মনেই আছে—

কালীগঞ্জের বউ বললে—তা আমি কী করলুম বাবা? আমার কী দোষ হলো?

—বলছি তুমি থামো, তবু আবার কথা বলছো? ভেবেছিলে আমার ভাগ্নেকে নিজের বাড়িতে ফুস্‌লে এনে বিয়েটা ভেঙে দেবে? এত শয়তানি বুদ্ধি তোমার?

সদানন্দ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো—খবরদার বলছি প্রকাশমামা, কালীগঞ্জের বউকে তুমি অমন করে যা-তা বলতে পারবে না। তা হলে কিন্তু আমিও সব ফাঁস করে দেব।

প্রকাশমামা বললে—তার মানে?

—তার মানে তুমি জানো না? তুমি জানো না এই কালীগঞ্জের বউ-এর কত সম্পত্তি দাদু গ্রাস করেছে? জানো, এই কালীগঞ্জের বউ এককালে কত সম্পত্তির মালিক ছিল? কে তার সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছে, কে-তাকে পথের ভিখিরি করেছে, আমি সে-সব কথা জানি না বলতে চাও?

প্রকাশমামা কথাগুলো শুনে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর একটু দম নিয়ে বললে—এই সব কথা তোকে বুড়ি বলেছে বুঝি? এই সব ফুসমন্তর বুঝি ঢুকিয়ে দিয়েছে তোর মাথায়?

—আমাকে ফুসমন্তর দিতে হবে না প্রকাশমামা। বোঝবার মত যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে আমার। বরং তুমি একটু বোঝ। যার পয়সায় তুমি এতদিন বাবুয়ানি করছো, জেনো সেটা তোমার ভগ্নিপতির পয়সা নয়, সে-সব এই কালীগঞ্জের বউ-এর—

প্রকাশমামা বললে—দ্যাখ্, এসব কথার জবাব দেবার সময় নেই এখন, ওদিকে কুটুমবাড়ির লোক বসে আছে, তারপরে বিকেল বেলার ট্রেন ধরে আবার কেষ্টনগরে বিয়ে করতে যেতে হবে। পরে আমরা তোর এসব কথার জবাব দেব—

সদানন্দ বললে—না, জবাব দিলে এখনি জবাব দিতে হবে। আগে এর জবাব চাই তবে আমি তোমার সঙ্গে যাবো—

—তা কীসের জবাব চাস্ তুই বল্? কবেকার পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবার এই কি সময়? এ সব কাসুন্দি তো পরে ঘাঁটলেও চলতো।

—না চলতো না। আগে আমি এর জবাব চাই। আগে তুমি বলো, আগে তুমি কথা দাও, দাদু এই কালীগঞ্জের বউ-এর পাওনা দশ হাজার টাকা মিটিয়ে দেবে?

—দশ হাজার টাকা?

—হ্যাঁ, দাদু পনেরো বছর আগে কথা দিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করবে এই কালীগঞ্জের বউকে। এখনও কেবল ঘোরাচ্ছে। এখন দাদু এই কালীগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে একবার দেখাও করে না। আগে তুমি কথা দাও সেই টাকা মিটিয়ে দেবে?

প্রকাশমামা বললে—তোর দাদু টাকা মেটাবে কি না তার কথা আমি দেব কি করে? আমি নিজে কি টাকা নিয়েছি যে কথা দেব?

সদানন্দ বললে—তা হলে আমিও বিয়ে করতে যাবো না—

প্রকাশমামা বললে—ঠিক আছে, তা হলে তুই বাড়ি চল্, বাড়ি গিয়ে তোর দাদুকে সব বল্ গিয়ে। দাদু যদি তখন টাকা দিতে রাজী না হয় তখন না-হয় বিয়ে করতে যাস্ নি। আমাকে বাপু তুই এই দায় থেকে বাঁচা—

কালীগঞ্জের বউ এতক্ষণে কথা বললে। সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—সেই ভালো কথা বাবা। তোমার মামা তো ঠিক কথাই বলেছে। আর আমার টাকা? আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন আমার টাকা দিলেও যা, না-দিলেও তাই। ও টাকার পিত্যেশ আর আমি করি না। কিন্তু তুমি বাবা আর দেরি করো না, যাও, তোমার গায়ে-হলুদের দেরি হয়ে যাবে—

সদানন্দ এতক্ষণে রাজী হলো। বললে—চলো—

তারপরে কালীগঞ্জের বউ-এর পায়ের কাছে মাথা নিচু করে প্রণাম করে বললে—

তোমার টাকা আমি নিজের হাতে দিয়ে যাবো কালীগঞ্জের বউ, তুমি কিছু ভেবো না। টাকা না দিলে আমি বিয়ে করতেই যাবো না—

মনে আছে সদানন্দর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কালীগঞ্জের বউ-এর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সদানন্দর চোখের সামনেই আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে ফেলেছিল।

কেষ্টনগরে বিয়েবাড়ির একান্তে একটা ঘরের ভেতরে প্রকাশমামা সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করলে। বললে—কীরে, তুই কালীগঞ্জের বউয়ের ব্যাপারটা বাসরঘরে সকলকে বলে দিস নি তো? নিরঞ্জন বলছিল—

সদানন্দ গম্ভীর মুখে বললে—না, বলি নি।

প্রকাশমামা সাবধান করে দিলে। বললে—না, বলিস, নি।

সদানন্দ বললে—কিন্তু কালীগঞ্জের বউ-এর সেই দশ হাজার টাকা? সেটা কিন্তু এখনও দাদু দিলে না, তুমি কথা দিয়েছিলে কিন্তু—

প্রকাশমামা বললে—তুই মিছিমিছি ও-সব নিয়ে ভাবছিস কেন? তোর দাদুর কাছে দশ হাজার তো হাতের ময়লা রে, দেবে যখন কথা দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই দেবে। দশ হাজার টাকা মেরে দিয়ে কি তোর দাদু বড়লোক হবে? নিশ্চয়ই দেবে, আমি তো সাক্ষী আছি—

সদানন্দ বললে—কিন্তু কালীগঞ্জের বউ-এর টাকা যদি দাদু না দেয়, তখন কিন্তু সর্বনাশ হবে, এই আমি বলে রাখছি—

ওদিক থেকে কন্যাকর্তার গলা শোনা গেল—কই, বেয়াই মশাই কোথায়? সিগারেট পেয়েছেন তো?

বলতে বলতে কালীকান্ত ভট্টাচার্য এসে পড়লেন। বললেন—এই যে, এখানে বাবাজীবনও আছে দেখছি। তা সিগারেট-টিগারেট সব পাচ্ছেন তো বেয়াই মশাই?

প্রকাশমামার মুখে তখন সিগারেট জ্বলছিল। সুতরাং উত্তর আর তাকে দিতে হলো না। শুধু বললে—এবার যাত্রার বন্দোবস্ত করুন বেয়াই মশাই, আমি বর-কনেকে একবার নবাবগঞ্জে পৌঁছিয়ে দিতে পারলেই আমার ছুটি। তারপর আপনার ভাগ্য আর আপনার মেয়ের হাতযশ—

তা প্রকাশমামা করিতকর্মা লোকই বটে। করিতকর্মা লোক না হলে কি এ বিয়ে হতো নাকি? বিয়ে তো প্রায় আটকেই গিয়েছিল কাল সকালবেলা। বাড়িময় সোরগোল উঠেছিল। নবাবগঞ্জে কথাটা প্রায় ছড়িয়েই গিয়েছিল। সবাই-ই জানতে পেরেছিল যে চৌধুরী মশাই-এর ছেলে পালিয়ে গিয়েছে। তাকে আর কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। একে গ্রাম-দেশ তার ওপর ছোট গ্রাম নবাবগঞ্জ। কার বাড়িতে জামাই এসেছে, কার বাড়ির মেয়ে কার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে, তা আর কারো জানতে বাকি থাকে! তা ছাড়া নেমন্তন্ন হয়েছে মোটামুটি সব বাড়িতেই। তারা ক'দিন ধরেই খাবে। শুধু খাবে না, একেবারে গণ্ডেপিণ্ডে খাবে। তার ওপর ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবে। ক'দিন আগে থেকেই তারা বাড়িতে কম খেয়ে খেয়ে চালাচ্ছে, যাতে খাবার জন্যে পেটে কিছু জায়গা খালি থাকে। কিন্তু সদানন্দর পালিয়ে যাবার খবর পাওয়ার পর তাদের সব উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়লো। তাহলে? তাহলে খাওয়াটা কি মাটি হলো?

বারোয়ারিতলায় নিতাই হালদারের দোকানের মাচার ওপর রীতিমত সভা বসলো।

পরমেশ মৌলিক তখন সবে খবরটা নিয়ে এসেছে। খবরটা শুনে সকলের মুখই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বললে—তাহলে খুড়ো মশাই, আজকে কি খাওয়া হবে না?

পরমেশ মৌলিক বললে—কী জানি হে কপালে কী আছে! মাছ-দই-মিষ্টি সব কিছুর বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

—কী-কী কী মিষ্টি হয়েছিল? শুনলুম নাকি কেষ্টনগর থেকে সরভাজার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল?

শুধু সরভাজা নয়। ক'দিন থেকেই খাওয়ার আইটেমগুলো নিয়ে আলোচনা করে করে সকলের সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। মাছ, মাংস, মাছের মুড়িঘণ্ট, ধোকার ডালনা, বেগুন ভাজা, নিরামিষ আর আমিষ দু'রকম চপ্, দই, রসগোল্লা, পানতুয়া আরো অনেক কিছু।

এমন সময়ে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে শালাবাবু আসছে। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল সেদিকে। কাছাকাছি আসতেই সবাই এগিয়ে গেল।

—শালাবাবু কী খবর? পেলেন সদাকে?

শালাবাবুর মুখটা গম্ভীর। বললে—না হে, পেলুম না, দেখি একবার কালীগঞ্জের দিকে গিয়ে—

—কালীগঞ্জে? কালীগঞ্জে সদা কী করতে যাবে?

শালাবাবু বললে—রাণাঘাট-ফানাঘাট, রেল-বাজার, নবাবপুর, সব তো দেখে এলুম, এবার কালীগঞ্জের দিকটাই বা বাকি থাকে কেন?

বলে আর দাঁড়াল না। হন্ হন্ করে সামনের দিকে চলতে লাগলো।

কেদারের হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। আসল কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেল। বললে—ওই যাঃ, আসল কথাটাই তো জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেল—

নিতাই জিজ্ঞেস করলে—কী কথা?

—খাওয়ার কথা?

বলে দৌড়তে লাগলো। শালাবাবু তখন অনেক দূর চলে গেছে। কেদার দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে ডাকলে—ও শালাবাবু, শালাবাবু—

শালাবাবু পেছন ফিরে তাকালো। ভাবলে হয়ত সদাকে পাওয়া গেছে, সদার সন্ধান দিতে আসছে কেদার। বললে—কী রে, সদাকে পেইছিস?

কেদার কাছে গিয়ে হাঁপাচ্ছিল। হঠাৎ কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। তারপর বললে—না, সদার কথা নয়, নেমন্তন্নর কথা বলছি। আমাদের নেমন্তন্নটার তাহলে কী হবে? সেটাও মারা যাবে নাকি?

কেদারের কথা শুনে শালাবাবুর পিত্তি জ্বলে গেল। বললে—দূর হ, ভোর রাত থেকে সদাকে খুঁজে খুঁজে আমার পায়ের রং-খিল গেল আর উনি এসেছেন নেমন্তন্নর খবর নিতে—দূর হ, দূর হ—

বলে রাগে গর গর করতে করতে শালাবাবু আরো জোর পায়ে এগোতে লাগলো। সভার সবাই খুব ম্রিয়মান হয়ে গেল কথা শুনে। বরকে না পাওয়া যাক, কিন্তু খাওয়াটা বন্ধ হবার কথা ভেবে সবাই যেন কেমন নিঝুম হয়ে গেল। এ ক'দিন অনেক ছিলিম তামাক্ পুড়েছে, অনেক সময় তর্কাতর্কি করেছে। রেলবাজারের গৌরের দোকানের রসগোল্লা ভালো না রাণাঘাটের হরিহরের দোকানের রসগোল্লা ভালো তাই নিয়ে তর্ক করে কতদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, কতদিন সেই তর্ক করতে করতে শেষকালে সেটা মারামারিতে

পরিণত হয়েছে, তবু তর্কের মীমাংসা হয় নি। সকলেই ওই বিয়ের তারিখটার দিকে চোখ রেখে এতদিন জীবন-যাপন করে এসেছে, হঠাৎ সেই পরম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে সবাই বিমর্ষ হয়ে রইল।

কিন্তু বিকেল পড়বার আগেই সবাই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কেদারই খবর পেয়েছিল প্রথমে। সে দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিলে গোপাল ষাটকে। গোপাল ষাট তখন গোয়াল ঘরে গরুকে জাব্‌না দিচ্ছে। কেদারের গলা শুনেই চেঁচিয়ে উঠলো—কী রে, কী খবর রে?

কেদার রাস্তা থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে, সদাকে পাওয়া গেছে—আর ভয় নেই—

গোপাল ষাট বললে—পাওয়া গেছে? তাহলে খাওয়া?

—খাওয়া হবে।

বলে আর দাঁড়ালো না। অন্য দিকে চলে গেল। বললে—যাই নিতাইকে খবরটা দিয়ে আসি, সে খুব মন-মরা হয়ে গেছে—

কথাটা শুনে পর্যন্ত গোপাল ষাটের বুক থেকে যেন একখানা ভারি পাথর নেমে গেল। গরুর জাব্‌না দেওয়া ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোল। এতক্ষণে সবাই-ই নিশ্চয় জেনে গেছে। সোজা বারোয়ারি তলার দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু সেখানে তখন আগেই সভা বসে গেছে। নিতাই, কেদার সবাই হাজির। সবার মুখেই উত্তেজনা। নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই-ই যেন বেশ ধাতস্থ। সবাই-ই জেনে গেছে সদাকে পাওয়া গেছে। কালীগঞ্জ থেকেই শালাবাবু নাকি তার ভাগ্নেকে ধরে এনেছে।

—কিন্তু পালিয়েছিল কেন? কিছু বলছে না সদা?

কথাটা সবাইকে ভাবিয়ে তুললো। বিয়ের নামে কেউ পালায়? সদাকে ছোট্টবেলা থেকেই দেখে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি কেউ কখনও। ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে এই বারোয়ারিতলা দিয়েই সে বাড়ি ফিরেছে। হাটের দিনেও অনেক সময় হাটে এসেছে সে। কিন্তু কেমন যেন ভুলো-ভুলো মন সব সময়ে। আর বেশির ভাগই শালাবাবু সঙ্গে থাকতো। চৌধুরী মশাই অনেকদিন ছেলেকে এনে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়েছেন। বলেছেন—একদিন তো তোমাকে কাজকর্ম সবই দেখতে হবে, এখন একটু জেনে-শুনে নাও—

অতি সুবোধ বালকের মত সদানন্দ চুপচাপ শুনে গেছে বাবার কথা।

চৌধুরী মশাই বলতেন—এই দেখ, এইগুলোর নাম পরচা, এই হচ্ছে দাখ্‌লে, আর এই হলো নক্‌শা। এই নক্‌শার ওপর নম্বর দেওয়া রয়েছে। এইগুলো হচ্ছে দাগনম্বর—

এক এক করে চৌধুরী মশাই সেরেস্তার নথিপত্র সব বোঝাতেন। কীসের কী মানে, কীসের কী গুরুত্ব। এককালে যখন দাদু থাকবে না, বাবা-মা কেউই থাকবে না, তখন তাকে নিজেকেই তো এই সব দেখতে হবে। নায়েব-গোমস্তার ওপর ভরসা করে আর যা-ই করা যাক জমিদারি সেরেস্তার কাজ চলে না। তোমার নিজের জিনিস, তোমাকে নিজের হাতেই সব করতে হবে। উকিল তোমাকে ঠকাতে চাইলেও তুমি কেন ঠকবে? মামলা-মকর্দমার সময় তোমাকে নিজেকে কাছারিতে যেতে হবে। কাঠগড়ায় সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ-রকম চুপ করে থাকলে চলবে না। উকিলের জেরায় ভয় পেলে চলবে না। নিজের স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে শিখবে। আর প্রজা ঠ্যাঙাতে যদি না পারো তো জমিদারি কোর না। এ ভালোমানুষির কাজ নয়, বুঝলে?

এত যে উপদেশ, এত যে পাখি-পড়ানো, সব কিন্তু বৃথা হয়েছিল।

চৌধুরী মশাই বলতেন—কিছু বুঝলে? কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? বুঝলে কিছু?

সদানন্দ বলতো—না—

চৌধুরী মশাই চটে যেতেন। বলতেন—কেন? এতে না-বোঝবার কী আছে? লেখাপড়া শিখেছ তুমি, তোমার কাছে এ-সব কথা তো শক্ত হবার কথা নয়। ওই কৈলাস গোমস্তাকে দেখ তো,ও তো লেখা পড়ার কিছুই জানে না, কিন্তু আমাদের কত নম্বর পরচায় কত বিঘে কত ছটাক জমি আছে সব ওর মুখস্থ—ও ম্যাট্রিক পাসও নয়, আই-এ পাসও নয়,—তোমার মত বি-এ পাস ছেলে যদি এ-সব বুঝতে না পারে তো এতগুলো পয়সা নষ্ট করে কী লাভ হলো?

তারপর যেন চৌধুরী মশাই-এর খেয়াল হতো খোকা কিছুই শুনছে না, অন্য দিকে চেয়ে আছে। তারপর ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে রজব আলি তাঁদের গোরুটাকে জোরে জোরে মারছে।

চৌধরী মশাই ধম্‌কে উঠতেন—ওদিকে কী দেখছো? আমি কাজের কথা বলে যাচ্ছি আর তুমি রজব আলিকে দেখছো! রজব আলির দিকে দেখে তোমার কী লাভ?

কিন্তু না, তার লাভ ছিল। রজব আলিকে দেখেও তার লাভ ছিল। কথা নেই বার্তা নেই সেই অবস্থাতেই সদানন্দ সেখান থেকে উঠে গেল। উঠে রজব আলির হাত থেকে লাঠিটা এক মিনিটের মধ্যে কেড়ে নিলে। বললে—মারছিস কেন গরুটাকে? কী করেছে গোরুটা?

রজব আলি তো ভয়ে অস্থির। গাড়ির গোরুকে মেরেছে তাতে এমন কী কসুর করেছে সে যে খোকাবাবু তার পাঁচন-বাড়ি কেড়ে নিলে!

কিন্তু ব্যাপার বুঝে চৌধুরী মশাই সেখানে এসে হাজির হলেন।

বললেন—এ কী করছো? এ কী করছো?

সদানন্দ বলল—ও গোরুটাকে মারছে কেন? গোরুটা কী করেছে ওর?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা দরকার হলে গোরুকে মারবে না? বদমায়েসি করেছে তাই মেরেছে। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন?

সদানন্দ বললে—তাহলে আমিও রজবকে মারবো, ও-ও তো বদমায়েসি করেছে—

চৌধুরী মশাই ছেলের বেয়াড়া বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে হয়ে এ রকম বেয়াড়া বুদ্ধি কেন হলো? এমন বুদ্ধি হলে এত সম্পত্তি রাখবে কী করে? চিরকাল তো আর তিনি থাকছেন না। একদিন তো এই ছেলের হাতে এই সমস্ত সম্পত্তি তুলে দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। তখন?

সেইদিন থেকেই চৌধুরী মশাই-এর আর এক ভাবনা শুরু হলো। সেইদিন থেকেই তিনি ছেলেকে নিজের কাছে কাছে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চণ্ডীমণ্ডপে নিজের কাছে বসিয়ে সব কিছু দেখাতে বোঝাতে লাগলেন। সদানন্দ কিছুক্ষণ কাছে বসে থাকতো বটে, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে থাকতো কে জানে।

খানিকক্ষণ পরেই বলতো—আমি যাই—

চৌধুরী মশাই বলতেন—কোথায় যাবে আবার?

সদানন্দ বলতো—আমার ভালো লাগছে না—

—ভালো লাগছে না তো যাবে কোথায়?

সদানন্দ বল্‌তো—বাইরে—

—বাইরে কোথায় তা বলবে তো?

কিন্তু সদানন্দ বাইরে যে কোথায় যাবে তা সে নিজে জানলে তবে তো বলবে!

রাত্রে চৌধুরী মশাই গৃহিণীকে বলতেন—খোকা কি এখনও প্রকাশের সঙ্গে মেশে নাকি?

গৃহিণী অবাক হয়ে যেতেন। বলতেন—প্রকাশের সঙ্গে মিশলে কী হয়েছে?

চৌধুরী মশাই বলতেন—না, প্রকাশের সঙ্গে যেন বেশি মেলা-মেশা না করে খোকা। এই তোমাকে সাবধান করে দিলুম।

প্রীতিলতাও জমিদারের মেয়ে। বাপের বাড়ির লোকের নিন্দে সহ্য করবার মত মেয়ে সে নয়।

বলতো—তুমি তো প্রকাশকে দেখতে পারবেই না। তা সে তোমার কী ক্ষতি করেছে শুনি?

চৌধুরী মশাই একটু নরম হয়ে বলতেন—না, আমি তা বলছি না। চিরকাল ওই রকম আড্ডা দিয়ে বেড়ালেই চলবে? সেরেস্তার কাজ-কর্মও তো একটু-একটু করে রপ্ত করে নিতে হবে! আমি আর ক'দিন—

এর পরে এ-প্রসঙ্গ আর বেশিক্ষণ চলতো না। কিন্তু চৌধুরী মশাই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতেন সদানন্দকে নিয়ে। ঠিক যেমন ছেলে তিনি চেয়েছিলেন সদানন্দ তেমন ছেলে হলো না। বাবার কাছে আসতেই যেন তার অনিচ্ছে। বাবার চোখে পড়বার ভয়ে সে যেন কোথাও লুকিয়ে থাকে। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে সে ঘুরে বেড়াতে পারলে যেন বাঁচে।

চৌধুরী মশাই প্রায়ই গৃহিনীকে প্রশ্ন করতেন—খোকা কোথায় গেল?

প্রীতিলতা বলতো—গেছে নিশ্চয়ই কোথাও—

চৌধুরী মশাই বলতেন—কিন্তু কোথায় গেছে সেটা বলবে তো?

প্রীতিলতা বলতো—কিন্তু কোথায় গেছে তা আমি কী করে বলবো? তার বয়েস হয়েছে, সে নিজের খুশীমতো যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবে। আমাকে সে বলে যাবে নাকি?

এর জবাবে চৌধুরী মশাই কী আর বলবেন! নিজের অভিলাষের অপূর্ণতার দুঃখটা নিজের মনেই হজম করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এমনি করে আর বেশিদিন চললো না। শেষকালে সমস্ত রোগের একমাত্র উপশম হিসেবে যখন খোকার বিয়ের প্রসঙ্গটা উঠলো তিনি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। ভাবলেন, হয়ত বিয়ের পরই সব কিছু সহজ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। যেমন সবার হয়ে থাকে।

কিন্তু সেই বিয়ের দিনেই যে খোকা এমন কাণ্ড করে বসবে তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল! প্রকাশই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল সুতরাং তারই যত দায়িত্ব। সে-ই ছুটলো চারিদিকে। চারিদিকে সকলকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, দই, মাছ, মিষ্টি সব কিছু তৈরি। অধিবাস নিয়ে কুটুম-বাড়ি থেকে লোক এসে গেছে অথচ বর নেই। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো চৌধুরী মশাই-এর। কুটুম-বাড়ির লোককে কী জবাব দেওয়া হবে!

কিন্তু না, প্রকাশ করিতকর্মা লোক বটে। বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর উৎরে গেছে। হঠাৎ খোকাকে নিয়ে এসে হাজির!

চৌধুরী মশাই খবর পেয়েই দৌড়ে নিচেয় গেছেন।

গিয়ে বললেন—কী হলো, কোথায় পেলে ওকে?

প্রকাশ বললে—সে সব কথা এখন থাক জামাইবাবু, সে অনেক কাণ্ড!

—অনেক কাণ্ড? অনেক কাণ্ড মানে কী, খুলে বলো! বেলা তিনটেয় বাড়ি থেকে বর নিয়ে বেরোতে হবে। হাতেও আর সময় নেই। এদিকে কুটুম-বাড়ি থেকে লোক এল, অধিবাসের তত্ত্ব নিয়ে যারা এসেছিল তারা দেখে গেছে যে বরের গায়ে-হলুদ হয়নি—

প্রকাশ বললে—তাদের বললেন কেন যে গায়ে-হলুদ হয়নি?

চৌধুরী মশাই বললেন—বলতে হবে কেন? তাদের চোখ নেই? তারা তো সবই দেখতে পেলে—

প্রকাশ তাতেও ভয় পাবার লোক নয়। তার হাতে যখন সব কিছুর ভার দেওয়া হয়েছে

তখন সেটা তারই দায়। বললে—ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নেই, আমি বরকে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে হাজির করবোই, আমার ওপর ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

দিদিও খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—হ্যাঁ রে প্রকাশ, খোকাকে কোথায় পেলি তুই শেষ পর্যন্ত?

প্রকাশ বললে—তুমি এখন কথা বলতে বসো না দিদি, তুমি গায়ে-হলুদের যোগাড় করো গে, বিকেল তিনটেয় আমরা বর নিয়ে যাত্রা করবো। নইলে ট্রেন ধরতে পারবো না। আমার একটা জরুরী কথা আছে জামাইবাবুর সঙ্গে, তুমি এখান থেকে যাও—

তারপর চৌধুরী মশাইকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল প্রকাশ।

বললে—একটা কথা আছে জামাইবাবু, সদাকে পেয়েছি কোথায় জানেন, কাউকে যেন বল্‌বেন না, পেয়েছি কালীগঞ্জে—

—কালীগঞ্জে?

—হ্যাঁ, কালীগঞ্জের বউ-এর কাছে গিয়ে উঠেছিল সদা। জানি না কালীগঞ্জের বউ সদাকে কী ফুস মন্তর দিয়েছে, দশ হাজার টাকা না দিলে সদা বিয়ে করতে যাবে না—

—দশ হাজার টাকা? কালীগঞ্জের বউকে দিতে হবে?

—হ্যাঁ, তা না দিলে সদা বিয়ে করতেই যাবে না। ওর দাদু কালীগঞ্জের বউকে কথা দিয়েছিল। সেই কথা এখন রাখতে হবে!

চৌধুরী মশাই-এর বিস্ময়ের ঘোর যেন তখনও কাটেনি। বললেন—সে সব তো অনেক কাল আগেকার কথা। ওই কালীগঞ্জের বউ-ই তো আমাদের নামে মামলা করছিল। তখন বাবা কথা দিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে সব মিটিয়ে নেবে—তা খোকা এ সব জানলো কী করে?

প্রকাশ বললে—কী জানি কী করে জানলে। সেখান থেকে তো সদা কিছুতেই আসতে চায় না, শেষে আমি বললুম যে—নবাবগঞ্জে গিয়ে তোকে টাকা দেওয়া হবে, তবে এলো। এখন টাকাটার একটা বন্দোবস্ত করুন—

চৌধুরী মশাই বললেন—এখনই টাকা দিতে হবে?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ—

—টাকা না দিলে?

—টাকা না দিলে ও বিয়ে করতে যাবে না।

—তা টাকা পরে দিলে চলবে না? বিয়ে-টিয়ে আগে মিটে যাক তারপর না হয় ভেবে চিন্তে টাকা দেওয়া যাবে।

প্রকাশ বললে—তা বোধ হয় শুনবে না সদা, ও যা বেয়াড়া ছেলে আপনার।

একবার যখন গোঁ ধরেছে তখন টাকা না দিলে ছাড়বেই না।

মহা ভাবনায় পড়লেন চৌধুরী মশাই। ওদিকে বেশি ভাববারও সময় নেই। বেলা তিনটেয় ট্রেন, সেই ট্রেন ধরে রাণাঘাটে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার কেষ্টনগর।

শেষকালে আর কিছু না ভেবে পেয়ে বললেন—দেখি, একবার বাবাকে গিয়ে বলে আসি—

বলে চৌধুরী মশাই ওপরে চলে গেলেন।

প্রকাশ মামা সদানন্দর কাছে এল। সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো?

প্রকাশ মামা বললে—হচ্ছে, টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। জামাইবাবু তোর দাদুর কাছে টাকা আনতে গেছে। তুই কিচ্ছু ভাবিস নি, তোর টাকা পেলেই তো হলো! তোর দাদুর কি টাকার অভাব? দশ হাজার টাকা তোর দাদুর হাতের ময়লা—

সদানন্দ বললে—ঠিক আছে, দাদু যদি টাকা দেয় তো ভালো, কিন্তু টাকা না দিলে আমি কিন্তু বিয়ে করতে যাবো না, এ আমি তোমায় জানিয়ে রাখছি—ততক্ষণে ওপর থেকে ডাক এলো। ওপরে যেতে হবে দু'জনকে।

সদানন্দ আগে আগে পেছন-পেছন প্রকাশ মামা। দাদুর ঘরে তখন কৈলাস গোমস্তা আর চৌধুরী মশাই রয়েছে। বিছানার ওপর আধ-শোওয়া অবস্থায় দাদু।

সদানন্দকে দেখেই দাদু বললেন—কী সব পাগলামির কথা শুনছি তোমার? তোমার না বয়েস হয়েছে? এই বয়সে কি তোমার ছেলেমানুষী এখনও গেল না?

সদানন্দ কিছু উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

—কথা বলছো না যে? যাও, বিয়ে করতে যাও। শেষকালে কি ট্রেন ফেল করবে নাকি?

সদানন্দ বললে—কিন্তু টাকা?

নরনারায়ণ চৌধুরীও তেমনি লোক। বললেন—টাকা কি হুট বললেই আসে?

তুমি বললে টাকা দাও আর আমিও অমনি টাকা দিয়ে দিলুম, তাই কখনও হয়, না হয়েছে? টাকা দেওয়া হবেখন্। তুমি এখন যা করতে যাচ্ছো তাই করতে যাও—শেষকালে কি লোক হাসাবে নাকি?

সদানন্দর মুখে সেই একই জবাব। বললে—টাকা না দিলে আমি যাবো না—

নরনারায়ণ চৌধুরীর জমিদারি মেজাজ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো—বলছি তো টাকা আমি দেব। আমার কথার একটা দাম নেই? তোমার জিদ্‌টাই বজায় থকবে।

—কিন্তু কখন টাকা দেবেন?

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—তুমি কাল বিয়ে করে ফিরে এলেই দেব—

—যদি না দেন?

এতক্ষণে চৌধুরী মশাই কথার মধ্যে মুখ খুললেন। বললেন—আর তুমি কথা বাড়িও না খোকা, দাদু যখন বলছেন টাকা দেবেন তখন তার ওপরে আর কথা বলো না। আর এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করলে ওদিকে গায়ে-হলুদের দেরি হয়ে যাবে, ট্রেনও ফেল করবো আমরা—

সদানন্দ বোধ হয় এতক্ষণে একটু নরম হলো। বললে—তোমরা সবাই কথা দিচ্ছ তাহলে? আমি এখন যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমরা সাক্ষী রইলে। টাকা না দিলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে,—এই বলে রাখলুম, চলো—

এতক্ষণে যেন চৌধুরী মশাই নিশ্চিন্তের হাঁফ ছাড়লেন। সব মিটে গেল। কর্তাবাবু ছেলেকে আলাদা করে ডেকে বলে দিলেন—তুমি সঙ্গে যাচ্ছো তো, একটু নজর রেখো, যেন আবার কোনও গণ্ডগোল না করে বসে সেখানে। তুমি কন্যে-কর্তার বাড়িতে রাত্তিরে থেকো—

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সঙ্গে যাচ্ছিই, রাত্রে সেখানেই থাকবো, সম্প্রদান পর্যন্ত দেখবো, তারপর নিরঞ্জন রইল, প্রকাশ রইল, তাদেরও একটু পাহারা দিতে বলবো—

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—ছেলেমানুষের মন, কেউ হয়ত নানা রকম মতলব দিয়ে ওর মাথাটা গরম করে দিয়েছে, ও নিয়ে তুমি ভেবো না। ছেলে-বয়সে বিয়ের আগে ওরকম সকলেরই মাথা গরম হয়। তারপর বিয়ে-থা হয়ে গেলে আবার যেমন-কে-তেমন, ও-সব আমার অনেক দেখা আছে—

তা এর পর আর কোন গণ্ডগোল হয় নি। তাড়াহুড়ো করে গায়ে-হলুদ হয়েছে সদার, জামা-কাপড় বদলে নিয়ে সবাই দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করেছে। তারপর বিয়েও হয়েছে, বাসর-ঘরও হয়েছে। সদানন্দ কোনও বেয়াড়াপনা করে নি।

একবার শুধু প্রকাশ মামাকে সদানন্দ জিজ্ঞেস করেছে—দাদু টাকা দেবে তো ঠিক প্রকাশ মামা?

প্রকাশ মামা বলেছে—আরে তুই অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? টাকা পেলেই তো তোর হলো?

নতুন বউকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছে সবাই। সঙ্গে প্রকাশ মামা আছে। প্রকাশ মামা বরকর্তা। আর আছে নিরঞ্জন। আসবার সময় বেয়াই মশাই-এর চোখ দুটোও জলে ভরে এসেছিল। একমাত্র সন্তান, এই নয়নতারাই ছিল তাঁর সব। মেয়েও যত চোখের জল ফেলেছে, মেয়ের মা-বাবাও তত। ট্রেনে ওঠবার সময় কালীকান্ত ভট্টাচার্য আর থাকতে পারেন নি। একেবারে প্রকাশ মামার হাত দুটো জাপ্‌টে ধরেছিলেন।

বলেছিলেন—আমার মেয়েকে একটু দেখবেন বেয়াই মশাই, ও-মেয়ে সংসারের কিছুই জানে না, দোষ-ত্রুটি যা-কিছু সব ক্ষমা করে নেবেন।

প্রকাশ মামা বলেছিল—আপনি কিছু ভাববেন না বেয়াই মশাই, আপনার মেয়ের অনেক পুণ্যফলে অমন শ্বশুর-শাশুড়ী পেলে। অমন শ্বশুর-শাশুড়ী কোনও মেয়ে পায় না—

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিলে। নয়নতারা অনেকক্ষণ ধরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর যখন বাবাকে আর দেখা গেল না তখন ঘোমটার আড়ালে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

তাপপর বর-কনে যখন নবাবগঞ্জে এসে পৌঁছুলো তখন বেলা পড়ো-পড়ো। বাড়ির ভেতর থেকে উলুর শব্দ উঠলো, শাঁখ বেজে উঠলো। নতুন বউ এসেছে চৌধুরীবাড়িতে। চৌধুরীবাড়ির প্রথম লক্ষ্মী এসেছে। এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে লোকজন মেয়ে-পুরুষ একবারে ভেঙে পড়লো।

বারোয়ারীতলার নিতাই হালদারের দোকানের মাচায় তখন রীতিমত সভা বসে গেছে।

কেদার বললে—বউ কী রকম দেখলি রে গোপাল?

গোপাল যাট বললে—আমি আর কখন দেখলুম, আমার বউ গিয়েছিল, বললে একেবারে জগদ্ধাত্রীর মত রূপ। বড়লোকের ছেলের বউ, আমাদের মতন শাঁকচুন্নী বউ হবে নাকি?

—কেন, তোর বউকে কি খারাপ দেখতে?

গোপাল যাট বললে—খারাপ বলে খারাপ, একেবারে রক্ষেকালীর বাচ্চা ভাই, যখন আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তোরা সে-চেহারা দেখিস নি—

সবাই হেসে উঠলো। নিতাই বলে উঠলো—ওরে তা নয়, আসলে পরের বউকে সকলেরই ভালো লাগে। যার সঙ্গে ঘর করতে হয় সে তো পুরোনো হয়ে যায়—

কেদার বললে—ওরে, এই আমার কথাই ধর না। আমি যখন বিয়ে করেছিলুম তখন সবাই বউ দেখে বললে পরী। তারপর বছর-বছর ছেলে বিইয়ে বিইয়ে চেহারাটা এমন করে ফেললে যে তার দিকে এখন চাইতে ঘেন্না করে আমার। বউ তো নয় যেন কাঁঠাল গাছ—

নিতাই বললে—তা কাঁঠাল গাছের কী দোষ, কাঁঠাল গাছের গোড়ায় অত জল ঢাললে ফলন তো হবেই।

কথাটা-শুনে আর এক চোট হাসি উঠলো।

কিন্তু তখন চৌধুরি বাড়ির ভিড় একটু করে পাতলা হয়ে আসছে। প্রকাশ মামাই সকলকে তাড়া দিতে লাগলো। বললে—সরো সরো বাপু তোমরা, একটু ভিড় পাতলা করো, কাল সারা রাত বউ ঘুমোয় নি—সরো, একটু হাঁফ ছাড়তে দাও—

সদানন্দ একটা ফাঁকা জায়গায় খোলা আকাশের নিচেয় গিয়ে দাঁড়ালো। একটা অস্বস্তিকর

অবস্থার আবহাওয়া তাকে যেন এতক্ষণ গ্রাস করেছিল। এবার সে মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।
হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এলো—আরে, তুই এখানে? আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে মরছি—
প্রকাশ মামা কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—তোকে যে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে—আর—
সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কী দরকার, এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে।
প্রকাশ মামা বললে—তোর মেজাজ এমন তিরিক্ষে কেন রে? বিয়ে করে এলি সুন্দরী বউ হলো তবু তোমার তিরিক্ষে মেজাজ গেল না, আয় আয়—
সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার টাকা?
প্রকাশ মামা বললে—আরে, টাকা কি তোর পালিয়ে যাচ্ছে?
সদানন্দ বললে—না, দাদু বলেছিল আমি বিয়ে করে আসার পর টাকা দেবে। আমি সেই টাকা নিয়ে এখনই কালীগঞ্জের বউকে গিয়ে দিয়ে আসবো—
প্রকাশ মামা বললে—তাহলে তোর দাদুকে গিয়ে তুই বল্—দাদু তো বলেই ছিল টাকা দেবে—
সদানন্দ বললে—আমি এখনই যাচ্ছি—
নরনারায়ণ চৌধুরীর মেজাজটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। এমনিতে সম্পত্তির ঝঞ্ঝাটে মেজাজ তাঁর সহজে ঠাণ্ডা থাকে না। নতুন বউ তাঁকে এসে প্রণাম করে গেছে। তিনি তাকে আশীর্বাদ করেছেন। আশীর্বাদ করেছেন যেন সে এ-বংশের সুখ-সমৃদ্ধি করে। যেন বংশ-পরম্পরায় চৌধুরী-বংশের অক্ষয়কীর্তি অমর করে রাখে। আর নতুন বউ-এর রূপ দেখেও তিনি খুশী হয়েছিলেন। রূপ বটে! যেমন রূপ তিনি আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি। আর শুধু রূপ নয়, লক্ষণও ভালো। তিনি ভালো করে বউ-এর মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। সুলক্ষণা যাকে বলে ঠিক তাই, এ পারবে। এ তাঁর নাতির বেয়াড়াপনা দূর করবে।
হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন। বললেন—কে?
সদানন্দ বললে—আমি সদানন্দ—
—ও, তা কী চাও?
সদানন্দ বললে—আমার টাকা—
—টাকা?
টাকার কথা শুনে নরনারায়ণ চৌধুরী চমকে উঠলেন। টাকা! যেন কিছুই জানেন না তিনি। যেন কিছুই তাঁর জানবার কথা নয়। যেন কাউকে তিনি টাকা দেবার কথা বলেনও নি। কথাটা শুনে তিনি বোবার মত তাঁর নাতির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।
তারপর বললেন—কিসের টাকা?
সদানন্দ বললে—আপনার মনে নেই আপনি দশ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন? আপনি বলেছিলেন আমি বিয়ে করে এলেই আপনি কালীগঞ্জের বউকে দশ হাজার টাকা দেবেন—
কর্তাবাবুর যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। বললেন—তা দেব যখন বলেছি তখন দেব। আমি কি বলেছি দেব না?
সদানন্দ বললে—তাহলে দিন টাকা আমি তাকে দিয়ে আসি—
কর্তাবাবু এতক্ষণে চটে গেলেন। বললেন তুমি কেন দিতে যাবে? তুমি এখন বাড়ি ছেড়ে যাবে কী করে? আর তুমি ছাড়া কি টাকা দিয়ে আসবার লোক নেই? আমি কি লোক দিয়ে টাকা পাঠাতে পারি না?
সদানন্দ বললে—কেন পাঠাতে পারবেন না, কিন্তু আমি জানি আপনি তা পাঠাবেন না। পাঠালে অনেক আগেই তা পাঠাতেন।

কর্তাবাবু নাতির কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন সুরে তো সদানন্দ কখনও কথা বলে না। কথার এত তেজ কোথায় পেলে সে? অবশ পা দুটো সামনের দিকে টানবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি মনে মনে ছট্‌ফট করতে লাগলেন। বললেন—তুমি হঠাৎ এত কড়া-কড়া কথা বলছো যে? কে তোমাকে এসব কথা শিখিয়েছে?
সদানন্দ বললে—কে আবার শেখাবে? আপনি বলেছিলেন টাকা দেবেন, তাই আপনার কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছি—
কর্তাবাবু বললেন—মনে করিয়ে তোমাকে দিতে হবে না। তুমি তোমার নিজের ধান্দা নিয়ে থাকো। এখন বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন লোকজন এসেছে, তাদের দেখা-শোনা করো তাহলেই যথেষ্ট করা হবে। এখন যাও—
সদানন্দ তবু নড়লো না, বললে—কিন্তু আপনি তো আপনার কথা রাখলেন না দাদু, আমি আপনার কথাতেই বিয়ে করতে গিয়েছি, এখন আপনি আপনার কথা রাখুন। টাকা দিন—
—আরে, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, কোথায় সেই নিয়ে সবাই ভাবছে, আর এখন কি না বলে টাকা দাও! অমনি টাকা দিলেই হলো?
তারপর কী করবেন বুঝতে পারলেন না। বললেন—এখন আমি ব্যস্ত আছি, পরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবো, তুমি এখন ভিতরে যাও—
—না আমি যাবো না। আগে আমার টাকা চাই—
কর্তাবাবু বললেন—কী বললে তুমি?
সদানন্দ বললে—আগে আপনি টাকা দেবেন তবে এখেন থেকে নড়বো—
কর্তাবাবু কৈলাসের দিকে চেয়ে বললেন—কৈলাস একবার ছোটবাবুকে ডাকো তো—
কৈলাস গোমস্তা উঠে নিচেয় চলে গেল। সদানন্দও সেই ঘরের মধ্যে কাঠের পুতুলের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সেই ঠিক করেই ফেলেছিল যে সে টাকা না নিয়ে ঘর থেকে আর বেরোবে না। সমস্ত বাড়ি তখন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে মুখর। আজ চৌধুরীবাড়ীতে নতুন বউ এসেছে। মেয়েরা উলু দিয়েছে, শাঁখ বাজিয়েছে। বাড়ির সব লোকজন নতুন কাপড় পেয়েছে। কৈলাস গোমস্তা থেকে শুরু করে রজব আলী পর্যন্ত কেউ বাদ যায় নি। এমন ঘটনা তো রোজ রোজ ঘটে না। আবার কত বছর পরে এ বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটবে কে বলতে পারে! বউ আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সব বউ-ঝিরা এসে ভিড় করেছে। কেদার, গোপাল ষাট সবাই নিজের নিজের বউদের আগাম পাঠিয়ে দিয়েছে। বউভাতের দিন সবাই তো বউ দেখতে পাবেই। কিন্তু তার তো অনেক দেরি। চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে তো আর বউভাত হচ্ছে না। শুধু বউভাতই নয়, ফুলশয্যাও হবে, বাড়ির উঠোন জুড়ে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। যেদিকে পুকুর-ঘাট সেই দিকটাতেই বসেছে ভিয়েন। সেখানে বড় বড় দশখানা উনুন তৈরি হয়েছে। দু'দিন আগে থেকে সেখানে মিষ্টি তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছে। রসগোল্লা তৈরি হবার পর গামলায় তুলে রাখতে হবে। সেই সব গামলাও এসে গিয়েছে। সেগুলো সার সার বসানো হয়েছে পুকুরের ধার ঘেঁষে। কিন্তু আসল বড় সামিয়ানাটা খাটানো হয়েছে বাড়ির সামনে। সেখানে বসবে বিশিষ্ট অতিথিরা।
প্রকাশ মামার এসে পর্যন্ত সময় নেই, পরশু থেকে নাইবার খাবার সময় ছিল না। দু'রাত নাগাড়ে জাগা। তার ওপর কেষ্টনগর থেকে বর কনে নিয়ে আসার পর দেখেছে যোগাড়-যন্তর কিছুই হয় নি, অথচ রাত পোহালে সব লোকজন এসে হবে। তারপর আছে সদানন্দকে নিয়ে ভাবনা। সে কোথায় কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। রাস্তায় আসতে আসতে

সদানন্দ অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে—টাকা পাওয়া যাবে তো ঠিক, প্রকাশ মামা?

প্রকাশ মামা বলেছে—তুই অত ভাবছিস কেন? তোর দাদু তো নিজের মুখে তোকে বলেছে টাকা দেবে, তাহলে আর তোর এত ভাবনা কীসের?

সদানন্দ বলেছে—না, কথা না রাখলে কিন্তু আমি দেখে নেব, তা বলে রাখছি—

প্রকাশ মামা বলেছে—টাকা না দিলে তুই কী করবি?

সদানন্দ বলেছে—কী করবো তা আমিই জানি—

—কী করবি তুই বল্ না। এখন তো বিয়ে তোর হয়েই গেছে। এখন তো আর তা বলে বউকে ফেলে দিতে পারবি না—

—সে আমি যা করবো, তুমি তা দেখতেই পাবে।

প্রকাশ মামা ভাগ্নের কথা শুনে হেসেছে। বলেছে—ওরে, প্রথমে সবাই ও-রকম বলে রে! তারপর বউ-এর মুখ দেখে সবাই ভুলে যায়। আর এ তোর যে-সে বউ নয়। এ বউকে তুই ফেলতে পারবি? এই রকম সুন্দরী বউকে?

উত্তরে সদানন্দ কিছু কথা বলে নি। কিন্তু প্রকাশ মামা বুঝেছে বউ-এর মুখ দেখে তার ভাগ্নে গলে গেছে। এক রাত্রের মধ্যেই ভাগ্নের মুখের চেহারা বদলে গেছে। তার পরে ফুলশয্যার রাতটা একবার কাবার হোক তখন আবার সদানন্দ অন্য মানুষ হয়ে যাবে। তখন আর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতেই চাইবে না। প্রকাশ মামা পাকা লোক। অনেক পুরুষ অনেক মেয়েমানুষকেই চরিয়েছে। সুতরাং সদানন্দ যা-কিছু টাকা-টাকা করেছে একটা রাত কাটলেই সব থিতিয়ে আসবে, এ সম্বন্ধে প্রকাশ মামার আর কিছু সন্দেহ ছিল না।

রাস্তায় ট্রেনের কামারায় প্রকাশ মামা ভাগ্নের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। বললে—কী রে, কী ভাবছিস?

সদানন্দ বললে—ভাবছি দাদু টাকাটা দেবে তো ঠিক?

প্রকাশ মামা বললে—তুই দেখছি আস্ত পাগল! কালীগঞ্জের বউ তোর কে শুনি যে তার টাকার জন্যে তুই মাথা ঘামচ্ছিস? আর বুড়িটা ক'দিনই বা বাঁচবে? ও টাকা পেলেই বা কী আর না পেলেই বা কী! তোর এমন বিয়ে হয়েছে, তুই এখন বিয়ের কথা ভাব। তুই এখন ভাব ফুলশয্যার রাত্তিরে বউ-এর সঙ্গে প্রথমে কী কথা বলবি—

সদানন্দ এ কথার কোনও উত্তর দিলে না।

প্রকাশ মামা বললে—দ্যাখ, তুই তো একটা আনাড়ির ডিম। তোকে আমি অনেক চেষ্টা করেও তো মানুষ করতে পারলুম না। রাধার ঘরে তোকে নিয়ে গিয়েই আমি তা বুঝেছি। মেয়েমানুষ দেখলে তুই অত ঘাবড়ে যাস কেন? কাল ফুলশয্যার রাত্তিরে যেন ঘাবড়ে যাস নি, বুঝলি?

সদানন্দ সে কথারও কিছু উত্তর দিলে না।

প্রকাশ মামা বললে—কী রে, কথা বলছিস না যে, ফুলশয্যার রাত্তিরে বউ-এর সঙ্গে প্রথমে কী কথা বলবি সব ভেবে রেখেছিস তো?

তবু সদানন্দর মুখে কোনও জবাব নেই।

প্রকাশ মামা তবু ছাড়লে না। বললে—কী রে, বুঝলি কিছু? কি বলছি তা বুঝতে পারলি?

সদানন্দ বললে—না—

—আরে, এই সোজা কথাটাও বুঝতে পারলি নে? জীবনে একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে প্রথম কথা বলবার আগে একটু ভেবে-চিন্তে নিতে হয়, বুঝলি? কিছু ভেবেছিস তুই?

সদানন্দ বললে—ভাববো আবার কী?

প্রকাশ মামা বললে—এই মরেছে! তুই দেখছি এখনও আনাড়ি আছিস! শোন, তোকে আমি বুঝিয়ে দিই, প্রথমে তো ঘরে ঢুকবি। ঢুকে দরজার খিল দিয়ে দিবি। তোর বউ যদি তখন চুপ করে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তো তুই আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে.....

সদানন্দ হঠাৎ বলে উঠলো—কিন্তু একটা কথা প্রকাশ মামা, তোমার কথাতেই কিন্তু আমি বিয়ে করেছি, তা মনে থাকে যেন—

অন্য প্রসঙ্গ আসতে প্রকাশ মামা বিরক্ত হয়ে উঠলো, বললে—তার মানে?

সদানন্দ বললে—তার মানে তুমি ভালো করেই জানো, দু'বার করে তা আর শুনতে চেয়ো না। আমার কিন্তু দশ হাজার টাকা চাই।

প্রকাশ মামা বললে—দশ হাজার টাকা আমি কোথায় পাবো? তোর দাদু সে-টাকা দেবে।

—হ্যাঁ, আমি বাড়ি ফিরে গিয়েই টাকা চাইবো। তখন দাদু টাকা না দিলে কিন্তু তোমাকে সে-টা পাইয়ে দিতে হবে। তোমার দায়িত্ব সেটা। শেষকালে যেন বোল না তোমার কোনও দায়িত্ব নেই—

—আরে, তুই দেখছি সেই যাকে বলে মালে ভুল তালে ঠিক।

সদানন্দ বললে—সে তুমি যাই বলো, আমি কিন্তু তখন তোমাকে ছাড়বো না। তখন যেন বলো না যে তুমি কিছু জানো না!

প্রকাশ মামা বলে উঠলো—দ্যাখ্ দিকিন, এখন কি ও সব কথা ভাববার সময়? কোথায় তুই বউ-র ঘোমটার ভেতর উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করবি, কোথায় ফুলশয্যার রাত্তিরে কী কথা বলবি সেই কথা ভাববি, তা নয় যত সব...

ট্রেনের কামরার মধ্যে নতুন বর-কনে চলেছে তখন। অন্য প্যাসেঞ্জাররা নতুন কনের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার মুখ দেখবার চেষ্টা করছে। হু-হু করে চলেছে ট্রেনটা। তারপর একসময় এসে থামলো রেল-বাজারে। রজব আলি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে পালকীর বন্দোবস্তও ছিল। এর পরে আর কোনও গণ্ডগোল হয় নি। নবাবগঞ্জে বর-কনেকে দিদির হেপাজতে রেখে ভিয়েন আর শামিয়ানা নিয়ে পড়েছিল। যেদিকে প্রকাশ মামা না দেখবে সেই দিকেই তো চিত্তির!

হঠাৎ কৈলাস গোমস্তা এসে ডাকলে—শালাবাবু, ছোটবাবু একবার ডাকছেন আপনাকে—

—ছোটবাবু? কেন? কোথায়?

—ওপরে।

—আচ্ছা, যাচ্ছি,—তুমি যাও—

বলে আর দাঁড়ালো না। কাজকর্ম ফেলে দোতলায় সিঁড়ির দিকে চলতে লাগলো।

কিন্তু ওপরে তখন আর এক নাটকের অভিনয় চলছে। চৌধুরী মশাই গিয়ে হাজির হয়েছেন সেখানে। সদানন্দও রয়েছে। প্রকাশ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুল তখন কর্তাবাবু বেশ রেগে উঠেছেন।—বলছেন তাহলে তোমার কথাই ঠিক থাকবে? আর আমি কেউ নই? আমার কথার কোনও দাম নেই? আমি তো বলছি ফুল-শয্যা-টয্যা হয়ে যাক তখন টাকার বন্দোবস্ত করবো। হুট করে বললেই কি টাকা বেরোয়? আর অত টাকা কি এক সঙ্গে কেউ ঘরে রাখে? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতেও তো সময় চাই?

সদানন্দ বললে—কিন্তু তখন কেন বললেন যে, আমি বিয়ে করে ফিরে এলেই টাকা দেবেন্? আপনি তো এতক্ষণে আজকের মধ্যে কাউকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রাখতে পারতেন!

কর্তাবাবু বললেন—তার কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে নাকি?

সদানন্দ বললে—কিন্তু আপনি তো জানতেন আমি বিয়ে করে ফিরে এসেই টাকাটা

চাইবো!

কর্তাবাবু বললেন—গুরুজনদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তাও দেখছি তুমি শেখো নি—

সদানন্দ বললে—আপনারা গুরুজন বলে কি আপনাদের সাতখুন মাফ? আমি তার প্রতিবাদ করতেও পারবো না?

চৌধুরী মশাই এবারে ছেলের দিকে চাইলেন। বললেন—তুমি চুপ করো। কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তাও জানো না। যাও যাও, নিচেয় যাও, এখন আমাদের অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে। কালকে আত্মীয়-স্বজন-কুটুমরা আসবে, তাদের ব্যবস্থা করতে হবে, এই সময়ে কিনা তুমি দাদুকে এই রকম বিরক্ত করতে এলে, দুদিন সবুর করতে পারলে না? এখন যাও, পরে ওসব ব্যাপার হবে—

সদানন্দ বললে—তুমি এটা কী বলছো বাবা? যখন দাদু কথা দিয়েছিলেন, তখন তুমিও তো শুনেছ! এমন করবে জানলে তো তখন আমি বিয়ে করতেই যেতুম না।

—থামো!

কর্তাবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়েই চিৎকার করে উঠলেন—থামো, থামো, বেয়াদপিরও একটা সীমা আছে।

বেয়াদপি আমি করছি না আপনি করছেন? আপনি কেন এমন করে একজন বিধবার সর্বনাশ করলেন? কেন তার সর্বস্ব কেড়ে নিলেন? কেন তাকে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না?

হঠাৎ সমস্ত বাড়ির লোকজন বেশ সচকিত হয়ে উঠলো। কর্তাবাবুর ঘরের ভেতরে একটা গোলমালের আওয়াজ হতেই সবাই কান পেতে গোলমালের কারণটা জানতে চাইল। গৌরী পিসী সিঁড়ির তলা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে উঠলো। কীসের আওয়াজ? ভেতরে বাড়ির ঘরে তখন নতুন বউকে ঘিরে অনেক অভ্যাগতের ভিড়। কাছে গিয়ে ডাকলে—বউদি ও বউদি—

সদানন্দর মা ব্যস্ত ছিল। বললে—কী? কী বলছিস?

গৌরী বললে—কর্তাবাবুর ঘরে অত চেঁচামেছি হচ্ছে কীসের বলো তো?

—চেঁচামেচি হচ্ছে কীসের তা আমি কী করে জানবো?

গৌরী বললে—না, মনে হলো খোকার গলা শুনতে পেলাম। খোকাবাবুর সঙ্গে কর্তাবাবুর যেন কথা-কাটাকাটি হচ্ছে—

—তাই নাকি?

এই এক ঘণ্টা আগে যে নতুন বউকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে সে কী নিয়ে ঠাকুরদাদার সঙ্গে চেঁচামেচি করবে! সাধারণত সদানন্দ তো কারো সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলে না। সে তো বরাবর চুপচাপই থাকে। সাধারণত কেউ তার মুখই দেখতে পায় না। সে যে কখন কোথায় থাকে কী করে কেউই তা জানতে পারে না। খেতে হয় তাই খায়। তারপর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই আবার কোথায় বেরিয়ে যায় তাও কেউ জানতে পারে না। সে কেন গোলমাল করবে বাড়ির ভেতরে।

কিন্তু তখন ও-সব ভাবনা ভাববার সময় নেই বাড়ির গিন্নীর। প্রীতি বাড়ির গিন্নী। এই সমস্ত অন্দর-মহলের মানুষগুলোর দায়িত্ব সমস্ত তার ওপর। কে খেতে পাচ্ছে, আর কে খেতে পাচ্ছে না তাও ভাবা তার দায়িত্ব। এতদিন পরে তার বাবা এসেছেন ভাগলপুর থেকে। তিনি বুড়ো মানুষ। তাঁর একমাত্র নাতির আজ বিয়ে। এই প্রথম আর এই-ই বোধ হয় শেষ। কীর্তিপদবাবু সুলতানপুরে একলা পড়ে থাকেন। তাঁরও অনেক সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি

দেখা-শোনার কাজেই তাঁর দিন কেটে যায়। অথচ তিনি চলে যাবার পর ওই সমস্ত সম্পত্তি তাঁরই মেয়ে-জামাই-নাতি পাবে। তখন এই নাতিকে যেমন নবাবগঞ্জের সম্পত্তি দেখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে সুলতানপুরের সম্পত্তিও। তিনি যা কিছু করছেন সবই এদের জন্যে—এই মেয়ে জামাই আর নাতি! তাই নাতির বিয়ের সময় নবাবগঞ্জে না এসে পারেন নি।

এসেই মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। অনেকদিন পরে দেখা।

কীর্তিপদবাবু বললেন—কেমন আছিস রে প্রীতি? সব খবর ভালো তো?

প্রীতি বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। বললে—তুমি কত রোগা হয়ে গেছ বাবা—

কীর্তিপদবাবু বললেন—রোগা তো হবোই, বুড়ো হচ্ছি না? এখন তোদের রেখে যেতে পারলেই তো হয় রে—

প্রীতি জিজ্ঞেস করলে—আসতে তোমার কোনও কষ্ট হয় নি তো বাবা?

কীর্তিপদবাবু বললেন—আমার কষ্টর কথা রাখ্। কুটুম কেমন হলো তাই বল? মেয়ে দেখতে-শুনতে ভালো তো?

প্রীতি বললে—শুনেছি তো মেয়ে দেখতে-শুনতে ভালো। আমি তো টাকা চাই নি। একটা পয়সা নেওয়া হয় নি, শুধু দেখতে-শুনতে সুন্দরী আর স্বভাব-চরিত্রটা ভালো হবে এই-ই চেয়েছিলুম। এখন কালকে বউ আসবে তখন বুঝবো।

খোকা কোথায়? তাকে তো দেখছি নে?

প্রীতি বললে—তার কথা আর বোল না।

কীর্তিপদবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেন? তার আবার কি হলো?

প্রীতি বললে—তাকে তো আমি চোখেই দেখতে পাই না। কখন সে থাকে, কখন থাকে না, কোথায় যায়, কী করে, কেউ জানতে পারে না।

—তা কলেজে তো বি-এ পড়ছিল, পাস-টাস করেছে?

—পাস করলে কী হবে, বুদ্ধিসুদ্ধি ভালো হয় নি। বাড়ির কাজকর্ম এখন থেকে বুঝে নেওয়া উচিত, তা সেদিকেও মন নেই। টাকা-পয়সার দিকেও কোনও টান নেই।

কীর্তিপদবাবু মেয়ের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ও কিছু না, ও নিয়ে তুই ভাবিস নি। ওর মতন বয়েসে সবাই ওই রকমই থাকে। তারপর এই এখন বিয়ে হচ্ছে, দেখবি কাঁধে জোয়াল পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ছোটবেলায় আমিও ওই তোর খোকার মতন ছিলুম—

বলে হাসতে লাগলেন। কিন্তু মেয়ের তখন বাবার সঙ্গে কথা বলবারও সময় ছিল না। ভাঁড়ারের চাবি যার শাড়ির আঁচলে তাকে সব দিকে নজর দিতে হয়। যাবার আগে বাবার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে অন্য কাজে মন দিতে হলো। খোকা যখন বিয়ে করতে গেল সেদিনও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। প্রকাশকে কাছে ডাকলেন কীর্তিপদবাবু। জিজ্ঞেস করলেন—গোলমালটা কীসের প্রকাশ? খোকা কোথায় ছিল?

প্রকাশও তখন অনেক কাজে ব্যস্ত। কালীগঞ্জ থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সদানন্দকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কোনও রকমে। তারপর বেলা করে গায়ে-হলুদ হয়েছে, যাত্রার জন্যে সবাই তৈরী হচ্ছে।

বললে—সে-সব আপনাকে পরে সব বলবো পিসেমশাই, সে অনেক কাণ্ড—এখন বলবার সময় নেই—

—অনেক কাণ্ড মানে?

প্রকাশ বললে—সদানন্দ এখন বায়না ধরেছে টাকা দিতে হবে, দশ হাজার টাকা দিলে তবে সে বিয়ে করতে যাবে—

—দশ হাজার টাকা? দশ হাজার টাকা কাকে দেবে? নিজে নেবে?

—না।

—তবে কাকে দেবে?

—কালীগঞ্জের বউকে।

কীর্তিপদবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কালীগঞ্জের বউ আবার কে? খোকার বিয়ের সঙ্গে কালীগঞ্জের বউ-এর কীসের সম্পর্ক?

প্রকাশ বললে—পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবো, এখন আমার সময় নেই, দেরি হয়ে গেছে, আর দেরি হলে ট্রেন মিস করবো—

বলে প্রকাশ চলে গেল। তারপর শাঁখের শব্দ শোনা গেল। মেয়েদের উলু দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বর বিয়ে করতে চলে গেল। কীর্তিপদবাবু সবই দেখলেন, সবই শুনলেন।

এসব গতকালের ঘটনা। তারপর আজ নতুন বউ এসেছে। এসে নরনারায়ণ চৌধুরীর ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এসেছে। কীর্তিপদবাবুকেও প্রণাম করেছে। বাড়িতে অনেক লোকজনের ভিড়। বাইরে শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। প্রীতির বিয়ের সময় ভাগলপুরে এমনি হয়েছিল। এমনি করেই হয়ত এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে বংশের ধারা গড়িয়ে চলে।

হঠাৎ বেয়াই মশাই-এর ঘর থেকে চেঁচামেচি-চিৎকারের শব্দ হতেই তিনি যেন চমকে উঠলেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাউকে কোথাও দেখতে পেলেন না। কাকে জিজ্ঞেস করবেন বুঝতে পারলেন না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হচ্ছে। সবাই নতুন বউকে দেখতেই ব্যস্ত। কিন্তু তখনও ওপরে চেঁচামেচি চলছে।

চৌধুরী মশাই বললেন—আমি কথা দিচ্ছি ফুলশয্যা মিটে গেলেই কালীগঞ্জের বউকে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। আমি নিজে তোমাকে কথা দিচ্ছি—

প্রকাশ মামা বললে—এবার হলো তো, এবার তাহলে তোর আর বলবার কিছু রইল না—তুই আর গোলমাল করিস নি—

নরনারায়ণ চৌধুরী অনেক কথা বলার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন—তোমরা সবাই এখন যাও এখান থেকে—আমার শরীর খারাপ লাগছে—

প্রকাশ মামা সদার দিকে চেয়ে বললে—চল্ চল্ এখান থেকে, দাদুকে আর বিরক্ত করিস নে। এখন তোর সব বায়না মিটলো তো—

সদানন্দ বললে—কিন্তু দাদু আগেও তো বলছিল টাকা দেবে, সে কথা কি রেখেছে?

—এবার ঠিক দেবে, আর একবার দ্যাখ। এবার না দিলে তোর যা ইচ্ছে তাই করিস।

সদানন্দর চোখ দিয়ে তখন কান্না বেরিয়ে আসছিল। ঘরের বাইরে যেতে যেতে বলতে লাগলো—জানো প্রাকাশ মামা, ও টাকা না দিতে পারলে আমি কালীগঞ্জের বউ এর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

প্রকাশ মামা বললে—তা কালীগঞ্জের বউ-এর কাছে তোকে মুখ দেখাতে কে বলেছে? আর সে বুড়িই বা ক'দিন বাঁচবে? তারও তো আর বেশিদিন নেই।

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমি? আমি নিজেকে কী বলে বোঝাবো? আমার নিজের কাছেও তো আমার একটা দায়-দায়িত্ব আছে—

—তোর নিজের কাছে আবার কীসের দায়-দায়িত্ব? তুই বলছিস কী? এখন তুই বিয়ে করলি এখন যে ক'দিন বাঁচিস ফুর্তি করে যা! যতদিন তোর টাকা আছে কেবল পেট ভরে ফুর্তি করে যা। আমার যদি তোর মতন টাকা থাকতো দেখতিস আমি ফুর্তির ঘোড়দৌড় ছুটিয়ে দিতুম—

—না প্রকাশ মামা, তুমি জানো না, আমার দাদুর যত টাকা আছে, সব পাপের টাকা—

—পাপের টাকা? কী যা-তা বলছিস তুই?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, জানতে আমার কিছু বাকি নেই। কপিল পায়রাপোড়া গলায় দড়ি দিয়ে যে পাপ করছে, সে পাপ দাদুর। কালীগঞ্জের বউ-এর সর্বনাশ করেছে দাদু। মাখন ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক, তাদেরও দাদু খুন করেছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করতে আমারও সুখ-ভোগ করবার কোনও অধিকার নেই—

প্রকাশ মামা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল—তোর দেখছি লেখাপড়া শিখে মাথাটার একেবারে বারোটা বেজে গেছে। আমরা তোর জন্যে ভেবে ভেবে মরছি, কালকে লোকজনকে কেমনভাবে খাতির-যত্ন করবো সেই ভাবনায় আমরা সবাই অস্থির হয়ে যাচ্ছি, আর তুই কি না যত আবোল-তাবোল কথা নিয়ে মাথা খারাপ করছিস—

সদানন্দ বললে—না, তুমি জানো না প্রকাশ মামা, তোমরা কেউই বুঝতে পারবে না, আমি যা বলছি তা সকলের ভালোর জন্যেই বলছি—এতে তোমাদের সকলের ভালো হবে। কালীগঞ্জের বউকে টাকাটা না দিলে বরং আমাদের ক্ষতি—

—কী ক্ষতি হবে শুনি? ক্ষতিটা কী হবে?

সদানন্দ বললে—টাকাটা না দিলে আমাদের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

—নষ্ট হয়ে যাবে মানে?

—আমাদের চৌধুরীবাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের এই নবাবগঞ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের এই দেশ আমাদের এই জাত নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা সবাই মারা যাবো। তুমি আমি বাবা দাদু মা কাউকেই তাহলে আর বাঁচাতে পারবো না।

প্রকাশ মামা আর থাকতে পারলে না। বললে—তুই থাম দিকিনি। যত সব তোর বাজে কথা। সত্যিই লেখাপড়া শিখে তোর মাথার ব্যামো হয়েছে! তাই-ই যদি হতো তাহলে আর এতদিন পৃথিবী টিঁকে থাকতো না। জমিদারি চালাতে গেলে লাঠিবাজি খুনখারাবি না করলে চলে? চল, চল ও-সব কথা মাথায় ঢোকাস নি। ওসব যত ভাববি তত মাথাখারাপ হবে। তার চেয়ে চিরকাল সবাই যেমন করে এসেছে তেমনি করে যা, দেখবি তাতে অনেক আরাম। একটা জিনিস জেনে রাখিস ফুর্তির চেয়ে দুনিয়ায় বড় জিনিস আর কিছু নেই—

তখন আর প্রকাশ মামার নিজেরও দাঁড়াবার সময় নেই। সদানন্দ চলে যেতেই চৌধুরী মশাই কাছে এলেন।

বললেন—কী হলো প্রকাশ, খোকাকে বোঝালে?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ—

—কী বললে খোকা? বুঝলো?

প্রকাশ মামা বললে—বুঝবে না? আমি সব বললুম বুঝিয়ে। বুঝিয়ে বললুম জমিদারি রাখতে গেলে লাঠিবাজি জালজোচ্চুরি না করলে জমিদারি থাকে? আর জমিদারির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, গভর্নমেণ্ট চলে? গভর্নমেণ্ট লাঠিবাজি করে না? গভর্নমেণ্টও তো বন্দুকবাজি করে। কে না ওসব করে? ক্ষমতা রাখতে গেলে ওসব জালজোচ্চুরি করতেই হবে। আকবর বাদশা থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত সবাই ওই লাঠিবাজি বন্দুকবাজি করে

এসেছে। তোর ঠাকুর্দা যা করেছে তোর দাদামশাইও তাই করেছে। না করলে এত সম্পত্তি আর এত জমির মালিক হওয়া যায়?

—তা শুনে কী বললে খোকা?

প্রকাশ বললে—কী আর বলবে? বলবার মুখ রইল না। বোবার মত চুপ করে শুধু শুনলো আমার কথাগুলো।

—তারপর?

প্রকাশ বললে—তারপর যখন বুঝলো তখন মাথা ঠাণ্ডা হলো। আসলে জামাইবাবু, অত লেখাপড়া শিখেই যত গণ্ডগোল হয়েছে। তার চেয়ে আমরা বেশ আছি। আমরা পেট পুরে খেলুম আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোলুম। আমি দেখেছি মাথায় একটু বিদ্যে ঢুকলেই সব তালগোল পাকিয়ে যায়—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। শামিয়ানা খাটানো তখনও শেষ হয় নি। ওদিকে পুকুরের ধারে ভিয়েন চড়েছে। সেদিকেও তদারকি করতে যেতে হবে। আর একটু চোখের আড়াল হয়েই রসগোল্লা পানতুয়া টপাটপ দু'চারটে মুখে পুরে দেবে বেটারা।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে নেমে আসছিল। অগ্রহায়ণ মাসের বিকেল। বেলা ছোট হয়ে আসতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে হলেই হ্যাজাগ বাতি জ্বলে উঠবে উঠোনে। সমস্ত বাড়ির সামনে-ভেতরে আলোয় আলো হয়ে উঠবে।

প্রকাশ মামারই যেন যত জ্বালা। বিয়ে করবে সদা আর জ্বলেপুড়ে মরবে প্রকাশ মামা। কেন রে বাপু? আমি কে? আমি গরীব মানুষ, আমার বিয়ের সময় এই এত জাঁকও হয় নি, এত জমকও হয় নি। তবু দিদি টাকা দিয়েছে, সেই টাকা দু'হাতে খরচ করার মধ্যেই যা সুখ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেই হলো। করকরে নোট বেরিয়ে আসবে। সেই টাকার লোভেই সবাই খাতির করছে শালাবাবুকে। সবাই শালাবাবু বলতে অজ্ঞান। ক'দিন ধরে সবাই-ই একবার করে এসে প্রণাম করে যাচ্ছে। কাছে এসে পায়ে হাত দিয়ে বলছে—পেন্নাম হই শালাবাবু—

হঠাৎ প্রকাশ মামা সদরের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো।

কে?

একটা পালকি এসে ঢুকলে সদরের বার-বাড়িতে। পালকির চেহারা দেখেই প্রকাশ মামার চক্ষু চড়ক গাছ। কালীগঞ্জের বউ এলো নাকি?

আর কথাবার্তা নেই। প্রকাশ আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা ভেতর-বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। গিয়ে ডাকলে—দীনু, দীনু কোথায়, দীনু—

কাজের বাড়ি। সবাই-ই নাকে দড়ি দিয়ে খাটছে। অনেক ডাকাডাকির পর দীনু হাতের কাজ ফেলে এলো। প্রকাশ মামা বললে—দীনু, সিগ্‌গির কর্তাবাবুকে খবর দিয়ে এসো, কালীগঞ্জের বউ এসেছে—

—কালীগঞ্জের বউ?

নামটা শুনে দীনুরও যেন কেমন ভালো লাগলো না। আবার এসেছে মাগী!

—যাও, যাও খবরটা দিয়ে এসো শিগগির। তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দেওয়া ভালো।

দীনু গিয়ে ওপরে খবরটা দিতেই কর্তাবাবু উঠে বসলেন। বললেন—কে? কে এসেছে বললি?

যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না দীনুর কথাটা।

দীনু আবার বললে—কালীগঞ্জের বউ।

নামটা শুনে নরনারায়ণ চৌধুরীর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনও কথা বেরোল না। তিনি

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আজ তাঁর নাতির বিয়ে আর আজকেই কিনা কালীগঞ্জের বউকে নবাবগঞ্জে আসতে হয়!

দীনু তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কর্তাবাবু তার দিকে চেয়ে বললেন—তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী?

দীনু বললে—তাঁকে কী বলবো তাই জিজ্ঞেস করছি—

সে-কথার উত্তর না দিয়ে কর্তাবাবু কৈলাস গোমস্তার দিকে চাইলেন। বললেন—কৈলাস, কালীগঞ্জের বৌকে তুমি নেমন্তন্ন করেছিলে নাকি?

কৈলাস গোমস্তা বললে—আজ্ঞে না, আমি কেন নেমন্তন্ন করতে যাবো?

কর্তাবাবু সঙ্গে সঙ্গে দীনুর দিকে চাইলেন। বললেন—দীনু, যা তো একবার বংশী ঢালীকে ডেকে নিয়ে আয় তো, বংশী ঢালী আছে এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ডেকে আনছি—

দীনু তাড়াতাড়ি চলে গেল। আর তার পরেই বংশী ঢালী এসে ঘরে ঢুকলো। মাথায় জড়ানো একটা লাল পাগড়ি। কালো কুচকুচে গায়ের রং। পরনের কাপড়টাকে বাসন্তী রং-এ ছুপিয়ে নিয়েছে।

বললে—কী হুকুম কর্তাবাবু?

কর্তাবাবু কৈলাস গোমস্তার দিকে চাইলেন। বললেন—কৈলাস, তুমি একবার বাইরে যাও তো। বংশীর সঙ্গে আমার একটা কাজের কথা আছে—দেখো, যেন এ সময়ে আমার ঘরে কেউ না ঢোকে—

কৈলাস গোমস্তা বাইরে চলে যেতেই কর্তাবাবু বংশীর দিকে চেয়ে বললেন—একটু কাছে সরে আয়, আমার মুখের কাছে—

বংশী কর্তাবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

—একটা কাজ করতে পারবি বংশী? মোটা বখশিশ পাবি। কালীগঞ্জের বউ এসেছে, দেখেছিস তো? তাকে সরাতে হবে। পারবি? হবে তোর দ্বারা?

—পারবো হুজুর।

—কিন্তু দেখিস। খুব সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে! পারবি তো?

বংশী ঢালীকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অবান্তর। তবু ঘটনার গুরুত্বটা বোঝানোর জন্যেই বোধ হয় এই প্রশ্ন করলেন কর্তাবাবু।

বংশী ঢালী শুধু কর্তাবাবুরই নয়, এককালে কালীগঞ্জের জমিদারের লোক ছিল। কর্তাবাবু যখন এখানে এই নবাবগঞ্জে আসেন তখন বংশী ঢালীও তাঁর সঙ্গে এসেছিল। এইটেই তার পেশা, এইটেই তার নেশা। তাই এ ধরনের কোনও কাজে 'না' বলার অভ্যেস তার নেই। বরং কাজ না পেলেই যেন সে অখুশী হয়। তখন তার শরীর ভালো থাকে না, হজম হয় না, ঘুম হয় না, গা ম্যাজ-ম্যাজ করে।

এবার এতদিন পরে কর্তাবাবুর মুখে কাজের কথা শুনে বংশী বেশ সতেজ হয়ে উঠলো। বললে—বলুন কর্তাবাবু কী কাজ, নিজের জান দিয়ে আপনার কাজ করে দেব—

কর্তাবাবু বললেন—খুব সাবধানে করতে হবে কিন্তু, কেউ যেন জানতে না পারে।

কথাটা শুনে বংশীর যেন অপমান বোধ হলো। বললে—আগে কি কখনও অসাবধান হয়েছি যে আপনি ও-কথা বলছেন?

কর্তাবাবু নিজেকে শুধরে নিলেন। সত্যিই তো, বংশী ঢালীকেই যদি তিনি অবিশ্বাস করেন তাহলে তো তাঁর নিজেকেই অবিশ্বাস করতে হয়। বললেন—ওরে, তা বলছি নে। বলছি আবার একটা ঝামেলা হয়েছে, সেই ঝামেলাটা তোকে কাটাতে হবে—

—বলুন না কাকে খতম করতে হবে?

কর্তাবাবু বললেন—এই এখখুনি খবর পেলাম কালীগঞ্জের বৌ নাকি এসেছে—

—তা যাচ্ছি আমি, এখুনি খতম করে দিচ্ছি—

—কী করে খতম করবি? সবাই যে জানতে পারবে। আজ যে কুটুমবাড়ির লোকজন এসেছে সব—

বংশী ঢালীর মুখটা একটা পৈশাচিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাথায় লাল কাপড়ে বাঁধা পাগড়িটা খুলে আর একবার জমপেশ করে বেঁধে নিলে। তারপর এক লাফে ঘরের বাইরে চলে গেল।

এই নবাবগঞ্জের ইতিহাসে এ এক মর্মান্তিক কাহিনী। জমিদারি উঠে গেছে ইণ্ডিয়া থেকে। সেই ১৯৫৮ সালের আইনে জমিদারি রাখা এখন বেআইনী হয়ে গেছে। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে বুঝি তা তখনও নিঃশেষ হয় নি। নিঃশেষ হয় নি সেই জমিদারির দাপট। জমি আর তখন জমিদারের নয়, সরকারের। সরকারের বিনা অনুমতিতে বেশি জমি রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু আইন যেমন আছে আইনের ফাঁকও তো আছে তেমনি। সেই আইনের ফাঁক দিয়ে কোনও জমিদারের কোনও জমিই হাতছাড়া হয় নি। শুধু জমির মালিকের নাম বদলিয়েছে। আগে যেখানে ছিল নরনারায়ণ চৌধুরীর নাম সেখানে বসেছে কুল-বিগ্রহের নাম। বাড়িতে কুল-বিগ্রহও আবার একটা নয়, একশোটা। একশোটা কুল-বিগ্রহের নাম বসেছে মালিকানার খতিয়ানে। সব কুল-বিগ্রহের প্রত্যেকের ভাগে পড়েছে পঁচাত্তর বিঘে জমি। অর্থাৎ জমির মালিক সেই মালিকই আছে, শুধু দাখলে কাটা হয় বেনামে। কুল-বিগ্রহরা পাথরের ঠাকুর। ঠাকুরের না আছে পেট না আছে ক্ষিধে। এমন কি খাবার হজম করবার ক্ষমতাও নেই কোনও ঠাকুরের। কিন্তু বেনামদার যারা তাদের মোটা মোটা পেট আছে, বাঘের মত ক্ষিধেও আছে। আর আছে হজম করবার অমানুষিক ক্ষমতা।

একদিন নরনারায়ণ চৌধুরী তিন পুরুষ আগে যখন এখানে এই সম্পত্তির পত্তন করেন তখন কল্পনাও করেন নি যে, একদিন আবার এই সম্পত্তি-বিলোপ আইন হবে। কিন্তু আইনটা যখন হলো তখন প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে কি গভর্নমেণ্ট সব জমি গ্রাস করে নেবে নাকি?

কিন্তু অভয় দিলেন উকিলবাবু। উকিলবাবু হাসলেন—গভর্নমেণ্ট আইন করলেই বা, আমরা আছি কী করতে কর্তাবাবু? আইন তৈরি করা যেমন গভর্মেণ্টের কাজ, আমাদের কাজ তেমনি আইন ভাঙার রাস্তা বাতলে দেওয়া—

কর্তাবাবু বললেন—তাহলে আইন বাতলে দিন—

উকিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন—আমাকে কত দেবেন বলুন? আমার পাওনাটা?

কর্তাবাবু বললেন—যা চাইবেন তাই-ই দিতে হবে। শতকরা পাঁচ টাকা খরচ না-হয় দেব আপনাকে—

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। উকিলবাবুই বুদ্ধি দিলেন—তাড়াতাড়ি কিছু মন্দির আর ঠাকুর তৈরি করে ফেলুন কর্তাবাবু। মাটির ঠাকুর করলে তেমন কিছু খরচ হবে না। রোজ বাড়িতে ঠাকুর-সেবা আরম্ভ করে দিন। পুরুত রাখুন আলাদা আলাদা—আর তারপর সেই সব ঠাকুরের নামে পঁচাত্তর বিঘে করে জমি-জমার দলিল করে ফেলুন। দেখি, গর্ভমেণ্ট কী করে। আর তখন আমি তো আছিই—

তা চৌধুরীবাড়িতে আগে থেকেই কুল-বিগ্রহ ছিল। পরে তাদের সংখ্যা বেড়ে একশো হলো। শেষ পর্যন্ত আইন যখন চালু হলো দেখা গেল মাত্র পঁচাত্তর বিঘে জমি-জমার মালিক হলেন নরনারায়ণ চৌধুরী আর বাকি ছেলে, পুত্রবধূ আর ঠাকুরদের নামে এমনভাবে জমি-জমা ভাগ হলো যাতে এক তিল জমি সরকারের ভাগে না পড়ে।

সুতরাং কাগজে-কলমে জমিদারি-প্রথা বিলোপ হয়ে গেল বটে, কিন্তু জমিদার যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। রয়ে গেল আগেকার সেই আয়-আদায় আর সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেল তাদের দাপট। আর তার সঙ্গে রয়ে গেল বংশী ঢালীরাও।

বংশী ঢালীদের কাজ কিছু থাকুক আর না-থাকুক তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হয়, মাসোহারা দিয়ে যেতে হয়। কাজ দিলাম তো ভালো আর যখন কাজ দিলাম না তখন বসে থাকো।

এমনি অনেকবার অনেক কাজের ভারই পড়েছে বংশী ঢালীর ওপর।

বড় বিশ্বাসী কর্মচারী বংশী ঢালীরা। সুখ-শান্তির দিনে তারা খেতে পাচ্ছে কি না তা দেখবার দায় নেই কর্তাবাবুদের। কিন্তু বিপদের দিনে তারাই ভরসা। তারাই বুক দিয়ে বাঁচায় কর্তাবাবুদের।

আজ এতদিন পরে আবার ডাক পড়েছে সেই বংশী ঢালীর।

বাড়িতে যখন সবাই কাজে ব্যস্ত তখন কেবল তারই কাজ ছিল না। এখন যেন সেও একটা কাজ পেলে। এতক্ষণ শুধু বাড়ির শোভা হয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাজের লোক যে সে চুপ করে থাকেই বা কী করে!

কর্তাবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে সে নিচেয় এল। চারিদিকে হৈ চৈ। লোকজনের আনাগোনায় সমস্ত বাড়িটা তখন গম-গম করছে। কিন্তু তাতে তার কিছু আসে যায় না। তার কাজ সকলের চোখের আড়ালে। সে কাজ কেউ দেখতে পাবে না। জানতে পারবে না তার বাহাদুরি। জানবে শুধু সে আর তার সাকরেদরা। আর জানতে পারবে তার অন্নদাতা মালিক। যে জানলে তার খাওয়া-পরা জুটবে, তার চাকরি বজায় থাকবে।

নিচেয় নেমেই আর দাঁড়াল না সেখানে বংশী ঢালী। একেবারে সোজা গিয়ে হাজির হলো বার-বাড়িতে। বার-বাড়িতে পালকি থেকে নেমে কালীগঞ্জের বউ তখন মাথার ঘোমটাটা ভালো করে টেনে দিলে।

প্রকাশ মামা সামনে গিয়ে অভ্যর্থনা করলে—আসুন আসুন মা জননী—

কালীগঞ্জের বউ-এর পরনে একটা গরদের পাট-ভাঙা থান। আজকে একটা বিশেষ দিন বলে বিশেষ ভাবেই সেজেগুজে এসেছে। আসবার তার ইচ্ছে ছিল না তেমন। কিন্তু আবার না-এসেও থাকতে পারে নি। একবার মনে হয়েছিল বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না। কিন্তু কে তাকে নেমন্তন্ন করবে! নারায়ণ তার নাতির বিয়েতে তাকে নেমন্তন্ন করবে এটা আশা করাও অন্যায়। কালীগঞ্জের বাজার থেকে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে এসেছিল নতুন বউকে দেবার জন্যে। পনেরো টাকা দাম নিয়েছে শাড়িটার।

কালীগঞ্জের বউ-এর তেমন পছন্দ হয় নি শাড়িটা। বলেছিল—হ্যাঁ রে দুলাল, এর থেকে ভালো শাড়ি একটা পেলিনে?

দুলাল বললে—এর চেয়ে ভালো শাড়ি আর দিতে হবে না মা, কেউ তো আপনাকে এ বিয়েতে নেমন্তন্নও করে নি—

কালীগঞ্জের বউ বলেছিল—নেমন্তন্ন না-করলেই বা, নায়েব মশাই না-হয় আমাকে নেমন্তন্ন করে নি, কিন্তু তার নাত-বৌ কী দোষ করলো, বল্? সে তো এর মধ্যে নেই। তাকে কেন খারাপ শাড়ি দিতে যাবো?

তা তখন আর সে-শাড়ি বদলাবার সময়ও ছিল না বলতে গেলে। তাড়াতাড়ি সেই শাড়িখানাই একটা কাগজে মুড়ে নিয়ে চলে এসেছিল। পালকির ভেতরে আসতে আসতে কালীগঞ্জের বউ-এর কেবল মনে পড়ছিল খোকার সেই কথাগুলো—তোমার টাকা আমি ফেরত দেবই কালীগঞ্জের বউ, তোমার টাকা না দিলে আমি বিয়েই করতে যাবো না—

আহা! ঠাকুর্দা যাই হোক, তার নাতিটা তো কোন দোষ করে নি।

পালকির ভেতরে বসেই কালীগঞ্জের বউ বলেছিল—তোরা একটু পা চালিয়ে চল দুলাল, নতুন-বউ বিকেল বেলা নবাবগঞ্জে আসবে, তাকে শাড়িটা দিয়ে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে চাই—

সত্যিই সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে চেয়েছিল কালীগঞ্জের বউ। হয়ত মন বলছিল সন্ধ্যের আগে ফিরে না এলেই বুঝি কোনও বিপদ ঘটবে। কিন্তু কে জানতো সে-বিপদ এমন ভয়াবহ বিপদ হয়ে উঠবে! কে জানতো সে-বিপদ এমনই বিপদ যে এ-জন্মের মত তা কাটিয়ে তার কালীগঞ্জে ফিরে আসা হবে না! আর কে-ই বা জানতো কালীগঞ্জের সেই বিপদই নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বংশের বিপদ হয়ে এমন করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেবে!

সত্যিই, এমনি করেই হয়ত ইতিহাস তার আপন গতি-পথ পরিবর্তন করে। নইলে একদিন যে-সূর্য কালীগঞ্জের আকাশে উদয় হয়ে কালীগঞ্জেই অস্ত গিয়েছিল তা যে আবার একদিন নবাবগঞ্জের আকাশকেও অন্ধকার করে দেবে তা-ই বা কে ভাবতে পেরেছিল! নইলে হর্ষনাথ চক্রবর্তী হয়ত যাবার আগে তাঁর স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে যেতেন। যাবার সময় হয়ত সহধর্মিণীকে বলে যেতেন—ওগো, ওই আমার নায়েবকে তুমি বিশ্বাস কোর না। নায়েব নরনারায়ণ চৌধুরীকে বিশ্বাস করলে একদিন তোমার সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলে যেতেন—সম্পত্তি রক্ষা করতে গেলে কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই। বলে যেতেন—আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বড় বিশ্বাস আর কিছু নেই। আরো বলে যেতেন—সম্পত্তি এমনই জিনিস যা শুধু নায়েব কেন নিজের ছেলেকেও বিশ্বাসহন্তা করে তোলে।

কিন্তু সেদিন হর্ষনাথ চক্রবর্তীর গৃহিণী বড় সহজ সরল মানুষ ছিল। সংসারে যে তাকে একদিন এমন করে একলা হয়ে যেতে হবে তাও কখনও কল্পনা করতে পারে নি সে। কর্তা ছিলেন মহাপ্রাণ মানুষ। গৃহিণীও তাই। নদীতে যখন স্নান করতে যেতেন তিনি সঙ্গে লোক যেত মাথায় ছাতি ধরে। যেন রোদ না লাগে কর্তার শরীরে। কোঁচানো কাপড় যেত স্নান করে উঠে পরবার জন্যে। আর যেত কাঁসার বাটিতে আধ সের তেল।

গৃহিণী দেখতে পেয়ে একদিন বলেছিল—অত তেল কি তোমার নিজের গায়ে মাখো নাকি?

কর্তা শুনে হাসতেন। বলতেন—না গো, ঘাটে যারা আসে তারা বড় গরীব মানুষ, তাদের তেল কেনবার পয়সা নেই। আমি তেল মাখি, তারাও মাখে—

শুধু তেল নয়। একবার গৃহিণীর ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রামের সব লোককে খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। খেতে যাবার আগে হঠাৎ কর্তার নজরে পড়লো গামলা-ভর্তি রসগোল্লা ভাসছে। বললেন—দেখি দেখি, খেয়ে দেখি একটা কেমন পাক হয়েছে—

রসগোল্লা খেলেন একটা।

কিন্তু রসগোল্লাটা মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিলেন।

বললেন—না, এ মিষ্টি কাউকে খেতে দিতে পারবে না, এ বাসি মিষ্টি, টক হয়ে গিয়েছে। ফেলে দাও—

শুধু ফেলে দেওয়া নয়। পাছে কাক-পক্ষীতেও খায় সেই জন্যে মাটিতে গর্ত করে সেই আড়াই মণ ছানার তৈরি রসগোল্লা সব পুঁতে ফেলা হলো। তারপর আবার রাতারাতি নতুন করে তৈরি হলো রসগোল্লা। তবে সকলেরই পাতে মিষ্টি পরিবেশন করা হলো।

এ-সব ঘটনা কালীগঞ্জের লোক যেমন জানে, এই নরনারায়ণ চৌধুরীও তেমনি জানেন। অথচ সেই চক্রবর্তী মশাই-এর গৃহিণীর এমন সর্বনাশ করতে তাঁরও কিনা বাধলো না।

শেষ সময়ে নরনারায়ণকেই ডেকেছিলেন সেদিন হর্ষনাথ চক্রবর্তী। বলেছিলেন—এবার আমার যাবার বন্দোবস্ত করো নারায়ণ—

নরনারায়ণ যাওয়ার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কোথায় যাবেন হুঁজুর?

হর্ষনাথ বলেছিলেন—নবদ্বীপ—

নবদ্বীপের কথা শুনে নরনারায়ণ সেদিন একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—নবদ্বীপে যাবেন কেন হুঁজুর?

হর্ষনাথ বলেছিলেন—যা বলছি তাই করো, গাড়ি যুততে বলো—

তাই সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। কর্তা নবদ্বীপে যাবেন হুকুম হয়েছে। কর্তার হুকুমের আর নড়চড় নেই। গাড়ি চললো। সমস্ত দিন চলে সন্ধ্যেবেলা একটা নদীর ধারে এসে গাড়ি পৌঁছুল। জিজ্ঞেস করলেন—এ কোথায় এলাম?

নরনারায়ণ বললেন—আজ্ঞে কেষ্টগঞ্জ—

কর্তা বললেন—আমি তামাক খাবো—আমার কলকে গড়গড়া নিয়ে এসো—

সঙ্গের লোক আবার ছুটলো কালীগঞ্জে। কর্তার তামাক খাবার ইচ্ছে হয়েছে। তাঁর নিজের গড়গড়া, ফরসি, সব কিছু আনা চাই। তিনি সেই কেষ্টগঞ্জের নদীর ঘাটেই আস্তানা গাড়লেন। পরের দিন সব কিছু এসে হাজির হলো। তখন সেই নিজের অভ্যস্ত গড়াগড়ার ওপর কলকে বসিয়ে তামাক খেলেন। দুচার টান দিলেন গড়গড়ায়। ধোঁয়া বেরোল। আর তারপর সেটা নরনারায়ণের হাতে দিলেন। বললেন—আর না, আমার এইটুকু আসক্তি ছিল, এবার তাও গেল, এখন চলো—

তখন গাড়ি আবার চললো নবদ্বীপের পথে—

কিন্তু এসব কথা আজকে আর কে শুনবে? কাকে শোনাবে কালীগঞ্জের বউ? একজন যে এসব ঘটনার সাক্ষী ছিল সেও আজ সব ভুলে বসে আছে। সেদিনকার সেই নায়েব আজ আর সেদিনকার সেই মনিবকে মনে রাখতে চায় নি। মনে রাখলে নবাবগঞ্জের সেই সব কিছু সম্পত্তি সোজা কালীগঞ্জের বউ-এর কাছেই ফিরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। তাই কালীগঞ্জের বউকে দেখলেই তার মেজাজটা বিগড়ে যায়। বলে—যা যা দীনু, বল্ আমার শরীরটা খারাপ, আমার সঙ্গে দেখা হবে না—

আর তা ছাড়া নিজের সৌভাগ্যের দিনে কে আর অতীতের সেই অন্ধকার দাসত্বের দিনগুলোর কথা মনে রাখে! কালীগঞ্জের বউ-এর নাম শুনলেই যেন কেবল মনে পড়ে যায় সেই পনেরো টাকা মাইনের চাকরিটার কথাগুলো। কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় তাঁর পুরানো চোহারাটাকে। বলে—ওই দ্যাখ, ওকে চিনতে পারিস!

নরনারায়ণ চৌধুরী চিৎকার করে ওঠেন—কৈলাস—কৈলাস—

কৈলাস গোমস্তা বলে—আজ্ঞে, এই তো আমি, আমি তো আপনার পাশেই রয়েছি—

—ও—বলে যেন শান্ত হন। যেন আবার তিনি বাস্তব জগতে ফিরে আসেন। বলেন—দেখ কৈলাস, আজকাল কেবল আমার এই রকম হয়। মনে হয় যেন আমার কাছে কেউ নেই। তুমি আমার কাছে কাছে থাকবে সব সময়—

কিন্তু সেদিন বংশী ঢালী ঘরের বাইরে চলে যাবার পরই কর্তাবাবু আবার ডাকলেন—কৈলাস—

কৈলাস বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। ডাক পেয়েই ভেতরে এল। বললে—আমাকে ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, তুমি কোথায় যাও? আমি তোমাকে বলেছি না সব সময় তুমি আমার কাছে কাছে থাকবে?

কৈলাস বললে—আজ্ঞে, আপনি যে এখুনি আমাকে বাইরে যেতে বললেন—

কর্তাবাবু বললেন—দেখ কৈলাস তক্কো কোর না, তোমার ওই বড় দোষ, তুমি বড় মুখে মুখে তক্কো করো। তোমাকে আমি বার-বার বলেছি আমার কাছাকাছি থাকবে। দেখছো, আমার সিন্দুকটা পাশে রয়েছে, এতে টাকাকড়ি আছে. কখন কে আসে তার ঠিক নেই—তুমি.......

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন কান পেতে শুনতে লাগলেন।

বললেন—একটা কীসের যেন শব্দ হলো না কৈলাস—

কৈলাস গোমস্তাও শব্দটা শুনতে চেষ্টা করলে। বললে—হ্যাঁ, ও তো মেয়েরা শাঁক বাজাচ্ছে নিচেয়—

—কর্তাবাবু ধমকে উঠলেন—মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে সে তো আমিও শুনতে পাচ্ছি। সে শব্দ নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পেলে না?

কৈলাস গোমস্তা বললে—আজ্ঞে না।

কর্তাবাবু বললেন—তুমি দেখছি দিন-দিন কানে কালা হয়ে যাচ্ছো। যাও, শুনে এসো কীসের শব্দ হলো ওখানে—

কৈলাস গোমস্তা তাড়াতাড়ি উঠে নিচেয় চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্তাবাবু ধমক দিলেন। বললেন—তুমি আবার কোথায় যাচ্ছো?

—আজ্ঞে নিচেয়।

—আজ্ঞে নিচেয়! তোমাকে বলেছি না তুমি সব সময় আমার কাছে কাছে থাকবে। আমার কাছে সিন্দুকে টাকা রয়েছে, বলেছি না তোমাকে?

কৈলাস গোমস্তা কথাটা শুনে আবার তার নিজের জায়গায় এসে বসলো।

কিন্তু ওদিকে হর্ষনাথ চক্রবর্তী মশাই তখন নবদ্বীপে চলেছেন। তাঁর জীবনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর আর কোনও আসক্তি নেই তখন। নাবালক ছেলে দু'জন রইলো, গৃহিণী রইলো। আর রইলো নায়েব নরনারায়ণ! জমি-জমাও রইল অনেক। অনেক কিছুই তিনি রেখে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় কিছুই সঙ্গে নিলেন না। যাবার সময় কারো সঙ্গে কিছু থাকেও না। একলাই এসেছিলেন সংসারে, সেই সংসার ফেলে একলাই আবার চলে যাচ্ছেন। আসক্তি নেই, কামনা নেই, আকাঙ্খাও আর নেই। একমাত্র আসক্তি ছিল তাঁর ওই তামাকটার ওপর। তা সেটাও গেল। সেটাও তিনি ত্যাগ করলেন। এবার মুক্তি। এবার আর কোনও কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারবে না।

নায়েব নরনারায়ণ সঙ্গে চলেছেন। চলতে চলতে একদিন নবদ্বীপ শহরে এসে পৌঁছুলো।

কর্তা বললেন—চলো, আমাকে রাধামাধবের আশ্রমে নিয়ে চলো।

তাঁর কথামত সেই রাধামাধবের আশ্রমেই তাঁকে তোলা হলো। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন তাঁকে থাকতে হলো না। দু'দিন পরেই কর্তা বললেন—এবার আমার সময় হয়েছে নরনারায়ণ, আমাকে গঙ্গায় নিয়ে চলো—

নায়েব নরনারায়ণ তাঁকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেলেন। কর্তা সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গার জলে নামলেন। প্রথমে হাঁটু-জল। তারপর কোমর। তারপর বুক। সেই বুক-জলেই দাঁড়ালেন কর্তা।

সত্যিই, এ-সব কথা আজ এই বিয়েবাড়ির উৎসবের মধ্যে ভাবা অন্যায়। ওই ওপরের

দোতলায় যে পঙ্গু মানুষটি লোহার সিন্দুক আঁকড়ে ধরে জীবন কাটাচ্ছেন তারও এ-সব কথা ভাবতে নেই। ভাবলে আজ এই তার নাতির বিয়ে পণ্ড হয়ে যাবে। এই অতিথি-অভ্যাগতে ভরা জমজমাট ঐশ্বর্যের ওপর কালো ছায়া পড়বে। জীবনের সার সত্য মোক্ষ নয়, শান্তি নয়, ত্যাগও নয়। আসল সত্য হলো এই ঐশ্বর্য, এই জাকঁজমক আর এই সিন্দুক। কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তী নির্বোধ ছিলেন তাই তিনি আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নিজের মুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ত্যাগে বিশ্বাস করি না, মুক্তিতে বিশ্বাস করি না, অনাশক্তিতেও বিশ্বাস করি না। আমি বাঁচতে চাই। এই জমি-জমা-জাঁকজমক-ঐশ্বর্য-বিলাস সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে থেকে বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই আমার আমির মধ্যে দিয়ে। বাঁচতে চাই আমার সন্তানের মধ্যে দিয়ে। আমি বাঁচতে চাই আমার বংশ-পরম্পরার উত্তরাধিকারের মধ্যে দিয়ে। যে সেই বাঁচার পথে অন্তরায় হবে তাকে আমি নিপাত করবো, নিঃশেষ করবো। আমার বংশী ঢালী সেই নিঃশেষ করার পথে আমাকে সাহায্য করবে। সেই জন্যেই তো আমি তাকে মাসোহারা দিয়ে রেখেছি।

বংশী ঢালী যখন বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন কালীগঞ্জের বউ সেখানে নেই। এমন কি তার সেই পালকিটারও চিহ্ন নেই সেখানে।

প্রকাশ মামা মা-জননীকে নিয়ে তখন একেবারে ভেতর-বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। কালীগঞ্জের বউ সম্বন্ধে চৌধুরীবাড়িতে যত অশ্রদ্ধাই থাক্, তার সঙ্গে চৌধুরী-বংশের ঐশ্বর্যের ক্ষীণ সূত্রটার কথা জানতে কারো বাকি ছিল না। অন্ততঃ আর কেউ না-জানুক চৌধুরী-বাড়ির গিন্নী সে কথা জানে।

—কোথায় গো, বৌমা কোথায়?

কালীগঞ্জের বৌ এতবার এ-বাড়িতে এসেছে টাকার তাগাদা করতে কিন্তু এমনি করে কখনও অন্দর-মহলের চৌহদ্দির মধ্যে আসে নি।

বৌমা ব্যস্ততার মধ্যেও চিনতে পেরেছে। বললে—আসুন আসুন মা—

—কালীগঞ্জের বৌ বললে—আমাকে তুমি চিনতে পারবে না বৌমা। আমার নাত-বৌ এসেছে বাড়িতে তাই আশীর্বাদ করতে এলুম। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো বৌমা?

—ওমা, তাড়িয়ে দেব কেন আপনাকে!

কালীগঞ্জের বৌ বললে—না, আমাকে তো আসতে কেউ নেমন্তন্ন করে নি বৌমা, আমি এমনিই এসেচি, আমাকে তুমি এত খাতির কোর না। আমি শুধু নাত-বউকে আশীর্বাদ করেই চলে যাবো... কই, নাত-বউ কোথায়?

নয়নতারা তখন একটা ঘরের মধ্যে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে ছিল। আশেপাশে আরো ক'জন পাড়ার বৌ-ঝি বসে আছে।

গৌরী পিসী সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বললে—বৌমা, এঁকে প্রণাম করো, ইনি হচ্ছেন কালীগঞ্জের জমিদারের বৌ, তোমার গুরুজন—

কালীগঞ্জের বৌ হাতের পাট করা শাড়িখানা এগিয়ে দিতেই নয়নতারা সেখানা হাত বাড়িয়ে নিলে। তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—থাক্ থাক্ মা, আশীর্বাদ করি সুখী হও, শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করো—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। যেন চলে আসতে পারলেই বাঁচে। যেন সকলের চোখের আড়ালে চলে যেতে পারলেই তৃপ্তি পায়। মুখ নিচু করে যেমন এসেছিল তেমনি আবার বার-বাড়ির দিকে চলে গেল।

গৌরী পিসি বাইরে আসতেই প্রীতি জিজ্ঞেস করলে—কী রে, মাগী চলে গেছে—?

গৌরী পিসী বললে—হ্যাঁ, বিদেয় হয়েছে—

—কী দিয়ে বৌ-এর মুখ দেখলে রে?

—সে আর বলো না বৌদি। একটা বাঁদি-পোতার গামছা—

—সে কী রে? গামছা? গামছা দিয়ে আমার ছেলের বৌ-এর মুখ দেখলে?

গৌরী বললে—তা সে গামছাই একরকম বলতে পারো। আমাদের বিবিগঞ্জের হাটে জোলাদের হাতে বোনা যেমন শাড়ি পাওয়া যায় তেমনি।

—কত দাম হবে?

—তা তিন টাকাও হতে পারে, পাঁচ টাকাও হতে পারে—

প্রীতি বললে—ঢং, ঢং দেখে আর বাঁচিনে, তবু যদি নেমন্তন্ন করে ডেকে আনা হতো তো তাও বুঝতুম—

গৌরী বললে—অথচ মাগীর দেমাক দেখ না, কর্তাবাবুকে সেবার কত গালাগালি দিয়ে গেল, এখন আবার এসেছে ভাব-ভালবাসা দেখাতে—লজ্জাও করে না মা, ছিঃ!

প্রীতির সেসব মনে ছিল না। বললে—গালাগালি দিয়েছিল? কর্তাবাবুকে? কী গালাগালি দিয়েছিল রে?

—ওমা তোমার মনে নেই, ওই বার-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সেবার বলে নি—তুমি নিব্বংশ হবে নারাণ, আমি বামুনের মেয়ে হয়ে তোমাকে শাপমন্যি দিয়ে গেলুম তোমার বংশ থাকবে না—কত কী কথা বলে যায় নি?

প্রীতি বললে—ওমা, তুই আমাকে আগে মনে করিয়ে দিলিনে কেন? আমি তাহলে আজ ঝ্যাঁটা ঘষে দিতুম মাগীর মুখে?

তা বটে। গৌরীও সেই কথাই বললে। কালীগঞ্জের বউ-এর মুখে খ্যাংরা ঝ্যাঁটা ঘষে দিলেই বুঝি ভালো হতো! এই সদানন্দর বিয়ের ব্যাপারেই কি কম বাগড়া দিয়েছে কালীগঞ্জের বউ? যাতে বিয়ে ভেঙে যায় সেই জন্যে খোকাকে পর্যন্ত নিজের বাড়িতে সমস্ত রাত আটকে রেখেছিল। এখন লজ্জা নেই তাই আবার ঢং করে একটা তিন টাকা দামের গামছা দিয়ে বৌ-এর মুখ দেখতে এসেছে।

কিন্তু ভেতর-বাড়িতে যখন এসব মন্তব্য চলেছে কালীগঞ্জের বউ তখন সোজা বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে দুলালকে খুঁজছে। কোথায়, দুলালরা কোথায় গেল! তাদের পালকি! পালকিটাই বা গেল কোথায়?

প্রকাশ মামা বাইরে শামিয়ানা খাটানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ পালকিটা দেখতে পেয়ে বললে—তোমরা এখেনে কেন হে? এখানে পালকি রেখে আমার জায়গা আটকে রেখেছে কেন? যাও যাও, বাইরে যাও—

দুলালরা পালকি সরিয়ে নিয়ে একেবারে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আর ভেতরের দিকে চেয়ে দেখছিল। মা-জননী এখনও আসছে না কেন? কালীগঞ্জে ফিরে যেতে যে রাত পুইয়ে যাবে!

সদানন্দ সামনে দিয়ে যেতে গিয়েই পালকিটা তার নজরে পড়লো। এ তো চেনা পালকি!

বললে—হ্যাঁ গো, এ পালকি কার? কালীগঞ্জের বউ এসেছে নাকি?

দুলাল বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মা-জননী এসেছে—

—তা কোথায় তিনি?

—ভেতরে গেছেন—

সদানন্দ আর দাঁড়ালা না। এক দৌড়ে ওপরে দাদুর ঘরে চলে গেল। কালীগঞ্জের বৌ এখানে এসেছে নাকি কৈলাস কাকা?

কৈলাস গোমস্তা কী বলবে ভেবে পেলে না। তারপর বললে—আমি তো ঠিক জানি নে খোকাবাবু—

কর্তাবাবুর কানেও কথাটা গিয়েছিল। বললেন—কে? কে কথা বললে কৈলাস? খোকা না?

কিন্তু সদানন্দ আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাহলে নিশ্চয় ভেতর-বাড়িতে গেছে।

—মা!

—কী রে খোকা?

—হ্যাঁ মা কালীগঞ্জের বউ এসেছে বুঝি? কোথায়?

—এই তো এখুনি বউ-র মুখ দেখে চলে গেল।

সদানন্দ বললে—কিন্তু এখানেই কোথাও আছে, পালকি যে বাইরে রয়েছে দেখলুম—

বলে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল আবার। কীর্তিপদবাবু তাঁর ঘরের মধ্যে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। নাতিকে দেখে বললেন—এই যে খোকা, কোথায় গিয়েছিলে?

কিন্তু ও-সব বাজে কথা বলবার তখন সময় ছিল না সদানন্দর। সেখান থেকে সোজা বার-বাড়িতে গিয়ে একেবারে প্রকাশ মামার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—মামা, কালীগঞ্জের বৌ এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, দেখলাম তো তাই।

—কিন্তু গেল কোথায়? কোথাও তো দেখতে পাচ্ছিনা—বাবার কাছে চণ্ডীমণ্ডপে আছে নাকি?

সেখান থেকে চণ্ডীমণ্ডপে। সদানন্দর মনে হলো এক মুহূর্ত দেরি হলে যেন আর কালীগঞ্জের বউকে দেখতে পাবে না সে। কিন্তু বিয়েবাড়িতে তো আসবার কথা ছিল না কালীগঞ্জের বউ-এর। তবে কি দাদুর কাছে টাকা চাইতে এসেছে? দাদু কি টাকা দিয়েছে তাহলে? দাদু কি তাহলে কথা রেখেছে? সেই দশ হাজার টাকা!

ভাবতে ভাবতে সমস্ত বাড়িটা চষে ফেলতে লাগলো সদানন্দ। এত ভিড় চার দিকে! সমস্ত লোকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে খুঁজতে লাগলো তার সেই আসল লক্ষ্যবস্তুটাকে। কই, কোথায় গেল কালীগঞ্জের বউ? পালকি থাকতে তো হেঁটে ফিরে যাবে না এখান থেকে।

শেষকালে সে আবার ফিরে এল সদরে। তখনও দুলালরা বার-বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

—কী গো, তোমাদের মা-জননী এসেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা তো মা-জননীর জন্যেই হা-পিত্যেশ করে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। সন্ধ্যের আগেই রওনা দেবার কথা আমাদের—

—তাহলে দেখি, কোথায় গেল—

বলে সদানন্দ আবার ভেতরের দিকে ঢুকলো। হ্যাজাগ বাতি লাগানো হচ্ছে গেটের ওপর। প্রকাশ মামা কোমরে তোয়ালে বেঁধে সেই তদারক করতেই ব্যস্ত। বাজে কাজে সময় নষ্ট করবার অবসর নেই তার। চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর। সদানন্দকে দেখেও যেন দেখলে না প্রকাশ মামা।

কিন্তু বংশী ঢালী তার কাজে কখনও ঢিলে দেয় নি জীবনে। সে যে কখন নিঃশব্দে

সকলের চোখের আড়ালে তার ডিউটি শেষ করে বসে আছে তা কেউ জানতে পারে নি। কিন্তু এটাও যে খুব সোজা কাজ তা নয়। কালীগঞ্জে যখন চক্রবর্তী মশাই-এর কাছে সে কাজ করতো তখন সে এই কালীগঞ্জের বউকেই একদিন মা-জননী বলে ডেকেছে। একদিন এরই নিমক খেয়েছে। কিন্তু বংশী ঢালীরা টাকার জন্যে সব করতে পারে। টাকার বদলে তাদের নিমকহারামী করতেও বুঝি বাধে না?

—কে? ওখানে কে?

বংশী ঢালীরা তখন নিঃশব্দে তাদের কাজ সমাধা করে ফেলেছে।

—কে? কে ওখানে?

সদানন্দর মনে হলো চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে আতা গাছের ঝোপের তলার অন্ধকারে যেন ফিস-ফিস করে কারা কথা বলছে।

সদানন্দ কাছে যেতেই বংশী ঢালী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—বংশী, এখানে অন্ধকারে কীসের একটা আওয়াজ হলো না? যেন মেয়েমানুষের গলার মত আওয়াজ পেলাম—

বংশী অবাক হয়ে গেল—মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ! এখানে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ কোত্থেকে আসবে খোকাবাবু?

—তা তুমি এখেনে এখন কি করছিলে? সবাই কাজ করছে আর তুমি এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী দেখছো?

বংশী বললে—না, এই আমার ঘরে ঢুকেছিলাম, এখন বেরোচ্ছি—

বলে কথা এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি বার-বাড়ির লোকজনের ভিড়ের দিকে চলে গেল। কিন্তু সদানন্দর কেমন সন্দেহ হলো। এ জায়গাটা একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। বংশী চলে যাবার পর সদানন্দও চলে আসছিল। কিন্তু আবার সেই অন্ধকারের দিকেই ফিরে গেল। বংশীকে দেখলেই কেমন ভয় করতো সদানন্দর। ও এমন সময় এখানে একলা থাকবার লোক তো নয়। আর এদিক থেকেই তো আওয়াজটা এসেছিল। মেয়েমানুষের গলার মত আওয়াজ।

বংশীর ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলতে গেল সে। কিন্তু মনে হলো যেন তালা ঝুলছে। অন্ধকারের মধ্যে তালাটায় হাত দিলে। হাত দিয়ে নাড়ালে। আর বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভালো করে তালায় চাবি লাগানো হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে গেল। সদানন্দ ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। মনে হলো ভেতরে যেন তখনও কার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—

কিন্তু বংশী তারই মধ্যে আবার এসে হাজির হয়েছে তখন।

—এখানে কি করছো খোকাবাবু?

—ঘরের ভেতরে কী বংশী? গোঙ্গাচ্ছে কে?

বংশী ঢালী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কর্তাবাবু তোমাকে ডাকছে খোকাবাবু, লোক এসেছে, তাড়াতাড়ি ডেকেছে—

—আমাকে? আমাকে ডেকেছে?

বংশী ঢালী বললে—হ্যাঁ—এখুনি দেখা করে এসো

—কিন্তু তোমার এই ঘরের মধ্যে কে?

বংশী ঢালী বললে—ঘরের মধ্যে আবার কে থাকবে? আমি তো তালা-চাবি দিয়ে রেখেছিলাম। খুললে কে? বলে ট্যাকের ঘুনসী থেকে একটা চাবি বার করে বোধ হয় তালাটা আবার বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

—কিন্তু ঘরের মধ্যে কার গলার আওয়াজ শুনলুম, ওখানে কে আছে বলো তো? বলো ওখানে কি হয়েছে? কে আছে ওখানে?

কিন্তু বংশী ঢালী অত সহজে ভাঙবার পাত্র নয়। বললে—তুমি ভূত দেখেছ খোকাবাবু, ভূতের ভয় লেগেছে তোমার নিশ্চয়।

সদানন্দ বললে—বাজে কথা রাখো, বলো ভেতরে কী হয়েছে? বলো ভেতরে কে আছে? তুমি নিশ্চয় কালীগঞ্জের বউকে ভেতরে আটকে দিয়েছ—এখনও বলো কে ওখানে?

বংশী ততক্ষণে দরজায় বেশ করে তালাচাবি বন্ধ করে আবার চলে যাচ্ছিল। সদানন্দ ছাড়লে না, বললে—বলো, কে ওখানে আছে? কাকে তালাচাবি বন্ধ করে রেখেছ?

বলতে বলতে বংশীর পেছন-পেছন একেবারে সদরের বার-বাড়ির কাছে এসে পড়েছিল। প্রকাশ মামা দেখতে পেয়েছে। বললে—এ কী রে, তোর গেঞ্জিতে এত রক্ত কেন?

এসব অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তবু এতকাল পরে চৌবেড়িয়া থেকে বেরিয়ে নবাবগঞ্জের পথে যেতে যেতে সেইদিনকার সেই সব কথাগুলোর যেন নতুন মানে করবার চেষ্টা করতে লাগলো সদানন্দ। এতকাল পরে নবাবগঞ্জে গেলে সেখানে কী দেখবে কে জানে! সেই নবাবগঞ্জ কি আর সেরকম আছে! ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যখন সব জিনিসেরই আসল-নকল যাচাই হয়ে যায় তখন নবাবগঞ্জেরও হয়ত একটা নতুন যাচাই হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সেই ফুলশয্যার আগের রাত্রের সেই দুর্ঘটনার কথা আজ সে ছাড়া কি আর কারো মনে আছে! আর মনে থাকলেও তার জীবনে এ ঘটনার তাৎপর্য যেমন করে ছায়াপাত করেছে তেমন করে আর কার জীবনে ছায়াপাত করবে? শুধু নবাবগঞ্জ কেন, পৃথিবীতে কোনও দুর্ঘটনাই তো কাউকে চিরকালের মত এমন অভিভূত করে রাখে না। সংসারে বোধ হয় তাই সে-ই একমাত্র ব্যতিক্রম। সে তো আর সকলের মত সুখে-স্বচ্ছন্দে স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে আপোস করে চললেই পারতো! কেন তবে সব থাকতে সে এই চৌবেড়িয়ার অতিথিশালায় অজ্ঞাতবাসের দুর্ভোগ সইছে!

পরের দিন কেষ্টগঞ্জ থেকে পুলিস এসে সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল।

বলেছিল—আপনি কেমন করে বুঝলেন যে এখানে খুন হয়েছিল? খুন হলে তো রক্তের দাগ থাকবে!

সদানন্দ বলেছিল—কিন্তু আমার গেঞ্জিতে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, আমার কাপড়ে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, আমার হাতেও তখন রক্তের দাগ লেগে ছিল। সে দাগ সবাই দেখেছে—

পুলিসের দারোগাবাবু তার আগেই কর্তাবাবুর সঙ্গে দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে আধ ঘণ্টারও বেশি কথাবার্তা বলেছে। সদানন্দ জানতো না ফয়সালা যা হবার তা সেখানেই সব কিছু হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে ফয়সালার জন্যে কর্তাবাবুর সিন্দুকের ভেতরে সব সময়েই মশলা মজুদ থাকে। সেই মশলা দিয়েই নরনারায়ণ চৌধুরী এতদিন রাজত্ব করে আসছেন। প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা প্রতাপ সব কিছু কায়েম করে সকলের মাথার ওপরে বসে আছেন। শুধু পুলিসের দারোগা কেন কোর্টের জজ থেকে শুরু করে আদালতের পেয়াদা পর্যন্ত ওই মশলার জোরে তাঁর কাছে মাথা নীচু করেছে।

তাই কেষ্টগঞ্জের দারোগার কানে সেদিন সদানন্দর কথাগুলো ভালো লাগে নি।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু কাকে খুন করা হয়েছে?

সদানন্দ বলেছিল—কালীগঞ্জের বউকে। কালীগঞ্জের জমিদারের বিধবা স্ত্রী—

—কিন্তু তাঁকে তো নেমন্তন্ন করা হয় নি। তিনি কেন ফুলশয্যার আগের দিন বিনা নিমন্ত্রণে আসতে যাবেন?

সদানন্দ বলেছিল—তাই যদি হয় তাহলে তিনি গেলেন কোথায়? কালীগঞ্জেও তো তিনি নেই। তিনি তো কালীগঞ্জেও ফিরে যান নি। তাঁর পালকি-বেহারাদেরও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি তাঁর পালকিটাও তো কোথাও নেই।

সত্যিই এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! কালকে যে মানুষটাকে সবাই দেখেছিল, একখানা শাড়ি নিয়ে এসে নতুন বউকে আশীর্বাদ করে গেছে, সে মানুষটা এমন করে অদৃশ্য হলোই বা কী করে! এমন কি তার পালকিটা পর্যন্ত রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে!

কিন্তু সাক্ষ্য দেবার সময় সবাই বললে—কই, আমি তো পালকি দেখি নি!

দারোগাবাবু বার-বার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কেউই দেখেন নি কালীগঞ্জের বউকে?

সবাই একবাক্যে বললে—আজ্ঞে না, আমাদের কাজকর্ম ছিল, কারো দিকে দেখবার মত সময় ছিল না তখন।

—আর আপনি? আপনি দেখেছেন? আপনিই তো সদরে দাঁড়িয়ে শামিয়ানা খাটাচ্ছিলেন। সবাই বললে।

প্রকাশ মামার কাজের তখনও শেষ হয় নি। পুলিস দেখে তার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। বললে—আমি? আমাকে বলছেন দারোগাবাবু? আমার কি মরবার ফুরসৎ আছে? যতক্ষণ না ফুলশয্যা কাটে ততক্ষণ আমার মরবার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই—

সদানন্দ মাঝখানে বলে উঠলো—কিন্তু মামা তুমি তো কালীগঞ্জের বউকে পালকি থেকে নামতে দেখেছ, তুমিই তো বেয়ারাদের সদর থেকে পালকি সরিয়ে নিয়ে যেতে বলছে! এখন তুমি সব বেমালুম ভুলে গেলে?

দারোগাবাবু বললে—আপনি থামুন, আমি যাকে জিজ্ঞেস করছি তিনিই উত্তর দেবেন।

তারপর প্রকাশ মামার দিকে চেয়ে দারোগাবাবু আবার বলতে লাগল—তারপর কখন আপনার শামিয়ানা খাটানো শেষ হলো?

প্রকাশ মামা বললে—ধরুন তখন মাঝ-রাততির—

—তখনও কি কিছু সন্দেহ করেছিলেন যে এ বাড়িতে কেউ খুন হয়েছে?

প্রকাশ মামা বললে—রাম, সে সন্দেহ করতে যাবো কেন? ওই আমার, ভাগ্নেই কেবল সকলকে বলে বেড়াতে লাগলো কালীগঞ্জের বউ কোথায় গেল, কালীগঞ্জের বউ কোথায় গেল! তা আমি বললুম কালীগঞ্জের বউ কোথায় আবার যাবে? কালীগঞ্জেই আছে—কিন্তু ও কিছুতেই তা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত সেই রাত্তিরে আমার ভাগ্নে কালীগঞ্জে গেল। গিয়ে যখন ফিরে এল তখন আমার ঘড়িতে রাত প্রায় একটা। সেখানেও নেই। তখন পাগলের মতন ছট্‌ফট করতে লাগলো। তখন আমি বললুম—এতই যদি তোর সন্দেহ তাহলে পুলিসে খবর দে! আমার কথাতে তখন ও আপনার কাছে গেল—

—আপনি তাহলে বলতে চান এ বাড়িতে কেউই খুন হয় নি?

প্রকাশ মামা বললে—তা হলে তো আমিই আগে জানতে পারতুম। তখন সকলের আগে আমিই আপনাকে গিয়ে খবর দিতুম।

পুলিসের কাজ বড় নিখুঁত। বিশেষ করে কেষ্টগঞ্জের পুলিসের। তারা নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীর কোনও কাজেই কোনও দিনই খুঁত পায় নি। এর আগে নবাবগঞ্জে যতবার লাঠিবাজি হয়েছে, জমি দখল হয়েছে, বিশেষ করে সেই যেবার বারোয়ারিতলার

অশথ গাছের ডালে কপিল পায়রাপোড়া গলায় দড়ি দিয়েছিল, কোনও বারেই কেষ্টগঞ্জের দারোগারা কোথাও কোনও খুঁত পায় নি। প্রত্যেকবারই নবাবগঞ্জে এসেছে, এসে কর্তাবাবুর দোতলার দরজা বন্ধ ঘরে বসে বসে নিরিবিলিতে সব মামলার ফয়সালা হয়ে গেছে, কোর্ট পর্যন্ত আর সে-সব গড়ায় নি।

আর আশ্চর্য ওই বংশী ঢালীর দল! তাদের যেন কোনও যুগেই শাস্তি হতে নেই। তারা যেমন সেই ইতিহাসের আদি যুগেও ছিল, তেমনি এখনও আছে, আবার সুদূর ভবিষ্যতেও তারা থাকেবে। তাদের জন্যে পেনাল-কোড তৈরী হয়েছে, থানা-পুলিস, কোর্ট-কাছারির ব্যবস্থা হয়েছে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের মোটা মাইনে দিয়ে পোষা হয়েছে। তবু তারা নিঃশেষ হয় নি। তাদের বংশ বেড়েই চলেছে বরাবর। এ যে কেমন করে সম্ভব হয় তা হয়ত ওই নরনারায়ণ চৌধুরীরাই একমাত্র বলতে পারেন, আর বলতে পারে তাদের সিন্দুকের টাকা। আর টাকা তো মানুষ নয়, আর টাকার মুখও নেই, তাই হয়ত সে মুখের ভাষাও নেই। যদি ভাষা থাকতো তা হলে বলতো—আমিই সব, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্থিতি, আবার আমিই প্রলয়। একাধারে আমিই নরনারায়ণ চৌধুরী, আমিই বংশী ঢালী আবার আমিই পুলিস। উকিল-জজ-আসামী-ফরিয়াদী সব কিছুই আমি। সুতরাং আমাকেই তোমরা মনে-প্রাণে ভজনা করো।

সেইজন্যেই সেদিন বংশী ঢালীর ভয় ছিল না। খোকাবাবু যখন কালীগঞ্জের বউকে সারা বাড়ির ভেতরে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন বংশী ঢালীরা গা-ঢাকা দিয়ে আতা গাছের অন্ধকারে চণ্ডীমণ্ডপের দরজার তালা আবার খুলেছে। তাদের সব কাজ পাকা হাতের কাজ। আগের বারে তাড়াতাড়িতে কাজটা কেঁচে গিয়েছিল। তাই খোকাবাবুর গেঞ্জিতে-ধুতিতে রক্ত লেগে গিয়েছিল। এবার আর তা নয়। এবার সমস্ত ঘরের মেঝে, দেয়াল, দরজা-জানলা জল দিয়ে ধুয়ে একেবারে সাফ করে ফেললে। তারপর সেই চণ্ডীমণ্ডপের খিড়কী দিয়ে লাশটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল একদল। আর গেল পালকি বেহারাদের অদৃশ্য করে দিতে। বেহারারা তখনও সদরের সামনে মা-জননীর জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

একজন কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ গো, কালীগঞ্জের লোক এখানে কারা?

দুলাল বললে—আমরা গো বাবু, আমরা—

লোকটা বললে—আরে, তোমাদেরই তো খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। এতক্ষণ তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান। তোমরা বার-বাড়ির উঠোনে ছিলে, তোমাদের আবার বাইরে আসতে কে বললে?

—আজ্ঞে, একজন বাবুমশায় তো আমাদের এখেনেই দাঁড়াতে বললে। আমাদের জন্যে তাঁর কাজের অসুবিধে হচ্ছিল।

—কী মুশকিল দেখ দিকিনি। আর এদিকে মা-জননী তোমাদের খুঁজে খুঁজে মরছে। খুব লোক যা'হোক তোমরা।

—তা মা জননী কোথায়?

—আরে, তিনিই তো ডেকে পাঠিয়েছেন তোমাদের। এসো, আমার সঙ্গে এসো, পালকি তুলে নিয়ে এসো—

—কিন্তু কোথায় মা-জননী? কোন্ দিকে?

তখন চৌধুরীবাড়িতে হ্যাজাগ-বাতি জ্বলে উঠেছে। পুকুর-পাড়ে মিষ্টির ভিয়েন বসেছে, তারও ও-পাশে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। মাছ-মাংস কাটা হচ্ছে। আর একদিকে লোহার কড়ায় গরম ঘিয়ের ওপর ময়দার লুচিগুলো ফোস্কার মত ফুলে ফুলে উঠছে। বাড়ির লোকজন খাবে, খাবে বাড়ির কর্তা-গিন্নি-কুটুম। তার সঙ্গে খাবে নতুন বউ।

নয়নতারা বিকেল থেকে এসে ঘরের মধ্যে এক জায়গায় বসে আছে। আগের রাতে বাসর-ঘরে ঘুমোতে পারে নি। তারপর সকাল বেলা কাঁদতে কাঁদতে ট্রেনে উঠেছে। তখন থেকে ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় সমস্ত রাস্তাটা কাটিয়েছে। এ বাড়িতে এসে যে বেশি করে যত্ন করেছে সে হলো গৌরী পিসী।

গৌরী পিসীরই যেন যত জ্বালা। বললে—ওলো, তোরা একটু সর তো বাছা, বউমাকে একটু হাঁফ ছাড়তে দে। সর বাছা তোরা সব—এখন তোরা যার-যার বাড়ি যা, কালকে আবার বউ দেখতে আসিস—

তারপর নয়নতারার হাতখানা ধরলে।

বললে—এসো বউমা এসো, মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও, কুয়ো-পাড়ে চলো—

তা ব্যবস্থা ভালোই করেছিল। কুয়োর কাছে একপাশে খানিকটা জায়গা চাটাই দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল নতুন বউ-এর জন্যে। একটু আড়াল হবে। নতুন বউ তো আর আমাদের মত গা খুলে চান করতে পারবে না। তার জন্যে আড়াল চাই। চান করবে, সাবান মাখবে, গা ডলবে।

গৌরী পিসী বললে—তুমি বউমা লজ্জা করো না যেন। খিদে-টিদে পেলে বলবে। এ এখন থেকে তোমারই বাড়ি মনে করে নাও। প্রথম প্রথম বাপ-মায়ের জন্যে একটু মন-কেমন করবে বটে, কিন্তু তারপর দেখবে যখন সোয়ামীর ওপর মন বসে যাবে তখন আর কেষ্টনগরে যেতেই মন চাইবে না। সোয়ামী এমন জিনিস গো—

সমস্ত অচেনা পরিবেশের মধ্যে নয়নতারার কাছে তখন সব কিছুই খারাপ লাগছিল। শুধু ভালো লাগছিল গৌরী পিসির কথাগুলো।

গৌরী পিসী বলল—আমি তোমার আপন পিস-শাশুড়ী নই গো, আপন পিস-শাশুড়ী নই। তুমি বুঝি ভাবছো আমি তোমার আপন পিস-শাশুড়ী?

নয়নতারা কী আর উত্তর দেবে! 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

গৌরী পিসী বললে—আমার সামনে লজ্জা করো না বউমা, তোমার গায়ের বেলাউজ খুলে ফেল, আমি পিঠে সাবান মাখিয়ে দিই—

তবু নয়নতারার কেমন লজ্জা করতে লাগলো।

গৌরী পিসী বললে—খোল খোল, লজ্জা কী, কাক-পক্ষীতে দেখতে পাবে না তোমাকে, তোমার চানের জন্যেই তো এই জায়গা তৈরি হয়েছে—

এবার নয়নতারা প্রথম কথা বলে উঠলো। বললে—আপনারা কোথায় চান করেন?

—আমরা? আমরা সবাই ওই পুকুরে। পুকুরে বাঁধানো ঘাট আছে। তোমার শাশুড়ীও সেখানে চান করে। প্রথম প্রথম তুমি এই কুয়োপাড়ে চান করো। শেষকালে একটু পুরোন হয়ে গেলে তুমিও আমাদের মত পুকুরের ঘাটের পৈঁঠেতে বসে চান করবে—

নয়নতারার পিঠে তখন গৌরী পিসী ঘস্ ঘস্ করে সাবান ঘষতে আরম্ভ করেছে।

সাবান ঘষতে ঘষতেই গৌরী পিসী বললে—আমাদের এইটুকু জায়গায় চান করে সুখ হয় না মা। তোমার শাশুড়ী আর আমি তো আগে সাঁতার কেটেছি কত...তা তুমি সাঁতার জানো তো বউমা?

—সাঁতার? আমি তো সাঁতার জানি না?

—সাঁতার জানো না? তা তোমাদের কেষ্টনগরে বুঝি বাড়িতে পুকুর-ঘাট নেই?

নয়নতারা বললে—না, আমাদের টিউবওয়েল আছে—

গৌরী বললে—ও আমি দেখেছি, ওই সদার মামার বাড়িতে ওই কল আছে, টিউবকল। ঢেঁকির মত পাড় দিতে হয়, বুঝতে পেরেছি। তা তোমার ভাবনা নেই বউমা, আমি তোমাকে

সাঁতার শিখিয়ে দেব। এই দু'চার দিন ঝাঁপাই ঝুড়লেই তোমার রপ্ত হয়ে যাবে, তখন দেখবে জল ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না—

তারপর গা-ধোওয়া, ভিজে-কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় বদলানো, মুখে পাউডার মাখা, চুল আঁচড়ে নতুন খোঁপা বাঁধা সবই করিয়ে দিলে গৌরী পিসী। নয়নতারার জন্যে নতুন ঘর। ঘরের ভেতর নতুন খাট, নতুন আলমারি, নতুন গদি-বিছানা।

গৌরী পিসী নয়নতারাকে সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

বললে—এই দেখ, এই হলো তোমার শোবার ঘর। কালকে এইখানে তোমার ফুলশয্যে হবে—

নয়নতারা দেখলে।

গৌরী পিসী বললে—আজ একটা রাত কোনও রকমে নাক-কান বুঁজে কাটাও, কাল রাত থেকে এখেনে তোমরা দু'জনে শোবে।

নয়নতারা এর জবাবেও কিছু বললে না। শুধু কান দিয়ে কথাটা শুনলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে ঘরে থাকা হলো না। পেছন থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—ওলো, ও গৌরী, বউমাকে খেতে দিয়েছিস?

সত্যিই খাবার কথা মনে ছিল না গৌরী পিসীর। বললে—চলো বউমা, ওদিকে তোমার শাশুড়ী আবার রাগ করবে, এসো এসো। এখন আর এসব দেখে কী হবে! কাল থেকে তো এখেনেই চিরকাল কাটাতে হবে তোমাকে। তখন দরজায় হুড়কো দিয়ে থাকবে তোমরা, কাউকেই আর ভেতরে ঢুকতে দেবে না। এসো—

ভেতরে জলখাবারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। শাশুড়ী বললে—এখন এই মিষ্টি কটা খেয়ে নাও বউমা, তারপরে রাত্তিরের খাওয়া পরে খেও। তখন পেট ভরে লুচি তরকারি মাছ মাংস খেও—গৌরী, ঠাণ্ডা জল দে বাছা বউমাকে—

মিষ্টিগুলোর দিকে চেয়ে নয়নতারা ভাবছিল অত খাবে কী করে! হঠাৎ বাইরে যেন কীসের আওয়াজ হলো। কীসের আওয়াজ! মুখটা তুলতেই হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে যাওয়াতে মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে। সদানন্দ!

সদানন্দ ভেতরে এসে নয়নতারাকে দেখে প্রথমে একটু দাঁড়ালো। তারপর ডাকলে—মা, মা কোথায়?

মা আসবার আগেই গৌরী পিসীকে দেখে বললে—পিসী, কালীগঞ্জের বউ এখানে এসেছে?

গৌরী পিসী তো অবাক। বললে—হ্যাঁ এসেছিল, কিন্তু সে তো চলে গেছে—

—কোথায় চলে গেছে? কোন্ দিকে?

ততক্ষণে মা এসে গেছে ভাঁড়ার ঘরের দিক থেকে। বললে—কী রে খোকা? কী চাস?

সদানন্দ বললে—কালীগঞ্জের বউ ভেতর-বাড়িতে এসেছিল?

—কেন? তার সঙ্গে তোর কী দরকার?

সদানন্দ বললে—দরকার আছে। তুমি বলো না কোন্ দিকে গেল?

—তা কী দরকার তাই বল না। তাকে তো নেমন্তন্ন করা হয় নি, কিছুই না, তবু সে কেন আসে এ বাড়িতে? আবার বুঝি তোকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে আটকে রাখবে? ভারি তো একটা তিন টাকা দামের বাঁধিপোতার গামছা দিয়ে আদিখ্যেতা করতে এসেছে। যেন আমরা গামছা কিনতে পারি না, আমাদের গামছা কেনবার যেন পয়সা নেই! ঢং, মাগী ঢং দেখাতে এসেছে—

সদানন্দ রেগে গেল। বললে—তোমার ওসব কথা শুনতে চাই নি আমি, আমি যা

জিজ্ঞেস করছি তারই জবাব দাও তুমি, বলো কালীগঞ্জের বউ ভেতর-বাড়িতে এসেছিল কি না—

মা বললে—তা সে যদি এসেই থাকে তো তোর কী? তোর সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক?

সদানন্দ বললে—আমার সম্পর্কের কথা আমি বুঝবো, আমি যা জিজ্ঞেস করছি আগে তার জবাব দাও তুমি—

নয়নতারা চুপ করে সব শুনছিল। এরই সঙ্গে তার কাল বিয়ে হয়েছে। মানুষটাকে খুব রাগী লোক বলে মনে হলো তার কাছে। কিন্তু কালীগঞ্জের বউ কে! বাসর-ঘরে তো এরই কথা হয়েছিল, এখন মনে পড়লো। অথচ আশ্চর্য, এ যে এত রাগী মানুষ চেহারা দেখে তো তা বোঝা যায় না।

কিন্তু ততক্ষণে সদানন্দ সেখান থেকে চলে গিয়েছে। তারপরে আরো রাত হলো। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে বসে আরো অনেক মেয়েলী কথা কানে এল। সবাই তার রূপ দেখে প্রশংসা করছে। সবাই বলছে এমন বউ নাকি হয় না। কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগলো নয়নতারার। নিজের রূপের প্রশংসা আগেও সে অনেক শুনেছে। বাপের বাড়ির লোকেরা বলতো এ মেয়ে যে বাড়িতে যাবে সে-বাড়ি আলো করে রাখবে। বলতো যার সঙ্গে এ মেয়ের বিয়ে হবে সে নাকি বড় ভাগ্যবান। তাহলে এমন রাগারাগি কেন করলে তার সামনে? আর চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তো ওই মানুষটার সঙ্গে তাকে একটা বিছানায় এক ঘরে কাটাতে হবে? তাহলে তারই সামনে মার সঙ্গে কেন অত রাগারাগি করতে গেল? তার রূপ দেখে তো তার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল! একটা দিনের জন্যেও সে তার রাগ সামলাতে পারলে না? তাহলে কীরকম চরিত্রের মানুষ ও!

তারপর সবাই খেতে বসলো। তাদের মধ্যে নয়নতারাও খেতে বসেছে। খেতে খেতে কত লোকের কত কথা তার কানে এল। কত হাসাহাসি, কত গল্প। সকলেরই নজর নতুন বউ-এর দিকে। ভালো ভালো জিনিস তার পাতে দিয়েছে শাশুড়ী। নয়নতারার মনে হলো শাশুড়ী মানুষটা কিন্তু ভালো।

একবার শাশুড়ী বললে—কই বউমা, তুমি তো কিছু খাচ্ছো না? খাও, এরকম না খেলে চলবে কেন? মাছ খাচ্ছো না যে, ঝাল হয়েছে বুঝি? তুমি বুঝি ঝাল খাও না?

নয়নতারা ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানালে সে ঝাল খায়। আর তা ছাড়া ঝাল সে খাক আর নাই খাক, সব জিনিস 'হ্যাঁ' বলতেই সে শিক্ষা পেয়েছে মার কাছে।

মা বলতো—শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শাশুড়ী যা বলে তাই শুনবে মা, 'না' বোল না যেন।

—ঝাল খাও? তা হলে আর একখানা মাছ দেব, খাবে?

গৌরী পিসী বললে—জিজ্ঞেস করছো কেন বউদি, দাও না আর একখানা মাছ।

খেতে খেতে কেবল মার কথাই মনে পড়তে লাগলো নয়নতারার। এমন করে মাও তাকে খাওয়াতো আর বকতো। বলতো—কোথায় কাদের বাড়িতে পড়বি তখন হয়ত পেটই ভরবে না তোর। এখন দিচ্ছি খেয়ে নে। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছ তখন সব রকম অবস্থার জন্যে তোমাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে মা। বিয়ের আগে আমার কত বায়নাক্কা ছিল, এখন সে-সব কোথায় চলে গেল মনেও পড়ে না আর—

অচেনা মুখ অজানা দেশ, অদেখা পরিবেশ। তাই মার কথাগুলোই বার-বার মনে পড়তে লাগলো নয়নতারার।

গৌরী পিসী হঠাৎ ভাবনার মাঝখানে বললে—চলো বউমা। শোবে চলো—

একটা বড় খাট। শ্বশুরের শোবার ঘর। সেখানেই সেদিনকার মত নয়নতারার শোবার

ব্যবস্থা হয়েছে। একপাশে শাশুড়ী আর তার পাশে নতুন বউ। বাপের বাড়িতেও বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে পাশে নিয়ে শুতো। আজই প্রথম অন্য বিছানায় অন্য লোকের পাশে শোওয়া। কাল থেকে আবার আর একজনের পাশে শুতে হবে তাকে।

আস্তে আস্তে চারদিকের সমস্ত শব্দ থেমে এল। রাত বাড়ছে। একটা পাতলা তন্দ্রার মধ্যে মনে হোল যেন কেষ্টনগরে মাও তাকে ভাবছে। মারও তার মতন একলা শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছে না হয়ত। মারও যেন মনে হচ্ছে খুকুর কথা। খুকু সেখানে খেলে কিনা, খুকুর চোখে ঘুম এল কিনা। খুকু সেখানে এতক্ষণে হয়ত শাশুড়ীর পাশে শুয়ে মার কথা ভাবছে। আশ্চর্য, মেয়েমানুষের জীবনটাই ভগবান এক আশ্চর্য ধাতুতে গড়েছে! ছোটবেলা থেকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে হয়। তারপর সেখানেই সে থাকবে। চিরকালের মত থাকবে। বাবা মা'র কথা আর ভাববে না। তখন তার নতুন সংসার নিয়েই মেতে থাকবে। তার সেই সংসারকেই সে নিজের সংসার বলে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবে। এই-ই নিয়ম। সংসারে আদিকাল থেকে বুঝি এই নিয়মই চলে আসছে মানুষের জীবনে।

—কই বউমা, তোমার ঘুম আসছে না বুঝি?

নয়নতারা একটু নড়তেই শাশুড়ী বোধ হয় বুঝতে পেরেছে।

শাশুড়ী বললে—নতুন জায়গা তো, তাই অসুবিধে হচ্ছে। দুদিন বাদে তখন আবার সব অভ্যেস হয়ে যাবে। ঘুমোও, ঘুমোতে চেষ্টা করো। কাল আবার বউভাত, সকাল থেকেই হই-চই শুরু হয়ে যাবে। তখন আর এক দণ্ডের জন্যে দু'চোখ এক করতে পারবে না। যতটুকু এখন পারো একটু ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করো—

নয়নতারা দু'চোখ বুঁজে মার কথাগুলোই আবার ভাবতে শুরু করলে। মার কথা ভাবলেই মনটা কেমন আনন্দে ভরে যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে মার কথা ভাবতেই তার ভালো লাগলো তখন। সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারার দু'চোখ যেন কখন ঘুমে জড়িয়ে এল।

নয়নতারা স্বপ্ন দেখতে লাগলো। ঠিক স্বপ্ন নয়, অথচ যেন স্বপ্নই। মন খারাপ দেখে বাবা যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে—খুকুর কথা ভেবো না তুমি, সে খুব ভালো জায়গায় পড়েছে গো, সে কত বড় বাড়ি, কত জমি-জমা তাদের। তার সেখানে কোনও কষ্ট নেই, সে খুব আরামে আছে, তুমি তার কথা ভেবে মন খারাপ করো না—

আসবার সময় মা নয়নতারাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছিল। বলেছিল—জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকো মা, স্বামীর মন যুগিয়ে চলো, আশীর্বাদ করি হাতের শাঁখা সিঁথির সিঁদুর যেন তোমার অক্ষয় হয়...

কথাগুলো বলছিল বটে মা কিন্তু মেয়েও যত কাঁদছিল মাও তত কাঁদছিল। তাদের দেখাদেখি আশেপাশে যারা দেখছিল তাদের চোখও আর শুকনো ছিল না। তারপর ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছিল। ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছিল বরকর্তা—কই বেয়াই মশাই, এত দেরি হচ্ছে কেন, ওদিকে যে ট্রেন ছেড়ে দেবে—মা-লক্ষ্মীকে একটু তাড়াতাড়ি করতে বলুন—

হঠাৎ যেন তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। তন্দ্রাটা ভাঙতেই নয়নতারা ধড়মড় করে চারদিকে চেয়ে দেখলে। একেবারে অন্য পরিবেশ। এখানে কেষ্টনগরের মত দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে চলবে না। পাশের দিকে চেয়ে দেখলে জায়গাটা খালি। শাশুড়ী কখন বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেছে টের পায় নি। আর দেরি করলে না সে। বিছানা ছেড়ে উঠলো। হঠাৎ মনে পড়লো ঘোমটা দিতে হবে। আগের মত আর মাথা খালি রাখলে চলবে না।

—ওমা, তুমি উঠেছ?

গৌরী পিসী চুপি চুপি ঘরে উঁকি মেরে দেখতে এসেছিল বউ উঠেছে কিনা। উঠেছে

দেখে বললে—ঘুম হয়েছিল তো বউমা? চা খাবে? চা খাওয়া অভ্যেস আছে তোমার?

নয়নতারা বললে—না—

—অভ্যেস নেই? অভ্যেস থাকলে বলো। বলতে লজ্জা করো না। আমাদের এখানে চা হয়। চা খাওয়ার লোক আছে এখানে। তোমার যে মামা-শ্বশুরকে দেখেছো, তোমাকে কেষ্টনগর থেকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, উনি চা খান, চা না হলে ওঁর একদণ্ড চলে না—

বাড়িটাতে তখন আবার লোকজনের গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। আজ বউভাত। বিকেলের পর থেকেই লোকজনের আসা শুরু হবে। তার জন্যে চারদিকে ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে। তারপর কেষ্টনগর থেকে বাবা ফুলশয্যের তত্ত্ব পাঠাবে। বিপিন আসবে। তার কাছ থেকেই মা-বাবার খবর পাওয়া যাবে। হয়ত মা-বাবা আসতেও পারে। এখন থেকে সারা দিন আর বিশ্রাম নেই কারো।

—নাও নাও বউমা, কুয়োপাড়ে জল দিয়েছে, কাপড়-চোপড় নিয়ে যাও, চান করতে হবে। চলো আমি দেখে দিচ্ছি কোন্ শাড়িটা পরবে তুমি—

সকাল বেলা এ-বাড়িটার আবার অন্য চেহারা। কাল রাত্রে এখানকার অন্য চেহারা দেখেছে সে। তখন চারদিকের এই গাছ-পালা-বাগান-পুকুর দেখে কেমন যেন জঙ্গল-জঙ্গল মনে হয়েছিল তার কাছে। আর আজ রোদ ওঠবার পর সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সব কিছু যেন তার কাছে ভালো লাগতে লাগলো।

ততক্ষণে গ্রাম থেকে আরো কজন বউ-ঝি তাকে দেখতে এসেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা যারা আসতে পারে নি তারা আজ দিনের আলোয় নতুন বউকে দেখবে। গরীব গ্রামের বউ-ঝি সব। খালি গা, খালি পা। জমিদার-বাড়ির নতুন বউকে তারা দূর থেকে একবার শুধু দেখে যাবে। আর তারপর সন্ধ্যেবেলা এসে পাতা পেতে পেট ভরে খাবে আর ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ কে যেন একজন দৌড়তে দৌড়তে ভেতরে এল।

—খুড়ীমা, পুলিস এসেছে বার-বাড়িতে—

—পুলিস? পুলিসকে আবার কে নেমন্তন্ন করতে গেল রে? পুলিস কী করতে এল রে আবার? বউ দেখবে নাকি?

কথাটা তখন চারদিকেই রটে গেছে। পুলিস-দারোগা কী করতে আসে এখানে! কোনও চুরি ডাকাতি হয়েছে নাকি! না খুনখারাবি!

খবর এল—দারোগাবাবু ওপরে কর্তাবাবুর ঘরে বসে কথা বলছে—

—তাহলে উনি কোথায়? তোদের চৌধুরী মশাই?

—ছোটবাবুও তো সঙ্গে রয়েছেন।

—আর প্রকাশ? প্রকাশ কোথায় গেল। তাকে একবার আমার কাছে ডেকে আন তো বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে একজন দৌড়লো শালাবাবুকে ডাকতে। নয়নতারার কানে সব কথাই যাচ্ছিল। তারও কেমন অবাক লাগলো। চুরি! ডাকাতি! খুন! কে কী চুরি করলো! আর যদি খুনই হয় তো কে-ই বা কাকে খুন করলো!

ছেলেটা আবার দৌড়তে-দৌড়তে ভেতরে এল। শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কী রে শালাবাবু কী বললে? আসছে?

—হ্যাঁ খুড়ীমা, শুনলাম কে নাকি এখেনে খুন হয়েছে, তাই পুলিস এয়েছে—

—খুন!

নয়নতারার মাথাটা এক মুহূর্তে যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠলো। খুন! খুন এখানে কখন হলো! কে খুন হলো! কে খুন করলো! কাকে খুন করলো!

নতুন জায়গায় এসে নতুন পরিবেশে কেমন যেন ভয় করতে লাগলো নয়নতারার। এ কেমন বাড়িতে তার বিয়ে হলো! বিয়ের পরের দিনই খুন! গৌরী পিসী সামনে দিয়ে যেতেই নয়নতারা তাকে ডাকলে—পিসীমা, পুলিস এসেছে শুনলুম, শুনলুম কে নাকি খুন হয়েছে?

গৌরী পিসী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে—কে জানে বৌমা কে খুন হয়েছে, কার কপাল পুড়েছে—

নয়নতারা তবু ছাড়লে না। বললে—ওই যে কে এসে বলে গেল, তুমি শোন নি?

গৌরী পিসী বললে—আমার কি শোনবার সময় আছে বৌমা, যত ঝক্কি সব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে সবাই। তুমি ও-নিয়ে মাথা ঘামিও না বৌমা, ও-সব ভাববার অনেক লোক আছে এ-বাড়িতে। খানিক পরেই ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে, তাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, তারপর গাঁ-সুদ্ধ নেমন্তন্ন হয়েছে, তাদের ঝামেলা সমস্ত আমাকে পোয়াতে হবে—

বলতে বলতে আবার কোন্ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল গৌরী পিসী।

বাড়ির ভেতরে তখন তুমুল কাজের ব্যস্ততা। কারোর যেন সময় নেই। শুধু কয়েকজন গ্রামের বউ-ঝি গিন্নীবান্নী মানুষ তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। যেন এক আজব বস্তুর সন্ধান পেয়েছে তারা নয়নতারার মধ্যে! যেন নয়নতারা তাদের মত মেয়েমানুষ নয়! যেন নয়নতারা অন্য জগতের জীব! তারা তার শাড়ি দেখছে, গয়না দেখছে, গায়ের রং দেখছে। মাথার খোঁপা দেখছে, চোখে চোখ রেখে যেন নয়নতারাকে গিলতে চাইছে সবাই।

হঠাৎ সেই মানুষটার গলা শোনা গেল আবার—মা, মা, মা কোথায়?

নয়নতারা মাথার ঘোমটাটা আরো বড় করে নিচের দিকে টেনে দিলে।

জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা সহজ সম্পর্ক থাকেই। আমরা তা স্বীকার করি আর না-ই করি। একদিন সদানন্দর জন্ম হয়েছিল এই বাড়িতে। সেদিন এখানে উৎসব হয়েছিল বেশ ঘটা করে। ওই দাদুই সেদিন একটা সোনার হার দিয়ে নাকি নাতির মুখ দেখেছিল! রাণাঘাট থেকে মামলার শুনানী ছেড়ে নবাবগঞ্জে চলে এসেছিল। ভেবেছিল এই জন্ম এই আবির্ভাব এক শুভ-সূচনা। নিজের বংশকে চিরকালের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই এই জন্ম। কিন্তু সেদিনকার সেই শুভ-সূচনাকে এই এতদিন পরে এই হত্যা দিয়ে এই মৃত্যু দিয়ে কেন অভিষিক্ত করতে হলো। এও কি সদানন্দর জীবনের ক্রমবিকাশের পক্ষে এতই অপরিহার্য ছিল? কে জানে? নইলে হয়ত সদানন্দর জীবন এমন হতো না। সদানন্দ হয়ত আর পাঁচজনের মত এই নবাবগঞ্জের বংশধর হয়ে দাদু আর চৌধুরী মশাই-এর মত প্রজা খাতক আর সেরেস্তার কাগজপত্রের মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দিত।

তাই সেদিন যখন চৌধুরীবাড়িতে সবাই বৌভাতের উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে হিম-সিম খেয়ে মরছে তখন সদানন্দ একবার কালীগঞ্জ আর একবার থানা-পুলিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আকাশ-পাতাল পরিশ্রম করে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু দারোগাবাবু কোথাও কিছু খুঁত পেলে না। আতা গাছের তলায় চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে বংশী ঢালীর যে আস্তানা ছিল সেখানেও সরেজমিনে তদন্ত করলে। কিন্তু সেখানে সব কিছুই স্বাভাবিক। কোথাও কিছু ব্যতিক্রম নেই।

অথচ এখানেই কাল মেয়েমানুষের গলার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল সদানন্দ।

অন্ধকারের মধ্যে অবশ্য স্পষ্ট কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার মনে হয়েছিল যেন কেউ কাউকে সেখানে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। তখন যেন মানুষটা পুরোপুরি জ্ঞান হারায়নি। তখনও যেন চেষ্টা করলে তাকে বাঁচানো যায়। আর সেখানেই তার হাতে আর গেঞ্জিতে রক্তের ছাপ লেগেছিল।

দারোগাবাবু বললে—কিন্তু আমি তো কিছু অস্বাভাবিক দেখছি না এখানে—

বংশী ঢালীকেও জেরা করলো দারোগাবাবু। বংশী ঢালী বললে—হুঁজুর, আমি তো রাত্তিরে এখানেই শুয়েছি, আমার হাতে পায়ে তো রক্তের দাগ লাগেনি—

—তাহলে সদানন্দবাবুর গেঞ্জিতে রক্তের দাগ কোত্থেকে এলো?

—তা আমি কী করে জানবো হুঁজুর।

—বাড়িতে আর কোথাও কি মাছ মাংস কাটা হচ্ছিল?

—হ্যাঁ হুঁজুর, বাড়িতে অনেক লোক খাবে, খোকাবাবু সেখানে গিয়েছিলেন, হয়ত সেখানেই রক্ত লেগে থাকবে—

—শুধু বংশী ঢালী নয়, প্রকাশ মামাও সেই একই কথা বললে—

সদানন্দ বললে—তাই-ই যদি হবে দারোগাবাবু, তাহলে কালীগঞ্জের বউ গেল কোথায়? কালীগঞ্জে আমি কাল রাত্তিরেই গিয়েছিলুম, সেখানে তো তিনি ফিরে যাননি। সঙ্গের পালকি-বেহারারাও ফিরে যায়নি কেউ। তারা তাহলে সবাই গেল কোথায়?

দারোগাবাবু বললে—সে এন্‌কোয়ারি করবে কালীগঞ্জের দারোগা। কালীগঞ্জ আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

—তাহলে? তাহলে একটা লোক খুন হয়ে যাবে আর আপনারা কেউ তার কোনও প্রতিকারই করবেন না? একজন নির্দোষ মানুষ অকারণে তার প্রাণ হারাবে? আপনি তাহলে একবার নিজে কালীগঞ্জে চলুন। নিজে সেখানে গিয়ে একবার এন্‌কোয়ারি করুন—

কিন্তু সদানন্দ তখন জানতো না যে পাপেরও শেকড় থাকে। গাছের শেকড়ের মত পাপের শেকড়ও সারা দেশময় সারা পৃথিবীময় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। আরো জানতো না যে দারোগা নবাবগঞ্জের খুনের তদন্ত করতে এসে কোনও খুঁত পায় না, কালীগঞ্জের দারোগার চরিত্রেও এই দারোগার পাপের রক্ত তার শেকড়ের শাখা বিস্তার করে রেখে দিয়েছে। বংশী ঢালীদের পাপ আবিষ্কার করে এমন সাধ্য শুধু নবাবগঞ্জের দারোগার কেন পৃথিবীর কোনও গঞ্জের দারোগারই বুঝি নেই।

কিন্তু তবু হাল ছাড়বার পাত্র নয় সদানন্দ। তবু সদানন্দ বললে—না, আমি তাহলে কালীগঞ্জের দারোগার থানায় যাই—

প্রকাশ মামা বললে—আরে তুই কি সত্যিই পাগল হলি সদা?

সদানন্দ বললে—পাগল আমি, না তোমরা? তোমরা সবাই পাগল। শুধু পাগল নয়, তোমরা শয়তান...

কথাটা বলে সদানন্দ বাইরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। প্রকাশ মামা তাকে ধরে ফেললে। বললে—কোথায় চললি তুই?

সদানন্দ বললে—কালীগঞ্জে—

প্রকাশ মামা বলে উঠলো—কালীগঞ্জে যাবি? কিন্তু বাড়িতে যে আজ তোর বৌভাত রে? তোর ফুলশয্যে—

—বৌভাত ফুলশয্যা তো আমার কী?

—তার মানে? তোর বৌভাত তোর ফুলশয্যা, তোর জন্যেই তো এই সব কিছু! আমি যে এই খেটে মরছি, এ কার জন্যে? তোর জন্যেই তো! এই যে হাজার হাজার টাকা

খরচ হচ্ছে, এ সবই তো তোর জন্যে আর তোর বউ-এর জন্যে! তুই-ই তো মজা মারবি, আর আমরা তো শুধু বুড়ো আঙুল চুষবো—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার জন্যেই যদি এত সব, তাহলে আমার টাকা দিলে না কেন তোমরা?

—টাকা?

—হ্যাঁ, কালীগঞ্জের বৌকে যে দশ হাজার টাকা দেবার কথা ছিল তা দিলে না কেন দাদু? টাকা দিলে তো কোনও গণ্ডগোলই হতো না আর! তাহলে আমিও কিছু বলতুম না। টাকা তো দিলেই না, তার ওপর পাছে টাকা দিতে হয় তাই কালীগঞ্জের বৌকে খুন পর্যন্ত করলে বংশী ঢালীকে দিয়ে—

প্রকাশ মামা বললে—খুন? খুন হলে তুই বলতে চাস পুলিস-দারোগা টের পেত না? খুন বললেই ওম্‌নি খুন করা যায়? তুই যা-তা বলছিস কেন?

সদানন্দর চোখ দিয়ে ততক্ষণে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

প্রকাশ মামা সদানন্দর চোখে জল দেখে থম্‌কে গেল। বললে—এ কি রে, তুই কাঁদছিস? আজকে এত বড় একটা শুভদিনে তুই চোখের জল ফেলছিস! ছিঃ....

সদানন্দর তখন আর কথা বলবার ক্ষমতা নেই যেন। বললে—আমাকে ছাড়ো তুমি মামা, আমাকে ছাড়ো—ছেড়ে দাও—

প্রকাশ মামা তখন আরো জোরে জাপটে ধরলে সদানন্দকে। বললে—পাগলামি করিস নে সদা, ছেলেমানুষি করবার তোর বয়েস নেই আর। এ সব জিনিস দশ বছর আগে করলে তখন মানাতো। এখন লোকে নিন্দে করবে তোর। তা ছাড়া এখুনি ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে কেষ্টনগর থেকে, তারপর তোর শ্বশুর-শাশুড়ী আসবে—তারপর গাঁ-সুদ্ধু লোককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, তারা সব শুনে কী ভাববে বল্ তো...

হঠাৎ কীর্তিপদবাবু সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে ঘটনাটা দেখে অবাক হলেন। প্রকাশ তাঁর নাতিকে অমন করে জাপ্‌টে ধরে আছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী রে প্রকাশ, খোকাকে অমন করে ধরে কী করছিস? ও কী করেছে?

প্রকাশ সদানন্দকে তেমনি করে জড়িয়ে ধরেই বললে—দেখুন না পিসেমশাই আপনার নাতির কাণ্ড! পালিয়ে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—

—পালিয়ে যাচ্ছে মানে? কেন পালাচ্ছে? কোথায় পালাচ্ছে?

প্রকাশ মামা বললে—কালীগঞ্জে—

—কালীগঞ্জে? কালীগঞ্জে কার কাছে? আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বল্ তো রে প্রকাশ? কাল থেকে কালীগঞ্জের বৌ-এর কথা শুনছি, কে সে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রকাশ মামা বললে—সে পিসেমশাই পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবো, এখন একে ধরে না রাখলে সব কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে—

কীর্তিপদবাবু বললেন—পরে আর তোর সময় হয়েছে! পুলিসের দারোগা কেন এসেছিল তাও তো কেউ কিছু বললি নে। সবাই বলছে এখন সময় নেই, পরে বলবে! আর পরে কখন সময় হবে? আমি মরে গেলে তখন কে শুনতে আসবে—

প্রকাশ মামা সে কথায় কান না দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—দীনু, ও দীনু—

দীনু আসবার আগে চৌধুরী মশাই-এর কানে গেল প্রকাশের চিৎকারের শব্দ। বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে দেখেই বেরিয়ে এলেন। শুধু তিনি একলাই নন। কাণ্ড দেখে অনেকেই এসে জুটলো। বিয়েবাড়ির ভিড়ের মধ্যে এমন কাণ্ড দেখে অনেকেই এসে জটলা করলো।

দীনু দৌড়তে দৌড়তে এসে জিজ্ঞেস করলে—আমায় ডাকছিলেন শালাবাবু—

কিন্তু ততক্ষণে জায়গাটা ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে। সাধারণ লোক যারা কাজকর্ম করতে ব্যস্ত তারাও হাতের কাজ ফেলে এসে কাছে দাঁড়ালো। ওদিকে ভিয়েনের জায়গায় পুরোদমে কাজ চলছিল। মিষ্টিগুলো তৈরি করে গামলায় তুলে এক-এক করে ভাঁড়ারে গিয়ে জমা করে আসছে। আর পুকুরের পাড়ে ময়দা মাখা হচ্ছিল। সন্ধ্যে হবার পর লুচি ভাজতে আরম্ভ করবে। তার আগে ডাল, মাছের কালিয়া, মাংস রান্না করে ভাঁড়ারে তোলা হচ্ছে।

চৌধুরী মশাই বিচক্ষণ লোক। তিনি কোনও দিনই বেশি কথা বলেন না। সামান্য একটুখানি শুনেই বললেন—প্রকাশ, এখান থেকে সরে এসো, বড় লোকের ভিড় —চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে এসো খোকাকে, ওখেনে গিয়ে শুনবো সব—

কীর্তিপদবাবু একবার শুধু বলতে চেষ্টা করলেন—ব্যাপারটা কী তাই খুলে বলো না তোমরা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

চৌধুরী মশাই শ্বশুরের দিকে চেয়ে বললেন—ও কিছু না, ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না—

বলে প্রকাশের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে সদানন্দকে নিয়ে চললেন। কিন্তু কীর্তিপদবাবু জামাই-এর কথায় খুশী হলেন না। তিনিও জামাই-এর পেছন পেছন চলতে লাগলেন। বললেন—ভাববো না মানে? সব কাজে তোমরা কেবল আমাকে ভাবতে বারণই করছো, তা আমিও তো একটা মানুষ, না কী? আমি বুড়ো হয়েছি বলে আমায় কিছু জানতে নেই?

কিন্তু কে আর তাঁর মত বুড়ো মানুষের কথায় কান দেয়। তিনি যে এত সম্পত্তি করেছেন, তিনি যে এত টাকার মালিক, তার জন্যেও কেউ তাঁর কোনও মূল্য দিচ্ছে না। তিনিও পেছনে-পেছনে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে সকলের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—আমাকে তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? আমি বুড়ো হয়েছি বলে কি তোমাদের কিছু সাহায্যও করতে পারবো না?

চৌধুরী মশাই শ্বশুরের এই অন্যায় কৌতূহল বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। বললেন—আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনাকে আমরা এ-সব ব্যাপারের মধ্যে কষ্ট দিতে চাই না। আপনি তামাক খান না নিজের ঘরে বসে—দীনু আপনাকে তামাক সেজে দিচ্ছে—

—তুমি থামো! সব কথায় কেবল আমার বয়েস দেখাও কেন?

কীর্তিপদবাবু রেগে গেলেন এবার। বলতে লাগলেন—কী হয়েছে তাই বলো!

তারপর সকলকে অগ্রাহ্য করে একেবারে সোজা সদানন্দকে ধরলেন।

বললেন—কী হয়েছে বলো তো দাদা? তোমার কী হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন? আমি এসে পর্যন্ত দেখছি তুমি যেন কী রকম হয়ে গেছ! গায়ে-হলুদের দিনে তুমি কোথায় লুকিয়ে রইলে। তারপর সকাল বেলা পুলিস-দারোগা এসে কী সব তদন্ত করে গেল। তারপর এখন আবার এই কাণ্ড। বলো তো এসব কী ব্যাপার? আমার কাছে কিছু লুকিও না—

হঠাৎ কৈলাস গোমস্তা এসে হাজির হলো।

বললে—বেয়াই মশাই, আপনাকে কর্তাবাবু একবার ডেকেছেন—

কীর্তিপদবাবু বললেন—দাঁড়াও বাপু, এখন এই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হয়ে যাক্—

ওদিকে ভিড়ের লোকজন আস্তে আস্তে সবাই এসে হাজির হয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। প্রকাশ মামার এতক্ষণে সেদিকে নজর পড়েছে। তাদের দিকে চেয়ে তেড়ে গেল—এই, তোরা এখানে কী করতে এসেছিস, যা বেরিয়ে যা এখেন থেকে। কাজ-কর্ম কিছু নেই তোদের? যা, এখান থেকে ভাগ—

ক্রমে ক্রমে খবরটা বাড়ির ভেতরেও পৌঁছে গেল। খোকা নাকি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল, শালাবাবু তাকে ধরে রেখেছে। ছোটবাবু সকলকে ডেকে নিয়ে গেছে চণ্ডীমণ্ডপে।

প্রীতি ভাঁড়ার ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল।

কথাটা শুনেই বললে—কেন, চলে যাচ্ছিল কেন খোকা? কোথায় যাচ্ছিল?

গৌরী পিসী বললে—চুপ করো বউদি, অত চেঁচিও না। নতুন বউ-এর কানে যাবে শেষকালে, একটু গলা নামিয়ে কথা বলো—

কর্তাবাবু নিজের ঘরে বসে তখন ছট্‌ফট করছিলেন। কৈলাস গোমস্তা ফিরে আসতেই বললেন—কী হলো? বেয়াই মশাই এলেন না?

—হ্যাঁ, আসছেন।

—খোকাকে আটকে রাখতে বলেছো তো? যেন পরশু দিনের মত বেরোতে না পারে!

—হ্যাঁ বলেছি। ছোটবাবু ধরে রেখেছেন খোকাবাবুকে।

—যদি কোনোও ফাঁকে বেরিয়ে যায়? শেষকালে ফুলশয্যার দিন যেন কেলেঙ্কারি করে না বসে!

কৈলাস গোমস্তা বললে—না, সে ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। খোকাবাবুকে আর একলা ছাড়া হবে না। বংশীকেও বলে দিয়েছেন ছোটবাবু, যেন তার ওপর নজর রাখে।

ততক্ষণে কীর্তিপদবাবু এসে গেলেন। এসেই বললেন—বড় চিন্তায় পড়লুম বেয়াই মশাই, খোকা তো আগে এ-রকম ছিল না। ছোটবেলায় কত মজার মজার কথা বলতো। আর এখন একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে দেখছি—

কর্তাবাবু বললেন—বড় বেয়াড়া হয়ে গেছে আজকাল। কারো কথা শোনে না—

কীর্তিপদবাবু বললেন—ভালোই করেছেন যে বিয়েটা দিয়ে দিয়েছেন, বিয়েটা কম বয়সে দিয়ে দেওয়াই ভালো—

কর্তাবাবু বললেন—আরো আগে বিয়ে দিয়ে দিলেই ভালো হতো। কিন্তু ভালো-মতো পাত্রী তো এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল না—তাই—

কীর্তিপদবাবু প্রবীণ বিচক্ষণ মানুষ। বললেন—দেখুন বেয়াই মশাই, বয়েস হয়েছে বলে কেউ আমাদের কথাই শুনতে চায় না আর, যেন আমরা কখনও কম বয়েসের ছিলাম না। এই-ই হয় বেয়াই মশাই, এই-ই হয়—

কর্তাবাবু বললেন—ওসব আর ভাববেন না বেয়াই মশাই, আমাদের যুগ চলে গেছে, আমরা বাতিল—

কীর্তিপদবাবু বললেন—কিন্তু কী ব্যাপারটা বলুন তো, খোকা ও-রকম বেয়াড়া হলো কেন? কে কালীগঞ্জের বউ? তার কী হয়েছে?

কর্তাবাবু বললেন—পাগলের কথার কি মানে আছে? সেই কথায় আছে না, পাগলে কী-ই না বলে আর ছাগলে কী-ই না খায়! আপনি তামাক খান, কৈলাস, বেয়াই মশাইকে তামাক দিতে বলো—

কিন্তু এ প্রসঙ্গ বেশিক্ষণ চললো না। কথার মধ্যেই বাধা পড়লো। হঠাৎ নিচে থেকে শাঁখ বাজার আওয়াজ হলো।

—ওই ফুলশয্যার তত্ত্ব এসেছে বোধ হয় কেষ্টনগর থেকে। কৈলাস যাও যাও, দেখে এসো—

সত্যিই তখন একতলায় হই-হই ব্যাপার। বিপিনই ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে এসেছে দলের মাথা হয়ে। অনেক দূর থেকে তত্ত্ব এসেছে। শাঁখ বাজার শব্দ শুনেই গ্রাম থেকে ছেলে-বুড়ো ছুটে এসেছে। অন্তত বারোজন লোক হবে। সকলের হাতেই জিনিসপত্র। রেল বাজার থেকে চারখানা গরুরগাড়ি ভর্তি জিনিসপত্র তারা নিয়ে এসেছে। বড় বড় বারকোষ, হাঁড়ি,

থালা, ফলের ঝুড়ি, ছানার মিষ্টি, ফুলের ঝোড়া, দই-এর হাঁড়ি, কোঁচানো শাড়ি। জামাই-এর ধুতি-পাঞ্জাবি।

—ঠাকুর, কড়ায় লুচি ছেড়ে দাও, বারোজন লোকের মতন। একসঙ্গে খেতে বসবে—

ভেতর-বাড়িতেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। চওড়া জরির শান্তিপুরে শাড়ি পরে বাড়ির গিন্নী সমস্ত কিছু তদারক করছে। আশেপাশের বাড়ি থেকে পাড়ার বুড়ী গিন্নী বান্নি মানুষেরা এসে পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ পান সাজতে বসেছে। কেউ তরকারি কুটছে।

বেহারী পালের বউ ক'দিন থেকেই আসছে। বিয়ে-বাড়ির কাজ-কর্ম করে দিয়ে অনেক রাত্রে আবার নিজের বাড়ি চলে যায়।

সেদিন বললে—হ্যাঁ বউমা, সদার নাকি কী হয়েছে?

প্রীতি বললে—কী আবার হবে মাসীমা? কই, সদার তো কিছু হয়নি—

—শুনলুম নাকি সদা বলছে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। গাঁয়ে কত রকমের কথা উঠেছে, উনি নাকি বারোয়ারিতলা থেকে শুনে এসেছেন—

প্রীতি বললে—কী জানি মাসীমা, তুমি তো এ কদিন আসছো, নিজের কানে কিছু শুনেছ?

বেহারী পালের বউ সেই কথা বললে। বললে—আমি তো কর্তাকে তাই-ই বললুম, বললুম সদার যদি বউ পছন্দ না হয়ে থাকে তো আমার কানে সে-কথা একবার আসতোই—

প্রীতি বললে—পাড়ার লোকের কথা ছেড়ে দাও মাসীমা। পাড়ার লোকে তো অনেক কথাই বলে। তুমি নিজের চোখেই তো বউ দেখলে। অমন বউ কজনের বাড়িতে দেখেছ বলতে পারো? ছেলের অপছন্দ হবার মত কি বউ করেছি আমি? বলুক দিকিনি কেউ—

কিন্তু তখন অত কথা বলবার আর সময় নেই কারো। তবু বেহারী পালের বউ বললে—তোমার গুণের ছেলে বউ, পাস করা ছেলে, তুমি যদি এমন বউ ঘরে না আনবে তো কে আনবে বলো? কার এমন সাধ্যি আছে?

কথার মাঝখানেই গৌরী পিসী এসে বাধা দিলে। বললে—শুনেছ বউ, কেষ্টনগর থেকে তোমার বেয়াই-বেয়ান কেউই আসছে না—

—কেন?

—তাই তো শুনলুম। ফুলশয্যের লোকেরা এসে তাই তো বলছে। বলছে পণ্ডিত মশাই এখানে এসে তো কিছু খাবেন না। তাই আর আসেননি। আর অনেক দূরের রাস্তা। ওরা সবাই বউমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে—

—তা বউমার কাছে নিয়ে যা না ওদের।

নয়নতারা তেমনি করেই চুপ-চাপ বসে ছিল। তার আগেই সাজানো-গোছানো হয়েছে বউকে। নতুন একখানা বেনারসী পরেছে। গা-ভর্তি গয়না। বিপিন আসতেই নয়নতারা চোখ তুলে চাইলে।

জিজ্ঞেস করলে—বাবা আসবে না বিপিন?

বিপিন বললে—না দিদিমণি, তা তুমি ভালো আছে তো? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে নয়নতারা বললে—আর মা? মা কেমন আছে?

—মা একটু কান্নাকাটি করছিল। কিন্তু এখন চুপ করেছে। বলছে মেয়ে যখন হয়েছে তখন তো পর হয়ে যাবেই।

নয়নতারা বললে—তুমি গিয়ে মাকে বোল আমি এখানে খুব ভালো আছি, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ দিদিমণি। খুব খেয়েছি পেট ভরে। বড় বড় মাছ, মাংস, মিষ্টি, দই খুব খেয়েছি। তোমার শাশুড়ী খুব ভালোমানুষ, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের খাইয়েছেন। এখানকার সবাই-ই খুব ভালো লোক। সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আবার চার হাঁড়ি মিষ্টি দিয়েছেন এঁরা—

কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলবার সময় হলো না। বাইরে ততক্ষণে আবার শানাই বেজে উঠলো। একে একে আবার লোকজন আসতে লাগলো নয়নতারার ঘরে। নবাবগঞ্জ ঝেঁটিয়ে লোক আসবে আজ। এ তারই সূচনা। সব অচেনা মুখ। তারা এসে ঘর জোড়া করে বসলো। সকলের চোখই নয়নতারার দিকে। নয়নতারা বুঝতে পারলো সবাই তার মুখের দিকেই হাঁ করে দেখছে। আজকে বুঝি সমস্ত সন্ধ্যেটাই এই রকম চলবে। আজকে নয়নতারাই বুঝি এ-বাড়ির সব চেয়ে বড় আকর্ষণ!

কর্তাবাবু একসময় ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। চৌধুরী মশাই আসতেই কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর, ও-দিকের খবর কী?

চৌধুরী মশাই বললেন—সব তো ঠিকই চলছে। ফুলশয্যার লোকদের সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে পাঠিয়ে দিলুম। তাদের তো আবার ট্রেন ধরতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—না, আমি ও কথা বলছি না, বলছি খোকা কোথায়?

চৌধুরী মশাই বললেন—খোকা আর তো কোনও গণ্ডগোল করছে না—

—ওই তোমাদের বুদ্ধি! গণ্ডগোল না করলেও, কখন কী করে ফেলে তা কি বলা যায়? আমি যে বলেছিলাম একটু চোখে চোখে রাখতে, রেখেছ?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, তার জন্যে তো প্রকাশকে বলে রেখেছি—

—প্রকাশ কে?

—আমার শালা। সে পাকা লোক। তার চোখ এড়াতে পারবে না খোকা—

কর্তাবাবু বললেন—তবেই হয়েছে। তোমাকে বলেছি না তুমি নিজে একটু নজর রাখবে। একলা ছাড়বে না ওকে মোটে, আর বংশীদেরও বলে রেখেছ?

—হ্যাঁ, বলেছি।

—বংশীরা যেন সবাই মিলে ওর আশেপাশে থাকে। যেন চোখের আড়াল না করে, বলে দিও—

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, বলে রেখেছি—

—ঠিক আছে, যাও, তুমি ও-দিকটায় দেখ গিয়ে, আমার এদিকে তোমাকে বেশি আসতে হবে না—

চৌধুরী মশাই আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। নিচের অনেক লোকজনের শব্দ কানে এল। সকলে খেতে বসেছে। সমস্ত বাড়িটাতেই অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়। বাইরে থেকে শানাই বাজতে শুরু করেছে। কর্তাবাবু যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন মনে মনে। ফুলশয্যাটা কাটলেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। তারপর একটা রাত কাটলেই আর ভয় নেই। তখন খোকা আস্তে আস্তে সংসারী হয়ে উঠবে। তখন পাগলামি চলে যাবে তার। ওই বেয়াই মশাই যা বলেছেন তাই হবে। কাঁধে জোয়াল পড়লেই মানুষের দায়িত্ববোধ আসে।

ক্রমে আরো লোকের ভিড় বাড়লো। আওয়াজের মাত্রা আরো বেড় গেল। নবাবগঞ্জের আকাশে অঘ্রাণ মাসের রাত আরো ঘন হলো। তাঁর মনে পড়তে লাগলো সেই নবদ্বীপের ঘাটে বুক-জলে নেমে হর্ষনাথ চক্রবর্তীর শেষ কথাগুলো। আশ্চর্য! প্রথমে হাঁটু-জল,

তারপরে কোমর-জল। তারপরে বুক-জল, তারপরে গলা-জল। তখন সূর্য উঠেছে নতুন। গঙ্গার ঘাটে আরো কিছু স্নানার্থী এসেছে। তারাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল।

—নারাণ!

কর্তাবাবু বললেন—বলুন হুঁজুর—

হর্ষনাথ চক্রবর্তী বললেন—আমি চললুম নারাণ। ওদের ভার তোমার ওপর রেখে দিয়েই চললুম। তুমি ওদের দেখো—বুঝলে—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—আপনি কিছু ভাববেন না হুঁজুর, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

হর্ষনাথ চক্রবর্তী বললেন—তুমি যদি না-ও দেখো, তবু আমার কিছু বলবার নেই নারাণ, আমার কিছু করণীয়ও নেই, আমার সব আসক্তি আজ দূর হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম তামাকের আসক্তিটাই আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো না। তা এখন সে আসক্তিটাও দূর করেছি। এখন চলি—বলে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

জবাকুসুমসংকাশং

কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিং....

সূর্যস্তব পাঠ করতে লাগলেন হর্ষনাথ চক্রবর্তী মশাই অনেকক্ষণ ধরে। কর্তাবাবু ও-সব সংস্কৃত বোঝেন না। তিনি তখনও জলের ভেতর দাঁড়িয়ে হুঁজুরকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর একসময় হঠাৎ তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। চোখ দুটো উর্ধ্বনেত্র হলো। আর তারপরেই সব শেষ!

কোথায় গেলেন তিনি। আর কোথায় রইলেন নরনারায়ণ চৌধুরী। তিনি আসক্তি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কর্তাবাবু কোন্ দুঃখে আসক্তি ত্যাগ করবেন! তাঁর যে এখনও অনেক কামনা-বাসনা বাকি! এখনও অনেক আকাঙ্খা তাঁর। এই আজ খোকার বউ-ভাত। এখনই খোকা সংসারী হলো। তারপর একদিন তার সন্তান হবে। তারপরে সেই সন্তানেরও আবার একদিন সন্তান হবে। এমনি করে তিনিই এই বংশধারার পরিক্রার মধ্যে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবেন। তাঁর বংশের শাখা-প্রশাখার মধ্যেই তিনি অজর-অমর হয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করবেন। তবেই হয়ত তখন তাঁর চিরকালের সাধ-আহ্লাদ-আশা মিটবে। তার আগে কিছুতেই নয়।

অনেক রাত্রে বাইরের কল-কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। নয়নতারাকে ফুলশয্যায় বসিয়ে দিলে বেহারী পালের বউ।

বললে—বেশি রাত কোর না মা আজ, ঘুমিয়ে পড়, নইলে তোমারও শরীর খারাপ হবে, সদার শরীরও খারাপ হবে, কাল থেকেই তো তোমাদের শরীরের ওপর দিয়ে ধকল যাচ্ছে—

ফুলের গন্ধ এসে নাকে লাগছিল নয়নতারার। চারিদিকেই ফুল। ফুলের পাহাড় চারদিকে। অনেক ফুল যোগাড় করা হয়েছিল। পদ্মফুল এসেছিল চৌধুরীদের বিল থেকে। নয়নতারার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। মা-বাবা কেউই এল না। এ বাড়িতে সবাই পর। কেউই তার আপন নয়। তবু শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই-ই কাল থেকে খুব ভালো ব্যবহার করে আসছে—

শাশুড়ী বার বার বলেছে—লজ্জা করো না বউমা। পেট ভরে খাও। মনে করো না যেন এখানে তোমার কেউ নেই। তোমার শ্বশুরও আমাকে তোমার কথা বার বার জিজ্ঞেস করেছেন। আর একটা সন্দেশ দেব?

তারপর যখন আরো রাত হলো হঠাৎ ঘরের দরজাটা আবার খুলে গেল। নয়নতারা আন্দাজে বুঝতে পারলে কে ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু সাহস করে চোখ তুলে চাইতে পারলে

না। বুকটা থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো যেন সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সদানন্দ সবে ঘরে ঢুকেছে।

পেছন থেকে প্রকাশ মামা বললে—দরজায় খিল দিয়ে দে রে, খিল দিয়ে দে—

কিন্তু তবু যেন তার হাত উঠতে চাইল না। প্রকাশ মামা আবার পেছন থেকে তাগিদ দিলে—কই রে সদা, খিল দিলি নে?

খাওয়া-দাওয়ার পর থেকেই প্রকাশ মামা কানে কানে বলছিল—আমি যা বলেছি, সব তোর মনে আছে তো? ভুলিস নি তো?

সদানন্দ বললে—কী?

—মনে নেই? তোকে এত করে পাখি-পড়ানো করে শিখিয়ে দিলুম আর এখন কিনা তুই বলছিস—কী? তোকে নিয়ে আমি কি করবো বল্ দিকিনি।

সদানন্দ এ-কথার কিছু জবার দিলে না।

প্রকাশ মামা বললে—আরে ফুলশয্যের রাত একবারই তো আসে মানুষের জীবনে, তুই দেখছি শেষকালে সব গুবলেট করে ফেলবি। আমার মান-ইজ্জৎ সব ডোবাবি। ভাগ্নে-বউ শেষকালে আমার নামেই খোঁটা দেবে। বলবে এমন বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে যে একটা আস্ত আনাড়ির ডিম—

কিন্তু সদানন্দ সেই ঘরের মধ্যে ঢুকতেই যেন তার মাথার ওপর বিকট শব্দে একটা বাজ ভেঙে পড়লো। সামনের দিকে চাইতেই মনে হলো কে যেন ছাদের কড়িকাট থেকে ঝুলছে। মুখটা যেন চেনা-চেনা। যেন ঠিক কপিল পায়রাপোড়া......পরনের কাপড়টা গলায় ফাঁস দেওয়া.....ঝুলছে.....

পেছন থেকে প্রকাশ মামা আবার তাগিদ দিলে—কই রে, সদা, দিলি নে? খিল দে—

কর্তাবাবুর কাছে রিপোর্ট দিতে গেলেন চৌধুরী মশাই। বললেন—সব নিশ্চিন্তে ঢুকে গেছে বাবা—

কর্তাবাবু এই খবরটার আশাতেই রাত জেগে বসেছিলেন। বললেন—আর খোকা?

পেছনে প্রকাশ মামাও ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করলে।

বললে—আমি এই এখুনি তাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে সেখান থেকে আসছি—আর যেতে কি চায়, ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম—

—ঘরে খিল দিয়েছে তো?

প্রকাশ মামা বললে—খিল দিতে কি চায়? প্রথমে দিচ্ছিল না, তারপর আমি পিছন থেকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে খিল্ বন্ধ করিয়ে তবে ছেড়েছি....

কর্তাবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। একটা আত্মতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। অবশ পা দুটো অভ্যাসমত ছড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা করেও পারলেন না।

তারপর বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও, এবার তোমরা বিশ্রাম করো গে—

শুধু যে তাতে কর্তাবাবুই নিশ্চিন্ত হলেন তা-ই নয়, হয়ত নবাবগঞ্জের চৌধুরীবাড়ির সবাই-ই নিশ্চিন্ত হলেন। চৌধুরী মশাইও নিশ্চিন্ত হলেন। যাক্, আর কোনও দুর্ভাবনা নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছেই পূর্ণ হলো। সদানন্দ এতক্ষণে নতুন বউ-এর আকর্ষণে গা ঢেলে দিয়ে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব ভুলে গিয়েছে। আর কোনও দুর্ভাবনা কারো নেই, আর কোনও

আশঙ্কাও নেই কারো। যা ভয় ছিল সবলের তা হলো না। সব সমস্যা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল। তিন দিন আগেও যে সমস্যা সকলের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল তার সমাধি হলো। কোথা থেকে এক পুরোন ইতিহাসের কুটিল স্মৃতি সাপ হয়ে ফণা তুলেছিল। মনে হয়েছিল সেই ফণা বুঝি এ সংসারের সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্যের মাথায় ছোবল মেরে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আর তা হবার সম্ভাবনা নেই। এবার নয়নতারা এসেছে। ফুলশয্যার ওপর নয়নতারার চোখ-ভোলানো রূপ আর মন-ভোলানো ভালবাসা সব কিছু সন্দেহের কাঁটা নির্মূল করে দিয়েছে। আর ভয় নেই। এবার ঘুমোও। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো সবাই। তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে এ ক'দিন ধরে। গায়ে-হলুদের আগের দিন রাত্রে যেদিন থেকে সদানন্দ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল সেই দিন থেকেই তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। তারপর অনেক ঝড়-ঝাপ্টা অতিক্রম করে শেযরক্ষা করেছে বংশী ঢালী। যেটুকু বংশী ঢালী পারেনি, সেটুকু শেষ করবে নতুন-বউ নয়নতারা। নয়নতারাই আজ ফুলশয্যার রাত্রে সদানন্দকে জীবনের আসল মানে বুঝিয়ে দেবে। নয়নতারাই বুঝিয়ে দেবে মহাপুরুষরা যা-কিছু বলে গিয়েছেন তা বইতে ছাপাবার জন্যে, স্কুলে কলেজে পড়াবার জন্যে, পড়ে পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে, কিন্তু জীবন আলাদা জিনিস। সে জীবনে একমাত্র সত্য হলো ভোগ। ভোগ তার সংসারের বিলাসের মধ্যে দিয়ে, তার অর্থ উপার্জনের মধ্যে দিয়ে। আর সেই ভোগের পথে যত বাধা আসে তা যে-কোনও উপায়ে অপসারণের মধ্যে দিয়ে। এরই নাম হলো জীবন!

কর্তাবাবুও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরটা যেন চট্ করে একটু ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন কাঁদছে। যেন কাছাকাছি থেকে কারো কান্নার আওয়াজ আসছে!

এই আনন্দের দিনে এত রাত্রে কে আবার কাঁদে! অভ্যাসগত ডাকলেন—দীনু—

অন্য সময় হলে দীনু সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হতো। হুকুম তামিল করবার জন্যে দীনুর মত অত বাধ্য মানুষ তিনি আর দেখেন নি। কালীগঞ্জের কর্তাবাবুর কাছে যখন তিনি কাজ করতেন তিনি নিজেও অত বাধ্য হয়ে হুকুম তামিল করেন নি কখনও।

কর্তাবাবুর ডাকে কেউ-ই সাড়া দিলে না। তা না সাড়া দিক। আহা সারা দিন খাটুনির পর বোধ হয় দীনু ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক। ঘুমোক সে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছিল কে কাঁদছে! অথচ কাঁদার তো কথা নয় কারো। আজকে তো আনন্দের দিন। আজকে তাঁর নাতির বিয়ে। বিয়ে ঠিক নয়, ফুলশয্যে। আজকে তো তাঁর প্রজারা এসে তাঁর নাতবউকে আশীর্বাদ করে গেছে। আজকে সবাই তাঁর বাড়িতে এসে পাতা পেতে পেট ভরে খেয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ খাবার পর ছাঁদা বেঁধেও নিয়ে গেছে। গ্রামে তো আজ আর কেউই উপবাসী নেই। সবাই পরিতৃপ্ত, সবাই পরিশ্রান্ত। এখন তারা যে-যার বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন কেন তারা কাঁদতে যাবে! কীসের দুঃখ তাদের!

কর্তাবাবু আবার চোখ দুটো জোর করে বুঁজিয়ে প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কর্তাবাবু তখনও জানতেন না যে তিনি ঘুমোতে চেষ্টা করলেও ইতিহাসের কখনও ঘুমোতে নেই। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই আজ কালীগঞ্জের বউকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই এত রাত্রে তাঁর কানে চাপা আর্তনাদ ভেসে আসে। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই তাঁর নাতি বিয়ের দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কালীগঞ্জে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবার ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই তাঁর নাতি বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেই টাকা চায়!

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক। এখন সবাই সুখী, এখন সকলের শান্তি। এখন সবাই ঘুমোও। আমি অসুস্থ লোক, আমার বয়েস হয়েছে, আমি জেগে থাকলেও তোমরা ঘুমোও।

—মা!

সমস্ত বাড়িময় যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। অনেকের একটা চাটাই কিংবা বালিশও জোটেনি। কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে একটা ছাদের তলা খুঁজে নিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। কাজ শেষ হতে রাত প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল। মাছের কাঁটা আর মাংসের এঁটো হাড়ের লোভে কিছু বেওয়ারিশ কুকুর পুকুরপাড়ে এসে অনেকক্ষণ কাড়াকাড়ি করে তখন পেট শান্ত করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বলতে গেলে কেউ আর তখন জেগে ছিল না। চৌধুরী মশাইও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বড় খাটুনি গিয়েছিল তাঁর। যখন সদানন্দ ফুলশয্যার ঘরে শুতে গেল তখনই শুধু একটা নিশ্চিন্তের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন তিনি। যাক্, বাঁচা গেল। চৌধুরী-পরিবারের বংশধারা রক্ষা পেল। আর কোনও দিন কোনও কালীগঞ্জের বউ এসে তাঁর কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এই বংশ শাখাপ্রশাখা মেলে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ বিস্তারলাভ করবে। ওই সদারও আবার একদিন সন্তান হবে। সেই সন্তানের আবার একদিন গায়ে-হলুদ হবে, একদিন বিয়ে হবে, একদিন ফুলশয্যাও হবে।

আর তারপর? তারপরের কথা ভাবতে গিয়েই চৌধুরী মশাই-এর দু'চোখ কখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল।

—মা!

চৌধুরী মশাই চমকে উঠলেন! কে যেন কাকে ডাকছে! মেয়েলি গলা! তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। পাশেই বিছানার ওপর গৃহিণী ঘুমোচ্ছিল। বড় অঘোর ঘুম তার। আহা, ঘুমোক। অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে আজ সবে একটু বিশ্রাম করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কে-ই বা ডাকছে তাকে! এত রাত্রে তাকে কেনই বা ডাকছে!

তিনি গৃহিণীর গায়ে ঠেলা দিলেন। বললেন—ওগো, ওগো,—শুনছো—

ধড়মড় করে উঠে পড়লো প্রীতি। বললে—কী হলো?

চৌধুরী মশাই বললেন—দেখ দিকিনি, কে যেন ডাকছে তোমাকে—

—আমাকে? ডাকছে? কে ডাকছে!

—কী জানি! একজন মেয়েমানুষের গলা মনে হলো—

মেয়েমানুষের গলা! এত রাত্তিরে কে মেয়েমানুষ তাকে ডাকবে! এই তো সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে তিনি ঘরে এসে শুয়ে পড়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন—রাত ক'টা হলো গো?

চৌধুরী মশাই ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন—রাত তিনটে—

রাত তিনটে মানে ভোর হয়ে এল। এত রাত পর্যন্ত ঘুম হয়েছে! তবে তো অনেকক্ষণ ঘুম হয়েছে। কিছুই টের পায়নি সে।

আবার বাইরে থেকে ডাক এল—মা—

প্রীতি তাড়াতাড়ি কাপড়টা গুছিয়ে নিতে নিতে ঘরের খিল খুলে বাইরে এলো। চারদিকে অন্ধকার। সামনের বারান্দায় যে-যেখানে যেমন ভাবে পেরেছে গড়া-গড়া শুয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে যেন মনে হলো কে একজন অন্ধকারে তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রীতি তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

মূর্তিটা বললে—আমি—

—আমি? আমি কে?

প্রীতি একেবারে মূর্তিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, মূর্তিটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই চমকে উঠেছে। বউমা? তুমি? তুমি হঠাৎ এত রাত্তিরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

নয়নতারা তখন থরথর করে কাঁপছিল। বললে—আমার ভয় পাচ্ছে—

—কেন? ভয় পাচ্ছে কেন? খোকা কোথায়?

নয়নতারা এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

শাশুড়ী বললে—কী হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন? খোকা কোথায় গেল? খোকা ঘরে নেই?

এবারও নয়নতারা কোন কথার উত্তর দিলে না।

কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো শাশুড়ীর মনে। বললে—চলো, চলো, তোমার ঘরে চলো, কিছু ভয় নেই। চলো—

নয়নতারাকে হাতে ধরে নিয়ে প্রীতি তার শোবার ঘরের দিকে গেল। নয়নতারার শোবার ঘরের দরজা তখন হাট করে খোলা পড়ে ছিল। ভেতরে একরাশ ফুলের গন্ধ। দেয়ালের গায়ে টিমটিম করে তখনও দেয়ালগিরিটা জ্বলছে। বিছানা যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। চাদরে বালিশে এতটুকু ভাঁজও পড়েনি কোথাও। বিছানায় যে কেউ শুয়েছিল তার সামান্যতম চিহ্নও কোথাও নেই। বিছানাটা যেন ব্যবহারও করা হয়নি এক মূহূর্তের জন্যে।

চারিদিকে চেয়ে প্রীতি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। যেন সমস্ত অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করলে। তারপর নয়নতারার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—খোকা কোথায় গেল?

নয়নতারা কথা বলতে গিয়েও কথা বলতে পারলে না। শাশুড়ীর চোখের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে মুখটা নিচু করে নিলে।

—বলো, খোকা কোথায় গেল? বলো?

নয়নতারা চুপ। তার চোখ দিয়ে তখন টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—খোকা ঘরে শোয়নি?

এবার প্রীতি আর পারলে না। নয়নতারার চিবুকটা ধরে উঁচু করে নিজের মুখোমুখি ধরলে। নয়নতারা শাশুড়ীর সে দৃষ্টি সহ্য করত না পেরে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেলল। বোঁজা চোখ দুটো দিয়ে তখন জলের ধারা আর বাধা মানছে না। দরদর করে গালে বেয়ে শাশুড়ীর হাতের পাতার ওপর পড়তে লাগলো।

—বলো বউমা, আমি তোমার শাশুড়ী হই, আমার কাছে লজ্জা করো না, খোকা তোমার বিছানায় শোয়নি?

নয়নতারার মুখে তখন যেন জবাব দেবার মত কোনও ক্ষমতাই আর নেই।

—বলো, জবাব দাও, খোকা শোয়নি?

এতক্ষণে নয়নতারার ঠোঁট দিয়ে একটা ছোট কথা বেরোল—না—

—শোয়নি? তা হলে কোথায় গেল সে?

নয়নতারা বললে—তা জানি না।

—কিন্তু তাকে তো আমরা তোমার ঘরে ঢুকিয়ে দিলুম। সে দরজায় খিল দিলে, তাও জানি। তারপর কী হলো? তারপর কখন সে বেরিয়ে গেল?

নয়নতারা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

প্রীতি বললে—বলো বউমা, আমার কথার জবাব দাও, তারপর কখন সে বেরিয়ে গেল? তোমার সঙ্গে কী কথা হলো? তুমি কি কিছু বলেছিলে তাকে? কী বলেছিলে?

নয়নতারা কাঁদতে কাঁদতেই বললে—কিছু বলিনি—

—কিছু বলোনি?

—না।

—সে তোমাকে কিছু বলেছিল?

—না।

প্রীতি একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে—তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোন কিছুই কথা হয়নি?

নয়নতারা বললে—না—

—তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল সে?

নয়নতারা হঠাৎ এ-কথার জবাব দিতে পারলে না।

প্রীতি বললে—বলো বউমা, আমি তোমাকে বলছি, আমি তোমার শাশুড়ী হই, আমি তোমার মায়ের মত। এখানে তোমার মা থাকলে যেমন তাকে সব কথা বলতে, তেমনি আমাকেও তুমি বলো। মনে করে নাও এ-বাড়িতে আমিই তোমার মা। আমাকে কোন কিছু বলতে তুমি লজ্জা করো না। বলো, তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল সে?

নয়নতারা এবার শাশুড়ীর বুকের মধ্যে ভেঙে পড়লো। শাশুড়ী বউকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে—কেঁদো না বউমা, চুপ করো, কেঁদো না। আমাকে সব খুলে বলো তুমি। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তো রয়েছি, তোমার কী ভয়? মার কাছে কি কেউ কিছু বলতে লজ্জা করে? বলো তো লক্ষ্মী মেয়ে, সদা বুঝি তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল, আর তুমি বুঝি আপত্তি করেছিলে?

নয়নতারা শাশুড়ীর বুকের মধ্যেই মাথা নেড়ে বললে—না—

—তবে? তবে কেন খোকা চলে গেল?

এর উত্তর কী দেবে নয়নতারা? নয়নতারা কি নিজেই এর উত্তর জানতো! সে কি কল্পনা করতে পেরেছিল এমন করে তার ফুলশয্যা রাত্রের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? কত দিন কত মেয়ের কাছে তাদের ফুলশয্যা রাত্রের মুখরোচক গল্প শুনেছে সে। তারাও তার সঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছে। তাদের বিয়ে হবার পরে তারাই গল্প করেছে সে-সব ঘটনার। বিয়ের আগে নয়নতারাও নিজের ফুলশয্যার রাত্রের অনেক স্বপ্ন তিলে তিলে মনের ভেতরে পুযে রেখেছিল। ভেবেছিল তার ফুলশয্যার রাত্রের ঘটনা তাদের বলবে। অন্তত বলবার মত একটা কিছু ঘটনা ঘটবে। কিন্তু এ কী হলো? কারো বাড়িতে কি বউভাতের রাত্রে পুলিস আসে! এমন ঘটনা তো তার কোনও বন্ধুর বিয়েতে ঘটেনি। পুলিসই বা কেন হঠাৎ আসতে গেল, আর খুনই বা হলো কে? সব কিছু মিশিয়ে যেন এক রহস্যজনক বিপর্যয় ঘটে গেল তার জীবনে। কান্না কি মানুযের চোখে সহজে আসে! আজ যদি মা এখানে থাকতো তো নয়নতারা তাকে জিজ্ঞেস করতো—মা, তুমি এমন জায়গায় আমার বিয়ে দিলে কেন? একটু খোঁজখবরও নিতে পারলে না ভালো করে?

প্রীতি কী করবে তখন বুঝতে পারছিল না। বললে—কেঁদো না বউমা, আমার সঙ্গে কথা বলো, আমি যে-কথা বলছি তার জবাব দাও—

বলে নয়নতারাকে বুক থেকে সরিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করালো। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে বউমার চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে—এবার বলো তো বউমা, সত্যিই কী হয়েছিল? সব সত্যি করে বলবে, কিছু লুকোবে না—বলো—

নয়নতারা বললে—কিছু হয়নি মা—

শাশুড়ী বললে—কিছু হয়নি তো শুধু শুধু খোকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল? ফুলশয্যার

রাত্তিরে বর কখনও মিছিমিছি বউকে ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়? এমন কথা কখনও কেউ শুনেছে? নিশ্চয় কিছু হয়েছে? তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ। বলো সত্যিই কী হয়েছিল?

নয়নতারা বললে—সত্যি বলছি মা, কিছু হয়নি—

—কিছু না হলে খোকা এমনিই বেরিয়ে গেল? আমার ছেলে তো পাগল নয়। পাগল হলে না-হয় বুঝতাম, তবু তার একটা মানে ছিল! শুধু শুধু সে বেরিয়ে গেল কেন? তুমি নিশ্চয়ই তাকে কিছু বলেছিলে!

—বিশ্বাস করুন মা, আমি কিছুছু বলিনি!

—তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করবো? যখন তুমি দেখলে যে সে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে তখন তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন যে সে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন, কোথায় যাচ্ছে?

নয়নতারা অপরাধীর মত বললে—আমি জিজ্ঞেস করিনি—

কেন জিজ্ঞেস করোনি?

—আমার ভয় করেছিল!

—ভয়? কীসের ভয়?

কীসের যে ভয় তা নয়নতারা নিজেই জানে না তো শাশুড়ীকে বোঝাবে কেমন করে? বললে—আমি জানি না কীসের ভয়!

প্রীতি এবার যেন একটু অসন্তুষ্ট হলো। বলে উঠলো—তা তুমি যখন দেখলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে ধরে রাখলে না কেন? তাহলে কীসের জন্যে ভগবান এত রূপ দিয়েছিল তোমাকে? তাহলে অন্য এত মেয়ে থাকতে কেন তোমাকেই বা এ-বাড়ির বউ করে নিয়ে এলুম? আর এইটুকুই যদি তুমি না করতে পারবে তো এত রূপ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? আমি রূপসী বউ চেয়েছিলুম কি আমার নিজের জন্যে?

কিন্তু কথাগুলো বলেই প্রীতি বুঝলো ঠিক এই সময়ে এ-কথাগুলো বলা যেন তার উচিত হচ্ছে না।

নয়নতারা তখনও শাশুড়ীর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। প্রীতি বললে—আর কেঁদো না বউমা, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কিছু দোষ নেই। আর সত্যিই তো, তুমিই বা কী করবে! তুমি তো নতুন এ বাড়িতে! এক কাজ করি, এখনও কিছুক্ষণ রাত আছে, আমি এসে তোমার কাছে শুচ্ছি। সারারাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে—তুমি একটু থাকো এখানে, আমি আসছি—

বলে নয়নতারাকে বিছানার ওপর বসিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে এলো।

চৌধুরী মশাই তখন নিজের ঘরের ভেতর ছট্‌ফট করে পায়চারি করছিলেন। ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, কোথায় কী গোলমাল বেধেছে। এখন যদি সমস্ত বাড়িময় জিনিসটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে। সমস্ত নবাবগঞ্জময় লোক জেনে যাবে যে, তাঁর ছেলে ফুলশয্যার রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়েছে! কথাটা হয়ত শেষ পর্যন্ত কেষ্টনগরে বেয়াইবাড়িতেও গিয়ে পৌঁছোবে! তখন?

হঠাৎ গৃহিণী এসে ঘরে ঢুকল।

চৌধুরী মশাই সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন—কী হলো? বউমা কী বললে?

যা ভেবেছিলাম তাই-ই হয়েছে, খোকা ঘরে নেই—

—ঘরে নেই?

গৃহিণী বললে—হ্যাঁ, বউমার একলা থাকতে ভয় করছিল, তাই আমাকে ডাকতে

এসেছিল। আমি যাই বউমার কাছে। তোমাকে তাই বলতে এলুম—

—কিন্তু খোকা গেল কোথায়?

গৃহিণী বললে—তা কী করে ও জানবে? বউমার সঙ্গে খোকার কোনও কথাও হয়নি, ঘরে ঢুকেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে—

—খোকা বেরিয়ে গেল আর বউমা আটকাতে পারলে না?

গৃহিণী বললে—কী যে তুমি বলো! নতুন বউ, এখনও খোকার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি, আর খোকাকে আটকাবে? নতুন বউ-এর অত সাহস থাকে? অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ, একেবারে বলতে গেলে প্রথম রাত, এর আগে কোনও দিন একটা কথাও হয়নি, তাকে কী বলে বাধা দেবে? তোমার এত বয়েস হলো আর তুমি এই কথা বলছো? আমার ফুলশয্যার রাতে যদি তুমি অমনি করতে তো আমি তোমাকে বাধা দিতে পারতুম? তা কি কোনও মেয়ে পারে? কী যে তোমার বুদ্ধি—

চৌধুরী মশাই বললেন—তাহলে কী হবে?

গৃহিণী বললে—এখন কী হবে তাই-ই ভাবছি! বউমা একেবারে ভেঙে পড়েছে। বেচারী এই রাত তিনটে পর্যন্ত একলা কী করবে ভেবে পায়নি, শুধু ভয়ে কেঁপেছে, শেষকালে আর কোনও উপায় না পেয়ে লজ্জা সরম সব ঠেলে ফেলে আমাকে ডাকতে এসেছে—

—তা তুমি কী বলে এলে বউমাকে?

—কী আর বলবো! আর আমারই কি ছাই মাথার ঠিক আছে এখন! প্রথমে খুব বকলুম, কিন্তু শেষে বুঝলুম বউমারই বা কী দোষ! খুব কাঁদছিল, আমি তার মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বসিয়ে রেখে দিয়ে এলুম। এখন যাই, যে রাতটুকু আছে, পাশে গিয়ে শুই, চেষ্টা করে দেখি যদি একটু ঘুম পাড়াতে পারি, তারপর সকাল হলে যা-হয় ঠিক করা যাবে—

চৌধুরী মশাই বললেন—ঠিক আর কী করবে তুমি! খোকা কি আর ফিরে আসবে?

—সে-সব এখন আর ভাবতে পারছি না আমি। আমারও মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে? আমিও আর দাঁড়াতে পারছি না—

বলে গৃহিণী চলে যাচ্ছিল।

চৌধুরী মশাই পেছন থেকে ডাকলেন। বললেন—আর একটা কথা শোন—

গৃহিনী ফিরলো। বললে—কী?

—দেখ, বউমাকে বলে দিও যেন এ-সব কথা কাউকে না বলে। বাইরের লোক এ-কথা শুনলে নানান কেলেঙ্কারি রটবে। কেষ্টনগরের বেয়াই-বেয়ানের কানেও যেন কথাটা না ওঠে।

গৃহিণী বললে—বউমাকে না হয় বারণ করবো, কিন্তু তোমার ছেলে? তোমার ছেলেই যদি দশজনকে বলে বেড়ায়! আর যদি না-ও বলে তো এ-সব কথা তুমি কদ্দিন চেপে রাখতে পারবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—সে পরের কথা পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন আজকের কাণ্ডটা যেন দু-কান না হয়। তোমার বাবা রয়েছেন এখানে, আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই এসেছে, এই অবস্থায় বাইরে জানাজানি হওয়া ভালো নয়, তারপর বাবার কানেও যেন না যায় কথাটা, তুমি একটু বউমাকে ভালো করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে দিও—

গৃহিণী বুঝলো কি বুঝলো না তা বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে গেল।

চৌধুরী মশাই তখন ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট করতে করতে পায়চারি করতে লাগলেন।

নয়নতারা তখনও পাথরের মত ঠাণ্ডা শরীরে বিছানার ওপর কাঠ হয়ে বসে ছিল। শাশুড়ী ঘরে ঢুকেই বললে—ওমা, তুমি এখনও শোওনি? এসো, এসো, শুয়ে পড়ো—বলে নয়নতারাকে পাশে নিয়ে শুইয়ে দিলে। তারপর পায়ের দিকে পাট করে রাখা চাদরটা তার গায়ে ঢাকা দিয়ে নিজেও তার পাশে শুয়ে পড়লো।

বললে—কিছু ভয় নেই বউমা, খোকাকে তুমি ভুল বুঝো না, ও ওইরকম। একটু খেয়ালী ছেলে। আজকে ওইরকম ব্যবহার করলে বটে, কিন্তু দু'এক দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে—তখন দেখবে ও-রকম স্বামী হয় না। আমি ওর মা, তবু আমার সঙ্গে ওই রকম করে। তুমি কিছু ভেবো না বউমা, লক্ষ্মীটি।

বলে প্রীতি নয়নতারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর আস্তে আস্তে বললে—একটা কথা বউমা, তুমি এসব কথা কাউকে বোল না যেন, আমি সব ঠিক করে দেব। এখনও তো তোমাদের ভালো করে জানাশোনা হয়নি, তাই একটু লজ্জা হয়েছে আমার খোকার। বড় লাজুক ছেলে কিনা আমার সদা—দু'দিন ঘর করলেই বুঝতে পারবে সব। তুমি যেন তোমার বাবা-মাকে এসব কথা কিচ্ছু বোল না, বুঝলে—

নয়নতারা বুঝলে না তা ঠিক বোঝা গেল না। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। শাশুড়ী তখনও নয়নতারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। সমস্ত বিয়েবাড়ি নিস্তব্ধ। বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যে কোলাহল চলছিল-তার চিহ্নমাত্র নেই আর কোথাও। সবাই ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। দূরে কোন্ পাড়ায় কাদের মুর্গী ডেকে উঠলো। এইবার ভোর হবে। এইবার একে একে আবার সবাই ঘুম ভেঙে উঠবে। আবার ডাক পড়বে প্রীতির। তার আঁচলে বড়-ভাঁড়ারের চাবি। এতগুলো লোক জলখাবার খাবে, কারো দুধ, কারো লুচি, কারো চা, কারো বা চিঁড়ে-মুড়ি। সকলের সব ফরমাস তামিল করতে হবে একা তাকেই। যেন কেউ না বলতে পারে চৌধুরী মশাই-এর ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসে পেটই ভরেনি আমাদের।

না, আর দেরি করা নয়। এরপর যদি একটু তন্দ্রা এসে যায় তখন বেলা গড়িয়ে যাবে। তখন জানাজানি হয়ে যাবে যে চৌধুরী মশাই-এর ছেলের ফুলশয্যা হয়নি। ছেলের বদলে শাশুড়ী এসে নতুন-বউএর পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। আস্তে আস্তে প্রীতি উঠলো। একবার নিচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করলে বউমা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। বউমা তখনও ঠিক সেই ভাবে বালিশে মুখ গুঁজে স্থির হয়ে শুয়ে আছে।

প্রীতি আর শব্দ না করে টিপি টিপি পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। বারান্দার ওপর তখনও মানুষ-জন গড়া গড়া শুয়ে আছে। তখনও যেন তাদের কাছে গভীর রাত।

কিন্তু সকলের আগে উঠেছে প্রকাশ মামা। প্রকাশ মামার ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়ার রোগ আছে। ঘুম থেকে উঠে সেইটেই তার প্রধান কাজ। বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, যা কিছু হোক, ওটি তার প্রথমেই চাই।

আগের রাতে শেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিটি চলে না-যাওয়া পর্যন্ত প্রকাশ মামার শান্তি ছিল না। সকলকে নিজে দাঁড়িয়ে খাইয়েছে প্রকাশ মামা। জোর-জবরদস্তি করে পেট ভরে সকলকে খাইয়েছে। যে দশখানা লুচির বেশি খেতে পারবে না, তাকে জোর-দবরদস্তি করে তিরিশ-চল্লিশখানা লুচি খাইয়েছে। মনে মনে সবাই বাহবা দিয়েছে শালাবাবুকে। হ্যাঁ, কেউ বলতে পারবে না যে সদানন্দর বিয়েতে ভালো করে খাতির-যত্ন হয়নি, পেট ভরে খেতে

পায়নি। গাঁ-গঞ্জে এই-ই নিয়ম। বিয়ে-বাড়ির এমন খাওয়া বছরে ক্বচিৎ কদাচিৎ কপালে জোটে। চাষা-ভুষোদের বিয়েবাড়িতে সাধারণত চিঁড়ের ফলারের বন্দোবস্ত।

প্রকাশ মামা কোথায় ছিল কেউ জানে না। চোখ মেলেই চেঁচিয়ে উঠলো—কই রে, চা হয়েছে?

কিন্তু কথাটা বলেই বুঝলো আজকে শালাবাবুর হুকুম তামিল করবার কেউ নেই আশেপাশে। আজকে সবাই ঘুমোচ্ছে। কালকের খাটুনির পর সকলেরই গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে বিছানায় গড়াচ্ছে। কিন্তু তা বললে তো নেশা শুনবে না। নেশার রসদ যোগাতেই হবে।

আস্তে আস্তে আড়ামোড়া খেয়ে প্রকাশ মামা উঠলো। উঠে একবার রান্নাবাড়ির দিকে গেল। কিন্তু সেদিকে সব ভোঁ-ভোঁ। কারোর টিকির পাত্তা নেই। একেবার পুকুরপাড়ের দিকে গেল। সেখানেই কালকে ভিয়েন চড়েছিল। মোটা-মোটা কাঠগুলো পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর-চাকরদের কারো দেখা নেই। ঘুমোতে যেতে সেই রাত একটা বেজে গিয়েছিল কাল।

হঠাৎ একটা চেনা লোকের মুখ দেখেই খুশীতে লাফিতে উঠলো। লোকটা মাঠের দিক থেকে আসছিল।

প্রকাশ মামা তাকেই ধরলো—এই যে হে, উঠেছ? কী নাম যেন তোমার?

—আজ্ঞে বিন্দাবন?

—বৃন্দাবন! বেশ বেশ! বেশ নাম তোমার! চা খেয়েছো তুমি?

—আজ্ঞে চা আমি খাইনে।

প্রকাশ মামা যেন একটু হতাশ হলো কথাটা শুনে। বললে—চা খাও না? তানা-ই বা খেলে, চা তৈরি করতে পারো তো?

—আজ্ঞে, তা পারি।

—ভেরি গুড। চা এক বাটি তৈরি করো দিকিনি।

লোকটা জানতো শালাবাবুর হাতেই সব ক্ষমতা। মজুরি নেবার সময় এই শালাবাবুকেই ধরতে হবে। তখন চায়ের কথাটা মনে থাকবে। প্রকাশ মামা বললে—বেশ কড়া করে বানাবে, বুঝলে? দুধ-ফুদ যদি না পাও তো ক্ষতি নেই, রংটা যেন লঙ্কার মত লাল হয়। এই চায়ের জন্যে মাঠে যেতে পারছি না, সব আটকে গেছে, পেট-টেট সব বোম্ মেরে আছে—

লোকটা অদ্ভুত করিতকর্মা বটে! কোথা থেকে কাকে ধরে চা, দুধ, চিনি যোগাড় করে নিয়ে এল। তারপর কাঠকয়লার আগুন ধরিয়ে তার ওপর জল চড়িয়ে দিলে।

প্রকাশ মামা বললে—দুবাটির মত জল দাও, আমি খাবো, আর আমার পিসেমশাই খাবে। পিসেমশাইকে চেনো তো? ওই যে বরের দাদামশাই, ওঁকেও এক বাটি দেব। কুটুম মানুষ, লজ্জায় চায়ের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবেন না। তবে আমার ও-সব লজ্জা-ফজ্জা নেই ভাই, আমি দিল-খোলা মানুষ। খাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা-সরম করি নে ; পেট হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়, জানো বৃন্দাবন। পেটের জন্যেই দুনিয়া চলছে। আরো বড় একটা জিনিস আছে অবিশ্যি, কিন্তু পেট তার চেয়েও বড়। সেটা না হলেও চলে, কিন্তু পেট তো না হলে চলে না—

বৃন্দাবন জল গরম করছে আর প্রকাশ মামা উনুনের সামনে তাই দেখছে। হঠাৎ সদরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। আরে সদা না! এত ভোরে কোথায় গিয়েছিল!

আর বসা হলো না প্রকাশ মামার। উঠে দাঁড়ালো। সদানন্দ ভেতরের দিকেই ঢুকছিল। প্রকাশ মামাও তার দিকে যেতে লাগলো।

একেবারে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তুই? আজ এত সকালে উঠে পড়েছিস যে?

সদানন্দর মুখের ভাব দেখে প্রকাশ মামার কেমন সন্দেহ হলো।
বললে—তোর চেহারা ও-রকম হলো কেন রে? কী হয়েছে বল তো?
সদানন্দ বললে—না, কিছু হয়নি—
প্রকাশ মামা বললে—কিছু না হলেই ভালো। কাল তুই যা ভাবিয়ে তুলেছিলি সকলকে! আমি তো ভেবেছিলাম তুই একটা কিছু কাণ্ড করে বসবি। নতুন-বউ বাড়িতে এসেছে। এই সময়ে কিছু করলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত মাইরি। তা যাক শেষ পর্যন্ত তোকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে তবে আমি খেইছি, জানিস! তোর দাদুও তোর জন্যে খুব ভাবনায় পড়েছিল। আমি যখন গিয়ে বললুম যে সদা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছে, তখন বুড়ো নিশ্চিন্ত হলো—
তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক্ সে-সব বাজে কথা, রাতটা কেমন কাটালি বল্—কে প্রথম কথা বললে? তুই, না তোর বউ?—
সদানন্দ কোনও জবাব দিলে না।
প্রকাশ মামা তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলো—কী রে? কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে? বল্ না, বল্! আমাকে বলতে তোর লজ্জা কীসের? মাইরি বলছি আমি কাউকে বলবো না। আমাকে বলতে তোর দোষ কীসের? আমি না তোর বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম, আজ আমার সঙ্গেই তুই বেইমানি করছিস্!
সদানন্দ বললে—বলছি তো কিছু বলবার নেই—
—বলবার নেই মানে? তুই কি সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছিস্ নাকি? অ্যাঁ? ছিঃ ছিঃ, তুই দেখছি একটা আস্ত হাঁদা-রাম! মেয়েটা কী ভাবলে বল্ দিকিনি? বেচারা কতদিন ধরে এই রাতটার দিকে চেয়ে বসে ছিল, আর তুই কিনা সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোলি?
সদানন্দ বললে—এখন ও-সব কথা ভাল লাগছে না প্রকাশ মামা, পরে সব বলবো—
বলে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রকাশ মামা ছাড়লে না। বললে—ওরে শয়তান, আজ আমি পর হয়ে গেলুম, না? অথচ আমিই এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তোর বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলুম, আর আজ আমি কেউ নয়! বেইমান তুই, জাত বেইমান—
কিন্তু কথার মধ্যেখানে বাধা পড়লো। ওদিক থেকে চৌধুরী মশাই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সদানন্দকে দেখে এগিয়ে এলেন।
বললেন—খোকা, তুমি একবার ভেতরে আমার সঙ্গে দেখা করো তো—
বলে আর দাঁড়ালেন না। সোজা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলতে লাগলেন।
সদানন্দও তাঁর পেছনে-পেছনে সেই দিকে চলতে লাগলো।

মনে আছে সেদিন সদানন্দ বাবার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী মশাই সোজা গিয়ে উঠলেন তাঁর চন্তীমন্ডপে। আসলে কর্তাবাবু যেদিন পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন সেইদিন থেকেই তিনি নিজের আসন করে নিয়েছিলেন ওইখানে। ওইখানে বসেই তিনি ক্ষেতের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। সেই যে সকালবেলা গিয়ে সেখানে বসতেন, তখন থেকে বেলা একটা দুটো পর্যন্ত তাঁর ওই চণ্ডীমণ্ডপে কাটতো। এক-এক করে সবাই আসতো নানান কাজে। তিনি চাইতেন তাঁর সঙ্গে খোকাও ওখানে বসুক, তাঁর কাজ-কর্ম আস্তে আস্তে দেখেশুনে নিক। তিনি থাকতে থাকতে ছেলে তাঁর কাছে সব কিছু কাজ-

কর্ম শিখে নিক।
কিন্তু ছেলের মতি-গতি তাঁর ভালো লাগতো না কোনও দিনই। বাপের কথা ছেলে অমান্য করতো না বটে, কিন্তু তেমন মান্যও ঠিক করতো না যেন। যেন কাজ-কর্ম না করতে হলেই সে বেঁচে যেত।
কীর্তিপদবাবু জামাইকে বলতেন—এখন থেকে তোমার ছেলেকে সব কিছু বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিচ্ছ তো বাবাজী?
জামাই বলতো—আমি তো বুঝিয়েই দিতে চাই, কিন্তু তার তো এসব দিকে একেবারেই মন নেই—
শ্বশুর বলতেন—এ-বয়সে মন তো থাকবেই না, আমারও ছিল না। আমার বাবা আমাকে কত বুঝিয়েছেন, তখন ওসব ভালো লাগতো না, কিন্তু পরে তাই নিয়েই তো মেতে আছি। এখন ও ছাড়া আর কিছু বুঝিই না—
কিন্তু আজ মনে হলো এবার আর দেরি নয়। যে ছেলে বিয়ের দিনে এই কাণ্ড করতে পারে সে বড় সাধারণ ছেলে নয়। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে জীবন ছেলেখেলার জিনিস নয়। শুধু লেখাপড়া আর আড্ডা দিয়ে বেড়ালে আর যাই চলুক সংসার চলে না। সংসার মানে দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া।
চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে একটা তক্তপোশ পাতা ছিল। তার ওপরে মাদুর পাতা। মাদুরের ওপর সামনের দিকে একটা কাঠের ক্যাশবাক্স। চৌধুরী মশাই সেই ক্যাশবাক্সের পেছনে গিয়ে বসলেন। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—বোস—
সদানন্দ বসলো না। তেমনি আড়ষ্ট হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো।
—কই, বসলে না যে! বোস! তোমার কানে কি কথা যাচ্ছে না?
সদানন্দ এবার তক্তাপোশের ওপরেই পা ঝুলিয়ে বসলো।
কাল রাত্রেই চৌধুরী মশাই কথাগুলো ভেবে রেখেছিলেন। সেই রাত তিনটের সময়। গৃহিণী যখন বউমার ঘরে চলে গিয়েছিল। অনেক ভেবে-চিন্তে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অবশ্য বিয়ে তিনিও একদিন করেছিলেন। জীবনে বিয়ে করার কী মর্ম তা তিনি জানেন। মর্মও যেমন জানেন তেমনি তার সঙ্গে দায়িত্বের কথাটাও তিনি কখনও হালকা করে দেখেননি। কর্তাবাবুর মত তিনিও একদিন বুড়ো হয়ে যাবেন। তখন হয়ত ঠিক তাঁরই মত পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবেন। তখন এই খোকাই এসে এই চণ্ডীমণ্ডপে বসে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু যে ফুলশয্যার রাতে এইরকম কাণ্ড করতে পারে তার ওপর কতটা নির্ভর করা যায়।
হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে আসল প্রশ্নটা বেরোল। বললেন—কোথায় ছিলে সমস্ত রাত?
সদানন্দও জবাব দিতে দেরি করলে না। বললে—বাইরে—
চৌধুরী মশাই থমকে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বাইরে মানে?
সদানন্দ বললে—বাইরে-মানে বাইরে। আমি বাড়িতে ছিলুম না সারারাত—
আরো অবাক হয়ে গেলেন চৌধুরী মশাই। তাঁর মুখের সামনে এমন করে তো কখনও আগে কথা বলেনি খোকা! হঠাৎ এত সাহস পেলে সে কোথা থেকে?
বললেন—তুমি জানো যে বাড়ির বাইরে থাকা এ-বাড়ির নিয়ম নয়! আর শুধু এ-বাড়ি কেন, কোন বাড়িতেই নিয়ম নেই বাড়ির ছেলে রাত্রে বাইরে রাত কাটাবে। কাটালে নিন্দে হয়, দশজনে দশ কথা বলে—
সদানন্দ উঠে দাঁড়ালো। বললে—আপনি কি আমাকে এই কথা বলতেই এখানে ডেকে এনেছেন?

সদানন্দর হাব-ভাব দেখে চৌধুরী মশাই তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলেন ছেলের দিকে। খানিক পরে বললেন—কেন, তোমাকে এখানে ডেকে এনে এই কথা বলা কি আমার অন্যায় হয়েছে?

সদানন্দ বললে—ন্যায়-অন্যায়ের কথা আপনারা তুলবেন না। কাকে ন্যায় বলে আর কাকে অন্যায় বলে তা আমি ভালো করেই জানি। আমি কি এখন যেতে পারি?

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন, বোস না—

সদানন্দ বললে—না, আমি এখানে বসবো না। যা শোনবার আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পারবো—

চৌধুরী মশাই বললেন—তাহলে বলো তুমি কেন এ-রকম করলে? বউমা তোমার কাছে কী অপরাধ করেছে? আর আমি আর তোমার মা, আমরাই বা তোমার কাছে কী অপরাধ করলুম যে দশের কাছে তুমি আমাদের বে-ইজ্জত করতে চাও! আমাদের বংশমর্যাদা, কোনও কিছুর কথাই কি তুমি ভাববে না?

সদানন্দ কথা না বলে চুপ করে রইল।

—কথা বলছো না যে, একটা কিছু জবাব দাও—

তবু সদানন্দ কিছু কথা বললে না। তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার চৌধুরী মশাই উঠলেন। উঠে সদানন্দর কাছে এলেন। তারপর বললেন—চলো, ভেতর-বাড়িতে তোমার মার কাছে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

বলে সদানন্দকে হাতে ধরে চণ্ডীমণ্ডপের বাইরে নিয়ে এলেন। বাইরে তখন বেশ স্পষ্ট সকাল হয়েছে। বিয়েবাড়ির লোকজন তখন এক-এক করে জেগে উঠেছে। তাদের সকলের দৃষ্টির সামনে দিয়ে একবারে সোজা তাকে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেখানে মেয়েদের আনাগোনা। তখন তারাও উঠেছে ঘুম থেকে। চারদিক অগোছালো। চৌধুরী মশাই-এর পেছন-পেছন সদানন্দ যাচ্ছিল। অনেকেই ছোট-বাবুকে দেখে ঘোমটা টেনে সামনে থেকে সরে গেল।

রাত্রে ভাল করে ঘুম হয়নি, তাই প্রীতি ভোরবেলাতেই তৈরি হয়ে নিয়েছিল। রাত তিনটের সময় সবেমাত্র একটু দু'চোখ জুড়ে এসেছিল এমন সময় ওই দুর্যোগ। মনটাও বিষিয়ে ছিল তার পর থেকে। নতুন-বউএর কাছে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা হচ্ছিল তার। ছেলে ফুলশয্যার রাতে বউ-এর সঙ্গে একঘরে শোয়নি, এ লজ্জা যেন ছেলেরও নয় বউ-এরও নয়, এ লজ্জা যেন শাশুড়ীরই নিজের। অথচ এমন এক ঘটনা যা বাইরের লোককে বলাও যাবে না। যা বলে কারোর কাছ থেকে সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না। নিজের মনে মনে জিনিসটাকে পুষে রেখে তুষের আগুনে জ্বলতে হবে।

হঠাৎ কর্তাকে সেই অসময়ে ঘরে আসতে দেখে প্রীতি অবাক হয়ে গেল। বললে—কী হলো, খোকার খোঁজ পেয়েছ?

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখলে, পেছনে খোকাও রয়েছে।

চৌধুরী মশাই সদানন্দকে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলেন।

বললেন—এই তো খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম তোমার কাছে—

সদানন্দ তখন অপরাধীর মত মা'র সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

চৌধুরী মশাই বললেন—আমি ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছি, তবু কোনও কথার জবাব দিচ্ছে না, দেখ, তুমি যদি কিছু কথা আদায় করতে পারো—

প্রীতি ছেলের মুখের দিকে সোজাসুজি চোখ রেখে বললে—হ্যাঁ রে খোকা, কোথায় ছিলি তুই সারারাত?

চৌধুরী মশাই বললেন—আমি ওকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছি। সমস্ত রাত বাইরে-বাইরে কাটালো, অথচ নতুন বউমা, সে বেচারি নতুন জায়গায় ভয়ে কেঁপে অস্থির—সে কী দোষ করলে?

প্রীতি ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চাইলে। বললে—কী হয়েছিল তোর বল্ তো বাবা? বউমাকে পছন্দ হয়নি? আমাকে সত্যি করে মন খুলে বল্, কী হয়েছিল তোর, বল্ কী হয়েছিল তোর? আমি কাউকে কিছু বলবো না। আমাদের কাছে বলতে তোর কীসের আপত্তি? আমাকে তো তুই আগে সব বলতিস, এখন তোর কী হলো যে আমাকে একবারও কিছু বললি না—না আমি তোর পর? তুই কি আমাদের পর মনে করিস?

সদানন্দ তখনও চুপ।

চৌধুরী মশাই বলতে লাগলেন—গায়ে-হলুদের সময় তুই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলি, ভাবলুম বিয়ের পর সব মিটে-টিটে যাবে। তারপর থানা-পুলিস কত কী হলো। তাও তো একরকম করে সব মিটলো, এখন পরের মেয়ে এ-বাড়িতে এসেছে, সে বেচারি কী ভাবছে বল্ দিকিনি—

মা ছেলের দিকে চেয়ে বললে—কী রে, কথা বলছিস নে যে? বাড়িত এখন এত লোকজন এসেছে, এদের কানে যদি কথাটা যায় তো তারাই বা কী ভাববে বল্ দিকিনি!

এতক্ষণে সদানন্দর মুখ দিয়ে কথা বেরোল।

বললে—মা...

কিন্তু কথা বলতে গিয়েও যেন সব কথা তার মুখের মধ্যে আটকে গেল।

মা বললে—কী রে, কী বলছিলি বল্, থামলি কেন?

সদানন্দ এবার মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ বাইরে থেকে কৈলাস গোমস্তার গলা শোনা গেল—ছোটবাবু—

গৃহিণী বললে—ওই, গোমস্তা মশাই তোমাকে ডাকছে, যাও—

কিন্তু এই অবস্থায় চৌধুরী মশাই-এর ঘর থেকে চলে যাবার ইচ্ছে ছিল না।

চৌধুরী মশাই দরজা খুলে বাইরে আসতেই গোমস্তা মশাই বললে—রেলবাজার থেকে প্রাণকৃষ্ণ সা মশাই এসেছেন—

প্রাণকৃষ্ণ সা! প্রাণকৃষ্ণ সা রেলবাজারের আড়তদার মানুষ। মহাজনও বটে। টাকার দরকার হলে চৌধুরী মশাইকে ওই প্রাণকৃষ্ণ সা'র কাছেই হাত পাততে হয়।

জিজ্ঞেস করলেন—তা তিনি এই অসময়ে কেন?

কৈলাস বললে— কাল সন্ধেবেলা বউভাতে আসতে পারেননি, এখন এসেছেন, বউমার মুখ দেখবেন।

চৌধুরী মশাই বিরক্ত হলেন মনে মনে। ঘরের ভেতর ঢুকে গৃহিণীকে বললেন—দেখেছ আক্কেলখানা! এই অসময়ে প্রাণকেষ্ট সা এসে হাজির, নতুন বউ-এর মুখ দেখবে! মুখ দেখবার আর সময় পেলে না! এখন কী করি বলো দিকিনি!

গৃহিণী বললেন—তা এসেছেন যখন তখন তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু একটু বসতে বলো গে। বউমা এখন ঘুমোচ্ছে, বউমা উঠবে, উঠে মুখ হাত ধোবে, তারপর সাজিয়ে-গুছিয়ে তবে বউ দেখাবো—তার আগে নয়—

চৌধুরী মশাই বিরক্ত হলেন। নিজের মনেই বললেন—আড়তদার মানুষ তো, তাই আক্কেলের মাথা খেয়ে বসে আছে একেবারে। সাত-সকালে বউ দেখতে চাইলেই অমনি দেখানো যায়! এখনও কারো বাসি কাপড় ছাড়া হয়নি—

আবার বাইরে এসে কৈলাসকে বললেন—সা মশাইকে বসিয়েছো তো!

—আজ্ঞে, তিনি তো কর্তাবাবুর কাছে বসে আছেন। কর্তাবাবুই আপনাকে ডাকতে পাঠালেন।

চৌধুরী মশাই বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি—তুমি যাও—

সেখানেও কিছু লোকজন বসে আছে। তারা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আসে। হুকুম নেয় ছোটবাবুর কাছে। কোথায় কোন্ জমিতে লাঙল দিতে হবে, কোন্ জমির সর্ষে কাটতে হবে; কোন্ ক্ষেতের বেড়া বাঁধতে হবে—সব নির্দেশ ছোটবাবু সকালবেলাই দিয়ে দেন। তারপর আছে মজুরি দেওয়ার কাজ। রোজকার মজুরিটা ছোটবাবু রোজই দিয়ে দেন। ওটা পড়ে থাকে না। তার ওপর আছে উকিল-মুহুরি-মোক্তারের আনাগোনা।

ওপরে কর্তাবাবুর ঘরে তখন প্রাণকৃষ্ণ সা মশাই বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। নাতির বিয়েটা দিয়ে দিয়েছেন বলে খুব বাহবা দিচ্ছে কর্তাবাবুকে। বলছে—খুব ভাল কাজ করলেন কর্তাবাবু, একটা কাজের মত কাজ করে গেলেন—

কর্তাবাবু বললেন—আমার তো এই একটা কাজই বাকি ছিল, এবার রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেল, এখন যেতে পারলেই হয়—

প্রাণকৃষ্ণ সা বললে—ও-কথা বলবেন না কর্তাবাবু, নাতির তো এই সবে বিয়ে হলো, এখন তার ছেলে হোক, অন্নপ্রাশন হোক, আমরা পাত পেড়ে ভোজ খাই, তবে তো....

প্রাণকৃষ্ণ সা'র সঙ্গে কর্তাবাবুর পুরোন সম্পর্ক। সম্পর্কটা লেনদেনের হলেও কালক্রমে সেটা বন্ধুত্বের বন্ধনে নিবিড় হয়েছে। তাকে চৌধুরী-বংশ সহজে অস্বীকার করতে পারে না। তাই তার অত্যাচারও সহ্য করতে হয় এদের মুখ বুঁজে।

ততক্ষণে চৌধুরী মশাই এসে গেলেন।

বললেন—আপনি কাল আসেননি, তাই খুব ভাবছিলুম—

প্রাণকৃষ্ণ সা বললে—তা শুভ কাজ নির্বিঘ্নে মিটে গেছে তো, তাহলেই হলো বাবাজী....

কর্তাবাবুও তাই বললেন। বললেন—হ্যাঁ, আমার বড় উদ্বেগ ছিল সা মশাই। আমার নাতি যেমন বেয়াড়া, ভেবেছিলুম একটা কাণ্ড না আবার বাধিয়ে বসে। আজকালকার ছেলে-ছোকরা তো আর আমাদের মত নয়, এরা সব অন্য রকম!

চৌধুরী মশাই কথার মাঝখানে বললেন—আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু, বউমা আমার সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তো, একটু মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নেবেন—

প্রাণকৃষ্ণ সা মশাই বললে—না, না, তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না, আমার তাড়া নেই, আমি ততক্ষণ গল্প করছি—

কিন্তু ওদিকে সদানন্দ তখনও মার সামনে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মা বললে—কই, বল কী হয়েছে তোর, বল—

সদানন্দ এতক্ষণে আবার কথা বলে উঠলো। বললে—কেন তুমি বার-বার এক কথা জিজ্ঞেস করছো, বলো তো?

মা বললে—তা তুই কেন বউমার কাছে শুবি নে তা বলবি তো?

সদানন্দ বললে—আমি তো বলেছি—

—কী বলেছিস?

—আমি তো বলেছি তুমি বার বার ও-কথা জিজ্ঞেস কোরনা আমাকে। আমি বলবো না।

মা বললে—তা আমাকে না বলিস, তুই বউমাকে বল্! বউমার সঙ্গে তুই একবার কথা বল্ গিয়ে। সে বেচারি কাল রাত তিনটের সময় ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে এসেছে, আমি গিয়ে তখন তার পাশে শুই, তবে বেচারি একটু ঘুমোতে পারে। জানিস আমাকে জড়িয়ে

ধরে কী কাঁদাটা সে কেঁদেছে! তাকে আমি কী বোঝাই বল তো? বল, তাকে আমি কী বলে বোঝাবো?

—তুমি কী বোঝাবে তা আমি কী করে জানবো?

—তুই যদি তা না জানবি তো ঘর থেকে পালিয়ে গেলি কেন? বউমা তোর কাছে কী দোষ করলো?

সদানন্দ বললে—তা আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলুম আমি বিয়ে করবো না!

মা বলে উঠলো—তা বিয়ে করবিই বা না কেন? বিয়ে কে না করে শুনি?

সদানন্দ বললে—তুমি সব কথা জানো না মা। তুমি যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

মা এবার ছেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ সোজাসুজি চেয়ে রইল। যেন কী একটা আতঙ্ক জেগে উঠলো মনে। বললে—তুই তাহলে কি কোনও দিনই বউমার কাছে শুবি নে নাকি?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে পরের মেয়েকে বাড়িতে এনে তুই এত কষ্ট দিবি?

—তা সেজন্যে তো আমি দায়ী নই।

—কিন্তু সে বেচারি তাহলে এখানে কী করবে? সে এমন কী পাপ করলে যে তাকে তুই এমন শাস্তি দিবি? তোর ধর্ম বলেও কি কিছু নেই? দয়া মায়া ভগবান—কিছুই তুই মানবি নে? তুই তার দিকটা একটু ভেবে দেখবি নে? তার কথা না ভাবলেও আমাদের কথাও কি তুই একবার ভাববি নে? আমরাই বা লোকের কাছে কুটুমদের কাছে মুখ দেখাবো কী করে? চিরকাল তো আর একথা চাপা থাকবে না, একদিন-না-একদিন তো এ দশ-কান হবেই, তখন?

সদানন্দ বলে উঠলো—তা এসব কথা তোমরা আগে ভাবোনি কেন? যখন কালীগঞ্জের বউকে দাদু টাকা দিলে না, তখন এসব কথা কেন একবার ভাবলে না? যখন দাদু তাকে খুন করে মারলে তখনও তো কেউ একটা কথা পর্যন্ত বললে না তোমরা!

মা ছেলেকে চুপ করিয়ে দিলে। বললে—তুই আস্তে কথা বল বাবা, একটু আস্তে, বাইরের সবাই শুনতে পাবে—

সদানন্দ আরো চেঁচিয়ে উঠলো—কেন, চুপ করে থাকলেই কি চিরকাল সব চাপা থাকবে তুমি বলতে চাও?

মা বললে—তোর দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চল্, আমার সঙ্গে চল্, বউমার কাছে গিয়ে তুই এই কথাগুলো বলবি চল্!

সদানন্দ বললে—কেন, বউমার কাছে আমি যাবো কেন? তোমরা তাকে বউ করে নিয়ে এসেছ, তোমরাই তার সঙ্গে ঘর করো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ওর মধ্যে টেনো না—

—পাগলামি করিস নে, আয় আমার সঙ্গে আয়—

বলে ছেলেকে হাত ধরে টানতে লাগলো প্রীতি।

সদানন্দ জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে। বললে—তুমি কি আমাকে এতদিনেও চিনলে না? ভেবেছ তুমি হাত ধরে টানলেই আমি যাবো? আমি ছেলেমানুষ?

—তা তুই না যাস আমি বরং বউমাকে ডেকে তোর কাছে নিয়ে আসছি, তার কাছেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাক।

সদানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই মা খপ্ করে তার হাতখানা ধরে ফেললে। বললে—কোথায় যাচ্ছিস?

সদানন্দ বললে—কোথায় যাচ্ছি তার কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই—

মা বললে—তা আমাকে যদি না-ই বলিস তো বউমাকে বলে যা! বউমাকে বলে যা কেন তুই তার ঘরে থাকবি না! আমার দায়িত্বটা অন্তত কাটুক। আমি অন্তত মুক্তি পাই। তোরা দু'জনে নিজেদের মধ্যে যা ইচ্ছে বোঝাপড়া করে নে, আমি কেন মাঝখানে থেকে পাপের ভাগী হই?

সদানন্দ এ কথার কোনও উত্তর দিলে না।

মা এবার ছেলের আরো কাছে সরে এলো। বললে—কে কী দোষ করলো, তার জন্যে হেনস্তা হবে আমার আর ওই এক ফোঁটা দুধের মেয়ের? এই-ই কি তোর বিধান?

সদানন্দ বললে—তুমি বড় বড় কথা বোল না মা, ও-সব বড় বড় কথায় আমি ভুলবো না, তা জেনে রেখো। আমি যা করবো তা আমি ঠিক করেই রেখেছি—

—কী ঠিক করে রেখেছিস?

—কী ঠিক করেছি তা তুমি দেখতেই পাবে। আমাকে আর জিজ্ঞেস কোর না।

মা বললে—তাহলে তুই কোনও দিনই বউমার ঘরে শুবি নে?

সদানন্দ চুপ করে রইল।

মা আবার জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, উত্তর দিচ্ছিস নে যে? কথা বল, জবাব দে—

সদানন্দর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি ডান হাত দিয়ে সেটা মুছে নিতে যাচ্ছিল, মা সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ধরে ফেলেছে।

বললে—তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস? ভেবেছিস আমার কাছে মনের কথা লুকিয়ে তুই পার পাবি? তাহলে কেন আমি তোর মা হয়েছিলুম? কেন আমি তোকে দশমাস দশ দিন পেটে ধরেছিলুম? তোর জেদটাই বড় হবে রে, আর আমি কেউ নই? আমার কথার কোনও দাম নেই তোর কাছে? এই-ই তোর বিচার?

সদানন্দ মার কথা শুনতে শুনতে আর থাকতে পারলে না। দেখলে মার চোখ দিয়েও জল পড়ছে। সদানন্দ মার দিকে চেয়ে বললে—মা....

মা বলে উঠলো—না, আমি তোর মা নই। আজ থেকে আমি তোর কেউ নই, আমাকে তুই এখন থেকে আর মা বলে ডাকিস নে—যা—

বলে প্রীতি এক-পা পিছিয়ে গেল। সদানন্দ মার দিকে এগিয়ে গেল। বললে—মা—

প্রীতি বললে—না, আমাকে তুই মা বলে আর ডাকিস নে, আমার ঘর থেকে তুই বেরিয়ে যা। আমি আর তোর মুখ দেখতে চাই নে—যা, বেরিয়ে যা—

সদানন্দ তবু মা'র দিকে এগিয়ে গেল। বললে—মা, তুমি আমার ওপর রাগ কোর না, আমার কথা শোন—

—তোর কোনও কথা শুনতে চাই নে, তুই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা—

এবার সদানন্দ মা'র সামনে গিয়ে মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। বললে—মা, তুমি আমার কথা শোন মা, আমার কথাগুলো শোন—

মা ছেলের হাত দুটো ধরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললে—না, তুই চলে যা আমার সামনে থেকে, চলে যা—আমি তোর মুখ দেখতে চাই নে—

সদানন্দ বললে—না না, তুমি আমার ওপর রাগ কোর না, তুমি আমার দিকটা মোটে ভেবে দেখছ না। শুধু তোমাদের দিকটাই দেখছো। কিন্তু আমি কী করবো বলো তো, আমি কী করবো তুমি বলে দাও, আমি যে আর পারছি না—

মা বললে—কেন, কী হয়েছে তোর?

সদানন্দ বললে—কী হয়নি আমার, তাই আমাকে জিজ্ঞেস করো! আমি তোমাদের এই পাপের সংসারে কী করে থাকবো! কী করে তোমাদের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলবো তাই শুধু আমি ভাবছি। আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে মা, সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছো না?

—কেন? কীসের জন্যে তোর বুক ফেটে যাচ্ছে?

সদানন্দ বললে—তুমি তো বাড়ির ভেতরে থাকো, তুমি সেসব কথা জানবে কী করে? কপিল পায়রাপোড়াকে জানো? মানিক ঘোষকে জানো? ফটিক প্রামাণিক? কত লোকের নাম জানো তুমি? তারপরে এই কালীগঞ্জের বউ? মা, তুমি কেবল আমার নামেই দোষ দিতে পারো, আর কই, এতকাল ধরে যে এ বাড়িতে এত অন্যায় চলে আসছে, তার বিরুদ্ধে তো তোমরা কিছুই বলোনি?

মা বললে—তা ওসব কথা নিয়ে তুই অত মাথা ঘামাস কেন? ওসব নিয়ে তোর ভাববার দরকারই বা কী? ওসব ব্যাপারে তুই কানে তুলো দিয়ে রাখলেই পারিস—

সদানন্দ বললে—তা আমি যদি মাথা না ঘামাই তো ওরা কি এমনি করেই মরে যাবে? কেউ ওদের দেখবে না?

বাইরে থেকে ডাক এল হঠাৎ—ও বউদি, বউদি—

মা বললে—ওই তোর গৌরী পিসী ডাকছে। আমি যাই, কাজের বাড়ি, তোর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে আমার কথা বলবার কি সময় আছে! যাই, আমি বাইরে যাই—

বলে একটু থেমে ছেলের দিকে চেয়ে বললে—তাহলে এবার থেকে আমার কথা শুনবি তো?

কিন্তু বাইরে থেকে আবার দরজা ঠেলার শব্দ—ও বউদি, বউদি—

প্রীতি দরজা খুলে দিতেই গৌরী পিসী বললে—কী করছিলে বউদি ঘরের ভেতর? তারপর সদানন্দকে দেখে আর কিছু বললে না। সদানন্দ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সদানন্দ চলে যেতেই গৌরী বললে—খবর শুনেছ?

—কী খবর?

গৌরী গলা নিচু করে বললে—বউমার বাপের বাড়ি থেকে লোক এসেছে—

—কেন? এই তো কাল বিকেলেই ফুলশয্যের তত্ত্ব নিয়ে লোক এসেছিল। এই সাত-সকালে আবার কী হলো?

গৌরী বললে—সব্বনাশ হয়েছে বউদি, খারাপ খবর নিয়ে এসেছে কেষ্টনগরের লোক—

—কী খারাপ খবর?

—বউমার মা'র নাকি খুব অসুখ।

—অসুখ? বউমাকে নিতে এসেছে নাকি? দেখ দিকিনি, কী কাণ্ড! তুই ওঘরে গিয়ে দেখেছিলি? বউমা কী করছে?

গৌরী বললে—আমি এ খবর দিতে পারবো না বাপু বউমাকে। তুমি দাও গে—

প্রীতি বললে—তা ছোট মশাই কোথায়? ছোট মশাই জানে?

—ছোট মশাই-এর কাছে তো বউমার বাপের বাড়ির লোক চিঠি নিয়ে দিয়েছে। বউমার বাপ নাকি চিঠিতে সব কথা লিখেছে—

প্রীতির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। সারারাত এত কাণ্ডের পর প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই এসে হাজির হয়েছে বউ দেখবে বলে। তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এতক্ষণ। এরপর বউমাকে মুখ-হাত পা ধুইয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে সা' মশাইকে দেখাতে হবে। এরই মধ্যে আবার বেয়ানের কিনা অসুখ! অসুখের কি সময় অসময় নেই গো? আর অসুখই যদি হলো তো এখনি সে খবর পাঠাতে হয়! একদিন পরে খবর পাঠালে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? এই সবে ফুলশয্যের রাত কাটলো, এখনও বাসি মুখে জল পড়েনি, এর মধ্যে খবরটাই বা

বউমাকে দেওয়া যায় কী করে? হয়ত কেঁদে-কেটে এক্সা করবে!

—আচ্ছা তুই যা, আমি দেখছি—

বলে সোজা বউমার ঘরে গেল। বাইরে থেকে যেমন দরজা ভেজিয়ে রেখে দিয়েছিল, তখনও ঠিক তেমনি ভেজানোই রয়েছে।

প্রীতি আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলে। উঁকি দিয়ে দেখলে বউ বিছানার ওপর শুয়ে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। মনে হলো বোধ হয় জেগেই আছে।

আস্তে আস্তে প্রীতি ভেতরে ঢুকলো। তারপর বিছানার কাছে গিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে বউমা সত্যিই জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে।

বোধ হয় প্রীতির পায়ের আওয়াজ নয়নতারার কানে গিয়েছিল। নয়নতারা মাথা তুলে দেখতেই প্রীতি বললে—তুমি জেগে আছ বউমা?

শাশুড়ীর কথার উত্তরে নয়নতারা ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—হ্যাঁ—

—একটুও ঘুম হয়নি? তোমাকে ঘুম পাড়িয়েই তো গেলাম। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলে না কেন?

নয়নতারা কোনও উত্তর দিলে না।

প্রীতি বললে—ঠিক আছে বউমা, তুমি একটু বোস, কিছু ভেবো না। আমি এখুনি আসছি। তোমার চা খাওয়া অভ্যেস আছে তো? তুমি চা খাও?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ—

তাহলে আমি চা তৈরি করে নিয়ে আসছি। তারপর একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি কালকে আসতে পারেননি, আজকে ভোর থেকে এসে বসে আছেন। তোমার মুখ দেখে আশীর্বাদ করেই চলে যাবেন। তার আগে তোমাকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে—

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি একটু অপেক্ষা করো বউমা আমি এখ্‌খুনি আসছি, আমি যাবো আর আসবো—

বলে প্রীতি বাইরে চলে গেল। যাবার আগে দরজার পাল্লা দু'টো ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার পথে আবার চৌধুরী মশাই-এর সঙ্গে দেখা। চৌধুরী মশাই হন-হন করে আসছিলেন। গৃহিণীকে দেখেই বললেন—ওগো শুনছো, কোথায় ছিলে তুমি?

গৃহিণী বললে—বউমার কাছে, কেন?

—বউমা কেমন আছেন এখন?

—থাকা-থাকি আর কী! সারারাতই ঘুমোয়নি। না-ঘুমিয়ে চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে রয়েছে। বউমার জন্যে চা তৈরি করতে আসছি। তা শুনছি নাকি বউমার মায়ের খুব অসুখ? বউমার বাপের বাড়ি থেকে নাকি লোক এসেছে—বেয়াই মশাই-এর চিঠি নিয়ে? বেয়ানের নাকি অসুখ?

—তোমায় কে বললে?

—গৌরী। তা অসুখের খবরটা কি আজকেই না-পাঠালে হতো না?

চৌধুরী মশাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। গলাটা নিচু করে বললেন—তোমাকে চুপি চুপি বলি। কাউকে যেন এখন বোল না। এই দেখ, বেয়াই মশাই এই চিঠি দিয়েছেন। খুবই দুঃখের খবর। বউমার মায়ের অসুখ নয়, ওটা আমি গৌরীকে ঘুরিয়ে বলেছি। আসলে বউমার মা কাল মারা গেছেন—

—অ্যাঁ?

প্রীতির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। বললে—বলছো কী তুমি? কখন মারা গেলেন? কী হয়েছিল? কালও তো কিছু বলেনি ওদের লোকেরা!

এ বাড়ির যে গৃহিণী তারই যেন সব দায়, নতুন বউ বাড়িতে এলে গৃহিণীর দায়িত্ব কোথায় কমবে, তা নয়। যেন আরো বেড়ে গেল। একে ক'দিন থেকেই ঝঞ্ঝাট চলেছে, তার ওপর আছে ছেলের বেয়াড়াপনা। এখন বউকে সামলাবে, না ছেলেকে সামলাবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির। তার ওপর আবার এই নতুন ঝঞ্ঝাট। মাথার ঠিক রাখাই দায় হয়ে পড়েছিল প্রীতির।

প্রীতি বললে—এখন কী করি তাহলে আমি? বউমাকে কথাটা বলি কী করে? খবরটা শুনে তো বউমা একেবারে কেঁদে ভাসাবে। তখন আমি সামলাবো কী করে?

চৌধুরী মশাই বললেন—আমিও তো তাই ভাবছি। কী যে করি আর কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করি তাও বুঝতে পারছি না—

—তা বেয়াই-বাড়ির লোক কী বলছে?

—ওরা আর কী বলবে? ওরা তো আমাদের খবর দিতে এসেছে। বেয়াই মশাই নিজেও কিছু ঠিক করতে পারেন নি, ওদিকে লোকজন সবাই শ্মশানে গেছে, আর এদেরও পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। এখন যা করার হয় আমরা করবো।

বলে চৌধুরী মশাই কিছু সমাধান বার করতে না পেরে দু'হাতে মাথার চুল-গুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। যেন মাথার চুলগুলোই সমস্যা সমাধানের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু অত কথা শোনবার বা ভাববারও সময় তখন কারো ছিল না। না প্রীতির না চৌধুরী মশাইয়ের। চৌধুরী মশাই বললেন—ওদিকে আবার প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই বসে আছে, বউমা তৈরি আছে তো?

প্রীতি রেগে গেল—কী করে তৈরি থাকবে? যখন-তখন ওমনি বউ দেখতে এলেই হলো? মানুষের শরীর-গতিক বলে একটা জিনিস নেই?

চৌধুরী মশাই বললেন—না না, আমি তা বলছি না। তাঁকে তো আমি বসিয়েই রেখেছি।

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, তিনি বসে থাকুন। যখন বউমা তৈরি হবে তখন দেখাবো, তার আগে নয়। আর আমারও তো শরীর-গতিক আছে! সারারাত তো আমিও ঘুমোতে পারিনি। আমার মাথা টলছে, আমিও আর কিছু ভাবতে পারছি না—

বলে গৃহিণী তার নিজের কাজে চলে গেল।

চৌধুরী মশাই খানিকক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনিও বারবাড়ির দিকে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগলেন।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সেদিন সমস্ত বাড়িটার মধ্যে সৃষ্টি হলো। কেউ জানলো না কোথায় সংসারের কোন্ কোণে একট ফাটল ধরেছে। সবাই উৎসবের আনন্দে উন্মত্ত। যারা নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে তারা খাওয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যারা বউ-এর মুখ দেখে গেছে তারাও বউ-এর রূপের প্রশংসায় মুখর। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের আর বিলাসের জাঁকজমকের ঝলমলানিই তারা দেখলে। তার অন্তরের দুর্যোগের দুর্দশাটির চেহারা তারা উপলব্ধি করতে পারলে না। ওটা

চাপা থাক, ওটাকে পুলটিশ দিয়ে ঢেকে রাখো। তোমার বাইরের ঐশ্বর্যটাই তাদের কাছে সত্যি হোক, কেউ যেন তার দারিদ্র্যটা না দেখতে পায়। ওটা দেখতে পেলে তোমার সম্মান সমৃদ্ধি আর সম্পদের সৌধটা ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে। তাহলে কেউ আর তোমায় সেলাম করবে না, কেউ তোমাকে হিংসেও করবে না। অথচ সংসারে তোমাকে কেউ হিংসে না করলে তোমার মাথাই বা উঁচু থাকবে কী করে? তুমি যে তাহলে সাধারণ হয়ে যাবে। একেবারে সাধারণ। আর সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকা মানেই তো নিচু হওয়া। অর্থাৎ অন্য সবাইয়ের সমান হওয়া, সকলের সঙ্গে একাকার হওয়া।

যখন উৎসবের বাড়িতে আবার সবাই আগেকার বউভাতের জের টেনে সকালবেলা থেকেই খুশির হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যখন সবাই বাসি লুচি-বেগুনভাজার ভোজে বেসামাল, বাড়ির গিন্নির তখন মেজাজ সপ্তমে চড়ে উঠেছে। অথচ কাল রাত্রেও এমন ছিল না। বাড়ির গৃহিণী তখন শান্তিপুরের চওড়া জরির পাড়ওয়ালা শাড়ি পরে সবাইকে অভ্যর্থনা করছে! কিন্তু আজ তারই আবার তখন অন্য চেহারা, অন্য মেজাজ। গৌরী পিসী কী একটা আর্জি জানাতে এসে বকুনি খেয়ে ফিরে গেল।

প্রীতি বলে উঠলো—আমার একটা তো মাথা, আমি কোন্ দিক সামলাবো শুনি! না খেল তো বয়ে গেল! দরকার নেই কারো খেয়ে। আমার নতুন-বউয়ের মুখে এখনও জল পড়েনি, আগে আমি তাই ভাববো না তোদের কথা ভাববো!

গৌরী পিসী বললে—আমি তো সে-কথা বলিনি বউদি। বলছি রাঁধুনী-বামুনরা জিজ্ঞেস করছে কত ময়দা মাখব—

প্রীতি ঝাঁঝিয়ে উঠলো—কত ময়দা মাখবে তা আমি এত আগে থেকে কী করে বলবো, আমি কি গুনতে জানি যে আগে গুনে বলবো আমার এতজন বাড়িতে খাবে...

এর পরে আর কথা চলে না। কিন্তু শুধু এই-ই শেষ নয়, সামান্য-সামান্য ব্যাপারেই সকাল থেকে বাড়ির গিন্নীর মেজাজটা সকলের নজরে পড়লো।

প্রকাশ মামা এসেই বললে—দিদি, শুনলুম বউমাকে নাকি বাপের বাড়ি পাঠানো হচ্ছে?

দিদি বললে—কেন, কে তোকে বললে?

—তুমি কথাটা সত্যি কি না তাই বলো না! কথা নেই বার্তা নেই ওমনি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হলো? এখনও তো আট দিনও কাটলো না!

প্রীতি বললে—কিন্তু এ-সব কথা কে বললে তোকে?

—কে আবার বলবে, বলেছে জামাইবাবু!

—তা যে বলেছে তাকেই জিজ্ঞেস করগে কেন বউমাকে পাঠানো হচ্ছে।

প্রকাশ মামা বললে—তা হলে যা শুনছি তা সত্যি!

প্রীতি বললে—সত্যি-মিথ্যে আমি জানি নে। আমার অত জানবার সময় নেই বাপু—

বলে আবার তার নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু প্রকাশ মামা ব্যাপারটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। আসলে চুপ করে বসে থাকা তার স্বভাবেই নেই। আবার দৌড়ে গেল চৌধুরী মশাইয়ের কাছে। বললে—জামাইবাবু, দিদি তো কই কিছু বললে না—

চৌধুরী মশাই তখন নিজের ঝঞ্ঝাট নিয়েই ব্যস্ত। প্রকাশের কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন—কীসের কী?

—ওই যে আপনি বললেন বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে!

চৌধুরী মশাই চটে গেলেন। বললেন—তা বউমা একবার বাপের বাড়িও যাবে না? বিয়ে হয়েছে বলে কি একেবারে চিরকাল শ্বশুরবাড়িতেই বাঁধা হয়ে থাকবে?

বাপ-মার জন্যে একটু মন-কেমন করে না? ছেলেমানুষ বউ, বেশি তো বয়েস নয়—

—কিন্তু এখানে কিছুদিন তো অন্তত থাকবে। একটা হপ্তা থাকুক, আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন ফেরত পাঠাচ্ছেন?

চৌধুরী মশাইয়ের কেমন যেন সন্দেহ হলো। বললেন—তা বউমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন হে? বউমা কিছু বলেছে তোমাকে?

—বউমা? বউমা কেন বলতে যাবে! আপনি কী যে বলেন!

—তা হলে? তা হলে কে তার হয়ে তোমাকে ওকালতি করতে বললে? বলো, কে বললে?

প্রকাশ মামা আর কী বলবে! হঠাৎ বলে ফেললে—সদা! সদা বলছিল—

চৌধুরী মশাই অবাক। বললেন—সদা? সদা তোমাকে বলেছে?

প্রকাশ মামা বললে—হ্যাঁ—

—কী বলেছে সদা?

—বলছিল এরই মধ্যে কেন বাবা বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেই কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—জিজ্ঞেস করেছে তোমাকে?

প্রকাশ মামা বললে—তা জিজ্ঞেস করবে না। সবে কাল ফুলশয্যে হয়েছে। এখনও ভালো করে ভাব-ভালবাসা হয়নি, এরই মধ্যে কিনা আপনি বউমাকে কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন!

—সদা কোথায়? তাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো তো আমার কাছে!

প্রকাশ মামা সদাকে আনতে চলে গেল। আসলে খবরটা কেউই বলেনি প্রকাশ মামাকে। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরদের বলে চা তৈরি করিয়ে নিয়ে খেয়েছিল। পিসে মশাইকেও গিয়ে এক কাপ খাইয়ে এসেছিল। বিরাট বাড়ি। বারবাড়ি, ভেতর বাড়ি। বার-বাড়ির উঠোন, ভেতর-বাড়ির উঠোন। কাল বউভাতের রাত্রে সমস্ত বাড়িটা লোকজনে ভরে গিয়েছিল। তারপর কখন কে খেলে, কে না খেলে, সব তদারক করেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে পাহারা দিয়েছে সদাকে। যেন কোথাও পালিয়ে না যায় সে। তারপর যখন সব শেষ হলো তার আগেই শোবার ঘরে সদাকে ঢুকিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু তখন আর শরীর বইছে না তার। সবাই-ই ক্লান্ত। শেষকালে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দু-চোখ বুঁজতেই ঘুমিয়ে পড়েছে অঘোরে তারপর সকালবেলাই দীনুর সঙ্গে দেখা। তখন বেশ বেলা হয়েছে। চা খেয়ে চাঙ্গা হয়েছে শরীর।

প্রকাশ মামা দীনুকে জিজ্ঞেস করলে—কী খবর দীনু? কাল রাত্তিরে কেমন খেলে?

দীনুর তখন কথা বলবার সময় ছিল না। বললে—ভালো—

বলেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ মামা বললে—কী গো, অত সাততাড়াতাড়ি যাচ্ছো কোথায়? কর্তাবাবু উঠেছে নাকি?

দীনু যেতে যেতে বললে—না, কুটুমবাড়ির লোক এসেছে, তাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

—কুটুমবাড়ির লোক! কেষ্টনগর থেকে এসেছে? কালই তো ফুলশয্যের তত্ত্ব নিয়ে এসে খেয়ে-দেয়ে চলে গেল! আবার আজ সকালেই এসেছে? হঠাৎ এল কেন?

দীনু বললে—বউমাকে নিয়ে যেতে—

—সে কী? বউমাকে নিয়ে যাবে মানে?

আসলে দীনুও ভালো করে কিছুই জানতো না। কুটুমবাড়ির লোক যখন এসেছে তখন

বউমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছে! তা ছাড়া আর কী হতে পারে?

—কোথায় তারা? কোথায় কুটুম-বাড়ির লোক?

দীনু বললে—এই চণ্ডীমণ্ডপে বসে রয়েছে—

কিন্তু প্রকাশ মামা যখন চণ্ডীমণ্ডপে গেল তখন তারা চলে গেছে।

চৌধুরী মশাই প্রকাশকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কী দেখছো?

—আজ্ঞে শুনলুম কুটুম-বাড়ির লোক এসেছে বউমাকে নিয়ে যেতে। দীনু বলছিল। কোথায় গেল তারা?

চৌধুরী মশাই বললেন—তারা চলে গেছে—কেন, তোমার কী দরকার?

—তা বউমাকে নিয়ে যাবার কথা আছে নাকি শুনলুম?

চৌধুরী মশাই নিজের মনেই তখনও ভাবছিলেন। কিছুই সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি। এত বড় বিপর্যয়টা গেল, কেমন করে সমস্ত দিক সামলাবেন বুঝতে পারছিলেন না। সমস্ত জিনিসটাই যেন জটিল হয়ে আসছিল। এমনই ব্যাপার যে কাউকে বলাও যাবে না কিছু। ছেলে ফুলশয্যার রাত্রে বউয়ের ঘরে রাত কাটায়নি এও যেমন কাউকে বলার নয় তেমনি বউমার মায়ের মৃত্যুর খবরটাও এখন কাউকে বলা যাবে না। বউমার কানে যদি কোনও রকমে কথাটা ওঠে তো সে এক মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে যাবে তখনই।

প্রকাশ মামা তখনও জিজ্ঞেস করলে—তা বউমাকে আপনি সত্যি-সত্যিই পাঠিয়ে দেবেন নাকি?

চৌধুরী মশাই অন্যমনস্ক ভাবেই বলে ফেললেন—হ্যাঁ, তুমি এখন যাও, আমার কাজ আছে—

তখন থেকেই ছট্‌ফট করতে লাগলো প্রকাশ মামা। সদাকে খুঁজতে লাগলো। কোথাও নেই সে। ভেতর-বাড়িতে দিদির কাছে গিয়েও কোনও সুরাহা হলো না। যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, সদাকে দেখেছিস? সদা কোথায় গেল?

কেউই দেখেনি সদাকে। যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সে এই সময়ে কোথায় পালালো! পিসেমশাই-এর ঘরে গিয়ে দেখলে তিনি তামাক ধরিয়েছেন। প্রকাশ মামা তাকে গিয়েও জিজ্ঞেস করলে—সদাকে দেখেছেন নাকি পিসেমশাই?

কীর্তিপদবাবু অবাক হয়ে গেলেন—সদা? খোকার কথা বলছো? তা সে আবার কোথায় যাবে? আবার পালালো নাকি?

—না, তাকে আমার দরকার।

কীর্তিপদবাবু বললেন—তা দেখ গিয়ে সে হয়ত এখন নতুন নাত-বউ-এর কাছে ঘুর-ঘুর করছে—সে কি আর আজকে বুড়ো মানুষের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করবে!

তা বটে। প্রকাশ মামা আবার ভেতর-বাড়িতে ঢুকলো। দিদি তখন ভাঁড়ার নিয়ে ব্যস্ত। একেবারে সোজা গিয়ে সদার শোবার ঘরের ভেতর দিকে চেয়ে দেখলে। নতুন বউ চুপ করে বসে ছিল। পাশে গৌরী পিসী তাকে পাথরের বাটিতে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে।

—হ্যাঁ গো গৌরী, আমাদের সদা কোথায় গেল? সদা এখানে আছে?

নয়নতারা মামাশ্বশুরকে দেখেই মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিলে। গৌরী পিসী বললে—খোকা এখেনে থাকতে যাবে কেন গো, বার-বাড়িতে গিয়ে দেখ—দিনের বেলা বর মানুষ কখনও বউ-এর কাছে থাকে?

প্রকাশ মামা সদাকে না পেয়ে আবার অন্য দিকে চলে গেল।

কর্তাবাবুর কাছে খবর গেল প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই এবার বউ-এর মুখ দেখতে আসতে পারেন। আড়তদার লোক। অনেক টাকা নিয়ে নাড়া-চাড়া করা মানুষ। টাকাও যেমন তিনি

দেখেছেন, মানুষও দেখেছেন তেমনি অনেক। নতুন-বউ খাটের ওপর বসে ছিল ; আবার তাকে বেনারসী পরানো হয়েছে। আবার সারা গায়ে গয়না উঠেছে।

গৌরী পিসী বললে—বউমা, তুমি ওই কার্পেটের আসনের ওপর বোস—সা' মশাই এলে তাঁকে প্রণাম করবে—

ওদিকে প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাইকে নিয়ে চৌধুরী মশাই ভেতর-বাড়িতে এসে পড়েছেন। তাঁদের কথাবার্তা কানে আসছে। গণ্যমান্য লোক, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষতি হবে এ-বাড়ির। যেন আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি না হয় কোথাও।

বাইরে এসে চৌধুরী মশাই গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—গৌরী, বউমা তৈরী? আমরা যাবো?

ভেতরে গৌরী পিসী নয়নতারাকে নিয়ে আসনের ওপর বসিয়ে দিতে দিতে বললে—হ্যাঁ, আসুন—

কিন্তু বসতে গিয়েই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। পাথরের জলখাবারের গেলাসটা নয়নতারার পায়ে লেগে উল্টে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গেলাসটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। গিয়ে ঘরের মেঝেয় সেই টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে গেল! গেলাসের জলটুকুও ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারদিকে জলে জলময় হয়ে গেল।

চৌধুরী মশাইএর সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই তখন ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন।

কারোর মুখেই তখন কোনও কথা নেই। না নয়নতারার, না গৌরী পিসীর। দুজনেরই মনে হলো যেন চরম সর্বনাশ ঘটে গেল তাদের চোখের সামনে। যেন আজকের সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র চরিত্র নয়নতারারও অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু ভেঙেচুর ছত্রখান হয়ে গেল হঠাৎ।

বাইরে প্রীতির কানে গেল শব্দটা। প্রীতি বুঝতে পারলে ঘরের ভেতর যেন কী একটা ভারি জিনিস হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

—কী যেন ভাঙলো না?

বেহারী পালের বউ সকালবেলাই এসেছিল। সেও বললে—ওমা, কী ভাঙলো ঘরের ভেতরে?

প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই ওই পরিস্থিতির মধ্যে আর দাঁড়ালো না। যা সঙ্গে করে এনেছিল সেটা তাড়াতাড়ি নতুন-বউএর হাতে তুলে দিয়েই বিদায় নিতে পারলে যেন বাঁচে। যেন তার অপরাধেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

মাঝখানে ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো, আর জল। তার একপাশে নতুন বউ দাঁড়িয়ে, আর একপাশে প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই। নতুন বউ দু'হাত পেতে উপহারটা নিয়ে সা' মশাইকে নমস্কার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সা' মশাই বলে উঠলো—থাক, থাক, আমি চলি—

সত্যিই, তার অপরাধ-বোধ তাকে আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দিলে না। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন চৌধুরী মশাই। তিনিও ঘটনার আকস্মিকতায় তখন স্তব্ধ হতচকিত।

—চলো বাবাজী, চলো—

দুজনেই তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থল থেকে বাইরে বার-বাড়ির দিকে চলে গেলেন। তাঁরা চলে যেতেই প্রীতি ঘরে ঢুকলো। চোখের সামনে যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা দেখে তার মুখ দিয়ে তখন আর কোনও কথা বেরোল না।

নতুন-বউ তখনও তার কার্পেটের আসনটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তার সমস্ত শরীর তখন থর-থর করে কাঁপছে। ভাঙা পাথরের গেলাসের টুকরোগুলো যেন তখনও তার বুকে গিয়ে

ফুটছে। তার যন্ত্রনাতেই যেন সে ছট্‌ফট করতে আরম্ভ করেছে।

বেহারী পালের বউও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—ওমা, এ কী, পাথরের গেলাসটা ভেঙে গেল নাকি?

কিন্তু কে আর তখন তার কথার উত্তর দেবে! সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় যেন মুহ্যমান।

প্রীতি চাইলে গৌরীর দিকে। বললে—হ্যাঁরে, গেলাসটা ভাঙলি?

গৌরী বললে—বউমার পায়ে লেগে ভেঙে গেল বৌদি—

ঝাঁঝিয়ে উঠলা প্রীতি। বললে—বউমার পায়ে লেগে ভেঙে গেল, তো তুই কোথায় ছিলি? তুই দেখতে পাসনি? তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিলি? তুই গেলাসটা একপাশে সরিয়ে রাখতে পারিসনি?

গৌরী বললে—সা' মশাই আসছিল তাই আমি তাড়াতাড়ি বৌমাকে আসনের ওপর বসাতে গেলুম....

—তা যখন দেখলি পায়ের সামনে গেলাসটা রয়েছে তখন ওটা সরাতে পারলি নে? দিন দিন তোর কী হচ্ছে কী? আজকের এই দিনে পাথরের জিনিস কি ভাঙা ভালো হলো?

বেহারী পালের বউও পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। বললে—বেস্পতিবারের বারবেলায় ব্যাপারটা ভালো হলো না বউ।

কথাটা সকলেরই মনে গিয়ে লাগলো। এমনিতেই পাথরের জিনিস। তার ওপর বৃহস্পতিবার। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সকলের বুকই ধক্‌-ধক্‌ করে উঠলো। এ যে কত বড় অমঙ্গল সে-কথাটা যেন কারো হৃদয়ঙ্গম হতে আর বাকি রইলো না। সকলেরই মনে হলো এত বড় দুর্ঘটনা যেন ভাবী কোনও অমঙ্গলের সূচক। অথচ এর কী প্রতিবিধান তাও সেই মুহূর্তে কারো যেন মাথায় এলো না।

বাইরে এসে বেহারী পালের বউ বললে—কাজটা ভালো হলো না বউ, নতুন-বউ বাড়িতে এসেই পা দিয়ে পাথরের গেলাসটা ভেঙে ফেললে এটা কিন্তু ভালো।

প্রীতির তখন চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। বললে—আমি কত দিক সামলাই বলো তো মাসীমা? আমার কি একটা জ্বালা? আর মানুষদেরও আক্কেল কী রকম দেখ, কালকে বউভাত গেল, কাল আসতে পারেনি বলে আজ এই অসময়ে আসতে হয়? আসবার আর সময় পেলে না কেউ? বউ তো পালিয়ে যাচ্ছে না বাড়ি থেকে! আর একটু বেলা করে এলে কী এমন ক্ষেতি হতো?

বেহারী পালের বউ বললে—তা কী আর করবে বলো, মঙ্গলচণ্ডীতলায় গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে।

—পুজো?

বেহারী পালের বউ বললে—ওমা, তা পুজো দেবে না? অন্য কেউ হলে তত কিছু না করলেও চলতো, কিন্তু নতুন-বউ বলে কথা! তোমার নতুন-বউকেও নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু মাসীমা, ওদিকে আর এক বিপদ হয়ে গেছে আমার।

বলতে বলতে প্রীতির গলাটা যেন বন্ধ হয়ে এল। বললে—কাউকে যেন বোল না মাসীমা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি এখন কাউকে বোল না। বউমার কানে গেলে আবার কেঁদেকেটে একসা করেবে—

বেহারী পালের বউ গোপন কথার ইঙ্গিত পেয়ে আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বললে—আমার কাউকে বলতে বয়ে গেছে, কথাটা কী শুনি না?

—তোমাকে আমার ঘরের লোক মনে করি বলেই বলছি, এখনও কেউ জানে না...

—আরে কথাটা কী তা-ই বলো না?

—বউমার মা মারা গেছে।

—ওমা, সে কী? কবে? কখন? কোত্থেকে খবর এল?

প্রীতি বললে—এই সকালবেলা বেয়াই মশাই খবর পাঠিয়েছেন। এখন আমি যে কী করি, কার সঙ্গে পরামর্শ করি তাই ভাবছি। বউমাও জানে কথাটা। পুরুতমশাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, কর্তারা সে-সব করছেন। এখন বাড়ির মধ্যে আমি কী করবো তা বুঝতে পারছি নে!

বেহারী পালের বউ বললে—বলেছ ভালোই করেছ বউমা। তাহলে এক কাজ করো। আজকে আর মাছ-টাছ কিছু খেতে দিও না বউমাকে। নিরিমিষ খাক, তারপর চতুর্থী করার ব্যবস্থা করতে হবে—

—কিন্তু ওরা তো বৌমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। তা বাপের বাড়িতে তো মা ছাড়া আর দ্বিতীয় মেয়েমানুষ কেউ নেই। বেয়াইমশাই খুবই ভেঙে পড়েছেন। আমি ভাবছি বউমাকে কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দিই।

বেহারী পালের বউ ভেবে-চিন্তে বললে—তা তাই-ই দাও বরং—

তারপর যেন কী ভাবলে! বললে—একে মা মারা যাওয়ার খবর এলো, তার ওপর বেস্পতিবারে পা দিয়ে পাথরের জিনিস ভাঙলে, এসব তো ভালো লক্ষণ নয় বউমা, এতে কারোর ভালো হবে না, তোমার ছেলের পক্ষেও ভালো নয়। অবিশ্যি তোমার ছেলের একটু কষ্ট হবে বটে। ক'দিন বউকে ছেড়ে খোকা থাকতে পারবে তো?

প্রীতি বললে—আমার ছেলের কথা ছেড়ে দাও—

—তা ছেলে যদি তোমার রাগ না করে তো বউমা সেখানেই থাক। তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেলে, তখন না হয় ফিরবে। এই সময়ে বাপের কাছে থাকলে বাপও মনে একটু শান্তি পাবে—আর না-হয় ছেলেকেও বউ-এর সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দাও। ছেলে যদি বউকে ছেড়ে থাকতে না পারে তো তাই-ই না হয় করো—

প্রীতি কিছু ভাঙলে না। মুখে বললে—দেখি, কী করি—কিন্তু বউমাকে খবরটা আমি কী করে দেব তাই ভাবছি মাসীমা—বউমা তো এখনও কিছু জানে না—

—তা আমি গিয়ে খবরটা দেব?

প্রীতি বললে—না মাসীমা, আমি বলি এখন থাক। কর্তাও বলছিলেন খবরটা এখন বউমাকে দিয়ে দরকার নেই। শেষকালে কান্নাকাটি করলে আমি আর বউমাকে সামলাতে পারবো না—

—তা তোমার ছেলে কী বলছে? সদা?

—ছেলের কথা তুমি ছেড়ে দাও মাসীমা। সে শুধু বিয়ে করেই খালাস। সে কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ভোরবেলা থেকে কোথায় যে সে ঘুরছে কেউ তার মুখও দেখেনি। খবরটা যে তাকে বলবো, তা তার দেখা পেলে তবে তো?

বেহারী পালের বউ বললে—তাহলে কর্তা যেমন বলেন সেই রকমই করো তুমি বউমা। ছেলের কানে গেলে যদি আবার সে বউমাকে বাপের বাড়ি যেতে না দেয়!

হঠাৎ চৌধুরী মশাই ভেতর-বাড়িতে এলেন। প্রীতি কাছে এগিয়ে গেল। গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলে, কী খবর ওদিকের?

চৌধুরী মশাই বললেন—সা' মশাইকে বিদেয় করে দিয়ে এলুম। লোকের আক্কেল দেখে অবাক। আর সময় পেলে না, এই অসময়ে এসে হাজির! পাথরের গেলাসটা ভেঙে গেল মাঝখান থেকে! দেখ দিকিন কী অমঙ্গলের ব্যাপার—

—সে আর ভেবে কী হবে! কিন্তু পুরুত মশাই কী বললেন? বউমা আজ নিরিমিষ খাবে তো?

—তা সব জেনে-শুনে আর আঁশ খেতে দেওয়া যায় কী করে বলো!

—কিন্তু কেষ্টনগরে যাওয়া?

চৌধুরী মশাই বললেন—পুরুত মশাই তো বলছেন সেখনে পাঠিয়ে দিতে! দু'দিন পরে তো পাঠাতেই হতো সেখানে। না হয় একদিন আগেই গেল! আমি ভাবছি সেইটেই ভালো হবে। খোকা যে-কাণ্ড করছে, আজকেও যদি খোকা বউমার ঘরে না শোয় তো তাতেও বউমার মনে সন্দেহ হবে। তার চেয়ে বরং বউমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো হবে—

—সঙ্গে কে যাবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—খোকা গেলেই ভালো হতো। কিন্তু কোথায় সে?

—থাকলেই কি সে সেখানে যেত? খোকা যদি না যায় তো প্রকাশ আর গৌরী সঙ্গে যাক। এখানকার আমাদের তরফের কেউ গেলেই ভালো হতো।

—কিন্তু সঙ্গে খোকা গেলেই সব চেয়ে ভালো হয়। তাহলে আর কারো যাবার দরকার হয় না।

প্রীতি বললে—তা দেখ না তাকে খুঁজে। যদি রাজি করাতে পারো—

চৌধুরী মশাই বললেন—সে না-হয় আমি দেখছি। কিন্তু তুমি ততক্ষণে বউমাকে তৈরি করিয়ে রাখো। খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখে দাও। বেরোলে এখুনি বেরোতে হবে। রজব আলীকে বলেছি গাড়ী তৈরি করতে। বেলাবেলির ট্রেনে পাঠানোই ভালো, প্রকাশ আর গৌরীকেও আমি তৈরি হতে বলেছি—

বলে তিনি যেমন এসেছিলেন আবার তেমনি বার-বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

হায় রে কপাল! তখনও নয়নতারা জানতো না যে যে-বাড়ি থেকে তাকে একদিন চিরকালের মত চলে যেতে হবে এই-ই বুঝি তার সূত্রপাত। এই ফুলশয্যার রাতেই বুঝি তার জীবনের এক অমোঘ সূচনা। নইলে অমন করে পাথরের গেলাসটা পায়ে লেগে ভেঙে গেলই বা কেন? অথচ এসব কথা যখন মা বলেছে তখন বিশ্বাসই করে নি সে। ভেবেছে মা'র যত সব মনের কুসংস্কার। কোথায় কত দূরে রইল তার মা, আর কোথায় চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে সে চলে এল নবাবগঞ্জে। আর এই নবাবগঞ্জেই হয়ত তাকে সারাজীবন কাটাতে হবে।

সারাজীবন এখানে কাটাবার কথাটা মনে হতেই কেমন যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। কাল রাত থেকেই সে ভয়ে কাঁপছে। কীসের ভয়? তার তো এখানে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই! তার শাশুড়ী মানুষটা তো ভালো। শ্বশুরও তো ভালো। আর...

আর সেই তার স্বামীর কথাটা ভাবতে গিয়েই যেন সব কিছু তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেল! কে সে? কী রকম মানুষ! কী রকম স্বভাবচরিত্র সে মানুষটার! শুধু বিয়ের সময় হাতে তার হাতের ছোঁওয়া লেগেছিল কিছুক্ষণ। কেষ্টনগরের সবাই-ই বলেছিল—ও-রকম বর নাকি সাধারণত দেখা যায় না।

আসবার সময় নয়নতারা যখন খুব কাঁদছিল তখন মা নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল—কাঁদিস নে মা, তোর কীসের দুঃখু, তুই যেমন স্বামী পেয়েছিস অমন স্বামী ক'জনের আছে বল তো! কাঁদিস নে—

তা সত্যি, বিয়ের দিন বাপের বাড়িতে একে একে সবাই তাকে এই কথাই বলে গেছে। যাদের বিয়ে হয় নি, কিম্বা যাদের বিয়ে হয়েছে সবাই তার বরের রূপ দেখে হিংসে করেছে।

হঠাৎ গৌরী পিসী ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বললো—এই নাও বউমা ভাত খেয়ে নাও—

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—এত সকাল-সকাল যে ভাত দিচ্ছ পিসীমা? কটা বাজলো এখন?

গৌরী পিসী বললে—সকাল-সকাল খেয়ে নাও, তুমি আবার কেষ্টনগরে যাবে যে আজ—

—কেষ্টনগরে? আজকে? কেন?

গৌরী পিসী বললে—তোর শ্বশুরের ইচ্ছে যে তোমার বাবা-মার সঙ্গে তুমি একবার দেখা করে আসবে। তুমি নাকি আসবার সময় সেদিন খুব কেঁদেছিলে, তাই। মাকে দেখতে তোমার খুব ইচ্ছে করছে না?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছে পিসীমা। মা'র জন্যে খুব মন-কেমন করছে আমার। কিন্তু তোমরা কী করে তা জানতে পারলে? আমি তো তোমাদের কিছু বলি নি!

গৌরী পিসী বললে—আহা, মন কেমন করবে না? মা কি যেমন-তেমন জিনিস বউমা?

নয়নতারা বললে—জানো পিসীমা, আমি কালকে রাত্তিরে মাকে স্বপ্ন দেখেছি। মা যেন আমার বউভাতের দিনে এই নবাবগঞ্জে এসেছে, এসে আমাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম—মা, তুমি যে খবর দিয়েছিলে আসবে না! তবে এলে কেন? শুনে মা কী বললে জানো? মা বললে—তোর বউভাতের দিনে আমি না-এসে কি থাকতে পারি রে? তারপর হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চোখ দুটো জলে ভেসে গেছে। কখন কেঁদেছি মনেও নেই—

গৌরী পিসী বললে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও বউমা, দেরি হয়ে যাবে আবার। আজকে কিন্তু মাছ নেই, খেতে পারবে তো?

—মাছ নেই কেন পিসীমা?

গৌরী পিসী বললে—আজকে তোমার মাছ খেতে নেই—

—কেন পিসীমা, আজকে কী?

গৌরী পিসী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তোমার জন্যে আর একটু দুধ এনে দিই বউমা—

খেতে খেতে নয়নতারা কেবল মা'র কথাই বলতে লাগলো। মা কেমন চমৎকার রান্না করে, মা কেমন সেলাই করে, মা কেমন কথা বলে। মার কথা বলবার লোক পেয়ে নয়নতারা যেন বেঁচে গেল।

গৌরী পিসী বললে—তোমার শাশুড়ীও খুব ভালো বউমা, তোমার শাশুড়ীর মত মানুষও হয় না—

নয়নতারা বললে—মাও আমাকে তাই বলেছে। বলেছে—এখন থেকে শাশুড়ীকেই মায়ের মত ভক্তি করবি—

গৌরী পিসী বললে—ও কটা ভাত দুধ দিয়ে খেয়ে নাও বউমা, আমি একটা সন্দেশ আনছি—

গৌরী পিসী বাইরে চলে গেল। কেষ্টনগরে যাওয়ার কথা ভাবতেই নয়নতারার সব দুঃখ যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার যেন নতুন করে বেঁচে উঠলো সে। আবার যেন সে নিজের সত্তা ফিরে পেলে। বেঁচে থেকে যে এত সুখ তা যেন সে এতদিন এমন

করে আর কখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। পাখিদের মত যদি পাখা থাকতো তার তাহলে বেশ উড়ে যাওয়া যেত। কেষ্টনগরে যেতে তাহলে আর তার এত দেরি হতো না।

হঠাৎ যেন বাইরে তার সেই মামাশ্বশুরের গলা শোনা গেল।

—হ্যাঁ গো গৌরী, বউমা হঠাৎ বাপের বাড়ি যাচ্ছে কেন গো? কী হয়েছে?

গৌরী পিসীর গলা শোনা গেল তারপর। গৌরী পিসী বললে—অত জোরে কথা বোল না মামাবাবু, একটু আস্তে, বউমার কানে যাবে। বউমার কানে গেলে অনথ বাধবে—

—কেন, কী হয়েছে? বউমার কানে গেলে ক্ষতি কী?

গৌরী পিসী বললে—বউমার মা যে মারা গেছে—

—অ্যাঁ? মা মারা গেছে? সদার শাশুড়ী? কীসে মারা গেল? কখন খবর এল? আমি তো কিছুই টের পাই নি, আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি—

গৌরী পিসী বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—আঃ, বলছি আস্তে! বউমা ঘরের ভেতরে রয়েছে, শুনতে পাবে যে—

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। গৌরী পিসী ঘরে ঢুকতেই দেখলে বউমার চোখ দুটো কেমন বিহ্বল হয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। হয়ত এখুনি ঢলে পড়ে যাবে।

গৌরী পিসী তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। বললে—কী হলো বউমা, তোমার শরীর খারাপ হলো নাকি!

নয়নতারার মুখে যেন তখন কথা বলবারও শক্তি নেই। কোনও রকমে বলে উঠলো—আমার মা মারা গেছে? তোমরা তো আমাকে কিছু বলো নি পিসীমা...

বলতে বলতে নয়নতারা সেইখানে বসেই ভেঙে পড়লো।

সংসারে যার জীবনের যাত্রাপথের সূচনাটাই মৃত্যু দিয়ে অভিষিক্ত হলো তার শেষ পরিণতি যে কোথায় কেমন করে কোন্ চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা যেমন তার সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারে না, তেমনি কোনও ইতিহাস-লেখকও বলতে পারে না। তবু তো সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয় না সৃষ্টিকর্তার, আর লেখককেও তাই লিখে যেতে হয়। কারণ বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে যেমন একজন মানুষ, তেমনি এক একটি মানুষ নিয়েই সমাজ দেশ ভূগোল আর ইতিহাস। যাকে সেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয় তাকে কখনও বা মধুর আবার কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই, আবার কারো মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও তার চলে না। সে যে নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত, নির্বিকার!

অন্তত নয়নতারার সেদিন সেই কথাই মনে হয়েছিল। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে সে? কার কাছে সে প্রতিকার প্রার্থনা করবে? মাকে সে দু'দিন আগেও দেখেছে। দুদিন আগেও মা তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়েছে। মা বলেছে—দেখিস মা, আসছে বেস্পতিবারেই আবার তোকে নিয়ে আসবো, বেয়াই মশাইকে উনি বলে দিয়েছেন—

বৃহস্পতিবার মার কাছে যাবার প্রতীক্ষাতেই সে ছিল। ভেবেছিল এটা এই শ্বশুরবাড়িটা তার সাময়িক আশ্রয়, কেষ্টনগরের বাড়িটার আশ্রয়ই তার শাশ্বত। সেখানে সে আবার ফিরে যাবে। আবার তার বাবা-মাকে ঘিরে তার জীবনের পরিক্রমা আগের মতই সুচারুভাবে চলবে।

কিন্তু হঠাৎ অদৃশ্য দেবতার কোন অমোঘ নির্দেশে তার সব কিছু এমন হঠাৎ বানচাল হয়ে গেল।

নয়নতারা মনে মনে ভাবতে চাইলে হয়ত সে যা শুনেছে তা ভুল। ভাবতে ভালো লাগলো যে আসলে তার মা আছে। হে ভগবান, তার ভাবনাটাই যেন সত্যি হয়। যেন সে কেষ্টনগরে গিয়ে মাকে দেখতে পায়। তাহলে মাকে গিয়ে সে বলবে—মা, আমি আর নবাবগঞ্জে যাবো না, আমি এবার এই কেষ্টনগরে তোমার কাছেই থাকবো—

মা তাকে হয়ত বলবে—না মা, ও-কথা বলতে নেই, এখন তোমার বিয়ে হয়েছে, এখন থেকে স্বামীর ঘরই তোমার ঘর, স্বামীই তোমার আপন, স্বামীই তোমার সব—

আশ্চর্য! কে জানতো এই স্বামীই তার কাছে একদিন সব চেয়ে পর হয়ে যাবে, সব চেয়ে দূর হয়ে যাবে। একদিন যার হাতে নয়নতারাকে তুলে দিয়ে তার মা সব চেয়ে নিশ্চিত বোধ করেছিল সেই সদানন্দই তাকে এমন করে দূরে ঠেলে দেবে—এ কথা কি তারা-ই কোনও দিন কল্পনা করতে পেরেছিল!

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই জীবন আরম্ভ করেছিলেন বড় মহৎ আদর্শ নিয়ে। তাঁর আদর্শ ছিল ছেলে মানুষ করবার। শুধু একজন ছেলে নয়, হাজার হাজার ছেলে। আর শুধু ছেলেই নয়, ভেবেছিলেন ছেলে মেয়ে সবাইকে তিনি মানুষ করে যাবেন নিজের আদর্শের মত করে। তিনি বলতেন—জীবনে পাওয়াটাই বড় কথা নয় নিখিলেশ, পেয়ে যেমন অনেকের হারিয়ে যায়, তেমনি হারিয়েও আবার অনেকে অনেক কিছু পায়। তথাগত বুদ্ধদেব রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে সম্রাটের ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন। তাকেই বলে সত্যিকারের পাওয়া। কিন্তু আমরা সবাই পেয়ে হারাই নিখিলেশ। আমরাই হলুম আসল লক্ষ্মীছাড়া। আমরা যা পাই তাও ধরে রাখতে পারি না, আবার যা পাই না তার জন্যেও আমাদের আক্ষেপ নেই। এই আমার জীবনটাই দেখ না—

বলে নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বলেন—আমি কিছুই হারাতে পারলুম না বলে জীবনে কিছুই পেলুম না—

শুধু নিখিলেশ নয়, মাস্টার মশাই-এর কথাগুলো আরো অনেক ছাত্র শুনতো। ছুটির দিন সবাই ভট্টাচার্যি মশাই-এর বাড়ি আসতো। কথা বলতে বলতে যদি অনেক বেলা হয়ে যেত তাঁর নয়নতারা হঠাৎ ঘরে এসে বলতো—বাবা, তুমি আজ চান করবে না, খাবে না?

ভট্টাচার্যি মশাই-এর এতক্ষণে যেন হুঁশ হতো। বলতেন—এই দেখ, আমাদের বেশ কথা হচ্ছিল, বেশ বিদ্যার জগতে বিচরণ করছিলুম, হঠাৎ অবিদ্যা এসে সব ভেস্তে দিল—

নয়নতারা অভিমান করে বলতো—বা রে, আমি বুঝি তোমার অবিদ্যা?

ভট্টাচার্যি মশাই নিজের ভুল বুঝে নয়নতারাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন—এই দেখ, আমার মেয়ে ওম্নি আবার রাগ করে বসলো—

মেয়েকে আদর করতে করতে বলতেন—তুমি অবিদ্যা হতে যাবে কেন মা, তুমি হলে মা আমার সরস্বতী। মা-সরস্বতী তুমি আমার! আমি বলছিলাম কল্পনা আর বাস্তবের কথা। আমরা সবাই বেশ বড় বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ তুমি আমাদের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলে—

নয়নতারা বলতো—বা রে, আমি কী করবো, মা যে তোমাকে ডাকতে বললে—

ভট্টাচার্যি মশাই বলতেন—না না, তোমার মা ঠিকই করেছে মা, বাস্তবকে বাদ দিয়ে তো কল্পনা হয় না। কল্পনার শেকড় থাকে বাস্তবের মাটিতে। তা না থাকলে সে কল্পনারও কোনও দাম নেই, সে কল্পনা হলো ফানুস, ফানুস ফেটে গেলে সে-ফানুসের তাই আর কোনও দাম থাকে না—

নয়নতারা কিন্তু বাবার সে-সব কথায় কান দিত না। সে বাবার ছাত্রদের দিকে চেয়ে বলতো—তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কী? তোমরা বাড়ি যাবে না? তোমাদের বাড়ি

ঘর দোর নেই?

ছাত্রদের মধ্যে নিখিলেশ ছিল একটু স্পষ্টবক্তা।

নিখিলেশ বলতো—তা আজকে তুমিই আমদের খেতে দাও না—আমরা এখানেই দুটি খাই—

নয়নতারা বলতো—ইস্, খাবে! তাহলে রান্না করবে কে? মা'র যে শরীর খারাপ, মা'র বুঝি রাঁধতে কষ্ট হয় না?

নিখিলেশ বলতো—কেন? তুমি রাঁধবে! তুমি আমাদের জন্যে একটু কষ্ট করতে পারো না?

নয়নতারাও কম যেত না। সে বলতো—তোমাদের জন্যে কেন আমি কষ্ট করতে যাবো বলো তো? তোমরা আমার কে?

ভট্টাচার্যি মশাই বলতেন—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই, পৃথিবীতে কেউ কারো পর নয়, জানো মা। পৃথিবীর সব মানুষকে আপন করে নিতে হবে। যে তা পারে সে-ই সত্যিকারের মানুষ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, সবাইকে নিজের লোক মনে করবে মা—

নয়নতারা বলতো—বা রে বা, তুমি তো আমার বাবা, কিন্তু ওরা আমার কে?

ভট্টাচার্যি মশাই একটু ভেবে নিয়ে বলতেন—ওরা? ওরা তোমার ভাই-এর মত। আমি কি শুধু তোমার একলার বাবা? আমি যে সকলের। আমি যেমন তোমার কথা ভাবি, তেমনি ওদের কথাও তো আমাকে ভাবতে হয়। আমি যে ওদেরও মঙ্গল চাই—

বাড়ির ভেতরে মা বলতো—আমার কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই, আমি যাচ্ছি পরের কথা ভাবতে! পরের কথা ভাবতে আমার বয়ে গেছে—

নয়নতারাকে নিজের পাশে শুইয়ে মা বলতো—ওঁর কথা ছেড়ে দে তুই, এ-সব বড়-বড় কথা শুনতে ভালো, বলতে ভালো, কিন্তু ওতে তো আমার পেট ভরবে না!

যখন বাবা ছাত্রদের নিয়ে লেখাপড়ার চর্চা করতো মা নিজের সংসার সামলাতেই হিমসিম্ খেয়ে যেত। আর সেই সময় সব সময়ের সঙ্গী থাকতো নয়নতারা। নয়নতারা মা'র কাছে কাছে ঘুরতো সারাদিন।

মা বলতো—ও মা নয়ন, এই চাল ক'টা একটু বেছে দে তো—

মা'র কথায় একটা কুলো নিয়ে নয়নতারা চাল বাছতে বসতো। কিন্তু চাল বাছা শেষ হতে না হতেই মা আর একটা কাজের হুকুম করতো। বলতো—ওরে নয়ন, কোথায় গেলি, বড়িগুলো একটু রোদদুরে দিয়ে দে তো মা—

যতবার নয়নতারা বই নিয়ে পড়তে বসতো ততবার মা'র ফরমাস। একটা-না-একটা ফরমাস লেগেই থাকতো মা'র। মার সঙ্গে নয়নতারার লেখাপড়ার যেন আড়ি ছিল। নয়নতারাকে পড়তে বসতে দেখলেই মা যত বাজে কাজ আবিষ্কার করে বসতো।

শেষকালে বিরক্ত হয়ে যেত নয়নতারা। বলতো—আমি পারবো না তোমার কাজ করতে, আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার কাজ পায়—?

মা বলতো—এক হাতে কত কাজ করছি তা তুই দেখতে পাচ্ছিস না? আমি খেটে খেটে মরে যাই তা-ই তোরা সবাই চাস্?

নয়নতারা বলতো তা একটা ঝি রাখলেই পারো, ওই তো কল্যাণীদের বাড়িতে কেমন দিন-রাতের ঝি আছে, সে-ই সব কাজ করে—

মা বলতো—আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি রে। এখন যদি এ-সব কাজ না-করিস তাহলে কোথায় কার বাড়িতে যাবি, সেখানে গিয়ে যে শাশুড়ীর কাছে তোকে বকুনি খেয়ে মরতে হবে। তখন শাশুড়ী আবার তোকে খোঁটা দেবে। বলবে—বাপের বাড়িতে মা কিছুই

শেখায়নি মেয়েকে, একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দিয়েছে।

তারপর মা নিজের মনেই বলতো—আমি যা বলি তোর ভালোর জন্যেই বলি রে! আমি মরে গেলে তখন বুঝবি, মা তোর ভালোর জন্যেই এত কথা বলতো—

তা শেষকালে যখন নবাবগঞ্জের সম্বন্ধটা এল তখন একেবারে দৌড়তে দৌড়তে মা তার ঘরে এসেছে। বললে—ওরে, তুই এবার জমিদারের বউ হবি, জানিস—

জমিদারের ছেলের বউ হওয়া যে কী জিনিস তা যদি মা তখন জানতো! কিন্তু শুধু মা কেন, নয়নতারা কি নিজেই সে কথা জানতো! বোধ হয় ভূ-ভারতে কেউই জানতো না। নইলে কোনও মেয়ের ফুলশয্যার দিনে এমন দুর্ঘটনা ঘটে? কারো পা লেগে শ্বেত-পাথরের গেলাস এমন করে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়?

সমস্ত দিন কোথায় ঘুরে ঘুরে সদানন্দ যখন বাড়ি ঢুকলো তখন সব শান্ত। এই কাল পর্যন্ত যে-বাড়িতে লোকজন গিস্‌গিস্ করেছে, যে-বাড়িতে ঢুকলেই লুচি-ভাজার ঘিয়ের গন্ধ ভুর ভুর করেছে তা আর তখন নেই। একদিন আগেও এখানে উৎসবের জাঁকজমক সব কিছু ভরাট ছিল। প্রকাশ মামা একাই ছিল একশো। তার হাঁক-ডাকে বাড়িতে কাক-পক্ষী পর্যন্ত বসতে পারছিল না।

কিন্তু সেই প্রকাশ মামাও তখন আর নেই।

কর্তাবাবু তখন নিজের ঘরের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। বহুদিন আগে একদিন তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন মনে নানা সংশয় ছিল তাঁর। সংশয় ছিল নানা কারণে। একে তো সোজা পথে তাঁর যাত্রা শুরু হয় নি। অনেক বাধা এসেছে তাঁর জীবনে। একদিক থেকে যেমন উন্নতি অন্যদিক থেকে তেমনি শত্রুতা। শুধু বিধাতার শত্রুতাই নয়, মানুষের শত্রুতাও কম ছিল না। তাঁর জমির আয়তন বেড়েছে, কিন্তু সেই আয়তন বাড়াতে গিয়ে কতবার রাজদ্বারে উপস্থিত হতে হয়েছে তাঁকে। একটার পর একটা মকর্দমা। সঙ্গে সঙ্গে ছিল অর্থব্যয়। দু'হাতে টাকা বিলিয়েছেন সকলকে। উকিল, মুহুরি, পেশকার থেকে শুরু করে কোর্টের একটা সামান্য পোকা-মাকড় পর্যন্ত তাঁর টাকায় পেট ভরিয়েছে। তারপর আছে পুলিস-দারোগা-চৌকিদার। সবাই যেন এক-একটা রাঘব বোয়াল। আর তিনিও ছিলেন মুক্তহস্ত। তিনি বলতেন—টাকা নিচ্ছ নাও, কিন্তু দেখো আমার কাজটা যেন উদ্ধার হয় বাপু—

তা নেমকহারামি যে কেউ করে নি তা নয়, করেছে। কিন্তু অনেকে আবার তাঁর কাজ উদ্ধারও করে দিয়েছে। লাভ-লোকসান ক্ষয়-ক্ষতি মিলিয়ে শেষমেষ যা দাঁড়িয়েছে তাতে মোটা লাভের দিকেই তাঁর পাল্লা ঝুঁকেছে।

এ সব অতীতের কথা। এখন বলতে গেলে সব দিক থেকেই সুরাহা হয়েছে তাঁর। এখন আর তাঁর জমিদারি নেই বটে। সরকারী আইনের আওতায় এখন তাঁকে আর জমিদার বলা যাবে না। সরকারী সেরেস্তার খাতায় জমিদারের তালিকাটাই পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু তা হোক, তাতে তাঁর কোনও উনিশ-বিশ হয় নি। তিনি আগেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন। বরং এখন তাঁর সমৃদ্ধি বলতে গেলে আরো বেড়েছে। তাঁর একমাত্র দাবীদার যে এতদিন বেঁচে ছিল সে-ও এখন নিঃশেষ হয়েছে। আর বাকি ছিল নাতির বিয়েটা। তা ভেবেছিলেন সেদিক থেকেও হয়ত কিছু বাধা আসবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তাও নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল কাল। কাল সমস্ত অতিথি-অভ্যাগতরা তাঁর বাড়িতে এসে

নববধূকে আশীর্বাদ করে গিয়েছে। ভেবেছিলেন তাঁর নাতি ফুলশয্যার রাত্রে হয়ত বাড়ি থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। কিন্তু না, সে শোবার ঘরে ঢুকে রীতিমত দরজায় খিল দিয়েছে। নতুন বউএর সঙ্গে রত্রিযাপনও করেছে।

কিন্তু তাহলে রাত্রে অমন অমঙ্গলের কান্না কে কেঁদেছিল?

দীনু ভোরবেলার দিকে এল। কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে দীনু, রাত্তিরে তুই কোথায় শুয়েছিলি?

দীনু বললে—আজ্ঞে, বাইরের বারান্দায়—

কর্তাবাবু বললেন,—বেশ করেছিস, বারান্দায় শুয়েছিস। তা হ্যাঁ রে, রাত্তিরে কিছু শুনতে পেয়েছিলি?

—কী শুনবো?

—কারোর কান্না?

দীনু কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—কান্না? কার কান্নার কথা বলছেন কর্তাবাবু?

কর্তাবাবু বললেন—কার কান্না তা কি ছাই আমিই জানি। মনে হলো যেন কে কোথায় কাঁদছে। তা আমি তোকে 'দীনু' 'দীনু' বলে বার-দুই ডাকলুম, কিন্তু তোর তো কোনও সাড়া-শব্দই পেলুম না—

দীনু অপরাধীর মত বললে—আজ্ঞে আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

—তা ঘুমিয়েছিস বেশ করেছিস। সারাদিন খাটুনি গেছে, ঘুমোবি না? হাজার হোক শরীর তো বটে।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তুই নিচেয় গিয়েছিলি?

দীনু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিচের থেকেই তো আসচি—

—নিচেয় কী দেখে এলি?

—দেখলুম ঠাকুররা উঠেচে, এইবার সব জল-খাবারের ব্যবস্থা হবে, উনুনে আগুন পড়েছে—

কর্তাবাবু বললেন—না না, ও কথা বলছি না, বলছি ভেতর-বাড়িতে কী দেখলি?

—ভেতর-বাড়িতে এখনও সবাই ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমোচ্ছে? তাই নাকি রে! সবাই-ই ঘুমোচ্ছে?

—না, ওদিকে কাল তো শুতে অনেক রাত হয়েছিল, তাই এখন জাগে নি কেউ। তা ছোট মশাইকে ডেকে দেব আমি?

—দূর, ছোট মশাইকে ডেকে দিয়ে কী হবে! আমি বুড়ো মানুষ, আমার তো খাটা-খাটুনি হয় নি বেশি, তাই ভালো ঘুমও হয় নি। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না। এখন ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট সব চুকে গেছে। এখন তো ঘুমোবেই।

তারপর একটু হেসে বললেন—তা ওদিকের কী খবর রে?

—কোন্ দিকের?

—বর-কনের!

—আজ্ঞে, খোকাবাবুর কথা বলছেন? খোকাবাবু তো দেখলুম শালাবাবুর সঙ্গে বার-বাড়ির উঠোনে কথা বলছেন।

কর্তাবাবু যেন বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—ঠিক দেখেছিস তো তুই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভুল দেখতে যাবো কেন?

—কিন্তু এত ভোর-ভোর, তাহলে উঠতে গেল কেন? নতুন-বউ কোথায়?

—আজ্ঞে নতুন-বউমার ঘরের দরজা তো ভেজানো রয়েছে দেখলুম!

কর্তবাবু কেমন যেন চিন্তায় পড়লেন। নতুন-বউ, ফুলশয্যার রাত, সেই রাতে বর কেন এত সকালে উঠলো! এ-দিনে তো একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে সবাই!

বললেন—তুই একবার ছোট মশাইকে ডেকে আন তো আমার কাছে—

দীনু আর দাঁড়ালো না। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাইও এসে গেছেন। আড়তদার মানুষ। নতুন-বউয়ের মুখ দেখবেন সোনা দিয়ে। একটু পরে কৈলাস গোমস্তাও এসে গেল। আর তার পরেই এল চৌধুরী মশাই নিজে।

নিচের থেকে খবর এল, বউমার তৈরি হতে একটু দেরি হবে। কর্তাবাবু বললেন—একটু বসতে হবে শা' মশাই, বুঝতেই তো পারছেন, কাল অনেক রাত হয়েছে সব শেষ হতে...

কিন্তু এই-ই সব নয়। যখন প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই বউকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন তখন চৌধুরী মশাইকে ডাকলেন কর্তাবাবু। একেবারে একান্তে।

ঘর থেকে তখন সবাইকে বার করে দেওয়া হয়েছে।

কর্তাবাবু গলাটা একটু নামালেন। বললেন—রেল-বাজার থেকে দারোগাবাবুর লোক এসেছিল নাকি?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ। আমি সব শোধ করে দিয়েছি।

—কত দিলে?

—আজ্ঞে আপনি যা দিতে বলেছিলেন। পুরোপুরি পাঁচশোই দিয়েছি।

—আর বংশী ঢালী?

চৌধুরী মশাই বললেন—ওরা একটু দর-কষাকষি করছিল এবার। দেড়শো টাকার কমে, ছাড়লে না।

—দেড়শো!

কর্তাবাবু যেন কেমন চমকে উঠলেন। বললেন—কেন? সেবার সেগুনবেড়ের বিলের দখলের সময় পনেরোটা লাস গুম করে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিলুম, তা-ই নিয়ে তো খুশী হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ওরা সেলাম করেছিল। আর এবার হঠাৎ একেবারে আড়াই গুণ রেট বাড়িয়ে দিলে কেন? এই ক'দিনের মধ্যেই টাকা কি এতই সস্তা হয়ে গেল?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, তা নয়, খুবই কান্নাকাটি করতে লাগলো। এমন করতে লাগলো যেন দেড়শো না পেলে একেবারে মাগ-ছেলে নিয়ে উপোস করে মরবে!

কর্তাবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন—সে উপোস করে মরবে বললে আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে? দেখছি এই রকম করেই তুমি আমার সম্পত্তি রক্ষে করবে! ওরা হলো ছোটলোক, ছোটলোকদের অত প্রশ্রয় দিতে আছে। যদি এতই হাতে-পায়ে ধরেছিল তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই পারতে!...লোক ক'জন?

—আজ্ঞে, চারজন।

—চারজনের লাশের জন্যে দেড়শো টাকা! এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি! টাকা কি গাছের ফল যে পাড়লুম আর খেলুম? কালীগঞ্জে আমি যখন নায়েব ছিলুম তখন এসব কাজে মাথা পিছু পাঁচ টাকা দিয়েছি, তারাও খুশী হয়ে তাই নিয়ে সেলাম করেছে। এই করেই তোমরা দেখছি সব জিনিসের দর বাড়িয়ে দাও। এমনি করে যদি ওরা রেট বাড়িয়ে যায়, তাহলে তো আর শেষকালে জমি-জিরেত রাখতে কুল পাবে না। তা টাকাটা দেবার আগে একবার আমাকে জিজ্ঞেস করবে তো! আমাকে জিজ্ঞেস করলে তোমার কী এমন লোকসান হতো! আমি তো এই ঘরেই রয়েছি। পা দুটোই না হয় গেছে, কিন্তু একেবারে

তো মরে যাই নি? আমি মরে গেলে তোমরা যা ইচ্ছে তাই করো, আমি সে-সব দেখতেও আসবো না—

বকুনি খেয়ে চৌধুরী মশাই বাবার সামনে মাথা নিচু করে রইলেন।

কিন্তু তখনই খবর এল নিচেয় কেষ্টনগর থেকে লোক এসেছে!

কর্তাবাবু বললেন—কেষ্টনগর? তোমার বেয়াই-বাড়ির লোক নাকি?

বেয়াই-বাড়ির লোক যে কেন আবার সাত সকালে এসে হাজির তা প্রথমে কেউই বুঝতে পারে নি। কিন্তু সকলের বোধের এক্তিয়ারের মধ্যেই যে সংসারের সব কিছু ঘটনা ঘটবে এমন কড়ার সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের সঙ্গে তো করেন নি! তাই বিপিনের মুখে যখন খবর প্রথম শুনলেন তখন সকলের অবাক হবারই কথা।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—শেষকালে কী হয়েছিল?

বিপিন বললে—কিছুই হয় নি। বিয়ের দিন খুবই খাটুনি গিয়েছিল সকলের, তার পরের দিন মেয়ে-জামাইকে বিদেয় দেবার পরই তিনি শুয়ে পড়লেন। বললেন—বুক কেমন করছে। তারপর ডাক্তারবাবু এলেন। ইন্‌জেকশন দিলেন। ইন্‌জেকশনের পরই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু সে-ঘুম তাঁর আর ভাঙলো না।

চৌধুরী মশাই সেখানে আর দাঁড়ালেন না।

বললেন—আমি একবার পুরুত মশাইকে খবর দিই গে—

কিন্তু তখন একেবারে তাই নিয়েই হইচই পড়ে গেল বাড়িময়। একদিকে নতুন-বউ তারপরে প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই, তার ওপর দারোগা, বংশী ঢালী। আর সকলের ওপর কেষ্টনগরের দুঃসংবাদ। সে যে কী দুর্যোগ গেছে সমস্তটা দিন তা কল্পনা করতেও যেন ভয় হয়। তার মধ্যে সদানন্দ যে কোথায় ছিল তা কেউ লক্ষ্যই করে নি। সে বাড়িতে খেলে কি খেলে না সে-দিকেও কারো খেয়াল ছিল না।

শুধু কর্তাবাবু চৌধুরী মশাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—খোকার কী খবর?

চৌধুরী মশাই বললেন—সে ভালোই আছে—

—আর কোনও গণ্ডগোল-টোল করে নি তো?

চৌধুরী মশাই বললেন—না—

—তবে যে দীনু বলছিল, শুনলাম, খোকা নাকি ভোরবেলাই বউমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, দিনু ঠিকই বলেছে—

—তা ফুলশয্যার দিন ও সকাল-সকাল ঘর ছেড়ে বেরোল যে? বউমার সঙ্গে কোনও ঝগড়া-টগড়া করে নি তো?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, ঝগড়া কেন করতে যাবে?

কর্তাবাবু বললেন—না, যে-রকম বেয়াড়া ছেলে তোমার, ও সব পারে। যা হোক, ভালোয় ভালোয় যখন মিটে গেছে তখন আর ভয় নেই। আমার তো ওই ভয়ই ছিল কিনা। তা নতুন-বউমা কেমন আছে? কেষ্টনগরের খবরটা তাকে দেওয়া হয়েছে?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, এখনও দেওয়া হয়নি। খবর দেওয়া হবে কি না তাই ভাবছি। খবরটা দিলে তো আবার কান্নাকাটি করবে। তারপর পুরুত মশাইকে জিজ্ঞেস করে তিনি যেমন বলেন তেমনি করা যাবে—

এ সব ঝঞ্ঝাট যখন শেষ হলো, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ক'দিন ধরে যে ধকলটা গেল তা যেন তখন খানিকটা শান্ত হলো। কর্তাবাবু মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। যাক্, তাঁর বংশরক্ষা পেয়ে গেল। আর কোনও ভয় নেই। মনে মনে

ঠিক করলেন তাঁর নাতবউয়ের সন্তান হলে কী দিয়ে তার মুখ দেখবেন। একটা দামী কিছু দিতে হবে। এইটেই বোধ হয় তাঁর শেষ দেওয়া। নাত-বউয়ের সন্তানকে দিলে সেটা তাঁর নিজেকেই দেওয়া হবে। হয় একটা গিনির মালা না হয় একজোড়া হীরের বালা। একজোড়া হীরের বালার কত দাম হবে সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে স্যাকরাকে। বেশ ভালো কমল-হীরে দিয়ে বালাজোড়া গড়াতে হবে। তা টাকা যা লাগে তা তিনি দেবেন।

হঠাৎ নিচেয় শাঁখ বেজে উঠলো। দীনু এল। কর্তাবাবু তার মুখের দিকে চাইলেন। বললেন—কী রে, ওরা রওনা হয়ে গেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু।

—সঙ্গে কে গেল?

—আজ্ঞে, শালাবাবু আর গৌরী পিসী!

কথাটা শুনে আরো নিশ্চিন্ত হলেন কর্তাবাবু। তারপর মনে পড়ে গেল কথাটা। বললেন—একটা কাজ করতে পারিস! রেল-বাজারের কাঞ্চন স্যাকরাকে একবার খবর দিতে পারিস?

—কাঞ্চন স্যাকরা?

কর্তাবাবু বললেন—হ্যাঁ, বলবি সময়মত যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে—

চৌধুরীবাড়ির সদর রাস্তায় তখন দুটো গরুর গাড়ি সামনে পেছনে চলেছে। সামনেটাতে নতুন-বউ নয়নতারা, আর তার পাশে গৌরী। গৌরী পিসী। আর পেছনেরটাতে শালাবাবু। শালাবাবু চিৎকার করে বললে—একটু পা চালিয়ে চলো রজব, একটু পা চালিয়ে চলো, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে—দুর্গা, দুর্গা...

সদর রাস্তা ছেড়ে গাড়ি দুটো বারোয়ারিতলায় পড়লো। বিরাট বিরাট বট আর অশ্বত্থ গাছের ছায়া-ঘেরা বারোয়ারিতলা। বারোয়ারিতলায় দোকানগুলোর মাচার ওপর তখন বিকেলের তাসের আড্ডা চলেছে। হঠাৎ গাড়ির ভেতরে সদানন্দর বউকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। পেছনের গাড়িতে শালাবাবুকে দেখে একটু সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এ কি শালাবাবু, কোথায়? নতুন-বউকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

শালাবাবুর তখন অত সময় নেই বাজে কথা বলবার। বললে—এখন ট্রেন ধরতে হবে ভাই, কথা বলবার সময় নেই—

বলে সামনের গাড়ির গাড়োয়ানকে আবার তাগাদা দিলে—একটু পা চালিয়ে চলো রজব, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে, পা চালিয়ে চলো—

এদিকে বাড়ির ভেতরে সদানন্দকে দেখে মা অবাক হয়ে গেছে। বললে—এ কী রে, তুই কোথায় ছিলি সারাদিন, বাড়িতে এত ঝঞ্ঝাট চললো, আর তোরই দেখা নেই—

প্রকাশ মামা থাকলে এতক্ষণে হই-হই লাগিয়ে দিত। কিন্তু প্রকাশ মামাও নেই, গৌরী পিসীও নেই। যারা দুজন বাড়ি জমিয়ে রাখে তারা কেউই নেই। বাড়িতে আস্তে আস্তে ঢুকেই লোকজন না দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল সদানন্দ। কদিন আগেও এখানে ভিড় ছিল। পুকুরের পাড়ের দিকে ভিয়েন বসেছিল। বারোয়ারিতলার তাসের আড্ডার সবাই-ই এখানে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল। বউ দেখেও খুব তারিফ করেছে তারা। সকাল বেলা বারোয়ারিতলায় যেতেই সবাই ধরেছে—কী রে, এত সকালে?

সদানন্দ বললে—বাড়িতে আর ভালো লাগলো না ভাই, বড্ড ভিড়—

গোপাল যাট বলে—কাল তোদের বাড়িতে খুব খেয়েছি রে, একেবারে পেট ফেটে যাবার দাখিল—

কেদার বললে—তা কী রকম বউ হলো বল্ সদা, পছন্দ হয়েছে তো তোর?

পছন্দর কথা শুনে আশেপাশে যারা শুনছিল সবাই কেদারের কথায় হেসে উঠেছে। অমন যার বউ তার আবার পছন্দর কথা ওঠে নাকি! নতুন বরকে দেখে ক্রমে ক্রমে আরো ভিড় জমে উঠলো মাচার ওপর। এতকাল ধরে এই সদানন্দকে তারা দেখে আসছে, অথচ সকলের কাছে আজ রাতারাতি যেন সে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। এই মানুষটাই তাদের সঙ্গে এতদিন আড্ডা দিয়েছে, কথা বলেছে, তাস খেলেছে, যাত্রা করেছে, উঠেছে, বসেছে, তবু যেন সে আজ একটা রাত্রের মধ্যেই সম্পূর্ণ এক অচেনা মানুষ হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। সকলেরই জানতে ইচ্ছে করছে গোপনে শুনে নেয় তার ফুলশয্যার রাতটা কেমন কাটলো। ওর ফুলশয্যা কি ঠিক আমার মত? সকলেরই নিজের নিজের ফুলশয্যার রাতের কথা মনে পড়তে লাগলো। নিজেদের সঙ্গে সদানন্দর ফুলশয্যার ঘটনাটা একবার মিলিয়েও নিতে চাইলে সবাই। অত সুন্দরী বউ বরের সঙ্গে প্রথমে কী কথা বললে সেটাও তাদের জানতে হবে। কিন্তু সদানন্দ শুধু হাসতে লাগলো।

ভৈরব বললে—কী রে, হাসছিস যে?

সদানন্দ বললে—তোদের কথা শুনে ভাই—

—কেন, আমরা গরীব বলে কি মানুষ নই, না আমাদের কালো বউ বলে সে আর বউ নয়?

একজন বলে—ওরে না, যা ভাবছিস তা নয়, অন্ধকারে কালো বউও যা ফরসা বউও তাই, সব সমান!

—তুই থাম্—বলে ধমকে উঠলো কেদার। বললে—তুই যা জানিস না, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস নি। তুই বিয়ে করিস নি, বিয়ের মর্ম তুই কী বুঝবি রে?

কথাটা মর্মে মর্মে সত্যি। সবাই-ই স্বীকার করলে বিয়ে না করলে বিয়ের মর্ম বোঝা যায় না। সবাই বললে—তুই এখেন থেকে যা দিকিনি, যা চলে যা—

এতগুলো বিবাহিত লোকের মধ্যে থেকে অবিবাহিতকে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেওয়া হলো। এবার সবাই গোল হয়ে বসলো সদানন্দকে ঘিরে। বললে—এবার বল্ ভাই, কী হলো তোর?

সদানন্দ বললে—কিছ্ছুই হয় নি—

—কিছ্ছু হয় নি মানে? আমাদের বোকা পেয়েছিস তুই?

সদানন্দ বললে—ওসব কথা থাক ভাই, অন্য কথা বল্—

কিন্তু অন্য কথা বলতে তখন কার ভালো লাগে! এর পরে যখন প্রসঙ্গটা পুরোন হয়ে যাবে তখন তো কেউ আর এসব কথা তুলবেও না সদানন্দর কাছে। তখন সদানন্দ এই সব লোকদের মতই সাধারণ হয়ে যাবে।

হঠাৎ গরুর গাড়ি দুটো দেখে কেদার বলে উঠলো—ওরে, তোর বউ বাপের বাড়ি যাচ্ছে রে, ওই দ্যাখ—

গাড়ি দুটো সামনে পেছনে চলেছে রেল-বাজারের দিকে। কেদার চিৎকার করে উঠলো—একি শালাবাবু, কোথায়? নতুন বউকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

শালাবাবু সেদিকে না চেয়েই বলে উঠলো—এখন ট্রেন ধরতে হবে ভাই, কথা বলবার সময় নেই—

গাড়ি দুটো জোর কদমে ছুটে চলতে লাগলো। সকলেই সদানন্দর দিকে চাইলে। জিজ্ঞেস

করলে—কী রে, তোর বউ সাত-তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ি যাচ্ছে কেন রে? এই তো সবে কাল বউভাত হলো, এরই মধ্যে চলে গেল?

ভৈরব বললে—তাহলে আজ রাতটা তোর বালিশ আঁকড়ে কাটবে সদা—তোর বরাতটাই খারাপ—

সদানন্দ বললে—আমি উঠি ভাই—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। মনে হলো এবার যেন আর কোনও বাধা নেই তার সামনে। সে যেন এবার স্বাধীন।

সবাই বলে উঠলো—কী রে, ওদিক কোথায় যাচ্ছিস্?

সেই সকাল থেকে আড্ডা দিয়েছে সে বারোয়ারিতলায়। তারপর আড্ডা দিতে দিতে সময়ের জ্ঞান ছিল না তার। একেবারে সোজা পশ্চিম দিকের রাস্তাটা ধরলে। যেতে যেতে বললে—একটা কাজ আছে ভাই পশ্চিমপাড়ায়—

আসলে পশ্চিমপাড়াও নয়, দক্ষিণপাড়াও নয়। মনে হলো সে যেন সমস্ত পৃথিবীটাই পরিক্রমা করে আসতে পারে এখন। তবু তার ক্লান্তি আসবে না, তবু তার শ্রান্তি আসবে না।

কেদার বললে—নতুন বিয়ে করে সদাটার মুণ্ডুটা ঘুরে গেছে। ও-রকম সকলেরই হয়—

বাড়িতে আসতেই মা বললে—শুনেছিস, তোর শাশুড়ী মারা গেছে, কেষ্টনগর থেকে লোক এসেছিল, তাই বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম।

সদানন্দ হাঁ না কিছুই বললে না। যেমন খেতে হয় তেমনি খেয়ে নিলে। মা আঁচল থেকে চাবির গোছা থেকে একটা চাবি খুলে দিয়ে বললে—তোর ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছি, বউমার জিনিসপত্তর রয়েছে তো, তাই! এই নে চাবি—

চাবি নিয়ে সদানন্দ ঘরের দরজাটা খুললে। খুলতেই একটা কেমন-কেমন মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ। পেছনের দিকের দরজাটাতেও আজ তালাচাবি পড়ে গেছে। কোথাও কোনও দিক দিয়ে আর পালাবার পথ নেই। ঘরের কোণের দিকের আল্‌নায় একটা কোঁচানো শাড়ি, তার পাশে একটা ব্লাউজ।

মা হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলো—কী রে, আজকে ঘরে শুবি তো ঠিক? না শুস্ তো বল্! বউমার বাক্স-প্যাঁটরা সব রয়েছে, সেগুলো তাহলে আমার ঘরে সরিয়ে রাখবো।

সদানন্দ তবু কিছু কথা বললে না। মা'র মনে হলো হয়তো ছেলের মতিগতি ফিরেছে।

বললে—তাহলে আমি চলি, তুই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়—

সদানন্দ গায়ের জামাটা খুলে রাখলে। তারপর আলোটা নেবাবার আগে ছাদের কড়িকাঠের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। কই, সেই কপিল পায়রাপোড়ার ঝুলন্ত শরীরটা তো আর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল সেটা? নিজের গেঞ্জিটার দিকেও চেয়ে দেখলে। সেই কালীগঞ্জের বউ-এর রক্তের দাগটাও তো কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। কেন এ-রকম হলো? এমন তো হবার কথা নয়। তবে কি সব দাগ মুছে গেল এক রাত্রেই! একটা ফুলশয্যার রাত্রের প্রলেপের এত ক্ষমতা! সদানন্দর মনে হলো তখনও যেন সেই গন্ধটা নাকের কাছে ঘুর-ঘুর করছে। ক'ঘণ্টা আগেও একটা মানুষ এ-ঘরে ছিল। তার শরীরের আর তার যৌবনের সান্নিধ্যের স্পর্শ যেন এই ঘরের সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে তখনও। একটা ছাড়া শাড়ির কোঁচানো কুটিলতার মধ্যে যেন তার মনটাকে সে এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে দেখছে। দেখছে শাড়িটা আর ব্লাউজটা সে সকলের দৃষ্টির অগোচরে একবার স্পর্শ করে কি না। তার স্পষ্ট ধারণা সদানন্দ ওগুলো স্পর্শ করবেই,

ওগুলোর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সদানন্দ বাঁচতে পারবে না। তার পূর্বপুরুষ এক মোহিনী জাল বিছিয়েছে তাকে অভিভূত করবার জন্যে। সে তাতে ধরা পড়বেই, সে তাতে ধরা পড়ে ধ্বংস হবেই—

বোধ হয় সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার দরজায় ঠক্‌ঠক্ করে টোকা পড়লো। বাইরে মা ডাকছে!

—ও খোকা, খোকা, ওরে, দরজা খোল্—বউমা এসেছে!

সদানন্দ কী করবে বুঝতে পারলে না। কেষ্টনগরে যার যাবার কথা, কেষ্টনগরেই যার দু'তিন দিন থাকবার কথা, সে হঠাৎ আবার ফিরে এল কেন?

—ওরে খোকা, দরজা খোল্। বউমা এসেছে। কেষ্টনগরের ট্রেন ফেল করে আবার এখানে ফিরে এসেছে, দরজা খোল—

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ মামার গলাও শোনা গেল। আশ্চর্য, ঠিক আজকেই কিনা তাদের ট্রেন ফেল করতে হয়!

সদানন্দ দরজাটা খুলে দিলে।

বাইরে অল্প-অল্প আলো। সেই আধো-অন্ধকারের মধ্যে মূর্তিটা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সদানন্দ দরজা খুলতেই নয়নতারা আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে এগিয়ে এল।

সদানন্দ বউ-এর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে।

পেছন থেকে তখন প্রকাশ মামার গলা শোনা গেল—আমরা স্টেশনে গেছি আর ট্রেনটাও ঠিক সেই সময়ে ছেড়ে দিলে—

গৌরী পিসীও ফিরে এসেছে। সেও বলে উঠলো—কপালের দুর্ভোগ বউদি, গায়েগতরে একেবারে ব্যথা হয়ে গেল, অথচ কোনও লাভ হলো না।

মা বললে—বউমার খুব কষ্ট হলো মাঝখান থেকে—

সদানন্দ তখনও পাথরের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কী যে সে করবে তা বুঝতে পারলে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, না ঘরেই থাকবে! নাকি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হয়ত প্রকাশ মামা আবার তাকে দেখতে পাবে!

হঠাৎ কী যে হলো, নয়নতারার দিকে একটু এগিয়ে গেল সদানন্দ। একটা কিছু কথা বলা তার উচিত। কাল সে ঘর থেকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন সে বেরিয়ে গিয়েছিল তা নয়নতারাকে বলা হয় নি। আর কাউকে না বললে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তার নিজের বিয়ে করা বউকে অন্ততঃ কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।

সদানন্দ নয়নতারার কাছে গিয়ে বললে—দেখ—

কিন্তু কিছু বলার আগেই নয়নতারা ফোঁস করে উঠেছে। বলে উঠল—আমাকে ছুঁও না—

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেছে। সদানন্দ মাথাটা বালিশ থেকে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখলে। কই, কেউ তো কোথাও নেই। ঘর অন্ধকার। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো সে। তারপর আলোটা জ্বাললে। দরজায় যেমন খিল দেওয়া ছিল, তেমনিই রয়েছে। কেউ কোথাও নেই! ঘরের ভেতরে সে একলাই শুয়ে ছিল এতক্ষণ। ঘরে কেউই ঢোকে নি। আলনার ওপর কোঁচানো শাড়ি আর পাট-করা ব্লাউজ। তখনও একভাবে একই জায়গায় রয়েছে। কেউ তা স্পর্শ করে নি। আশ্চর্য—আশ্চর্য স্বপ্ন তো! কিন্তু স্বপ্নই যদি দেখতে হয় তো এমন স্বপ্ন দেখল কেন সে? কেন সে এমন স্বপ্ন দেখলে?

আলোটা নিবিয়ে আবার সে বিছানায় গিয়ে শুলে। আবার সব অন্ধকার। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে একটু। মনে হলো আর কোনও ভয় নেই। ট্রেন তারা ফেল করে নি। মিছিমিছি সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ তারা তিনজনেই হয়ত কেষ্টনগরে পৌঁছে গিয়েছে।

এতক্ষণ হয়ত খুবই কান্নাকাটি করছে তার স্ত্রী। বিয়ের একদিন পরেই মা মারা গেল। এমন তো সাধারণত হয় না।

কিন্তু অত ভাবতে গেলে সদানন্দর চলবে না। সে কারো স্বার্থ কারো ভালোমন্দ দেখবে না। তার স্বার্থ, তার ভালোমন্দের কথা কি কেউ কোনও দিন ভেবেছে! সবাই শুধু তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছে। তার দাদু চেয়েছে এই বংশ, এই বংশের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা অক্ষয় করতে। তার বাবা চেয়েছে সদানন্দ যেন বংশের ধারাকে জীইয়ে রেখে দেয়। কেউ আর কিছু চায় না তার কাছ থেকে। সদানন্দর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কারো কাম্য নয়।

কালীগঞ্জের বউ সেদিন সদানন্দকে সেই কথাই বলেছিল। বলেছিল—তুমি কেন আমার কথা ভাবছো বাবা? তোমার বিয়ে হবে, তোমার সংসার হবে, তোমার ছেলে হবে, তোমার সামনে এখন মস্ত লম্বা ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, আমার তো গঙ্গামুখো পা, আমি যেতে পারলেই এখন বাঁচি। আমার কথা আর তুমি ভেবো না বাবা—

বালিশের ওপর মুখটা গুঁজে বার বার কথাগুলো না-ভাববারই চেষ্টা করতে লাগলো সদানন্দ। সত্যিই সে কেন কালীগঞ্জের বউ-এর কথা ভাবে! কেন সে কপিল পায়রাপোড়ার কথা ভাবে! কেন সে মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিকের কথা ভাবে! পৃথিবীর আর কেউ তো তার মত এত বাজে কথা ভাবে না!

না, সদানন্দ এবার আর কিছু ভাববে না। এবার কারোর কথা সে ভাববে না। শুধু নিজের কথা ভাববে। নিজের স্বার্থের কথা, নিজের সুখের কথা। কোথাকার কে কপিল পায়রাপোড়া, কোথাকার কে কালীগঞ্জের বউ, তারা তো আর এ পৃথিবীতে নেই। তাদের কথা ভেবেও তো সে তাদের কোনও উপকার করতে পারবে না। তারা মারা গেছে। তাদের দলে কেউ নেই। তাদের পুলিস নেই, দারোগা নেই, আইন নেই, গভর্নমেন্ট নেই, সমাজও তাদের বিরুদ্ধে। কেন তাদের কথা সে ভাববে! কেন তাদের কথা ভেবে সে মন খারাপ করবে! তার চেয়ে সে বরং নিজের কথাই ভাববে। নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের স্ত্রী, নিজের সম্পত্তির কথা ভাববে। এই পারিবারিক লাখ-লাখ টাকার জমিদারি, এসব কী করে আরো বাড়ানো যায়, কী করে পরের জমি কোন্ কৌশলে দখল করে নিজের সম্পত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ করা যায় কেবল সেই কথাই সে ভাববে।

এবার নয়নতারা যদি আসে তা হলে এই ঘরেই সে রাত্রে শোবে। এই ঘরের বিছানাতেই সে তার স্ত্রীর সঙ্গে শোবে।

তারপর আস্তে আস্তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেও জানতে পারল না।

বহুদিন আগের আর একটা দিনের ঘটনা। নবাবগঞ্জে তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। গ্রামের লোক শীত পড়লেই ভোরবেলা উঠোনে বেরিয়ে পড়ে। খোলা-মেলা চারিদিক। তখন ক্ষেতেও কাজ থাকে না কারো। তখন ধান কাটা হয়ে গেছে, পাটও উঠে গেছে। ক্ষেতে শুধু তখন সরষে। সরষে ক্ষেত তখন শুকিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির বাইরে চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিমে উঠোনময় সরষে ছড়ানো। চারদিকে বাকারির বেড়া দেওয়া থাকে। যাতে গরু-ছাগল এসে খেয়ে না যায়। সেই সরষে রেটে বেছে মরাইতে তুলতে হবে। তারপর খেপে খেপে যাবে রেলবাজারের প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই-এর আড়তে। সেখান থেকে নগদ টাকা আসবে নরনারায়ন চৌধুরীর সিন্দুকে। সেই টাকা দিয়ে আবার জমি কেনা হবে

সেই জমিতে আবার ফসল ফলবে। এই জমি কেনা আর ফসল ফলানো আর ফসল বেচার টাকায় নরনারায়ণ চৌধুরী মশাই পঙ্গু পা'দুটো নিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অখণ্ড সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখবে আর সেই স্বপ্নের নেশাতেই বছরের পর বছর পরমায়ু নিঃশেষ করে দেবে।

ছোটবেলায় সদানন্দ ওই ধান মাড়া, পাট-কাচা, সরষে ভাঙা দেখতো। বিধু কয়াল সেগুলো আবার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতো। চৌধুরী মশাই অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো বিধুকাকা, এত সরষে কে খাবে গো?

বিধু কয়াল বলতো—কে আবার খাবে, লোকে খাবে—

সদানন্দ বলতো—তা এত সরষে লোকে খেতে পারবে?

বিধু কয়াল হাসতো। বলতো—পৃথিবীতে লোক কি কম খোকাবাবু লোকের শেষ নেই। পৃথিবীতে রোজ কত লোক জন্মাচ্ছে, তা জানো?

—কত লোক?

—কোটি কোটি লোক জন্মাচ্ছে। আবার কোটি কোটি লোক মরছেও। যত লোক জন্মাচ্ছে সবাই এই চাল, ডাল, সরষে সব খাবে।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—কী করে জন্মায় এত লোক?

বিধু কয়াল বলতো—সে-সব তুমি এখন বুঝবে না, বড় হলে তবে বুঝতে পারবে। সদানন্দ বলতো—তুমি বলো না, আমি তো বড় হয়েছি, আমি ঠিক বুঝতে পারবো—

বিধু কয়াল তবু বলতো না। কিংবা হয়তো ও সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইত না ছোট ছেলের সঙ্গে। আর অত কথা বলবার হয়ত সময়ও ছিল না বিধু কয়ালের। তার অনেক কাজ ছিল। যখন দাঁড়িপাল্লার কাজ থাকতো না তখন তাকে অন্য কাজ দেওয়া হতো। কাজ কি চৌধুরী মশাই-এর বাড়িতে একটা! গোয়ালের গরু দেখবার রাখাল ছিল, ক্ষেত-খামারে কাজ করবার জন্যে কৃষাণ ছিল, মাল ওজন করবার কয়াল ছিল, কাছারির কাজ করবার গোমস্তা ছিল। তার ওপর ছিল সংসারের কাজ-কর্ম দেখাশোনার লোক। লোকে-লোকে ভর্তি ছিল সেই বাড়ি। ভোরবেলা থেকে চৌধুরীদের বাড়িতে কাজ শুরু হতো, সে-কাজ শেষ হতো সন্ধ্যের পর। সন্ধ্যের পরেই যেন একটু ঠাণ্ডা হতো নবাবগঞ্জ।

তা সেই বিধু কয়ালই একদিন হঠাৎ মারা গেল।

সে এক কাণ্ড বটে! একদিন হঠাৎ হই-হই পড়ে গেল চৌধুরীবাড়িতে। কী হয়েছে, না বিধু কয়ালকে সাপে কামড়েছে। সবাই ছুটলো বিধু কয়ালের বাড়িতে। বিধু কয়ালের বাড়িতে কখনও আগে যায় নি সদানন্দ। গিয়ে দেখলে মাটির দাওয়ার ওপর বিধু কয়াল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর একজন বুড়ো ওঝা মন্তর পড়ছে। ঝাড়-ফুঁক করছে। মনে আছে সদানন্দ একদৃষ্টে সেই বিধু কাকার দিকে চেয়ে দেখছিল। সে কী বীভৎস মৃত্যু! কপিল পায়রাপোড়ার মৃত্যু এক-রকম, সেও বীভৎস। সে-ও এক রকমের অপমৃত্যু। কিন্তু বিধু কয়ালের অপমৃত্যু যেন অন্য রকম। বিধু কাকার অপমৃত্যুর জন্যে সে যে কাকে দায়ী করবে তা সেদিন ঠিক করতে পারে নি। সকলকে জিজ্ঞেস করেছিল সদানন্দ। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে, মাকে জিজ্ঞেস করেছে। গৌরী পিসীকে জিজ্ঞেস করেছে। এমন কি প্রকাশ মামাকেও জিজ্ঞেস করেছে। প্রকাশ মামা ভাগ্নের কথা শুনে অবাক। বলেছে—আরে, সাপে কামড়ালে মানুষ মরবে না? আবার তেমনি বাগে পেলে যে মানুষও আবার সাপকে মেরে ফেলে! যে-যাকে বাগে পায় তাকেই মারে, বুঝলি না?

সদানন্দ তবু বুঝতে পারে নি। বলেছে—তার মানে?

—তার মানে সবাই সবার শত্রু। সবাই সবাইকে বাগে পাবার চেষ্টা করছে। এই যেমন দ্যাখ্ না, তোর দাদু কপিল পায়রাপোড়াকে বাগে পেয়েছিল তাই সে মরলো, আবার কপিল পায়রাপোড়া যদি তোর দাদুকে বাগে পেত তো তোর দাদুকেও তাহলে মরতে হতো। এই-ই তো নিয়ম রে। এই নিয়মেই তো দুনিয়া চলছে—

কথাটা অনেক দিন ধরে সদানন্দকে খুব ভাবিয়েছিল। সদানন্দ মাঝে মাঝে বিধু কয়ালের কথা ভাবতো। তারপর সেই বিধু কয়ালের জায়গায় একদিন তার ছেলে শশী কয়াল এল। তখন থেকে শশী কয়ালই তাদের বাড়িতে কাজ করতো। শশী কয়ালও ঠিক তার বাবার মত ধান মাপতো, পাট মাপতো, সরষে মাপতো। সদানন্দ তাকে দেখতো আর ভাবতো, দাদু কবে তাকেও হয়ত বাগে পাবে।

একদিন শশীকেও সদানন্দ জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা শশী, তুমি কাকে বাগে পাবার চেষ্টা করছো বলো তো?

শশী কয়াল তো অবাক! বললে—তার মানে?

সদানন্দ বললে—তার মানে জানো না?

—না।

সদানন্দ বললে—নিশ্চয় মানে জানো তুমি, আমার কাছে বলছো না শুধু। তুমি নিশ্চয়ই কাউকে খুন করবার চেষ্ট করছো। সবাই সেই চেষ্টাই করে। এই-ই নিয়ম। এই নিয়মেই দুনিয়া চলছে—

শশী তার হাতের কাজ থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। সদানন্দর দিকে। খোকাবাবু বলছে কী!

কাছ দিয়ে চৌধুরী মশাই যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী শশী, কী কথা হচ্ছে তোমাদের?

শশী বললে—আজ্ঞে, দেখুন না খোকাবাবু কী বলছে, আমি নাকি কাকে খুন করার মতলব করছি!

—তার মানে?

চৌধুরী মশাইও অবাক। সদানন্দর দিকে চেয়ে চৌধুরী মশাই বললেন—কে তোমাকে এ-সব কথা বললে? শশী কাকে খুন করবে?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আমি জানি—

—জানি মানে? কী জানো তুমি?

সদানন্দ বললে—সবাই সবাইকে খুন করবার মতলব করছে!

চৌধুরী মশাই আরো অবাক। বললেন—এ-সব বাজে কথা কে তোমাকে শেখালে?

সদানন্দ বললে—প্রকাশ মামা।

—প্রকাশ মামা?

—হ্যাঁ, প্রকাশ মামা বলেছে। কেন, বিধু কাকাকে সাপে কাটে নি? কপিল পায়রাপোড়াকে দাদু খুন করে নি?

এরপর আর কথা বলেন নি চৌধুরী মশাই। তখনই ছেলেকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে চলে গিয়েছিলেন, তারপর অনেক জেরা করতে লাগলেন ছেলেকে। কে তাকে এ-সব কথা বলেছে। কে শিখিয়েছে তাকে এ-সব প্রশ্ন। সব কথার উত্তরেই সদানন্দ বললে—প্রকাশ মামা!

প্রকাশ মামাকেও ডাকা হলো, চৌধুরী মশাই তাকেও জেরা করলেন—এই সব কথা তুমি শিখিয়েছ সদানন্দকে?

প্রকাশ মামা বললে—আমি? আমি কেন শেখাতে যাবো জামাইবাবু? আমার দায় পড়েছে। সদা কি ভাবছেন সোজা ছেলে? ও আমাকে সব শেখাতে পারে, তা জানেন?

রাত্রে গৃহিণীকে গিয়ে চৌধুরী মশাই সব কথা বললেন—তোমার ভাই কিন্তু খোকাকে খারাপ করে দিচ্ছে, ওর সঙ্গে খোকাকে বেশি মিশতে দিও না—

গৃহিণী বললে—কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। ছেলেমানুষ কী বলেছে তাই নিয়েই তুমি মাথা ঘামাচ্ছো? তুমি তোমার নিজের কাজ-কম্মো নিয়ে থাকো না, ছেলেমানুষদের কথায় অত কান দিতে গেলে চলে?

এরপর আর কোনও কথা হয় নি এ-সম্বন্ধে। সদানন্দ নিঃশব্দে বড় হয়েছে। সে যা দেখবার তা দেখেছে যা শেখবার তা শিখেছে। কী দেখেছে আর কী শিখেছে তা জানবার সুযোগ হয় নি কারো। চৌধুরী মশাই ব্যস্ত ছিলেন তাঁর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আর প্রীতি জড়িয়ে পড়েছিল সংসারের বেড়াজালে। প্রীতির তখন রোজ নতুন করে গয়না গড়ানো হতো আর দুদিন পরেই তা কাঞ্চন স্যাকরাকে দিয়ে ভেঙে আবার অন্য প্যাটার্নের গয়না গড়ানো হতো। তখন ছেলে ছোট। মা-বাবা ভেবেছে ছেলে যেমন ছেলেমানুষ আছে, তেমনি বরাবর ছেলেমানুষই থাকবে, কিন্তু সেই রবারের বেলুন কেনা থেকে শুরু করে কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, আর ফটিক প্রামাণিকের হয়রানির ঘটনাগুলো যে সে এতদিন ধরে মনের ভেতর পুষে রাখবে তা কে কল্পনা করতে পারবে? শশী কয়ালকেই বা কেন সে তার বাবা বিধু কয়ালের কথা জিজ্ঞাসা করবে? আর কালীগঞ্জের বউ?

পরের দিন যথারীতি সকাল হলো।

সদানন্দ সকালবেলাই খেয়ে-দেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল। আগের দিনের লোকজনের আনাগোনাও আর নেই। হট্টগোলও তেমনি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকাশ মামা নেই, গৌরী নেই। দুটো লোকের অনুপস্থিতিতে সমস্ত বাড়িটাই যেন তখনও খাঁ-খাঁ করছে।

চৌধুরী মশাই দুপুরবেলা ভেতর-বাড়িতে খেতে এসেছিল। খেয়ে উঠে নিজের শোবার ঘরে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। খানিক পরে প্রীতিও এল।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—খোকা কোথায়? সে খেয়েছে?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, খেয়েই বেরিয়ে গেল।

—কোথায় গেল?

প্রীতি বললে—তা আমি কী করে বলবো? সে কি কখনও আমাকে বলে যায়?

—কালকে রাত্তিরে তো নিজের ঘরেই শুয়েছিল? বউমা এলেও ওই ঘরেই শোবে তো এবার থেকে?

প্রীতি বললে—আমি তো সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। তা কিছু জবাব দিলে না।

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড না বাধিয়ে বসে! ও যা ছেলে, ও সব পারে. কেন শুচ্ছে না তার কারণটা কিছু বলেছে ও তোমাকে?

প্রীতি বললে—ওর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। ওকে বললে ও কোথাকার কে কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, কোন্ ফটিক প্রামাণিক, কালীগঞ্জের বউ তাদের কথা তোলে। তা আমি তাই ওসব কথা আর জিজ্ঞেসও করি না, ও-সব বুঝিও না।

চৌধুরী মশাই যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—পাগল, একেবারে আস্ত পাগল! কই, দেশে-গাঁয়ে তো এত ছেলে আছে, এত ছেলে বিয়ে করছে, কেউ তো এমন পাগলামি কখনও করে নি!

প্রীতি বললে—তা যাদের নাম করছে ও, তারা কারা? তারা ওর কী করেছে?

চৌধুরী মশাই বললেন—ভগবান জানে! কে যে ওর মাথায় ওই সব কথা ঢোকালে তাই-ই ভেবে পাচ্ছি না। ও নিশ্চয়ই প্রকাশের কাণ্ড!

প্রীতি বললে—প্রকাশ? প্রকাশের নামে কেন দোষ চাপাচ্ছো শুনি? দোষ করলো তোমার ছেলে আর দায়ী হলো প্রকাশ—তুমি সব ব্যাপারে প্রকাশকে দায়ী করো কেন বলো তো?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা ছোটবেলা থেকে প্রকাশই তো ওকে নিয়ে ঘুরছে। কোথায় রাণাঘাটে নিয়ে গিয়েছে যাত্রা শুনতে। কোথায় ঢপ কীর্তন হচ্ছে সেখানে নিয়ে গেছে। আমি তো তখন থেকেই তোমাকে বারণ করেছিলুম ওর সঙ্গে মিশতে দিও না—তুমি আমার কথা শুনতে না—এখন যা হবার তাই হয়েছে—

প্রীতি বললে—এখন যত দোষ সেই আমার ঘাড়েই পড়লো। তোমার ছেলে, তুমি সব সময় নিজের কাছে রেখে দিলেই তো পারতে।

চৌধুরী মশাই বললেন—তা আমার কি আর কোনও কাজকর্ম নেই? ছেলে ঘাড়ে করে নিয়ে থাকলে আমার চলবে? নানান ঝঞ্চাটের মধ্যে আমাকে থাকতে হয়, আমি কখন খোকাকে দেখি বলো দিকিনি? তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো, তুমি দেখবে না তো কে দেখবে?

প্রীতিরও রাগ হয়ে গেল। বললে—তা তোমার একলারই বুঝি কাজ আছে, আর আমি ঝাড়া হাত-পা, না? আমার কোনও কাজ নেই বুঝি? এই যে এতগুলো লোক বাড়িতে পুষেছ তাদের তদারকি কে করে শুনি? তার বুঝি কোনও মেহনৎ নেই?

চৌধুরী মশাই দেখলেন কথাগুলো ঝগড়ার দিকে মোড় নিচ্ছে। আর বিশ্রাম নেওয়া হলো না। আর একটু হলে একেবারে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। তিনি উঠলেন।

বললেন—একবার চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যাই। প্রকাশ বোধ হয় এবার আসবে, তাদের আসবার টাইম হলো!

বলে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। আবার ফিরে এলেন।

বললেন—একটা কথা, একজন বলছিল নানা রকম দৈব ওষুধ নাকি দেয় একজন সাধু—

—দৈব ওষুধ?

—হ্যাঁ, সবাই নাকি ফল পেয়েছে। হাঙ্গামা কিছু নেই, শুধু হাতে পরলেই কাজ হয়।

প্রীতি বললে—মাদুলি?

চৌধুরী মশাই বললেন—মাদুলিও দেয়, খাবার ওষুধও দেয়। ব্যাপারটা আমি ঠিক পুরোপুরি জানি না। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি—

প্রীতি বললে—তোমার ছেলে যা, ও কি মাদুলি-টাদুলি পরবে?

—ছেলে না পরে বউমা পরবে! বশীকরণ-টশীকরণ কত রকম জিনিস তো থাকে ওদের। কাল রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে আমি তাই ভাবছিলুম।

প্রীতি বললে—ছেলে পরবে না। বউমা পরলে যদি কাজ হয় তো না হয় চেষ্টা করে

দেখতে পারি। কিন্তু খাবার ওষুধ আমি খাওয়াতে পারবো না, শেষকালে কী হতে কী হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। তখন উল্টে উৎপত্তি হয়ে যাবে হয়ত —

—দেখি, সে লোকটার এখনি আসবার কথা আছে—

বলে চৌধুরী মশাই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে এগোতে লাগলেন।

বিকেল বেলার দিকেই হুই-হুই করে প্রকাশ মামা আর গৌরী পিসী এসে হাজির হলো। তারা কেষ্টনগরে বউমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এক রাত সেখানে কাটিয়ে ভোরের ট্রেনে আবার এসেছে। এসব কাজে প্রকাশ মামার জুড়ি নেই। শুধু তাকে মাতব্বরী করতে দিতে হবে। অর্থাৎ মোড়লী। মোড়লী করতে পেলে আর কিছু চায় না প্রকাশ মামা।

গৌরী এসেই সোজা ভেতর-বাড়িতে ঢুকেছে।

কিন্তু সদানন্দ যখন বাড়ি ঢুকলো তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে। সকালে খেয়ে দেয়ে সেই যে বেরিয়েছিল তখন থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়িতে কী ঘটেছে তা তার জানা ছিল না। চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসতেই চৌধুরী মশাই ভেতর থেকে দেখতে পেয়েছেন।

ডাকলেন—শোন—

সদানন্দ ভেতরে ঢুকতেই দেখলে চৌধুরী মশাই-এর সামনে কে একজন বসে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। তেল-চক্‌চকে মুখের চামড়া। গায়ে একটা নামাবলী। আর দুটো ভুরুর মধ্যে কপালে একটা মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ।

চৌধুরী মশাই ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—এঁকে প্রণাম করো—

সদানন্দ কী করবে বুঝতে পারলে না। কে এ, কেন এখানে এসেছে! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসী মানুষের মত।

—করো, প্রণাম করো। কী, দেখছো কী চেয়ে?

সদানন্দ বললে—কেন, প্রণাম করবো কেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—ইনি তোমার ভালো করবেন, এঁকে প্রণাম করলে তোমার ভালো হবে।

সদানন্দ বললে—আমার কী ভালো করবেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি তো বড় তর্ক করো দেখছি। আমি যা বলছি তাই করো না। প্রণাম করলে তোমার ক্ষতিটা কী?

সদানন্দ বললে—আমার ভালোর দরকার নেই, আমি প্রণাম করবো না। যাকে-তাকে আমি প্রণাম করবো কেন?

চৌধুরী মশাই আর থাকতে পারলেন না। হঠাৎ রাগের ঝোঁকে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো? আমি বলছি ওঁকে প্রণাম করো।

সদানন্দ তবু নির্বিকার। বললে—আমি তো বলেছি আমি প্রণাম করবো না, আবার কতবার বলবো?

—প্রণাম করবে না?

—না।

এর পর চৌধুরী মশাই ঝোঁকের মাথায় কী করে ফেলতেন বলা যায় না, কিন্তু সেই

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন। বললেন—থাম্, তুই থাম্—

সামান্য কথা, সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী মশাই জল হয়ে গেলেন। যেন মন্ত্রের মত কাজ হলো।

চৌধুরী মশাই সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বললেন—দেখলেন তো বাবা, আমার ছেলে কী রকম বাপের অবাধ্য! কেমন মুখের ওপর আমার কথার জবাব দিচ্ছে! আমি কোথায় ছেলের ভালোর জন্যে ভাবছি, আর ছেলে কী রকম ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে, দেখলেন তো?

সন্ন্যাসী বললেন—তুই শান্ত হ, মাথা গরম করিস নি, সব ঠিক হয়ে যাবে—

—ঠিক হবে বাবা? সব ঠিক হবে?

সন্ন্যাসী ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ রে, সব ঠিক হয়ে যাবে!

চৌধুরী মশাই তখন আবার নিজের জায়গায় বসে পড়েছেন বটে, কিন্তু উত্তেজনায় তখনও হাঁফাচ্ছেন। বললেন—জানেন বাবা, এই ছেলের জন্যেই আমি কী করেছি জানেন? হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি ওর পেছনে। যাতে ও মানুষ হয়, যাতে ও দশজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার জন্যেই তো খরচ করেছি। নইলে আমার আর কী স্বার্থ? আমি আর কদিন? আমি যা কিছু রেখে যাবো একদিন ও-ই তো তার মালিক হবে। কিন্তু এ এমনই নেমকহারাম যে আমার মুখের ওপর কথা বলে! এত বড় ওর আস্পর্ধা!

সন্ন্যাসী ভদ্রলোক কিন্তু এত কথার পরও বিচলিত হলেন না। হাসতে হাসতেই বলতে লাগলেন—সব ঠিক হয়ে যাবে রে, তুই কিছ্ছু ভাবিস নি। আমি যখন এসে পড়েছি তখন তোর আর কিছ্ছু ভাবনা নেই—

চৌধুরী মশাই যেন বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন—সেই জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি বাবাজী! এখন আপনিই আমার ভরসা—

বাবাজী বললেন—তোর ভাগ্য খুব ভালো যে ঠিক সময়েই আমার দেখা পেয়েছিস—

তারপর সদানন্দর দিকে চেয়ে বললেন—তোর নাম কী রে বেটা?

সদানন্দ ক্ষেপে উঠলো। বললে—আমাকে বেটা বলছো কেন?

বাবাজী সদানন্দর কথা শুনে কোথায় রেগে উঠবেন তা নয়, হো-হো করে একেবারে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন—এখনও রক্ত গরম আছে তো, তাই গরম গরম কথা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। এখনও ষড়ৈশ্বর্যের জাঁক যায় নি!

তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সদানন্দের কপালের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখেলেন।

বললেন—আরে, তোর কপালে যে ভৃগুপদচিহ্ন রয়েছে রে! কী আশ্চর্য, আগে তো দেখি নি—

চৌধুরী মশাই বললেন—ভৃগুপদচিহ্ন? তার মানে? তার মানে কী বাবাজী?

বাবাজী বললেন—তোর ছেলে আসলে কে জানিস?

—কে?

—স্বয়ং ভৃগু ঋষি এ-জন্মে তোর ছেলে হয়ে তোর ঘরে জন্মেছে। ভৃগু ঋষির খুব সংসার করবার ইচ্ছে হয়েছিল একবার। গেল জন্মে সংসার করার শখ মেটেনি তো, তাই এ জন্মে তোর ছেলে হয়ে এই নবাবগঞ্জে এসেছে। তোর বংশের খুব সুসার হবে রে। তোর বংশে দেশ-আলো করা বংশধর জন্মাবে। তোর বংশের যশ-খ্যাতি সারা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে—

সদানন্দ এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার বললে—ও সব বুজরুকি ছাড়ো, ওই বলে বাবার কাছ থেকে টাকা হাতাবার জন্যে চেষ্টা করছো.....

—খোকা!

চৌধুরী মশাই আবার গর্জন করে উঠলেন ছেলের দিকে চেয়ে।

বাবাজী চৌধুরী মশাইকে আবার ধমক দিলেন। বললেন—আবার তুই ছেলের ওপর রাগ করছিস! ঠিক আগেকার জন্মের মত রাগী মেজাজ নিয়ে যে ও জন্মেছে। ঋষি মানুষের রাগ, ও আর কতক্ষণ! ও রাগতেও যতক্ষণ, আবার ও-রাগ জল হতেও ততক্ষণ। ভৃগু ঋষি যে এই রকমই রাগী মানুষ ছিলেন রে, তা জানিস না?

চৌধুরী মশাই জীবনে কখনও ভৃগু ঋষির নামই শোনেন নি। শুধু ভৃগু ঋষি কেন, কোন ঋষিরই নাম শোনেন নি তিনি। মুনি-ঋষিদের ধার-কাছ দিয়েও কখনও যাবার দরকার হয় নি তাঁর। বরাবর জমি-জমা-টাকা-কড়ি-সুদ-আড়তদার-উকিল-মুহুরি জজ নিয়েই কেবল মাথা ঘামিয়েছেন। উকিল কিম্বা জজের জীবনী জানতে চাইলে তবু তিনি কিছু বলতে পারতেন। কোন্ জজ রাগী, কোন্ জজ অমায়িক, কোন্ জজ সৎ, কোন্ জজ অসৎ তা তাঁর মুখস্থ। হঠাৎ বাবাজীর মুখে মুনি-ঋষির কথা শুনে নির্বাক হয়ে রইলেন। সত্যি সত্যিই যদি ভৃগু ঋষি তাঁর ছেলে হয়ে এসে থাকে তাহলে তাঁর যে আরো সম্পত্তি হবে সেই সহজ কথাটা সহজেই বুঝতে পারলেন। তাই ছেলের বেয়াদপির জবাবে কিছু বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন।

বাবাজী হঠাৎ তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। সদানন্দর দুটো পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাতেই সদানন্দ তিন হাত পেছিয়ে এল।

বললে—রাখো রাখো, বুজরুকি রাখো তোমার!

বাবাজী কিন্তু রাগলেন না। বললেন—তুমি রাগ করছো কেন বাবা? আমি তো তোমাকে প্রণাম করছি না, আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে প্রণাম করছি—

সদানন্দ অনেকক্ষণ বুজরুকি সহ্য করেছে। কিন্তু এবার আর পারল না।

বললে—ওসব বুজরুকি আমি অনেক দেখেছি, আর দেখতে চাই না, আমি যাই—

চৌধুরী মশাই বললেন—চলে যাচ্ছ কেন?

সদানন্দ বললে—চলে যাবো না তো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ন্যাকামী দেখবো? আমি আর দাঁড়াবো না এখানে। যা করতে পারেন আপনি করুন গে—

বলে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই প্রকাশ মামা ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে পড়ে সব দেখেশুনে অবাক। সদানন্দের দিকে চেয়ে বললে—কী রে, কী করছিস এখানে!

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—ও-দিকের খবর সব ভালো তো প্রকাশ? বেয়াই মশাইকে কেমন দেখলে?

প্রকাশ মামা বললে—খুবই মুষড়ে পড়েছেন বেয়াই মশাই। আমি সান্ত্বনা দিলুম তাঁকে। বললুম—মৃত্যু কি কারো হাত-ধরা! জীবন-মৃত্যু সবই ভগবানের দেওয়া, সবই মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনও উপায় নেই।

—আর বউমা?

—বউমা খুব কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এলুম।

—বউমাকে আবার কবে এখানে পাঠাবেন?

প্রকাশ মামা বললে—বলেছি তো তাড়াতাড়ি পাঠাতে। বলেছি যত শিগ্‌গির পারেন পাঠিয়ে দেবেন, আমরা বউমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবো।

তারপর সদানন্দর হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে নিয়ে এসেই বললে—কী রে, তুই নাকি ফুলশয্যের রাত্তিরে বউমার সঙ্গে শুসনি? তুই নাকি বউমাকে একলা ঘরে ফেলে বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলি?

সদানন্দ কোনও কথা বললে না।

—কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস না যে? অমন সুন্দরী বউ এনে দিলুম, আর তুই কিনা তার কাছেই শুলিনে? ব্যাপার কী বল্ তো? দিদির কথা শুনে আমি তো অবাক! দিদি তো আমাকেই বকছে। আমারই দোষ দিচ্ছে দিদি। বলছে—তুই কী রকম বউ এনে দিলি যে আমার ছেলেকে ঘরে আটকে রাখতে পারলে না? কী ব্যাপার বল দিকিনি? তুই তো আমাকে কিছুই বলিস নি। আমি ভেবেছি তুই আয়েস করে নতুন বউ নিয়ে রাত কাটিয়েছিস, আর এদিকে এই কাণ্ড? কী হলোটা কী? তোর বউ তোকে কিছু বলেছে? না তোর বউ পছন্দ হয় নি? ব্যাপারটা কী? আমি অত খুঁজে খুঁজে ডানা-কাটা-পরী এনে দিলুম তোকে আর তুই কিনা তাকে অপগেরাহ্যি করছিস এমনি করে?

সদানন্দ তবু সে-কথার কোন জবাব দিলে না। ভেতর-বাড়ি থেকে কে একজন লোক আসছিল, তাকে দেখেই প্রকাশ মামা কথা বলতে বলতে থেমে গেল। বললে—আয়, ইদিকে আয়, তোর সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে আমার, একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে জিনিসটার ফয়সালা করতে হবে—

বলে সদানন্দকে পুকুরপাড়ের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরে বাবাজী তখন ভৃগু ঋষির মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যাঁর ছিল নখদর্পণে। একদিন তিনিই দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন কলিযুগে তিনি নবাবগঞ্জের হরনারায়ণ চৌধুরীর ঔরসে আবার সংসার-ধর্ম পালন করবার জন্যে জন্মগ্রহণ করবেন।

চৌধুরী মশাই একসময়ে বললেন—আচ্ছা বাবাজী, আমার ছেলের আসল রোগের কথাটা বলি—

রোগ? কী রোগ?

চৌধুরী মশাই বললেন—আপনি জানেন তো আমার এত জমিদারি এত সম্পত্তি, কিন্তু মাত্র ওই একটি ছেলে। এই ছেলের আমি সবে বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ছেলে ফুলশয্যার রাত্তিরে বউ-এর সঙ্গে শোয়নি। কখন সকলের চোখের আড়ালে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে—

বাবাজী চোখ বুজিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন—তারপর?

—তারপর আর কী। সকালের দিকে ওর মা ওকে জিজ্ঞেস করলে কেন ও ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, জবাবে ও বললে বউ-এর সঙ্গে ও শোবে না।

বাবাজী বললেন—কেন? শোবে না কেন?

—ওই কথা বলে কে? আপনিই বলুন, আমার যদি বংশরক্ষে না হয় তাহলে আমার এত সম্পত্তি খাবে কে? কেন তাহলে আমি আমার ছেলের বিয়ে দিলুম? অথচ রূপে গুণে একেবারে জগদ্ধাত্রীর মত রূপ দেখে আমার পুত্রবধূ করেছি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরী মশাই-এর যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। জিজ্ঞেস করলেন—আজকে রাত্রে আপনার আহারের কী বন্দোবস্ত করবো বাবা?

বাবাজী বললেন—আমি আহার করি না রে, আমি সেবা করি। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর থেকে আহার করা আমি ছেড়ে দিয়েছি—

চৌধুরী মশাই শশব্যস্ত হয়ে বললেন—ঠিক আছে, আপনি বসুন, আমি আপনার সেবার ব্যবস্থাটা আগে করে ফেলি—

ভেতর-বাড়িতে গিয়ে চৌধুরী মশাই একেবারে সোজা গৃহিণীর সঙ্গে দেখা করলেন। বাবাজী যে আহার করেন না, শুধু সেবা করেন সেটা বুঝিয়ে বললেন।

প্রীতি বললে—আর কী বললেন উনি?

চৌধুরী মশাই বললেন—বললেন তো অনেক ভালো কথা। এত ভালো ভালো কথা বললেন, যে সে-সব বিশ্বাস করতেও ভয় হয়।

—কী রকম?

বললেন—খোকা নাকি আগের জন্মে ভৃগু ঋষি ছিলেন, এ জন্মে তোমার ছেলে হয়ে এসেছে। ওকে বকাবকি করতে বারণ করলেন।

প্রীতি কথাগুলো শুনে খানিকক্ষণ চৌধুরী মশাই এর মুখের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বললে—সত্যি?

চৌধুরী মশাই বললেন—সত্যি মিথ্যে বুঝি না। উনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলেই ভালো। ওঁর কথা শুনে মনটা একটু ভালো হলো। কিন্তু তোমার ছেলে যে-রকম বেয়াড়া, বললাম যে বাবাজীকে একবার প্রণাম করো, তা কিছুতেই করলে না। বললে কী জানো? বললে, বুজরুক!

—বুজরুক বললে?

—হ্যাঁ, মুখের ওপর ওঁকে বুজরুক বলে উঠলো। তা আমি আর কী করবো! ছেলের হয়ে আমিই ক্ষমা চেয়ে নিলুম। এখন ভালো করে ওঁর সেবার ব্যবস্থা করে দাও। ছানা, দুধ, ফল মিষ্টি যা আছে তাই দিয়ে ওঁর সেবা করো—

তা সেই রকম ব্যবস্থাই হলো। বাবাজী সেদিন থেকেই বাড়িতে রয়ে গেলেন। বাবাজী মহাশক্তিধর পুরুষ। নিজের কথা বেশি বলতে চান না। যত না কথা বলেন তার চেয়ে বেশি অনুভব করেন। চৌধুরী মশাই বাবাজীর ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চৌধুরী মশাই-এর গৃহিণীও এল। এসে প্রণাম করলে।

বাবাজী আশীর্বাদ করলেন।

বললেন—তোর ভালো হবে মা, আমি সব জানি। তোর কিছু ভয় নেই। এবার তো আমি এসে পড়েছি।

প্রীতি বললে—আমার ওই ছেলেকে নিয়েই যত ভাবনা বাবা। ও সংসারী হবে তো?

বাবাজী বললেন—আমি তো আছি রে, আমাকে তুই বকলমা দিয়ে দে, তোর ভাবনাটা আমি ভাববো।

এ রকম করে আগে কখনও ভরসা দেয়নি কেউ। প্রীতি গলে গেল। তার মনে হলো এত কিছু ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা সব বুঝি তার দূর হয়ে গেল। বললে—আমার ওই ছেলেই সব চেয়ে বড় ঝামেলা বাবা। লোকের মেয়ে নিয়ে ঝঞ্ঝাট হয়, আমার ঝঞ্ঝাট হয়েছে ছেলে নিয়ে।

একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে মেয়েদের পেটে আর কোনও কথা বাকি থাকে না। সমস্ত কথা বলে যেন প্রীতি তৃপ্তি পেলে।

হঠাৎ প্রকাশ ঘরে ঢুকলো। বাবাজী তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কে?

প্রীতি বললে—সম্পর্কে আমার ভাই হয় বাবা—

বাবাজী এবার আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন তার দিকে।

চৌধুরী মশাই বললেন—প্রকাশ, তুমি এঁকে প্রণাম করো—

প্রকাশ মামা শুধু প্রণামই করলে না। একেবারে বাবাজীর পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকালে। তারপর হাত জোড় করে সামনে বসলো। ততক্ষণে বাবাজীর সেবা হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িতে তখন আর কোনও কাজ নেই, কোনও সমস্যাও নেই। সমস্ত শক্তি সমস্ত সামর্থ্য যেন বাবাজীর সেবায় ন্যস্ত করেই এ বংশের কর্তা গিন্নী পরিত্রাণ পেতে চাইছে। বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সবাই যেন এই বাবাজীকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকতে চাইছে।

বলছে—আমাদের সব দুঃখ দূর করো বাবা, আমাদের শান্তি দাও, সুখ দাও, ঐশ্বর্য দাও, সমৃদ্ধি দাও। আমাদের একমাত্র সন্তানকে সুমতি দাও সে যেন সংসারী হয়, সহজ হয়, স্বাভাবিক হয়, সাধারণ হয়। আর কিছু আমরা চাই না—

কিন্তু সুখ শান্তি সৌভাগ্য দেবার বিধাতা বোধ হয় মনে মনে হাসলেন। হাসলেন কিংবা হয়ত কটাক্ষ করলেন। সদানন্দ সবই শুনলো। সব কথাই কানে গেল তার। সে বুঝতে পারলে তার জন্যেই এত আয়োজন, এত সেবা, এত পরিশ্রম।

তা পরিশ্রমও কি কম! সেদিন থেকেই বাড়ির অন্য চেহারা। প্রকাশ মামা আবার একটা কাজ পেয়ে গেল। কর্তাবাবু ওপরের ঘরে একলা পড়ে থাকেন। কৈলাস গোমস্তা খাতা নিয়ে হিসেব লেখে, আদায়পত্রের খবরাখবর দেয়। তার ওপর দীনু আছে।

কাজ করতে করতে হঠাৎ কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করেন—নিচে শাঁখ বাজাচ্ছে কে কৈলাস?

কৈলাস সব জেনেও বলে—আজ্ঞে ও শাঁখ তো আমাদের বাড়িতে বাজছে না, পালেদের বাড়িতে বাজছে—

—এমন অসময়ে শাঁখ বাজাচ্ছে কেন?

কৈলাস গোমস্তা বলে—কোনও পুজোটুজো হচ্ছে বোধ হয়। বেহারি পাল তো খুব ভক্তমানুষ।

তা হবে। এর পরে আর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু পরের দিনও তেমনি।

কর্তাবাবু বলেন—বেহারি পালের পয়সা হয়েছে, বুঝলে কৈলাস! বেনে-মশলার দোকান করে দুটো পয়সা হয়েছে বলে দেব-দ্বিজে ভক্তি বেড়ে গেছে। ও সব ভড়ং আমরা বুঝি।

কৈলাস বলে—আজ্ঞে ভক্তি-টক্তি সব বাজে কথা, আসল হচ্ছে টাকা—

কর্তাবাবু বলেন—বেহারি পাল টাকা ছাড়া আর কিছুকেই পুজো করে না, বুঝলে কৈলাস! টাকাই ওর কাছে ঠাকুর দেবতা যা-কিছু সব—

ক'দিন ধরে খুবই কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ আসতে লাগল কর্তাবাবুর কানে। আসুক। কর্তাবাবুর তাতে আর কোনও ক্ষোভ নেই। হোক, সকলেরই টাকা হোক। আমার আর কোনও ভয় নেই। আমার মত এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্য, এতখানি কারো না হলেই হলো। তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত।

—আচ্ছা কৈলাস, তুমি তো অনেক বাড়ির বউ দেখেছ, এমন রূপে গুণে আলো করা বউ আর কারো দেখেছ? বলো তুমি, দেখেছ কখনও?

কৈলাস বললে—আজ্ঞে, আপনার বউমার সঙ্গে কার তুলনা! এ লক্ষতে একটা হয়।

—আর আমার নাতি? সদানন্দ? অমন নাতি কারো আছে? গাঁয়ে তো কত ছেলেই রয়েছে, এমন ছেলে কজনের আছে শুনি? ও বেহারি পাল যতই পুজো করুক আর কাঁসর-ঘণ্টা বাজাক আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?

কৈলাস বলে—কী যে বলেন! আপনি হাসালেন কর্তাবাবু। আপনার সঙ্গে বেহারি পালের তুলনা?

কর্তাবাবু বলেন—না না, আমি কথার কথা বলছি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ কানে আসে কিনা রোজ, তাই কথাটা বললুম—

কৈলাস বলে—আজ্ঞে বেহারি পাল কি মানুষ? বেহারি পাল সুদে টাকা খাটায়। সুদখোর। সুদখোরকে কখনও কেউ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে? অথচ আপনাকে? আপনাকে তো সবাই ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে।

কর্তাবাবুর জানতে আগ্রহ হয়। জিজ্ঞেস করেন—ভক্তি-শ্রদ্ধা করে নাকি আমাকে?

—তা করে না? আপনার সামনে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি আবার আপনার আড়ালেও আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আর করবে না-ই বা কেন? আপনার মত মানুষ তো হয় না।

—লোকে তা-ও বলে নাকি?

কৈলাস বলে—বলে বইকি।

—কী বলে?

কৈলাস বলে—বলি কর্তাবাবুর মত মানুষ হয় না।

কথাটা শুনে কর্তাবাবুর মনটা খুশী হয়। কর্তাবাবু খুশী হলে তা সবাই বুঝতে পারে। তখন তাঁর গোঁফ-জোড়া একটু কাঁপতে থাকে, চোখ দুটো একটু কুঁচকে যায়। সবাই বুঝতে পারে। কর্তাবাবুর কাছে তখন যদি কিছু আর্জি করা যায় তো চটপট মঞ্জুর হয়ে যাবে। তখনই সবাই যা চাইবার তা চেয়ে নেয়। কেউ জমি-জমা চায় কেউ টাকা হাওলাত চায়। কেউ বা ঝাড় থেকে দু'খানা বাঁশ। আবার কেউ বা নগদ টাকা পয়সা।

নাতির বিয়ের পর থেকেই কর্তাবাবুর মেজাজটার মধ্যে যেন বেশ একটা খুশী-খুশী ভাব ছিল। ফুলশয্যার পরদিন যেদিন তিনি শুনলেন যে তাঁর নাতি বউ-এর সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে, তখন থেকেই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর আসল শত্রু ছিল কালীগঞ্জের বউ, তার জীবনের রাহু। সেই রাহুই যখন চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে তখন আর কাকে পরোয়া! যখন মানুষের শত্রু থাকে না তখনই উদার হতে পারে। তখনই তার মুখে হাসি ফোটে। তখন সবাই তার উদারতার প্রশংসা করে। কিন্তু উদার যে হবো তার উপাদান কে দেবে? কে আমার অভাব ঘোচাবে, কে আমার শত্রু নিপাত করবে, কে আমার মাথা উঁচু করে দেবে? তুমি আমার অভাব ঘোচাও, তুমি আমার শত্রু নিপাত করো, তুমি আমার মাথা উঁচু করো, আমি তখন সৎ হবো, সাধু হবো, মহৎ হবো, দাতা হবো। আরো কত কী হবো। রেল-বাজারের দারোগা টাকা নিয়েছে বটে, তা নিক। ন্যায্য পাওনা নিলে কর্তাবাবুর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বংশী ঢালীরা বড্ড বেশি টাকা নিয়ে ফেলেছে। তা নিক। বৃহৎ কাজে অমন অপব্যয় একটু হয়েছে, তার জন্যে মেজাজ খারাপ করলে কি চলে?

তারপর হঠাৎ যেন কাজের কথা মনে পড়ে যেত কর্তাবাবুর। বলতেন—তারপর কী হলো কৈলাস, তারপর পড়ে যাও—

একটা অর্ধ সাপ্তাহিক বাংলা খবরের কাগজ কিনতেন কর্তাবাবু। কৈলাস গোমস্তা সেটা অবসরমত পড়ে পড়ে শোনাতো।

—কই, থামলে কেন? পড়ে যাও?

কৈলাস গেমস্তা ভালো করে পড়তে পারতো না। হোঁচট খেতে খেতে পড়তো—

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড আজ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইতেছেন...

কোথাকার কোন্ গাইকোরাড, সে কোন্ দেশ, কে তার মহারাজা, কেনই বা তার নাম গাইকোয়াড তা কৈলাসও যেমন জানতো না, কর্তাবাবুও তেমনি জানতেন না। তবু খবরের কাগজে যখন খবরটা বেরিয়েছে তখন তিনি নিশ্চয়ই কেষ্ট-বিষ্টু কেউ হবেন। আর মহারাজা মানুষ যখন নিশ্চয়ই তিনি অনেক টাকার মালিক! অনেক টাকার মালিকদের ওপর কর্তাবাবুর খুব শ্রদ্ধা ছিল বরাবর।

কর্তাবাবু বলতেন—আচ্ছা কৈলাস, মহারাজাদের অনেক টাকা আছে, কী বলো?

কৈলাস বলতো—আজ্ঞে, তা তো আছেই—

তা কত টাকা থাকতে পারে মহারাজাদের?

মহারাজাদের কত টাকা থাকতে পারে তার কোনও আন্দাজ জানা ছিল না কৈলাসের। তবু আন্দাজ করে বলতো—দশ-বারো লাখ টাকা নিশ্চয়ই—

কর্তাবাবু বলতেন—আরে দূর দশ-বারো লাখ টাকা কি আবার টাকা! তোমার যেমন বুদ্ধি! আমারই তো দশ-বারো লাখ টাকার সম্পত্তি আছে। তুমি তো হিসেব জানো, হিসেব করো না—

হিসেব অবশ্য শেষ পর্যন্ত করতে হতো না। কৈলাস জানতো কর্তাবাবু কত টাকার সম্পত্তির মালিক। কিন্তু মহারাজাদের কাছে কখনও গোমস্তাগিরি করে নি বলে তাদের টাকার অঙ্কটাও আন্দাজ করতে পারতো না কৈলাস গোমস্তা।

ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত যখন কোনও ফয়সালা হতো না তখন অন্য প্রসঙ্গ উঠতো। কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করতেন—তা সে যাক্‌গে, গাইকোয়াড মহারাজা কলকাতাতে আসছেনই বা কেন বলো তো? তোমার কী মনে হয় কৈলাস?

কৈলাস বলতো—আজ্ঞে, আমি সামান্য লোক, আমি কী করে তা জানবো!

—তা সামান্য লোক হলেই বা, একটু মাথা খাটিয়ে ভাবো না, কেন আসছে মহারাজা? কাগজে কিছু লিখেছে সে সম্বন্ধে?

কৈলাস পাঁতিপাঁতি করে খুঁজেও মহারাজার কলকাতায় আসার কোনও হদিস পেলে না। শুধু মহারাজার আসার খবরটাই ছাপা হয়েছে, কোনও কারণের উল্লেখ নেই কোথাও।

কর্তাবাবু খুঁজে খুঁজে অনেক কষ্টে একটা কারণ বার করলেন। বললেন—বুঝলে কৈলাস, আমার মনে হয় মহারাজা আসছে শিকার করতে—

—শিকার?

—হ্যাঁ, বাঘ শিকার করতে আসছে, বুঝলে? কলকাতার কাছেই তো সুন্দরবন। সুন্দরবনে অনেক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে, তা-ই শিকার করতে আসছে। বুঝতে পেরেছি। নইলে সেই বরোদা থেকে মহারাজা কলকাতায় আসবেনই বা কেন?...তারপর অন্য কী খবর আছে, পড়ো—

এই রকম করেই দিন কাটতো কর্তাবাবুর। সদানন্দের বিয়ের পর থেকেই কর্তাবাবুর মনটা বেশ সরেস ছিল, তাই খবরের কাগজের খবরে বেশি মন দিতেন। কখনও বরোদার গাইকোয়াডের কলকাতায় আসার খবর, কখনও ধান-চাল-পাটের দর, আবার কখনও বেহারি পালের টাকার গরমের কথা। সব কথাই হতো।

হঠাৎ একদিন কৈলাস বললে—কেষ্টনগরের চিঠি এসেছে কর্তাবাবু—

—চিঠি? কে লিখেছে? বউমার বাবা? বউমা আসছে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রাদ্ধশ্রান্তি মিটে গেছে তো, এবার আসছেন বউমা।

কথাটা বলতেই মনে পড়ে গেল কর্তাবাবুর। বললেন—কই, তুমি তো কাঞ্চন স্যাকরাকে ডাকলে না কৈলাস? আমি যে তোমাকে ডাকতে বলেছিলুম।

—আজ্ঞে, আমি তো খবর দিয়েছিলুম।

—তা তবু সে এল না কেন? তাহলে আবার একবার ডেকে পাঠাও তো—

কাঞ্চন স্যাকরাকে শেষ পর্যন্ত একদিন লোক পাঠিয়েই ডেকে আনতে হলো। কাঞ্চন আসতেই কর্তাবাবু খুব একচোট ধমক দিলেন। বললেন—তুমি যে একেবারে লবাব-পুত্তুর হয়ে গেলে হে, কাঞ্চন! তোমার বুঝি খুব টাকা হয়েছে? টাকার গরম হয়েছে খুব? তা অতই যদি টাকার গরম তো তুমি এলে কেন হে বাপু? না এলেই পারতে!

কাঞ্চন খুব বিনয় করে জানালে যে তার অসুখ হয়েছিল বলেই এতদিন আসতে পারে নি। নইলে আগেই আসতো ইত্যাদি ইত্যাদি...

কিন্তু তবু কিছুতেই কর্তাবাবুর রাগ কমে না। বললেন—তুমি বেরিয়ে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাকে দিয়ে আর জীবনে কখনো গয়না গড়াবো না। যাও—তুমি বেরিয়ে যাও—

এ-সব কথা যে রাগের কথা তা কাঞ্চন স্যাকরা জানতো।

শেষকালে বুঝি অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর কর্তাবাবুর রাগ কমলো।

বললেন—তুমি আমার গয়না গড়াবে কিনা আগে সেই কথা বলে দাও, নইলে বাজারে অন্য অনেক স্যাকরা আছে। স্যাকরার অভাব নেই দুনিয়াতে। পয়সা ফেললে অমন তোমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো স্যাকরা এসে আমার খোশামোদ করবে, তা জানো?

তারপর একটু কেশে নিয়ে বললেন—তুমি ভেবেছ কী শুনি? তুমি ভেবেছ কী? তুমি কী ভেবেছ তুমি ছাড়া বাড়ির নাতি-নাতবউ-এর গয়না গড়াবার লোক পাবে না।

শেষকালে একসময় কর্তবাবু কাঞ্চন স্যাকরাকে ক্ষমা করলেন। শুধু যে ক্ষমা করলেন তা-ই নয় আগাম টাকাও দিলেন শ'খানেক। ওটা বায়না। কাঞ্চন বায়না নিতে চায় নি। তবু কর্তাবাবু টাকাটা দিলেন। বললেন—ওটা তুমি নাও কাঞ্চন। তুমি গরীব লোক, তুমি টাকা পাবে কোথেকে? টাকা না পেলে তোমার চাড় হবে না। আমার অনেক টাকা আছে, বুঝলে? গাইকোয়াডের মহারাজাদের মত টাকা নেই বটে, কিন্তু টাকা আমার অনেক আছে। সোজা কথা, জিনিসটা ভালো আর খাঁটি হওয়া চাই—এটা মনে রেখো—

কুড়ি ভরির একটা হার। তার ওপর মিনের কাজ করা। লোকে দেখে যেন বলে—হ্যাঁ, কর্তাবাবু একটা জিনিসের মত জিনিস দিয়েছে বটে!

বাইরে এসে কাঞ্চন স্যাকরা টাকাগুলো ভালো করে ট্যাকে গুঁজে নিলে। কৈলাস গোমস্তা সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। কাঞ্চন জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা গোমস্তা মশাই, কার জন্যে এ হার গড়ানো হচ্ছে বলুন তো? এ কাকে দেবার জন্যে? কর্তাবাবু কাকে হার দেবেন?

কৈলাস হাসতে লাগলো। বললে—চৌধুরী মশাই-এর নাতির জন্যে—

—চৌধুরী মশাইয়ের নাতি? কিন্তু এই তো সবে সেদিন চৌধুরী মশাই-এর ছেলের বিয়ে হলো, এর মধ্যে নাতি হয়ে গেল তাঁর? এখনও তো দশ মাস হয় নি গো?

কৈলাস গোমস্তা আরো হাসতে লাগলো। বললে—নাতি হয় নি, কিন্তু হবে তো একদিন!

কাঞ্চন অবাক হয়ে গেল। যে নাতি হয় নি তারই জন্যে কর্তাবাবুর এত হাঁক ডাক! একেবারে এই মারে তো সেই মারে! যেন নাতির অন্নপ্রাশন আটকে যাচ্ছে হারের জন্যে!

কৈলাস গোমস্তা বললে—পাগল হে কাঞ্চন, আস্ত পাগল। নেহাৎ চাকরি করতে হয় তাই এত কথা শুনি নইলে আমাকে তো দুবেলায় যাচ্ছেতাই করে বলেন। তুমি ভেবেছ চৌধুরী মশাই-এর নাতি হবে? হবে না। তুমি দেখে নিও, হবে না—

—হবে না? হবে না মানে?

কৈলাস বললে—সে-সব পরে তোমাকে বলবো। তুমি এখন যাও—

কাঞ্চন বললে—কিন্তু শেষকালে হার নেবেন তো কর্তাবাবু? নইলে আমার মেহনতই যে সার হবে গোমস্তা মশাই?

কৈলাস বললে—আরে তোমার কী? তুমি মাল দেবে পয়সা নেবে। চৌধুরী মশাই এর নাতি হোক না-হোক তোমার কী? তুমি তো মজুরী পেলেই খুশি!

—কিন্তু কেন নাতি হবে না গোমস্তা মশাই?

কৈলাস গোমস্তা তখন বাড়িতে খেতে যাচ্ছিল। তার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বললে—আরে, তোমার কেবল ওই এক কথা। বলছি তো সে তোমাকে পরে বলবো'খন। আমি আসি—

বলে কৈলাস বাড়ির দিকে চলে গেল।

কালীগঞ্জের বউ যে একদিন কর্তাবাবুকে নির্বংশ হবার অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল সে-কথাটা এখন কাউকে না বলাই ভালো। ওটা চাপা থাক। ওটা আর কারো মনে না থাকলেও শুধু কৈলাস গোমস্তারই মনে থাকুক। যে-কথাটা মনে করলেও বুকটা কেঁপে ওঠে সেটা তোমাদের কারো জানবার দরকার নেই। দশ হাজার টাকা মাত্র! দশ হাজার টাকার খেসারত দেবে কর্তাবাবুর নাতি! সেই খেসারত দেবার বৃত্তান্ত কাঞ্চন স্যাকরা নাই বা জানলো!

তা সত্যিই কেষ্টনগর থেকে একদিন বেয়াই মশাই-এর চিঠি এসেছিল।

শ্রাদ্ধশান্তি নির্বিঘ্নে চুকে গেছে। তিনি নিজেই নয়নতারাকে নিয়ে নবাবগঞ্জে আসছেন।

কিন্তু এ আসা বড় মর্মান্তিক আসা। নিয়ম ছিল মেয়ের সন্তান না হলে বাবা-মা কাউকেই বেয়াই বাড়িতে আসতে নেই! কিন্তু কী করা যাবে? আর কে আছে তাঁর? কার সঙ্গে পাঠাবেন মেয়েকে?

নয়নতারা বলেছিল—বাবা এত তাড়াতাড়ি কেন আমাকে পাঠাচ্ছো, আর কিছুদিন না-হয় তোমার কাছে থাকি। আমি চলে গেলে কে তোমার দেখাশোনা করবে?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই-এর কিন্তু অনেক সহ্য-ক্ষমতা। পাছে মেয়ের কান্না পায় তাই স্ত্রী-বিয়োগের শোকে মেয়ের সামনে নিজেও কোনোদিন কাঁদেন নি। মেয়ের সামনে বলেছেন—তাতে কী হয়েছে মা! মানুষ কি চিরকাল বাঁচে? একদিন না একদিন তো তাকে যেতেই হয়। তোমার মাও তাই চলে গেছেন—

এও এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে তার ঠিক নেই। মেয়ে বাবার মুখের দিকে চায় আর বাবা চায় মেয়ের মুখের দিকে। তবু যে তিনি যাবার আগে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন এইটেই তো সান্ত্বনা। নইলে কী হতো বলো তো মা!

ভট্টাচার্য মশাই বলেন—তুমি আমার জন্যে ভেবো না মা। আমার ছাত্ররা রয়েছে তারাই আমাকে দেখবে।

মেয়ে বলে—তুমি তোমার শরীরের দিকে একটু দেখো বাবা। তুমি নিজেকে না দেখলে কেউ তোমাকে দেখবে না।

—সে তোকে বলতে হবে না রে। আমি দেখবি ঠিক চালিয়ে যাবো। আমার তো কোনও অসুখ নেই—

—অসুখ না-ই বা থাকলো, অসুখ হতে কতক্ষণ! এতদিন মা ছিল তাই তোমাকে দেখেছে, এখন তো আর মা নেই! আর আমাকেও তো তুমি আবার নবাবগঞ্জে পাঠিয়ে দিচ্ছ। আমি আর কিছুদিন থাকলে কী এমন ক্ষতি হতো!

ভট্টাচার্যি মশাই বলেন—আমার কিছু ক্ষতি হতো না মা, কিন্তু তোর?

—বা রে, আমার কী ক্ষতি?

ভট্টাচার্যি মশাই বলেন—না মা, তোর শ্বশুর-শাশুড়ী, সদানন্দ তারা কী ভাববে বল্ দিকিন—

মেয়ে বলে—হ্যাঁ, আমার জন্যে তাদের ভাবতে বয়ে গেছে! আমার কথা যদি তারা

এতই ভাবতো তো এতদিনের মধ্যে তারা অন্তত একবার একখানা চিঠি দিত। কই, মার শ্রাদ্ধে তো খবর দিয়েছি, তা তারা কেউ এল?

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। সত্যিই তো, তারা তো কেউই আসেনি। শুধু মেয়ের মামাশ্বশুরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল একবার নামমাত্র। তাও তো আবার নিজের মামাশ্বশুর নয়।

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—তাই তো মা, সদানন্দও তো একবার আসতে পারতো?

মেয়ে বলে—কেন আসবে? কেন আসতে যাবে তারা?

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—সে কি কথা, আসবে না? জ্ঞাতি-কুটুমের বিপদে-আপদে আসবে না?

মেয়ে বলে—না, তারা আসবে না। বড়লোক কেন গরীব লোকের বাড়ি আসবে? তুমি তো বড়লোক বলেই তাদের বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়েছিলে! আমি খেয়ে পরে সুখে থাকবো বলে তোমার লোভ লেগেছিল। এখন? এখন দেখলে তো?

এসব কথা শুনে ভট্টাচার্যি মশাই মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন। পাড়ার লোকেরাও কেউ কেউ মন্তব্য করলে। বললে—এত বড় একটা কাণ্ড হলো, অথচ জামাই তো কই এল না—

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—আরে বাপু, জামাই কি আমার বেকার মানুষ যে বললেই হুট করে চলে আসবে! জমিদার মানুষ, কাজ-কর্ম থাকতে নেই? হয়ত কোর্টকাছারির দিন পড়েছে। তা জামাই না এলেও মামাকে তো পাঠিয়ে দিয়েছে—

—কিন্তু বেয়াই মশাই? বেয়াই মশাই একবার আসতে পারতেন না?

—তোমরা বিশ্বনিন্দুক। সবাই তোমরা বিশ্বনিন্দুক হে! বেয়াই মশাইদের কত বড় জমিদারি কত বড় তালুক তা তোমরা জানো? না যদি জানো তো ওই বিপিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিপিনকেই জিজ্ঞেস করো না। বিপিন ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছিল। ও দেখে এসেছে। এক হাজার লোক পাত পেড়ে কালিয়া পোলোয়া খেয়ে গিয়েছে। আর নয়নতারাও তো ছিল, ওকেও জিজ্ঞেস করো। ও-ও দেখেছে। ওর শাশুড়ী কত বড় সীতাহার দিয়েছে দেখেছ? ওজন করলে অন্তত দু'শো ভরি হবে—

প্রশ্নকর্তারা দু'শো ভরি ওজনের কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। বলে—না, না, কী যে বলেন আপনি পণ্ডিত মশাই, দু'শো ভরির হার কখনও নয়—

—কখনও নয়? আচ্ছা এখ্খুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি—ও নয়ন, নয়ন—

বলে তখনি পাশের ঘরে চলে যান। একেবারে নয়নতারার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বলেন—হ্যাঁরে তোর শাশুড়ী যে-হারটা তোকে গায়েহলুদে দিয়েছিল সেটার ওজন কত রে? দু'শো ভরি নয়? নিখিলেশ বলে কি না, দু'শো ভরি কখনও হতে পারে না—

নয়নতারা বলে—আমি জানি না—

—জানি না মানে? তুই সে হার দেখিস নি? তুই আয় না আমার সঙ্গে, একবার বাইরে আয়। ওদের বুঝিয়ে বলবি আয় তো!

নয়নতারা আর পারে না। বলে—তুমি চুপ করো তো বাবা। আমি বলতে পারবো না—

—আয় না মা, আয় না। একবার এলে তোর ক্ষতিটা কী?

নয়নতারা শেষকালে অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে—তুমি যাও তো বাবা, আমি যেতে পারবো না, আমায় আর বিরক্ত করো না তুমি—যাও—

বলে নিজের দুই হাতে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলে।

কিন্তু মুখ ঢাকলেই কি আর মান ঢাকা যায়! যার নিজের মান ঢাকবার দায় পরের ওপর নির্ভরশীল, তার মান-অপমানের দামই বা কতটুকু! কতটুকুই বা তার দায়িত্ব। কেমন করেই বা পরের অপরাধ সে তার মুখের কথা দিয়ে ঢাকবে! একটা পাতলা লজ্জাবস্ত্র দিয়ে যে তার সমস্ত মান-সম্ভ্রমের দায়িত্ব নেবার শপথ নিয়েছে তার পক্ষ নিয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়াটাই তো লজ্জাকর। এ যেন সেই চোরের পক্ষ নিয়ে চোরের মা'র গলাবাজি।

তবু আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত আবার মাথা নিচু করে সেই অপরাধীদের কাছেই কিনা আসতে হয়। মেয়ে-মানুষের জীবনে এ-বিড়ম্বনার চেয়ে বুঝি বড় বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। তাই বাবার সঙ্গে যখন আবার নয়নতারা নবাবগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়িতে এসে নামলো তখন কে যেন ঘোমটা দেওয়া নিচু মাথাটাকে আরো নিচু করে দিয়ে তবে অব্যাহতি দিলে।

কিন্তু ততদিনে চৌধুরীবাড়িতে আরো অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। সন্ধ্যেবেলা শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজে আর বাবাজী যজ্ঞ করে। যজ্ঞের সময় বাবাজীর সে কী মূর্তি। যজ্ঞের মন্ত্র পড়া দেখে চৌধুরী মশাই-এর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রীতিও যজ্ঞস্থলে গলাবস্ত্র হয়ে হাত-জোড় করে বসে থাকে।

বাবাজী মন্ত্র পড়তে পড়তে এক-একবার বিকট চিৎকার করে ওঠেন—মা মা—মা—

প্রকাশ মামা আর থাকতে পারে না। দু'হাতে গায়ের জোরে কাঁসরে ঘা দেয়। আর চেঁচিয়ে ওঠে—জয়, জয় জগদম্বা—

এ-ব্যাপারে প্রকাশ মামারই যেন সব চেয়ে বেশি উৎসাহ। এই সেদিন বাড়িতে একটা বিয়ের ঘটা গেছে। তখন গোগ্রাসে গিলেছে ক'দিন ধরে। তার পরে গেছে কেষ্টনগরে শ্রাদ্ধ-বাড়িতে। সেখানেও গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়েছে। সেখান থেকে এসেই আবার এই উৎসব। উৎসব মানেই সেবা। বাবাজী তো আহার করেন না, শুধু সেবা করেন। প্রকাশ মামাও এসে পর্যন্ত আহার করা ছেড়ে দিয়ে সেবা শুরু করে দিয়েছে। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা দিস্তে দিস্তে ময়দার লুচি, নলেনগুড়ের কাঁচাগোল্লা, বেলের পানা, মিছরির সরবৎ, পেস্তাবাদাম আর আরো কত রকমের মেওয়া।

বাবাজী বলেন—যজ্ঞ সার্থক করতে হলে মনটা সাত্ত্বিক করার সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক সেবাও চাই—

প্রকাশ মামা বলে—নিশ্চয়ই, সাত্ত্বিক সেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা বাবাজী। ওতে মনটাও ভালো থাকে, পেটটাও তেমনি—

এই সাত্ত্বিক সেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ মামার পেটটা ভালো যাচ্ছিল বলে মনটাও বেশ উদার হয়ে উঠছিল। সে বলতো—আপনি কিছু ভাববেন না জামাইবাবু, ও সদা এবার ঠিক হয়ে যাবে। দেখবেন একেবারে কেঁচোর মতন বউ-এর পায়ে লেপ্টে থাকবে—

লেপ্টে থাকলেই ভালো। চৌধুরী মশাই সেই ভরসাতেই দু'হাতে টাকা খরচ করতেন। কাজ-কর্ম সব ছেড়ে-ছুড়ে বাবাজীর পায়ের ওপর পড়ে আছেন।

প্রীতি ভক্তিগদগদ হয়ে বাবাজীকে প্রশ্ন করতো—আমার ছেলে সংসারী হবে তো বাবা?

বাবাজী বলতেন—হবে না মানে? ওর কপালে ভৃগু-পদচিহ্ন রয়েছে, আর সংসারী হবে না?

প্রীতির বোধ হয় তবু সন্দেহ যেত না। জিজ্ঞেস করতো—কবে সংসারী হবে বাবা?

বাবাজী বলতেন—তোর বউমা এবার আসুক, বউমা এলেই দেখতে পাবি কেমন সংসারী হয়েছে তোর ছেলে।

প্রীতি জিজ্ঞেস করতো—তা আমার ছেলে-বউতে ভাব হবে তো?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, হবে। আমি যখন বলছি তখন হবেই—দেখে নিস—

—বউ-এর সঙ্গে একঘরে শোবে তো বাবা? ফুলশয্যার রাত্তিরে সারারাত আমি বউমার

সঙ্গে শুয়েছি বাবা। আমার কপালে সে যে কী কষ্ট গেছে তা আপনাকে আমি আর কী বলবো! বউমাও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি। এত কান্নার ফল ফলবে তো বাবা?

প্রকাশ মামা বলতো—তুমি অত ভাবছো কেন বলো তো দিদি। আমিও তো আছি। আমাকে যদি তুমি এ-কথা আগে বলতে তো অনেক আগেই আমি মুশকিল আসান করে দিতুম। তুমিও বলো নি, সদাও কিছু বলে নি। আমি ভেবেছি সদা ফুলশয্যের রাত্তিরে বউয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। আমি কি এ-সব ছাই আগে জানতুম!

দিদি বলতো—তুই কী করে ঠিক করতিস?

প্রকাশ মামা বলতো—আমি? আমি কী করে ঠিক করতুম তা আমি এবারই দেখিয়ে দেব তোমাকে। আমি সদাকে বউমার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরের দরজায় শেকল তুলে দেব। দেখি কী করে সদা বউকে রেখে পালায়! তাহলে আর এত যাগ-যজ্ঞ করতে হতো না, আর এত টাকাও খরচ করতে হতো না।

তারপরই আবার নিজেকে শুধরে নিয়ে বলতো—তা যাগ-যজ্ঞ করছো ভালোই করছো। বাবাজী ওদিক থেকে কল চালাবে আর আমি এদিক থেকে কল চালাবো, দেখি এবারে বাছাধন কী করে পার পায়?

দোতলায় বসে কর্তাবাবুর কানে সব শব্দই যায়।

বলেন—বেহারি পালের বড্ড বাড় বেড়েছে কৈলাস, বড্ড বাড় বেড়েছে—এত বাড় ভালো নয়—

কৈলাস গোমস্তাও সায় দেয়। বলে—হ্যাঁ কর্তাবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন, বড্ড বাড় বেড়েছে—

কর্তাবাবু বলেন—সুদখোর মানুষ তো। সুদখোররা এদিকে পয়সার পিশাচ আর বাইরে ওই দেব-দ্বিজে ভক্তি, ওই কাঁসর-ঘন্টা শাঁখ ও-সব ভড়ং—

হঠাৎ দীনু এসে খবর দিলে—কেষ্টনগর থেকে বউমা এসেছেন—

কর্তাবাবুর মুখ প্রসন্ন হলো। কাঞ্চন স্যাকরাকে কুড়ি ভরির হার গড়াতে দিয়েছেন। একশো টাকা বায়নাও দিয়েছেন তার জন্যে। তাঁর গয়না গড়ানো সার্থক হোক!

জিজ্ঞেস করলেন—বউমাকে কে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে?

—আজ্ঞে বউমার বাবা।

এই-ই প্রথম বলতে গেলে কালীকান্ত ভট্টাচার্য মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এলেন। মেয়ের বিয়ের আগে একবার এসেছিলেন, কিন্তু সে আসা বেয়াই হিসেবে আসা নয়। এ বাড়ির কুটুম হিসেবে এই-ই তাঁর প্রথম আসা। কিন্তু বেশিদিন যে তিনি থাকতে পারবেন না সেটা প্রথমেই জানিয়ে দিলেন। দুপুরে এলেন আবার বিকেলের গাড়িতেই চলে যাওয়া।

বললেন—থাকলে কি আমার চলে বেয়াই মশাই, ওদিকের কাজ-কর্ম তো সবই ফেলে রেখে এসেছি—আর বাড়িতেও তো কেউ নেই। বাড়িও একেবারে ফাঁকা রয়েছে।

তারপর বউমার মায়ের কথা উঠলো। শেষকালে কী হয়েছিল, ডাক্তার দেখে কী বললে, আগে কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল কিনা। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যে-সব বাঁধা বুলি সবাই-ই বলে থাকে সেই সব কথাও হলো। জীবনকে যারা বেশি আঁকড়ে ধরে থাকে তারাই জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বেশি মুখর। তাই কর্তাবাবুই বেশি করে জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে লাগলেন।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—আমাদের শাস্ত্রে আছে ফল যখন পাকবে তখন তার বোঁটা আলগা হবেই, তা তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু অকালমৃত্যুটাই দুঃখের কারণ। আমার গৃহিণীর বয়েস হয়েছিল তাই তিনি গেছেন। তাই আমি তার জন্যে কোনও দুঃখ করি নে

কর্তাবাবু। আর তিনি তো নিজের হাতেই নয়নতারার বিয়ে দিয়ে গেছেন। দেখে যেতে পেরেছেন কন্যা তাঁর সৎপাত্রেই পড়েছে—

প্রকাশ মামা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—সৎ পাত্র যে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, সদানন্দ আমার ভাগ্নে বলে বলছি না, অমন সৎ পাত্র এ-যুগে জন্মায় না বেয়াই মশাই। আমি নিজে সে-সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিচ্ছি—

ভট্টাচার্যি মশাই হঠাৎ বললেন—কই, আমার বাবাজীকে তো দেখছি নে? কোথাও কাজে গেছে বুঝি?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, একটু বেরিয়েছে—

প্রকাশ মামা বাকিটা পূরণ করে দিলে। বললে—সদার কাজের কি অন্ত আছে বেয়াই মশাই। এই এত বড় জমিদারি সবই বলতে গেলে একলা ওই সদাই দেখছে। জামাইবাবু বুড়ো হয়ে গেছে তো, তাই সদা বাবাকে বলেছে—তোমাকে কিছুছু দেখতে হবে না বাবা, এবার থেকে আমি নিজেই সব দেখবো—

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—উপযুক্ত ছেলের মতই কথা বলেছে—

প্রকাশ মামা বললে—উপযুক্ত ছেলে মানে? সদা কি ভাবছেন উপযুক্ত ছাড়া অনুপযুক্ত কথা বলবে? বাপ-ঠাকুর্দার তেমন শিক্ষাই নয় বেয়াই মশাই। এই যে আমার জামাইবাবুকে দেখছেন, ইনিও বাপের উপযুক্ত ছেলে। এই এখনও এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত জামাইবাবু বাপ বলতে অজ্ঞান—। আপনার মেয়ের অনেক পুণ্যবল তাই এমন বংশে পড়েছে—

প্রকাশ মামা একটু আবার বলে উঠলো—আর তা ছাড়া এই আমার কথাই ধরুন না, আমি তো এ-বংশের কেউ নই, কিন্তু সদা ঠিক আমার ক্যারেক্টারের ধাঁচ পেয়েছে। আমি পিতৃ-মাতৃ ভক্ত, সদাও পিতৃ-মাতৃ ভক্ত। আপনাদের সংস্কৃতে যে শ্লোক আছে না, নরানাং মাতুলঃ ক্রমঃ, সদা একেবারে হুবহু তাই...

কথাটা বলে প্রকাশ মামা চৌধুরী মশাই-এর দিকে চাইলে। বললে—কী বলেন জামাইবাবু, ঠিক বলি নি?

কেউ তার কথায় সায় দিলে না দেখে প্রকাশ মামা তখন অন্য প্রসঙ্গ ওঠালো। বললে—তবে হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি বেয়ানের শ্রাদ্ধে খাইয়েছিলেন বটে। বুঝলেন জামাইবাবু, অমন খাওয়া আমি বহুদিন খাই নি। আমি বোধ হয় দু'ডজন সরভাজা খেয়েছি। আঃ কী সোয়াদ—

কিন্তু এ কথাটাও কারো মনে গিয়ে দাগ কাটলো না। ওদিকে ভট্টাচার্যি মশাইএরও যাবার সময় হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন—এবার আমাকে উঠতে হয় বেয়াই মশাই—

যাবার আগে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রকাশ মামা সে ব্যবস্থা করে দিলে। বেয়াই মশাইকে একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। ভট্টাচার্যি মশাই ঘরে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। বেশ সাজানো ঘর। আসবাবপত্রে মোড়া, দামী আয়না, দামী আলমারি, দামী চাদরে ঢাকা বালিশ বিছানা। তিনি নিজে ফুলশয্যার তত্ত্বের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন তা ছাড়াও আরো অনেক আসবাব দিয়েছে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী। ভট্টাচার্যি মশাই-এর মনটা ভারি হয়ে উঠলো। এসব কিছুই দেখে যেতে পারলে না নয়নতারার মা। মেয়ের এই সুখ এই ঐশ্বর্য চোখে দেখতে পেলে তিনিও খুশী হতেন।

বাবাকে দেখে নয়নতারা বিছানা থেকে নেমে এসে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

ভট্টাচার্যি মশাই আশীর্বাদ করলেন—সুখে থাকো মা, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মী হয়ে থাকো, মনেপ্রাণে স্বামীর সেবা কোর, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর নেই—

নয়নতারার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—কাঁদতে নেই মা, ছিঃ, বাপ-মা কারো চিরকাল থাকে না। তোমাকে সুখী দেখতে পেলেই আমাদের সুখ। তুমি মনেপ্রাণে স্বামীর সংসার করো, তাই দেখেই তাঁর স্বর্গত আত্মা সুখী হবে—তোমার দুঃখ কী মা, তোমার মতন স্বামী ক'জন পায় বলো তো। তা এবার চলি, সদানন্দর সঙ্গে দেখা হলো না, শুনলাম সে নাকি মামলার কাজে রানাঘাটে গেছে। বাড়ি এলে তাকে বলে দিও মা যে আমি এসেছিলুম, তাকেও আশর্বাদ করে গেছি—

নয়নতারা আর একবার বাবার পায়ে প্রণাম করলে। ভট্টাচার্যি মশাই আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মায়া জিনিসটা এমন যে তা যত বাড়াও ততই বেড়ে যায়। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

চৌধুরী মশাই বললেন—আবার আসবেন বেয়াই মশাই—

প্রকাশ মামা বলে উঠল—এবারের আসা ঠিক মনের মত আসা হলো না বেয়াই মশাই, এবার এসে জামাই-এর বাড়িতে রাত কাটিয়ে যেতে হবে কিন্তু—

ভট্টাচার্যি মশাইও ভদ্রতা করে বললেন—ওদিকপানে গেলে আপনারাও কিন্তু যাবেন, একবার পায়ের ধুলো দেবেন।

প্রকাশ মামা বললে—আমাকে সে আর বলতে হবে না, নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো, গিয়ে আবার সরপুরিয়া সরভাজা খেয়ে আসবো—

আর তারপর 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে যাত্রা। গাড়ি ছেড়ে দিলে রজব আলি।

আবার সেই রাত। ফুলশয্যার সেই অমোঘ রাতটার পর এই দ্বিতীয়বার নয়নতারা আবার একবার রাত কাটাবে এই ঘরে। এই রাতটার কথা ভাবতেই কেমন যেন তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এতদিন মা ছিল, তাই ততো ভয় করে নি, কিন্তু এবার কেউ নেই তার। অভিযোগ করবার, আবদার করবার, আত্মসমর্পণ করবারও যেন কোনও লোক তার নেই। তবে এবার থেকে তাকে তার অদৃশ্য ভাগ্যের কাছেই অভিযোগ আবদার আত্মসমর্পণ যা-কিছু সব করতে হবে! নিজেকে তার নিজের কাছেই বড় অসহায় মনে হলো।

শাশুড়ী সামনে বসিয়ে খাওয়ালে। বললে—তোমার মা নেই বউমা, কিন্তু আমি তো আছি, তোমার কোনও কষ্ট হলে তুমি আমাকে বলবে। বলতে যেন কোনও লজ্জা কোর না—

খাওয়ার পর বউমা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

শাশুড়ী বললে—তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা, তুমি তোমার ঘরে যাও—

নয়নতারা বললে—আপনাদের কারো যে খাওয়া হয় নি মা—

—আমাদের খাওয়া হোক না-হোক, তুমি বাচ্চা মেয়ে বসে থাকবে কেন? তুমি এতদূর থেকে এলে, এত ধকল গেল তোমার শরীরে, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো গে—যাও—

নয়নতারা আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকে চার পাশের জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিলে। বিছানার ওপর দুটো মাথার বালিশ, দুটো পাশ-বালিশ পাশাপাশি সাজানো। বাবা এতক্ষণ কেষ্টনগরের পথে ট্রেনে চড়ে চলেছে হয়ত। হয়ত নয়নতারার কথা ভুলেও গেছে বাবা। কেষ্টনগরে গিয়ে বাবা আবার হয়ত তার কাজের মধ্যে ডুবে যাবে। বাবার কি সময় কাটাবার কাজের অভাব? সকাল-সন্ধ্যেয় ছাত্ররা আসবে পড়া জানতে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতেই কোথা দিয়ে বেলা পুইয়ে যাবে বাবা তা টেরও পাবে না, তখন

খাওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে হবে। বাবা খেয়ে নিলে তবে তো রান্নাঘর ধোওয়া এঁটো বাসন মাজা শেষ হবে। বাবা খেয়ে নিতে যত দেরি করবে সংসারে কাজ শেষ হতে ততই দেরি হবে। বাবা কখনও নিজে সংসার দেখে নি! সব দেখতো মা-ই। নিজের হাতে সংসার করলেই তবে সংসারের জ্বালা মানুষ বুঝতে পারে। নইলে দূর থেকে হুকুম দিতে পারে সবাই।

কাপড় ব্লাউজ বদলে নয়নতারা শুতে গিয়েও কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলো। দরজায় খিল দিয়ে শোবে নাকি সে?

কী করবে বুঝতে পারলে না। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এখনই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

হঠাৎ বাইরে থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—বউমা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

নয়নতারা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে বললে—না মা—

শাশুড়ী বললে—হ্যাঁ, তোমাকে তাই বলতে এলাম, তুমি এতদূর থেকে এসেছ, জেগে থাকবার দরকার নেই, কিন্তু দরজায় যেন খিল দিও না, কিছু ভয়ডর নেই এখানে। খোকা খেয়ে-দেয়ে এই ঘরেই শুতে আসবে—

কথাটা শুনেই নয়নতারার বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। শাশুড়ী কথাটা বলে আবার তার নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু নয়নতারার মনের মধ্যে তার জের চলতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

প্রকাশ মামা দিদির কাছে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো দিদি? বউমা দরজা খুলে শুয়েছে?

দিদি বললে—হ্যাঁ, পাছে দরজায় খিল দিয়ে দেয় তাই বলে এলাম—

তারপর যেন মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—খোকাকে পেলি?

প্রকাশ মামা বললে—সেই তাকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলুম। কোথাও নেই। বারোয়ারিতলায় গোপাল কেদার ওদের সঙ্গে দেখা হলো। সবাই তাস খেলছে। ওরা বললে সদা ওখানে অনেকক্ষণ ছিল। বসে বসে তাস খেলা দেখছিল, তারপর কখন কোথায় চলে গেছে কেউ টের পায় নি—

—তাহলে কোথায় গেল?

প্রকাশ মামা বললে—তারপর বারোয়ারিতলা থেকে আমি ওদের যাত্রা পার্টির ক্লাবে গিয়েছিলুম, সেখানে দেখি ওদের 'পাষাণী'র রিহার্সাল চলেছে। পুজোর সময় 'পাষাণী' প্লে হবে কিনা। সেখানে গিয়েও জিজ্ঞেস করলুম, তারা বললে বাড়ির দিকে গেছে সদা। তাই ভাবলুম হয়ত বাড়ির দিকেই এসেছে সে, বাড়িতে এসে দেখি সে আসে নি—এখন কী করা যায় বলো দিকিনি। আমি তো মহা ভাবনায় পড়লুম—

প্রীতি বললে—বউমা বাড়িতে এসেছে সে-খবরটা সে পেয়েছে নাকি?

—সে-খবর সে পাবে কী করে?

—যদি রাস্তায় কেউ গাড়ি দেখে থাকে তো সে হয়ত বলে দিয়েছে খোকাকে।

প্রকাশ মামা কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—তাহলে আমাদের বাবাজী কী করছে?

প্রীতি বললে—যখন বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই হবে। আমি তো ওই ভরসাতেই আছি—

—যজ্ঞ কবে হবে?

—সে আমি কী করে বলবো? যেদিন বাবাজীর আদেশ হবে।

—এই বাড়িতেই হবে তো?

—সেই রকমই তো কথা আছে।

বাবাজী ততদিনে বেশ বহাল-তবিয়তেই আছেন। সারা বাড়িতেই বাবাজীর জন্যে তোড়জোড় চলে সারা দিন। রেল-বাজার থেকে ফল-ফুলুরি-মিষ্টি আসে। বাড়িতে দুধ আছে, তার বেশির ভাগটাই ছানা তৈরি হয় বাবাজীর জন্যে। বাবাজী চাল-আটা-মাংস-ডিম কিছুই স্পর্শ করে না। বাবাজীর কাছে শালগ্রাম-শিলা আছে। তিনি সকালে সন্ধ্যেয় সেই শালগ্রাম শিলার সামনে আরতি করেন। সেই আরতির জন্যে গব্যঘৃত, চন্দন, দুগ্ধ, তুলসীপত্র, ফুল, বেলপাতা যোগাড় করতে হয়। গৌরী পিসী সারাদিন সেই সব তদারকিতেই থাকে। কর্তাবাবুর বাড়িতেই অনেক বিগ্রহ। সে বিগ্রহ নামে মাত্র। প্রত্যেক বিগ্রহের মাথা পিছু পঁচাত্তর বিঘে জমিজমা বরাদ্দ। পূজারী ঠাকুর রোজ ফুল-বেলপাতা চড়িয়ে নিয়ম করে পূজো করে যায়। তার জন্যে কোনও দিন কোনও ঘটাও হয় নি, উৎসবও হয় নি। সে-পূজো কখন হলো তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। তার জন্যে বরাদ্দ ব্যবস্থা আছে। পূজারী ঠাকুর তার জন্যে জমি পেয়েছে। পুরোপুরি সে-পূজোর জিম্মাদারি তারই।

কিন্তু এ আলাদা পূজো।

বেহারি পালের বউ এসেও খানিকটা হাত চালায়। কখনও ফল কেটে দেয়, কখনও আরতির সময়ে গিয়ে হাজির থাকে। তারপর যখন আরতি হয়ে যায় তখন গলবস্ত্র হয়ে আর সকলের সঙ্গে প্রণাম করে।

বাড়িতে যেতেই বেহারি পাল গিন্নীকে জিজ্ঞেস করে—আজকে কী হলো গো ওদের বাড়িতে?

গিন্নী বলে—কী আবার হবে, ওই পূজো—

বেনে-মশলার দোকান করেই বেহারি পালের অনেক বাড়তি পয়সা। সেই বাড়তি পয়সাতেই আবার মহাজনি কারবার চলে। ধান-পাট-তিসি-সরষের বদলে টাকা ধার দেয়। তবে মালের দরটা বাজারের থেকে কম। কিন্তু দর কম হলে কী হবে, অমন নগদ টাকা কে দেবে হাতে তুলে! কর্তাবাবুও এককালে ওই কারবার করেছিলেন। তারপর যখন অনেক টাকা হয়ে গিয়েছিল তখন জমি কিনে ফেললেন সেই টাকায়। সুদের কারবারে ইজ্জৎ নেই তেমন। কর্তাবাবু তখন একটু ইজ্জতের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

বেহারি পাল জিজ্ঞেস করে—তা হঠাৎ বাবাজীকে কোত্থেকে আমদানি করলে?

—হিমালয়ের সাধু। রাণাঘাটে এসেছিলেন কোন্ শিষ্যের বাড়িতে। সেখান থেকে নাকি চৌধুরী মশাই নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন। এবার যজ্ঞ হবে, তারপর সাধু আবার চলে যাবেন হিমালয়ে।

—তা সাধুবাবাজী কী করে সারাদিন?

গিন্নী বলে—সাধু-সন্নিসীদের ব্যাপারে তুমি অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোর না, কার মনে কী আছে কে বলতে পারে! ভাল না করুক মন্দও তো করতে পারে। তখন? আর আমার তো এতে পয়সা খরচ হচ্ছে না—

বেহারি পাল বলে—ওসব কর্তাবাবুর বুজরুকি। বুঝলে? যাকে বলে ভড়ং—ভেতরে ভেতরে কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর সব সম্পত্তি গ্রাস করে এখন বোধ হয় পরকালের ভয় ঢুকেছে মনে! যাবে একদিন সব এই তোমায় বলে রাখলুম, সব যাবে। ওই নাতিই ওদের বংশে পেল্লাদ হয়ে জন্মেছে—দৈত্যকুলে পেল্লাদ—! কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক কি মিছিমিছি মরেছে বলতে চাও?

তা বেহারি পাল যা-ই বলুক তাতে কারোর কিছুই আসে যায় না। টাকা হলেই ও-

রকম পরস্পর হিংসা-ঈর্ষা দ্বেষ বিদ্বেষ থাকেই। তা নিয়ে মাথা ঘামালে সংসার চলে না। নইলে বাবাজীদেরই বা চলবে কেমন করে? তাদেরও তো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা চাই। চৌধুরী মশাই-এর সংসারে যদি শান্তিই থাকবে তো তাহলে কি আর বাবাজীকে বাড়িতে এনে এত খাতির করতো কেউ? না, দিনরাত তার সেবার জন্যে এত খরচান্তের আয়োজন-অনুষ্ঠান হতো।

বাবাজী এক একদিন এক-এক ব্রত করেন।

বলেন—আজ 'ভূতাপসারণ দিগ্বন্ধন' করবে—

—সেটা কী?

বাবাজী বলেন—তার অর্থ এই বাড়ির চৌহদ্দি থেকে ভূত-প্রেত দূর করবো। তাদের দৃষ্টি পড়েছে এ বাড়িতে—

—তাতে কী কী উপচার চাই?

বাবাজী ফর্দ দেন—গঙ্গাজল, পুষ্প আর শ্বেতসর্ষপ। বেশি কিছু নয়।

তা তারই ব্যবস্থা হলো। সবাই এসে জুটলো। সত্যিই যদি বাড়ির ওপর ভূত-প্রেতের নজর পড়ে থাকে তো তা আগে দূর করতে হবে।

যখন সব যোগাড় হলো তিনি দিগ্বন্ধন করতে করতে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। ধূপ-ধূনোর গন্ধে তখন চোখে অন্ধকার দেখছে সবাই।

বাবাজী বলল—কাঁসর-ঘণ্টা কই?

প্রকাশ মামা কাঁসর নিয়ে ঝাঁই-ঝাঁই করে বাজাতে লাগলো। আর একজন ঘণ্টা।

বাবাজী চিৎকার করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন—ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ...

আরো কী সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন তার মানে কেউ বুঝতে পারলে না। তা না পারুক, শব্দ যত দুর্বোধ্য হয় সকলের ভক্তি ততই বাড়ে। শেষকালে হাতে তুড়ি দিতে লাগলেন বাবাজী। ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোধয় শোধয় স্বাহাঃ...

যখন পূজো শেষ হয়ে আসছিল তখন হঠাৎ বাবাজী চিৎকার করে বলতে লাগলেন—ফট্...ফট্...ফট্...ফট্ স্বাহাঃ...

শেষ পর্যন্ত দিগ্বন্ধন হলো, ভূতাপসারণও হলো। পরের দিন চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ বাবা, ভূত কি ছিল বাড়িতে?

বাবাজী বললেন—ছিল বৈকি। অনেকগুলো ভূত ছিল। তার মধ্যে আবার একটা ছিল পেতনী—

কথাটা শুনেই চৌধুরী মশাই-এর বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কালীগঞ্জের বউ কি তাহলে অশরীরী হয়ে এই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল নাকি?

—তা এখন সবই দূর হয়েছে তো?

—দূর হবে না মানে? চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবাই পালিয়েছে।

—কিন্তু যজ্ঞ করবেন কবে? আপনি যে বলেছিলেন যজ্ঞ করলে অমঙ্গল কেটে যাবে?

—আরে আগে-ভাগে যজ্ঞ করলেই হলো? ভৃগুর কষ্ট হচ্ছিল ভূত-প্রেতের উপদ্রবের জন্যে। এবার তারা দূর হলো, এখন ভৃগু সুস্থ হলেন।

ঠিক এই সময়েই কেষ্টনগর থেকে বেয়াই মশাই তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। বেয়াই মশাই কিম্বা তাঁর মেয়ে কেউই জানতে পারলে না তাদের অসাক্ষাতে এই বাড়ি এই বংশ ভূতের উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

কর্তাবাবুও জানতে পারলেন না ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড চলেছে। তাঁর নাকে তখনও

ধূপ-ধুনোর গন্ধ যায় আর কানে যায় কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ। বলেন—বেহারি পালের দেব-দ্বিজে ভক্তি-টক্তি ওসব ভড়ং, বুঝলে কৈলাস! সব ভড়ং। ও হলো আসলে টাকার গরম। সুদে টাকা খাটিয়ে খাটিয়ে টাকা করে এখন লোককে দেখাচ্ছে—ওগো তোমরা দ্যাখো, আমার কত টাকা হয়েছে—

সেদিন বাবাজীর কাছে গিয়ে চৌধুরী মশাই বললেন—বাবাজী, আজ আমার বউমা এসেছে—

—এসে গেছে? তা ভালোই হয়েছে।

—এবার ছেলেকে বউমার কাছে শুতে পাঠাবো তো?

—নিশ্চয় পাঠাবি।

—কিন্তু ছেলে যদি আবার বিগড়ে বসে?

বাবাজী হাসলেন। বললেন—না রে না, সে ভয় তোর নেই। আমি তো দিগ্বন্ধন করে দিয়েছি, এর পর আমি একটু পাদোদক দিয়ে দেব সেইটে খাইয়ে দিস। এখন এই পর্যন্তই চলুক, তারপর তো আমি আছিই—তোর কিছু ভয় নেই—

অনেক রাত্রে কখন নিঃশব্দে সদানন্দ বাড়িতে ঢুকলো। রোজ এমনি করে নিঃশব্দেই সে ঢোকে। কখন কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে তাও যেন কেউ জানে না। কখনও দেখা যায় বারোয়ারিতলায় গিয়ে বসেছে। তারপর আবার কখন সেখান থেকেও সে উঠে যায় কেউ টের পায় না। তারপর একে একে যখন রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা পাতলা হয়ে আসে তখন ক্ষিধে পেয়ে যায়। নদীর ধারে বিরাট চড়া পড়ে থাকে। সেখানেই হয়ত শুয়ে পড়লো। এপারে নবাবগঞ্জ ওপারে কালীগঞ্জ। নদীটা পেরিয়ে ওপারে খানিকটা হেঁটে গেলেই হর্ষনাথ চক্রবর্তীর ভাঙা দোতলা বাড়িটা। সেই বাড়ির সামনে গিয়েও খানিক দাঁড়ায়।

সেই বাড়ির রাস্তায় চলতি কোনও লোক দেখতে পেলে ভালো করে ঠাহর করতে পারে না।

জিজ্ঞেস করে—কে?

সদানন্দ বলে—আমি।

বুড়ো লোকটা জিজ্ঞেস করে—তুমি কাদের বাড়ির?

সদানন্দ বলে—আমি নবাবগঞ্জের চৌধুরী মশাই-এর ছেলে,—

—ও, তুমি গোমস্তা মশাই-এর নাতি? তা এত রাত্তিরে এখেনে কেন? কী দেখছো?

সদানন্দ বলে—না, কিছু দেখছি না, এমনি।

—এ বাড়ি কার জানো? হর্ষনাথ চক্কোত্তির বাড়ি। তোমার ঠাকুর্দাদা এই চক্কোত্তি মশাই-এর গোমস্তা ছিলেন। এ কী বাড়িই ছিল এককালে বাবা, আর এখন কী বাড়িই হলো। একেবারে ভুতের বাড়ি হয়ে গেল রাতারাতি।

সদানন্দ আর বেশি দাঁড়ায় না সেখানে। ক'দিন আগেও সে এখানে এসেছিল। এই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। এরই মধ্যে যেন জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে জায়গাটা। দু-চারটে গাছ, ভাঙা ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে শুরু করেছে। লোকজন কেউ নেই কোথাও। ভেতরে কোথাও একটা আলোও জ্বলছে না। সত্যিই ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দেখছি।

আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে ফেরে। মনে হয় যেন পেছন পেছন কে আসছে। পেছন ফিরে দেখে একবার। কেউ কোথাও নেই। আবার যেন কার গলা শোনা যায়। সদানন্দ আবার পেছন ফেরে। কাউকে দেখতে পায় না।

হঠাৎ যেন কে বলে ওঠে—আমার দিকে চেয়ে দেখ, এই যে আমি—

আবার পেছন ফেরে সদানন্দ। একেবারে ঠিক কালীগঞ্জের বউ-এর গলা।

—তুমি বাবা আমার জন্যে কেন কষ্ট পাচ্ছো? আমি তো মরে গিয়েছি।

সদানন্দ সামনের ধূ-ধূ নিঃসীম অন্ধকারের দিকে চেয়ে অশরীরী শব্দটার মধ্যে একটা অবয়ব খুঁজতে চেষ্টা করে।

—তুমি নতুন বিয়ে করেছ, তোমার সামনে অনেক ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, তুমি আমার কথা আর ভেবো না বাবা। বুঝলে? ভাবলে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি বাড়ি ফিরে যাও—

সদানন্দ কাঁদো-কাঁদো গলায় একবার ক্ষীণ প্রশ্ন করলে—তুমি কই কালীগঞ্জের বউ? তুমি কই?

—আমি? আমি তো আর নেই বাবা?

—তুমি নেই তো কথা বলছো কী করে? তুমি কোথায়?

—আমি? আমি আর কোথায় থাকবো? আমাকে যে তোমার গোমস্তা মশাই একবারে শেষ করে দিয়েছে। আমি যে হারিয়ে গিয়েছি বাবা।

বলতে বলতে একটা কাঠফাটা আর্তনাদে হঠাৎ যেন বাতাসটা চৌচির হয়ে গেল আর সদানন্দর সমস্ত শরীরটা সেই শব্দে থর-থর করে কেঁপে উঠলো। হঠাৎ নজরে পড়লো তার সামনেই একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর অচেনা মানুষ দেখে তার দিকে চেয়ে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে।

সদানন্দ চিৎকার করে বলে উঠলো—আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো কালীগঞ্জের বউ, তুমি দেখে নিও, আমি আমার দাদুর সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো একদিন—

আশ্চর্য! একটা তুচ্ছ কুকুরও তাকে আজ পর মনে করছে। তাকে অবিশ্বাস করছে। তাকে অশ্রদ্ধা করছে। সে যে এক নিষ্ঠুর হত্যাকারী পরস্বাপহারীর বংশধর তা এই রাস্তার কুকুরটাও যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছে।

লজ্জায় মাথা নিচু করে সদানন্দ আবার তার বাড়ির পথ ধরলে। অন্য দিন হলে সে কুকুরটাকে তাড়া করতো। কিম্বা তাকে লক্ষ্য করে একটা ঢিলও ছুঁড়তো। কিন্তু আজ তার মনে হলো কুকুরটার কোনও অপরাধ নেই। সে কোনও অন্যায় করেনি। নবাবগঞ্জের মানুষও যে তাকে এতদিন এমনি করে কামড়াতে আসে নি এই-ই যেন তার পরম সৌভাগ্য!

প্রকাশ মামাই প্রথমে তাকে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছে—ও দিদি এই যে, এতক্ষণে তোমার খোকা এসে গেছে—

গৌরী পিসীও রান্নাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সকলকেই বলা ছিল বউমা যে বাড়িতে এসেছে এ কথা কেউ যেন খোকাকে না জানায়! সদানন্দ সকলের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এমন করে তো অন্যদিন কেউ চায় না তার দিকে। অন্তত কেউ এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখে না।

মা বললে—আয় খেতে বোস—

সদানন্দ কুয়োতলা থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে যথারীতি খেতে বসলো। প্রতিদিনকার নিয়ম-বাঁধা কাজ। সেই সকালবেলা খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর রাত্রে এসে খেয়ে নিজের ঘরটাতে শুয়ে পড়া। আর তাও খাওয়া-না-খাওয়া। কোনও রকমে গলা দিয়ে ভাত সেঁধিয়ে দেওয়া।

মা বললে—হ্যাঁ রে, সারাদিন কোথায় থাকিস? তোর কি ক্ষিধেও পেতে নেই রে? না কারো বাড়িতে খেয়ে নিস্?

এ অভিযোগ নিত্য-নৈমিত্তিক। এতে কান দেওয়ার মত ছেলে সদানন্দ নয়।

গৌরী পিসী এসে ভাতের থালা রেখে দিয়ে গেল সামনে।

মা বললে—ওরে খাবার আগে এইটে চুমুক দিয়ে খেয়ে নে বাবা—যেন পায়ে না ঠেকে—বলে ছোট পাথরের একটা বাটি সামনে এগিয়ে দিলে।

—কী এটা?

—পূজোর চন্নোমেত্তর! পূজো হয়েছিল তারই পেসাদ!

সদানন্দ বললে—এ আমি খাবো না—

—কেন, খাবি নে কেন? পেসাদ খেতে দোষ কী তোর?

সদানন্দ বললে—এ খেয়ে কী হবে?

মা বললে—খেলে তোর ভালো হবে। তোর মতি-গতি ফিরবে—

সদানন্দ বললে—আমার মতি-গতি কি খারাপ যে ফেরাতে হবে?

মা বললে—অত তক্কো করিস নি তুই, আমি বলছি খেয়ে নে, মার কথা শুনতে হয়, খা, খেয়ে নে—

সদানন্দ হাত দিয়ে বাটিটা ঠেলে দিতেই বাটিটা উল্টে জল পড়ে গেল।

মা বললে—ও কী করলি? ঠাকুরের পেসাদ ফেলে দিলি? ওতে যে পাপ হয় রে—

—হোক পাপ। পাপ হলে আমার হবে। আমার পাপ হলে তোমাদের কী? তোমরা আমার কথা কেউ ভাবো?

বলে সদানন্দ থালা থেকে ভাত তুলে মুখে পুরতে লাগলো। যেন কোনও রকমে ভাত গিলে মার সামনে থেকে উঠে যেতে পারলে সে বাঁচে। তারপর যা পারলে খেয়ে নিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ ধুয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

প্রকাশ মামা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ততক্ষণ আড়ালে ওৎ পেতে ছিল। সদানন্দ ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়েছে।

সদানন্দর তখন আর কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা খুলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সাপের ছোবল খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পড়লো। মনে হলো পাশে যেন কে শুয়ে রয়েছে। একটা কী যেন সন্দেহ হলো তার। তারপর জানলাটা খুলে দিলে। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের আলো এসে বিছানাতে পড়তেই দেখলে নয়নতারা। নয়নতারা বিছানার একপাশে সরে গিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে।

কিন্তু এমন করে তার বউ যে হঠাৎ এসে পড়বে তা সদানন্দ কল্পনা করতে পারে নি। নয়নতারার মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে সে সেখানে চলে গিয়েছিল এই খবরটাই সে জানতো। কিন্তু ফিরে আসার খবরটা তো তাকে কেউই দেয় নি।

কী করবে সে বুঝতে পারলে না। ঘটনার আকস্মিকতায় একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তার পরে সোজা ঘর থেকে বাইরে যেতে গিয়েই বুঝলে বাইরে থেকে শেকল বন্ধ।

সদানন্দ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—মা, মা, দরজা খোল, দরজা বন্ধ করে দিলে কেন? দরজা খোল মা—

প্রকাশ মামা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল মজা দেখবার জন্যে। দিদির দিকে চেয়ে বললে—খবরদার, দরজা খুলে দিও না যেন—ওই রকম বন্ধ থাকুক—

প্রীতির তখনও সন্দেহ হচ্ছিল। বললে—কিন্তু শেষে যদি খোকা কিছু করে বসে?

—কী করে বসবে? করলে তখন তো আমি আছি। আমার কাছে তো তারও ওষুধ আছে।

সদানন্দ ভেতর থেকে তখনও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে—মা, দরজা খোল মা—

চৌধুরী মশাইও বাবাজীকে রেখে দেখতে এসেছিলেন। বললেন—সেই চন্নোমেত্তরটা খাইয়েছো তো?

প্রীতি বললে—খোকা কি তোমার সেই ছেলে যে খাবে? আমি পাথর বাটিটা দিতেই সে ঠেলে ফেলে দিলে।

চৌধুরী মশাই রেগে গেলেন। বললেন—তা এই সামান্য কাজটুকুও তোমাদের দিয়ে হবে না? এখন বাবাজীকে আমি কী বলি বলো তো?

প্রীতি বললে—তুমি আর কথা বলো না। এতই যদি তোমার ক্ষমতা তো তুমি নিজেই খাওয়াবার ভার নিলে পারতে, দেখতুম তোমার ছেলে কী রকম বাধ্য তোমার! তুমি কি মনে করেছ আমি ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করিনি?

প্রকাশ মামা চৌধুরী মশাইকে ঠেলে সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। বললে—আপনি যান তো জামাইবাবু এখান থেকে, আপনি যান। আপনি গিয়ে বাবাজীকে দেখুন গে। আমরা এ-দিকটা সামলাচ্ছি, আপনি যান—

চৌধুরী মশাই আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু মন থেকে তাঁর দুর্ভাবনাও গেল না। এত সাধ্য-সাধনা, এত হোম-ব্রত, এত পূজো-আচ্চা, এত টাকা খরচান্ত, সবই কি তাহলে ব্যর্থ হলো? তাহলে কি ভগবান বলে কেউ নেই?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ রে প্রকাশ, শেষকালে হিতে বিপরীত হবে না তো?

প্রকাশ মামা নির্ভয় দিলে। বললে—হিতে-বিপরীত কী হবেটা শুনি? হবেটা কী?

প্রীতি বললে—যদি খোকা বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায়? এখন তো তবু বাড়িতে আসছিল রাত্তিরবেলাটা, এর পর যদি বাড়ি আসাও ছেড়ে দেয়?

—পাগল হয়েছ? বাড়িতে না এলে খাবে কোথায় শুনি? ঘুমোনো যেখানে-সেখানে চলতে পারে, কিন্তু খাওয়া? সেটা কে দেবে ওকে? তোমার ছেলের তো সে ক্ষমতাও নেই যে নিজে রোজগার করে খাবে! তাহলে বাড়ি আসবে না তো যাবে কোথায়? তুমি অত ভাবছো কেন দিদি, আমি তো আছি। এতে ফয়সালা না হয় তো অন্য পথও তো আছে—

—অন্য কী পথ?

প্রকাশ মামা বললে—সে একরকম মাদুলি আছে, সে একেবারে অব্যর্থ—

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, মাদুলি পরতে বয়ে গেছে তোর ভাগ্নের। বলে চন্নোমেত্তোরই ফেলে দিলে, সে আবার পরবে মাদুলি!

প্রকাশ মামা বললে—আরে সদা মাদুলি পরবে কেন। মাদুলি পরিয়ে দেব বউমাকে। দেখবে সেই মাদুলি পরিয়ে দিলে সদা একেবারে বউমার পা চাটতে চাটতে পায়ের চামড়া ক্ষইয়ে ফেলবে তবে ছাড়বে—তুমি যদি ফুলশয্যের দিনের ব্যাপারটা আগে বলতে আমি তো সেই ব্যবস্থাই করতুম। তাহলে এই বাবাজীর পেছনে এত খরচান্ত করতেও হতো না—

ভেতর থেকে সদা তখনও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে—মা, দরজা খুলে দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, দরজা খোল মা...

প্রকাশ মামার মুখ দিয়ে তখন হাসি বেরোচ্ছে। জয়ের হাসি। বাহাদুরি দেখাবার এমন সুযোগ তার বহুদিন আসে নি। যেন সদানন্দর সব রোগের অব্যর্থ ওষুধ সে প্রয়োগ করেছে। এবার রোগী বাঁচবেই।

প্রকাশ দিদির মুখের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে—তুমি এবার নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোওগে। আর কোনও ভয় নেই। তোমার শরীর খারাপ, তুমি কেন আর কষ্ট করবে—

কিন্তু প্রীতি যেন তখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। বললে—শেষকালে উল্টো ফল হবে না তো রে? আমার বাপু ভয় করছে কিন্তু—

—ভয়? প্রকাশ অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি রয়েছি তবু তোমার ভয়? তুমি জানো আমি এর চেয়ে বড় বড় কেস মিটিয়ে দিয়েছি, আর তুমি এখনও সন্দেহ করছো?

প্রীতি বললে—আমি বউমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। হাজার হোক বেচারি তো নতুন এসেছে আজ। এই সবে মা মারা গিয়েছে। আর তা ছাড়া বউমাকে তো আগে থেকে সাবধান করে রাখা হয় নি।

প্রকাশ বললে—বর-বউ এক ঘরে শোবে তাতে আবার সাবধান করে দেওয়ার কী আছে? মেয়েমানুষের চরিত্র তুমি আমাকে শেখাচ্ছো? তুমি ভাবছো আমি মেয়েদের স্বভাব জানি না? সদা যদি একটু চালাক হয় তো আজকে এই চান্স্ আর ছাড়বে না। প্রথম দিন যা করেছে তা করেছে, আজকে যদি আবার এ চান্স হাত-ছাড়া করে তো ওর কপালে অনেক দুঃখু আছে, এই তোমাকে বলে রাখলুম—

প্রীতি বললে—আর কতক্ষণ দরজায় এমনি করে শেকল দিয়ে রাখবি?

প্রকাশ হাসলো। বললে—ঘি যখন গলে যাবে তখনই দরজা খুলে দেব—

—তার মানে?

—তার মানে বুঝলে না তুমি! আগুনের পাশে ঘি রাখলেই তো গলে যায়। আর একটু সবুর করো না, তখন ওই সদা নিজেই ভেতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে দেবে—আমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না—

প্রীতি বললে—কী জানি বাপু তোর কী মতলব, তুই থাক, আমি যাই, আমার ঘুম পেয়ে গেছে, আমি আর পারছি নে—

বলে প্রীতি তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। চৌধুরী মশাই তার আগেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তিনিও তখন হাঁ করে ছিলেন সব শোনবার জন্যে। গৃহিণীকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? ওদিকের কী খবর?

প্রীতি বললে—প্রকাশ রইলো আমি চলে এলুম। আমার ঘুম পেয়ে গেছে—

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—তা এখনও কি প্রকাশ সেই রকম শেকল দিয়ে রেখেছে নাকি?

—রেখেছে।

—কখন খুলবে?

প্রীতি বললে—কে জানে কখন খুলবে! ছেলের যেমন কাণ্ড! এত ছেলের বিয়ে দেখেছি, এমন কাণ্ড বাপের জন্মে কখনও কারো দেখি নি—এও আমার কপাল!

চৌধুরী মশাই এ-কথার কিছু জবাব দিলেন না। আর কী জবাবই বা তাঁর দেবার ছিল! এমনধারা কাণ্ড তিনিও জীবনে দেখেন নি! লোকের বিয়ে হয়, বর-কনে ফুলশয্যার রাত থেকে এক বিছানায় শোয়, পরের দিন সারা রাত জাগার দরুণ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। তার পরদিন থেকে লোকে কখন রাত হবে কখন আবার বউএর সঙ্গে দেখা হবে সেই আশায় সারাদিন ছট্‌ফট করে! তাঁর নিজেরও একদিন বিয়ে হয়েছিল। তিনিও বিয়ের পর তাই-ই করেছেন। এই-ই হলো নিয়ম। এইটেই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। সকলের জীবনে এই-ই তো ঘটে! তা নয়, এ কী অসম্ভব কাণ্ড! এ কথা লোকে জানলে তারাই বা কী ভাববে! বউমার বাবার কানে গেলে তিনিই বা কী ভাববেন! কোথাও কিছু নেই, ঠাকুরদাদা কী দোষ করলো, বাবা কী অপরাধ করলো তাই নিয়ে কোনও ছেলে এমন পাগলামি করেছে এ-কথা কখনও কেউ শুনেছে?

চৌধুরী মশাই গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন—ওগো, শুনছো!

গৃহিণী জেগেই ছিলেন। বললেন—কী?

—বউমাকে বলে দিয়েছ তো যে এ-সব কথা যেন বেয়াই মশাইকে না বলে?

প্রীতি বললে—বলেছি তো। আগেই বলেছি, বার বার এ-সব কথা বলতেও আমার লজ্জা করে। শাশুড়ী হয়ে এ-সব কথা বউকে বার বার বলতে ভালো লাগে?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা আমারই কি বলতে ভালো লাগে মনে করো? কিন্তু কী করবো বলো? ছেলে যদি এমন বেয়াড়া না হতো আমিই কি ভাবছো এ-সব নিয়ে আলোচনা করতুম?

প্রীতি বললে—তা তোমাদেরই তো যত দোষ!

—কেন? আমরা আবার কি দোষ করলুম? আমরা মানে কারা?

প্রীতি বললে—তুমি আর তোমার বাবা! তোমরা কাকে ঠকিয়ে টাকা-কড়ি-জমি-জমা করবে, কাকে খুন করবে তা ওর মনে লাগবে না? সত্যিই তো, কালীগঞ্জের বউ যেমন মানুষই হোক, জলজ্যান্ত মানুষটা যাবেই বা কোথায়? দারোগা পুলিস এল, তারাই বা কিছু কূল-কিনারা করতে পারলে না কেন? তাদেরও তোমরা টাকা খাইয়ে হাত করবে! তা এখন আমার কী, তোমরাই সামলাও—

চৌধুরী মশাই কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে গেলেন। বললেন—তুমি আর ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না।

প্রীতি বললে—কেন? মাথা ঘামাবো না কেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—তোমরা মেয়েমানুষ বাড়ির ভেতরে থাকো, বাড়ির বাইরের ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকারটা কী! জমিদারি-জোতদারির কথায় তোমাদের মেয়েমানুষদের না-থাকাই ভালো।

প্রীতি বললে—ওই মাথা ঘামাতে দাও না বলেই তো আজকে আমার বউমার এই হেনস্থা! মাথা ঘামাতে দিলে আর বাড়ির ভেতরে এই অবস্থা হতো না—

কথাটা চৌধুরী মশাই-এর পছন্দ হলো না। বললেন—তা হলে বলো জমি-জমা বেচে দিয়ে সন্নিসী হয়ে যাই, সন্নিসী হয়ে সংসার-ধর্ম ছেড়ে বনে চলে যাই। তাও তো পারবে না। তাতেও তো তোমার কষ্ট হবে।

প্রীতি বললে—তা সংসার-ধর্ম ছাড়বার কথা আমি কি একবারও বলিচি? রাত-দুপুরে কী যে তুমি সব আজে-বাজে কথা বলো—

চৌধুরী মশাই বললেন—এ-সব বাজে কথা হলো? তোমার সঙ্গে দেখছি এ-সব কথা বলাও পাপ—

প্রীতি বললে—তা বাজে কথা না তো কী! আমি তোমায় সংসার ছেড়ে বনে চলে যেতে একবারও বলিচি?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা হলে কালীগঞ্জের বউ-এর কথা তুমি তুললে কেন? কালীগঞ্জের বউকে কি আমরা খুন করেছি? আর যদি খুনই করতুম তো দারোগা-পুলিস কি তার কোনও কিনারা করতে পারতো না? তারা কি সবাই ঘাস খায়?

তারপর একটু থেমে আবার গলা চড়িয়ে বললেন—আর তা ছাড়া জমিদারির তুমি কী বোঝ শুনি? জমি-জমা করতে গেলে খুন-খারাবি না করলে চলে? তাহলে কাল থেকে তুমিই চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসলে পারো, আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকি! দেখি কী-রকম জমিদারি চালাও তুমি!

প্রীতি বললে—যাও, তুমি আর কিছু তো পারো না, কেবল ঝগড়া করতেই পারো—

চৌধুরী মশাই বললেন—আমি ভালো কথাই বলছি, আর তোমার কাছে এটা ঝগড়া করা হলো?

—ঝগড়া না তো কী! কোথায় আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কথা বলতে এলাম আর তুমি এলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! তুমি ঘুমোও না। তোমার কি ঘুমও পায় না? তোমায় কে জেগে থাকতে বলেছে?

চৌধুরী মশাই বললেন—বাড়ির মধ্যে ছেলের এই কাণ্ড, এতে কারো ঘুম আসে?

—তা তুমি ঘুমোও আর না-ঘুমোও আমাকে ঘুমোতে দাও। সারা দিন সংসারে খেটে খেটে আমার হাড়-মাস কালো হয়ে গেছে, আমি একটু ঘুমোব, কাল সকালে উঠেই তো আবার আমাকে সংসারের পিণ্ডি রাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন দানা-পানি না পেলে তো আবার তোমরাই চেঁচাবে—

চৌধুরী মশাই বললেন—তোমার শরীর খারাপ, তুমি অত খাটোই বা কেন? তুমি ছাড়া কি আর লোক নেই? গৌরী সারা দিন কী করে? ও তো কেবল নেচে নেচে বেড়ায় দেখেছি। ওকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে পারো না? গৌরী রয়েছে, বিষ্টুর মা রয়েছে, লোকের তো তোমার আমি কমতি রাখি নি। তাদের কি কেবল বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার জন্যে রেখেছি! তারা যদি কিছু কাজই না করে তো তাদের ছাড়িয়ে দাও না। আপদ বিদেয় হোক—

প্রীতি আর পারলে না। বললে—দেখ, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বাইরে থেকে ও-সব অনেক কথা বলা যায়, কথা বলতে তো কারো ট্যাক্স লাগে না, হাতে কলমে করলে তবে ঠ্যালা বুঝবে!

চৌধুরী মশাই বললেন—তা তুমি একদিন রান্নাঘরে না-গিয়েই দেখ না, কাজ ঠিক হয় কি না, কেউ খেতে পায় কি না—

প্রীতি বললে—সে আমি যখন মরে যাবো তখন তোমরাই দেখো। আমি তখন আর দেখতে আসছি নে—

—ওই তো! ওই তোমার এক কথা। যখন তর্কে হেরে যাবে তখন ওই মরার কথা বলা ছাড়া তোমার উপায় নেই—

—তুমি থামো দিকি! তুমি থামো।

বলে রেগে চেঁচিয়ে উঠলো প্রীতি। বললে—আমার সঙ্গে যদি কথা বলতে তোমার এতই খারাপ লাগে তো আমার ঘরে আসো কেন? এখানে না শুয়ে চণ্ডীমণ্ডপে শুলেই পারো। কাল থেকে আমি তোমার সেই ব্যবস্থাই করে দেব—

বলে উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুলো। তারপর বললে —আমার এখন কিচ্ছু ভাল লাগছে না, আমার ঘুম পেয়ে গেছে, আমি ঘুমোব—

বলে প্রীতি পাশ-বালিশটা জড়িয়ে ধরে দু চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। চারদিকে নিঝুম। কোথাও কোন শব্দ নেই। নবাবগঞ্জ এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই সব অন্ধকার রাত্রে বারোয়ারিতলা থেকে মাঝে মাঝে যাত্রার গানের শব্দ আসে, এবার পূজোর সময় তাদের 'পাষাণী' পালা হবে। প্রকাশ বলে গেছে। নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে। প্রীতি দু চোখের পাতা জোর করে বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। খানিক পরে একসময়ে পাশ থেকে চৌধুরী মশাইএরও নাক ডাকার শব্দ শুরু হলো। অদ্ভুত মানুষটা। বেশ চট্ করে কথা বলতে বলতে ঘুমোতে পারে। কাজের মধ্যেও মানুষ যে কেমন করে এমন নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে সেইটেই আশ্চর্য। তার মানে মনে কোনও দাগ লাগে না মানুষটার। যেমন সারাদিন নাকে দড়ি দিয়ে খাটবে, তেমনি আবার রাত্রে বিছানায় পড়েই ভোঁস্-ভোঁস্

করে ঘুমোবে। প্রীতিরও যদি ওই রকম হতো তো ভালো হতো। জীবনে কোনও দিন বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এলো না। এও এক রকমের রোগ! রোগ বই কি! নইলে সারাদিন তো ধকল কম যায় নি। যত রাত বাড়বে ততই হাই উঠবে। কিন্তু চোখ দুটো বোঁজার সঙ্গে সঙ্গে যত ঘুম সব যে কোথায় পালিয়ে যাবে ঠিক পাওয়া যাবে না।

তারপর আবার অন্য দিকে পাশ ফিরলো প্রীতি। আবার সেই চোখ বুঁজে ঘুমের সাধনা। আবার সেই হাজারটা ভাবনা এসে মাথায় ঢোকে। এতক্ষণ খোকা আর বউমা ঘরের মধ্যে কী করছে কে জানে। হয়ত দু'জনের ভাব হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়ত দুজনে কথা বলছে।

আর প্রকাশ?

প্রকাশের কথা মনে আসতেই ঘুমটা যেন আসতে আসতে আরো দূরে পালিয়ে গেল। প্রীতি দু'চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যেই চেয়ে দেখলে। পাশেই চৌধুরী মশাই ও-পাশ ফিরে ঘুমে অসাড়। পাশে একজন মানুষ অমন করে অঘোরে ঘুমোলে কি কারো ভালো লাগে? অথচ কাল সকাল থেকেই আবার সংসারের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করবে। ভোরবেলা দেখা হলেই গৌরী ভাঁড়ারের চাবি চাইবে। বিষ্টুর মা জিজ্ঞেস করবে কী রান্না হবে। খাবে সবাই-ই কিন্তু কী রান্না হবে তা ভাবতে হবে একা প্রীতিকেই। যেন সংসার তার একলারই, আর কারো নয়।

কিন্তু না, প্রকাশের কথাটা মনে পড়লেই প্রীতি বিছানা ছেড়ে উঠলো। জ্বালাতন হয়েছে তার। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাত্তিরে যে একটু আরাম করে ঘুমোবে তারও উপায় নেই। গায়ের কাপড় ভালো করে সামলে নিয়ে প্রীতি ঘর থেকে বেরোল।

রাত কত হয়েছে কে জানে! কোনও দিক থেকে কারো কোনও শব্দ আসছে না। প্রীতি আস্তে আস্তে খোকার ঘরের দিকে গেল।

কিন্তু খোকার ঘরের সামনে গিয়ে অবাক। দেখে প্রকাশ সেই ঘরের দরজার সামনে খালি মেঝের ওপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

প্রীতি ডাকলে—এই প্রকাশ, প্রকাশ—এই প্রকাশ—

প্রকাশের ঘুম নয় তো যেন হাতীর ঘুম। কেউ যদি তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়েও যায় তবু তার ঘুম ভাঙবে না।

—এই প্রকাশ, প্রকাশ—

এবার তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে হলো। মোযের মত ঘুমোচ্ছে। তার কাপড় খুলে নিলেও যেন সে টের পাবে না, এমন ঘুম।

ধাক্কা খেয়ে প্রকাশ ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—কে? কে? কী হয়েছে?

একে ঘুমের জড়তা, তার ওপর মাঝরাত। তারপর একটু যেন জ্ঞান ফিরলো। প্রীতির মুখের দিকে চাইলে। বললে—কী হলো? আমি কোথায়?

প্রীতি বললে—আমি তোর দিদি রে। আমি তোর দিদি কথা বলছি—

দিদির কথা শুনে যেন ধাতস্থ হলো প্রকাশ। বললে—তাই বলো! তা অমন করে ঠেলতে আছে? আমি তো জেগেই ছিলুম। শুধু চোখ দুটো বুঁজিয়ে রেখেছিলুম আর কি। তা তুমি আবার কেন কষ্ট করে আসতে গেলে? আমি যখন ভার নিয়েছি তখন তুমি অত ভাবছো কেন?

সে-সব কথায় কান না দিয়ে প্রীতি বললে—খোকা আর দরজা ঠেলেছিল? ধাক্কা দিয়েছিল ভেতর থেকে?

—খোকা? সদা? কই, না তো। ধাক্কা দিলে তো আমি শুনতে পেতুম! আমি তো জেগেই আছি—

প্রীতি যেন মনে মনে খুশী হলো।

—তাহলে এতক্ষণে খোকার ভাব হয়ে গেছে বউমার সঙ্গে, কী বল্—

প্রকাশ বললে—আরে, তোমাকে তো আমি বলেই রেখেছি যে তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই। যতক্ষণ আমি আছি তুমি গ্যাঁট হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না। আমিই সদার বউ পছন্দ করে দিয়েছি, ওর দায়িত্ব আমারই—

প্রীতি বললে—সে তো আমি জানি রে। কিন্তু তোর জামাইবাবু যে ভেবে ভেবে ছট্‌ফট করছে। ও নিজেও ভাবছে, আমাকেও ভাবিয়ে মারছে।

প্রকাশ বললে—কেন যে জামাইবাবু এত ভাবছে। তা বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও আমি মেয়েমানুষ কখনও দেখি নি, না মেয়েমানুষকে কখনও বিয়ে করি নি? আমার ও তো এককালে বিয়ে হয়েছে গো! আগুনের পাশে ঘি রাখলে কী হয় তা কি আমি জানি না বলতে চাও? তুমিই বলো আগুনের পাশে ঘি রাখলে কী হয়, তুমিই বলো? তোমারও তো বিয়ে হয়েছে—

প্রীতি কিছু বুঝতে পারলে না। প্রকাশ যে কথা বলছে সে তো সোজা হিসেব। কিন্তু সংসারের সব হিসেব যদি অত সোজা হিসেব হতো তাহলে তো আর কোনও ভাবনাই থাকতো না। তাহলে কি আর প্রীতির এত ভাবনা না চৌধুরী মশাই-এরই এত খরচান্ত। চৌধুরী মশাই যে কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছেন তা বাইরের কেউ জানতে পারে না। কিন্তু প্রীতি তো মানুষটার যন্ত্রণার কথা আন্দাজ করতে পারে! কর্তাবাবুকে পর্যন্ত এসব ব্যাপার কিছু বলা হয় নি। কর্তাবাবু জানে সকলে যেমন সংসার-ধর্ম করে তাঁর নাতিও তেমনি সংসার-ধর্ম করে যাচ্ছে। রেল বাজারের কাঞ্চন স্যাকরাকে গয়না গড়াতে দিয়েছে, বউমার ছেলে হলে তাই দিয়ে তার মুখ দেখবেন। কর্তাবাবুর আগ্রহটাই যেন সব চেয়ে বেশি। বউমার ছেলে হলে কর্তাবাবুই সব চেয়ে খুশী হবেন। কিন্তু বাড়িতে যে শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে তাঁকে সে-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। তিনি ভাবছেন বেহারি পালের বাড়িতে পুজো হচ্ছে। এখন যদি আসল খবরটা তাঁর কানে যায় তখন কী হবে?

প্রকাশ বললে—তুমি ঘুমোতে যাও দিদি, তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবে? এই খুপরির মধ্যে—

প্রীতি বললে—আর তুই? তুই আর কতক্ষণ শেকল বন্ধ করে দরজা আগলে থাকবি?

প্রকাশ বললে—কিন্তু দরজার শেকল খুলে দিলে যদি সদা ঘর থেকে পালিয়ে যায়?

প্রীতি বললে—তুই আস্তে আস্তে শেকল খুলে দে না, আওয়াজ না হলেই তো হলো। ও তো আর টের পাচ্ছে না। আর তা ছাড়া খোকা আর বউমা দু'জনেই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই—

—কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। এই বলতে গেলে প্রথম ওদের দেখা, আজ রাত্তিরে কখনও ঘুমোয়? আমি তো আমার ফুলশয্যের রাত্তিরে ঘুমোই নি। তুমি ঘুমিয়েছিলে?

প্রীতি সে কথার ধার দিয়ে গেল না। বললে—তাহলে তুই কী করবি? এখেনে সারা রাত বসে থাকবি এমনি করে?

প্রকাশ বললে—রাত তো আর বেশি নেই, ভোর তো হয়ে এল—

তারপর যেন কী ভাবলে। বললে—দাঁড়াও, একটা মতলব বার করেছি। আমি একবার খিড়কির দরজা খুলে বাগানের দিকে যাই ; ওখানে গিয়ে সদার ঘরের জানালা যদি খোলা থাকে তো উঁকি মেরে দেখি যে কী করছে তারা—তুমি এখেনে দাঁড়াও—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না প্রকাশ। বারান্দা পেরিয়ে উঠোন। ভেতর-বাড়ির উঠোন। উঠোনে নেমে পশ্চিম দিক দিয়ে বাগানের বেড়ার দরজা। সেই দরজা খুলে ভেতরে বাগান। ভোর হয়-হয়। চাঁদটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। গাছ-পালা মাড়িয়ে প্রকাশ একেবারে সদার ঘরের উত্তর দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সেদিকটা ঝোপ-ঝাড়। কলাগাছ, নেবুগাছের ঝাড়। মাথায় কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি হবার মত অবস্থা। গিয়ে দেখলে জানালার পাল্লা দুটো খোলা। টিপি-টিপি পায়ে প্রকাশ মাথা নিচু করে সেখানে গিয়ে উঁকি দিলে। উঁকি দিয়ে দেখে অবাক।

প্রকাশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলে।

তারপর যে পথ দিয়ে গিয়েছিল আবার সেই পথ দিয়েই উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। প্রীতি সেখানেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রকাশ আসতেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী দেখলি? দেখতে পেলি কিছু? কী করছে ওরা? ঘুমোচ্ছে? ঘুমিয়ে পড়েছে?

প্রকাশ বললে—তুমিও দেখবে এসো না—

—আমি? আমি আবার কী দেখবো?

প্রকাশ বললে—চলো না, তুমি তোমার ছেলের কাণ্ড নিজের চোখেই দেখবে চলো না।

প্রীতি বললে—তুই নিজেই বল না, আমি আবার কী দেখবো?

প্রকাশ নাছোড়বান্দা। বললে—না, তোমার নিজের চোখেই দেখা উচিত, এসো, আমার সঙ্গে এসো। তোমার ছেলের কাণ্ড দেখবে এসো—

বলে প্রকাশ দিদির একটা হাত খপ করে ধরে ফেললে। ধরে টানতে লাগলো। বললে—এসো, এসো, দেখবে এসো—

প্রীতি বললে—ওরে না-না, হাত ছাড়, আমি মা হই, আমার দেখতে নেই, আমার দেখা ঠিক নয়—

কিন্তু প্রকাশ দিদির কথা শুনবে, এমন পাত্রই সে নয়। সে দিদির হাত ধরে টানতে লাগলো। টানতে টানতে একেবারে বাগানের ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর হাতটা ছেড়ে দিলে। বললে—এবার একটু আস্তে এসো। পা টিপে টিপে এসো। শুকনো পাতা যেন মাড়িয়ে ফেলো না, শব্দ হবে।

প্রীতি আবার একবার আপত্তি করতে যাচ্ছিল। প্রকাশ বললে—না, তোমার ছেলের কীর্তি তোমার নিজের চোখে দেখা ভালো। নইলে আমার মুখ থেকে শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না। এসো—

প্রীতিও প্রকাশের পেছন পেছন পা টিপে টিপে চলতে লাগলো। উত্তর দিকের দেয়ালের জানালার কাছে এসে প্রকাশ গলা নিচু করে প্রীতির কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে বললে—এইখান দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখো—

প্রীতির যেন কেমন সঙ্কোচ হলো। বললে—আমি দেখবো?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ, দেখ না, চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সব স্পষ্ট দেখতে পাবে—

প্রীতি বললে—কিন্তু আমি যে মা হই রে, আমাকে দেখতে নেই যে—

প্রকাশ বললে—একটু আস্তে কথা বলো না, শুনতে পাবে যে—দেখো এবার ভেতরে উঁকি মেরে দেখ, কিচ্ছু অন্যায় হবে না। আমি বলছি তোমার কিচ্ছু অন্যায় হবে না—

প্রীতি কী আর করবে। মাথাটা উঁচু করে জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলে।

দেখে অবাক হয়ে গেল। দেখলে খোকা ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা চেয়ারের

ওপর মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। মুখের চেহারাটা যেন মনে হলো গম্ভীর-গম্ভীর। যেন খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে। আর খাটের দক্ষিণ দিকে বিছানার একটা কোণের ওপর পেছন ফিরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে বউমা। মাথায় একগলা ঘোমটা। কারো মুখে কোনও সাড়া নেই শব্দ নেই। যেন দুজনেই বোবা।

তা হলে কি সারা রাতই ওরা ওইভাবে রাত কাটিয়েছে নাকি?

প্রীতির দু-চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল। আর দেখতে ভালো লাগলো না। তাড়াতাড়ি জানালা থেকে চোখ নামিয়ে নিলে।

প্রকাশ বললে—কী? কী দেখলে দিদি?

প্রীতি কিছু কথা বললে না। যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই আবার ফিরে চলতে লাগলো। তারপর বাগান পেরিয়ে উঠোনে এসে পড়লো।

প্রকাশও পেছন-পেছন আসছিল। এতক্ষণ সেও কোনও কথা বলে নি। এবারে উঠোনে পড়েই জিজ্ঞেস করলে—দেখলে তো? দেখলে তো তোমার ছেলের কাণ্ড?

তবু প্রীতির মুখে কোনও কথা নেই। সে যেন খানিকক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠলো।

প্রকাশ বললে—কী হলো? তুমি কথা বলছো না যে?

প্রীতি বললে—আমি আর কী বলবো?

প্রকাশ বললে—কী অদ্ভুত ছেলেই পেটে ধরেছিলে তুমি দিদি! ধিক্ তোমার ছেলেকে, ধিক্! আমি এতদিন ধরে চেষ্টা করেও ওকে মানুষ করতে পারলুম না। আমারই লজ্জা হচ্ছে, বুঝলে দিদি। লজ্জা আমারই হচ্ছে, অথচ অত সুন্দরী দেখে ওর বউ এনে দিলুম। আমি জানতুম আগুনের পাশে ঘি রাখলে ঘি গলে জল হয়ে যায়, এ যে দেখছি একেবারে আইস, একেবারে বরফ—

প্রীতি তখনও যেন নিজের মনেই কী ভাবছিল। বললে—আমার মনে হয় ওর বিয়ে না দিলেই ভালো হতো রে। ও তখন আপত্তি করেছিল। কেন যে তখন আমি অত জোর-জবরদস্তি করলুম। কী জানি, মা হয়ে ওর ভাল করলুম কি মন্দ করলুম—আর পরের বাড়ির একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনটাও মাঝখান থেকে বোধ হয় নষ্ট করে দিলুম—

প্রকাশ সান্ত্বনা দিলে। বললে—এসো, তুমি ও নিয়ে আর ভেবো না, তোমারও তো আবার কথায় কথায় বুক ধড়ফড় করে। আর ভেবো না তুমি। আমি সব ঠিক করে দেব, আমাকে দেখছি সেই মাদুলিই আনতে হবে—

সত্যিই প্রীতির বুকটার কাছে তখন কেমন ব্যথায় টনটন করছিল। এ রকম প্রায়ই হয় প্রীতির। একটু অনিয়ম হলেই এই রকম হয়। বিয়ের হাঙ্গামে কত দিন ধরে ভালো করে ঘুমই হয় নি। তার ওপর বিয়ের হাঙ্গামা চুকে যাবার পরও অনিয়ম চলছে। হার্টের আর দোষ কী?

প্রীতি বললে—ওরে, ভোর হয়ে এসেছে, এবার তুই শেকলটা খুলে দে—আর কষ্ট দিস নে খোকাকে—

প্রকাশও বুঝলো আর দরজায় শেকল দিয়ে রেখে লাভ নেই।

বললে—খুলে দিই তাহলে?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, খুলে দে।

প্রকাশ বাইরে থেকে চেঁচিয়ে সদার নাম ধরে ডাকলে—সদা-সদা—

বলে শব্দ করে শেকলটা খুলে দিলে। আর খানিক পরেই ভেতর থেকে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল সদানন্দ।

প্রকাশ মামা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দ তার দিকে একবার চেয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর প্রকাশ মামাকে পাশ কাটিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রকাশ মামা তাকে গিয়ে ধরলে। বললে—কী রে, এত সকালে উঠে পড়লি যে? তুই ঘুমোস নি নাকি?

তাকে দেখে মনে হলো সদানন্দ যেন রাগে ফুলছে। প্রকাশ মামার কথায় কান না দিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলতে লাগলো। প্রকাশ মামা সদানন্দর সামনে গিয়ে তার রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

বললে—কী রে, তুই কি আমার সঙ্গে কথাই বলবি না নাকি? আমার ওপর রাগ করলি কেন? আমি তোর কী করলুম?

সদানন্দ বললে—তুমি ছাড়ো আমাকে—

প্রকাশ মামা বললে—তা ছাড়বো না তো কি তোকে আমি ধরে রাখবো? কিন্তু তোর কী হলো তা আমাকে বলবি তো?

সদানন্দ বললে—তুমি কেন মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত করছো প্রকাশ মামা? আমার শরীর খারাপ, কিছু ভালো লাগছে না—

প্রকাশ মামা সদানন্দর সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বললে—কেন, শরীর খারাপ কেন? রাত্তিরে ঘুম হয় নি?

সদানন্দ রেগে উঠলো। বললে—তোমরা কি আমাকে পাগল করতে চাও প্রকাশ মামা? আমাকে কি তোমরা মেরে ফেলতে চাও? তোমরা কী পেয়েছ আমাকে? আমি পাগল?

প্রকাশ মামা বললে—দূর, তুই পাগল কেন হতে যাবি, তুই যে কাণ্ড করছিস তাতে আমাদেরই পাগল করে ছাড়বি—

সদানন্দ বললে—তার চেয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও প্রকাশ মামা, আমার যেদিকে দু চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই। আমার কিছু ভালো লাগছে না—

প্রকাশ মামা সদানন্দর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—না না, অমন কাজ করিস নি তুই সদা, তুই লেখাপড়া-জানা ছেলে, পাগলামি করিস নি তুই। কী হয়েছে তাই তুই বল্ আমাকে—

সদানন্দ রেগে গেল। বললে—কাকে কী বলবো? কতবার বলবো? কেউ যদি আমার কথা না শোনে তো আমি কী করবো? কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে বললে প্রকাশ মামা? কেন আমাকে তোমরা মিছিমিছি ধাপ্পা দিলে? কেন তোমরা আমার কথা রাখলে না? কেন তোমরা কালীগঞ্জের বউএর এমন সর্বনাশ করলে? কেন তোমরা তাকে তার দশ হাজার টাকা দিলে না? কেন? কেন দিলে না, কেন?

প্রকাশ মামা বললে—কেন টাকা দিলে না তা তোর দাদু জানে, তোর বউ কী দোষ করলো? তোর দাদুর দোষের জন্যে তুই তা বলে তোর বউএর ওপর প্রতিশোধ নিবি?

ওদিকে প্রীতি তাড়াতাড়ি খোকার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভেতরে ঢুকেই ডাকলে—বউমা—

নয়নতারা তখনও খাটের কোণের দিকে ঠায় সেই একই ভাবে বসে ছিল। শাশুড়ীর গলার শব্দে তার ঘোমটাটা যেন একটুখানি কেঁপে উঠলো। কিন্তু তখনই সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। শাশুড়ী যখন সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

শাশুড়ী সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী বউমা, কাঁদছো যে? কী হয়েছে?

নয়নতারা তার মাথাটা আরো নিচু করে নিলে। যেন পোড়ামুখ দেখাতেও তার লজ্জা হচ্ছিল।

শাশুড়ী আবার বউমাকে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কথা বলছো না যে? আজ তো খোকা রাত্তিরে তোমার ঘরে ছিল? আজ তো আর পালিয়ে যায় নি?

তবু নয়নতারার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। তার মাথাটা যেন আরো নিচু হয়ে গেল।

প্রীতি এবারে নয়নতারার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরলে। নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় ঘেন্নায় অপমানে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেলেছে। কিন্তু চোখ বুঁজলেই কি আর চোখের জলকে আটকানো যায়! সেটা তখন অঝোর ধারায় গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

প্রীতি বললে—আমার কথার জবাব দাও বউমা, আমি জানতে চাইছি আজকে খোকা তোমাকে কী বললে? তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলেছে সে?

নয়নতারা মুখে কিছু বললে না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে—না—

—কোনও কথা বলে নি?

—না

—তা হলে সমস্ত রাত ঘুমিয়ে কাটালে?

—না

—সমস্ত রাত জেগে ছিলে? বলো, জবাব দাও? দুজনেই জেগে কাটালে অথচ দুজনের মধ্যে কোনও কথা হলো না মোটে? সেই জন্যেই বুঝি তোমার চোখ দুটো এত ফুলে উঠেছে? একে রাত-জাগা তার ওপর সমস্ত রাত কেঁদেছ, চোখ তো ফুলবেই।

তারপর এ সমস্যার কী সমাধান করবে তা ভেবে না পেয়ে প্রীতি বললে—তা হলে তুমি একটু এখন শুয়ে পড় বউমা, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, ভোর হয়ে এসেছে, আমি বাসি কাপড় বদলে তোমার জন্যে একটু দুধ গরম করে আনতে বলি—

বলে প্রীতি চলে যাচ্ছিল। নয়নতারা এবার কথা বলে উঠলো। বললে—মা—

—কী বউমা, আমাকে কিছু বলবে? কী বলতে যাচ্ছিলে, বলো?

নয়নতারা আধ-ফোটা গলায় বললে—আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিন—

প্রীতি স্তম্ভিত হয়ে গেল বউমার প্রস্তাব শুনে। বললে—ছি বউমা, অমন কথা বলতে নেই, লোকে বলবে কী? তাতে তোমারও নিন্দে হবে, তোমার শ্বশুরবাড়িরও নিন্দে হবে। বলবে চৌধুরী মশাই এমন বউ করেছিল যে সে শ্বশুর-শাশুড়ীকে মানিয়ে চলতে পারলে না। আর তোমার বাবার কথাটা একবার ভাবো তো! সবে তিনি এত বড় একটা শোক সামলে উঠেছেন, এর পরে যদি শোনেন যে তোমারও কপাল ভেঙেছে তা হলে কি আর তিনি বাঁচবেন?

নয়নতারা কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। কিছু উত্তর দিলে না।

প্রীতি বললে—তার চেয়ে তুমি আর কটা দিন সহ্য করো, দেখি আমি কী করতে পারি। আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও—

নয়নতারা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমি কী অন্যায় করেছি মা, কী এমন অন্যায় করেছি যে, আমাকে এত শাস্তি পেতে হবে? আমাকে তো আপনারা দেখে শুনে পছন্দ করে বউ করে এনেছেন। আমি তো নিজে থেকে যেচে আপনাদের বাড়ি আসি নি যে এমন করে তার প্রতিশোধ নেবেন আমার ওপর—

বলতে বলতে নয়নতারা যেন ভেঙে পড়লো। মনের জ্বালায় হয়তো আরো অনেক কিছু সে বলতো কিন্তু বলতে গিয়ে তার গলাটা কথার মাঝখানেই বুঁজে এল।

প্রীতি নয়নতারার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললে—দোষ তুমি কেন করতে যাবে বউমা, সব দোষ আমার আর আমার ছেলের। আমরাই দোষ করেছি। আমার ছেলে বিয়েই করতে চায় নি। তবু তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা তুমি তার জন্যে ভেবো না বউমা, প্রথম প্রথম অনেক ছেলেই বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু শেষকালে তো সবই ঠিক হয়ে যায়। তখন আবার ছেলেমেয়ে হয়ে ঘর একেবারে ভরে যায়। এরকম অনেক দেখেছি আমি। আমাদের সুলতানপুরেই আমি কত দেখেছি। কিন্তু তুমি যেন এ নিয়ে এখন সাত-কান কোর না। কথাটা যদি একবার পাড়ার লোকের কানে যায় তো আর রক্ষে থাকবে না। তখন গাঁয়ে এই নিয়ে টি-টি পড়ে যাবে একেবারে—

হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এলো—বউদি—

প্রীতি বললে—ওই গৌরী ডাকছে, এখনই বিষ্টুর মা রান্নাঘরে ঢুকবে, গৌরী ভাঁড়ারের চাবি চাইতে এসেছে। আমি এখনই আসছি, উনুনে আগুন দিলেই তোমার জন্যে একবাটি গরম দুধ নিয়ে আসছি। সারারাত জেগে আছো, শরীরটা একটু সুস্থ হবে—

বলে বাইরে চলে গেল প্রীতি।

কিন্তু সেই সেদিন থেকেই যেন শনির দৃষ্টি পড়লো চৌধুরী বংশের ওপর। সেই যেদিন কালীগঞ্জের বউ এসেছিল নতুন বউ-এর মুখ দেখতে সেই দিন থেকে। রানাঘাট থেকে লোক এসে খবর দিয়ে গেল যে, উকিলবাবু খবর দিয়েছেন কোর্টে আর একটা মামলা উঠেছে। চৌধুরী মশাইকে একবার সেখানে যেতে হবে।

জমি-জমা থাকলেই অবশ্য মামলা-মোকর্দমা থাকবে। কথাটা তা নয়। কিন্তু এটা বড় জটিল মামলা। উকিলবাবুর চিঠিটা দুদিন আগেই এসেছিল। চৌধুরী মশাই ভেবেছিলেন বউমা কেষ্টনগর থেকে আসার পর ছেলের কী মতিগতি হয় তা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রানাঘাটে যাবেন। বাবাজীকেও তাই বলেছিলেন। বাবাজী বলেছিলেন—তুই নিশ্চিন্ত থাক, আমি তো রইলুম—আমি সব ঠিক করে দেব—

চৌধুরী মশাই বলেছিলেন—কিন্তু আপনার দিগ্বন্ধনের কিছু ফল দেখে না গেলে বড় ভয় করছে বাবাজী, জানেনই তো আমার ওই একমাত্র সন্তান, ওই একই ছেলে। যদি কিছু উল্টো ফল হয় তো তখন বড় মুশকিলে পড়বো। এখনও পর্যন্ত বাবাকে কিছুই বলা হয় নি।

—না বলেছিস ভালো করেছিস। গুহ্য কথা কাউকে বলতে নেই—

আগের দিনই এই সব কথা হয়ে গিয়েছে। পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন দেখলেন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। তিনি মস্ত বড় বিছানায় একলাই শুয়ে আছেন, পাশে কেউ নেই। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ঘরের বাইরে এসে দেখলেন ভেতর-বাড়িতে সেদিনকার কাজকর্ম সব শুরু হয়ে গিয়েছে। গৃহিণীর দেখা পাবার জন্যে একবার রান্না-বাড়ির দিকে উঁকি দিলেন। সেখানেও তিনি নেই।

কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। ফিরেই যাচ্ছিলেন। তারপর চলে গেলেন কুয়োতলার দিকে। ক'দিন আগেই বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেছে। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ভিয়েনের উনুন তৈরী করা হয়েছিল। সে উনুন আর কাজে লাগবে না। পোড়ামাটির ভাঙা ঢ্যালাগুলো তখনও জমা হয়ে রয়েছে সেখানে। কুয়োতলার পাশে মুখ-হাত-পা ধোবার বড় বড় মাটির জালা রাখা ছিল। সেখান থেকে জল নিলেন। একটু পরেই রোজকার কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে।

তখন আসবে কৃষাণ, কয়াল, প্রজা-পাঠক। তখন চৌধুরীদের বার-বাড়ি একেবারে গম্‌-গম্‌ করে উঠবে। বিধু কয়ালের ছেলে শশী কয়াল সেই নিয়মমত সরষে ঝাড়তে বসবে। মাঠ থেকে সরষে গাছগুলো এনে গোবর-দেওয়া উঠোনের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে। গোছা-গোছা শুকনো সরষে গাছের আঁটি। সেগুলোকে ঝাড়তে হবে মাড়তে হবে। তারপর দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে মেপে মেপে মরাইতে তুলবে। রজব আলিও আসবে দামড়া দুটোর তদারক করতে। তাদের খাওয়ানো তাদের সেবা-শুশ্রূষার ভারও তার ওপর। তারপর যেদিন চৌধুরী মশাই সদরে যাবেন সেদিন ভোর থেকেই গরুর গাড়ির চাকায় রেড়ির তেল মাখাবে। গাড়ির ছইটা ঝাড়বে মুছবে। পাতবার শতরঞ্জিটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে কেচে রোদে শুকোতে দেবে। শুধু শশী কয়াল, রজব আলিই নয়, হাজারটা লোকের হাজার রকম কাজের বরাদ্দ। সবাই কাজ করছে কিনা তার তদারক করার কাজ চৌধুরী মশাই-এর। এই এতগুলো লোক ঠিকমত কাজ করলেই তবে চৌধুরী-বংশের সংসার যন্ত্রের চাকা নিয়ম করে ঘুরবে।

গৌরী তখন রান্না-বাড়ির দিক থেকে আসছিল। তারও সকাল বেলা থেকে ফুরসৎ নেই। চৌধুরী মশাইকে ভেতর বাড়িতে আসতে দেখে একটু পাশ দিচ্ছিল। চৌধুরী মশাই তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, তোর বৌদি কোথায়?

প্রীতিও সেই সময়ে ছেলের ঘর থেকে দুধের বাটি হাতে নিয়ে এই দিকে আসছিল। বললে—কী হলো, তুমি ঘুম থেকে উঠেছ?

চৌধুরী মশাই কাছে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বউমার কী খবর?

প্রীতি বললে—এই তো বউমার কাছ থেকে আসছি। একটু গরম দুধ খাইয়ে এলুম—

—আর খোকা? খোকা কোথায়?

প্রীতি বললে—সারা রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে এখন তোমার খোকার কথা মনে পড়লো?

চৌধুরী মশাই বললেন—কী জানি কেন, কালকে খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। কেন যে এত ঘুমিয়ে পড়লুম হঠাৎ কে জানে!

প্রীতি বললে—কবে তুমি ঘুমোও না বলো তো? তুমি তো চিরকাল বিছানায় শুলেই নাক ডাকাও। তোমার মতন অমন ঘুম হলে আমি বেঁচে যেতুম। সরো, আমার কাজ আছে—

চৌধুরী মশাই বললেন—কাজ তো আমারও আছে, কিন্তু কালকে কী হলো তা তো আমাকে বললে না! খোকাকে তো শেকল দিয়ে গিয়েছিলে বাইরে থেকে, শেষকালে প্রকাশ শেকল খুলে দিয়েছিল নাকি?

প্রীতি বললে—এখন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে অত কথা বলবার সময় নেই। বলছি যে আমার কাজ আছে—

চৌধুরী মশাই বললেন—কাজ কি আমারই নেই? আমাকে আবার একবার রানাঘাটে যেতে হবে। উকিলবাবুর জরুরী চিঠি আছে। তা বলে আমার কথার জবাব দিতে আর কতক্ষণ সময় লাগে! জবাব দেবে না তাই-ই বলো!

প্রীতি বললে—তা তোমার কথার জবাব দিতে গেলে আমার সংসার চলবে? আর জবাব দিয়েই বা কী করবো? তোমাকে দিয়ে তো আমার কাজের কোনও সুরাহা হবে না—

—তার মানে? এ যেমন তোমার সংসার তেমনি তো আমারও সংসার। এ সংসারের ভালোমন্দ কি আমিও ভাবি না?

প্রীতি বললে—অত চেঁচিও না, একে তো লজ্জায় বউমার কাছে আমার মাথা হেঁট্ হয়ে

গেছে, তার ওপরে তুমি আমার মাথাটা আরো হেঁট্ করে দিও না—। আমি বলে সারারাত ঘুমোই নি, এমনিতেই আমার বুক ধড়ফড় করছে, তার ওপরে তোমার বাক্যবাণ আমি আর সইতে পারছি না—

চৌধুরী মশাই বললেন—তোমার শরীরের কথা ভেবেই তো আমি জিজ্ঞেস করছি কাল রাত্তিরে কী হলো, তা তুমি অত মেজাজ গরম করবে তা জানলে আর ভেতর-বাড়িতে আসতুম না—

প্রীতি বললে—আমার শরীরের জন্যে যেন ভেবে ভেবে তোমার ঘুম হচ্ছে না—

—বেশ, আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি নাচার, কিন্তু এখনই তো বাবাজীর কাছে যাবো, যখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন তখন তো বলতে হবে কিছু—

প্রীতি বলে—তাঁর মন্তরে কোনও কাজ হয় নি—আর কাজ হবেও না—

—কেন? কাজ হয় নি কেন?

প্রীতি বললে—তা কাজ হলে আমার এই হেনস্তা? এই সক্কালবেলা বউমাকে গিয়ে গরম দুধ খাইয়ে আসি? কোথায় বউ আমার সেবা করবে, না আমি বউ-এর সেবা করে করে মরছি। আমারও যেমন কপাল—

চৌধুরী মশাই বললেন—তা প্রকাশ কি ঘরের শেকল খুলে দিয়েছিল রাত্তিরে বেলা? খোকা পালিয়ে গেল কী করে?

প্রীতি বললে—শেকল খুলে দেবে কেন? ঘরের মধ্যেই দুজনে মুখ ফিরিয়ে বসে রাত কাটিয়েছে।

—সমস্ত রাত?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, সমস্ত রাত। তাই জানতে পেরেই তো আমার এত হেনস্তা। এমন ছেলে আমি বাপের জন্মে কখনও দেখি নি! বউমা তো তাই বলছিল তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে—

—কেন?

প্রীতি বললে—তা বউমা'র দোষ কী? তোমার ছেলে অমন করে তাকে অপমান করবে, তার দিকে ফিরে তাকাবে না, তাকে দেখলেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, একঘরে থাকলেও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে, তাতে তার কষ্ট হয় না? এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকলে কোনও মেয়েমানুষ তা সহ্য করতে পারে? আমার তো ভয় হচ্ছে বউমা শেষকালে কোনও কাণ্ড না বাধিয়ে বসে!

—কী কাণ্ড বাধাবে?

—আরে মেয়েদের মনের হিসেব তোমরা পুরুষমানুষরা কী করে বুঝবে? আমি ভাবছি শেষকালে আত্মঘাতী না হয়! শেষকালে গলায় দড়িটরি দিয়ে একটা কেলেঙ্কারি না করে বসে!

এতক্ষণে যেন চৌধুরী মশাই-এর হুঁশ হলো।

বললেন—কেন? খুব কাঁদছে নাকি বউমা? কিছু বলছে?

—তা বলবে না? এই সবে দু'দিন আগে একটা শোক পেয়েছে, তারপর তোমার ছেলের এই কাণ্ড, এর পর যদি কিছু বলেই তো আমি তার মুখ বন্ধ করতে পারবো?

—তা বলো না, বউমা কী বলছিল, বলো না?

—বলবে আবার কী! দুঃখের জ্বালায় বলছিল যে আমরা তাকে দেখে শুনে পছন্দ করে নিয়ে এসেছি, সে তো নিজে থেকে আসে নি, তাহলে কেন তার ওপর আমরা এত প্রতিশোধ নিচ্ছি—সে কী দোষ করেছে!

—তা তুমি কী বললে তার জবাবে?

প্রীতি বললে—এ কথায় আমার কী জবাব থাকতে পারে বলো দিকিনি। আমিও তো মেয়েমানুষ। আমি নিজে মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের দুঃখ যদি না বুঝি তো কি তুমি বুঝবে, না তোমার ছেলে বুঝবে?

—তারপর?

প্রীতি বললে—তারপর আর কী, তারপর কেবল কাঁদতে লাগলো হাউ-হাউ করে। তা আমি আর কী করবো, আমারও খুব কষ্ট হলো দেখে। আমিও খানিক কাঁদলুম। বেচারী সারারাত ঠায় একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কেঁদেছে আর জেগে কাটিয়েছে। তাই এখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দিয়ে এলুম—

—আর খোকা? খোকা কোথায় গেল? সে—

হঠাৎ কানে এল বার-বাড়ি থেকে যেন একটা কী আওয়াজ এল। যেন গোলমালের আওয়াজ। কান খাড়া করলেন চৌধুরী মশাই। বললেন—ও কীসের গোলমাল?

অনেকক্ষণ শব্দটা শুনলেন তবু কিছু বুঝতে পারলেন না। প্রীতির তখন অত সব বাজে-কথা শোনবার সময় নেই। এত বড় সংসারের সব লোকের সমস্ত দাবি তার মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে আছে। সারারাত তার ঘুম হোক আর নাই হোক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। সকলেরই এক কথা ঃ আমার দাবি মেটাতে হবে। কোথা থেকে টাকা আসছে, কে উপার্জন করছে, তা যাচাই করবার দায়িত্ব আমার নেই। আমি শুধু ঠিক সময়ে মাইনে পেলেই হলো আর খেতে পেলেই হলো। আমরা শুধু নেব, তোমার দেবার শক্তি-সামর্থ আছে কিনা সে তোমার বিবেচ্য। অথচ পান থেকে চুন খসলেই আমি তোমাকে দায়ী করবো। নইলে তুমি এ-বাড়ির গিন্নী হয়েছিলে কেন?

চৌধুরী মশাই আর দাঁড়ালেন না সেখানে। তাড়াতাড়ি ভেতর-বাড়ি পেরিয়ে সোজা গিয়ে বারবাড়িতে পড়লেন। ততক্ষণ আওয়াজটা স্পষ্ট কানে আসছে—

তারপর মনে হলো এ যেন খোকার গলার আওয়াজ—

বার-বাড়ির মুখেই একটা বড় ঘরে বাবাজীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ঘরের ভেতরে বসেই বাবাজীর পূজো-আচ্চা-সেবা যা-কিছু সব হতো। আওয়াজটা সেই ঘরের দিক থেকেই আসছে। সেখানে যাবার পথেই দেখলেন, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠোন থেকে নানা দিক থেকে কৌতূহলী লোকজন বাবাজীর ঘরের দিকে আসছে।

—এই শশী, কী হচ্ছে রে ওখানে?

শশী দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—কী জানি ছোটবাবু, আমি তো তাই জানতেই যাচ্ছি—

দীনু ভেতর দিক থেকে দৌড়ে বাইরে আসছিল।

তাকেও জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী মশাই—কী হচ্চে রে ওখানে? কীসের গোলমাল?

—আজ্ঞে আপনাকে ডাকতেই যাচ্ছিলুম, খোকাবাবু বাবাজীকে মারছে—

—খোকাবাবু!

যেন বজ্রপাত হলো চৌধুরী মশাই-এর মাথায়। বললেন—কেন? মারছে কেন?

দীনু বললে—আজ্ঞে আমি তো তা জানি নে, শব্দ শুনে দৌড়ে এসে কাণ্ড দেখলুম। দেখেই আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলুম—

সমস্ত জিনিসটা এতক্ষণে যেন চৌধুরী মশাই আন্দাজ করতে পারলেন। তারপর বাবাজীর ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেতে গিয়েও থেমে গেলেন। পেছন ফিরে বললেন—হ্যাঁ রে, কর্তাবাবু কী করছে?

—আজ্ঞে তিনি তো ভোরবেলাই ঘুম থেকে উঠেছেন। এখন পূজোয় বসেছেন।

—এই গোলমাল কানে গেছে নাকি?

—তা জানি নে। আমি এখন গেলে জানতে পারবো। এখনও গোমস্তা মশাই আসেন নি—

চৌধুরী মশাই বললেন—তা হলে তুই কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে সামলে রাখ। যদি জিজ্ঞেস করেন নিচেয় কীসের গোলমাল তাহলে যেন কিছুছু বলিস নে! বলবি বেহারি পালের বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে—

বলে আর দাঁড়ালেন না। দৌড়তে দৌড়তে এক লাফে গিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন। চৌধুরী মশাইকে দেখে রাস্তা করে দিলে সবাই। ঘরের ভেতরে তখন তুমুল কাণ্ড। চৌধুরী মশাই ঘরে ঢুকে দেখেন সদানন্দ এক হাতে বাবাজীর মোটা মোটা জটাগুলো পাকিয়ে ধরেছে, আর এক হাতে বাবাজীর সিঁদুর-মাখা ত্রিশূলটা ধরে তাঁর দিকে তাগ করে আছে।

বলছে—আর করবি তুই? আর এমন করবি কখনো?

বাবাজীও নাচার হয়ে বলেছেন—আমাকে ছাড়ুন বাবা, আমাকে ছাড়ুন।

সদানন্দর শক্ত মুঠির তেজ, অত বড় দশাসই বাবাজী যেন একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন।

চৌধুরী মশাই আর থাকতে পারলেন না। ঘরে ঢুকেই বাবাজীর ত্রিশূলটা সদানন্দর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন। কিন্তু সদানন্দর গায়েও যেন অসুরের শক্তি। সেও আটকে ধরেছে সেটা।

চৌধুরী মশাই বললেন—কী হচ্ছে কী খোকা? ছাড়ো, এটা ছাড়ো—

—আমি ছাড়বো না। আপনি কেন বাধা দিচ্ছেন? ছেড়ে দিন—

চৌধুরী মশাইও ছাড়বেন না, সদানন্দও ধরে থাকবে।

—ছাড়ো, ছাড়ো—

সদানন্দ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো—না ছাড়বো না—আমি বুজরুকটাকে খুন করে ফেলবো—

এতক্ষণে চৌধুরী মশাই-এর নজরে পড়লো একপাশে প্রকাশ মামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। চৌধুরী মশাই তার দিকে চেয়ে তাকে ধমকে উঠলেন। বললেন—তুমি এখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছো, খোকার হাত থেকে ত্রিশূলটা কেড়ে নিতে পারছো না?

প্রকাশ বললে—আজ্ঞে জামাইবাবু, আমি তো তখন থেকে সদাকে তাই বলছি। বাবাজী কী দোষ করলেন? বাবাজীর তো কিছুই দোষ নেই। তা ও কিছুতেই আমার কথা শুনছে না, আমি কী করবো?

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। তোমার জন্যেই তো যত গণ্ডগোল হয়েছে—

প্রকাশ মামা যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আমি? আমিই যত নষ্টের গোড়া? সদা দোষ করলো, আর দোষ পড়লো আমার মাথায়?

—তা দেখছ ত্রিশূলটা দিয়ে খোকা মানুষ খুন করতে যাচ্ছে আর তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছো? এতখানি বয়েস হলো, আর তোমার এতটুকু আক্কেল হলো না?

তারপর সদানন্দর দিকে চেয়ে বললেন—এখনও ছাড়ছো না, ছাড়ো বলছি—

—আমি ছাড়বো না।

বলে পাথরের মত কঠোর হয়ে সদানন্দ বাবাজীর মাথার জটগুলো আরো জোরে ধরে রইল।

বাবাজী তখন মাথার যন্ত্রনায় ছট্‌ফট করছেন। বলছেন—ছেড়ে দিন বাবা, ছেড়ে দিন, আমি তো আপনার ভালো করবার চেষ্টাই করেছি। আমি আপনার মঙ্গলই চাই—

সদানন্দ চিৎকার করে বলে উঠলো—দরকার নেই তোর মঙ্গল করে, তুই আগে এ-বাড়ি থেকে বিদেয় হ—

এর জবাব দিলেন চৌধুরী মশাই। বললেন—কেন, বিদেয় হবেন কেন? বাবাজীকে বিদেয় করবার তুমি কে শুনি? বাবাজীকে আমি এ-বাড়িতে ডেকে এনে তুলেছি, উনি তো নিজের থেকে আসেন নি, এ-বাড়ির মালিক আমি, ওকে বিদেয় করতে হয় তো আমি বিদেয় করবো, তুমি কে?

সদানন্দ বললে—কিন্তু ও কেন আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসে?

—কেন? উনি কী করেছেন তোমার? উনি তো আমাদের সকলের মঙ্গল-কামনাই করেন।

—না, আমি কী করি-না-করি তা দেখবার দরকার কী ওর? আমি রাত্তিরে বাড়িতে শুয়েছিলুম কিনা তা জানবার কীসের দরকার পড়েছে?

—তা গুরুজনরা জিজ্ঞেস করেন না? জিজ্ঞেস করেছেন তো ভালো কাজই করেছেন।

সদানন্দ বললে—ও কি আমার গুরুজন বলতে চান আপনি? একটা বুজরুক ঠগ-জোচ্চোর হবে আমার গুরুজন, আর ও যা বলবে আমি তাই মানবো?

—কেন মানবে না? তোমাকে মানতেই হবে ওঁর কথা। উনি যখন আমার গুরুজন, তুমিও যখন আমার ছেলে তখন উনি তোমারও গুরুজন। ছাড়ো, ওঁর জটা ছেড়ে দাও, ত্রিশূল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করো—

সদানন্দ যেন চৌধুরী মশাই-এর কথার প্রতিবাদেই বাবাজীর জটা ধরে আরো জোরে টান দিলে। বললে—আমি ওকে আজ বাড়ি থেকে বিদেয় করবো তবে ছাড়বো—

—কী, এত বড় আস্পর্ধা তোমার? তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ কথা বলবো, আলবৎ বলবো—

—খবরদার!

চৌধুরী মশাই রাগে গর-গর করতে লাগলেন। তাঁর গলার আওয়াজে সমস্ত ঘরখানা যেন থর-থর করে কেঁপে উঠলো।

প্রকাশ আর থাকতে পারলে না। এতক্ষণ জামাইবাবুর সামনে সে বেশি কথা বলে নি। এবার যখন দেখলে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে তখন সদানন্দর দিকে এগিয়ে গেল। বললে—এই সদা, করছিস কী? তোর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু নেই? কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তাও জানিস না?

—তুমি থামো প্রকাশ মামা!

—পাগল না কী তুই?

চৌধুরী মশাই সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রকাশকে বললেন—তুমি সরো, আমি দেখছি—

বলে প্রকাশকে জোরে পাশে ঠেলে দিলেন। প্রকাশ ঘরের মেঝের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়লো। কে একজন তাকে ধরে তুলতে এল। প্রকাশ রেগে গেল। বললে—যা, সরে যা, কে তুই? আমাকে তুলতে হবে না, আমি নিজেই উঠবো, যা—

কিন্তু উঠতে গিয়েই আবার পড়ে গেল। মাথায় খুবই লেগেছিল বোধ হয়। মাথা দিয়ে তখন তার রক্ত পড়ছে।

কিন্তু সেদিকে তখন চৌধুরী মশাইএর খেয়াল নেই। তিনি তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সদানন্দর ওপর। সদানন্দর হাত থেকে বাবাজীকে ছাড়িয়ে নিয়ে ত্রিশূলটাও কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর সদানন্দকে দুই হাতে ধরে ফেলেছেন।

বললেন—চলো, চলো, ভেতরে চলো—

সদানন্দ তখন চেঁচিয়ে উঠেছে—আমি যাবো না, আমি কিছুতেই যাবো না—

চৌধুরী মশাই জোরে চিৎকার করে ডাকলেন—দীনু, দীনু—

দীনু কাছে দাঁড়িয়েই ভয়ে ভয়ে সব দেখছিল এতক্ষণ। ছোটবাবুর ডাক শুনেই দৌড়ে এল।

চৌধুরী মশাই বললেন—খোকাবাবুকে ধর তো—

খোকাবাবুকে ধরতে যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। ধরতে গিয়েও যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল।

চৌধুরী মশাই ধমক দিলেন। বললেন—হাঁ করে দেখছিস কী? ধর একে—ধরে টেনে নিয়ে আয়, আমি আজ একে আটকে রেখে দেব ঘরের ভেতরে। আমি জব্দ করবো একে, বড় বাড় বেড়েছে এ—

বলে আর কারো ভরসা না করে নিজেই সদানন্দকে টানতে টানতে ভেতর-বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। আশেপাশে যারা কাণ্ড দেখতে এসেছিল তারা তখন আড়ালে লুকিয়েছে। আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে সব দেখছিল।

চৌধুরী মশাই তাদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—বেরো সব এখান থেকে বেরো, বেরিয়ে যা—

সবাই হুড়মুড় করে যে-যেদিকে পারলে পালিয়ে বাঁচলো। সদানন্দ তখন ছটফট করছে ছাড়া পাবার জন্যে। বলছে—আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দিন—

কিন্তু চৌধুরী মশাই-এর গায়ে যেন তখন অসুরের শক্তি নেমে এসেছে। তিনি সদানন্দকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একেবারে ভেতর বাড়িতে একটা ঘরে পুরে দিলেন। তারপর ডাকলেন—গৌরী—গৌরী—

গৌরী আসবার আগে প্রীতি দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। বললে—কী করছো, খোকাকে ধরেছ কেন? খোকা কী করেছে?

—সে তোমাকে পরে বলবো, গৌরী কোথায়?

গৌরী পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে বললেন—একটা তালা-চাবি নিয়ে আয় তো—

গৌরী তালা-চাবি এনে দিতেই সদানন্দকে ঘরে পুরে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিলেন চৌধুরী মশাই। বললেন—থাকুক এখানে পড়ে, যেমন ব্যবহার তেমনি জব্দ হোক—

প্রীতি তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে—তুমি করছো কী? বাড়িতে নতুন বউ রয়েছে, তুমি এ কী করছো?

চৌধুরী মশাই সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন—সে তুমি বুঝবে না, ওদিকে উকিলবাবুর চিঠি এসেছে, আমার মামলার তারিখ পড়েছে, আর এদিকে ছেলের এই বেয়াড়াপানা, আমি কত সহ্য করবো? আমিও তো মানুষ, আমারও তো একটা সহ্যের ক্ষমতা আছে...

প্রীতি কী যেন বলতে যচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। কৈলাস গেমস্তা দৌড়তে দৌড়তে এলো।

—ছোটবাবু!

—কী?

চৌধুরী মশাই অবাক হয়ে গেছেন। এ-সময়ে আবার কৈলাস এলো কেন? কৈলাস বললে—কর্তাবাবু কেমন করছেন! আপনাকে একবার ডাকছেন।

—কর্তাবাবু? কর্তাবাবু কি এই খবর পেয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—কে এ খবর দিলে কর্তাবাবুকে? আমি যে দীনুকে বলে দিলুম যেন কর্তাবাবুর কানে খবরটা না পৌঁছোয়, তবু কে তাঁর কানে দিলে?

—বেহারি পাল মশাই।

চৌধুরী মশাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বেহারি পালের আর সময় নেই, ঠিক এই সময়েই কিনা আসতে হয়!

চৌধুরী মশাই তখন চাবিটা নিজের ট্যাঁকে গুঁজে ফেলেছেন। বললেন—চলো কৈলাস, চলো—

সদানন্দের মনে আছে বাড়িতে তখন সে কী বিশৃঙ্খলা! যে-বাড়িতে এতদিন সব কাজ নিয়ম করে চলেছে, যে-বাড়িতে সকাল থেকে সবাই নিয়ম মেনে চলেছে, সেই বাড়িতেই যেন হঠাৎ এক অরাজক অবস্থা নেমে এল। একদিকে কর্তাবাবুর অসুখ, অন্যদিকে মামলা আর বাড়ির ভেতরে তখন বেনিয়ম। অথচ সমস্ত কিছুর পেছনে সদানন্দ। তার সামান্য একটু অসহযোগিতার জন্যে এতদিনের সব অইনকানুন যেন একেবারে ভেঙে-চুরে তছনছ হয়ে গেল।

এমনই হয়। সত্যিই এমনি হয়। কারণ সবাই তো সংসারের নিয়মের সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। সংসারের সঙ্গে আপস করে চলেই সবাই সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু এমন লোকও সংসারে জন্মায় যারা সংসারের নিয়মের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে না চলে সংসারকেই নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। লোকে এদেরই বলে বেহিসেবী। অথচ এই বেহিসেবী লোকগুলোর জন্যেই আমাদের এই পৃথিবীটা এগিয়ে চলে। তাদের অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েই পরবর্তী যুগের মানুষ অনেক অনাচার আর অনেক অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।

সদানন্দও বোধ হয় এমনি এক বেহিসেবী মানুষ!

নইলে বেশ তো ছিল সে। তার পূর্বপুরুষের পাপের কৈফিয়ৎ তো কেউ তার কাছে চাইতে যায় নি। কেউ তো বলে নি—তুমি প্রায়শ্চিত্ত করো। কেউ তো তাকে বলে নি, তুমি তোমার পূর্বপুরুষের সব কলঙ্ক নিজের আত্মাহুতির প্রলেপে মুছে ফেল। কেউ তো বলে নি তোমার জন্মদাতার সব অপরাধের উত্তরাধিকারী তুমি। আর তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত করবার একমাত্র হকদার।

বেহারি পাল প্রথমে বুঝতে পারে নি। কিন্তু খবরটা কানে পৌঁছুল তার গিন্নির মারফত। পাশাপাশি বড়ি। এ-বাড়ির চিলে-কোঠায় বেড়াল এসে বসলে ও-বাড়ির বেড়াল রাগে গোঁ-গোঁ করে। সেই বেহারি পালের কানে গেল খবরটা।

গিন্নী বললে—ছি ছি ছি, আমার বাপের জন্মেও এমন কাণ্ড কখনও শুনি নি মা—

বেহারী পালের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—তা খবরটা তুমি কার কাছে শুনলে?

—ওই বিষ্টুর মা। বিষ্টুর মা'র সঙ্গে যে আমার ঘাটে দেখা হল। মাগী বদমাইশ হলে কী হবে, মানুষটার মনটা ভালো।

—কী রকম?

গিন্নী বললে—ওই মাগীই তো বললে ওদের নতুন-বউএর সঙ্গে নাকি চৌধুরী মশাই-এর ছেলে একঘরে এক বিছানায় শোয় না। আমার তো শুনে বিশ্বাস হলো না। বিষ্টুর মা বললে—বউটা নাকি নষ্টা—

—সে কী?

এ-খবর ক'দিন থেকেই বেহারি পালের কানে যাচ্ছিল। বেহারি পাল মশাই নিজের কাজকর্ম করে, আর চৌধুরী-বাড়ি থেকে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজও শোনে। কিন্তু কারণটা এতদিনেও বুঝতে পারতো না। এবার যেন সেটা একটু স্পষ্ট হলো। বুঝতে পারলে চৌধুরী মশাইএর বংশের মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরেছে। এইবার জব্দ হবে বুড়ো। এইবার মচকাবে কর্তাবাবু।

গিন্নীকে বেহারি পাল একান্তে ডেকে বলে দিলে—তুমি যেন এখন এ-সব কথা কাউকে বলে ফেলো না আবার। বুঝলে?

—কেন? বললে দোষ কী?

বেহারী পাল সাবধানী লোক। বললে—এখন বললে জিনিসটা আর বাড়বে না, এখন একটু বাড়তে দাও, বেড়ে বেড়ে ওর ডাল-পালা গজাক, তখন বলো—

অবশ্য বেহারি পাল বুঝতো মেয়েমানুষদের ও-কথা বলাও যা আর না বলাও তাই। তবু যে কথাটা বলে রাখলো তারও একটা দাম আছে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। কখন কোন্ ফাঁকে মেয়েমানুষের মুখ ফসকে কথাটা বাইরে ফাঁস হয়ে যায় সেই ভাবনাতেই রাতটা কাটলো। বলতে গেলে রাত্তিরে ভালো করে ঘুমও হলো না বেহারি পালের। তাই ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে সামনের বাগানের সামনে পায়চারি করছিল। দেখলে কৈলাস গোমস্তা যাচ্ছে।

বললে—কী গো কৈলাস, খবর কী? কী রকম সরষে উঠলো তোমাদের?

কৈলাস বললে—এবার তো নাবি সরষে, তাই ভালো হলো না। শ'পাঁচেক বস্তা হয়েছে কোনও রকমে।

—তা কর্তাবাবু কেমন আছেন?

—কর্তাবাবু আর কেমন থাকবেন, সেই একই রকম।

বেহারি পাল পায়ে-পায়ে কৈলাস গোমস্তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। বললো—চলো, অনেক দিন তোমাদের কর্তাবাবুকে দেখি নি, আজ দেখে আসি গে চলো—

এইভাবেই কর্তাবাবুর কাছে বেহারি পালের আসা। পাশাপাশি বাড়ি, অথচ দেখাশোনা হয় না। প্রথমে কিছু শিষ্টাচারসম্মত কথা হলো। তারপরেই হঠাৎ কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন—তোমার বাড়িতে অত শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজে কেন হে বেহারি? তুমি কি দীক্ষা নিয়েছো নাকি?

—দীক্ষা?

—হ্যাঁ, দীক্ষা না নিলে অত পূজা আচ্চার ঘটা কেন তোমার বাড়িতে?

বেহারি পাল তো অবাক! বললে—আমার বাড়িতে শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা? ও তো আমার বাড়িতে নয় কর্তাবাবু, ও তো আপনার বাড়িতে বাজে। আপনার বাড়িতেই তো এক সাধু-বাবাজী এসেছেন, তিনিই যাগযজ্ঞ করেন দিনরাত, বাড়ি থেকে দিগ্বন্ধন করে ভূত-প্রেত তাড়িয়ে দেন। আপনি এ-সব কিছু জানেন না?

কর্তাবাবু কথাটা শুনে রেগে আগুন। বললেন—তার মানে? শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজলো তোমার বাড়িতে আর তুমি বলছো আমার বাড়িতে পূজো হচ্ছে? তুমি কি আজকাল জেগে ঘুমোচ্ছ নাকি হে বেহারি? সুদে টাকা খাটিয়ে কিছু টাকা হয়েছে বলে একেবারে মুখে যা আসে তাই-ই বলতে আরম্ভ করেছ?

তারপর কৈলাসের দিকে চাইলেন। বললেন—শুনলে কৈলাস, বেহারির কথাটা শুনলে?

কৈলাসের তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। কর্তাবাবুর কথার না করতে পারে প্রতিবাদ আর না করতে পারে সমর্থন।

বেহারি পাল ভেতরের কথা অত-শত জানে না। সে বললে—আজ্ঞে, সুদে আমি টাকা খাটাই বটে, কিন্তু সে কি আজ নতুন কর্তাবাবু? তার জন্যে আমি খামোকা মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন আপনার কাছে? আর শাঁক-কাঁসর-ঘণ্টা বাজাটা কি অন্যায় কর্তাবাবু?

কর্তাবাবু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তার চেয়ে বলো না ওটা তোমার ভড়ং—ভড়ং বলতে তোমার অত লজ্জা কীসের?

—কী আশ্চর্য, আমি এলুম আপনার কাছে আপনি কেমন আছেন তাই জানতে, আর আপনি আমাকে গাল মন্দ করছেন?

—আমি তোমাকে গালমন্দ করলুম? বা রে মজা! তোমার বাড়িতে শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজার কথা বললেও গালমন্দ করা হলো? তুমি তো আজকাল ভারি বেআক্কেলে হয়ে গেছ হে বেহারি? দুটো টাকা হলেই মানুষকে এমন বেআক্কেলে হতে হয়, ছি ছি ছি—

শেষের ছি-টার ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে কর্তাবাবু কথাটা শেষ করলেন। ভাবলেন এই চিৎকারেই বেহারি পাল নরম হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু না, কর্তাবাবু বেহারি পালকে চেনেন নি। ভেবেছেন সেই আগেকার বেহারি পালই আছে। সেই সবে গোঁফ-গজানো নিরীহ গোবেচারী মানুষ। কিন্তু তারপরে এতকাল ইছামতীতে যে কত জল গড়িয়ে গেছে, চারপাশের দুনিয়াটা যে কত বদলে গেছে, ঘরের মধ্যে বসে সে খবর তিনি পান নি। ভেবেছেন সেই কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর আমল বুঝি এখনও চলছে। এখনও জমিদার যা বলবে সবাই বেদবাক্য বলেই তা মেনে নেবে। তিনি নিজে যখন নবাবগঞ্জের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি তখন যেন আর কোনও ধনী ব্যক্তি এ দিগরে থাকতে পারবে না, থাকতে পারা যেন বে-আইনী। নিজে পঙ্গু মানুষ, তাই ভেবে নিয়েছেন পৃথিবীটাও যেন তাঁরই মত পঙ্গু হয়ে শুয়ে পড়ে আছে।

কথাটা চরমে উঠলো তার পরেই। বেহারি পাল হঠাৎ বলে বসলো—আগে নিজের বাড়ির দিকে নজর দিয়ে দেখুন কর্তাবাবু, পরের ব্যাপার পরই ভালো করে নজর দিতে পারবে—

—কী বললে তুমি? কী বললে?

বেহারি পাল বললে—এখন তো সবে নাতির বিয়ে দিলেন। এখন নাতবউও বাড়িতে এসেছে। এখন সেই দিকেই নজর দিন, নইলে আপনারই ক্ষতি, আমার কলা—

বলে বেহারি পাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। কিন্তু উঠে পড়বার আগেই যা হবার তা হয়ে গেল। কর্তাবাবুর মুখ দিয়ে কি রকম একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগলো। যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, সে-কথাটা জিভের মধ্যেই আটকে গেল। রাগের মাথায় দুটো সচল হাত তুলে কী বলতে চাইলেন তা আর কেউ জানতে পারলে না। বেহারি পাল আর দাঁড়ালো না। সে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল হলো কৈলাস গোমস্তার। সে ভয় পেয়ে গেল। সে আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় একতলায় নেমে এসেছে।

নিচেয় তখন চৌধুরী মশাই সদানন্দকে ঘরের ভেতর পুরে দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে দিয়েছেন। আর বাড়ি যত লোক আশ-পাশ থেকে উঁকি মেরে কাণ্ডটা লক্ষ্য করছে।

সদানন্দের ঘরের দরজায় তালাবন্ধ হলে কী হবে, পাশেই একটা বিরাট জানালা। গরাদের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল সদানন্দ এতটুকু প্রতিবাদ করছে না, বাধাও দিচ্ছে না। তালা-চাবি বন্ধ হবার পর সে মাথা নিচু করে ঘরের ভেতরে রাখা খাটটার ওপরে গিয়ে বসে মাথা নিচু করে রইলো।

সমস্ত ব্যাপারটা প্রীতির চোখের সামনেই ঘটলো। বললে—ওগো দরজাটা খুলে দিয়ে যাও, দরজা বন্ধ করে চলে গেলে কেন?

গৌরীও এতক্ষণ নির্বাক হয়ে সব কিছু দেখছিল। সে-ই নিজের হাতে ছোটবাবুকে তালা-চাবি এনে দিয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে যে কী কাণ্ড ঘটে গেল তা যেন কেউ তখনি-তখনি কল্পনাও করতে পারলো না। কী যে অপরাধ সদানন্দের আর কত বড় অপরাধের যে এত বড় শাস্তি, তাও কেউ অনুমান করতে পারলে না।

প্রীতি বাইরের জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে খোকা, তুই কী করেছিলি রে? কর্তা এমন রেগে গেলেন কেন তোর ওপর? তুই কী করেছিলি?

প্রকাশ মামাও এতক্ষণ কোনও কথা বলে নি। পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এত যে বাক্যবাগীশ মানুষটা সেও যেন ঘটনার আকস্মিকতায় খানিকক্ষণের জন্যে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

প্রীতি তার দিকে চেয়েও জিজ্ঞেস করল—কী রে, কী হয়েছিল রে? তোর জামাইবাবু এত রেগে গেল কেন রে? কী করেছিল খোকা?

প্রকাশ বললে—বাবাজীর ত্রিশূল কেড়ে নিয়েছিল, আর বাবাজীর জটা টেনে ধরে গালাগালি দিচ্ছিল—

—গালাগালি দিচ্ছিল? খোকা গালাগালি দিচ্ছিল? এ হতেই পারে না। খোকা কখনও কাউকে গালাগালি দিতেই পারে না—

ভেতরে সদানন্দ তখনও মুখ নিচু করে খাটের ওপর চুপ করে বসে ছিল। প্রীতি তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে খোকা, তুই বাবাজীকে গালাগালি দিয়েছিলি? কী করেছিল বাবাজী?

সদানন্দ যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল। এ কথার কোনও জবাব দিলে না।

প্রীতি আবার জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, কথার জবাব দে—

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে একজন প্রশ্ন করছে আর ভেতরে যে শুনছে সে পাথর না গাছ তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

—কথার জবাব দিবি না? বলি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?

তবু সদানন্দর দিক থেকে কোনও উত্তর নেই।

প্রীতি যেন নিজের মনেই বললে—এ আমার কী মুশকিল হলো বল্ তো প্রকাশ। এ আমি কাকে কী বলি? তোর জামাইবাবু তো খোকাকে ঘরের ভেতরে রেখে দিয়ে চলে গেল। আবার ওদিকে কর্তাবাবুর কী হলো কে জানে। এখন আমি সংসার দেখবো, না এই ছেলেকে সামলাবো। ছোট ছেলে হলে না হয় তবু তাকে সামলাতে পারা যায়, কিন্তু বুড়ো ধাড়ি ছেলেকে নিয়ে আমি কী করি? বাবাজী সন্নিসী মানুষ, তিনি তো কোনও ক্ষতি করেন

নি, তাকে কেন খামোকা তুই মারতে গেলি মাঝখান থেকে! তিনি তোর কী করেছিলেন?

প্রকাশ বললে—দাঁড়াও, তুমি কিছু ভেবো না দিদি, তুমি এখান থেকে সরে যাও দিকি, তোমরা সবাই এখান থেকে সরে যাও, সবাই সরে যাও—

গৌরী; বিষ্টুর মা, ঝি, শশী, আরো সব ভেতর-বাড়ির ঝি-ঝিউড়ি যে-যে আশপাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল সবাই ধমক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গিয়েও পাছে কাছাকাছি থাকে সেই জন্যে প্রকাশ আবার বললে—সবাই ভাগো এখান থেকে, ভাগো—

প্রীতি নিজের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে আগেই রান্না বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল। তার তখন মাথা ঘুরছে একেবারে বনবন্ করে। একে কটা রাত ঠায় জাগা। তার ওপর এই উটকো ঝামেলা। কিন্তু খাবার সময় কেউ পেট খালি করে খাবে না। তখন পান থেকে চুন খসলে যত দোষ বাড়ির গিন্নীর। বিষ্টুর মা গৌরী তারাও প্রীতির সঙ্গে তখন চলে গেছে। প্রকাশ তবু চারিদিকে খুঁটিয়ে দেখে নিলে। না, কেউ কোথাও নেই। প্রকাশ জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

বললে—এই সদা, শোন! আয় ইদিকে—

কিন্তু কাকে কথা বলা! সদা প্রকাশ মামার কথা শুনলে তবে তো!

প্রকাশ মামা আবার ডাকলে—আমার কথা শুনবি না?

এতক্ষণে সদানন্দ মুখ তুললো। চেহারা দেখলে বোঝা যায় সে যেন রাগে ফুঁসছে।

—চা। আমার দিকে চেয়ে দেখ্!

সদানন্দ বলে উঠলো—কী বলবে বলো না—

প্রকাশ মামা বললে—আয়, একবার জানালার কাছে আয়, তোর কানে কানে একটা কথা বলবো—

সদানন্দ বললে—যা বলবে তুমি ওখান থেকেই বলো।

প্রকাশ মামা জানালার গরাদের কাছে মুখ নিয়ে গেল। গলাটা একটু নামালে। বললে—দ্যাখ্, একটা কথা শোন্, মন দিয়ে শোন্, বাড়িতে এখন পরের বাড়ির মেয়ে রয়েছে, এই সময় তুই কেন এমন কেলেঙ্কারি করছিস বল তো? জামাইবাবুর কথা একটু শুনলে তোর কী এমন ক্ষতিটা হয়? তোকে তো এমন কিছু শক্ত কাজ কেউ করতে বলছে না?

বলে প্রকাশ মামা চুপ করলো। তারপর সদানন্দর তরফ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে আবার বললে—কী রে, জবাব দিচ্ছিস নে যে?

সদানন্দ বলে উঠলো—তুমি এখান থেকে যাও প্রকাশ মামা, আমাকে বিরক্ত কোর না—

প্রকাশ মামা বললে—আমি তোকে বিরক্ত করছি? কী বলছিস তুই? আমি তোর ভালোর জন্যে বলছি, আর তুই কিনা বলছিস আমি তোকে বিরক্ত করছি?

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক গে, আমি জামাইবাবুকে এখ্খুনি ডেকে নিয়ে আসছি, তুই শুধু তার সামনে বলবি তুই আর অমন করবি না, যা করেছিস তার জন্যে মাপ চাইবি, চুকে যাবে ল্যাঠা। পারবি না? এইটুকুও বলতে পারবি না?

সদানন্দ তবু কিছু জবাব দিলে না। চুপ করে রইল।

—কী রে, আবার চুপ করে রইলি? জানিস ওপরে এখন কী হচ্ছে? তোর দাদুর হঠাৎ অসুখ বেড়েছে, যায়-যায় অবস্থা। বাড়িতে এই রকম বিপদ চলছে আর তোর কি না এই আক্কেল! তোর মা বাবা আমি—সবাই কোন্ দিকটা সামলাই বল্ দিকিনি। তুইও তো সারা

রাত জেগে কাটিয়েছিস। বউমারও তো সেই অবস্থা। ওদিকে বাবাজী মানুষটার সেবার ব্যবস্থা আছে। এই সময়ে কে কাকে দেখে বল তো? একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুই সেয়ানা ছেলে হয়ে এ কী করছিস আমি বুঝতে পারছি না—

এমন সময় দীনু ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে নেমে আসছিল। তাকে দেখেই প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কর্তাবাবুর কী রকম অবস্থা?

দীনু হাঁফাচ্ছিল। বললে—কর্তাবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছে—

—কেন? অজ্ঞান হয়ে গেছে কেন? মারা যাবে নাকি?

কিন্তু তার আগেই চৌধুরী মশাই নিজেই আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। এসেই প্রকাশকে সামনে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন—প্রকাশ, ও দীনুকে দিয়ে হবে না, তোমাকেই যেতে হবে—

প্রকাশ বললে—কোথায়?

—ননী ডাক্তারকে ডাকতে। বাবার অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। চোখ উল্টে গেছে।

—তা হঠাৎ এমন হলো কেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—সে-সব কথা পরে হবে। আগে তুমি যাও, ননী ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি ভালো বুঝছি না। বেহারি পাল মশাই-এর সঙ্গে কী নাকি কথা-কাটাকাটি হয়েছিল শুনলাম, এখন কী করি!

প্রীতিও চৌধুরী মশাই-এর গলার শব্দ পেয়ে দৌড়ে এলো। বললে—কী হলো! ওপরে কী দেখে এলে?

প্রকাশকে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেই কথাগুলোই চৌধুরী মশাই গিন্নীকে বললেন। কিন্তু প্রীতি সে কথায় কান দিলে না। বললে—তা তুমি যে খোকাকে ঘরে তালা-চাবি দিয়ে গেলে, ও খাবে না? ও মুখ-হাত-পা ধোবে না? রাগ হলে কি তোমার এই রকমই মাথা গরম হয়ে যায়?

চৌধুরী মশাই এ-কথায় আরো রেগে গেলেন। বললেন—মাথা গরম হবে না? তুমি আমার মাথারই দোষ দেখলে? আর তোমার ছেলে যে কত বেয়াড়া তা তো একবারও দেখতে পাও না?

প্রীতি বললে—তা বুঝলাম না-হয় যে আমার ছেলে বেয়াড়া, তা বলে তাকে ঘরে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দেবে? তালা-চাবি বন্ধ করলে ছেলে তোমার শোধরাবে? এ কি ছেলেমানুষ ছেলে যে মেরে-ধরে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে ভালো করে তুলবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা অত বড় বুড়ো ধাড়ি ছেলে, ওর এতটুকু জ্ঞানগম্যি থাকবে না তা বলে? ভেবেছে ওর যা খুশি তাই করবে? যে ছেলে নিজের বাপের মুখের ওপর কথা বলে তাকে এই রকম শাস্তিই দিতে হয়। দরকার নেই ওর খেয়ে। ও-ছেলে আমার থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী! তুমি ও-রকম ছেলেকে পেটে ধরেছিলে কেন?

—আঃ—

বলে প্রীতি বিরক্তিতে একেবারে ফেটে পড়লো। বললে—তোমার কী মুখের আড় থাকতে নেই? তুমি কী বলছো তাও তুমি জানো না। দাও, আমাকে চাবি দাও, আমি দরজা খুলে দেব—

চৌধুরী মশাই চাবিটা চেপে ধরলেন। বললেন—না, চাবি কখ্খনো দেব না—

প্রীতি বললে—পাগলের মতো কাণ্ড কোর না। দাও চাবি দাও—

—কিন্তু তোমার ছেলে তাহলে বাবাজীর কাছে এখনি ক্ষমা চাক। এখুনি বাবাজীর কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাক।

প্রীতি আর কথা না বলে চৌধুরি মশাই-এর কাছ থেকে এক টানে চাবি কেড়ে নিলে। তারপর দরজার তালাটা খুলতে যেতেই চৌধুরী মশাই গিন্নীর হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন—চাবি দাও, চাবি দাও আমাকে—তালা খুলতে পারবে না—

বলে চাবিটার জন্যে গিন্নির হাতটা ধরে টানতে লাগলেন।

প্রকাশ মামা এতক্ষণে চৌধুরী মশাই-এর হাতটা ধরতে গেল। বললে—জামাইবাবু, আপনি করছেন কী? আপনি ঠাণ্ডা হোন—

চৌধুরী মশাই প্রকাশের হাতটা ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন—খবরদার, তুমি আমার হাত ধরবার কে? যাও এখান থেকে চলে যাও। একবার তোমাকে ঠেলে দিয়েছি না! আমার গায়ে হাত দিলে এবার উঠোনের কুয়োর মধ্যে ফেলে দেবে—যাও—

প্রকাশ বললে—কিন্তু আপনি মাথা ঠাণ্ডা করে জিনিসটা ভেবে দেখুন জামাইবাবু, দিদি যা বলছে ঠিকই বলছে—

—আবার? আবার তুমি আমার সামনে আসছো?

কিন্তু প্রীতি তখন সেই ফাঁকে তালাটা খুলে ফেলেছে। খুলে ফেলে সদানন্দকে ডাকলে—আয় খোকা, আয়, আয়, বেরিয়ে আয়।

সদানন্দ কিন্তু বেরিয়ে আসবার কোনও চেষ্টাই করলে না। প্রীতি এবার নিজেই ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে সদানন্দর হাতটা ধরে টানতে লাগলো। বললে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বেরিয়ে আয়—

চৌধুরী মশাই তখনও প্রকাশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত। বললেন—তুমি আমাদের ব্যাপারে কেন মাথা ঘামাতে আসো শুনি? তোমার নিজের বাড়ি-ঘর-দোর নেই?

প্রকাশ বললে—আমি তো যেতে চাই-ই। আমার ছেলে-মেয়ে বউ সেখানে পড়ে রয়েছে, আমি তো যেতেই চাই সেখানে—

—তা যাচ্ছো না কেন—গেলেই তো পারো? আপদ চোকে—

—কিন্তু দিদি যে আমাকে যেতে দেয় না। সদানন্দর বিয়ের পরই তো আমি যেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু দিদিই তো আমাকে আটকে রাখলে।

চৌধুরী মশাই বললেন—দিদি কে? এ আমার বাড়ি, আমি এ বাড়ির মালিক। আমি বলছি তুমি এখান থেকে চলে যাও—তুমি কেন এখানে বসে বসে আমার অন্ন-ধ্বংস করছো—

প্রকাশের মতন হ্যাংলা মানুষেরও বোধ হয় মান-অপমান জ্ঞান আছে। নইলে জামাইবাবুর কথায় সেই বা অমন হঠাৎ চুপ হয়ে যাবে কেন? এতক্ষণ তার মুখের যা-চেহারা ছিল তা যেন হঠাৎ এই কথাগুলোয় চুপসে গেল। সে মুখ চুন করে একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এতগুলো বাড়ির লোকের সামনে এত বড় অপমান তার জীবনে আর কখনও ঘটে নি।

শুধু একবার বললে—তাহলে ননী ডাক্তারকে ডাকতে যাবো না?

এত কাণ্ডের মধ্যে চৌধুরী মশাই-এর বোধ হয় মাথার ঠিক ছিল না। প্রকাশের কথায় যেন মনে পড়ে গেল। বললেন—তা ডাক্তারের কাছে যেতে কি আমি তোমাকে বারণ করেছি? আগে ডাক্তারের কাছে যাও—

প্রকাশ বললে—তা আপনি যে এখখুনি আমায় বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি দেখছি বড় বে-আক্কেলে মানুষ। ডাক্তারকে ডেকে দিয়ে নিজের দেশে চলে যাওয়া যায় না? ডাক্তারকে ডেকে দিয়ে খেয়ে-দেয়ে দুপুরের গাড়িতে চলে যেও—

এতক্ষণে প্রীতির কানে কথাগুলো গেছে। সে এগিয়ে এল। বললে—কী হলো? কাকে যেতে বলছো? কে বাড়ি থেকে চলে যাবে?

প্রকাশ মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—জামাইবাবু আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছেন—

—কেন? প্রকাশ চলে যাবে কেন?

এতক্ষণ হঠাৎ চৌধুরী মশাই-এর নজরে পড়লো ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে চেয়ে দেখলেন খোকা নেই।

বললেন—খোকা কোথায় গেল?

প্রীতি বললে—তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি—

—ছেড়ে দিয়েছ মানে? কোথায় গেল সে?

—কোথায় গেল তা আমি কী জানি!

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি কেন দরজার চাবি খুলে দিতে গেলে? আমি নিজে তাকে তালাবন্ধ করে দিয়ে গেলুম তবু তুমি তাকে দরজা খুলে বার করে দিলে কেন?

প্রীতি বললে—বেশ করেছি—

চৌধুরী মশাই স্তম্ভিত হয়ে স্থানুর মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন—তুমি এই কথা বললে?

প্রীতি বললে—বলবো না? কেন তুমি এত বড় সেয়ানা ছেলেকে সকলের সামনে এমন অপমান করলে? তার এখন বয়েস হয়েছে, তার বিয়ে হয়েছে, ঘরে তার নতুন বউ রয়েছে, এই সময়ে তুমি এমন করে তার ইজ্জৎ নিলে, আর আমি তালা খুলে দেব না?

চৌধুরী মশাই বললেন—তার ইজ্জৎ? তার ইজ্জতের কথাটাই তুমি ভাবলে? আর আমি? আমি এ-বাড়ির মালিক, আমার ইজ্জতের কথাটা তো একবারও ভাবলে না? তোমার কাছে তোমার ছেলের ইজ্জৎটাই বড় হলো?

প্রকাশ কী করবে তখনও বুঝতে পারছে না। একবার জামাইবাবুর মুখের দিকে চাইছে আর একবার দিদির মুখের দিকে। চৌধুরী মশাই রাগে ফুলছেন। দিদির সঙ্গে জামাইবাবুর এমন ঝগড়া আগে কখনও প্রকাশ দেখে নি। দিদিও বলছে বেশ করেছে সদানন্দকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, জামাইবাবুও বলছে—কেন তালা খুলে দিলে! তাহলে কি জামাইবাবুর কথার কোনও দাম নেই?

জামাইবাবু মাঝখানে বলে উঠলো—তাহলে আমি যদি এ-বাড়ির কেউই না হই তো হয় আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, আর নয় তো তুমিই চলে যাও—

দিদি বললে—তুমি কেন যাবে? তুমি কী দোষ করেছ? যেতে হলে আমিই যাবো। আমাকে তুমি বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি যে-কটা দিন বাঁচি সেখানেই থাকবো—সারাদিন তুমি নিশ্চিন্তে তোমার জমি-জমা বউ-ছেলে নিয়ে আরাম করে কাটাবে—কেউ আর তখন তোমাকে কথা শোনাতে আসবে না—

চৌধুরী মশাই বললেন—ওটা তো তোমার রাগের কথা হলো। আমি কি তোমাকে রাগের কথা বলেছি কিছু যে ভাগলপুরে চলে যাবো বলছো?

প্রীতি বললে—তা কোন্ কথাটা বলতে আমাকে বাকি রেখেছ তুমি? মানুষ আবার কী রকম করে লোককে হেনস্তা করে? এই তো প্রকাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও-ও তো সব শুনেছে। ও-ই বলুক না, তুমি আমাকে অপমান করলে, না আমি তোমায় অপমান

করলুম? বলুক ও, বুকে হাত দিয়ে ও বলুক—

প্রকাশ বললে—দিদি তুমি চুপ করো না, কেন কথা বাড়াচ্ছো? তুমি নিজের কাজ করো গে যাও না—

চৌধুরী মশাই যেন এতক্ষণে আবার প্রকাশের উপস্থিতি টের পেলেন। বললেন—তুমি থামো তো হে। তোমাকে কে মাতব্বরি করতে বলেছে? আমি তোমাকে ননী ডাক্তারকে ডাকতে বললুম না—

এমন সময় হঠাৎ ভেতর থেকে মৃদু গলায় আওয়াজ এলো—মা—

এতক্ষণে যেন সবাই সম্বিৎ ফিরে পেলে। যেন এতক্ষণে হঠাৎ খেয়াল হলো যে এ-বাড়িতে এমন একজন লোক আছে যার সামনে এমন ব্যবহার করা অসঙ্গত। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও যেন সে-মানুষটার সামনে একটু সংযত হয়ে কথা বলা দরকার। এ-ছাড়াও যেন নতুন করে চৌধুরী মশাই-এর মনে পড়ে গেল যে ওপরে কর্তাবাবুর মরণাপন্ন অসুখ। তারপর আরো মনে পড়ে গেল যে একটু দূরেই বাবাজী রয়েছেন, তাঁর কানেও এই স্বামী-স্ত্রীর কথা-কাটাকাটির শব্দ পৌঁছোনো সম্ভব। সকলের সব কথাই মনে পড়ে গেল। পাশের বাড়ির শ্যেনচক্ষু বেহারি পালের কানেও যে শব্দটা পৌঁছতে পারে সে কথাটাও যেন এতক্ষণে সকলের খেয়াল হলো। খেয়াল হতেই এক মুহূর্তের জন্যে সবাই নিজের আসল স্বরূপটা ফিরে পেলে। লজ্জায় চৌধুরী মশাই যেন যেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। সামনেই দেখলেন প্রকাশ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়েই বার-বাড়ির দিকে চলতে চলতে বললেন—তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছো বড়কুটুম, ওদিকে যে কর্তাবাবু ছট্‌ফট করছেন—

জামাইবাবুর এ-রূপটা প্রকাশের দেখা আছে। যখন প্রকাশকে দিয়ে কোনও জরুরী কাজ করাতে হবে তখন জামাইবাবুর মুখে এই আদরের বড়কুটুম শব্দটা বেরিয়ে আসে।

প্রকাশও জামাইবাবুর কথায় গদগদ হয়ে গেল। বললে—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না জামাইবাবু, আমি এখখুনি যাচ্ছি, যাবো আর আসবো। প্রকাশ থাকতে আপনার কিচ্ছু ভাবনা করবার দরকার নেই—এই আমি চললুম—

বলে প্রকাশ বেরিয়ে চলে গেল।

প্রীতি পাশের বারান্দায় গিয়েই দেখলে, খোকার ঘর থেকে সামনের বারান্দায় বউমা এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটায় মাথাটা ঢাকা। কিন্তু ফাঁক দিয়ে মুখের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় বউমার চোখ-মুখ যেন শুকিয়ে গেছে। একটুখানি শুধু মা ডাক! কিন্তু ওই ডাকটুকুতেই যেন প্রীতি আবার অন্য মানুষ হয়ে গেল। এতক্ষণ যে-মানুষটার স্বামীর সঙ্গে নির্লজ্জের মত ঝগড়া করতে বাধে নি সেই মানুষটাই যেন একেবারে স্নেহ-মমতা-করুণায় এক মুহূর্তে জননীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বউমার কাছে গিয়ে বললে—কী, বউমা, আমাকে ডাকছিলে?

নয়নতারা তেমনি মুখটা নিচু করেই রইল। যেন তার মুখের কথাটা খানিকক্ষণের জন্যে মুখেই আটকে রইল। তারপর যেন অনেক কষ্টে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললে—মা, বলছিলাম কি, আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন না—

প্রীতি বললে—ছি মা, ও-কথা কি বলতে আছে? এতক্ষণ দেখলে না তোমার শ্বশুর তোমার কথা ভেবে ভেবে কী রকম মাথা গরম করে ফেলেছেন। তোমার কানে তো সব কথাই গেছে। ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না, তোমার শ্বশুরের ওই এক স্বভাব, রেগে গেলেন তো গেলেন, তখন একেবারে অগ্নিকাণ্ড, আবার ওই মানুষটাই অন্য সময় একেবারে জল। ওঁর কথায় তুমি কান দিও না বউমা, ওঁর কথায় যদি আমি কান দিতুম তো আমিই কোন্‌দিন

বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে যেতুম। এ-বাড়ির সব পুরুষমানুষই ওই রকম। ও-সব কথায় কান দিলে কি সংসার চলে বউমা! শ্বশুরকে আজ যেমন দেখলে, উনি আমার সঙ্গেও ঠিক তেমনি করেন। রাগলে এ-বাড়ির পুরুষমানুষদের কোনও দিকে আর জ্ঞান থাকে না—

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমাকে নিয়েই যখন এত অশান্তি, তখন আমি চলে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিছুদিনের মত চলে যাই না, তারপর যখন বাবার রাগ পড়বে না-হয় আবার ফিরে আসবো—

—না না বউমা, তা হয় না, তুমি পাগলামি কোর না, তুমি ঘরে গিয়ে একটু বোস, আমি রান্নাঘরের দিকটা একবার দেখে আসি, আমি যেদিকে দেখব না সেই দিকেই তো চিত্তির হয়ে যাবে—

বলে বাইরে এসে বিষ্টুর-মার খোঁজে রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দীনু মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। বললে—মা, বউমার বাপের বাড়ি থেকে লোক এসেছে তত্ত্ব নিয়ে—

—তত্ত্ব? কীসের তত্ত্ব?

—শীতের তত্ত্ব!

কথাটা শুনেই প্রীতির মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠলো। আর সময় পেলেন না বেয়াই মশাই তত্ত্ব পাঠাবার! ঠিক এই সময়েই কি না তত্ত্ব পাঠাতে হয়!

কালীকান্ত ভট্টাচার্যের সব দিকে নজর। সব জিনিস সহজ করে নিতে পারার মত মনের ধৈর্য ছিল বলেই হয়ত এত বড় শোকের মধ্যেও মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে শীতের তত্ত্ব পাঠাবার কথাটাও ভাববার সময় পেয়েছেন। ভেবেছিলেন তাঁর নিজের যাই হোক, মেয়ের শশুর-শাশুড়ীর কাছে অন্তত মেয়ের আদর হোক। নয়নতারার সুখ থাকলেই তাঁর সুখ।

নিখিলেশদেরও তাই বলতেন। বলতেন—আমার যা-কিছু আছে সবই তো নয়নতারার। বড়লোকের বাড়িতে সে পড়েছে, তাদের মর্যাদামত তত্ত্ব করতে হবে তো—

নিখিলেশই বলতে গেলে বাজার করে দিয়েছিল। কালীকান্ত ভট্টাচার্য তাকে বলে দিয়েছিলেন—যা কিছু কিনবে সব যেন বাজারের সেরা জিনিস হয়, বুঝলে? একেবারে সেরা সরপুরিয়া, একেবারে সেরা সন্দেশ, সেরা জামা কাপড়—

কালীকান্ত ভট্টাচার্যের নিজের ও-সব শখ-শৌখীনতার বালাই ছিল না কোনও কালে, তিনি একজোড়া চটি, একখানা ধুতি আর একটা উড়ুনি দিয়েই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। জামা আছে। কিন্তু সে-জামা পরবার প্রয়োজন তেমন অনিবার্য হয় না কখনও। সেইজন্যেই নিখিলেশকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন বাড়িতে। তাকে সব বললেন। বললেন—মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী যেন না ভাবে যে মেয়ের মা নেই বলে বেয়াই মশাই শীতের তত্ত্বটাও বাদ দিলে।

তারপর বললেন—তুমি তো কলকাতায় যাও, সেখান থেকে সেরা দোকান থেকে গরম কাপড় কিনে সেরা দর্জিকে দিয়ে পাঞ্জাবি করিয়ে নিয়ে আসবে—

নিখিলেশ তাই-ই করিয়েছিল। কোনও খুঁত রাখে নি সে। মাস্টার মশাই-এর কথাটা মনে ছিল তার—টাকা যত লাগে তুমি চেয়ে নিও আমার কাছ থেকে। টাকার জন্যে যেন জিনিস খারাপ কোর না। একেবারে সরেশ জিনিস চাই। নবাবগঞ্জের লোক যেন তত্ত্ব দেখে বলে—হ্যাঁ, তত্ত্বের মতন তত্ত্ব পাঠিয়েছে চৌধুরী মশাই-এর বেয়াই—

কিন্তু তিনিই কি জানতেন, তাঁর অত কষ্টের টাকায় পাঠানো তত্ত্বর এমন হেনস্তা হবে। বিপিন প্রামাণিক ছাড়া কালীকান্ত ভট্টাচার্যের তত্ত্ব নিয়ে আসবার আর কে আছে। বিপিনই যোগাড় করেছিল আরও চারজন লোক। একজনের মাথায় দই রাবড়ি, একজনের মাথায় সরপুরিয়া সরভাজার থালা, একজনের মাথায় কমলালেবু ফুলকপি কড়াইশুঁটি ইত্যাদির ঝুড়ি, একজনের হাতে বিশ সের ওজনের একটা রুই মাছ, আর একজনের মাথায় জামা কাপড় শাড়ি এই সব।

প্রকাশ মামা ননী ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসে কাণ্ড দেখে অবাক। বললে—কী হে, তত্ত্ব নিয়ে এসেছ? বাঃ বাঃ, বেয়াই মশাই তো কাজের লোক দেখছি, সব দিকে খেয়াল আছে। সরপুরিয়া সরভাজাও তো রয়েছে দেখছি—

আর থাকতে পারলে না। সোজা চলে গেল ভেতর-বাড়ির দিকে। দিদি—ও দিদি—

এমন সুখবরটা দিদিকে না দিতে পারলে যেন তার পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না। কিন্তু দিদি তখন সেখানে নেই। প্রীতি তখন বউমার কাছে গিয়ে খবরটা দিচ্ছিল। বলছিল—তোমার বাবা তত্ত্ব পাঠিয়েছেন বউমা, শীতের তত্ত্ব। তারা বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে—তার আগে তুমি ওই শাড়িটা বদলে একটা ভালো শাড়ি পরে নাও, আয়নাতে মুখ-টুখ দেখে পরিষ্কার হয়ে নাও—

কথাটা শুনে নয়নতারা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বাবা পাঠিয়েছে? তা হলে কি বিপিন এসেছে নাকি!

শাশুড়ী আবার বললেন—দেখো বউমা, তুমি যেন এসব কেলেঙ্কারির কথা ওদের বোল না, বুঝলে?

নয়নতারা আর কী বলবে! বাবা শীতের তত্ত্ব পাঠিয়েছে! সমস্ত রাত্রের যা-কিছু গ্লানি সব যেন এক মুহূর্তে মুছে গেল তার মন থেকে। সকাল থেকে বাড়িতে যা-যা কাণ্ড ঘটেছে, তাও যেন আর মনে রইল না। বাবা তত্ত্ব পাঠিয়েছে! নয়নতারা যেন এতক্ষণে একটা আশ্রয় খুঁজে পেলো। তাহলে তো সে একেবারে নিঃস্ব নয়, একেবারে নিঃসহায়, নিরাশ্রয় নয়। একটা জায়গা তো তার এখনও আছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে তার একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় আছে। মা চলে গেলেও তো একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায় নি সে।

তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে গিয়ে নয়নতারা শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখটা মুছে নিলে। রাত জাগার পর চোখের তলায় কেমন একটা কালো দাগ পড়েছিল। সেখানটায় একটু পাউডার ঘষে নিলে। তারপর ঘরের এক কোণে গিয়ে একটা নতুন শাড়ি পরে নিলে। বাপের বাড়ির লোকদের বুঝতে দিতে হবে যে সে এখানে সুখে-শান্তিতে আছে, তার কোনও কষ্ট নেই। শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে খুব আদরে-যত্নে রেখেছে।

বাইরে থেকে গলা শোনা গেল—দিদিমণি—

নয়নতারা তাড়াতাড়ি ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে ডাকলে—এসো, এসো—

পাঁচজন লোক একসঙ্গে গিয়ে ঘরে ঢুকলো। তাদের সকলের আগে বিপিন। বিপিন একেবারে হাসতে হাসতে নয়নতারার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো দিদিমণি—

—ভালো। তোমরা ভালো?

—হ্যাঁ দিদিমণি।

—বাবা? বাবা কেমন আছে?

—পণ্ডিতমশাই মুখে তো ভালো আছেন বলেন। কিন্তু তুমি আসার পর থেকে মনটা

কেমন উড়ু-উড়ু হয়ে গেছে। সে-মানুষ আর নেই। তারপর অত বড় একটা শোক-তাপ গেল। আমরা হলে তো ভেঙে পড়তুম দিদিমণি। নেহাৎ পণ্ডিতমশাই দিনরাত কাজ নিয়ে থাকেন বলে তবু শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে আছেন—

—কিন্তু এসব তত্ত্ব-টত্ত্বর ব্যবস্থা কে করলে? বাবা একলা সব করতে পারলো?

—তিনি একলাই করলেন। আর দোক্‌লা কে আছে যে করে দেবে!

—বাবার খাওয়া-দাওয়ার কী হচ্ছে?

—ওই যে বামুন মেয়েটা আছে। সে-ই রান্না করে দিয়ে চলে যায়। আর বাবুর তো খাওয়া!

বলতে বলতে বিপিনের কী যেন সন্দেহ হলো। বললে—তোমার মুখটা কেমন শুকনো-শুকনো দেখছি, তোমার শরীর ভালো আছে তো দিদিমণি?

নয়নতারা মুখে একটা হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললে—আমি? আমার আবার কী হয়েছে যে খারাপ থাকবো? শ্বশুর-শাশুড়ীর এত আদর পাচ্ছি, খারাপ থাকবো কেন?

—আর জামাইবাবু? জামাইবাবুকে যে দেখছি না? জামাইবাবু কোথায়?

আবার সেই ব্যথার জায়গাটাতেই ঘা দিলে বিপিন। কিন্তু নয়নতারা মুখের হাসিটা সেই একই ভাবে মুখে ধরে রেখে বললে—এই তো এখুনি ছিলেন, বাড়িতেই কোথাও আছেন বোধ হয়—

হঠাৎ বাইরে যেন কী একটা গোলমালের আওয়াজ হলো। কে যেন চিৎকার করে উঠলো—কোথায় গেল খোকা? গেল কোথায়? দিন-দিন এরকম বেয়াড়াপনা করে তো আমার ইজ্জৎ থাকে?

কথাগুলো যিনি বললেন তিনি যেন খুব রেগে গেছেন বলে মনে হলো। গলার আওয়াজে যেন সমস্ত বাড়িটা গম-গম করে উঠলো।

বিপিনের সঙ্গে যারা এসেছিল আওয়াজটা তাদের সকলের কানেই গেল। তারা সবাই শুনতে লাগলো কথাগুলো। বাইরে তখনও গোলমাল চলেছে। কে একজন যেন মেয়েলী গলায় জিজ্ঞেস করলে—কী, হলো কী আবার? তুমি অত রেগে গেলে কেন?

—রাগবো না? তোমরাই তো ছেলেকে আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছ! তুমি আর ওই প্রকাশ! কেন? ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে ভেবেছে সে যা ইচ্ছে তাই করবে? আমি তাকে কিছু বলতেও পারবো না?

—তুমি চুপ করো। একটু আস্তে আস্তে কথা বলতে পারো না? অত চেঁচাবার কী আছে?

—বেশ করবো চেঁচাবো। আমি ননী ডাক্তারকে নিয়ে ওপরে বাবাকে দেখাতে গেছি, আর এদিকে বাবাজীর ত্রিশূলটা সরিয়ে নিয়ে সে চলে গেছে—

ততক্ষণে প্রকাশ এসে ঢুকলো। প্রকাশ ননী ডাক্তারের ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে কাণ্ড দেখে অবাক। বাবাজীর ঘরে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূলটা ছিল সেটা নাকি সদা আবার সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

চৌধুরী মশাই বলে উঠলেন—এ তো তোমাদেরই দোষ! আমি সদাকে ঘরের ভেতর পুরে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দিলুম আর তোমরাই তাকে ছেড়ে দিলে! এখন কোথায় গেল সে? সে গেল কোথায়?

কথার মাঝখানেই বাধা দিলে প্রীতি। বললে—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো, কুটুমবাড়ি থেকে তত্ত্ব নিয়ে লোক এসেছে, তাদের সামনে আর কেলেঙ্কারি কোর না। ওরা চলে যাক, তখন যত ইচ্ছে ছেলেকে গালমন্দ করো—তার ওপর বউমা রয়েছে

বাড়িতে, বউমা কী ভাবছে বল দিকিনি। তোমার কি একটা আক্কেল বলে কিছু থাকতে নেই?

চৌধুরী মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—তত্ত্ব এসেছে? কীসের তত্ত্ব? শীতের?

প্রকাশ মামা বললে—হ্যাঁ জামাইবাবু, আমি নিজে দেখেছি যে। সদার কাপড়-জামা, কমলালেবু, কপি, কড়াইশুঁটি, সরপুরিয়া, সরভাজা—

বিপিনের দলের লোকেরা এতক্ষণ সব শুনছিল। বিপিন নয়নতারার দিকে চেয়ে দেখলে। দিদিমণির মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে—ও কা'র গলা দিদিমণি?

নয়নতারা এর কী উত্তর দেবে! তার যেন তখন লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা গেছে।

কিন্তু তাকে আর এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলো না তখন।

বিপিন তখনি আবার জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে কে আছে দিদিমণি? তার ত্রিশূল বুঝি জামাইবাবু নিয়ে গেছেন?

হঠাৎ শাশুড়ী ঘরে ঢুকলো। বললে—এসো বাবা, তোমরা খাবে এসো, তোমাদের খাবার দেওয়া হয়েছে—

বিপিন দিদিমণির শাশুড়ীকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেই বললে—থাক থাক বাবা, সব ভালো খবর তো তোমাদের?

ভেতর-বাড়িতে রান্না-বাড়ির বারান্দায় সার সার আসন পেতে কুটুমবাড়ির লোক-জনদের পেট-ভরা খাওয়াবার আয়োজন হয়েছিল। লুচি বেগুনভাজা থেকে শুরু করে ডাল মাছ দই মিষ্টি কিছুই বাদ নেই! যারা কুটুমবাড়িতে তত্ত্ব নিয়ে এসেছে তাদের খাওয়ার অধিকার আছে। গৌরী পরিবেশন করছিল আর প্রীতি তদারক।

বিপিন খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলে—জামাইবাবু কোথায়, তাঁকে তো দেখছি নে। সেবারে পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন, তিনিও জামাইবাবুকে দেখতে পান নি, আসবার সময় বলে দিয়েছিলেন জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—

প্রীতি বললে—তা খোকা তো বাড়িতে নেই এখন, মামলার কাগজপত্র নিয়ে সে রানাঘাটে গেছে উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—

কথাটা শুনে বিপিন যেন কেমন একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল। দিদিমণি এক রকম বললে, দিদিমণির শাশুড়ী একরকম বললে, আর দিদিমণির শ্বশুরের আর একরকম কথা।

চৌধুরী মশাই অনেকক্ষণ পরে এলেন। বিপিনদের তখন খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে পান খাচ্ছে।

—বেয়াই মশাই কেমন আছেন?

—আজ্ঞে, ভালোই আছেন।

—তোমাদের পেট ভরেছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব খেয়েছি। তাহলে আসি আমরা—

আর একবার প্রণাম করে তারা বিদায় নিচ্ছিল। যাবার আগে বিপিন বললে—সকলের সঙ্গেই দেখা হলো আজ্ঞে, শুধু জামাইবাবুর সঙ্গেই দেখা হলো না—

চৌধুরী মশাই বললেন—সে তো সকালে ছিল বাড়িতে, এই তোমরা আসবার কিছুক্ষণ আগে মাঠে গেছে ছোলা দেখতে। এবারে পাঁচশো বিঘে জমিতে ছোলা বোনা হয়েছে কি না, নিজেরা না দেখলে কে দেখবে, তাই...

বিপিন আরো অবাক হয়ে গেল। সমস্ত জিনিসটার পেছনে যেন একটা রহস্য মেশানো রয়েছে। একই বাড়ির লোক এক-এক রকম কথা বলে কেন? তবে কি কেউই জামাইবাবুর সঠিক খবর রাখে না?

বিপিনরা চলে যাবার পর প্রকাশ ছুটতে ছুটতে এসে চৌধুরী মশাইএর সামনে দাঁড়ালো। বললে—এই দেখুন জামাইবাবু, আপনি বলছিলেন সদা বাবাজীর ত্রিশূল নিয়ে পালিয়েছে, এই তো বাড়িতেই ত্রিশূল রয়েছে, আমি খুঁজে বার করলুম—

চৌধুরী মশাই বললেন—কোথায় ছিল?

—শশী কয়াল আমাকে দিলে। মরাই-এর পাশে পড়ে ছিল।

—তা ওখানে ওটা কে নিয়ে গেল?

প্রকাশ বললে—কে নিয়ে গেল কে জানে! হয়ত ভূতে নিয়ে গেছে। ভূত প্রেতদের চটিয়ে দিয়েছেন বাবাজী, তারা কি অত সহজে বাগ মানে? যাবার সময় হয়ত এই হাতিয়ারটা সামনে পেয়ে তুলে নিয়ে গেছে—

ত্রিশূলটা নিয়ে চৌধুরী মশাই বাবাজীর ঘরের দিকে চলতে লাগলেন। প্রকাশও পেছন-পেছন চলছিল। সে বললে—আপনি মিছিমিছি সদার নামে দোষ দিলেন....

—তুমি থামো, তুমি আর অত ফ্যাচ-ফ্যাচ কোর না। ফ্যাচ-ফ্যাচ করা আমার ভাল লাগে না। আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায়, আর এই সময়ে কিনা কর্তা-বাবুর অসুখ, কুটুমবাড়ির তত্ত্ব, বাবাজীর ত্রিশূল, ছেলের বেয়াড়াপনা, সদরের মামলা, সব একেবারে পঙ্গপালের মত পেছনে তাড়া করতে হয়—

বলতে বলতে দু'জনেই বাবাজীর ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। কিন্তু বাবাজী তখন চোখ বুজে জপ করছেন। একেবারে ধ্যানস্থ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কোনও পার্থিব দিকে তাঁর আর মনোযোগ নেই। ধ্যানযোগে তখন হয়ত তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অলৌকিক-লোকে বিচরণ করছেন।

চৌধুরী মশাই আর প্রকাশ মামা যেমন ঘরে ঢুকেছিলেন তেমনি আবার বেরিয়ে এলেন। বাবাজীর ধ্যান ভাঙাতে আর ইচ্ছে হলো না।

একদিনের মধ্যেই বাড়িতে যেন ঝড় বয়ে গেল। কুটুম্বিতা, আতিথেয়তা, অসুখ আর ঝামেলার ঝড়! আসলে বলতে গেলে ঝড় শুরু হয়েছিল সেই সদানন্দর গায়ে-হলুদের দিন থেকেই। তারপর থেকে এই ঝঞ্ঝাটের আর যেন কামাই নেই। চৌধুরী মশাই আর প্রীতির যেন মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

একলা প্রকাশ কোন্ দিক সামলাবে! তাকে একবার ডাক্তারবাড়ি যেতে হচ্ছে, আর একাবার সদানন্দকে সামলাতে হচ্ছে। তারও ঘুম হয় নি সারারাত। অন্ধকার বারান্দায় সারারাত সদার ঘরের দরজার সামনে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে কি কারো ঘুম আসে!

ডাক্তারবাড়ি থেকে ওষুধটা কোনও রকমে কর্তাবাবুর ঘরে ফেলে দিয়ে এসেই একেবারে সোজা রান্নাঘরে ছুটে এসেছে। এসেই বললে—কই দিদি, আমাকে সরভাজা দিলে না যে?

দিদি তখন রান্নার তদারকে ব্যস্ত ছিল। কথাটা শুনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—আমার এখন দেবার সময় নেই—পরে দেব'খন—

—তার মানে? পরে তো খাবোই। এখন একটু চেখে দেখবো, তাও দেবে না?

দিদি আর রাগ সামলাতে পারলে না। ঝাঁঝিয়ে উঠলো—হ্যাঁ রে, তোর এই এত বয়েস

হলো, বুড়ো ধাড়ি হলি, এখনও তোর নোলা গেল না? আমার কি মরবার সময় আছে এখন যে তোকে সরভাজা খেতে দেব?

—তা তোমাকে কে দিতে বলছে? আমাকে বলো না কোথায় রেখেছ, আমি নিজেই নিতে পারবো, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না—। আর বেয়াই মশাই কী রকম তত্ত্বটা করলে, ভালো কি মন্দ, একবার পরখ করে দেখতে হবে না?

দিদি হঠাৎ হাতের কাজ ফেলে ভাঁড়ার ঘর থেকে সরভাজা আর সরপুরিয়ার দুটো হাঁড়ি প্রকাশের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বললে—খা, গেল্—

প্রকাশ বললে—এ কী করলে? এতগুলো দিতে গেলে কেন? এতগুলো কি মানুষে খেতে পারে? তুমি নিজের জন্যে কিছু রাখলে না? জামাইবাবুও তো খাবে—

ওদিকে চৌধুরী মশাই স্নান করে এসে হাজির। বললে—কই রে গৌরী, আমায় ভাত দে—

তারপর প্রকাশের কাণ্ড দেখে অবাক। বললেন—এগুলো কী খাচ্ছো?

প্রকাশ বললে—এই দেখুন না জামাইবাবু, এত সরপুরিয়া সরভাজা কেউ খেতে পারে? এই দু'হাঁড়ি? শীতের তত্ত্ব এসেছে বেয়াইবাড়ি থেকে, এ তো একলা আমাকে দেয় নি। আপনি খাবেন, দিদি খাবে, সদা খাবে, বউমা খাবে। তা নয়, দিদি সব আমাকে দিয়ে গেল—

চৌধুরী মশাই-এর তখন তাড়া ছিল। সদর থেকে উকিলবাবু জরুরী তলব দিয়েছে। মামলা আছে সেখানে। রজব আলি গাড়ি নিয়ে তৈরি। খেয়ে উঠেই রওনা দেবেন তিনি।

গৌরী ভাতের থালা দিয়ে গেল। প্রীতি এসে বললে—খাক্ খাক্, ও পছন্দ করে বউ এনে দিয়েছে, ওই-ই খাক্—

কিন্তু এসব কথা নিয়ে আলোচনা করার মত সময় তখন ছিল না চৌধুরী মশাই-এর। তাড়াতাড়ি খেতে লাগলেন। তারপর যখন দেখলেন বাইরের কেউ নেই তখন জিজ্ঞেস করলেন—সদা কোথায়? সদা সেই সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আর বুঝি আসে নি?

প্রীতি বললে—না—

—আর বউমা কী বলছেন? কুটুমবাড়ির লোককে এখানকার ব্যাপার কিছু বলে নি তো?

প্রীতি বললে—বউমা না বললেই বা, কিন্তু তুমি এমন হইচই করলে তাতেই তো তারা সব জেনে গেল—

—কী রকম?

—তোমার তো মাথা গরম হলে আর কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান থাকে না, তুমি এমন চেঁচাতে লাগলে যে পাশের বাড়ির লোকও সব জেনে ফেললে।

চৌধুরী মশাই খেতে খেতে বললেন—বেহারি পাল তার আগেই যে সব কর্তাবাবুকে বলে গেছে। সেই জন্যেই তো এত ডাক্তার-ওষুধের হিড়িক হলো।

কৈলাস গোমস্তা সবই বলেছে আমাকে—

প্রীতি বললে—সে তো তোমারই দোষ। আমি তো আর বাড়ি বয়ে ভেতরের ব্যাপার কাউকে বলতে যাই নি—আমার সেরকম স্বভাবও নয়। তুমি নিজেই সকলেক বলে বেড়াবে আর নিজেই আবার আমাদের সাবধান করে দেবে—

চৌধুরী মশাই এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললেন—তা আজকে কী করবো?

—কীসের কী?

—আজকে তো রাত্তিরে আমি থাকছি নে। কাজকর্ম মিটিয়ে রাণাঘাট থেকে কোর্টকাছারি করে ফিরে আসতে সেই পরশু গড়িয়ে যাবে—আজ যদি খোকা বাড়িতে আসে তো আজকে সে কোথায় শোবে?

প্রীতি বললে—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজের কাজ করো গে যাও। কালই বা তুমি কী করেছিলে? তুমি তো ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলে। যা কিছু করবার তা আমি আর প্রকাশই তো করলুম—

—তা তুমি কি বলতে চাও আমার ভাবনা হয় না? আমি জমি-জমা নিয়ে ভাবি বলে ছেলে-বউএর ব্যাপার কি আমার নিজের ব্যাপার নয়? এত জমি-জমা তাহলে কার জন্যে করছি? এত মামলা-মকর্দমার ঝামেলাই বা কার জন্যে? আমি আর কদিন? আমি যখন থাকবো না তখন এসব কে দেখবে? আমার যা কিছু সব তো ওই ছেলের জন্যেই। ছেলে মানুষ হলো কি অমানুষ হলো তা আমি ভাববো না তো কে ভাববে? এই যে আমি রাণাঘাটে যাচ্ছি, তা সেখানে গিয়েই কি আমি শান্তি পাবো মনে করছো? আমার মন কেবল পড়ে থাকবে এখানে। রাত্তিরে সেখানে শুয়ে শুয়েও মনে পড়বে খোকা কী করছে, খোকা কোথায় শুয়েছে। খোকার সঙ্গে বউমার ভাব হলো কি না, এই সবই ভাববো। মামলার ব্যাপার যা-কিছু উকিলবাবু করবে, আমি তো এখানকার কথা ভেবেই সারাদিন সারারাত ছট্‌ফট করবো...

খাওয়া তখন হয়ে এসেছিল। তিনি উঠছিলেন।

প্রীতি বললে—এ কী? তুমি উঠলে যে? দুধ খাবে না?

—না, খাওয়া-দাওয়া এখন আমার মাথায় উঠেছে। ছেলের একটা ব্যবস্থা না করতে পারা পর্যন্ত আমার খেয়েও সুখ নেই—

প্রীতি বললে—ছেলের কথা তোমায় আর অত ভাবতে হবে না। আমি তো বলছি, সে-ভার আমাদের ওপর তুমি ছেড়ে দাও। আমি আছি, প্রকাশও রইল। আমরা দুজনে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করবোই। ওই তো প্রকাশ বলছিল, কোন্ সাধুর কাছ থেকে একটা বশীকরণ মাদুলি নাকি ও এনে দেবে—

—মাদুলি তোমার ছেলে পরবে? খোকা কি সেই রকম ছেলে তোমার?

—খোকা কেন মাদুলি পরবে? বউমাকে পরিয়ে দেব। সে যা-হোক আমরা একটা ব্যবস্থা করবোই। তুমি দুধটা খেয়ে নাও, এখন তো দু-তিন দিন আর দুধ-ঘি কিছুই জুটবে না—

চৌধুরী মশাই দুধটা চোঁ-চোঁ করে চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়ে বললেন—ও সাধু-সন্নিসী মাদুলি-তাবিজের ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই। আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

এতক্ষণ প্রকাশের কানে এসব কথা যায় নি। জামাইবাবুকে উঠতে দেখেই খেয়াল হলো। বললে—এ কি, আপনি সরভাজা সরপুরিয়া খেলেন না জামাইবাবু? বেয়াই মশাই এত খরচ-পত্তোর করে তত্ত্ব পাঠালেন আর আপনি একটা মুখে দিলেন না—যাবার আগে অন্তত একটা সরভাজা চেখে দেখুন—

চৌধুরী মশাই যেতে যেতে বললেন—ওসব তুমি খাও বড়কুটুম, তোমার মনে তো কোনও অশান্তি নেই, মামলা-মকর্দমার ঝামেলাও নেই। মামলা-মকর্দমা যে কী ব্যাপার তা তুমিই বা কী বুঝবে আর তোমার দিদিই বা কী বুঝবে—

প্রীতি পেছনে ছিল। বললে—আমি খুব বুঝি। আমিও জমিদারের মেয়ে। বাবা বলতো—সম্পত্তি করবো অথচ মামলা-মকর্দমা করবো না, তা কি হয়!

জামা-কাপড় পরে তৈরি হতে বেশি সময় লাগলো না। জুতো জোড়া পরে নিয়ে হাতে কাগজপত্রের পুঁটলিটা নিয়ে চৌধুরী মশাই গাড়ীতে উঠে বসলেন। অন্য সময় হলে কৈলাস গোমস্তা সঙ্গে যেত। কিন্তু সে চলে গেলে কর্তাবাবুকে কে দেখবে?

—দুর্গা দুর্গা, দুর্গা—দুর্গা—

পরম ভক্তিভরে পুব দিককে উদ্দেশ করে কিম্বা হয়ত ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে তিনি রওনা দিলেন।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো।

চৌধুরী মশাই না থাকলে সেরেস্তাদার পরমেশ মৌলিকই চণ্ডীমণ্ডপের কাজ চালাতো। একেবারে নির্বিকার নির্বিরোধ মানুষ। বাড়ির ভেতরের কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তার ছিল না। যেমন ঝঞ্ঝাট ছিল কৈলাস গোমস্তার। শুধু হিসেবের খাতাটা নিয়ে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে নিত। চৌধুরী মশাই চলে যাবার পর পরমেশ মৌলিকও বাড়িতে গিয়ে খেয়ে নিয়ে একটু দিবানিদ্রা দিয়েছিল। সেরেস্তার কাজে তেমন তাড়া ছিল না সেদিন। বাড়ির কর্তাই যখন বাড়িতে নেই তখন তার কাজেরও তাড়া নেই। চণ্ডীমণ্ডপের সামনেটায় গ্রীষ্মকালে বেশ ছায়া-ছায়া থাকে। কিন্তু শীতকালটাতেই যত বিপদ। বিরাট আতা গাছটার ডালপালার ছায়ায় রোদ এসে ঢোকে না।

পরমেশ মৌলিক চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বাইরের দাওয়ায় বসে গায়ে একটু রোদের আঁচ লাগাচ্ছিল। ছোটবাবু নেই তাই পরমেশ মৌলিকের মনটাতেও একটু ছুটির আমেজ।

শালাবাবু হন হন করে বাড়ির ভেতরের দিকে আসছিল। পরমেশ মৌলিককে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো সেরেস্তাদার, সদাকে দেখেছ?

—খোকাবাবু! কই, না তো!

—দেখ নি? তা দেখবে কেন? তাহলে যে বাড়ির উপকার করা হবে। উপকার করবার সময় তো কেউ নেই, শুধু গায়ে রোদ লাগিয়ে বেড়াচ্ছো!

পরমেশ মৌলিক বললে—কেন? খোকাবাবু খেতে আসে নি?

—তোমার কি বুদ্ধি হে সেরেস্তাদার, খেতেই যদি আসবে তো আমি সারা গাঁ খুঁজে বেড়াবো কেন তাকে?

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। একেবারে সোজা দিদির কাছে গিয়ে হাজির। বললে—কই, সদা এসেছে দিদি?

প্রীতি ছেলের জন্যে তখনও না-খেয়ে বসে ছিল। বললে—কই না তো—

—তা তুমি খেয়ে নিলে না কেন?

—আমি কী করে খাই বল্! বউমাকে বলে-কয়ে অনেক কষ্টে এখন খাইয়ে দিলুম। প্রথমে খেতে চাইছিল না। আমি বললুম, আমি শাশুড়ী হই, আমি তোমাকে বলছি, খেলে কোনও দোষ হবে না—

প্রকাশ বললে—দেখেছ কী-রকম সতীসাধ্বী বউ এনেছি তোমার! সদাটা একটা আস্ত লক্ষ্মীছাড়া, অমন সতী-সাধ্বী বউ পেয়েছে আর তার এ কি হেনস্তা! বেশ করেছ তুমি খাইয়ে দিয়েছ, তা তুমিও খেয়ে নিলে পারতে? সে লক্ষ্মীছাড়ার জন্যে কতক্ষণ বসে থাকবে শুনি?

—সে খেলে না, আমি মা হয়ে কী করে খাই বল্ দিকিনি!

—আর বাবাজী? বাবাজীর সেবা হয়েছে?

প্রীতি বললে—ওই এক জ্বালা হয়েছে। তখনই তোর জামাইবাবুকে বললুম ও-সব হাঙ্গামা বাড়ির মধ্যে কোর না। অত পারবো না আমি। তো তোর জামাইবাবুর তো বিশ্বাস হলো না, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হলো। এখন সামলাবার সময় তো সেই আমাকেই একলা সামলাতে হবে—

তারপর একটু থেমে বললে—তা খোকাকে কোথাও পেলি নে তুই?

প্রকাশ বললে—না, হেঁটে হেঁটে আমার পায়ের খিল্ খুলে গেছে। বারোয়ারিতলা চষে এলাম, নদীর ধারে গেছলুম, ভাবলুম সেখানেই বোধ হয় একলা-একলা শিবের গাজন গাইছে! যা ভাবুক ছেলে তোমার! কী যে এত ভাবনা ওর, তা বুঝতে পারি নে। রাগ করবি যত ইচ্ছে রাগ কর, ভাতের ওপর কেউ রাগ করে? এমন বোকা কেউ আছে? তুমিই বলো না—

—তা আর কোথাও পেলি নে তাকে?

—তারপর গেলাম দক্ষিণ পাড়ার দিকে, গেলাম পশ্চিম পাড়ায়। কোথাও নেই। ওই যে বললুম হেঁটে হেঁটে আমার পায়ের খিল্ খুলে গেছে। শেষকালে আমার ক্ষিদে পেয়ে গেল।

প্রীতি বললে—সে কী রে, এই তো এখুনি ভাত খেয়ে গেলি। তারপর সকালে অতগুলো সরভাজা সরপুরিয়া খেলি, এরই মধ্যে তোর আবার ক্ষিধে?

—তা ক্ষিধের কী দোষ বলো? তুমি আমার মত একটু হেঁটে এসো দেখবে তোমারও চড়-চড় করে ক্ষিধে পেয়ে যাবে। বেয়াই মশাই যে কমলালেবু পাঠিয়েছিল, সে তো একটাও চেখে দেখি নি তখন—

প্রীতির তখন ওসব কথা ভলো লাগছিল না। বললে—ভাঁড়ার ঘরে সব আছে, যে ক'টা পারিস খেগে যা—

প্রকাশ বললে—আরে আমি কি তাই বলেছি, বলছিলুম কমলালেবুগুলো মিষ্টি না টক্ সেটা চেখে দেখতে হবে তো—

প্রীতি বললে—মিষ্টি হোক টক হোক ও তো আর ফেরত দিতে পারবো না। ও তো দোকানের জিনিস নয়—খেতেই হবে—

বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল প্রীতি। সমস্ত বাড়িটা শীতের দুপুরে নিঝুম হয়ে রয়েছে। সকালবেলার কর্ম-ব্যস্ত বাড়িটা তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে বোধ হয় একমনে সন্ধ্যার প্রত্যাশায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। কখন খোকা আসবে তার জন্যে হাঁড়িতে ভাত রাখা আছে। গৌরী গিয়ে রোদে গা দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। বিষ্টুর মা-ও তখন সারা দিনের কাজের অবসরে একটু গড়িয়ে নেবার আশায় বাড়ির কোনও জায়গায় আড়াল দেখে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে আছে।

তারপর বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সাজ-সাজ রব উঠবে। ছোটবাবু না-ই বা রইল বাড়িতে। কিন্তু অন্য সবাই-ই তো রয়েছে। তারা তো তা বলে আর পেটে খিল্ লাগিয়ে বসে থাকবে না। তাদের সব চাহিদা ঠিক ঠিক যুগিয়ে যেতে হবে প্রীতিকেই। ওপরে বুড়ো শ্বশুর অসুস্থ, বারবাড়িতে বাবাজী। পাশের ঘরে নতুন বউ-মানুষ। শুধু যার জন্যে এই সংসার করা, যার মুখ চেয়ে এই পরের বাড়ির মেয়েকে বউ করে আনা, সে-ই কোথায় রইল তার ঠিক নেই।

বাইরে কার পায়ের শব্দ হতেই প্রীতি চেয়ে দেখলে—কে?

বিষ্টুর মা! বিষ্টুর মা বললে—উনুনে আঁচ দেব মা?

প্রীতি রেগে গেল—ভরদুপুর বেলায় উনুনে আঁচ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিষ্টুর মা?

বিষ্টুর মা বললে—দুপুর কোথায় মা! সন্ধ্যে হয়ে এসেছে যে—

সন্ধ্যে! প্রীতি ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলো। শীতের বেলা দেখতে দেখতে পার হয়ে যায়। কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, আবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল তা টেরই পায় নি সে। গৌরী কোথায়? গৌরী মুখপুড়ী কোথায় গেল? আমাকে একবার ডেকে দেয় নি কেন সে?

গৌরী আসতেই প্রীতি ধমকে দিলে—হ্যাঁ রে, তোরা থাকিস কোথায়? আমাকে একবার ডাকতে পারলি নে? ঘরের মধ্যে আমি কি বেলা ঠাহর করতে পেরেছি? উনুনে এখনও আঁচও পড়ে নি, তোদের দিয়ে কি একটা কাজও হবার নয়? কর্তা বাড়িতে নেই বলে কি তোরা সবাই সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস?

গৌরী বললে—তুমি যে ঘুমোচ্ছিলে দেখলুম বউদি, তাই আর ডাকি নি—

প্রীতি রেগে গেল। বললে—আমি ঘুমোচ্ছিলুম? তুই আমাকে ঘুমোতে দেখলি! জানিস খোকা খেতে আসে নি বলে আমি তখন থেকে না-খেয়ে বসে আছি, আর আমি ঘুমোব? আমার ঘুম আসে? চল, ভাঁড়ারের চাবি নে, চাল ডাল বার কর—আমি যাচ্ছি, একবার বউমাকে দেখে এখুনি আসছি—

ওদিকে পরমেশ মৌলিকও চণ্ডীমণ্ডপের কাজ সেরে হারিকেন বাতিটা জ্বালিয়ে সবে আবার হিসেবের খাতায় মন দিতে যাচ্ছে এমন সময় থানা থেকে একজন চৌকিদার এলো দৌড়তে দৌড়তে।

—সেরেস্তাদারবাবু! সেরেস্তাদারবাবু!

বংশী ঢালী চণ্ডীমণ্ডপের পেছনের ঘরখানাতেই তখন রান্না চড়িয়েছিল। থানার চৌকিদারের গলা শুনে সেও চমকে উঠেছে। ছোটবাবু নেই, এই সময়ে আবার থানার চৌকিদার আসে কেন? বাইরে বেরিয়ে দেখলে শুধু থানার চৌকিদার নয়, রেল-বাজার থানার দারোগাবাবুও এসেছে।

—কী খবর বংশী? তোর ছোটবাবু কোথায়?

পরমেশ মৌলিকই জবাব দিলে—আজ্ঞে তিনি তো রাণাঘাটের সদরে গেছেন, মামলার দিন পড়েছে কাল—

—কর্তাবাবু?

—তাঁর তো অসুখ। সকাল থেকে মুখে কথা আটকে গেছে। ননী ডাক্তারবাবু দেখছেন। যায়-যায় অবস্থা তাঁর।

—তাহলে আর কে আছে বাড়িতে?

—শালাবাবু আছে, প্রকাশ মামা। তাঁকে ডাকবো?

—না, তাকে দিয়ে হবে না। সে আবার একটা মানুষ নাকি?

তারপর কী ভেবে দারোগা আবার বললে—তা তাঁকেই ডাকো একবার, কথাটা তাঁকেই বলে যাই, খুব জরুরী কথা ছিল—

বংশী ঢালী গিয়ে কর্তাবাবুর ঘর থেকে শালাবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। প্রকাশ মামা আসতেই দারোগাবাবু বললে—কেউ যখন বাড়িতে নেই তখন আপনাকেই বলে যাই, সদানন্দ অ্যারেস্ট হয়েছে—

—সদানন্দ? অ্যারেস্ট হয়েছে? সে কোথায়? তাকেই তো আমি সকাল থেকে গরু-খোঁজা করেছি, সে খায় নি দায় নি। দিদিও তার জন্যে সারাদিন জলগ্রহণ করে নি, একেবারে

উপোস করে রয়েছে। কোথায় ছিল সে?

—কালীগঞ্জে!

—কালীগঞ্জে? কালীগঞ্জে কোথায়?

দারোগাবাবু বললে—কালীগঞ্জের সেই জমিদারের পোড়ো ভাঙা বাড়ির মধ্যে। আরও পাঁচজন ডাকাতদের সঙ্গে ছোটবাবুর ছেলেও ধরা পড়েছে। স্বরূপগঞ্জের ট্রেন ডাকাতির মামলার সব আসামী ওইখানে ছিল। পুরো দলটা একেবারে একসঙ্গে ধরা পড়ে গেছে—

প্রকাশ হতভম্ব হয়ে গেল। এ আবার কী উটকো বিপদ! এখন জামাইবাবু নেই, এখন এসব কে সামলাবে? বললে—তা সদা—সদা কেন ধরা পড়লো? সদাও কি ডাকাতি করেছে নাকি?

তা স্বরূপগঞ্জের ট্রেন ডাকাতির কথা নবাবগঞ্জের লোক জানতো। শুধু নবাবগঞ্জ নয়, কেষ্টনগরের ও-অঞ্চলটার সব লোকই অল্পবিস্তর জানতো। তা নিয়ে গ্রামে-গ্রামে আলোচনাও হয়েছিল। সে এক ভীষণ ডাকাতি। স্বরূপগঞ্জ দিয়ে মেল্ ট্রেনটা চলবার সময় হঠাৎ একদিন থেমে গিয়েছিল। রাত তখন কত কে জানে। প্যাসেঞ্জাররা ঘুমে অচৈতন্য। হঠাৎ পিস্তলের গুলির দুম-দুম আওয়াজ শুনে সবাই জেগে উঠে ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। এমন তো বড় একটা হয় না। যারা সাহসী লোক তারা জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে। কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পেলে না। শুধু দেখলে অন্ধকারে রেল লাইনের ধারে কয়েকজন লোক টর্চ নিয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটছে আর গুলি ছোঁড়ার শব্দ হচ্ছে।

তারপর যেন কোন্ কামরা থেকে একটা আর্ত চিৎকার উঠলো।

তার কয়েক ঘণ্টা পরেই আরেকটা ট্রেনে অনেক পুলিস এসে পৌঁছোল। তারা সারা ট্রেনখানাকে তল্লাসী করলে। তারপর ট্রেনটা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো স্বরূপগঞ্জে। ততক্ষণে স্টেশনের প্লাটফরমে সেই অত রাত্রে অনেক ভিড় জমে গেছে। পুলিসে-পুলিসে জায়গাটা একেবারে ছেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী প্যাসেঞ্জারদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল—ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নাকি দেড় লক্ষ টাকা ডাকাতরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

যারা ডাকাতি করেছে তারা নাকি ঠিক ডাকাত নয়। স্বদেশী কোন্ পার্টি!

এ-সব কয়েক মাস আগেকার ঘটনা। এ ঘটনার পর কর্তাবাবু খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। খবরের কাগজটা যখন পড়িয়ে শুনিয়েছিল কৈলাস তখন কর্তাবাবু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যাদের কিছু আছে তাদেরই খোয়া যাবার ভয় থাকে। যাদের বেশি আছে তাদের আবার বেশি খোয়া যাবার ভয়। কর্তাবাবু সেই বেশি থাকার দলে। তাই তাঁর ভয়টাই আরো বেশি করে হয়েছিল।

তার পরে সপ্তাহে দু'বার যখনই কাগজ এসেছে তখনই কর্তাবাবু কৈলাসকে খুঁচিয়েছেন—কৈলাস, সেই ডাকাতদের কথা আর কিছু লেখে নি কাগজওয়ালারা?

কৈলাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে-সম্বন্ধে আর কিছু নতুন খবর পায় নি। প্রত্যেকবারই বলেছে-আজ্ঞে না কর্তাবাবু—

এমনি প্রত্যেকবার। দেখতে দেখতে কত মাস কেটে গেল। তারপরে অন্য খবরের তলায় স্বরূপগঞ্জের ডাকাতির খবর একদিন চাপাও পড়ে গেল। কর্তাবাবুর মনে হলো সব ঠিক

হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না। এবার শান্তি। এবার তাঁর জমি-জমা-টাকা-কড়ি আর কেউ কেড়ে নেবে না। এবার থেকে তিনি নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে পৃথিবীর সব উপকরণ ভোগ-দখল করতে পারবেন। হয়ত তাঁর পা-ও একদিন আবার ভালো হয়ে যাবে। আবার তিনি হেঁটে-চলে ঘুরতে পারবেন। তখন তিনি আবার ক্ষেত-খামার চষে বেড়াবেন। তখন আর পৃথিবীতে ডাকাত থাকবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর আশেপাশে তখন কেউ-ই আর বলবার ছিল না যে আসলে তিনিও একজন ডাকাত। তিনিও একদিন ওই স্বরূপগঞ্জের ডাকাতদের মতই ডাকাতি করেছেন। ডাকাতি করেই এই সংসার-সম্পত্তি-জমি-জমা করেছেন। স্বরূপগঞ্জের ডাকাতরা ট্রেন ডাকাতি করেছে আর তিনি করেছেন কালীগঞ্জের জমিদারি ডাকাতি। এ ডাকাতি আর ও-ডাকাতিতে যে কোনও তফাৎ নেই তা বোঝবার মত চেতনা ছিল না কর্তাবাবুর। আর কর্তাবাবুরই বা দোষ কী! কর্তাবাবুর চেয়েও যারা আরো বেশি বড় ডাকাত তাদেরই কি সে চেতনা থাকে? ইতিহাসের তো ওই একটাই শিক্ষা। আমরা তো ইতিহাস পড়েই শিখি যে ইতিহাস পড়ে আমরা কোন শিক্ষাই নিই না। নইলে এই কর্তাবাবুর বংশেই বা এই কালাপাহাড় সদানন্দর জন্ম হলো কেন!

ইতিহাসেই লেখা আছে আড়াই হাজার বছর আগে আর এক দেশে আর এক জমিদার-বংশে আর এক সদানন্দর জন্ম হয়েছিল! সেই ছেলেরও সেই কর্তাবাবু একদিন পরমা রূপসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। সেই সদানন্দর জন্যেও অনেক আদর অনেক যত্ন অনেক বিলাসের উপকরণের আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এই সদানন্দর মত সেই সদানন্দরও সেদিন মন ভরে নি। তারও মনে প্রশ্ন জেগেছিল—এ অন্যায়, এ পাপ! এই অন্যায় আর এই পাপের প্রতিকার চাই—

এই বলে কপিলাবস্তুর সেই সদানন্দও একদিন সব আয়োজন-উপকরণ-পত্নী-প্রিয়জন সবাইকে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল।

নবাবগঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই সদানন্দরও সেদিন মনে হলো—এ অন্যায়, এ পাপ। এই অন্যায় আর এই পাপের প্রতিকার চাই—এই বুজরুক, এই ভণ্ড, আর এই মিথ্যের সৌধ ছেড়ে সে রাস্তায় নামবে।

সকালবেলাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। প্রকাশ মামা খানিক দূর পর্যন্ত এসেছিল। বলেছিল—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

তারপর নিজেই আবার বলেছিল—তোকে নিয়ে দেখছি মুশকিল হলো আমার, এই সব দায়িত্ব দেখছি শেষকালে আমার ঘাড়েই পড়লো—

একটু আগে বাড়িতে যে-কাণ্ড ঘটে গেছে সেটা তখনও প্রকাশ মামার মনে ছিল। একদিকে দিদির সঙ্গে জামাইবাবুর কথা-কাটাকাটি, চাবি নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া, ওদিকে বাবাজীর হেনস্তা, আর তার ওপর কর্তাবাবুর হঠাৎ অসুখ। তারপরে ননী ডাক্তারকে ডাকতে যাওয়া। যত রকমের ঝঞ্ঝাট শুরু হয়ে গেল ওই নতুন বউ বাড়িতে আসবার পর থেকেই। তাহলে ওই বউটাই আসলে অপয়া।

আর সদানন্দর সঙ্গে বেশি দূর যাবার সময় ছিল না। প্রকাশ মামা ফিরলো। দূর হোক গে, সকাল থেকে তখনও প্রকাশ মামার কিছু পেটে পড়ে নি। না-খেয়ে ভাগ্নের পেছন-পেছন কত ঘোরা যায়? ও তো একটা বাউণ্ডুলে মানুষ, ও খালি পেটে ঘুরতে পারে। কিন্তু প্রকাশের তো তা চলবে না। খাওয়া চাই, পেটটা আগে ভরানো চাই।

বললে—আমি আর যাবো না তোর সঙ্গে—তুই কখন আসছিস?

সদানন্দ সে-কথার উত্তর না দিয়ে যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো।

প্রকাশ মামা আবার বাড়িতে ফিরলো। বাড়ি নয় তো যেন আগুন। সেখানে ফেরা মানে আগুনের মধ্যে ফেরা। তবু না ফিরে উপায়ই বা কী! এমন হাত পাতলেই টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? ভাগলপুরে গেলে তো আর এমন আরাম নেই। সেখানে সেই বউ-ছেলে মেয়ের ঝামেলা। আজ এটার অসুখ, কাল সেটার। এখানে দরকার হলো তো দিদির কাছে হাত পাতলুম। সেই টাকা থেকে কিছু পাঠিয়ে দিলুম বউ-এর কাছে। তারা সেখানে খেতে পাক আর না-পাক সেসব তো আমাকে আর চোখ মেলে দেখতে হচ্ছে না।

কিন্তু বাড়িতে এসেই দেখলে খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে দিদিতে আর জামাইবাবুতে।

সদানন্দর তখন ওসব সমস্যা নেই। মাথার ওপর আকাশ। বারোয়ারিতলার দিকে গেলে তাদের সেই গাছের তলায় দোকানের মাচার ওপর বসে বসে আড্ডা আর রাত্তিরে সেই মহড়া। তার চেয়ে আরো দূরে চলে চলো। একেবারে নদীর ধারে।

শীতকালে নদীটার চেহারাটাই একেবারে অন্য রকম হয়ে যায়। জল শুকিয়ে আসে তখন। নল-খাগড়ার ডগাগুলো তখন জলের ওপর মাথা তুলে আকাশের দিকে হাত বাড়ায়। যেন জলের বেড়া ডিঙিয়ে তারা সূর্যের নিঃসীমতায় প্রাণ খোঁজে। তখন ইছামতী হেঁটেই পার হওয়া যায়।

নদীটা পার হয়ে একেবারে ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো সদানন্দ। যেদিকটায় লোকের ভিড় সেদিকে গেল না সে। আলের পথে রাস্তাটা বেশ ফাঁকা। যতদূর চোখ চাও কেবল ছোলার ক্ষেত। ছোট ছোট আধ ইঞ্চির মত সবুজ ছোলা গাছের চারা। কতকগুলো পাখি ক্ষেতের ওপর বসে বসে কী খাচ্ছিল কে জানে। সদানন্দকে দেখেই তারা ভয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

সদানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। চেয়ে দেখলে পাখিগুলো আরো দূরে কাদের একটা ক্ষেতের ওপর গিয়ে ঝাঁক বেঁধে বসলো। সদানন্দ কী করবে বুঝতে পারলে না। ওর পাশ দিয়েই রাস্তা। ওখান দিয়ে গেলে তো আবার পাখিগুলো ভয় পাবে। আবার উড়ে যাবে।

সদানন্দ সেখানে দাঁড়িয়েই বললে—আমি কিছু করবো না রে, তোদের কিচ্ছু ভয় নেই, তোরা খাচ্ছিস খা—

পাখীগুলো তার কথা বুঝতে পারলে কিনা কে জানে। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে সবাই নিশ্চিন্ত মনে ছোলা গাছের কচি পাতা খেতে লাগলো। সদানন্দর নিজেরও ক্ষিধে পেয়েছিল। কিন্তু পাখিদের খেতে দিয়ে তার নিজের ক্ষিধেই যেন মিটে যেতে লাগলো। খা, খা, তোরা খা। যাদের ছোলার ক্ষেত তাদের অনেক আছে। তারা অনেক কপিল পায়রাপোড়া অনেক মানিক ঘোষ আর অনেক ফটিক প্রামাণিককে খেতে না দিয়ে উপোস করিয়ে মেরে ফেলেছে। তারা অনেক কালীগঞ্জের অনেক বউ-এর অনেক সর্বনাশ করেছে। ও-ক'টা খেলে তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। তোরা গরীব, তোদের বরং খাওয়াবার কেউ নেই। তোরা খা, পেট ভরে খা। আমি কিছু বলবো না। এখানে কর্তাবাবুরাও নেই, চৌধুরী মশাইরাও নেই, কৈলাস, দীনু, প্রকাশ মামা, মা কেউই নেই। কেবল আমি আছি। আমি তোদের কিচ্ছু বলবো না। আমিও তোদের মতন, জানিস। খা, খা, তোরা খুব খা—

তারপর নলগাড়ির মাঠ, বউমারীর বিল, একটা খেজুর গাছ। দুটো গরু। তারও পরে ওমরপুর। তারপরে শুধু আকাশ। কেবল আকাশ আর আকাশ। আর আকাশের ওপারে?

—কে?

কখন যে হাঁটতে হাঁটতে সে কালীগঞ্জে এসে পড়েছে তা তার নিজেরই খেয়াল ছিল, না। কখন যে সূর্য ডুবে গেছে তারও খেয়াল ছিল না তার। একেবারে কালীগঞ্জের বাজারের কাছে এসে পড়েছিল।

—আমি।

—আমি কে?

সদানন্দ বললে—আমি সদানন্দ।

—কোথায় বাড়ি তোমাদের?

—নবাবগঞ্জে—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে সদানন্দ। শেষকালে হয়ত কুলুজীর পরিচয় দিতে হবে। বলতে হবে কেন সে এখানে এসেছে। কেন সে এখানে প্রায় আসে। নবাবগঞ্জের হরনারায়ণ চৌধুরীর ছেলের এখানে আসার দরকারটা কী? জিজ্ঞেস করলে সে কী উত্তর দেবে? কী উত্তর দেওয়া তার উচিত? আর উত্তর আছেই বা কি ছাই যে সে উত্তর দেবে! কেন যে সে ঘুরে ঘুরে কালীগঞ্জে আসে তা কি সে নিজেই জানে? সত্যিই তো, কেন সে এখানে আসে! সমস্ত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর অতিক্রম করে এখানে এই কালীগঞ্জে?

হাটের একটা কোণে তখন বেশ ভিড় হয়েছে। চারিদিকে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে একটা মেয়েলী গলার গান ভেসে আসছে—

আগে যদি সখি জানিতাম।
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও-বিষ ভখিতাম॥

আরে, এ তো সেই গান! বহুদিন আগে সেই রাণাঘটের সদরে রাধার মুখে শোনা। প্রকাশ মামা যাত্রা-শোনার পরে রাত দুটোর সময় তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তবে কি ও-বিষ ভখিতাম মানে খাইতাম! সদানন্দ সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো। আসলে গান শুনলো না! মনে হলো সে তার নিজেরই মনের কথা যেন শুনতে লাগলো। আগে যদি কালীগঞ্জের বউ জানতো যে বিয়েবাড়িতে গেলে তাকে এমন করে গুম খুন করে ফেলবে তাহলে কি সে নবাবগঞ্জে যেত! কপিল পায়রাপোড়া যদি জানতো তাকে বারোয়ারিতলায় একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে তাহলে কি সে কর্তাবাবুর নাতিকে বিনে পয়সায় রবারের বেলুন উপহার দিত! এই রকম কত যদি আছে তার জীবনে। কর্তাবাবু যদি বলতো যে কালীগঞ্জের বউকে টাকা দেবে না তাহলে সদানন্দ বিয়ে করতেই কি যেত! আর নয়নতারার বাবাই যদি জানতো যে টাকা না দিলে জামাই তার মেয়ের সঙ্গে ঘর করবে না তাহলে কি সদানন্দর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিত!

অথচ ইতিহাসের পাতায় তো সবই লেখা আছে। তারও আগে হাজার হাজার সদানন্দ তো এমনি করেই সংসারের সঙ্গে কত অসহযোগিতা করেছে। কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন তো অনেক চেষ্টা করেছে সিদ্ধার্থকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। নদীয়ার শচীমাতাও তো অনেক সাধ্য-সাধনা করেছে নিমাইকে সংসারী করবার জন্যে। আসলে ইতিহাসের তো ওই একটাই শিক্ষা। আমরা তো ইতিহাস পড়েই শিখি যে ইতিহাস পড়ে আমরা কিছুই শিখি না। নইলে নবাবগঞ্জের এত বংশ থাকতে কালীগঞ্জের নায়েব নরনারায়ণ চৌধুরীর বংশেই বা কেন সদানন্দর জন্ম হলো!

আবার সেই অদ্ভুত গলার শব্দটা—কে?

—আমি!

—আমি কে?

—আমি সদানন্দ।

—কোথায় বাড়ি তোমাদের?

—নবাবগঞ্জে।

কে কথাটা জিজ্ঞেস করলে, কোথা থেকে জিজ্ঞেস করলে, কিছুই বোঝা গেল না। তখন বেশ আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিকে। কালীগঞ্জের জমিদারের বাড়ির ভেতরে কতদিন সে লুকিয়ে ঢুকেছে, কতদিন এখানে কত সময় কাটিয়ে গিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই এখানে চলে এসেছে সকলের চোখের আড়ালে। এখানে এসে নিরিবিলিতে কালীগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে দু' দণ্ড কথা বলেছে, কিন্তু এমন করে কেউ কখনও তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করে নি, এমন করে তাকে চ্যালেঞ্জও করে নি।

কিন্তু এ-সময়ে এরা কারা?

হর্ষনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি সহজ বাড়ি নয়! এককালে পয়সা ছিল তাঁর প্রচুর, জমিও ছিল প্রচুর। কিম্বা হয়ত কর্তাবাবুর মত কপিল পায়রাপোড়া, মাণিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকদের ঠকিয়েই তিনি পয়সা করেছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে আসক্তি ত্যাগ করে নবদ্বীপবাসী হতে গিয়েছিলেন হয়ত সেই কারণেই। আর হয়ত নরনারায়ণ চৌধুরীর মত নায়েব না থাকলে এ বাড়ির এমন দশাও হতো না। অর্থ আর প্রতিপত্তির শিখরে যখন তিনি উঠেছিলেন তখন তিনি এই বাড়ি করেছিলেন। তাই যতটা না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি ছিল বাড়ির আয়োজন। যত না মানুষ তার চেয়ে বেশি ছিল ঘর। এবং যত না ঘর তার চেয়েও বেশি ছিল ঘরের আসবাবপত্র। তা আসবাবপত্র বোধ হয় পোড়োবাড়িতে পড়ে থাকার কথা নয়। তাই সেগুলো যথাসময়েই অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু ইঁট-কাঠ? ও-গুলো তো আর একদিনে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না, তাই আছে। সেই ভাঙা ইঁট-কাঠের মধ্যেই সদানন্দ রোজ এসে যেন খানিকক্ষণের শান্তি খুঁজতো। তখন নিরিবিলিতে কালীগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে দুদণ্ড কথা হতো। নিজের মনকে উজাড় করে ঢেলে দিত তার কাছে। বলতো—আমি আমার পূর্ব পুরুষের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো কালীগঞ্জের বউ, তুমি কিছু ভেবো না, আমি প্রায়শ্চিত্ত করবোই—

কিন্তু সেদিন আর তা হলো না। ভাঙা পাঁচিলটা টপ্‌কে ভেতরের উঠোনের কাঁটাঝোপ মাড়িয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দোতলায় উঠেছে তখনই কাদের ফিস-ফিস আওয়াজ শুরু হয়েছিল।

—কে?

—আমি!

—আমি কে? কোথা থেকে আসছো তুমি?

—আমি সদানন্দ, নবাবগঞ্জে থাকি।

তারপর যারা এতক্ষণ অদৃশ্য ছিল তারা একে-একে সবাই সামনে বেরিয়ে এল। একেবারে চার-পাঁচ জন। সবাই তারই বয়েসী। তারপর তাদের জেরা। কোথায় থাকেন? কেন এখানে আসেন রোজ? এই অন্ধকার ভূতের বাড়িতে আপনার কীসের প্রয়োজন? অনেক কথা তাদের, অনেক জিজ্ঞাসা। কিন্তু তবু মনে হলো তাদের যেন অনেক সন্দেহ।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আপনারা কারা? আপনাদের তো কোনও দিন এ-বাড়িতে দেখি নি?

—আমরা কালীগঞ্জে এসেছিলুম হাট করতে। আজ এখানে হাট-বার। কাল সকালে আবার ফিরে যাবো।

তবু সদানন্দর সন্দেহ গেল না। হাট বার তো বাড়িতে যেতে কী! এর আগেও তো অনেক হাট গেছে এই কালীগঞ্জে। কোনও দিন তো তোমরা এখানে আসো নি। তোমরা

এখানে খাবে কী! থাকবে কোথায়? ঘুমোবে কোথায়? কতক্ষণ থাকবে?

—আর আপনি? আপনি কী খাবেন? আপনি কোথায় ঘুমোবেন? আপনি বাড়ি যাবেন না?

সদানন্দ বললে—আমি তো রাত্তিরে এখানে থাকি না। আমি নবাবগঞ্জে চলে যাই, নবাবগঞ্জে আমাদের বাড়ি আছে—

তবু সন্দেহ গেল না তাদের। একজন চুপি-চুপি আর একজনকে বললে—ও নিশ্চয়ই পুলিসের লোক—চর—

আর একজন বললে—ওকে ছাড়িস নি, এখানেই আটকে রাখ, বেরিয়েই পুলিসে খবর দিয়ে দেবে—

একজন সদানন্দর দিকে এগিয়ে এল। একজনের হাতে রিভলবার। সদানন্দ তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। ছেলেটা এসে তার দিকে রিভলবারটা তাগ করে বললে—কোথায় যাচ্ছেন?

—বাড়ি।

—বাড়ি, না পুলিসের হেড-কোয়ার্টারে? আমরা সব জানি। আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না।

সদানন্দ হাসলো। বললে—বেশ তো, এখানেই থাকবো। বাড়ির ওপর আমার এমন কিছু টান নেই যে সেখানে যেতেই হবে—

সবাই অবাক! সদানন্দ যে পুলিসের স্পাই এ-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই রইল না তাদের। অতি ধূর্ত না হলে কি এমন কথা কেউ বলে!

—খাবেন কী?

সদানন্দ বললে—খাওয়া? আমার অত ক্ষিধে পায় না—

এবার আরো নিঃসন্দেহ হয়ে গেল সবাই। বললে—তাহলে আপনাকে এই ঘরের মধ্যে রেখে আমরা বাইরে থেকে দরজায় শেকল দিয়ে দেব। তারপর সেই ভোরবেলা আবার দরজা খুলে দেব—

ঠিক আছে। তাই সই। তেমনি করেই তাকে ঘরের মধ্যে রেখে তারা বাইরে থেকে দরজায় শেকল দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেই পোড়োবাড়ির পরিত্যক্ত একটা ঘরে। মনে আছে সদানন্দের জীবনে এর পরে অনেক কাণ্ডই ঘটেছে। কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনার যেন আর তুলনা নেই। যে-মানুষ একদিন আসামী হয়ে কাঠগড়ায় উঠবে, তার শুরু অনেক দিন আগে থেকেই অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে সে এই পৃথিবীটাকে নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে এইটেই ছিল তার সব চেয়ে বড় সমস্যা। অথচ সবাই চাইতো তাদের সঙ্গেই সদানন্দ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিক। সেখানেই তো ছিল তার যত বিরোধ। সেই বিরোধটাই সেইদিন প্রথম মোটা আকারে ধরা পড়লো সেই কালীগঞ্জের পোড়ো-বাড়িটাতে।

হঠাৎ কখন কে জানে ঝনাৎ করে একটা শব্দ হয়ে দরজাটা খুলে গেল। আর খুলে যেতেই সদানন্দ দেখলে একগাদা পুলিস তার সামনে। তারা সবাইকে ধরে ফেলেছিল। এবার তাকেও তারা ধরে ফেললে। সদানন্দ কোনও প্রতিবাদ করলে না। পালাতেও চেষ্টা করলে না। যে-অপরাধে আর পাঁচজন ধরা পড়লো, তার অপরাধও সেই একই। এর জন্যে তার কৈফিয়ৎ চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কেবল শাস্তির প্রশ্নই ওঠে। সেই ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়েই যেন সদানন্দর ওপর শেষ বিচারের দণ্ড নেমে এলো। যেমন করে দণ্ড নেমে এসেছিল

নবাবগঞ্জে তাদের নিজেদের বাড়িতে।

তারপর ছ'জনকেই হাতে হাত-কড়া পরানো হলো। পুলিসের দল আসামীদের সকলকে নিয়ে সদরে চালান দিয়ে দিলে।

জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি আর এত রোমাঞ্চকর ভাবে ঘটলো যে কাউকে যেন কিছু ভাবতেও সময় দিলে না।

প্রকাশ চণ্ডীমণ্ডপ থেকে একেবারে সোজা রান্নাবাড়ির দিকে ছুটলো। নয়নতারার রাতটা যেমন কাটে নি, দিনটাও তেমনি না-কাটবার কথা। অন্য দিনের মত আবার তার রাত আসবে। দিনের পর রাত আসার নিয়ম আছে বলেই আসবে। অথচ রাতের কথা ভাবতেই নয়নতারার যেন আতঙ্ক হলো! আবার কি রাত আসবে? আবার কি সেই পুনরাবৃত্তি? আবার সেই অপমান! আবার সেই পোড়া মুখ ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হবে! সে-কথা ভাবতেও যেন ভয় লাগছিল নয়নতারার।

অথচ নতুন বউ সে এ-বাড়িতে। এ-ব্যাপারে প্রতিবাদ করা নতুন বউ-এর ধর্ম নয়। তার ধর্ম সমস্ত কিছু মান-অপমান অনাদর-আঘাত মুখ বুঁজে হজম করা। তোমাকে সবাই যা-খুশী বলুক তোমার কর্তব্য চুপ করে থাকা। এখানে আসার আগে মা তাকে এই কথাই শিখিয়ে দিয়েছিল। তার মনে হলো মা যদি এখন বেঁচে থাকতো তো তাকে নয়নতারা জিজ্ঞেস করতো—মা, তুমি যদি আমার মত অবস্থায় পড়তে তো তুমি কী করতে? তুমিও কি আমার মত সব কিছু মুখ বুঁজে সহ্য করতে? এমনি করে সমস্ত সহ্য করেই তুমি তোমার নারী-ধর্ম পালন করতে?

কিন্তু মা যখন নেই তখন এ-প্রশ্ন কাকেই বা সে করবে আর কে-ই বা এর উত্তর দেবে?

হঠাৎ বাইরে মামাশ্বশুরের গলা শোনা গেল—দিদি শুনেছ, সব্বোনাশ হয়েছে—

শাশুড়ী সারাদিন খায় নি। তবু একটার পর একটা সর্বনাশ হয়ে হয়ে চরম সর্বনাশের গুরুত্বও বোধ হয় তার শাশুড়ীর কাছে তখন কমে গিয়েছিল। কিম্বা হয়ত সব রকম সর্বনাশের জন্যেই মনটাকে কঠোর করে নিয়েছিল তার শাশুড়ী।

নিরুদ্বেগ গলায় প্রীতি বললে—কী?

প্রকাশ বলল—সদার খোঁজ পাওয়া গেছে—

—পাওয়া গেছে? কোথায়? কোথায় ছিল সে?

প্রকাশ বললে—এই এখ্খুনি রেল-বাজারের দারোগাবাবু এসেছিল, পুলিস-টুলিস নিয়ে। সদাকে পুলিস এ্যারেস্ট করেছে। সে নাকি স্বরূপগঞ্জের ট্রেন-ডাকাতির দলের সঙ্গে ধরা পড়েছে—

—ট্রেন ডাকাতি? বলছিস কী তুই? সদা করবে ডাকাতি?

—আমিও তো শুনে তাই অবাক! এখন কী করবো তা বুঝতে পারছি না। সদা হঠাৎ ডাকাতিই বা করতে যাবে কেন? স্বরূপগঞ্জের ট্রেনে তো স্বদেশীরা ডাকাতি করেছিল শুনেছি। সে মাঝখান থেকে তাদের সঙ্গে জুটল কী করে? প্রীতির তখনও বিশ্বাস হলো না কথাটা।

বললে—তুই ঠিক শুনেছিস তো? আমার ছেলে ডাকাতি করবে? আমার ছেলের কি টাকার অভাব যে ডাকাতি করতে যাবে সে? তাহলে এখন কী হবে?

প্রকাশ বললে—এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। জামাইবাবু নেই, এই সময়েই কিনা যত ঝামেলা। আমি একলা মানুষ। কর্তাবাবুকে দেখবো, না সদাকে সামলাবো! কী করি বল দিকিনি এখন?

প্রীতি কথাটা শুনে সেখানেই বসে পড়লো। বললে—আমি সারাদিন খাই নি, আমার মাথাটা ঘুরছে, আমি কিছু ভাবতে পারছি না—

—তা আমিই কি ছাই কিছু ভাবতে পারছি! তা থাক গে, তুমি খেয়ে নাও, বুঝলে? খেলে তবু একটু বুদ্ধি বেরোবে। তা বাবাজীর কাছে একবার যাবো? দেখবো বাবাজী কী বলে?

প্রীতি বললে—তুই আর হাসাস নি! থাম্। তা হ্যাঁরে, তাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা যায় না?

প্রকাশ বললে—আমি তো জীবনে কখনও জামিন-টামিন হই নি—কে জামিন দাঁড়াবে?

—তা পুলিসকে টাকা দিলে পুলিস তো কেস ছেড়েও দেয়। কত টাকা লাগে একবার জিজ্ঞেস করে আয় না। পুলিস তো আমাদের হাত-ধরা লোক।

প্রকাশ বললে—পুলিস তো চলে গেছে। খবরটা দিয়েই চলে গেছে—

প্রীতি বললে—তুই তাহলে একবার এখুনি রেল-বাজারে যা ভাই। হয়ত রাস্তাতেই তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—

—তাহলে টাকা দাও।

—কত টাকা দেব?

প্রকাশ বললে—পাঁচশো, হাজার, যা আছে তোমার কাছে দিয়ে দাও, ডাকাতির মামলা তো সস্তায় হবে না—

প্রীতি আর দাঁড়ালো না। তার শোবার ঘরেই সিন্দুক থাকে। সিন্দুকের তলায় গোছা-গোছা নোট থাকে। একগাদা নোট বার করে গুনে বাইরে নিয়ে এল।

—কত আছে এতে?

—চারশো তিরিশ টাকা।

—এতে কি হবে?—

ওতে যা আছে এখন তাই নিয়ে খোকাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তো আয়। তারপর তোর জামাইবাবু এলে বেশি দিতে পারবো।

প্রকাশ টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল।

ঘরের ভেতরে নয়নতারার কানে সব কথাগুলোই গিয়েছিল। শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে গেল সে। এ কী হলো? এমন তো হবার কথা নয়। এ কোথায় কার সঙ্গে তার বিয়ে হলো! আস্তে আস্তে সে নিজের ঘর থেকে বেরোল। তারপর পায়ে পায়ে রান্নাবাড়ির কাছে এল।

—মা!

প্রীতির কানে গেছে কথাটা।

—কী বউমা? কিছু বলবে?

নয়নতারা বললে—কী হয়েছে মা? আপনারা কী বলাবলি করছিলেন?

—ও, তুমি শুনেছ সব?

নয়নতারা বললে—শুনেছি। এত বড় একটা কাণ্ড হলো, বাবাকে একটা চিঠি দেব?

—চিঠি? প্রীতি যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—চিঠি দিয়ে আর কী হবে বউমা, এই তো তত্ত্ব নিয়ে তোমার বাপের বাড়ির লোকেরা সব গেল। এখনও বোধহয় তারা কেষ্টনগরেই পৌঁছোয় নি। তারা তো দেখেই গেছে তুমি ভালো আছো—

নয়নতারা বললে—মা, আমার কথা নয়। বাবা যদি শেষকালে বলেন, ওঁর এত বড় একটা বিপদ গেল আর তোরা কেউ আমায় একটা খবরও দিলি নে তখন? শেষকালে তো আমাকেই দোষ দেবেন।

প্রীতি বললে—তাঁকে বুড়ো মানুষকে আবার কেন মিছিমিছি ভাবাবে? তিনি তো সেখানে বসে এর কিছু সুরাহা করতে পারবেন না। উল্টে মিছিমিছি তাঁর উদ্বেগ বাড়ানো। আর যা করবার তা তো আমরা এখান থেকেই করতে পারবো—

নয়নতারা বললে—আমার মনে হচ্ছিল বাবাকে খবরটা দিলে ভালো হতো, শেষে জানতে পারলে আমার ওপর রাগ করবেন—

প্রীতি বললে—তাহলে আর দুটো দিন সবুর করো বউমা। তোমার শ্বশুর তো রাণাঘাট থেকে পরশু ফিরছেন, তিনি এলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা-হয় একটা কিছু করা যাবে। আর এ তো সাজানো মামলা বউমা! বোঝাই যাচ্ছে। সদার মত ছেলে ডাকাতি করতে যাবে এ কেউ বিশ্বাস করবে? তুমিই বলো না, তুমিও তো তাকে দেখেছ। আর কীসের জন্যে ডাকাতির মধ্যে থাকবে সে? তার এত কীসের টাকার দরকার পড়লো যে ডাকাতির মধ্যে যাবে সে?

নয়নতারা শাশুড়ীর কথার যুক্তি হয়ত বুঝলো, হয়ত বা বুঝলো না। আর যুক্তিটা যত ধারালোই হোক, শাশুড়ীর কথার ওপরে কথা বলা কি তার মানায়?

নয়নতারা আবার নিঃশব্দে তার নিজের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

সকালবেলা নিখিলেশ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। বাইরে থেকে ডাক এলো—নিখিলেশ, নিখিলেশ—

শেষ রাত্রের ঘুম। আসলে ঘুম নয়, তন্দ্রা। গলার আওয়াজটা শুনেই নিখিলেশ ধড়মড় করে উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। পণ্ডিতমশাই এত সকালে তাকে ডাকছেন কেন? আর এত কীসের তাড়া যে একেবারে তার বাড়িতে এসে?

বাইরে বেরিয়ে আসতেই নিখিলেশ দেখে একেবারে জামা-কাপড়-জুতো পরে পণ্ডিতমশাই দাঁড়িয়ে আছেন।

—তুমি ঘুম থেকে উঠেছ নিখিলেশ? আমি ভাবলাম তুমি হয়তো এখনও ঘুমোচ্ছ।

নিখিলেশ বললে—কাল অনেক রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা থেকে—

পণ্ডিতমশাই বললেন—বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি নিখিলেশ। আমি সকালের গাড়িতেই একবার নবাবগঞ্জে যাচ্ছি, তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হতো।

—নবাবগঞ্জে? নয়নতারার শ্বশুরবাড়ীতে? হঠাৎ?

পণ্ডিতমাশাই বললেন—একটা বড় বিপদের সঙ্কেত পেলাম নিখিলেশ। বিপিনরা নবাবগঞ্জে গিয়েছিল শীতের তত্ত্ব নিয়ে, সে তো তুমি জানো!

—তার অসুখ-বিসুখ নাকি?

—না তা নয়, বিপিনরা তো রেল-বাজার স্টেশন হয়ে ফিরছিল। স্টেশনে এসে দেখে একদল পুলিস ডাকাতদের একটা দলকে প্ল্যাটফরমে ধরে নিয়ে অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্যে। স্বরূপগঞ্জের ট্রেন ডাকাতির কথা তোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে। খবরের কাগজে পড়েছিলুম।

—হ্যাঁ, সেই তাদের দলটাকেই পুলিস নাকি কালীগঞ্জের একটা বাড়ি থেকে ধরে কলকাতায় চালান দিচ্ছে। কলকাতা থেকে তার জন্যে বিশেষ পুলিস এসেছিল। তা সেই ডাকাত দলের মধ্যে নাকি আমার জামাইকেও তারা দেখেছে!

নিখিলেশ চমকে উঠলো—বলছেন কী? নয়নতারার স্বামী? সেও ডাকাতির মধ্যে জড়িয়ে ছিল নাকি?

—তা ওরা তো বললে—জামাইবাবুকে কোমরে নাকি দড়ি বাঁধা অবস্থায় দেখেছে।

নিখিলেশের বিশ্বাস হলো না। বললে—না না, তা কখনও হতে পারে? বিয়ের সময় আমি তো সদানন্দবাবুকে দেখেছি। কথাও বলেছি, সে রকম তো কিছু মনে হয় নি। আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। হয়ত অন্ধকার প্ল্যাটফরমে কাকে দেখতে কাকে দেখেছে। অন্য কাউকে জামাইবাবু বলে ভুল করেছে—

তারপর একটু ভেবে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—আর তাছাড়া বিপিনরা যখন তত্ত্ব নিয়ে নবাবগঞ্জে গিয়েছিল তখন জামাইবাবুকে বাড়িতে দেখে নি?

পণ্ডিতমশাই বললেন—না, তাইতেই তো আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে! মেয়েটাকে তবে কি আমি না জেনে-শুনে জলে ফেলে দিলুম নিখিলেশ? ওরা শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করেছে জামাইবাবু কোথায়, তিনি এক রকম উত্তর দিয়েছেন, আবার বেয়াই মশাইকে জিজ্ঞেস করেছে, তিনি আবার তার উল্টো উত্তর দিয়েছেন, আমার মেয়ে আবার আর এক রকম উত্তর দিয়েছে। আমি যেদিন নয়নতারাকে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে গিয়েছিলুম সেদিন সকলকেই বাড়িতে দেখলুম, জামাইবাবাজীকে তো কই দেখি নি। তারপর আমার গৃহিণী যখন মারা যান তাঁর শ্রাদ্ধের সময় নয়নতারা এখানেই ছিল, নয়নতারার মামাশ্বশুর এসেছিল নিমন্ত্রন রক্ষা করতে কিন্তু জামাইবাবাজী তো একবারও আসে নি—

কথাটা নিখিলেশকেও ভাবিয়ে তুললো। এর কী জবাব সে দেবে তা বুঝতে পারলে না।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—এই সব কথা আমার এখন মনে পড়ছে নিখিলেশ। আগে এসব ভাবিও নি। কাল অনেক রাত্রে বিপিনদের কাছে ঘটনাটা শুনে ভালো ঘুম হয় নি। তখন ট্রেন থাকলে তখনই নবাবগঞ্জে চলে যেতাম। কিন্তু সকালবেলার ট্রেন, ভাবলাম একলা কী করে যাই, তাই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথাটা মনে উদয় হলো। তুমি যাবে?

—নিশ্চয় যাবো, আপনি স্টেশনের দিকে যান। আমি তৈরি হয়ে নিয়ে এখ্খুনি বেরোচ্ছি—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—আমি তাহলে এগোই, তুমি দেরি কোরো না—

বলে স্টেশনের দিকে চলতে লাগলেন। কেষ্টনগরে তখন ভালো করে রোদ ওঠে নি। ফার্স্ট ট্রেনটা ধরলে রেল-বাজারে বেলা দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। সেখান থেকে যদি একটা সাইকেল-রিক্শা পাওয়া যায়, তাহলে আর দেরি হবে না। ঘণ্টা দুয়েকেই মধ্যেই একেবারে নয়নতারার শ্বশুরবাড়ি।

খানিক দূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখলেন একবার। বাজারের টিনের চালের বাড়িটার একেবারে ওধারে যেন মনে হলো নিখিলেশ হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে। সারা রাত ঘুম হয় নি। মাথাটা কী রকম করছিল। তাড়াতাড়ি হেঁটে আসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ততক্ষণে নিখিলেশ পণ্ডিতমশাই-এর নাগাল পেয়ে গেছে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—এসো, তুমি তো তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছ—খবরটা শোনার পর থেকে আমার মনটা কেমন করছে নিখিলেশ। আমি তো অনেক দেখেশুনেই বিয়ে

দিয়েছিলাম নয়নতারার। তোমরা তো জানো। নয়নতারার মত মেয়ের পাত্রের অভাব হবার কথা নয়। ওর রূপ গুণ দেখে কত জায়গা থেকে কত সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সবগুলো নাকচ করে এখানেই বিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বনেদী বংশ, প্রচুর অর্থ। কিন্তু শেষকালে এ কী হলো নিখিলেশ!

নিখিলেশ বললে—আপনি কিছু ভাববেন না, আমি তো যাচ্ছি, গিয়েই সব দেখতে পাবো—বলতে বলতে দুজনেই স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে উঠলো।

একদিন বিয়ের আগে নয়নতারা এই দিনগুলোর কথাই কল্পনা করতো। তখন সবে এখানে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল। বাবা-মার কথাবার্তার টুকরো কথাগুলো মাঝে মাঝে কানে আসতো। নবাবগঞ্জের জমিদার, অনেক ধন-সম্পত্তি তাঁদের। তাঁদের একমাত্র ছেলে। স্বাস্থ্যবান সুন্দর সুপুরুষ। বাবা নিজে গিয়ে দেখে এসে মাকে সব বর্ণনা দিচ্ছিল। শুনতে শুনতে নয়নতারার চোখের সামনে যেন নবাবগঞ্জে তার ভাবী শ্বশুরবাড়ীর চেহারাটা ভেসে উঠছিল। কল্পনায় সে চেহারা দেখে নিজের মনেই একটা নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল সে। বড় বড় ঘর, মস্ত বড় দু'মহলা বাড়ি, আর রাজপুত্রের মত একজন পুরুষ তার স্বামী।

মা জিজ্ঞেস করেছিল—সংসারে কে কে আছে?

বাবা বলেছিল—ওই তো, বাবা আর মা, আর এক বুড়ো ঠাকুরদাদা! খুব সচ্ছল সংসার। চৌধুরী মশাই-এর মত মানুষ হয় না। বললেন—আমার ওই একটিই সন্তান, ওর জন্যেই এই সংসার করা—

মা জিজ্ঞেস করেছিল—পাত্রের বোন-টোন কেউ নেই বুঝি?

—না।

মা শুনে খুব খুশী হয়েছিল—ভালোই হয়েছে, নয়নকে আর ননদ-কাঁটা সহ্য করতে হবে না—

তারপর মা একটু পরে জিজ্ঞেস করেছিল—তা পাত্রকে দেখতে কেমন? আমার নয়নের সঙ্গে মানাবে তো?

বাবা বলেছিল—দেখতে নয়নতারার চাইতেও ভালো, যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপ। যখন বিয়ে করতে আসবে লোকে বলবে—হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই জামাই-এর মত জামাই করেছে বটে—

এ-সব কথা শুনে নয়নতারা সেদিন মনের মধ্যে কল্পনার একটা প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল। এরকম কল্পনার প্রাসাদ অনেকেই বিয়ের আগে গড়ে তোলে। শুধু বিয়ে কেন, মানুষ তার সব ব্যাপারেই একটা অলৌকিক আশা করতে ভালবাসে। মনে মনে আশার একটা সৌধও গড়ে তোলে। কিন্তু নয়নতারার মত এমন করে বুঝি কারো আশা ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে নষ্টও হয়ে যায় না।

রাত তখন বেশি হয় নি। সংসারে এত বড় একটা বিপর্যয় হয়ে গেল অথচ সংসারে দৈনন্দিন কাজকর্মের কোনও ব্যতিক্রম হলো না। সকলের সব কাজ ঠিক ভাবেই সমাধা হলো। নয়নতারাকেও খেতে ডাকতে এল গৌরী। এ যেন নিয়মরক্ষে। রাত্রে খেতে হয় বলেই খাওয়া।

প্রীতি তখনও নিজের ঘরে শুয়ে ছিল। গৌরীকে ডাকলে। জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ-রে, বউমা খেয়েছে?

গৌরী বললে—খেতে চাইছিল না, আমি জোর করে খাইয়ে দিয়েছি। তুমি খাবে?
প্রীতি বললে—না।
গৌরী বললে—না খেলে শরীর টিকবে কেন? খেয়ে নাও।
প্রীতি বললে—তুই আর বকবক্ করিস নি আমার কানের কাছে, যা,—
কিন্তু গৌরীও ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—না, তোমাকে খেতেই হবে। একে বাড়িতে এই কাণ্ড, এর মধ্যে তুমি বাড়ির গিন্নী, তুমি যদি অসুখে পড়ে যাও, তখন তোমার সংসার কে সামলাবে শুনি? আপন বলতে আর কে আছে তোমার যে তোমাকে সেবা করবে?
শেষ পর্যন্ত প্রীতি যা পারে মুখে পুরে দিয়ে আবার উঠে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ শুতে পারলে না। যেন পিঠে কাঁটা ফুটতে লাগলো। আস্তে আস্তে উঠে বউমার ঘরে গেল। ঘরের দরজা খোলা ছিল। নয়নতারা তখনও ঘুমোয় নি। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে। যেন অনেক কথা রয়েছে দু'জনেরই, কিন্তু বলবার ক্ষমতা নেই কারো। শেষকালে অনেক কষ্টে শাশুড়ীর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল—
—বউমা, তুমি খেয়েছ?
নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, খেয়েছি, আপনি?
শাশুড়ী বললে—আমিও খেলাম বউমা। খোকা কোথায় রইল, সে খেলে কি খেলে না তার ঠিক নেই, কিন্তু আমি মা হয়ে খেলাম। আমার গলা দিয়ে ভাত গললো। আমি মা নই বউমা, আমি রাক্ষুসী। কিন্তু আমার কথা থাক, আমি তোমার কথাই কেবল ভাবছি বউমা। আমি কেন মরতে তোমাকে বউ করে নিয়ে এলাম বউমা, তোমাকে আমি কত কষ্ট দিচ্ছি, অন্য কোথাও বিয়ে হলে তোমার কত সুখ হতো। তুমি কত সুখে থাকতে সেখানে। কেন আমি এ-পাপ করতে গেলাম! এর সব দোষ আমার বউমা, আর কারো নয়, আমার। আমার ওপর তুমি রাগ করো বউমা, রাগ করে আমাকে তুমি কিছু বলো, একটু গালমন্দ দাও, তাতে যদি আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাতে যদি আমার কিছু শিক্ষা হয়। এর বেশি আমি আর কী বলতে পারি বলো বউমা? তোমার যা-কিছু কষ্ট তার জন্যে আমিই দায়ী বউমা, আমাকে তুমি 'মা' বলেও আর ডেকো না—
বলতে বলতে শাশুড়ী যেন ভেঙে পড়লো।
নয়নতারা শাশুড়ীকে ধরে ফেলে বিছানার ওপর বসিয়ে দিলে। বললে—আপনি চুপ করুন মা, আপনি স্থির হোন্—
—না বউমা, আমাকে অমন করে মা বলে ডেকো না আর। আমি তোমার মায়ের কাজ করি নি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো বউমা।
নয়নতারা বললে—মিছিমিছি আপনি কেন ও-সব কথা বলছেন মা, ওতে আপনার ছেলের অকল্যাণ হবে—
—ছেলে? তুমি আমার ছেলের কথা বললে? যে ছেলে নিজের বাপ-মার কথা ভাবলে না, নিজের বিয়ে করা বউ-এর দিকে ফিরে চাইলে না, তাকে আমি ছেলে বলবো? সে আমার ছেলে নয় বউমা, সে আমার শত্রু। আমি আমার শত্রুকে পেটে ধরেছিলুম বউমা, সে-ই আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছিল—
নয়নতারা শাশুড়ীর হাত দুটো ধরলে—আপনি ঘুমোতে যান মা, সারা দিন আপনার কষ্ট গেছে, এর ওপর রাত জাগলে আপনার শরীর ভেঙে পড়বে—চলুন আমি আপনাকে আপনার ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসছি।

প্রীতি উঠলো। বউমা তাকে আদর করছে এটা তার বড় ভালো লাগলো। এমন লক্ষ্মী বউ পেয়েও কিনা খোকা তার মর্যাদা দিলে না। হাতের লক্ষ্মী এমন করে পায়ে ঠেললে কি তারই ভালো হবে? তা যদি হয় তাহলে তো ভগবানও মিথ্যে, ভগবানের পৃথিবীতে এই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র তাও তো মিথ্যে।
—বউমা!
নয়নতারা শাশুড়ীকে তাঁর নিজের ঘরের ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—বলুন মা—
—তোমার যদি রাত্তিরে একলা শুতে ভয় করে তো তুমি আজ আমার কাছে শোবে? তোমার শ্বশুর তো বাড়িতে নেই!—
নয়নতারা বললে—না মা, আমার একলা শুতে ভয় করবে না—
—তাহলে তুমি যদি বলো, আমি তোমার ঘরে গিয়েও শুতে পারি—
নয়নতারা শাশুড়ীকে তাঁর ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললে—না মা, তার দরকার হবে না, আপনি কিছু ভাববেন না, আমার একলা শোওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু প্রথম দিনটায় একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম—
শাশুড়ী তখন বিছানায় শুয়ে আর নয়নতারা তার সামনে দাঁড়িয়ে।
নয়নতারা বললে—আমি আলো নিবিয়ে দেব মা?
—না বউমা, তোমাকে কিছু করতে হবে না। গৌরী আছে, খেয়ে উঠে সে-ই সব করে দেবে।
নয়নতারা বললে—তাহলে আমি আসি মা?
—হ্যাঁ এসো। যদি তোমার ঘুম না আসে তো আমাকে ডেকো, বুঝলে? নয়নতারা তার নিজের ঘরের দিকেই চলে আসছিল। শাশুড়ী আবার ডাকলে—বউমা,—
নয়নতারা আবার ফিরলো। বললে—আমাকে ডাকছেন মা?
শাশুড়ী বললে—শোন বউমা, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি তোমাকে। খোকাকে তো জেলে ধরে নিয়ে গেছে, কবে ফিরবে তাও জানি না। আর কোনও দিন ফিরবে কিনা তারও ঠিক নেই। প্রকাশ তো গেছে থানায়, টাকাও নিয়ে গেছে, এখনও তো ফিরলো না। তোমার শ্বশুরও বাড়িতে নেই, তুমি আমার এই চাবিটা তোমার কাছে রেখে দাও—
—চাবি? আমি চাবি নিয়ে কী করবো মা?
—তুমি এ-বাড়ির বউ, আমি মারা গেলে তখন তো তোমাকেই এ সংসারের ভার নিতে হবে বউমা! তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই যার হাতে সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে যেতে পারি।
নয়নতারা বলে উঠলো—আপনি কী-সব বলছেন মা? আপনার কী হয়েছে যে আপনি এই সব কথা এখন বলছেন? আমি চাবি নেব না—
বলে একটু দূরে সরে এল। কিন্তু শাশুড়ী ছাড়লে না। নিজের আঁচল থেকে চাবির গোছটা খুলে জোর করে নয়নতারার হাতে পুরে দিলে। বললে—তুমি এটা নিজের কাছে রাখো বউমা, আমি বলছি তোমাকে, আমি তোমার গুরুজন, আমার কথা অমান্য করতে নেই, তুমি রেখে দাও—
নয়নতারা চাবিটা নিলে। নিয়ে বললে—কিন্তু কেন আপনি অত ভাবছেন, মা। আপনার তো কিছুই হয় নি, আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন—
শাশুড়ী বললে—যদি তেমন কিছু না-হয় তো ভালোই, তখন তোমার কাছ থেকে না-হয় আবার আমি চাবি চেয়ে নেব। কিন্তু আমি যা বলছি তোমাকে তা মিথ্যে নয় বউমা।

তুমি জানো না, আমার সব সময়ে বুক ধফ-ফড় করে, আমি মাঝে মাঝে টলে পড়ে যাই, কেউ জানে না। যদি তেমন কিছু বিপদ হয় তখন আমার এ-সংসার তুমি ছাড়া আর কে দেখবে বউমা। এ-সংসারের হাতা-বেড়ি-খুন্তিটা পর্যন্ত যে আমার মায়ার জিনিস। যখন যেখানে গেছি কিনে এনেছি। তুমি জানো না, এ আমার বড় সাধের সংসার বউমা, আমার বড় সাধ ছিল ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি ঘরে বউ আনবো, এমন বউ আনবো যে লক্ষ্মীপ্রতিমার মত বাড়ি আলো করে রাখবে। নাতি-নাতনীতে বাড়ি একবারে ভরে যাবে। সে-সব একটা সাধও আমার মিটলো না, বোধ হয় এ-সাধ আর জীবনে কখনও মিটবেও না—

হঠাৎ গৌরী এসে ঢুকলো। বললে—কী বউমা, তুমি এখানে?

নয়নতারা বললে—মা আমাকে এই চাবিটা দিলেন—

প্রীতি বললে—গৌরী, কাল সকালে ভাঁড়ারের চাবি বউমার কাছ থেকে চেয়ে নিবি, কাজ হয়ে গেলে আবার বউমাকে ফিরিয়ে দিবি—

গৌরীও অবাক। বললে—কেন বউদি, তুমি নিজের কাছে চাবি রাখবে না?

নয়নতারা বললে—ওই দেখ না গৌরী পিসী, মা সব কী অলুক্ষণে কথা বলছেন—বলছেন উনি আর বাঁচবেন না, আমার হাতে জোর করে চাবির গোছা গছিয়ে দিয়েছেন—

প্রীতি বললে—না রে গৌরী, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না রে! এখন থেকে বউমাই তোদের সংসার চালাবে—বউমার কাছ থেকেই তোরা চাবি চেয়ে নিস্—

গৌরী পিসী প্রীতির দিকে চেয়ে ধমক্ দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি থামো তো বউদি, সারাদিন না খেয়ে খেয়ে তোমার এই রকম হয়েছে, তখন কত বললুম খেয়ে নাও খেয়ে নাও, তা তো শুনলে না। এখন বুক ধড়ফড় তো করবেই। আর কথা বলতে হবে না, এখন ঘুমোতে চেষ্টা করো, আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি—

তারপর নয়নতারার দিকে চেয়ে বললে—তুমিও শুয়ে পড়ো গে যাও বউমা, তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবে? আমি তো আছি। আমি আজ এই ঘরের মেঝেতেই বিছানা করে নেব। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো গে—

নয়নতারা বললে—কিন্তু এই চাবি?

গৌরী পিসী বললে—চাবিটা তোমার কাছেই রেখে দাও, একটু সাবধানে রেখো। ওই চাবির মধ্যেই এ-বাড়ির সব—কাল বিষ্টুর মা এলে আমি তোমার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নেব—যাও—

নয়নতারা চাবিটা নিয়ে তার শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সমস্ত রাতই কেমন যেন আধ-ঘুম আধ-জাগা অবস্থায় কাটলো নয়নতারার। সারাটা বাড়ি নিস্তব্ধ। এই সব নিস্তব্ধতার মধ্যে এতদিন কেবল কেষ্টনগরের কথাই মনে পড়তো তার। কেবল মনে পড়তো বাবার কথা। বাবার কথা আর তার সঙ্গে মার কথা। বিয়ের আগে মা কী বলতো, মা কী করতো।

কিন্তু সেদিন আর তা মনে পড়লো না। শুধু মনে পড়তে লাগলো নবাবগঞ্জের এই বাড়িটার কথা। তার এই শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরের কথা, শাশুড়ীর কথা। যেন একটু মায়া হতে লাগলো শাশুড়ীর জন্যে। সত্যিই তো, তাদের ছেলের অপরাধের জন্যে শ্বশুর-শাশুড়ীর কী দোষ! প্রথম দিন থেকে তারা তো এতটুকু অনাদর করে নি নয়নতারাকে। বরং নয়নতারা

কীসে খুশী হয় সেই চেষ্টাই করে এসেছে বরাবর।

অন্ধকারে শুয়ে-শুয়েই এক সময়ে মনে হলো যেন ভোর হচ্ছে। দূর থেকে মুরগীর ডাক কানে এলো। সত্যিই বোধ হয় সকাল হয়ে এলো।

নয়নতারা আস্তে আস্তে উঠলো। উঠে ঘরের বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। পাশের শাশুড়ীর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। সকালবেলা ক'টার সময় থেকে বাড়ির কাজ শুরু হয় তাও সে জানে না, অথচ তার কাছেই ভাঁড়ারের চাবি।

নয়নতারা আবার তার নিজের ঘরের দিকে চলে আসছিল হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল—উঠে পড়েছ বউমা?

নয়নতারা পেছন ফিরে দেখল, গৌরী পিসী।

গৌরী পিসী বললে—দাও চাবিটা দাও, দিদি এখনো ওঠে নি, ঘুমোচ্ছে—

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—মা কেমন আছে এখন?

গৌরী পিসী বললে—সারা রাতের পর এখন একটু ঘুমোচ্ছে—তুমি তৈরী হয়ে নাও, বিষ্টুর মা এখুনি এসে উনুনে আঁচ দেবে। এখন থেকে ভাঁড়ার বের না করলে আবার ওদিকে দেরি হয়ে যাবে—

বলে চাবি নিয়ে তার নিজের কাজে চলে গেল। নয়নতারা গা ধুয়ে কাপড় কেচে স্নান করে যখন রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালো, তখন দেখলে বিষ্টুর মা আর গৌরী পিসী ততক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেলেছে।

নয়নতারা বললে—আমাকে কিছু কাজ দাও পিসী, একলা তুমি সব পারবে না, আমি তৈরি হয়ে এসেছি—

গৌরী পিসী বললে—তুমি তোমার ঘরে যাও বউমা, আমি তোমার ঘরে জলখাবার দিয়ে আসছি—

নয়নতারা বললে—কেন, আমার এখন ক্ষিধে পায় নি, তোমার যদি কিছু কাজ থাকে বলো—আমার তো কোনও কাজ নেই, চুপ করে ঘরে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না—

গৌরী পিসী বললে—বসে থাকতে ভালো লাগছে না বলে তুমি এই ধোঁয়ার মধ্যে বসে থাকবে? তা যদি ভালো লাগে তো এই পিঁড়িটা নিয়ে বোস।

গৌরী পিসী আর বিষ্টুর মা দুজনে দু'হাতে কাজ করছে। নয়নতারা বসে বসে দেখতে লাগলো সব। জলখাবার গেল চণ্ডীমণ্ডপে। যাবে দোতলায় কৈলাস গোমস্তার কাছে। কর্তাবাবুর অসুখ তাই তাঁর কাছে যাওয়ার কথা ওঠে না। তারপর দীনু আছে, বংশী ঢালীরা আছে। জলখাবারের পাটের পর ভাত ডাল তরকারি। বিষ্টুর মা রাঁধছে আর তরকারি কুটছে গৌরী পিসী। সারা বাড়ির লোক খাবে। অথচ রান্না করার লোক কম। প্রতিদিন এমনি করেই চলে এসেছে, এমনি করেই হয়ত আবহমান কাল ধরে চলবে। নয়নতারাও এদেরই একজন হয়ে গেছে এখন। তার জীবনও একদিন এই সংসারের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

হঠাৎ হইচই আওয়াজ করতে করতে প্রকাশ মামা এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। বললে—কই, দিদি কোথায়? দিদি—দিদি—

নয়নতারা মামাশ্বশুরের গলার শব্দ পেয়েই নিজের শোবার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নিলে। কিন্তু তার আগেই প্রকাশ মামা একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির।

গৌরী পিসী বললে—বউদির শরীর খারাপ, শুয়ে আছে।

—শরীর খারাপ? এই সময়ে কিনা শরীর খারাপ করে বসলো দিদি? বলতে বলতে

দিদির ঘরে গিয়ে হাজির। চেঁচামেচিতে প্রীতির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

বললে—কী হলো? খোকার খবর পেলি কিছু?

প্রকাশ মামা বললে—খোকার খবর না নিয়ে কি এসেছি? কিন্তু তুমি কেন এই কাজের সময় শরীর খারাপ করে বসলে বলো দিকিনি? এই সময়েই কিনা শরীর খারাপ করতে হয়? আসলে খাওয়াটা তোমার কম হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি—

—আমার শরীরের কথা থাক, খোকার খবর কিছু পেলি কিনা তাই বল্।

প্রকাশ বললে—আমাকে শিগগীর শিগগীর খাবার দিতে বলো। আমি আবার এখনি কলকাতায় যাবো। এই কলকাতা থেকে আমি আসছি এখন—

—খোকা কি কলকাতায় নাকি?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ, শুনলুম কলকাতার জেলখানায় তাকে পুলিস আটকে রেখেছে। রেল-বাজারের থানায় থাকলে এতক্ষণ তো তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতুম। কিন্তু তাকে যে কলকাতার পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। শুনে কাল সন্ধ্যেবেলাই আমি কলকাতায় চলে গেলুম। সেখানে গিয়ে আসল ব্যাপারটা সব শুনলাম।

বলে আদ্যোপান্ত যা-যা ঘটেছিল সব বলে গেল প্রকাশ মামা।

—খোকার সঙ্গে দেখা হলো তাহলে?

প্রকাশ মামা বললে—কী করে দেখা হবে? তুমি টাকা দিয়েছ?

—কেন? তুই যে চারশো তিরিশ টাকা না কত যেন নিয়ে গেলি আমার কাছ থেকে পুলিসকে দেবার জন্যে?

—সে টাকা তো কিছু গেল রেল-বাজারের পুলিসকে দিতে। তারপর আছে আমার রেলের যাতায়াতের ভাড়া, খাই-খরচ। বাকী কটা টাকা রইলো। কিন্তু কলকাতার পুলিসকে কি ওই কটা টাকায় খুশী করা যায়? আরো শ'পাঁচেক লাগবে, তার কমে তারা কথাই বলবে না—তুমি টাকাটা যোগাড় করো, আমি ততক্ষণে খেয়ে নিই, তারপর ট্রেন ধরে আবার এখুনি কলকাতায় ছুটতে হবে—

প্রীতি বললে—তা খোকাকে পুলিস ছাড়বে তো?

প্রকাশ বললে—তুমি বলছো কী দিদি? টাকা ছড়ালে কলকাতায় বাঘের দুধ পাওয়া যায়, আর খোকাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবো না? আর তা ছাড়া খোকা তো আর সত্যি সত্যি ডাকাতি করে নি। ডাকাত ভেবে তাকে ভুল করে ধরে নিয়ে গেছে। এখানেই ছেড়ে দিত, শুধু টাকার যা তোয়াক্কা! টাকাটা দিলেই সুড়-সুড় করে তারা ছেড়ে দেবে। নাও, চাবি দিয়ে তোমার সিন্দুক খোল, কটা টাকা আছে বার করো—

প্রীতি বললে—চাবি আমার কাছে নেই, বউমাকে দিয়েছি—

—কেন, চাবি বউমার কাছে কেন?

—তা এখন থেকে তো বউমাই সব দেখবে। বউমাই তো একদিন এই সংসারের গিন্নী হবে, এখন থেকে আমি তার হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছি—

প্রকাশ মামা বললে—ঠিক আছে, ততক্ষণ বউমার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে তুমি টাকাটা বার করে রাখো, আমি ততক্ষণ চান-খাওয়া করে নি—

বলে প্রকাশ মামা কুয়োতলার দিকে চলে গেল। তারপর নয়নতারা আবার শাশুড়ীর ঘরে এল।

বললে—মা—

—কী বউমা?

—কেমন আছেন এখন?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে প্রীতি বললে—জানো বউমা, খোকার খোঁজ পাওয়া গেছে। এই এখখুনি প্রকাশ এসে বলে গেল। আসলে তাকে মিছিমিছি সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছে। ডাকাতরা কালীগঞ্জের জমিদারের পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে ছিল তো, তা খোকাও সেখানে গিয়েছিল। পুলিস ভেবেছে ও-ও বুঝি তাদের দলের লোক, তাই ওকেও ধরে নিয়ে গেছে—

নয়নতারা বললে—আমি সব শুনেছি মা, কিন্তু উনিই বা কালীগঞ্জের সে পোড়ো-বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন? ডাকাতরা না হয় লুকিয়ে থাকবার জন্যে গিয়েছিল, কিন্তু উনি সেখানে কী করতে গিয়েছিলেন?

প্রীতি বললে—তুমি তো সব জানো না বউমা, সে অনেক কথা, সেই ব্যাপারের পর থেকেই তো খোকা ওই রকম হয়ে গেল। ও তো বিয়ে করতেই চায় নি ওই জন্যে—

—কিন্তু সেই কালীগঞ্জের বউ? সে কে?

প্রীতি বললে—আস্তে আস্তে তুমি সবই জানতে পারবে বউমা, পাগল আর কাকে বলে! জমিদারি রাখতে গেলে কত কী কাণ্ড করতে হয় তা তো তুমি জানো না বউমা। আমার বাবাও ভাগলপুরের জমিদার, আমি ছোটবেলা থেকে ও-সব দেখে এসেছি, আমার ও-সব শুনে কিছু মনে লাগে না। কারোরই মনে লাগে না। কিন্তু খোকা হয়েছে সৃষ্টিছাড়া ছেলে আমার—

প্রকাশ মামার ততক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গিয়েছে। জামাকাপড় বদলে নিয়ে বললে—কই দিদি, কোথায়? টাকা বার করেছ?

প্রীতি বললে—বউমা তোমার চাবিটা দিয়ে ওই সিন্দুকের তালাটা খোল তো, খুলে শ'পাঁচেক টাকা ওর মধ্যে থেকে বের করে দাও—

নয়নতারা মামাশ্বশুরকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছিল। বললে—আমি দেব?

—দাও না, দিতে দোষ কী? একদিন তো এ-সব একলা তোমাকে করতে হবে। তখন তো আমি থাকবো না।

প্রকাশ মামা বললে—হ্যাঁ, দিদি ঠিক বলেছে, এখন থেকে সব প্র্যাক্‌টিস করে নাও বউমা, একদিন এই সমস্তই তো তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে—

নয়নতারা কিছু না বলে চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুললে। তারপর সিন্দুকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে। হাতে যেন কত কী ঠেকলো। নয়নতারার মনে হলো যেন অনেক টাকা, অনেক সোনা, অনেক রূপো, অনেক হীরে, অনেক জহরৎ-এর স্পর্শে তার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। বিয়ের আগে যে রোমাঞ্চের স্বপ্ন সে দেখেছিল, তা সে পায় নি। কিন্তু তার বদলে আর এক জগতের আর এক ধরনের রোমাঞ্চের আস্বাদ পেয়ে তার বিস্ময়ের যেন শেষ রইল না। এত টাকা এদের, এত ঐশ্বর্য! কেষ্টনগরে তার মার হাতবাক্স খুলে সে দেখেছে, অনেক সময় কাজে-অকাজে তার ভেতর থেকে টাকা পয়সাও সে বার করে দিয়েছে। কিন্তু সে আর এ! এ যে অগাধ, এ যে অপরিসীম, এ যে অনন্ত! এত টাকা এ-বাড়ির কোথা থেকে এলো? সে নিজেই একদিন এই সমস্ত কিছুর মালিক হবে নাকি? এ টাকা কেমন করে উপার্জন করলে এরা? এও কি সেই কালীগঞ্জের জমিদারকে ঠকিয়ে পাওয়া, সেই কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিককে শোষণ করার সঞ্চয়? যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তার স্বামী আজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? এসে পর্যন্ত যাদের নাম সে কানাঘুষায় শুনতে আরম্ভ করেছে? এ সমস্তই কি তাদের নাকি?

—কই বউমা, পেলে না?

তাড়াতাড়িতে নয়নতারা একটা ছোট কৌটো বার করলে। আগাগোড়া রূপোর কাজ করা। ডালাটা খুলতেই দেখলে অনেক মোহর তার ভেতরে।

—ওটা না, ওটা না, বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে দেখ একটা কাঠের বাক্স আছে, সেইটে বার করো। তার ভেতরে কাগজের নোট আছে—

এবার রূপোর বাক্সটা রেখে দিয়ে বাঁ দিকে হাত ঢোকালে নয়নতারা। বাঁ দিকে বাক্স একটা নয়, অনেকগুলো ছিল। তারই মধ্যে একটা বাক্স বেছে নিয়ে ডালাটা খুললে। তাতেও অনেক টাকা থাক্-থাক্ সাজানো।

শাশুড়ী বললে—হ্যাঁ ওই বাক্সটা, ওর থেকে টাকা গুনে বার করে দাও—

এক-এক করে নয়নতারা টাকাগুলো গুনতে লাগলো। দশটাকা, পাঁচটাকা একটাকার নোট সব। অত তাড়াতাড়ি গোনা কি সোজা! কত প্রজার কত রক্ত শুষে তবে এগুলো কাগজের নোটে রূপান্তরিত হয়েছে। এই টাকা দিয়ে নয়নতারা একদিন আরো জমি কিনবে, সে-জমিতে যারা ফসল ফলাবে তাদের খাটিয়ে নয়নতারা আরো টাকা করবে। সে টাকা সবই এনে সে জমা করবে এই সিন্দুকে। সেদিন নয়নতারার শ্বশুরও থাকবে না, শাশুড়ীও থাকবে না। তখন এই টাকা দিয়ে সে তার শাশুড়ীর মত হীরে-পান্না বসানো সীতাহার গড়াবে, ছেলের বিয়ে দিয়ে নতুন বউ আনবে। তখন নয়নতারা নিজেও শাশুড়ীর মত অসুখে পড়বে, আর নতুন বউ তখন আবার এই সিন্দুকের চাবি নিয়ে আঁচলে বাঁধবে। এমনি করে এক-একজনের বাড়িতে টাকার পাহাড় জমবে, আর কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকেরা বারোয়ারিতলায় অশ্বত্থ গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করবে।

—কই বউমা, কত হলো? পাঁচশো টাকা গুনতে তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন?

প্রকাশ মামা চেঁচিয়ে উঠলো—মোটে পাঁচশো টাকা? পাঁচশো টাকাতে কী হবে শুনি? পাঁচশো টাকা তো শুধু পান খাওয়াতেই খরচ হয়ে যাবে, তার ওপর আমার যাতায়াত খাওয়া থাকার হোটেল খরচ আছে। এ কি তুমি রেল-বাজারের পুলিস-দারোগা পেয়েছ যে পাঁচশো টাকায় হবে? কলকাতার পুলিস। তারা পাঁচশো টাকায় কথাই বলবে না—

শাশুড়ী বললে—আচ্ছা বউমা, তাহলে হাজার টাকাই দিয়ে দাও পুরোপুরি। কিন্তু তোকে পুরো টাকার হিসেব দিতে হবে তা বলে রাখছি—

প্রকাশ মামা বললে—হিসেব? হিসেব কি তোমাকে আমি কখনও দিই নি যে হিসেব দেবার কথা বলছো তুমি আজ? তুমি আমাকে যত টাকা দিয়েছ তার সব হিসেব তো আমি তোমাকে পাই টু-পাই দিয়েছি। দিই নি? তুমিই বলো, দিই নি?

—আচ্ছা, পুরোপুরি হাজার টাকাই দিয়ে দাও, শেষকালে তোর জন্যে দেখছি তোর জামাইবাবুর কাছে আমাকে ধরা পড়ে যেতে হবে একদিন—

নয়নতারা হাজার টাকার নোটের গোছাটা মামাশ্বশুরের হাতে দিতেই প্রকাশ মামা সেটা পকেটে পুরে ফেললে।

দিদি বললে—ও কি রে, টাকা গুনে নে, গুনে নিলি নে?

প্রকাশ মামা তখন টাকা পেয়ে যেতে পারলে বাঁচে। বললে—টাকা গুনে কী হবে? বউমা তো নিজে গুনেছে, বউমা কি আর আমাকে ঠকাবে বলতে চাও!

বলে বাইরে চলে গেল এক দৌড়ে। টাকা পকেটস্থ হয়ে গেছে যখন তখন আর কে তাকে দেখে। এখান থেকে সোজা রেল-বাজারে যেতে হবে। সেখান থেকে প্রথম কাজ পোস্টাপিসে যাওয়া। পোস্টাপিসে গিয়ে ভাগলপুরে বউএর নামে টাকা মানি-অর্ডার করতে

হবে। সেখানে ছেলে মেয়ে-বউকে অনেকদিন কিছু পাঠাতে পারা যায় নি। তারা উপোস করে আছে এতদিন। এইবার এর থেকে অন্তত শ তিনেক সেখানে না পাঠালে ঠিক হবে না। তার পরে রাণাঘাটের সদরে রাধার বাড়িতেও অনেকদিন ঢুঁ মারে নি। সে তো টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। তারপরে অনেকদিন ফুর্তির-প্রাণ-গড়ের মাঠ করা হয় নি। একটু-আধটু ফুর্তি না করলে মন-মেজাজই বা ঠিক থাকবে কেন? জীবনে একটু ফুর্তির ছিটে-ফোঁটা না মিললো তো বেঁচে থেকে ফয়দাটা কী? কলকাতায় গিয়েই একটা [illegible] বসে মা-কালীমার্কা বোতল গলায় ঢালাই হবে প্রথম কাজ। তারপর, তারপর কলকাতা শহর। হাতে টাকা থাকলে তুমি যত ইচ্ছে ফুর্তি করো না, কেউ তোমায় বারণ করছে না।

টাকাগুলো দু'পাশের ট্যাকে জম্পেশ করে গুঁজে নিয়ে প্রকাশ মামা আকাশের দিকে চাইলে। একটা শঙ্খচিল দেখতে চেষ্টা করলে। শঙ্খচিল দেখলে যাত্রা শুভ হয়। তাহলে এই রকম পুলিস কেস হাতে আসে। এই রকম দু-চারটে পুলিস-কেস মাঝে-মধ্যে এলে তবু কিছু টাকার মুখ দেখা যায়। কিন্তু দিন কাল যা পড়েছে টাকা দুনিয়া থেকে যেন উবে যাচ্ছে!

না, আকাশের ত্রিসীমানায় একটা শঙ্খচিলের টিকিও দেখা গেল না। যে-কটা উড়ছে সব গোদা-চিল। কী আর করা যাবে! একটা জলভরা কলসী দেখলেও কাজ হতো। তাও নেই।

কিন্তু আর দেরি করা যায় না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়লো বৈঠকখানার দিকে। বৈঠকখানার দরজাটা হাট করে খোলা। এখন দরজা খোলা কেন? বাবাজী তো কখনও দরজা খুলে রাখে না।

একটু উঁকি দিয়ে দেখতেই খট্‌কা লাগলো। বাবাজী কোথায় গেল?

প্রকাশ মামার সন্দেহ আরো বাড়লো। বাবাজী নেই নাকি! তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। কোথায় বাবাজী?

ওদিকে কলকাতায় যাবার ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে। তবু জানতে ইচ্ছে হলো ব্যাপারটা কী! বাবাজীর ত্রিশূল রয়েছে, বাবাজীর খড়ম-জোড়াও রয়েছে। কিন্তু সেই ঝোলাটা নেই, বাবাজীর সেই ঝোলা। যার ভেতরে বাবাজীর গাঁজার কলকে-টলকে সব থাকতো।

কী রকম হলো! বংশী ঢালী সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। প্রকাশ মামা তাকেই ডাকলে—বংশী, বাবাজী কোথায় গেল রে?

বংশী বললে—আরে শালাবাবু, আমি তো বাবাজীকে সকাল থেকেই দেখি নি—

—তাহলে কি মাঠে গেছে? কিন্তু এই অসময়ে তো বাবাজী মাঠে যায় না—

শুধু বংশী ঢালী নয়। কেউ জানে না বাবাজী কোথায় গেল। ওপরে গিয়ে দীনুকে গিয়েও জিজ্ঞেস করলে। সে-ও কিছু জানে না। কৈলাস গোমস্তা মশাইও দেখে নি। এমন কি চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকে পরমেশ মৌলিক। সেরেস্তাদার। সেও কিছু জানে না। সবাই-ই বললে সকালবেলাও কেউ দেখে নি বাবাজীকে।

তারপর দিদিকে জিজ্ঞেস করতে প্রকাশ মামা ভেতরে যাচ্ছিল।—দিদি—দিদি—

কিন্তু তার আগেই একটা সাইকেল-রিকশায় চড়ে কারা যেন বারবাড়ির উঠোনে এসে হাজির হলো। ভালো করে চেয়ে দেখতেই অবাক হয়ে গেল প্রকাশ।

—আরে, বেয়াই মশাই যে! আসুন-আসুন—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য আর নিখিলেশ দু'জনেই নামলো রিকশা থেকে। রিক্‌শাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ পেয়ে চলে এলুম বেয়াই মশাই। এটি আমার ছাত্র, নিখিলেশ—

নিখিলেশ প্রকাশ মামাকে নমস্কার করলে। প্রকাশ মামা বললে—আপনি তো নিখিলেশবাবু, আমার ভাগ্নের বিয়ের সময় তো আপনাকে দেখেছি—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই বললেন—বৃদ্ধ বয়সে এত দূরে আসবো, তাই দেখা-শোনা করবার জন্যে একে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। তা বেয়াই মশাই কোথায়?

প্রকাশ মামা বললে—সেই তো মুশকিল হয়েছে, তিনি গতকাল রাণাঘাটের সদরে গেছেন, মুনসিফ্ কোর্টে একটা মামলা আছে, তার তদ্‌বিরে গেছেন। জরুরী ব্যাপার। অথচ কর্তাবাবুর ভীষণ অসুখ, নড়তেও পারছেন না, কথা বলতেও পারছেন না কদিন থেকে। এদিকে আমার ভাগ্নেকে আবার পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে—

—ব্যাপারটা কী বলুন তো বেয়াই মশাই, আমি তো সেই খবর পেয়েই দৌড়ে এলাম।

প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী করে খবর পেলেন এর মধ্যে?

—ওই যে আমার বিপিন এসেছিল শীতের তত্ত্ব নিয়ে, ফেরবার সময় রেলবাজারের স্টেশনে দেখে ডাকাতদের মধ্যে জামাইবাবাজীও রয়েছে—

প্রকাশ মামা বললে—সেই ব্যাপারেই তো আমি এখন কালকাতায় যাচ্ছি—

—কলকাতায় যাচ্ছেন? এখন?

প্রকাশ মামা বললে—এই দুপুরের ট্রেনে না গেলে আবার ঠিক সময়ে কলকাতায় পৌঁছতে পারবো না, আজ রাত্তিরের আগেই তাকে বার করে নিয়ে আসতে হবে। আসলে সে তো ডাকাতি করে নি। তার কীসের দায় বলুন না যে ডাকাতি করতে যাবে। আমার জামাইবাবুর এত টাকা যে তাই-ই খেয়ে ফুরিয়ে উঠোতে পারবে না সে—

—তাহলে কি জামাই-বাবাজী স্বদেশী দলের মধ্যে ছিল-টিল নাকি?

—আরে রামঃ, আমার ভাগ্নে করবে স্বদেশী, তাহলেই হয়েছে! আমি বলেছিলাম আপনাকে আমার ভাগ্নে একেবারে গো-বেচারা ভালোমানুষ! সংসারে ভালোমানুষেরই যত হেনস্তা আজকাল, এ তো আপনি চারদিকে দেখতে পাচ্ছেন—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য কী যেন ভাবলেন একটু। তারপর বললেন—তাহলে আপনিও চলে যাচ্ছেন, বেয়াই মশাইও বাড়িতে নেই, কর্তাবাবুরও অসুখ, কার সঙ্গে কথা বলবো আমরা?

—কেন? বউমা রয়েছেন। আপনার মেয়ে? এ তো আপনার নিজের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। এ-বাড়ি কি আপনার পরের বাড়ি? নাই বা রইলেন বেয়াই মশাই, না-ই বা রইলুম আমি, আপনার মেয়ের কাছে এসেছেন, মেয়ের ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। মেয়ের সঙ্গে দেখা করুন। এখানে স্নান-খাওয়া করুন, বিশ্রাম করুন, আমি বউমাকে গিয়ে খবর দিচ্ছি—

বলে প্রকাশ মামা বাড়ির ভেতরে গিয়ে খবরটা দিলে।

—দিদি, বেয়াই মশাই এসেছেন কেষ্টনগর থেকে।

নয়নতারাও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কানেও গেল কথাটা। কথাটা কানে যেতেই সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে—আমার বাবা?

বাবা! বাবা এসেছে!

শাশুড়ী বললে—যাও বউমা, তোমার বাবাকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আর গৌরীকে গিয়ে বলে এসো ওঁদের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করতে।

প্রকাশ মামা বললে—দুজনের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে তাঁর এক ছাত্রও এসেছে। বুড়ো মানুষ একলা আসেনই বা কী করে! চানের জল তুলে দিতে বলছি দীনুকে, যেন কোনও ত্রুটি না হয়, আমি রইলুম না, জামাইবাবুও নেই, তুমি তোমার বাবাকে ভালো করে দেখো বউমা—যেন এ-বাড়ির বদনাম না হয়, আমি চল্লুম—

আনন্দে নয়নতারার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কেউ দেখে ফেলবে বলে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে জলটা মুছে নিলে। কিন্তু তার আগেই শাশুড়ী ঠিক দেখে ফেলেছে। বললে—তুমি কাঁদছো নাকি বউমা, কাঁদছো কেন? কী হলো?

—না কাঁদি নি তো মা—বলে তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর ঘর ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। বাবা এসেছে! তার বাবা! বাবা বোধ হয় তাকে ছেড়ে আর থাকতে পারে নি, তাই ছুটে এসেছে। আনন্দের চোটে নয়নতারা যে কী করবে তা বুঝতে পারলে না। ঘরে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলে।

বাইরে থেকে বাবার গলা শোনা গেল—নয়ন—

কলকাতা শহরের জনতা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের একটা কেন্দ্রে তখন আর একটা মানুষের ভাবনা আর একদিকে কক্ষ পরিবর্তন করেছে। কোথায় সেই নবাবগঞ্জ, আর কোথায় এই কলকাতা! কলকাতাতে আগেও এসেছে সদানন্দ। কিন্তু আগে এসেছে বাবার সঙ্গে গড়ের মাঠ দেখতে। চিড়িয়াখানা দেখতে। ট্রাম, বাস, গাড়ি, মানুষ, ভিড় দেখতে। কালীঘাটে পুজো দিতে, মানুষের মহোৎসব প্রাণভরে উপভোগ করতে। তখন এমন জিনিসগুলো দেখেছে যাতে তার চোখ ভরে গেছে, মনও ভরেছে।

কিন্তু এই থানার হাজত-ঘরে বসে আর এক কলকাতা দেখলে সদানন্দ। কিন্তু কতটুকুই বা দেখলে সে! কতটুকুই বা দেখতে পেলে! সেই কালীগঞ্জের পোড়ো বাড়িটা থেকে তাকে হাত-কড়া দিয়ে নিয়ে এসেছিল পুলিস। তারপরে রেল-বাজার থেকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছিল তাদের। সঙ্গীন খাড়া করা পুলিসের পাহারায় তাদের দু'জনকে শেয়ালদায় একটা গাড়ির ভেতরে পুরে দিয়ে সোজা এখানে নিয়ে এল। এই লালবাজারের পুলিস হেড কোয়ার্টারে। তারপর থেকে ওদের সঙ্গেই কাটছিল।

ওদেরই মধ্যে একজন নিজে থেকেই তার সঙ্গে আলাপ করতে এল। জিজ্ঞেস করলে—আপনি কখনও কলকাতায় আসেন নি বুঝি?

সদানন্দ বললে—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। গাড়ির ভেতরে আপনি জালের জানালা দিয়ে যে রকম করে চেয়ে দেখছিলেন, তাই জিজ্ঞেস করছি। গ্রামের মানুষ না হলে এমন করে কেউ বাইরের দিকে চেয়ে দেখে না—

সদানন্দ বললে—না, আগে আমি বাবা-মার সঙ্গে অনেকবার কলকাতায় বেড়াতে এসেছি—

—আপনি কী করেন?

—কিছুই করি না।

—কিছুই করেন না? কিছু করবার দরকার হয় না বুঝি? পৈতৃক জমিদারি আছে?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললে—আপনারাই হচ্ছেন আসল কালপ্রিট্। আপনাদের জন্যেই ইণ্ডিয়ার যত অশান্তি। আপনারা ইংরেজদের চেয়েও বেশী শয়তান।

সদানন্দ বললে—ঠিকই বলেছেন।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—ঠিকই বলেছি?

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এতটুকু অন্যায় বলেন নি। আপনাদের সঙ্গে আমি **একমত।**

ভদ্রলোক আরো অবাক। ভদ্রলোক আর কিছু না বলে অন্য চারজনের কাছে গিয়ে ফিস্-ফিস্ করে কী যেন বলতে লাগলো। তার কথা শুনে সবাই সদানন্দর কাছে এল। আবার নতুন করে নাম-ধাম, পিতৃ-পরিচয়, জন্মস্থানের বিবরণ জানতে চাইলে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে গেল। তাকে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে তারা দুঃখপ্রকাশও করলে। একজন বললে—আমাদের জন্যে আপনারও শাস্তি হয়ে যাবে—

শাস্তি?

শাস্তির কথা শুনে সদানন্দর হাসি পেল। বললে—শাস্তি তো আমি এমনিতেই পাচ্ছি, আবার নতুন করে আমাকে গভর্মেন্ট কী শাস্তি দেবে?

যারা কথা বলছিল, তারা সবাই সদানন্দরই বয়সী। ট্রেনে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ বেশি কথা হয় নি। পুলিসের দল তাদের ঘিরে রেখে দিয়েছিল। সকলের কোমরেই দড়ি বাঁধা। প্ল্যাটফরমে, ট্রেনের কামরায় বাইরের লোকেরা তাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছে। সকলের চোখেই একটা কৌতূহলী দৃষ্টি। যেন মানুষের সমাজে এই ক'জন এক আলাদা জাত। এক ব্যতিক্রম।

একজন বললে—দেখছেন কী রকম করে লোকগুলো চেয়ে দেখছে আমাদের দিকে! আমরা যে ডাকাত!

সদানন্দ ওদের কথাগুলো শুনছিল। তার মনে হচ্ছিল, এমন ধরনের মানুষ আগে কখনও দেখে নি সে। তাদের নবাবগঞ্জের নিতাই, কেদার, গোপাল, আরো কত ছেলে যারা বারোয়ারিতলায় বসে গল্প করে, রাত্রে যাত্রার রিহার্সাল দেয়, পূজোর সময় পাল খাটিয়ে থিয়েটার করে, এরা তাদের থেকে আলাদা।

—আপনি ওই ভাঙা বাড়িটার মধ্যে কেন গিয়েছিলেন?

সদানন্দ বললে—আমি ওখানে প্রায়ই যাই—ওখানে যেতে ভালো লাগে আমার—

কিন্তু আপনার বাড়ি তো নবাবগঞ্জে, আপনি কালীগঞ্জে যান কেন? বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

—সবাই আছে। বাবা-মা-ঠাকুর্দাদা, আমার বউ—

—বউ? আপনি বিয়েও করেছেন নাকি?

সদানন্দ বললে—আমি বিয়ে করি নি, আমার বিয়ে হয়েছে—

অল্প সময়ের মধ্যে এমনি অনেক কথা হয়ে গেল তাদের মধ্যে। সদানন্দ জানতে পারলে যে তারা ডাকাতি করে টাকা যোগাড় করে সেই টাকা দিয়ে বন্দুক পিস্তল কেনে, দেশের শত্রুদের খুন করবার জন্যে।

সদানন্দ ওদের যতই দেখছিল, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ওরা ক'জন বেশির ভাগই নিজেদের মধ্যে থাকতো।—ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করতো। অথচ একসঙ্গে ধরা পড়েও সে যেন জেলখানার মধ্যেই একঘরে। সে যেন জাতিচ্যুত। তাকে যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না ওরা। তবু একজনের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। তার নামটা আজও মনে আছে, প্রিয়তোষ। প্রিয়তোষ সরকার। ভারি চমৎকার দেখতে। যেন আগুনের একটা আস্ত টুকরো। প্রিয়তোষ বললে—আপনাকে বোধ হয় ছেড়ে দেবে এরা—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—পুলিস ইনস্পেক্টর আমাদের জিজ্ঞেস করছিল আপনার সম্বন্ধে? আমি বলেছি ও আমাদের দলের নয়।

সদানন্দ বললে—কেন ও-কথা বলতে গেলেন? আমি চাই আমারও আপনাদের সঙ্গে জেল হোক।

প্রিয়তোষ বললে—শুধু তো আর জেল নয়, হয়ত ফাঁসিও হতে পারে, কিছুই বলা যায় না।

সদানন্দ হাসলো—ভাবছেন ফাঁসির কথা শুনে আমি ভয় পাবো?

—ভয় পাবেন না?

—না। জেল হলেও আমার আপত্তি নেই, ফাঁসি হলেও আপত্তি নেই।

সদানন্দর কথা শুনে প্রিয়তোষ সরকার খানিকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর চলে গেল নিজের দলের বন্ধুদের কাছে। তারপর সবাই মিলে দল বেঁধে আবার তার কাছে এল। এবার তার দিকে সবাই আরো স্পষ্ট করে চেয়ে দেখলে। তাদের ধারণা হয়েছিল বীরত্বের দিক থেকে তাদের বুঝি জুড়ি নেই। কিন্তু অচেনা আর একজনের সাহস দেখে যেন তার ওপর তাদের শ্রদ্ধা হতে লাগলো। একজন বললে—আগে জানলে আপনাকে আমাদের দলে নিয়ে নিতুম মশাই। আপনার মত হাজার হাজার ছেলে আমাদের দরকার। যারা প্রাণ দিয়ে দেশের শত্রুদের খুন করতে পারবে। কিন্তু বড় দেরিতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাই—

সদানন্দ বললে—আপনারা বুঝি মানুষ খুন করেন?

প্রিয়তোষ বললে—নইলে কি আর টাকার জন্যে ট্রেন লুঠ করেছি?

সদানন্দ বললে—কিন্তু সব দোষ কি আর তাদের একলার? আমাদের মধ্যেও তো এমন অনেক লোক আছে, যাদের খুন করলে দেশে শান্তি আসে—

—আছে বইকি! তারা হলো মীরজাফর। সেই মীরজাফরদেরও আমরা খুন করি।

সদানন্দ বললে—কিন্তু যদি বিদেশীরা কোনোদিন চলে যায়, মীরজাফররাও চলে যায়, তখন কাদের খুন করবেন?

তারা এ-কথার মানে বুঝতে পারলে না। বললে—আপনি কাদের কথা বলছেন?

সদানন্দ বললে—তারা যে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতেই রয়েছে। কেউ ঠাকুর্দা হয়ে বাবা হয়ে মা হয়ে মামা হয়ে যে অকথ্য অত্যাচার করছে, তাদের খুন করবার ব্যবস্থা করতে পারবেন আপনারা?

—তার মানে!

সদানন্দ বললে—একদিন-না-একদিন বিদেশীরা তো চলে যাবে, কিন্তু এরা তো আমাদের শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে বাড়িতে-বাড়িতে থাকবে, তখন তাদের অত্যাচার বন্ধ করতে পারবেন আপনারা? সেই সব ঠাকুর্দাদের, বাবাদের, মাদের, মামাদের অত্যাচার? তারা কী-রকম অত্যাচার করে তার কি খবর রাখেন আপনারা? তারা কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক আর কালীগঞ্জের বউদের একটার পর একটা খুন করে চলেছে। তাদের শাস্তি কবে হবে? আপনারা তাদের শাস্তি দিতে পারবেন?

হঠাৎ একজন ওয়ার্ডার এসে হাজির হলো। বললে—সদানন্দ চৌধুরী কার নাম?

সদানন্দ বললে—আমার, কেন?

—পুলিস-সুপার আই-বি আপনাকে নিচেয় ডাকছে, চলিয়ে—

সদানন্দ আর দাঁড়ালো না। যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ওয়ার্ডারটার পেছনে-পেছনে চলতে লাগলো।

সদানন্দ চলে যাবার পর প্রিয়তোষ বন্ধুদের দিকে চাইলে। বললে—আমি তোদের বলেছিলুম ছেলেটা পাগল। তখন তোরা কেউ বিশ্বাস করলি না। তখন তোরা বললি, স্পাই—

অন্য সবাইও ঠিক করলে পাগলই বটে! আসলে সারাজীবন সাদানন্দকে সবাই পাগল বলেই ধরে নিয়েছিল। এও তার জীবনের এক ট্র্যাজেডি। অথচ এ-পৃথিবীতে কে যে পাগল আর কে-ই বা সেয়ানা সেইটেই বিচার করবার জন্যে একটা মানুষও কি খুঁজে পেয়েছে সে? মাঝখান থেকে বদনাম হলো শুধু তার! সে-ই নাকি পাগল!

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

ওদিকে একটা বিরাট টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন তাকে একটার পর একটা জেরা করে চলেছিল সাদা চামড়ার আই-বি অফিসার। কোথায় বাড়ি, তার বাবার নাম কী, পোড়ো বাড়ির মধ্যে সে কেন সেদিন গিয়েছিল। অনেক অনেক প্রশ্ন। কখনও ভয় দেখিয়ে কখনও মিষ্টি কথা বলে তার কাছে কথা আদায় করতে চেয়েছিল সাহেব। কিন্তু তার একটাই কেবল কথা যে তাকে জেলে পুরলেও তার আপত্তি নেই, ফাঁসি দিলেও না।

শেষকালে সাহেবের যখন সব সন্দেহের নিরসন হলো, আর রিপোর্টেও যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন হুকুম হলো—যাও, গেট্‌ আউট্‌—গেট্‌ আউট্‌ অব দিস্‌ প্লেস্‌—

সদানন্দ প্রথমে বুঝতে পারে নি। বললে—কোথায় যাবো?

আর কয়েকজন বাঙালী ইনস্‌পেক্টর দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তারা বললে—বাইরে চলে যান, আপনি ফ্রি—

—ফ্রি?

থানার বাইরেও যে সে ফ্রি নয়, সেটাও যে সদানন্দের কাছে একটা জেলখানা তা বাইরের লোক যারা, তারা জানবে কী করে? সদানন্দর চোখ দিয়ে তখন যেন কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল।

—হাঁ করে দেখছেন কী? চলে যান—

সদানন্দ বললে—ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারি? ওই ওদের মধ্যে প্রিয়তোষ সরকারের সঙ্গে?

একজন বাঙালী অফিসার ধমক দিয়ে উঠলো—যা বলছি শুনছেন না কেন? আবার ইয়ার্কি হচ্ছে?

সদানন্দ আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে বিরাট কমপাউণ্ড, কমপাউণ্ডের মধ্যে অনেক লাল পাগড়ি, অনেক সাদা পোশাক-পরা পুলিস, গাড়ি-ভ্যানের ভিড়। সবাই জানলো সদানন্দ চৌধুরী নামে যে-ছেলেটিকে কাল ধরে আনা হয়েছে, তাকে হাজত-ঘর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু একটা কথা কেউই জানতে পারলে না যে সে সত্যিই ছাড়া পেলে না। শুধু একটা ছোট হাজত-ঘর থেকে সে আর একটা বড় হাজত-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। এ-হাজত-ঘরে ছাদ নেই, আকাশ, আর দেওয়াল নেই, শুধু আছে বন্দী মানুষদের ভিড়। এইটুকুই যা তফাৎ। এখানে সবাই তারই মত মানুষ। তারা ভাবছে তারা স্বাধীন, কিন্তু না, আসলে বন্দী তারাও।

ছাড়া পেয়ে সদানন্দ রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। চারদিকে অসংখ্য ব্যস্ততা যেন মানুষের রূপ ধরে রাস্তায় ছুটে চলেছে। এ সেই নবাবগঞ্জের মত নয়। সেখানে সবাই ব্যস্ত হতে চায়, কিন্তু পারে না। কিন্তু সেখানে সমস্ত দিনখানা পড়ে আছে তোমার জন্যে। কত কাজ করার করো না। আর কাজ যদি না থাকে তো বারোয়ারি-তলায় কেদারের দোকানের মাচায় বসে পরচর্চা করো। সেখানে ঢালাও ক্ষেত-খামার। ইচ্ছে হলো তো নদীর ধারের নিরিবিলির মধ্যে

নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করো। কিন্তু এখানে উলটো—সকলের মুখের দিকে চেয়ে সদানন্দর মনে হলো এখানে যেন কেউ কারো নয়। সবাই নিঃসঙ্গ। তবু সবাইকে জড়িয়ে নিয়েই একসঙ্গে মরতে চাইছে।

—শুনুন—

সদানন্দ পাশ ফিরে দেখলে। একজন লোক তার দিকে চেয়ে হাত পেতে আছে।

—একটা পয়সা দেবেন?

সদানন্দ বুঝলো, লোকটা ভিখিরি। অথচ গায়ে জামা, পরনে ধুতি, পায়ে জুতোও রয়েছে। বাইরে থেকে ভিখিরি বলে বোঝাই যায় না। সদানন্দ পকেটে হাত দিলে। পয়সা তার কাছে আছে কিনা তাও জানা ছিল না। পুলিসে ধরবার পর তার জামা-কাপড় সব কিছু তল্লাসী করেছিল তারা। হঠাৎ খেয়াল হলো পকেটে তো তার কিছু নেই। অথচ নবাবগঞ্জে ফিরে যেতে গেলে তো ট্রেন-ভাড়া লাগবে। তখন তো টাকার দরকার। কী করে ফিরবে সে তাহলে।

সদানন্দ বললে—আমার কাছে একটা পয়সাও নেই, আমি কিছুই দিতে পারবো না—

কথাটা লোকটা বিশ্বাস করলে কিনা কে জানে। হয়তো কল্পনাও করতে পারে নি যে, সদানন্দ সদ্য সদ্য পুলিস-হাজত থেকে বেরিয়েছে। আর কল্পনা করতে পারবেই বা কী করে? তার জামা-কাপড়ে চেহারায় তো লেখা নেই সে আসামী!

লোকটা চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল। তারপরে হয়ত আর একটা লোকের কাছে গিয়ে আবার নতুন করে হাত পাতবে সে। লোকটার কাছে সবাই বড়লোক। সবাই তার চেয়ে অর্থবান! সুতরাং চাইতে তার কিছু লজ্জা নেই। কিন্তু সদানন্দ এই শহরে কার কাছে হাত পাতবে? তার বাড়ি ফেরার ট্রেন ভাড়ার টাকা সে কার কাছে ভিক্ষে করবে?

সমস্ত কলকাতা শহরটা ততক্ষণে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারো অভাব-দুঃখ-দারিদ্র্যের দিকে দেখবার সময় আর তখন নেই কলকাতার। সদানন্দ সেই নিষ্ঠুর-নির্মম কলকাতার দিকে চেয়ে সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারলে না এখানে সে কোন্‌ কাজে লাগবে! এ পৃথিবীতে তার কীসের প্রয়োজন!

নয়নতারার কিন্তু বাহাদুরি আছে বলতে হবে। শাশুড়ীও অবাক হয়ে গেছে বউমার কাজ-কর্ম দেখে। বাবা এসেছে, সুতরাং নয়নতারাও যেন অন্য মানুষ হয়ে উঠলো একেবারে। একবার রান্নাঘরে যাচ্ছে। আর একবার যাচ্ছে বাবার কাছে। শাশুড়ী একবার ডাকলে—বউমা—

শাশুড়ী সেই সকাল থেকেই আর ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। সেই আগের দিন রাত্রে যে শুয়েছে, তার পরে আর ওঠে নি। মাঝখানে শুধু উঠে বসেছিল একবার। বউমাকে সিন্দুকের চাবি খুলে প্রকাশকে টাকাটা বার করে দিতে বলেছিল।

শাশুড়ী বললে—এমন সময় তোমার বাবা এলেন, আমি উঠেও বসতে পারছি না। তুমি একলা দেখা-শোনা করতে পারবে তো? বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই যে খাতির-যত্ন করবে। তোমার ওপরেই ভার দিলুম বউমা, দেখো যেন তোমার শ্বশুর-বাড়ির বদনাম না হয়—

নয়নতারা বলেছিল—সে আপনাকে ভাবতে হবে না মা, আমি তো আছি, আমি সব দেখবো—

শাশুড়ী বউমার মুখের চেহারা দেখে ভরসা পেলে। বাবার আসার খবর পেয়ে বউমা যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মুখে হাসি, অথচ উদ্বেগও কম নেই তার।

বললে—চান করবার ব্যবস্থা করতে বলে দিও বউমা।

নয়নতারা বললে—বাবার সঙ্গে তাঁর একজন ছাত্রও এসেছে। বুড়ো মানুষ তো, তাই একলা আসতে ভরসা পান নি।

—ভালোই তো। গৌরীকে আমার কাছে একবার ডেকে দিয়ে তুমি বাবার কাছে গিয়ে বোসো গে। আমি গৌরীকে বলে দিচ্ছি কী-কী রাঁধতে হবে।

বাড়িতে কুটুম এসেছে। সুতরাং এ-বাড়ির গিন্নীর নিজেরই সব করার কথা। গৌরী আসতেই শাশুড়ী বললে—হ্যাঁ রে, বেয়াই মশাইরা খাবেন, যেন নিন্দে না হয় দেখিস, তোর দাদা বাড়িতে নেই, একা সব পারবি তো, না আমি যাবো?

গৌরীর তখন সময় ছিল না কথা বলবার। বললে—তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন বউদি, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো না, আমি আছি, বিষ্টুর মা আছে, বউমা রয়েছে, কাজের লোকের কী অভাব?

সত্যিই কোনও অসুবিধেই হলো না কারো। নয়নতারা অদ্ভুত মানিয়ে নিলে। একবার রান্নাঘরে যায়, গিয়েই জিজ্ঞেস করে—পিসী, আমি একটু হাত লাগাবো?

গৌরী বলে—না না বউমা, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে গিয়ে কথা বলো গে। বেয়াই মশাইদের চান হয়ে গেলেই আমাকে খবর দেবে—

নয়নতারা বললে—চান করা তো হয়ে গেছে।

—তাহলে তুমি বাবার কাছে গিয়ে বোস, আমি এদিকে গুছিয়ে নিয়ে তোমাকে খবর দিচ্ছি—

নয়নতারা বললে—বাবার কাছে বসেই তো এতক্ষণ গল্প করছিলুম, মাঝখানে শুধু একবার দেখতে এলুম তুমি একা সব কি পারবে?

—খুব পারবো, তুমি এখান থেকে যাও তো। এই তো সামান্য দুজনের খাওয়া, এই গৌরী একদিন একশো জনকে এক হাতে রান্না করে খাইয়েছে—

নয়নতারা আর দাঁড়ালো না সেখানে। এক দৌড়ে আবার সোজা চলে গেল বাবার কাছে।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য আর নিখিলেশ তখন স্নান-টান সেরে বসে আছে আরাম করে। এতদিন পরে নয়নতারার সঙ্গে দেখা। অনেক সাধ করে তিনি এই নবাবগঞ্জের চৌধুরী বংশে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে আসবার সময় অনেক দুর্ভাবনা নিয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কী দেখবেন কী শুনবেন তারই ভাবনা ছিল। কিন্তু এসে পৌঁছনোর পর থেকে মেয়ে তাঁর খাতির-যত্ন করতেই ব্যস্ত, একটা কথা বলবার পর্যন্ত সময় পান নি। এবারই প্রথম নয়নতারার শ্বশুরবাড়ির ভেতরটা এত ভালো করে দেখলেন তিনি। বার-বাড়ির চেহারাটা সেবারই দেখেছেন। কিন্তু এবার মেয়ে একেবারে বাবাকে ভেতরের বাড়িতে নিয়ে বসিয়েছিল। সেবার মেয়েকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার অন্যরকম। তিনি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। গ্রামের বাড়ি বটে, কিন্তু তারই মধ্যে কী চমৎকার ব্যবস্থা। উত্তর দিক দিয়ে বাড়ির সদরে ঢুকতে হয়, তারপরে বার-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ বাঁয়ে রেখে সোজা ভেতরে ঢুকে যাও। বাঁয়ে দক্ষিণে ধান-চাল-সরষে-ছোলার মরাই। আর বাঁয়ে সার সার ঘর। বৈঠকখানা থেকে শুরু করে অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা। তার শেষপ্রান্তে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় যা কিছু একখানা দেড়খানা ঘর আছে সবই কর্তাবাবুর দখলে। সেটা তাঁরই এলাকা। এর পর উঁচু একটা পাঁচিল। তারই মাঝখানে দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভেতর-বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়বে।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য কুয়োতলায় স্নান করতে করতে সবই দেখছিলেন। পশ্চিম দিকে কত বড় বাগান। বাগানের দক্ষিণে ভেতর-বাড়ির পুকুর। ইঁট-বাঁধানো ঘাটের ওপর সিমেন্টের বেঞ্চি। এই ঘাটে নয়নতারা চান করে নাকি?

নয়নতারা বললে—না বাবা, আমি কুয়োতলায় ঘেরা ঘরে চান করি, শাশুড়ী আমাকে পুকুরে নামতে দেন না, বলেন তুমি সাঁতার জানো না বউমা, তুমি পুকুরে নেমো না—

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—তা শাশুড়ী তো তোর খুব ভালো বলতে হবে—

—হ্যাঁ, খুব ভালো বাবা। গয়না-গাঁটি টাকাকড়ি সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত আমাকে দিয়ে দিয়েছে, এই দেখ না—

শুধু বাবা নয়, নিখিলেশও দেখলে। নয়নতারা চাবিটা হাতে নিয়ে দেখালে।

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—দেখলে তো নিখিলেশ, আমি তোমায় বলেছিলুম নয়নতারার স্বামীভাগ্য ভালো—হ্যাঁ রে, তা সদানন্দকে ছাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা তোর মামাশ্বশুর করতে পারবে তো?

নয়নতারা বললে—তুমি তাহলে আমার মামাশ্বশুরকে চেনো না বাবা, তিনি খুব পাকা লোক—

—তা পুলিস যদি না ছাড়ে?

নয়নতারা বললে—সেই জন্যেই তো এক হাজার টাকা নিয়ে গেলেন, আমিই তো নিজে সিন্দুক থেকে টাকা বার করে দিলুম—

ভট্টাচার্যি মশাই যেন খুশী হলেন। বললেন—তাহলে টাকা-কড়িও বুঝি তোর হাতে! তুই-ই-টাকা-কড়ি রাখিস নাকি?

নয়নতারা বললে—বা রে, সিন্দুকের চাবি থাকবে আমার হাতে আর টাকা নাড়াচাড়া করবে অন্য লোক? তুমি যে কী বলো বাবা তার ঠিক নেই।

—তাহলে তুই-ই দেখছি বলতে গেলে এ বাড়ির আসল গিন্নী!

নয়নতারা হাসলো।

বললে—আমার শাশুড়ীর তো অসুখ কাল থেকে। আমি সংসার না দেখলে আর কে দেখবে? আমার শ্বশুর গেলেন রাণাঘাটে মামলার তদ্বির-তদারক করতে, দোতলায় কর্তাবাবু বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন, মামাশ্বশুর গেছেন কলকাতায় পুলিসের থানায় দরবার করতে, এদিকে শাশুড়ীর আবার অসুখ, অথচ খাবার বেলায় এক গাদা লোক—

খেতে বসে মেয়ের গল্প শুনছিলেন ভট্টাচার্যি মশাই। বললেন—এটা খেতে তো খুব ভালো হয়েছে রে। এটা কে রেঁধেছে? এই মাছের মুড়ো দিয়ে ছোলার ডাল?

—কে আবার রাঁধবে? আমিই রেঁধেছি—

নিখিলেশও পাশে বসে খাচ্ছিল। সেও বললে—হ্যাঁ, সব রান্নাগুলোই ভালো হয়েছে—

নয়নতারা উৎসাহ পেয়ে গেল। বললে—তা হলে মুড়ি-ঘণ্টটা আর একটু নিয়ে আসি, যাই—

ভট্টাচার্যি মশাই বাধা দিলেন। বললেন—ওরে না না, এত সব খেতে হবে, একটা তো মাত্র পেট, ধরবে কী করে অত? তা আমি ভাবছি তুই এত শিখলি কবে? তোর মা'ও মুড়ি-ঘণ্ট খুব ভালো রাঁধতো। তোর মা'র কাছেই এসব রাঁধতে শিখেছিলি, না-রে? বিপিনও এখানে খেয়ে গিয়ে রান্নার খুব প্রশংসা করছিল—

নয়নতারা বললে—তা মা ছাড়া আর কার কাছে রান্না শিখবো, এখানে তো সবে এসেছি—

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—তা এখেনে এসে তোকে রান্না-বান্না করতে হয় নাকি?

—কী যে বলো তুমি বাবা তার ঠিক নেই। এখানে রান্নার লোকের কী অভাব? বিষ্টুর মা আছে, গৌরীপিসী আছে, কিন্তু আমার শাশুড়ীর ইচ্ছে যে আমি রাঁধি। আমার রান্না আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর খুব খেতে ভালো লাগে—

—আর সদানন্দ? সে কী বলে? তোর রান্না পছন্দ হয় তার?

নয়নতারা হাসলো। বললে—আসলে তাঁর জন্যেই তো আমাকে রান্নাঘরে যেতে হয়। তাঁর আবার আমার রান্না না হলে যে মুখে রোচে না—

বাবা খুব খুশী হলেন মেয়ের কথাটা শুনে। নয়নতারা বললে—আর একটু দই দিই তোমাকে বাবা—

ভট্টাচার্যি মশাই ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। বললেন—এর বেশি খেলে আমার অসুখ করবে মা, আমার কি আর খাবার বয়েস আছে? এই নিখিলেশকে বরং দে, এদের কম বয়েস, এরা খেতে পারবে—

নিখিলেশও উঠে পড়লো। বললে—আমিও আর খেতে পারবো না—

খাওয়া-দাওয়ার পর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—তুই আমার সঙ্গে যাবি মা কেষ্টনগরে? তুই বেয়ানকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় না। বলবি বাবা নিয়ে যাবার কথা বলছেন—

প্রীতি নিজের ঘরে শুয়েছিল তখনও। বউমাকে দেখে বললে—তোমার বাবার খাওয়া হলো? কোনও কষ্ট হলো না তো? আমি তো দেখতেই পেলুম না কী কী রান্না হলো, কী রকম পরিবেশন করলে তুমি—

—না মা, খাওয়ার কোনও অসুবিধে হয় নি। বাবা বলছিলেন আমাকে কেষ্টনগরে নিয়ে যাবেন। আমি যাবো?

শাশুড়ী বললে—তা যাও না বউমা, দু'দিনের জন্যে ঘুরে এসো না, তুমি তো বলছিলেই কেষ্টনগরে যাবে। বাবা যখন এসে গেছেন তখন যাও না। এ বাড়িতে এ অবস্থায় থাকলে তোমার কষ্ট হবে, তার চেয়ে বরং তুমি কিছুদিনের জন্যে ঘুরে এসো—

নয়নতারা বললে—কিন্তু মা, আপনার শরীরের এই অবস্থা...

শাশুড়ী বললে—তা হোক বউমা, আমার যদি এখন বরাবরই শরীর খারাপ হয় তা বলে তুমি একবার বাপের বাড়ি যাবে না? আমার জন্যে তুমি কেন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবে বউমা? তুমি এখানে কোন্ সুখে পড়ে থাকবে? তার চেয়ে তোমার বাবা এসেছেন, এমন সুযোগ আর হবে না, তুমি বরং চলেই যাও—

নয়নতারা একটু ভেবে বললে—আমি যাবো? এখন বাবা বাড়িতে নেই, তিনি ফিরে এসে যদি কিছু বলেন?

শাশুড়ী বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না বউমা, তিনি কিচ্ছু বলবেন না, যদি কিছু বলেন তো আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে বলবো। আর কার জন্যে তুমি এখানে থাকবে বউমা? এখানে কে আছে তোমার? আমার ছেলে কি তোমার মুখ-দর্শন করে? যার স্বামী অমন সে কোন্ সুখে স্বামীর ঘর করবে?

এর জবাব কি দেবে নয়নতারা! বললে—তা হলে আমি বাবাকে সেই কথা বলি গে?

—হ্যাঁ, বউমা, আমি বলছি তুমি যাও। জানো বউমা, তুমি এখানে মুখ ভার করে থাকলে আমার আরো কষ্ট হয়। আসলে তোমার কথা ভেবে ভেবেই আমার এই অসুখ, নইলে অসুখের তো আর অন্য কোনও কারণ নেই—

—আচ্ছা মা, আমি বাবাকে তাহলে তাই বলি গিয়ে—

বলে নয়নতারা আবার বাবার কাছে গেল। বললে—না বাবা, শাশুড়ী মত দিলেন না। বললেন—কর্তা এখন বাড়ি নেই, উনিও নেই, এ সময়ে আমার চলে যাওয়া ঠিক হবে না। আর আমিও ভেবে দেখলুম এ সময়ে গেলে এদের সংসারে খুব অসুবিধে হবে। সিন্দুকের চাবি-টাবি সব তো আমার কাছে, শাশুড়ীর শরীরও ভালো নয়। আমার তো তোমার সঙ্গে খুব যেতে ইচ্ছে করছিল, তোমার সঙ্গে গেলে কিছু দিন তবু তোমার দেখাশোনা করতে পারতুম, কিন্তু এই অবস্থায় কী করি বলো তো?

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—না না, বেয়ান তো ঠিক কথাই বলেছেন। আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না মা। আমার কোনো অসুবিধে হয় না সেখানে। তুমি এখানে সুখে আছো ভাবলেই আমার সুখ। তোমার এত সুখ এত ঐশ্বর্য, এসব তোমার মা কিছু দেখে যেতে পারলেন না, সেইটেই আমার দুঃখ রয়ে গেল! তাহলে আমি আসি মা, তোমার শাশুড়ী-শ্বশুরকে বলে দিও, আমি আর থাকতে পারলুম না, আমার কালকে কলেজ আছে—আমি তাহলে আসি—সদানন্দ এল কি না খবরটা যেন কোনও ভাবে পাই—

নয়নতারা বাবার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে। বাবা মেয়ের মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন, বেঁচে থাকো মা, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মী হয়ে বিরাজ করো, এই প্রার্থনা করি—

বলে বিদায় নিয়ে বাইরে এলেন। নিখিলেশও সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। দীনু আগের থেকেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। রজব আলি স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

নয়নতারা বার-বাড়ির সীমানায় এসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো। গাড়িতে উঠলেন বাবা। নিখিলেশও উঠলো। তারপর গাড়িটা ছেড়ে দিলে। সদর দিয়ে বেরিয়ে গাড়িটা একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। তারপর আর দেখা গেল না। নয়নতারার চোখ দু'টো ছল-ছল করে উঠলো। তারপর জানালাটার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলে।

গাড়িটা তখন বারোয়ারিতলা দিয়ে চলেছে। ভট্টাচার্যি মশাই-এর মনটা বড় ভারি-ভারি লাগছিল। মেয়ের সুখ, মেয়ের ঐশ্বর্য দেখে খুশী যেমন হয়েছিলেন, তেমনি মেয়েকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্টও হচ্ছিল তাঁর। পাশে নিখিলেশ চুপ করে বসে ছিল।

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—কী নিখিলেশ, তুমি চুপ করে আছো যে? কেমন দেখলে? আমি বলেছিলুম না যে নয়নের ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। কত বড় বাড়ি দেখলে? আর নয়নের রান্না কী চমৎকার সেটাও বলো, সব ওর মায়ের কাছে শেখা, বুঝলে? ওইরকম ছোলার ডালের মুড়িঘণ্ট নয়নের মাও রাঁধতো—

নিখিলেশ স্বীকার করলে। বললে—হ্যাঁ, রান্নাটা খুব ভালো হয়েছিল মাস্টার মশাই—

রাস্তার পাশে বেহারি পালের বেনে-মশলার দোকান। গরুরগাড়িটার ভেতর অচেনা মুখ দেখে একটু কৌতূহল হলো বেহারি পালের। গাড়িটা যে কর্তাবাবুর তা রজব আলিকে দেখে বুঝতে পারলে। কিন্তু গাড়ির ভেতরে ওরা কারা?

সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলে বেহারি পাল—মশাইরা কোত্থেকে আসছেন?

ভট্টাচার্যি মশাই-এর সেদিকে নজর পড়লো। কিন্তু উত্তর দিলে রজব আলিই। সে বললে—আমাদের বেয়াই মশাই, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—

বেহারি পাল হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে। বললে—আপনারা ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই।

ভট্টাচার্যি মশাইও নিয়মানুযায়ী প্রণাম করলেন। বললেন—আপনি?

—আমার নাম বেহারি পাল। আমার এই বেনে-মশলার দোকান। তা মেয়ের আপনি

বিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কুটুম ভালো হয় নি—

হঠাৎ কথাটার আকস্মিকতায় ভট্টাচার্যি মশাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কোথাকার কে বেহারি পাল, তার এ মন্তব্য করবার কতটুকু অধিকার তাও তিনি বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ এ মন্তব্য করার উদ্দেশ্য কী তাও তাঁর বোধগম্য হলো না। কথাটা শুনে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে যেন হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোকের দিকে।

কিন্তু রজব আলি তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। বেহারি পালের বেনে-মশলার দোকান ছাড়িয়ে যখন অনেক দূর চলে এসেছে তখন যেন ভট্টাচার্যি মশাই-এর মুখে প্রথম কথা বেরোল।

বললেন—নিখিলেশ, ভদ্রলোকের কথাটা শুনলে? ও ভদ্রলোক ও-কথাটা বললে কেন বলো দিকিনি?

নিখিলেশ বললে—পাড়াগাঁয়ের লোক তো, ওরা ওমনি পরশ্রীকাতর হয় মাস্টার মশাই—ওকথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না—

কথাটা ভট্টাচার্যি মশাই এর খুব মনঃপুত হলো। বললেন—তুমি ঠিক বলেছ নিখিলেশ, ঠিক বলেছ তুমি, এ পরশ্রীকাতরতার কথা। পল্লীগ্রামে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। অথচ তুমি তো নিজের চোখেই সব দেখলে। নিজের কানেই সব শুনলে, কুটুম কি খারাপ করেছি নিখিলেশ? তুমিই বলো? মেয়ে আমার ভালো ঘরে পড়ে নি? ডাকাত বলে ভুল করে যদি জামাইকে ধরে নিয়ে যায় তো জামাই কী করবে? আমার জামাই-এর তো কোনও দোষ নেই—

নিখিলেশ বললে— কে কী বললে তা নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন মাস্টার মশাই? লোকে কি কারো ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে? আপনার মেয়ে ভালো ঘরে পড়েছে এতেই ওদের ঈর্ষা হয়েছে। ওদের রাগ কেন চৌধুরীদের বাড়িতে অত সুন্দরী বউ হয়েছে। আসল কথাটা হলো তাই—

ভট্টাচার্যি মশাইও নিখিলেশের কথায় সায় দিলেন। বললেন—তুমি বিচক্ষণ ছেলে নিখিলেশ, তুমি ঠিক বলেছ, সব ওদের ঈর্ষা, আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবো না। এই আমি চুপ করে রইলুম—

বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

আর গ্রামের ধুলোর রাস্তার ওপর দিয়ে রজব আলি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

সদানন্দর পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো—আরে সদা, তুই এখানে? আর আমি তোকে গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি—

সদানন্দ পেছন ফিরে দেখলে—প্রকাশ মামা।

প্রকাশ মামা বলতে লাগলো—কখন ছাড়া পেলি তুই?

সদানন্দ বললে—এই একটু আগে—

—একটু আগে অথচ আমি সারা থানাটা হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি তোর জন্যে। বড় দারোগাটা ভারি বজ্জাত, জানলি! মোটে কথা বলতে চায় না। শেষকালে হাজার টাকা যখন হাতে তুলে দিলুম তখন হুকুম দিয়ে দিলে তোকে ছাড়বার। আমাকে বড় দারোগা বললে—ছেড়ে দিয়েছে। তা ছেড়ে দিলে তো আমি দেখতেই পেতুম—। আমি তখন থেকে একবার ঘর

একবার বার করছি। আর এদিকে তুই এখানে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজছিস!

সদানন্দ বললে—তুমি ঘুঁষ দিলে?

প্রকাশ মামা বললে—ঘুঁষ, দেব না? ঘুঁষ না দিলে তুই এখন এখানে দাঁড়িয়ে গায়ে হাওয়া লাগাতে পারতিস? এতক্ষণ হাজাতখানার ঘরে তোকে পচে মরতে হতো না? তা আয়, আমার সঙ্গে আয়, যা ঠাণ্ডা পড়েছে। শরীরটাকে একটু গরম না করতে পারলে আর চলছে না। আয়—

সদানন্দ তবু জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

প্রকাশ মামা এবার সদানন্দর একটা হাত ধরে টান দিলে। বললে—তুই আয় না, এত রাত্তিরে তো আর নবাবগঞ্জের ট্রেন নেই, একটা রাত কলকাতাতেই তো কাটাতে হবে। আয়, তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই—

বলে প্রকাশ মামা সদানন্দকে টানতে টানতে যে কোন্‌দিকে নিয়ে চললো তা সে বুঝতে পারলে না। সত্যিই প্রকাশ রায় যেন নবাবগঞ্জের চৌধুরী বাড়িতে শনি হয়েই ঢুকেছিল। নইলে কোথাকার কোন্ নবাবগঞ্জের চৌধুরী বাড়ির বংশধরকে সে সেদিন কালীঘাটের মানদা মাসির বস্তি-বাড়িতেই বা নিয়ে গেল কেন?

তা মানদা মাসির প্রসঙ্গ পরে বলবো। তার আগে নবাবগঞ্জের কথা আগে কিছু বলতে হবে। কারণ এ-গল্পের শেষ যেখানেই হোক, নবাবগঞ্জেই এ-গল্পের শুরু।

সেই নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বাড়িটার ভেতরে যে তখন ভাঙন ধরতে শুরু হয়েছে, বাইরে থেকে কিন্তু তা এতটুকু বোঝবারই উপায় ছিল না। বাইরে তখনও বিধু কয়ালের ছেলে শশী কয়াল দাঁড়িপাল্লায় ধান-চাল মেপে মেপে গোলায় তোলে। পরমেশ মৌলিক প্রতিদিন চণ্ডীমণ্ডপে এসে কাঠের বাক্সখানা সামনে নিয়ে বসে। তারপর খেরো খাতাখানা খুলে হিসেবের কুটিল অঙ্কগুলো কষতে কষতে জলের মত তরল-সরল করে আয় ব্যয়ের সমতা সাধন করে। কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলেই তার মাথায় টনক নড়ে ওঠে।

কিন্তু পরমেশ মৌলিকের মাথার ওপর আছে কৈলাস গোমস্তা। কৈলাস গোমস্তা আরো পাকা লোক। সে সেই খাতাগুলো দেখে আর দেখার পর মঞ্জুর করে দেয়। কোথাও বা খরচ জোড়ে, তারপর তা থেকে সেগুলো পাকা খাতায় তোলে।

যতদিন কর্তাবাবু সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।

বলতেন—এটা এখানে কী লিখেছ কৈলাস? এই দুটো পয়সা কীসের খরচা?

কৈলাস বলতো—আজ্ঞে দু'পয়সার বিড়ি—

—বিড়ি?

বিড়ি শুনে চমকে যেতেন কর্তাবাবু। বলতেন—বিড়ি খেয়েছে কে? এ-বাড়িতে বিড়ি কে খায়?

কৈলাস বলতো—আজ্ঞে ওই যে কাঞ্চন স্যাকরা এসেছিল, সে বিড়ি খেতে চাইলে কিনা, তাই—কর্তাবাবু রেগে যেতেন। বলতেন—কাঞ্চন স্যাকরা বিড়ি খেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা সে বিড়ি খাক আর গাঁজাই খাক, তার জন্যে আমি পয়সা দেব কেন? তার নেশার খরচ যোগাবার জন্যে আমার কীসের গরজ?

কৈলাস গোমস্তা কিন্তু-কিন্তু করতো। বলতো—আজ্ঞে, সে যে বিড়ি খেতে চাইলে...

কর্তাবাবু বলতেন—না, ওসব চলবে না আমার কাছে, বিড়ি খেতে হয় তো সে নিজের পয়সায় খাক্। তুমি এক কাজ করো, ওর নামে তো একশো টাকা আগাম বায়না লেখা

আছে, ওই জায়গায় ওটা কেটে লিখে রাখো একশো টাকা দু'পয়সা আগাম। আর এবার থেকে যদি আর কখনও বিড়ি খেতে চায় তো তবিল্ থেকে আর পয়সা দেবে না। বারোয়ারিতলায় পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান আছে, তুমি তাকে দোকান দেখিয়ে দেবে—

কৈলাস মাথা পেতে অপরাধ স্বীকার করে নিত। বলতো—আজ্ঞে, তাই দেব।

এককালে কর্তাবাবু কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর গোমস্তাগিরি করেছেন, সুতরাং গোমস্তারা কী রকম করে হিসেবের কারচুপি করে তা তিনি জানতেন। এখন তাঁরই গোমস্তা আবার তেমনি করে হিসেবের কারচুপি করবে তা তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না।

দু'টো তো মাত্র পয়সা। কিন্তু সেই দুটো পয়সার অপব্যয়ও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এখন এই যে তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন, তিনি জানতেও পারছেন না তাঁর কৈলাস গোমস্তা কত দু'পয়সা হিসেবে কারচুপি করছে।

তবু বাইরে থেকে সবাই ঠিক আছে। ননী ডাক্তার নিয়ম করে আসছে, ওষুধও পড়ছে নিয়মমত। দীনুও সেবা করে যাচ্ছে দিন-রাত। আর সে সেবাও ঠিক তেমনি সেবা। নিজের পরিবারও এমন করে কোনও স্বামীকে সেবা করতে পারে না।

অথচ দীনুর কি একটা কাজ! বেয়াই বাড়ি থেকে লোক এল তত্ত্ব নিয়ে, তাদের চান করবার জন্যে তাকেই কুয়ো থেকে জল তুলে দিতে হবে। বিশ্বাস করবার মত নির্ভর করবার মত লোক ওই এক দীনুই। দীনু যে কখন ঘুম থেকে ওঠে, কখন খায় কখন ঘুমোয় তা কেউ দেখতে পায় না। ডাকলেই দীনু এসে হাজির হবে। বলবে—আমাকে ডাকছিলেন আজ্ঞে?

এরই মধ্যে চৌধুরী মশাই সেদিন রানাঘাটের কোর্ট থেকে দৌড়তে দৌড়তে ফিরলেন। তাঁর যেন আর তর সইছিল না। চণ্ডীমণ্ডপে পরমেশ মৌলিক আপনমনে কাজ করছিল। ছোট মশাইকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—কী পরমেশ, খবর সব ভালো তো? প্রাণকেষ্ট সা' মশাই-এর আড়ত থেকে পাটের টাকা দিয়ে গেছে?

পরমেশ মৌলিক বললে—আজ্ঞে, কই, না তো!

—আর ভুবন বসাক? ভুবন বসাক আর এসেছিল?

—আজ্ঞে না।

চৌধুরী মশাই রেগে গেলেন। বললেন—দেখলে, আমি নেই, আর সবাই সাপের পাঁচ পা দেখেছে—

পরমেশ মৌলিক হঠাৎ কথার মাঝখানে বলে উঠলো—আজ্ঞে দারোগাবাবু এসেছিল পরশু—

—দারোগাবাবু? রেল-বাজারের দারোগাবাবু? কেন? আবার পাওনা-গণ্ডা চায় নাকি?

—আজ্ঞে না, তা নয়, বলতে এসেছিলেন খোকাবাবু ধরা পড়েছেন।

—খোকাবাবু? আমাদের সদা? ধরা পড়েছে? তার মানে?

—আজ্ঞে ধরা পড়েছে মানে পুলিসে অ্যারেস্ট করেছে।

—সে কী? কী জন্যে অ্যারেস্ট করেছে সদাকে? কী করেছিল সে?

এত বড় একটা ঘটনা শুনে চৌধুরী মশাই যেন প্রথমে একটু নাড়া খেলেন। দুটো দিন মাত্র বাড়িতে গর-হাজির, এর মধ্যে এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল! হঠাৎ নজর পড়লো বৈঠকখানার দিকে। কী হলো? ঘরের দরজা হাট করে খোলা কেন?

আর দাঁড়ালেন না সেখানে। সোজা বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখেন সেখানে কেউ নেই। চারদিকে যেখানকার জিনিস সেখানেই রয়েছে, শুধু বাবাজীই নেই কোথাও। তাঁর খড়ম, ত্রিশূল, গেরুয়া কাপড়খানা পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে।

তারপর কী যেন সন্দেহ হলো। ভেতর-বাড়ির দরজা পেরিয়ে ডাকলেন—গৌরী, গৌরী—সব গেলি কোথায়?

প্রীতি ঘরের ভেতর নিজের বিছানায় শুয়ে ছিল। নয়নতারা পাশে বসে পাখার হাওয়া করছিল শাশুড়ীকে। অত ঠাণ্ডার মধ্যেও শাশুড়ী ঘামছিল শুয়ে শুয়ে। বড় ভয় করছিল নয়নতারার। এই ক'দিন আগে তার মা হঠাৎ চলে গেছে। অথচ তার বিয়ের দিনও কেউ কল্পনা করতে পারে নি তার মা এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে। এই ক'টা দিন ধরে তার জীবনে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বাবার কথাও মনে পড়তে লাগলো। বাবা এতক্ষণ বোধ হয় ট্রেনে উঠে বসেছে।

হঠাৎ শাশুড়ী বললে—বউমা—

নয়নতারা শাশুড়ীর মুখের কাছে মুখ এনে বললে—কিছু বলবেন মা?

শাশুড়ী বললে—তুমি আর কেন কষ্ট করছো বউমা, তুমি এবার যাও, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে, গৌরী খেয়ে এখুনি আসছে, তুমি যাও, তোমার কষ্ট হচ্ছে—

নয়নতারা বললে—আমার আর কীসের কষ্ট? আমার তো কিছু কষ্ট হচ্ছে না—

কথাটা শুনে শাশুড়ীর যেন ভালো লাগলো। বললো—আমার বড় সাধ ছিল বউমা যে ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি বউ-এর হাতে সেবা নেব, কিন্তু তা আমার কপালে নেই।

নয়নতারা বললে—ও-কথা কেন বলছেন মা? আপনার সেবা করতে তো আমার ভালো লাগছে—

শাশুড়ী বললে—আমার একটা কাজ করতে পারবে বউমা?

নয়নতারা বললে—বলুন? কী করতে হবে বলুন? জল খাবেন?

শাশুড়ী বললে—না, জল খাবো না। খোকা যখন বাড়িতে আসবে তখন একটা কাজ করতে হবে বউমা তোমাকে। পারবে?

নয়নতারা ভয় পেয়ে গেল। বললে—আপনি বললে নিশ্চয় পারবো। বলুন কী করতে হবে?

শাশুড়ী বললে—দেখ বউমা, আমার তো কোনও অভাব নেই দেখছো তুমি? মেয়েমানুষ যা চায় আমি সে-সবই পেয়েছি। আমার এই জমজমাট সংসার, আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার গয়নাগাঁটি বাড়ি জমি-জমা টাকা-কড়ি কিছুরই অভাব রাখেন নি ভগবান। কিন্তু একটি জিনিস আমি পাই নি বউমা। তোমার শ্বশুরেরও সেই একটাই অভাব। তুমি আমাকে তা দেবে বউমা? দিতে পারবে?

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল শাশুড়ীর কথা শুনে। বললে—আমি?

—হ্যাঁ বউমা, তুমিই কেবল আমাকে তা দিতে পারো, আর কেউ দিতে পারে না। আমার বুড়ো অথর্ব শ্বশুর কবে থেকে আশা করে আছেন তার জন্যে। কিন্তু আর বোধ হয় তাঁর সে-আশা পূর্ণ হলো না?

নয়নতারা বললে—বলুন মা, আমাকে কী করতে হবে বলুন—

—কিন্তু তুমি যদি না পারো, তাহলে কী হবে? আমার শ্বশুর অসুখে পড়বার আগে আমাদের এখানকার কাঞ্চন স্যাকরাকে দিয়ে একটা কুড়ি ভরির সোনার হার পর্যন্ত গড়াবার বায়না দিয়েছেন।

তবু নয়নতারা যেন ঠিক জিনিসটা কী তা বুঝতে পারলে না। কিম্বা হয়ত শুধু খানিকটা আন্দাজ করতে পারলে।

শাশুড়ী বললে—কিন্তু খোকার কাণ্ড দেখে আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি বউমা, আমার সে সাধ বোধ হয় এ-জীবনে আর মিটবে না—

নয়নতারা এ-কথার উত্তরে কিছুই বললে না। যেমন পাখা করছিল তেমনিই পাখা করতে লাগলো। কিন্তু তখন আর সে-পাখার হাওয়া লাগছে না শাশুড়ীর গায়ে।

—কই বউমা, তুমি কোনও কথা বলছো না যে!

নয়নতারা মুখ নিচু করে বললে—আমি কী বলবো বলুন?

শাশুড়ী বললে—তুমি চুপ করে থাকলে আমি কার ভরসায় বেঁচে থাকি বলো বউমা? আর আমার কে আছে? তুমি ছাড়া এ-সাধ আমার কে মেটাবে বলো? দেখছো তো, তোমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তোমার শ্বশুর এক বাবাজীকে ধরে কত তুক্-তাক্, পূজো-যাগ-যজ্ঞ হোম করবার ব্যবস্থা করলেন। সেও একটা বুজরুক। বুজরুকের পাল্লায় পড়ে মাঝ থেকে এক গাদা টাকাই নষ্ট হয়ে গেল মিছিমিছি, কোনও ফলই হলো না। উল্টে খোকা কোথায় পুলিসের হাতে কিনা ধরা পড়লো। এখন কী হবে ভগবানই জানেন। কোথায় রইল খোকা আর কোথায় রইলে তুমি—

নয়নতারা বললে—আপনি কেন ও নিয়ে ভাবছেন মিছিমিছি মা, তাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে তো উনি গেছেন!

শাশুড়ী বললে—তুমি প্রকাশের কথা বলছো? তাহলেই হয়েছে। এতদিন এ-বাড়িতে আছো আর তুমি প্রকাশকে চিনলে না? ওর কথায় কি বিশ্বাস আছে বউমা?

—কিন্তু উনি যে এক হাজার টাকা নিয়ে গেলেন! আমি নিজের হাতে যে ওঁকে সিন্দুক খুলে টাকা বের করে দিলুম, উনি যে বললেন পুলিসকে নাকি ঘুঁষ দিতে হবে—আমি তো বাবাকে তাই-ই বললুম, বাবাও যে তাই শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন—

শাশুড়ী বললে—তা খোকা যদি ছাড়া পায় তো ভালই, তারপরে আমার আর তোমার ভাগ্য! কিন্তু আমি যে কথা তোমাকে বললুম তার তো কোনও জবাব তুমি দিলে না বউমা?

—কোন্ কথার জবাব মা?

শাশুড়ী বললে—ওই যে বললুম, আমার বড় সাধ আমি নাতির মুখ দেখবো, একটা কোল আলোকরা নাতি। তুমি আমাকে নাতি দিতে পারবে বউমা? আমি তাকে কোলে নিয়ে আদর করবো, আমি তাকে চুমু খাবো, আমি তাকে নিয়ে খেলা করবো—দেবে বউমা, দেবে?

কথার মাঝখানেই নয়নতারার পাখাটা হাত থেকে খসে পড়লো। শাশুড়ীর বুকের ওপর মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

—কী বউমা তুমি কাঁদছো? তুমি পারবে না? আমার একটা মাত্র সাধ তা-ও তুমি মেটাতে পারবে না বউমা?

নয়নতারা শাশুড়ীর বুকে মুখ রেখেই বলতে লাগলো—আপনি আমাকে কেন বউ করে আনলেন মা? এই-ই যদি আপনার মনে ছিল তাহলে অন্য কোনও মেয়েকে ঘরে আনলেন না কেন? সে হয়ত আপনার সব সাধ মেটাতে পারতো.....

শাশুড়ী দু'হাত দিয়ে নয়নতারার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলো—না বউমা, তুমি আমার বড় লক্ষ্মী বউ, তুমি পারবে, একটু চেষ্টা কোর, তুমিই পারবে বউমা—

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমি কী করে পারবো মা? আমার কি অত ক্ষমতা আছে?

শাশুড়ী বলে উঠলো—কেন পারবে না বউমা? তোমার এই রূপ দেখেই তো তোমাকে আমি বউ করে ঘরে এনেছি। তোমাকে ভগবান এত রূপ দিয়েছে আর তুমি কিনা বলছো তুমি পারবো না? আর কিছু না হোক তোমার রূপ দিয়েও তো আমার ছেলেকে ধরে রাখতে পারো! আর তা যদি না পারো তো আমি কী নিয়ে থাকবো? আমার খোকাই যদি বিবাগী হয়ে যায় তো কাকে নিয়ে আমি সংসার করবো তাই বলো?

নয়নতারা মুখ তুললো। বললে—তা আমি কী করবো বলুন, আমাকে দেখলেই যে তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে যান—

—তা খোকা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমাকে অপমান করবে আর তুমি তা বোবার মত সহ্য করবে? তোমার মুখ নেই? তুমি কথা বলতে জনো না? তুমিও তাকে অপমান করতে পারো না?

নয়নতারা বুঝতে পারলে না কথাটা। বললে—আমি পরের বাড়ির মেয়ে হয়ে এ বাড়ির ছেলেকে অপমান করবো?

—কে বললে তুমি পরের বাড়ির মেয়ে? পরের বাড়ির মেয়ে তুমি যখন ছিলে তখন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি এ-বাড়ির বউ, এ-বাড়িতে আমার ছেলের যতখানি অধিকার, তোমারও যে ঠিক ততখানিই অধিকার বউমা। তুমি ভুলে যেও না বউমা আমার ছেলে যদি তোমাকে অপমান করে তো সে-অপমান আমার গায়েও লাগে! আমার ছেলে তোমাকে অপমান করবে আমি তা সহ্য করবো না। তোমার জায়গায় যদি আমি হতুম বউমা তো আমি কিন্তু তোমার মত মুখ বুঁজে এ অপমান সহ্য করতুম না। আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতুমই—

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমি হেস্ত-নেস্ত করবো কী করে?

শাশুড়ী বললে—সেই কথাই তো তোমাকে বলছি বউমা, সেই কথা বলতেই তো তোমায় আমার কাছে ডেকে এনেছি। তুমি জোর করবে। খোকা যদি জোর করে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তো তুমিও জোর করে ঘরে আটকে রাখবে—তাও পারবে না তুমি?

—কিন্তু সেদিন তো আপনি বাইরে থেকে দরজায় শেকল দিয়ে দিয়েছিলেন, তবু তো আমাকে উনি অপমান করলেন, সারারাত আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন—

শাশুড়ী বললে—তা যদি আবার তা করে তো তুমি খোকার হাত ধরে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবে। দেখো তখন কী করে! তোমার গায়ে তো আর তা বলে হাত তুলবে না সে! তখন তো আমি আছি—

—আপনি কী বলছেন মা? আমি ওঁর হাত ধরবো? ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কাজ করবো? এর চেয়ে যে আমার মরণও ভালো! মেয়েমানুষ হয়ে এত নিচেয় নামবো?

শাশুড়ী বললে—একে তুমি নিচেয় নামা বলো? তা এতই যদি তোমার উঁচু-নিচু জ্ঞান তো মরতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিলে কেন তুমি? পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মাতে পারলে না? তাহলে আর তোমাকে এই অপমানও সইতে হতো না, আর বউ হয়ে পরের বাড়িতেও যেতে হতো না—! আর অপমানের কথা বলছো? এই পড়ে পড়ে মার খাওয়া বুঝি অপমান নয়? এ-অপমানের চেয়ে তো অন্তত সে-অপমানও ভালো! তাতে তোমার কী এমন গায়ে ফোস্কা পড়বে?

নয়নতারা অসহায়ের মত শাশুড়ীর দিকে চাইলে। বললে—তাহলে আমাকে কী করতে বলেন আপনি বলুন? আপনি যা করতে বলবেন আমি তাই-ই করবো, বলুন—

শাশুড়ী নয়নতারার থুত্নিতে হাত দিয়ে আদর করলে। যেন বড় খুশী হয়েছে প্রীতি।

বললে—এই তো লক্ষ্মী বউ-এর মত কথা। তবে শোন বউমা, প্রকাশ আজ হোক কাল হোক যখন খোকাকে নিয়ে আসবে আমি খোকাকে বলে দেব বউমাকে তার বাবা এসে কেষ্টনগরে নিয়ে গেছেন। আমি তোমার শ্বশুরকে, মামাশ্বশুরকেও সেই কথাই বলবো। তারাও জানবে যে তোমার বাপ এসে কেষ্টনগরে নিয়ে চলে গেছেন, বুঝলে?

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু আমাকে যে দেখতে পাবে সবাই—

শাশুড়ী বললে—তোমাকে দেখতে যাতে না পায় তারই ব্যবস্থা করবো—

—কী ব্যবস্থা করবেন আপনি?

শাশুড়ী বললে—আমি তোমাকে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখবো, যাতে তোমাকে কেউ দেখতে না পায়—

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—কেউ দেখতে পাবে না আমাকে?

শাশুড়ী বললে—তোমাকে দেখতে তো পাবেই না, আর জানতেও পারবে না যে তুমি এ-বাড়িতে আছো। আর গৌরী, বিষ্টুর মা, ওরা আমার হাত ধরা লোক, আমি যদি বলে দিই ওদের গলা টিপে মেরে ফেললেও ওরা কখনও সত্যি কথা বলবে না—

নয়নতারা বললে—কিন্তু বাবা মামাবাবু—ওঁরা তো ভেতর-বাড়িতে আসবেন, ওদের নজরে যদি পড়ে যাই?

শাশুড়ী বললে—আমি তো বলছি সে-ব্যবস্থা আমি করবো, সে তোমাকে ভাবতে হবে না—তোমার ঘরের পাশে যে-ঘরটা আছে আমি তোমাকে সেখানে রেখে দিয়ে বাইরে থেকে তালা-চাবি লাগিয়ে দেব। কিন্তু তুমি বলো আমি যা বলেছি তোমাকে তা তুমি করতে পারবে?

নযনতারার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। রূপ দেখিয়ে জোর করে স্বামীর ভালবাসা আদায় করতে হবে, নিজেকে অপমান করার এর চেয়ে নীচ পদ্ধতি আর কী থাকতে পারে!

শাশুড়ী বললে—কী ভাবছো বউমা? স্বামীকে বশ করার জন্যে এর চেয়ে কত নিচু কাজ মেয়েমানুষকে করতে হয় তা তুমি জানো না? রামায়ণ-মহাভারতে পড়ো নি? আর আমার সংসারের ভালোর জন্যে, তোমার আমার সকলের ভালোর জন্যে তুমি এইটুকুও করতে পারবে না?

নয়নতারা বললে—আমি চেষ্টা করবো মা, আমি পারতে চেষ্টা করবো—

ঠিক এই সময় বাইরে চৌধুরী মশাই-এর গলার শব্দ শোনা গেল—গৌরী, গৌরী—

শাশুড়ী তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। বললে—চলো বৌমা, তোমার শ্বশুর এসেছেন, শিগগির এখান থেকে চলো—নইলে তোমাকে ওঁরা দেখে ফেলবেন—

বলে নয়নতারাকে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে কোণের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর বাইরে থেকে তালা-বন্ধ করে দিলে।

গৌরী ততক্ষণে চৌধুরী মশাই-এর গলা পেয়ে সামনে এসেছে।

চৌধুরী মশাই গৌরীকে দেখেই বললেন—কী রে, কারোর যে সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে, বাবাজীর ঘর হাট করে খোলা, কোথায় গেল সব? খোকাকে নাকি পুলিস ধরেছে? আমি দু'দিন বাড়িতে নেই এরই মধ্যে এতকাণ্ড ঘটে গেল—

গৌরী বললে—বউদির অসুখ—

—বউদির অসুখ? সে কী? কী অসুখ হলো আবার? কখন অসুখ হলো?

বলত বলতে চৌধুরী মশাই নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। প্রীতি ততক্ষণে আবার নিজের ঘরের বিছানায় এসে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

চৌধুরী মশাই বললেন—কী হলো, তোমার নাকি অসুখ?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, শরীর খারাপ—

চৌধুরী মশাই বললেন—তোমার আবার এই সময়ে শরীরটা খারাপ হলো? সময়টা আমার খুবই খারাপ চলছে দেখছি। ওদিকে খোকাকে নাকি পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে? ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবাজীই বা কোথায় গেলেন?

প্রীতি বললে—সেই সব ভেবেই তো আমার শরীর খারাপ হয়েছে। তুমি আগে হাত-মুখ ধুয়ে এসো আমি বলছি—

কিন্তু খোকাকে পুলিসে ধরলো কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রকাশই বা কোথায় গেল?

প্রীতি বললে—সে গেছে কলকাতায়।

—কলকাতায় কেন?

—খোকাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে। পুলিস তাকে ধরে কলকাতায় নিয়ে গেছে। তুমি এত দূর থেকে এলে, হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসো, আমি সব বলছি—

চৌধুরী মশাই বললেন—তার আগে আমি একবার ওপরে গিয়ে বাবাকে দেখে আসি—

বলে বাইরে চলে গেলেন। চৌধুরী মশাই চলে যেতেই গৌরী ঘরে ঢুকলো। প্রীতি বললে—গৌরী, এদিকে আয়, একটা কথা শোন্, কাউকে বলিস নি যেন। বউমাকে আমি উত্তরের কোণের ঘরে লুকিয়ে তালা-বন্ধ করে রেখেছি, বুঝলি? কেউ যেন না জানতে পারে! ছোট মশাই কি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলবি বউমার বাবা এসে বউমাকে কেষ্টনগরে নিয়ে গেছে, বুঝলি? বিষ্টুর মা'কেও তাই বলে দিবি—

গৌরী বললে—কেন বউদি, কী হয়েছে?

প্রীতি বললে—তোর অত সাত-সতেরোয় দরকার কী? আমি যা বলছি তাই করবি, বুঝলি?

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সদানন্দ চারদিকে চেয়ে দেখলে। এ কোথায় এসেছে সে! কোথায় রাত কাটিয়েছে! কাদের বাড়ি!

এক মুহূর্তে আগের দিনের ঘটনাটা সব মনে পড়ে গেল। অত দেরিতে তখন আর নবাবগঞ্জে ট্রেন ছিল না, তাই পুলিসের হাজত-ঘর থেকে প্রকাশ মামা এখানে এনে তুলেছিল তাকে। প্রকাশ মামা বলেছিল—তোর কিচ্ছু ভাবনা নেই, কলকাতা শহরে রাত কাটাবার জায়গার অভাব নেই। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? আমার ট্যাঁকে টাকা রয়েছে, ভাবনাটা কীসের?

বলে এখানে নিয়ে এসেছিল তাকে। মনে আছে চারদিকের আবহাওয়া দেখে সদানন্দর কেমন সন্দেহ হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—এ কোথায় নিয়ে এলে তুমি আমাকে?

প্রকাশ মামা বলেছিল—এ জায়গার নাম কালীঘাট—

তারপরে তাকে এক টিনের চালের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উঠিয়েছিল। ছোট-ছোট মাপের সব টিনের চালের বাড়ি চারদিকে। মাঝখান দিয়ে সরু সরু গলি-রাস্তা। চারদিকে গিশ-গিশ করছে লোকজন। জনা কয়েক মেয়েমানুষও ঘুরে বেড়াচ্ছে আশে-পাশে। মাথা নিচু করে ঘরের ভেতরে ঢুকতে হয়। ঘরের ভেতরে সাজানো-গোছানো। একটা ডবল-খাট, মুখ দেখবার বড় আরশি।

প্রকাশ মামা বললে—দাঁড়া, আগে খাবার ব্যবস্থা করে আসি—

বলে প্রকাশ মামা তাকে রেখে কোথায় বেরিয়ে গেল। তারপর কোথা থেকে একটা লোককে ধরে নিয়ে এল। তার হাতে দু'থালা ভাত তরকারি।

প্রকাশ মামা বললে—আয়, বসে পড়, আগে পেট ঠাণ্ডা করি।

বলে নিজেই মাটিতে খেতে বসে পড়ল। সদানন্দও পাশে বসলো। কিছু তো খেতে হবে। কিন্তু ভাত মুখে দিতেই যেন সমস্ত ক্ষিদে চলে গেল এক মিনিটে। যেমন ঝাল আর তেমনি ঠাণ্ডা! বহুদিন পরে এই কালীঘাটের টিনের বস্তিতে রাত কাটানোর স্মৃতিটা বহুবার সদানন্দর মনে পড়েছে। জীবনের উত্তরকালে যাকে একদিন আসামী হয়ে জীবন কাটাতে হবে তার পক্ষে এই শিক্ষানবিশিটা বোধ হয় দরকার ছিল। দরকার ছিল এই কৃচ্ছ্রসাধনের। ধনীর সন্তান হয়েও তার যে সে-ধনের ওপর একদিন কোনও অধিকার থাকবে না এটাই বোধ হয় ছিল তার সৃষ্টিকর্তার বিধান। তাই কোনও অপরাধ না করেও যেমন কালীগঞ্জের বউকে খুন হতে হলো, কোনও পাপ না করেও কপিল পায়রাপোড়াকে যেমন বারোয়ারিতলার বটগাছে গলায় দড়ি দিতে হলো, তেমনি কোন অন্যায় না করেও তাকে একদিনের জন্যেই হাজত-ঘরে কাটাতে হলো। জন্মালেই যেমন মানুষকে মরতে হয় তেমনি মরবার জন্যেই মরবার আগে মানুষকে অনেকবার মরতে হয়। বার বার মরে মরে মরবার শিক্ষানবিশি করতে হয় মানুষকে। এও সেই শিক্ষানবিশির মতন। এ শিক্ষানবিশি না করলে ভালো করে মরতে পারবো কেন? ভালো করে বাঁচবার জন্যে যেমন শিক্ষানবিশি দরকার, মরবার জন্যেও তেমনি। তোমার পৈতৃক অনেক টাকা আছে স্বীকার করি, কিন্তু সেই টাকা, সেই ঐশ্বর্য তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কি রক্ষা করতে পারবে? তার চেয়ে আগে থেকেই তৈরী হয়ে নাও। যেন মরবার সময় মুখে হাসি ফোটাতে পারো।

আজ যে সদানন্দ রসিক পালের কাছারি-বাড়িতে পরান্নভোজী, সেদিনের সেই ছোটবেলার সদানন্দও ঠিক তাই-ই ছিল। তখনও ছিল সে পরান্নভোজী। বাড়ি তার বাড়ী নয়, বাবা তার বাবা নয়, মা-ও তার মা নয়, স্ত্রীও তার স্ত্রী নয়। অথচ সবাই-ই তার আপন। সবাই-ই তার আপনার জন।

প্রকাশ মামা হঠাৎ বলে উঠলো—কী রে, খাচ্ছিস না যে, আর একটা মাছ নিবি?

প্রকাশ মামা যখন খেতো তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে বসে থাকতো। এক-একজন মানুষ থাকে সংসারে যারা বোধ হয় পৃথিবীতে খাবার জন্যই বাঁচে। আবার এমন লোকও থাকে যারা বাঁচার জন্যই খায়। কিন্তু প্রকাশ মামা খেতো শুধু খাবার জন্যেই। নিজে খাবে শুধু তাই-ই নয়, পরকেও খাওয়াবে। বউ-ছেলে-মেয়েকে খাওয়াবে, রাণাঘাটের বাজারের রাধাকে খাওয়াবে। যাকে সামনে পাবে তার সঙ্গে মিলে-মিশে খাবে। যদি সদানন্দর মা না থাকতো তাহলে বোধ হয় প্রকাশ মামা না খেতে পেয়েই মরতো।

খাওয়া সেরে উঠে প্রকাশ মামা তাকে শুতে বলে কোথায় যেন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—তুই এই খাটে শুয়ে ঘুমো রে, আমি পাশের ঘরে আছি—

তিন রাত ঘুমোয় নি সদানন্দ। তার ওপর সেই বিয়ের দিন থেকেই উদ্বেগ চলেছে মনের ভেতরে। ক্লান্তিতে চোখ দুটো জুড়ে আসছিল। হঠাৎ কোথায় যেন হারমনিয়ামের সঙ্গে গানের সুর ভেসে এল। এ কোথায় নিয়ে এল তাকে প্রকাশ মামা! এ কার বাড়ি! প্রকাশ মামার সঙ্গে এদের সম্পর্কই বা কী!

হঠাৎ কে যেন ঘরে ঢুকলো। তখন বেশ তন্দ্রা এসেছে সদানন্দর চোখে। তবু পায়ের আওয়াজ কানে এসেছে।

সদানন্দ ঝাপসা অন্ধকার চেয়ে দেখলে একজন মেয়েমানুষ। মেয়েটা সোজা খাটের

ওপর শুতে গিয়ে একেবারে সদানন্দর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পড়েই চিৎকার—ওমা, আমার খাটে কে শুয়ে গো, এখানে কে?

যেন কেউটে সাপের ওপর পা পড়েছে এমনি ভাবে আঁতকে উঠে মেয়েটা দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার তার গায়ের ওপর ধপাস করে পড়লো। তারপর চিৎকার করে উঠলো—ও মাসি, দেখ তো গো, কে এখানে আমার খাটে শুয়ে রয়েছে—

মেয়েটার চিৎকার শুনে বাইরে থেকে কার গলা কানে এল—কী হলো রে বাতাসী, কী হলো? কে ধরেছে রে তোকে? কে? কোন্ হারামজাদা?

বলতে বলতে হাতে লম্ফ নিয়ে মাসি ঘরে ঢুকলো। কিন্তু ততক্ষণে বাতাসী নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। লম্ফর আলোয় ঘরটা তখন আলো হয়ে গিয়েছে। মাসি ভালো করে চেয়ে দেখল সদানন্দর দিকে। বাতাসীও চেয়ে দেখলে। একেবারে অচেনা লোক।

মাসি সদানন্দকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও চিনতে পারলে না। বাতাসীও চিনতে পারলে না। অচেনা লোক, বলা নেই কওয়া নেই কোত্থেকে তার ঘরে এসে ঘাপটি মেরে শুয়ে রয়েছে।

মাসি জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে গা? কে তোমাকে এ ঘরে এনে বসালে? বেরোও ঘর থেকে, বেরোও—

সদানন্দ ততক্ষণে উঠে বসেছে। দুজনের চেহারা দেখে কেমন সন্দেহ হলো। বললে—আমাকে এক ভদ্রলোক নিয়ে এসেছে এখানে। এখানে শুতে বলে বাইরে গেছে—

—ভদ্দরলোক? ভদ্দরলোক আমাদের এখানে আসে নাকি যে ভদ্দরলোকের কথা বলছো? আর কোথা থেকে কে একজন তোমাকে এখানে এনে শুইয়ে দিলে আর তুমিও শুয়ে পড়লে? এ কি ঘুমোবার জায়গা? এখানে কি কেউ ঘুমোতে আসে?

চেঁচামেচি শুনে আরো দু'চারজন মেয়ে এসে হাজির হলো। তারাও সদানন্দকে দেখে অবাক। বললে—এ কে গা মাসি? কার লোক?

মাসি বললে—কে জানে বাছা, ঘর খালি পেয়ে নাকি ঘুমোচ্ছে এখেনে—এখুনি যদি বড়বাবু এসে পড়ে—

কথাটা শুনে সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ঘুমোবার কথা শুনে সবারই হাসি পেল। এত বড় কলকাতা শহরে ঘুমোবার আর জায়গা পেলে না, ঘুমোতে এলো কিনা এখানে?

সদানন্দর তখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠছিল। চারপাশের এই আবহাওয়া দেখে বুঝতে পারলে প্রকাশ মামা তাকে কোথায় এনেছে। বললে—আমি যার সঙ্গে এসেছিলুম সে কোথায়?

মাসি জিজ্ঞেস করলে—কার সঙ্গে এসেছিলে তুমি? কার কথা বলছো?

সদানন্দ বললে—আমার মামা।

মাসি বললে—মামা? তা তোমার মামা কোন্ ঘরে আছে আমি জানবো কী করে বাছা? বাড়িতে কি একটা লোক? কত ঘরে কত লোক আছে তার হিসেব রাখা কি সোজা? তা তুমি বাছা বাতাসীর ঘরে থাকবে! থাকবে তো বলো! পাঁচ ট্যাকা লাগবে। রাজি থাকো তো থেকে যাও, আমার কোনও আপত্তি নেই—

সদানন্দ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমার কাছে টাকা নেই। আর টাকা থাকলেও আমি থাকতুম না। আমি একবার আমার মামার সঙ্গে কথা বলতে চাই—

মাসি বললে—তোমার মামা কার ঘরে আছে তা আমি কী জানি!

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার মামা যে বলে গেল পাশের ঘরে থাকবে—

মাসি বললে—তোমার মামাও যেমন তুমিও তেমনি। তা খালি পকেটে তোমরা কেন আসো বাছা এখানে?

সদানন্দ বললে—তাহলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দিন—আমি চলে যাই—

মাসি বললে—চলে যাবে মানে? চলে ওমনি গেলেই হলো? ঘর-ভাড়া কে দেবে শুনি? বাতাসীর ঘর-ভাড়া বাতাসী নিজের গাঁট থেকে দেবে নাকি? আমি তোমার কাছ থেকে আগে ঘর-ভাড়া আদায় করবো তবে ছাড়বো। নইলে এখুনি পুলিস ডাকবো—

তারপর পাশের একটা মেয়ের দিকে চেয়ে বললে—যা তো লা পুঁটি, গিরিধারীকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো—যা তো—

সদানন্দ এবার সোজা দরজার দিকে এগিয়ে এল। বললে—পুলিসের ভয় দেখাবেন না আমাকে, আমি পুলিসকে ভয় করি না। টাকা আমার কাছে নেই, আমাকে যেতে দিন—

বাতাসী তখন ভয় পেয়ে গিয়েছে। হাউ-মাউ করে চিৎকার করে উঠলো—ও মাসি, তোমাকে মারবে, তুমি সরে যাও—

—ইঃ, মারবে! অমনি মারলেই হলো! টাকা না দিয়ে চলে গেলে আমি পাড়ার লোক ডেকে জড়ো করবো না! তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন লা? বড়বাবুকে খবর দিলে এখখুনি কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে না—

ততক্ষণে চেঁচামেচিতে আরো লোক জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। রাত তখন কত হয়েছে কে জানে। সবাই কিল-বিল করতে করতে এসে হাজির হলো সেখানে। সকলের একই প্রশ্ন—কী হয়েছে মাসি? কী করেছে লোকটা?

মাসি বললে—দ্যাখ না মেয়ে, বাতাসীর ঘরে বসলো, এতক্ষণ বসে বসে মদ গিললো, এখন চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছে, বলে কিনা ট্যাকা নেই। ট্যাকা নেই তো ফুর্তি মারতে এখানে এসেছিলে কেন শুনি? শখ-টখ করে এখন ট্যাকা নেই বললে তোমাকে ছাড়বো কেন? এ কি ঘরের বিয়ে করা বউ পেয়েছ তুমি?

সদানন্দ আর সহ্য করতে পারলে না। সকলকে ঠেলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললে—পুলিশ আপনাদের ডাকতে হবে না, তার আগে আমিই পুলিস ডাকবো।

ততক্ষণে গিরিধারী এসে গিয়েছিল। তাকে আর কিছু বলতে হলো না। সে এসেই সদানন্দর গলা টিপে ধরেছে—চুপ কর শালা মাতাল—

কিন্তু তার কথাটা শেষ হবার আগেই সদানন্দ তাকে এক ধাক্কা দিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে উঠোনের ওপর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর বাড়ির মেয়েরা সবাই মিলে পাড়া কাঁপিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দিল। আশেপাশের যত বাড়িতে যত মেয়ে ছিল সবাই এসে হাজির—কী হয়েছে লা? কী হয়েছে তোদের বাড়িতে?

সদানন্দ তখন চিৎকার করে বলে উঠলো—আমার সামনে যে আসবে তারই ওই দশা করবো—ছাড়ো—পথ ছাড়ো—

গিরিধারীকে ধরাশায়ী দেখে সবাই-ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল তখন। কিন্তু মাসির ভয় করা চলে না। সে এ-সব ঝামেলা আগে অনেক সামলেছে। সে আর কোনও উপায় না পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো—ওগো, তোমরা সবাই এসে দেখে যাও গো, লোকটা মেয়েমোনুষের টাকা না দিয়ে পালাচ্ছে—

সদানন্দ যদিও বা চলে যেত কিন্তু চলে যেতে গিয়েও তখন থমকে দাঁড়ালো। বললে—হ্যাঁ, আসুক সবাই, আমি এই এখানে দাঁড়িয়ে রইলুম—

বললে আরো লোকজনের অপেক্ষায় সেই উঠোনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার বললে—কই, কোথায় সব? কেউ আসছে না কেন?

মাসি আবার চেঁচালে—কই গো, তোমরা কে কোথায় আছো এসো, আসামী পালাচ্ছে—

এবার দু'চারজন গুণ্ডা গোছের লোক কোত্থেকে এসে হাজির হলো। বললে—কী হয়েছে মাসি? কোন্ শালা পালাচ্ছে? কোথায় সে?

মাসিকে আর দেখাতে হলো না। সদানন্দ নিজেই বলে উঠলো—এই যে আমি!

একজন সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দর গলা ধরবার জন্যে এগিয়ে এসেছে। পেছনের তিনজনও সঙ্গে রয়েছে।

সদানন্দ বললে—খবরদার, সামনে এগোবে না, যা বলবার ওখান থেকে বলো—

—তবে রে!

সে এক হই-হই কাণ্ড বেধে গেল সেই রাত্রে। একদিকে মেয়েমানুষের কান্না, আর একদিকে পুরুষমানুষের পাড়া-কাঁপানো কথা-কাটাকাটি। আর একটু হলেই হয়ত খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যেত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে প্রকাশ মামা এসে হাজির। অন্ধকারে প্রকাশ মামাকে ভালো করে চিনতে পারে নি। একটা গেঞ্জি গায়ে, পরনে লুঙ্গি। মাথার চুল উসকো-খুসকো। পা দুটোও ঠিকমত মাটিতে পড়ছে না। কথাগুলোও স্পষ্ট নয়। সেই অবস্থাতেই টলতে টলতে এসে হাজির। গণ্ডগোলের আন্দাজ পেয়ে বাইরের উঠোনে এসেছিল। সেখান থেকে সদানন্দকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে কাছে এসেছে। এসেই সদানন্দর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ঘুঁষি বাগিয়ে চিৎকার করে উঠলো—দেখি কোন শালা মারে আমার ভাগ্নেকে, আয় শালারা, লড়ে যাবি আয়—

বলে শূন্যের মধ্যে ঘুঁষি ঘোরাতে লাগল।

সদানন্দও প্রকাশ মামাকে দেখে অবাক। এতক্ষণ যারা আস্ফালন করছিল তারাও তখন চুপ। মাসি এতক্ষণে এগিয়ে এল। বললে—এই কি তোমার ভাগ্নে নাকি বাবা! তা সে কথা তো তোমার ভাগ্নে বলে নি এতক্ষণ!

প্রকাশ মামা বললে—কে আমার ভাগ্নের গায়ে হাত তুলেছে শুনি, কোন্ শালা হাত তুলেছে আমি তার নাম জানতে চাই—

সদানন্দ বলে উঠলো—প্রকাশ মামা, আমি আর এখানে থাকবো না—

প্রাকাশ মামা, চেটিয়ে উঠলো সদানন্দের কথা শুনে—তার মানে? থাকবি না মানে? আমি টাকা দিই নি? আলবাৎ থাকবো। আমাদের হক আছে থাকবার। আমি ঘর-ভাড়ার টাকা দিইচি চলে যাবার জন্যে? আমি আমার ঘর-ভাড়া দিইচি, তোর ঘর ভাড়া দিইচি, আমি কি মুফোৎ আছি নাকি এখানে?

তারপর মাসির দিকে চেয়ে বললে—কী হলো মাসি, তুমি চুপ করে আছো যে? তোমার মুখে কথা নেই কেন? আমি তোমাকে টাকা দিয়েছি কিনা বলো! বুকে হাত দিয়ে বলো তুমি! আমি তোমায় ঘর ভাড়ার টাকা, মালের টাকা আগাম মিটিয়ে দিই নি?

ততক্ষণে সমস্ত আবহাওয়াটা যেন একেবারে উল্টে গেছে। ঘটনাটা বেশি দূর গড়ালো না দেখে সবাই যেন বিমর্ষ হয়ে যে-যার কাজে চলে গেল। গুণ্ডাগুলোও কখন অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকাশ মামার তখনও রাগ থামে নি। তার ভাগ্নের অপমান যেন তার গায়েও লেগেছে। বললে—আমিও আর থাকবো না এখানে। আমিও চলে যাবো, চল সদানন্দ, এ-বাড়িতে আর জীবনে আসবো না, এই বলে রাখলুম—চল—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? বাজারে কি মেয়েমানুষের আকাল পড়েছে?

বলে সেখানে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—রাধা, তুইও চলে আয়, এখুনি চলে যাবো এখান থেকে, এ কলকাতা শহর, টাকা ফেললে এখানে ফূর্তি মারবার জায়গার অভাব?

রাধা! ওদিকের কোন্ ঘর থেকে একটা মেয়েমানুষ ঘোমটা দিয়ে এসে হাজির হলো প্রকাশ মামার সামনে। সদানন্দ ভালো করে নজর করে দেখলে। চিনতে পারলে রাধাকে। সেই রাণাঘাটের সদরের বাজারে থাকতো। প্রকাশ মামা তাকে নিয়ে গিয়েছিল রাধার বাড়িতে। সে এখানে এল কী করে?

মাসি বললে—তুমি রাগ করছো কেন বাবা? আমি কি জানতুম ও তোমার ভাগ্নে!

প্রকাশ মামা বললে—চিনতে না পারলেই তুমি অপমান করবে তাকে? জানো, ও কত বড়লোকর ছেলে? তোমার মত হাজারটা মাসিকে ও পুষতে পারে তা জানো?

মাসি বললে—তা চিনতে না পারলে কী করবো বাবা? ওকে বাতাসীর ঘরেই বা তুমি রেখে দিয়েছিলে কেন? জানো তো ও বড়বাবুর বাঁধা মেয়েমানুষ। বড়বাবু নিজে ওকে এখানে এনে রেখে গেছে—

প্রকাশ মামা বললে—ও-ঘরে কেউ থাকে তা আমি জানবো কী করে? আগে যখন এসেছি তখন তো ও-ঘরটা বরাবর খালি পড়েই থাকতো। আমি কি আজকে প্রথম আসছি তোমার বাড়িতে? আমি সব সইতে পারি কিন্তু অপমান আমার ধাতে সয় না—আমার ভাগ্নেকে তুমি অপমান করেছ, আমি তা সইবো না। চল রাধা, আমার কাপড়টা দে, আমি এখানে আর থাকছি না—

মাসি আর থাকতে পারলে না তখন। প্রকাশ মামার হাত দুটো খপ করে ধরে ফেললে। বললে—আমার ঘাট হয়েছে বাবা, তুমি কিছু মনে কোর না। তুমি থাকো—

প্রকাশ মামা বললে—না, আমি কিছুতেই থাকবো না—আমার রাগ তুমি জানো না, রাগ হলে আমি কারোর নই—

রাধা বললে—হ্যাঁ গো, মাসি এত করে বলছে থাকো না—আমি যে তোমাকে বলেছিলুম কালীঘাটের মন্দিরে মায়ের পূজো দেব, কালীঘাটের গঙ্গায় চান করবো—

—তুই থাম মাগী! আগে তোর গঙ্গাচ্চান না আগে আমার ভাগ্নে? দেখছিস আমার ভাগ্নেকে অপমান করেচে মাসি, আর এখন কিনা তোর গঙ্গাচ্চানটাই বড়ো হলো? তোরা বাজারের মেয়েমানুষ, তোদের আবার গঙ্গাচ্চান কী হবে রে? তোদের পাপ কোনওকালে ঘুচবে ভেবেছিস?

কিন্তু মাসি ছাড়লে না। প্রকাশ মামার হাত দুটো ধরে বলতে লাগলো—তুমি রাগ কোর না বাবা, আমি বুড়োমানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলেছি, তুমি চলো। তোমার ভাগ্নেকেও আমি যেতে দেব না, আমি বাতাসীকে বলে দিচ্ছি তোমার ভাগ্নেকে তার ঘরে বসাবে। আগে তো ঘরখানা খালি পড়েই থাকতো, এই ক'মাস হলো বড়বাবু বাতাসীকে এনে ওখানে তুলেছে—

প্রকাশ মামা সদানন্দর দিকে চাইলে। বললে—কী রে? থাকবি তুই? এরা এত করে বলচে!

সদানন্দ বললে—না, আমি আর থাকবো না এখানে—

মাসি বললে—কিন্তু এত রাত্তিরে কোথায় যাবে বাবা? গাড়ি-ঘোড়া বাস-ট্রাম তো বন্ধ সব! রাত্তিরটা অন্তত আমার এখানে কাটাও, তোমার মামা আমার পুরোন খদ্দের, খদ্দের হলো গিয়ে লক্ষ্মী, তোমরা চলে গেলে আমার কি ভালো হবে বাবা বলতে চাও? আমার অকল্যেণ হয় তাই কি চাও বাবা তোমরা?

প্রকাশ মামাও বললে—ওরে, যাকগে, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—তুই থেকে যা, একটা রাত্তিরের তো মামলা, কাল ভোরবেলা উঠেই ট্রেন ধরে নবাবগঞ্জে চলে যাবো—

কিন্তু কথার মধ্যেই বাধা পড়লো। বাইরের দরজায় যেন কারা এসে হাজির হলো। মাসি ভেতর থেকেই বলে উঠলো—কে গো? কে ওখানে?

কিন্তু তার আগেই গিরিধারী দৌড়ে এসেছে—মাসি, বড়বাবু এসেছে—

বড়বাবু কথাটা শুনেই মাসি যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে—ওমা, বড়বাবু? নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়—

সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলো। বেশ লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা। পায়ের জুতো মশ মশ আওয়াজ করছে। কোট-প্যান্ট পরা ভব্যসভ্য মানুষ। মুখে সিগারেট। গায়ে ভুর-ভুর করছে মদের সুগন্ধ।

মাসি সামনে গিয়ে যেন একেবারে জুজু হয়ে দাঁড়ালো। বললে—আসুন বড়বাবু, কী ভাগ্যি আমার, আপনার চরনের ধুলো পড়লো আমার বাড়িতে—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম—

বড়বাবু কোনও দিকে না চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—বাতাসী আছে?

মাসি বললে—আছে বইকি বড়বাবু, বাতাসী আপনার জিনিস, যাবে আবার কোথায়? আসুন, আসুন—

তারপর চেঁচিয়ে ডাকলে—ওলো ও বাতাসী, কোথায় গেলি রে? কে এসেছে দ্যাখসে, তোর বাবু এসেছে—

বড়বাবু সদানন্দ প্রকাশ মামা রাধা সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা বাতাসীর ঘরের দিকে চলতে লাগলো। সামনে দিয়ে যাবার সময় সদানন্দ হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখটা দেখেই চমকে উঠেছে। এ সেই পুলিস ইনসপেক্টরটা না? এই লোকটাই তো তাকে থানার হাজতে বার বার জেরা করেছিল। এই লোকটাই তো তাকে জেরা করতে গিয়ে কখনও শাসিয়েছিল, কখনও ভয় দেখিয়েছিল, কখনও লোভ দেখিয়েছিল, আবার কখনও মিষ্টি কথা বলেছিল। আসলে কি এরাও সব এই রকম। এইসব লোক দিয়েই কি এরা চোর-ডাকাত-গুণ্ডা ধরবে? এরাই রাজত্ব চালাবে? রেল-বাজার কিম্বা নবাবগঞ্জের সঙ্গে তাহলে কলকাতা শহরের কোনও তফাৎ নেই!

প্রকাশ মামার গলা শোনা গেল হঠাৎ—কী রে, কী দেখছিস? দেখলি তো কত বড় বড় লোক সব এখেনে আসে? দেখতে টিনের চালের বাড়ি হলে কী হবে, এখেনে যারা আসে তারা সবাই আমাদের মত ভদ্দরলোকের ছেলে, জানিস? তোকে আমি বাজে জায়গায় নিয়ে এসেছি ভাবিস নি—একেবারে খানদানি বাড়ি—

কিন্তু সদানন্দর কানে এসব কথা ঢুকলো না। তার মাথায় তখন অন্য কথা ঘুরছে। আগে প্রকাশ মামার ওপর তার ঘেন্না হচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ মামা তাকে এখানে না নিয়ে এলে তো সে এই শহরের আর একটা দিক দেখতেও পেত না। জানতেও পারতো না যে দিনের বেলা যাদের দেখে মানুষ শ্রদ্ধা করে, ভয় পায়, সমাজের গণ্য-মান্য বলে মাথা উঁচু করে বেড়ায়, রাত্রের অন্ধকারে তাদের আর এক চেহারা, আর এক রূপ! আর এক প্রবৃত্তি।

উত্তরের কোণের ঘরের ভেতরে নয়নতারা তখন চুপ করে বসেছিল। ঘরটা এমনি একটা বাড়তি ঘর। কেউ থাকেও না কখনও। থাকবার দরকারও হয় না। এককালে কর্তাবাবু যখন এ-বাড়ি করেছিলেন তখন ভেবেছিলেন ছেলে-মেয়ে-নাতনিতে তাঁর ঘর ভরে যাবে। কিন্তু তাঁর নিজের সন্তান বলতে হলো ওই একটা মাত্র। তা এক ছেলেই কি কম! সেই এক ছেলের ছেলে-মেয়ে হলেও তো বাড়ি ভরে যাবার কথা। কিন্তু তাও হলো না। হলো মাত্র একটি নাতি। ওই সদানন্দ যখন হলো তখন মস্ত ঘটা করে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারপর আরো ক'বছর কাটলো। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল। কিন্তু আর কোনও সন্তান হলো না ছেলের। কর্তাবাবুর ঘরবাড়িও আগেকার মতই ফাঁকা পড়ে রইলো।

সন্ধ্যেবেলার দিকে একবার চুপি চুপি শাশুড়ী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

বললে—বউমা, তোমার ভয় পাচ্ছে না তো?

নয়নতারা বললে—না মা—

শাশুড়ী বললে—ভয় পেও না, আমি বাইরেই আছি। খোকা তো এখনও এল না, প্রকাশেরও তো দেখা নেই---

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—আপনি কেমন আছেন?

—আমার কথা ছেড়ে দাও বউমা। আমি নিজের কথা আর ভাবছি না। তোমার শ্বশুর রাণাঘাট থেকে এসে জিজ্ঞেস করছিলেন তোমার কথা। আমি বলেছি তুমি বেয়াই মশাই-এর সঙ্গে কেষ্টনগরে চলে গেছে—

তারপর একটু থেমে বললে—আমি এখন আসি বউমা, নইলে কেউ আবার টের পেয়ে যাবে। তোমাকে আজকে আগে-আগে খাইয়ে দেব। তখন তুমি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পোড়, বাইরে থেকে আমি তোমার দরজায় তালা লাগিয়ে দেব, তাহলে আর কেউ টের পাবে না। আবার ভোর না হতে দরজা খুলে দেব—

এই রকম ব্যবস্থাই হলো। কিন্তু বিকেল হলো, সন্ধ্যে হলো, তবু খোকাও এলো না, প্রকাশও এলো না।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কই, প্রকাশ তো এখনও এলো না—আমি নিজে একবার যাবো কলকাতায়?

প্রীতি বললে—তুমি গিয়ে আর কী-ই বা করবে। ও-সব কাজ প্রকাশই করবে ভালো। আর তুমি চলে গেলে এদিকটা আবার কে সামলাবে? বাড়িতে এই কর্তাবাবুর অসুখ, এখন এখানে একজন পুরুষ-মানুষ না থাকলে চলে?

তা বটে। চৌধুরী মশাই বুঝলেন। কিন্তু তিনি যুক্তি বুঝলে কী হবে, মন তো যুক্তি বুঝতে চায় না। তাঁর মনের সমস্ত খেই যেন হারিয়ে গেছে একদিনের মধ্যেই। একদিনের মধ্যেই যেন তাঁর সমস্ত দৈনন্দিন কাজগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও তো একটা শৃঙ্খলা থাকে। সেই শৃঙ্খলাটা নষ্ট হলেই মন বড় বিপন্ন হয়। অথচ যে-মানুষটা বড় বেশি করে সংসার-ধর্ম করতে চেয়েছিলেন তাঁর আর কোন দিকেই হুঁশ নেই। তিনি অচল-অটল হয়ে পড়ে আছেন। জানতেও পারছেন না যে তাঁর এত সাধের সংসারের ভিতেই আজ ফাটল ধরেছে। কৈলাশ গোমস্তা আর দীনুই কেবল তাঁকে সামলাচ্ছে। আগে রাণাঘাট থেকে ছেলে ফিরে এলে মামলার ধারাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। মামলা করে করে কর্তাবাবু মামলার ঘুণ হয়ে গিয়েছিলেন শেষের দিকে। উকিলকেও কর্তাবাবু মামলার খেই ধরিয়ে দিতেন। সেই তিনিই আজ জানতে চাইছেন না কোর্টে কতদূর কী হলো। জানতেও চাইছেন না তাঁর অত আদরের নাতি কোথায় গেল। তিনি সুস্থ থাকলে কি আর এই অবস্থায় বউমাকে বাপের বাড়ি যেতে দিতেন!

পরের দিন রাত থাকতে নয়নতারাকে জাগিয়ে দিয়েছে শাশুড়ী।

—কী বউমা, রাত্তিরে তোমার ভয় করে নি তো?

নয়নতারা বললে—না মা—

শাশুড়ী বললে—এখনও ভোর হয় নি, তোমার শ্বশুর এখনও ঘুমোচ্ছেন, তাড়া-তাড়ি তুমি তৈরী হয়ে নাও, তারপরে আবার তোমাকে উত্তরের ঘরে রেখে দিয়ে আমি দরজায় তালা দিয়ে দেব—

নয়নতারা হঠাৎ বললে—মা—

শাশুড়ী বললে—কী বউমা?

—আজকেও যদি ওঁরা ফিরে না আসেন?

শাশুড়ী বললে—যদি না আসে তো তোমার কপাল! কাল সারা রাত তো কেবল ভগবানকে ডেকেছি। তুমিও ভগবানকে ডাকো বউমা। নিশ্চয়ই তিনি মুখ তুলে চাইবেন। একমনে ডাকলে কি আর ভগবান মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন? বেহুলার গল্প জানো তো? সেই বেহুলা কেমন করে তার মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছিল সে গল্প তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ! তা তুমিও পারবে বউমা। ভগবান সহায় থাকলে কোনও কাজই মানুষের অসাধ্য নয়। তুমি সব সময়ে একমনে তাঁকে ডাকো, নিশ্চয়ই ফিরে আসবে খোকা—

সত্যিই নয়নতারা তখন ভগবানে বিশ্বাস করতো। তারপরে আঘাত পেতে পেতে কখন যে একদিন তার সব বিশ্বাসের সলিল-সমাধি হয়ে গিয়েছিল তা তার চিরকাল মনে থাকবে। কিন্তু কেন তার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল? কেন আস্থা হারালো সে? আস্থা হারালো কি শুধু ভগবানের ওপর? আস্থা হারালো নিজের জীবনের ওপর, নিজের শ্বশুর, শাশুড়ী সকলের ওপর। যে-বিশ্বাস হারিয়ে একদিন সদানন্দ শেষ পর্যন্ত অমন আসামী হয়ে গেল, নয়নতারাও তো সেই আস্থা হারিয়েই একদিন আত্মঘাতী হতে গিয়েছিল।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

পরের দিন সন্ধ্যে কেটে রাত হয়েছে।

শাশুড়ী আবার ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো। বললে—খেয়ে নাও বউমা, খাবার এনেছি—

খেতে বসে নয়নতারার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো।

শাশুড়ী বললে—কেঁদো না বউমা, কাঁদতে নেই। কাঁদবার কথা তো আমার, কিন্তু আমি তো কাঁদছি না। আমি যদি কাঁদতুম তো কবে আমার এই সংসার করা ঘুচে যেত বউমা, তা জানো? কাঁদবার দিন অনেক পাবে বউমা। এত তাড়াতাড়ি চোখের সব জল ফুরিয়ে দিও না। শেষকালে যখন একটার পর একটা শোক-তাপ পাবে তখন কাঁদবার মত চোখে অত জল কোথায় পাবে বলো তো? তুমি তো সবে সংসারে ঢুকলে, এরই মধ্যে যদি এত কান্না পায় তাহলে শেষ জীবনে কী করবে?

নয়নতারা শাশুড়ীর কথায় চোখের জল মুছে একটু শক্ত হবার চেষ্টা করলে। কোনও রকমে খাওয়াটা সারলে। যেন নিয়ম রক্ষে করলে।

শাশুড়ী বললে—এরকম উপোস করে থাকলে তো তোমার চলবে না বউমা। না খেলে তখন আরো দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন তোমার অপমানের শোধ নেবে কী করে?

হঠাৎ বাইরে থেকে প্রকাশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—দিদি, দিদি—সদাকে নিয়ে এসেছি—দিদি—

চৌধুরী মশাই তখন দোতলায় কর্তাবাবুর কাছে ছিলেন। তাঁর কানেও আওয়াজটা পৌঁছোল। আওয়াজটা পেয়েই তিনি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে নেমে এলেন।

—কই, কই, খোকা কই?

প্রকাশের পেছনেই সদানন্দ শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেলে?

প্রকাশ মামা বললে—সহজে কি ছাড়ে জামাইবাবু? পুলিসে ছুঁলে তো আঠারো ঘা, সে তো কথাতেই আছে। কিন্তু এ আবার পুলিসের বাবা। কলকাতার পুলিস। হাজার টাকার কমে তো কথাই বলতে চায় না। শেষে হাতে-পায়ে ধরতে তবে কথা রাখলে।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—তা খুব কষ্ট হয়েছে তো?

প্রকাশ মামা বললে—কষ্ট বলে কষ্ট। হাতে তো টাকা ছিল না বেশি। সব তো পুলিসের পেটে ঢুকিয়েছি। শেষে যে-কটা পয়সা ছিল তাতে গাড়ি ভাড়াটা কোনও রকমে দিয়ে তবে আসতে পেরেছি—নইলে কলকাতার রাস্তাতেই আমাদের রাত কাটাতে হতো—

তারপর আর দাঁড়ালো না সেখানে। বললে—যাই, আগে দিদিকে খবরটা দিয়ে আসি গে, দিদি হয়ত আবার খুব ভাবছে—

চৌধুরি মশাই বললেন—তোমার দিদির তো আবার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে—

প্রকাশ মামা বললে—সে তো আমি যাবার সময়ই দেখে গেছি, খোকার আসার খবর পেলেই দিদির শরীর ভালো হয়ে উঠবে—

তারপর ভেতর-বাড়ির বারান্দায় গিয়ে ডাকতে লাগলো—দিদি দিদি—

প্রীতি প্রকাশের গলার আওয়াজ পেয়ে আর সময় নষ্ট করে নি। বউমাকে নিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলে।

নয়নতারাকে বলে দিলে—যা বলেছি তা তোমার মনে আছে তো বউমা?

নয়নতারা ঘাড় নাড়লে।

—হ্যাঁ, মনে রেখে দিও, ভুলো না যেন। খোকা যেন জানতে না পারে যে তুমি ঘরে আছো। আমি ওদের বলবো তুমি বাপের বাড়ি চলে গেছ, বুঝলে? আজ খোকাকে বোঝানো চাই যে তুমিও অপমানের শোধ তুলতে পারো, বোঝানো চাই মেয়েমানুষ হলেও তুমি একজন মানুষ, বোঝানো চাই যে তোমার মান-অপমান লজ্জা-সম্ভ্রম বলে একটা জিনিস আছে, আরো বোঝানো চাই খোকার যেমন অধিকার আছে এ-বাড়ির ওপর, তোমারও তেমনি সমান-সমান অধিকার আছে, বুঝলে? যা যা বলছি তাই ঠিক-ঠিক কোর, যেন ভয় পেও না। খোকা যদি ঘর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তো তুমি যেন ওকে জোর করে ধরে রাখতে ভয় পেও না। আর আমি তো আছি, ও যদি তোমাকে কিছু করে তখন আমি তোমার দিকে আছি, তুমি আমাকে ডেকো। আমাকে চেঁচিয়ে ডাকলেই আমি ছুটে আসবো, বুঝতে পারলে? এখন আমি চললুম—

বলে দরজায় তালা বন্ধ করে প্রীতি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো।

বাইরে থেকে প্রকাশ ডাকতে ডাকতে ভেতরে এল।

বললে—কই গো দিদি, কোথায় গেলে, তোমার খোকাকে তো এনেচি, উঃ, সে কী কাণ্ড, কলকাতায় গিয়ে কম হেনস্তা আমার। আমি না গেলে সদাকে ছাড়িয়ে আনাই যেত না—

তারপর বউমার ঘরের দিকে চেয়ে বললে—বউমা কোথায়?

প্রীতি বললে—বউমার বাবা এসেছিল, বউমাকে নিয়ে কেষ্টনগরে চলে গেছে—

—সে কী? এই সময়ে তুমি বউমাকে বাপের বাড়ি যেতে দিলে? এত কষ্ট করে সদাকে হাজত-ঘর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম আর ঠিক এই সময়েই কিনা বউমা চলে গেল বাপের বাড়ি? এই তো সবে সেদিন বাপের বাড়ি থেকে এল বউমা, আবার এরই মধ্যে বাপের বাড়ি যাওয়া?

দিদি সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কই? খোকা কোথায়? খোকা যে আমার কাছে এল না?

প্রকাশ বললে—আমি ডেকে নিয়ে আসছি—

খোকা এসেছে, এই খবরটাই যেন একটা অসুস্থ মানুষের রোগ-মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। প্রীতির শরীরটা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে হাল্কা হয়ে উঠলো।

প্রকাশ মামা আবার বললে—ওঃ, সদার জন্যে যে কী ঝঞ্ঝাট গেল তোমায় কী বলবো দিদি। কথায় বলে পুলিসে ছুঁলে আঠারো ঘা, তার ওপর আবার কলকাতার পুলিস। সোজা আঙ্গুলে তো সেখানে ঘি ওঠে না। আমিও তাই ব্যাঁকা রাস্তা ধরলুম। আমি বললুম সদাকে ছাড়াতেই হবে। তার জন্যে যত টাকা লাগে তা আমার জামাইবাবু খরচা করতে প্রস্তুত। তা টাকার কথা শুনেই পুলিসের মুখের চেহারা বদলে গেল। আমার হাতে তখন কাঁচা নোটগুলো রয়েছে। সেগুলো দেখে বললে—কত আছে ওতে? আমি বললুম—পাঁচশো—

দিদি বললে—তা পাঁচশোতে রাজি হয়ে গেল?

প্রকাশ মামা বললে—ক্ষেপেছ? তেমন বান্দাই নয় তারা—

—তারপরে?

—তারপরে শেষ পর্যন্ত সাতশো টাকায় রফা হলো। নগদ টাকাটা চুকিয়ে দিতেই হুকুম হয়ে গেল আসামী খালাস। তখন দেখি কাঁদতে কাঁদতে সদা আসছে। না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে সদার মুখ একেবার শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে! কান্নায় চোখ ফুলে একেবারে ঢোঁপাকুল!

দিদি বললে—আহা, তা বাছাকে খেতেও দেয় নি? সারাদিন না খেয়ে কাটিয়েছে? প্রকাশ মামা বললে—সে তোমার ভাবনা নেই। পুলিস না খেতে দিক, আমি পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছি তোমার খোকাকে। কী কী খাইয়েছিলুম শুনবে? বড় বড় রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা সন্দেশ, তারপর রাবড়ি। তাতেও পেট ভরে না। শেষকালে তোমার ছেলে বলে ভাত খাবো। তা নিয়ে গেলাম তোমার ছেলেকে হোটেলে। সেখানে গিয়ে পোনা মাছের কালিয়া আর সরু বালাম চালের ভাত খাইয়ে দিলুম। বললুম—খা, যত পারিস পেট ভরে খেয়ে নে। আমার কাছে তখনও তিনশো টাকা রয়েছে—

কিন্তু অত খাওয়ার কথা শুনতে তখন ভালো লাগছিল না প্রীতির। বললে—খাওয়ার কথা রাখ তুই, খোকা এখনও আসছে না কেন, তাকে ডেকে দে না—

চৌধুরী মশাই তখন সদানন্দকে নিয়ে পড়েছিলেন। সব শুনে বললেন—তা তুমিই বা ওই কালীগঞ্জের পোড়ো বাড়ির মধ্যে গিয়েছিলে কেন? সেখানে তোমার কী আছে? কে থাকে সেখানে?

সদানন্দ বললে—কেউ না—

—কেউ যদি না থাকে তো তোমার সেখানে যাবার দরকার কী ছিল? বাড়িতে তোমার মন টেঁকে না? বাড়িতে তোমার যদি কোনও কাজ না থাকে তো চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে সেরেস্তার খাতা-পত্তোরগুলো দেখলেও তো পারো। তা দেখলেও তা আমার উপকার হয়। সেটাও কি তোমার দ্বারা হবে না?

সদানন্দ এ-কথার কোন জবাব দেওয়া দরকার মনে করলে না।

—বলি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে? আমি যা বলছি তা তোমার কানে যাচ্ছে না, না কথাগুলো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাও না! ভাবছো যা বলছি আমার ভালোর জন্যেই বলছি—তোমার ভালোটা দেখছি না? কিন্তু আমার ভালোটা কি তোমারও ভালো নয়? এই যে এত খেটে-খুটে সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি ; এ কি আমি নিজে ভোগ করবো বলে? আমি মরবার সময় এ-সব আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো বলে? এ সব তো তখন তুমি একলাই ভোগ করবে! সব তো তোমারই রইল। আমরা আর কদ্দিন? আমিও থাকবো না, তোমার মা-ও থাকবে না। তখন তুমি আর বউমাই এ-সব ভোগ-দখল করবে। তখন আমরা দেখতেও আসবো না এ-সব তোমরা উড়িয়ে দিলে না বেচে দিয়ে রাস্তার ফকির হয়ে গেলে। কিন্তু

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তো আমাকে বাপের কর্তব্য করে যেতে হবে।

সদানন্দ এবারও কোনও কথার জবাব দিলে না।

চৌধুরী মশাই তখন রেগে গেলেন। বললেন—তুমি কি ঠিক করেছ আমার কোনও কথারই জবাব দেবে না? আমার সঙ্গে আর কথাই বলবে না? তা যদি ঠিক করে থাকো তো বলো, এখন থেকে বলে দাও। আমি তাহলে সেই রকম ব্যবস্থাই করবো। তোমার মত বেয়াদব ছেলেকে কী করে টিট্ করতে হয় তাও জানি—

নয়নতারাকে খাইয়ে-দাইয়ে ততক্ষণে শাশুড়ী তার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকার ঘর। বাইরে থেকে শাশুড়ী আবার দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দিয়ে চলে গেছে। নয়নতারার বুকটা কাঁপছিল। শ্বশুরের সঙ্গে তার স্বামীর কথাগুলো কানে আসছিল। কান পেতে কথাগুলো সে একমনে শুনতে লাগলো। সবাই জেনে গেছে নয়নতারা কেষ্টনগরে চলে গেছে। এতটুকু টুঁ শব্দ করা চলবে না। তাহলেই জানাজানি হয়ে যাবে যে সে এ-বাড়িতেই আছে।

একদিকে ভেতর-বাড়িতে শাশুড়ীর সঙ্গে তার মামাশ্বশুরের কথা হচ্ছে। তাও কানে যাচ্ছে। আবার ওধারে তার শ্বশুরের গলা।

এই রকম বন্দী অবস্থায় সে কাল রাতটা কাটিয়েছে, তারপর আজ সমস্ত দিনটাও কাটলো। আরো কতক্ষণ তাকে এমন করে কাটাতে হবে কে জানে! আর একটু পরে খাওয়া -দাওয়া সেরে যখন তার স্বামী এ-ঘরে শুতে আসবে, তখন?

শাশুড়ী তাকে পাখি-পড়া করে শিখিয়ে দিয়েছে। অনেক কথাই শিখিয়ে দিয়েছে তাকে। কথাগুলো মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কাঠ হয়ে এল শরীরটা। একটা বিপদ ঘটাবার আগেই যেন সে ভয়ে ভয়ে মুহূর্ত গুনতে লাগলো। বেহুলা তার স্বামীকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। তাকেও কি সেই বেহুলা হতে হবে!

নয়নতারা এক মনে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কল্পনা করে নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলো—ভগবান আজকে তুমি আমার মুখ রেখো। শুধু আমার নয়, সকলের মুখ রাখবার ভার তোমার ওপর ভগবান। আমি যেন পারি। আমি যেন আমার স্বামীর মন ফেরাতে পারি। আমাকে তুমি সাহস দিও, শক্তি দিও, সামর্থ্য দিও—আমি যেন হেরে না যাই—

হঠাৎ শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—এসেছিস্ খোকা?

তার স্বামীর গলার কিছু আওয়াজ শোনা গেল না। কিন্তু নয়নতারা বুঝতে পারলে তার স্বামী ভেতর-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে।

নয়নতারা কান পেতে রইল সেদিকে। সমস্ত বাড়িটার ক্ষীণতম শব্দও যেন তার কানকে এড়িয়ে যেতে না পারে। তার মামাশ্বশুরের গলা শোনা গেল এবার।

প্রকাশ মামা বললে—মা'র দুঃখু কি ছেলে বুঝতে পারে দিদি, কোনও ছেলেই তা বুঝতে পারে না। আমি নিজেই তো মাকে কত কষ্ট দিইছি। তখন বুঝতুম না, এখন মা নেই, এখন বুঝতে পারছি—

শাশুড়ী সে-কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেকে আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন আমাদের কথা শুনিস না বল তো বাবা? আমাদের কথা শুনলে তো তোর আজ আর এই এত হেনস্তা ভোগ করতে হতো না—। এত ভালো বাড়ি থাকতে তুই কেন গিয়েছিলি বাবা সেই কালীগঞ্জের পোড়ো বাড়ির ভেতরে? ডাকাত যদি না-ও থাকতো তো সাপ-খোপও তো থাকতে পারে? সেখানে ঢোকা কি ভালো? এ না-হয় পুলিসের কাছে টাকা-কড়ি দিয়ে খালাস করে আনা গেল, কিন্তু যদি সাপ-খোপে কামড়াতো, তখন? তখন কী হতো?

চৌধুরী মশাইও এবার ভেতরে এলেন। বললেন—ও শুনবে না আমাদের কথা, তুমি ওকে হাজার বলো, কোনও কথাই ওর কানে ঢুকবে না। তুমি যেসব কথা বলছো আমি ওকে সেই সব কথা অনেক বলেছি। ও যে কী ভাবে, কী করে, কী ওর মতলব, আমি কিছুই বুঝি না—

শাশুড়ী বললে—তুমি আবার ভেতরে এলে কেন? ওকে যা বলবার আমিই তো বলছি, তুমি তোমার নিজের কাজ করো না গিয়ে—

চৌধুরী মশাই ধাক্কা খেয়ে আবার বাইরে চলে গেলেন। ডাক্তার আসবার কথা ছিল একটু পরে। তিনি সেই জন্যেই বাইরে অপেক্ষা করে করে যখন ডাক্তার এলোই না তখন বাড়ির ভেতরে এসেছিলেন। স্ত্রীর কথা শুনে আবার বাইরে চলে এলেন। দীনু এসে ডাকলো।

বললে—ছোট মশাই, ডাক্তারবাবু এসেছেন, আসুন—

বহুদিন আগে একদিন সদানন্দর যখন অসুখ হয়েছিল তখন এই ডাক্তারই দেখে গিয়েছিল তাকে। এই ননী ডাক্তার। অসুখ সামান্য। কর্তা মশাই তখন সুস্থ মানুষ। জিজ্ঞেস করেছিলেন—ডাক্তার কত টাকা নিলে কৈলাস?

কৈলাস সামন্তই বরাবর সব হিসেব রাখতো। খাতা দেখে বললে—আজ্ঞে ওষুধ আর ভিজিট মিলিয়ে সতেরো টাকা—

সতেরো টাকা? যেন সাপের মুখের সামনে পা বাড়িয়েছেন এমনি করে কর্তা মশাই আঁতকে উঠেছিলেন টাকার অঙ্কটা শুনে। অকারণ বাজে খরচ যেমন দেখতে পারতেন না কর্তা মশাই তেমনি ডাক্তার-খরচটাও কর্তা মশাই বাজে খরচ বলে মনে করতেন।

কিন্তু আজ আর তিনি বুঝতেও পারছেন না তাঁর অত সাধের টাকা-পয়সা কেমন করে তাঁর নিজের অসুখের সূত্রে জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে। একদিন দুটো পয়সা লোকসানের অভিযোগে তিনি কপিল পায়রাপোড়ার অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন। একদিন মানিক ঘোষ দুপুরবেলা ক্ষেত থেকে এসে ভাত খেতে বসেছিল, সেই অবস্থায় ওই বংশী ঢালীর দল গিয়ে তার ভাতের থালা পা দিয়ে উল্টে দিয়েছিল। দিয়ে টিনের চাল খুলে নিয়ে তাকে সপরিবারে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। তার অপরাধ? অপরাধ সে সময়মত তার হাওলাত নেওয়া টাকার সুদ দিতে পারে নি। অনেক টাকা বাকি পড়ে গিয়েছিল। তারপর ফটিক প্রামাণিক! তার কথাও সবাই জানে। ফটিক প্রামাণিকের দুটো গাইগরু কর্তা মশাই-এর ধানক্ষেতে গিয়ে মুখ দেওয়ার অপরাধে তার খড়ের চালে হঠাৎ একদিন আগুন লেগে গেল। সেই আগুনে ফটিক প্রামাণিকের বউ তো পুড়ে মারা গেলই, ফটিক নিজেও সেই শোকে একদিন পাগল হয়ে গেল।

অথচ সেই লোকসানের গুণোগার দেবার জন্যেই বোধ হয় তার ছেলের শালা রাণাঘাটের রাধাকে গঙ্গাস্নান করাতে কালীঘাটে নিয়ে যায়। ননী ডাক্তারের পেছনে হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ হয়ে যায়। আর নাতি, যে নাতি তাঁর বংশে বাতি জ্বালাবে বলে কাঞ্চন স্যাকরাকে কুড়ি ভরির সোনার হার গড়াবার বায়না দেন তার ভাবী ছেলের অন্নপ্রাশনের উপহার হিসেবে, সে তার নতুন বউএর দিকে ফিরেও চেয়ে দেখে না। তবু আজ এ-সব কিছুই তাঁর নজরে পড়ে না। তিনি যেন তখন শিলীভূত মাংস-পিণ্ড। তাঁকে ধরে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, তাঁর ঠোঁট ফাঁক করে ওষুধ খাইয়ে দিতে হয়।

চৌধুরী মশাই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতেন—আর কতদিন এমন করে বাঁচাবেন ডাক্তারবাবু?

ননী ডাক্তার বলতো—তা কি বলা যায়? কত মানুষ এমনি করে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে।

—কিন্তু যদি মারাই যাবেন তাহলে আর চিকিৎসা করে লাভ কী?

ননী ডাক্তার বলতো—তা বলে নিজের বাবাকে কেউ মেরে ফেলতে পারে?

চৌধুরী মশাই বলতেন—কিন্তু ওঁর দিকে তো আর চেয়ে দেখতে পারি না। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন না?

—কী ব্যবস্থা করবো?

কী যে ব্যবস্থা ননী ডাক্তার করবে আর কী ব্যবস্থার প্রস্তাব চৌধুরী মশাই করতে চান তা দুজনের কেউই খুলে বলতেন না। কিন্তু বুঝতে পারতেন দুজনেই। একমাত্র রোগীকে হত্যা করা ছাড়া এর যে আর কোনও প্রতিকার নেই তা বোধ হয় দুজনেই জানতেন। জানতেন বলেই সে-কথাটা আর কেউই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে অপরাধের ভাগী হতে চাইতেন না।

কিন্তু রাণাঘাটের সদরে বসেই মনে মনে সংকল্প করে নিয়েছিলেন চৌধুরী মশাই। সংকল্প করে নিয়েছিলেন—আর নয়। প্রতিদিন এতগুলো টাকা খরচ! খরচের অঙ্কটা হিসেব করতেই চৌধুরী মশাই-এর আতঙ্ক হতো। এতগুলো টাকা! এই টাকা খরচেরও কি শেষ নেই? আরোগ্যের কোনও আশাই যখন নেই তাহলে কেন এই খরচান্ত হওয়া? এর প্রতিকার তো তাঁর নিজের হাতেই আছে! তবে?

এই 'তবে'র উত্তর খোঁজবার জন্যেই তিনি কদিন ধরে ছটফট করছিলেন। যদি খরচান্ত হওয়া নিরর্থক হয় তাহলে তো কর্তাবাবুকে বাঁচিয়ে রাখাও নিরর্থক! অথচ এই নিরর্থক জিনিসটাকে এতদিন ধরে শুধু কর্তব্য আর মানবতাবোধের দোহাই দিয়ে তিনি বরদাস্ত করে চলেছেন। কিন্তু কতদিন, আর কতদিন এমন করে বরদাস্ত করা সম্ভব হবে?

ডাক্তারবাবু নিয়ম করে সেদিনও রোগীকে পরীক্ষা করলে। যেমন করে রোগীর বুকে স্টেথিসকোপ বসিয়ে বুকের সুস্থতা পরীক্ষা করা নিয়ম, তেমনি করেই পরীক্ষা করলে। দু'একটা নিয়মমাফিক প্রশ্নও করলো। যেমন রোজই করে।

আর তারপর হাত বাড়িয়ে টাকা ক'টা নিয়ে চলেই যাচ্ছিল। রাত বাড়ছে। বাড়িতে তার আরও অনেক রোগী। বাড়ির বাইরেও অনেক রোগী তার অপেক্ষায় বসে মুহূর্ত গুনছে।

চৌধুরী মশাই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এলেন।

পেছন থেকে ডাকলেন—ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার পেছন ফিরলো।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কর্তাবাবুকে আজ কেমন দেখলেন?

ননী ডাক্তার বললে—কী রকম আর দেখবো? সেই একই রকম।

চৌধুরী মশাই বললেন—তা রোজ যদি একই রকম দেখেন তাহলে আপনার রোগী দেখতে আসারই বা কী দরকার আর ওষুধ খাওয়ানোরই বা কী দরকার? ওষুধ কিনতেও তো টাকা লাগে!

ননী ডাক্তার বললে—তা লাগে। টাকা লাগলে যদি আপনার বাজে-খরচ বলে মনে হয় তো তাহলে আর ওষুধ খাওয়াবেন না—

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। ভাবছি ওষুধ তো আর ওঁর কাজে লাগছে না।

ননী ডাক্তার বললে—না, কাজে আর লাগবেও না।

—তাহলে ওষুধ না দিয়ে কী করবো?

—যদি যন্ত্রণা বাড়ে তো একটু করে আফিম খেতে দিন। টাকাও কম খরচ হবে আর যন্ত্রণাও কমবে।

বলে আর দাঁড়াল না ডাক্তার। উঠোন পেরিয়ে সদর দিয়ে সাইকেলে উঠে বসলো। তারপর ঘন্টা বাজিয়ে রাস্তার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চৌধুরী মশাই সেই অন্ধকার বারান্দার ওপরেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আফিম? কিন্তু আফিমই বা কিনতে যাবেন কেন? আফিম কিনতেও তো পয়সা লাগে! আর আজ রাত্রের মধ্যে আফিমই বা আসছে কোথা থেকে? কাল দিনমানের আগে তো আর রেল-বাজারের আবগারি দোকান খুলছে না। আর আফিম কিনতে গেলেও তো তার একটা প্রমাণ থেকে যাবে। প্রমাণ থেকে যাবে যে চৌধুরী মশাই-এর লোক কর্তাবাবুর মারা যাবার আগের দিন রেল-বাজারের আবগারি দোকান থেকে আফিম কিনে নিয়ে গিয়েছিল। এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কী? তার বদলে সোজা পথ তো অনেক খোলা রয়েছে।

চৌধুরী মশাই নিজের করণীয় কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। একেবারে নিশ্চিন্ত। তারপর আবার সোজা একেবারে ওপরে উঠে গেলেন। কর্তাবাবুর তখনও সেই একই অবস্থা। নিশ্চল নিথর হয়ে শুয়ে আছেন।

কৈলাস গোমস্তা তখন কর্তাবাবুকে ওষুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিল। চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—ওষুধ তৈরি করছো কার জন্যে?

কৈলাস বললে—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু যে বলে গেলেন!

চৌধুরী মশাই বললেন—না, ডাক্তারবাবু আমাকে অন্য কথা বলে গেলেন। আর ওষুধ খাওয়াতে হবে না আজ থেকে—

—খাওয়াতে হবে না?

—না

ঘরময় ওষুধের শিশি-বোতল জমে একদিন পাহাড় হয়ে উঠেছিল। সেগুলোর দিকে চেয়ে দেখলেন চৌধুরী মশাই। যতগুলো শিশি-বোতল তার একশো গুণ টাকা করচ হয়েছে। সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে এতদিন। কিন্তু এতদিন যা হয়েছে তা হয়েছে, এবার থেকে আর তা নয়! এবার থামা। কর্তাবাবু সজ্ঞানে থাকলে তিনিও এত টাকা নষ্ট হতে দিতে আপত্তি করতেন। কর্তাবাবুর কাছেও তাঁর জীবনের চেয়ে টাকার দাম বেশি ছিল। তিনি জানতে পারলে এ অনাচার হতে দিতেন না কখনও। এত বেহিসেব তিনিও কখনও সহ্য করতেন না।

বললেন—ওই শিশি-বোতলগুলো কাল এ-ঘর থেকে সব সরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বংশী ঢালীর ঘরের পাশে জমা করে রাখবে। তারপর রেল-বাজারে গিয়ে পুরোন শিশি-বোতলের দোকানে বিক্রি করার ব্যবস্থা করবে, বুঝলে?

কৈলাস গোমস্তা মাথা নাড়লে বটে, কিন্তু একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক তার মনটায় জুড়ে বসলো। তবে কি কর্তাবাবুর এবার চলে যাবার সময় এসেছে! তাহলে তার চাকরি! তার চাকরিটাও কি চলে যাবে কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে!

বললে—ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন ছোট মশাই? কর্তাবাবু কি আর বাঁচবেন না?

চৌধুরী মশাই রেগে গেলেন। বললেন—আমি যা বলছি আগে তাই করো। কর্তাবাবু বাঁচবেন কি বাঁচবেন না, তা নিয়ে তুমি কেন অত মাথা ঘামাচ্ছো—?

তারপর একটু থেমে বললেন—আর একটা কথা। রাত্তিরে তুমি তো এখানেই শোও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিই তো আমাকে এতদিন এখানেই শুতে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, আমি বলেছিলুম বটে, কিন্তু এখন থেকে তোমার আর এখানে শোবার দরকার নেই, আজ থেকে তুমি তোমার নিজের বাড়িতেই গিয়ে শুয়ো—

—আজ্ঞে তাই-ই শোবো।

চৌধুরী মশাই দীনুর দিকে চাইলেন—আর তুই?

দীনু বললে—আজ্ঞে আমি তো বরাবর ওই বাইরের বারান্দাতেই শুই—

—তা তাই-ই শুবি। আমি আজ থেকে কর্তাবাবুর ঘরের ভেতরে শোব।

বলে আবার সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এলেন। মাথাটার মধ্যে সমস্ত ঝঞ্ঝাটগুলো যেন কিল্ বিল্ করতে লাগলো। এমনিতে ধীর স্থির মানুষ চৌধুরী মশাই। সহজে নুয়ে পড়েন না। কিন্তু সেদিন যেন কেমন আতঙ্ক হতে লাগলো বুকের মধ্যে। এতদিন ধরে তিনি অনেক সহ্য করেছেন। এখন সহ্যের সীমা উৎরে গেছে। এখন একটা হেস্ত-নেস্ত করবার সময় এসে গেছে।

সুযোগ জীবনে একবারই আসে। ঠিক সেই সুযোগের সময়েই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কর্তাবাবু বহুদিন আগে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বংশী ঢালীকে ডেকে কালীগঞ্জের বউ খতম্ করার হুকুম দিয়েছিলেন। তারপরই তিনি দেখে গেছেন তাঁর নাতির বেয়াড়াপনা বন্ধ। নাতির এত যে কথা সে-সব ফুলশয্যার রাত্রেই ঠাণ্ডা। সুন্দরী বউএর মুখ দেখেই জোয়ান ছেলের মাথা ঘুরে গেছে। তারপরে সেই কালীগঞ্জের বউকে দশ হাজার টাকা দেবার কথা আর সে মুখে আনে নি। ছেলেকে ডেকে কর্তাবাবু বলেছিলেন—কী হলো? আমি যা বলেছিলুম তা ঠিক-ঠিক ফলেছে তো?

চৌধুরী মশাই সব জেনেও মিথ্যে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—হ্যাঁ ফলেছে—

—আর দশ হাজার টাকা দেবার নামগন্ধ করে?

চৌধুরী মশাই বলেছিলেন—না।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—আর নাম-গন্ধ করবেও না। দেখে নিও। আর কখনও বেয়াড়াপনা করবে না। তোমরাই তো তখন ভয় পেয়েছিলে সবাই। বলেছিলে কালীগঞ্জের বউকে টাকাটা দিয়ে দেওয়াই ভালো! তা এখন দেখলে তো, তোমরা যেটা বলেছিলে সেটা ভালো ছিল, না আমি যেটা বলেছিলুম সেইটেই ভালো! সেই-ই ফুলশয্যার রাত্তিরে খোকা বউ-এর সঙ্গে শুলো তো? বলো, শুলো কি না?

চৌধুরী মশাই বলেছিলেন—হ্যাঁ, শুলো, আপনি যা বলেছিলেন তাই-ই হলো।

—তা হলে তোমাদের কথা শুনলে মাঝখান থেকে আমার শুধু-শুধু দশটি হাজার টাকা জলে চলে যেত!

—তা যেত।

—তোমরা ছেলেমানুষ তাই এখনও কিছু বোঝ না। জমি-জমা রাখতে গেলে এসব বুদ্ধি খরচ করতে হয়। এই যা কিছু করেছি দেখছো সমস্ত এমনি করেই করেছি, বুঝলে? যদি সম্পত্তি রাখতে চাও তো মায়া-দয়া করলে চলবে না, মায়া-দয়া করলে সব গোল্লায় যাবে—

কর্তাবাবুর 'মায়া-দয়া' কথাটাই বিশেষ করে মনে পড়লো চৌধুরী মশাই-এর। মায়া-দয়া করলে নাকি জমি-জমা-টাকা-কড়ি সমস্ত চলে যাবে, কিছুই থাকবে না। না, আর মায়া-দয়া কিছুই করবেন না তিনি। কারোর ওপরেই মায়া-দয়া নয়। এমন কি কর্তাবাবুর ওপরেও মায়া-দয়া নয় আর। আজ রাত্রেই মায়া-দয়ার গলা টিপে মারবেন তিনি।

সোজা নিচেয় এসে আবার ভেতর-বাড়িতে ঢুকলেন। রান্না-বাড়ির বারান্দায় গৃহিণী একলা বসে ছিল।

কাছে এসে চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? তোমার শরীর খারাপ, তুমি ঠাণ্ডার মধ্যে এখানে বসে কেন? খোকা কই?

—খোকা পুকুরঘাটে গেছে, হাত-পা ধুতে। তাকে খেতে দেব।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—খোকা কী বললে?

প্রীতি বললে—কী আবার বলবে! খুব কষ্ট হয়েছে, এই সব কথাই বললে—

—না, সে-কথা নয়। বউমা বাপের বাড়ি চলে গেছে শুনে কিছু বললে নাকি?

প্রীতি বললে—না।

—জিজ্ঞেস করলে না কেন বাপের বাড়ি গেল! কে তাকে নিয়ে গেল!

—না।

চৌধুরী মশাই প্রসঙ্গ বদলে বললেন—আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব, আজ থেকে আমি কর্তবাবুর ঘরে শোব—

প্রীতি বললে—কেন? গোমস্তা মশাই তো থাকে সেখানে?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, আজ থেকে তাকে থাকতে বারণ করেছি আমি। বলেছি, এবার থেকে নিজের বাড়িতে গিয়ে শুতে—

—তা তুমি যে শোবে, বিছানা?

—দীনুকে বিছানা করতে বলে দিয়েছি, গৌরীকে বলো আমার খাবার দিয়ে দিতে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি গে যাই, আমার কিছু ভালো লাগছে না—। কর্তাবাবুর অসুখও সারবে না, আর আমারও ঝামেলা শেষ হবে না। ননী ডাক্তার এখনি বলে গেল কর্তাবাবু নাকি এই রকম করেই বরাবর বেঁচে থাকবে—

প্রীতি বললে—তা মানুষ যদি বেঁচে থাকে তো তুমি কী করবে? তা বলে তো আর কাউকে গলা টিপে মেরে ফেলা যায় না। যতদিন কপালের ভোগান্তি আছে ততদিন সহ্য করতেই হবে—

চৌধুরী মশাই বললেন—কী বলছো তুমি? সহ্যও করবো আবার ওষুধও খাইয়ে যাবো? ওষুধ কিনতে বুঝি টাকা লাগে না? বলো তো এ ক'দিনে কতগুলো টাকা মবলক জলে চলে গেল! ওই টাকায় পাঁচশো বিঘে জমি হয়ে যেত আমার। বুঝতুম যে ওতে অসুখ ভাল হয়ে যাবে তা হলেও না-হয় মনে কিছু লাগতো না, কিন্তু এ যে ন-দেবায় ন-ধর্মায়....

এমন সময় রান্নাবাড়ির দাওয়ায় গৌরী ভাত দিয়ে গেল। চৌধুরী মশাই গিয়ে খেতে বসলেন। কিন্তু খেতে-খেতেও কর্তাবাবুর কথাগুলো তাঁর মাথার মধ্যে ঘুর-ঘুর করতে লাগলো—যদি সম্পত্তি রাখতে চাও তো মায়া-দয়া করলে চলবে না। মায়া-দয়া করলে সব গোল্লায় যাবে—

সত্যিই আর মায়া-দয়া নয়। মায়া-দয়া করলে সব গোল্লায় যাবে। কিচ্ছু থাকবে না। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে নাকে-মুখে খাবারটা গুঁজে একেবারে দোতলায় কর্তাবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলেন আবার। কৈলাস গোমস্তা তখন তার বাড়ি চলে গেছে। আজ থেকে তার আরাম। আর দুর্গন্ধের মধ্যে তাকে রাত কাটাতে হবে না।

দীনু দাঁড়িয়ে ছিল। চৌধুরী মশাই বললেন—তুই আর মিছিমিছি দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, নিচেয় গিয়ে গৌরীর কাছে খাবার চেয়ে খেয়ে নিগে যা—

দীনু চলে যেতেই চৌধুরী মশাই কর্তাবাবুর কাছে সরে এলেন। সত্যিই কর্তাবাবু তখন একটা অচল মাংসপিণ্ড বই আর কিছু নয়। একটু চেতনাও নেই মানুষটার। এত যে বিছানার দুর্গন্ধ তাতেও মানুষটার কোনও বিকার নেই। পঞ্চেন্দ্রিয় লোপ পেয়ে গেছে তবু মানুষটা বেঁচে আছে কেমন করে কে জানে! অথচ এই মানুষটারই এককালে কত বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল। শুধু বুদ্ধি-বিবেচনা নয়। কূট বুদ্ধি-বিবেচনা। সেই কূট বুদ্ধিতে কোর্টের হাকিম-পেশকার-উকিল-মুহুরি মোকতার সবাই হিমসিম খেয়ে যেত। এই মানুষটাই একদিন বলেছিল—'যদি সম্পত্তি রাখতে চাও তো মায়া-দয়া করলে চলবে না। মায়া-দয়া করলে সব গোল্লায় যাবে!' কিন্তু আজ আমিও যদি সম্পত্তি রাখবার জন্যে মায়া-দয়া না করি। আমি আজ মায়া-দয়া করলে তো এই সব সম্পত্তিও গোল্লায় যাবে। তা হলে?

চৌধুরী মশাই নিজের দু'হাতের দুটো দুড়ো আঙ্গুল পরীক্ষা করে দেখলেন। ওষুধ লাগবে না, বিষ লাগবে না, ছোরা লাঠি কিছুই লাগবে না, শুধু এই দুটো বুড়ো আঙুল দিয়েই সব শেষ করে দেওয়া যায়।

—কে? কে তুমি?

চৌধুরী মশাই চমকে উঠেছেন। কর্তাবাবুর কি তবে জ্ঞান আছে যে সব টের পাচ্ছেন তিনি?

—তুমি কে? কথা বলছো না কেন? কথার জবাব দাও। তোমাকে তো আমি খুন করে ফেলেছি, তবে আবার কী করে তুমি এখানে এসেছ? তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলে মনে আছে? তুমি বলেছিলে আমি নির্বংশ হবো, বলেছিলে তুমি বামুনের মেয়ে, তোমার অভিশাপ ফলবেই! মনে আছে?

বলতে বলতেই কর্তাবাবু ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

—কিন্তু ফলেছে কী? আমার নাতি কি তোমার কথা শুনেছে? সুন্দরী বউ পেয়ে সে সব ভুলে গেছে কালীগঞ্জের বউ, সব ভুলে গেছে। সে এখন রোজ বউ-এর সঙ্গে এক ঘরে শোয়। তা জানো? আমি আমার বংশধরের মুখ দেখবো বলে কাঞ্চন স্যাকরাকে সোনার হারের বায়না দিয়ে রেখেছি। তুমি যাও এখন, যাও—আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না, তুমি যাও, যাও—চলে যাও বলছি।

হঠাৎ হারিকেন নিয়ে দীনু ঢুকতেই আবার সব চুপ।

চৌধুরী মশাই বললেন—খাওয়া হলো তোর?

—আজ্ঞে হ্যা।

—তাইলে তুই শুয়ে পড় বারান্দায়, আমি এখানেই শোব।

দীনু বারান্দায় গিয়ে বিছানা পাতলে। চৌধুরী মশাই তখনও একদৃষ্টে চেয়ে দেখছেন কর্তাবাবুর মুখের দিকে। কই, কিছু তো নেই! এ তো ঠিক আগেকার মত নিথর নিশ্চল শিলীভূত মাংসপিণ্ড! এর তো কথা বলবার কোনও ক্ষমতা নেই। তবে এতক্ষণ কে কথা বলছিল! না, আর মায়া-দয়া করলে চৌধুরী বংশ গোল্লায় যাবে—মায়া-দয়া আর তিনি করবেন না।

বাইরে তখন দীনুর নাক-ডাকা শুরু হয়ে গেছে। চৌধুরী মশাই আর দেরি করলেন না। টিপি টিপি পায়ে আবার এগিয়ে গেলেন কর্তাবাবুর দিকে।

আবার কর্তাবাবু চিৎকার করে উঠলেন—কে? কে তুমি? তোমাকে তো আমি খুন করে ফেলেছি, তবে আবার কী করে তুমি এখানে এলে? কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল? কৈলাস, কৈলাস—

দীনুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়ফড় করে উঠে ভেতরে এসেছে। বললে—ছোট

মশাই, আমাকে ডাকছেন?

ছোট মশাই দীনুকে দেখেই নিজেকে সামলে নিলেন।

বললেন—না, আমি তো ডাকি নি—

দীনু নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল। চলে যেতেই চৌধুরী মশাই আবার উঠলেন। না, মায়া-দয়া করলে চলবে না। মায়া-দয়া করলে চৌধুরী বংশ গোল্লায় যাবে—

চৌধুরী মশাই টিপি টিপি পায়ে কর্তাবাবুর দিকে আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কালীগঞ্জের বউ যে মিছিমিছি কর্তাবাবুকে অভিশাপ দেয় নি—তার প্রমাণ সেই দিন রাত্রেই পাওয়া গেল। সদানন্দ আর নয়নতারার জীবনে সে এক স্মরণীয় রাত। নয়নতারা এতক্ষণ তার নিজের ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে ছিল। এবার যেন সে তার অন্তরাত্মার আর্তনাদ শুনতে পেলে। তার অন্তরাত্মা তখন আর্তনাদ করে তাকে বলছে—খোকা তোমাকে অপমান করলে তুমিও তাকে অপমান করতে পারো না? তোমার গায়ে জোর নেই?

নয়নতারার মনে হলো সে যেন এখনি দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তুমি যখন পরের বাড়ির মেয়ে ছিলে তখন ছিলে, এখন তুমি এ-বাড়ির বউ। এ সংসারের ওপর খোকারও যতখানি অধিকার, তোমারও অধিকার ঠিক ততখানি। কোনও অংশে এতটুকু কম নয়। তাহলে তোমার কিসের ভয়? খোকা যদি তোমার গায়ে হাত তোলে তুমিও তার গায়ে হাত তুলবে! আমি তো পাশের ঘরেই আছি, তুমি আমাকে ডাকবে। ডাকলেই আমি ছুটে যাবো। তুমি ভয় পেও না বউমা, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ বলে কি সব কিছু তোমাকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে?

হঠাৎ দরজাটার তালা খোলার শব্দ হলো।

শাশুড়ীর গলা শোনা গেল বাইরে। শাশুড়ী বললে—তুই শুয়ে পড়গে যা, আলো নিতে হবে না, গৌরী তোর বিছানা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছে—

নয়নতারা দেখলে মানুষটা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। তারপর আর কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। বোধ হয় খুবই ক্লান্ত ছিল। শুধু শুয়ে পড়তেই যা দেরি, তারপরেই লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো তার।

এত কাছে, এত ঘনিষ্ঠভাবে মানুষটার সঙ্গে কখনও থাকে নি নয়নতারা। অথচ যতটা পেরেছে বিছানার একেবারে শেষপ্রান্তে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে সে। মানুষটা জানেও না যে যাকে সে সব চেয়ে এড়িয়ে চলতে চায় সে তারই সঙ্গে এক ঘরের এক ছাদের তলায় আর একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে।

এমনি করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওঠা-পড়ার শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? তবু শুনতে হবে, তবু এক ঘরে এক বিছানায় প্রতি রাত্রে শুতে হবে। এই-ই হচ্ছে বিধান। তাতে তোমার শয্যাসঙ্গী তোমাকে ঘৃণাই করুক আর তাচ্ছিল্যই করুক।

হঠাৎ অজান্তে নয়নতারার হাতের চুড়ির শব্দ হতেই মানুষটা চমকে বিছানায় উঠে বসেছে।

—কে?

—তারপর বোধ হয় অস্পষ্ট অন্ধকারে একটা কিছু অনুমান করেই মানুষটা আর বিছানায় বসে থাকতে পারলে না। উঠেই সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে খিল খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু নয়নতারা তার আগেই গিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে।

বললে—কোথায় যাচ্ছো?

নয়নতারার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার সদানন্দ বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে নি। তাই প্রথমটায় একটু হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল।

নয়নতারা বললে—আমি তোমার কী করেছি যে তুমি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছো?

সদানন্দ নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললে—আমাকে ছেড়ে দাও, আমার হাত ছাড়ো, আমি বাইরে যাবো—

নয়নতারা তবু সদানন্দর হাত ছাড়লো না। শরীরে যত জোর ছিল—তাই দিয়ে সদানন্দর হাতটা চেপে ধরে বললে—না, তোমাকে ছেড়ে দেব না, আগে বলো তোমার কাছে আমি কী দোষ করেছি যে তুমি আমার ঘরে থাকবে না? আমাকে তোমার এত ঘেন্না কেন?

সদানন্দ এমন অবস্থার জন্যে তৈরি ছিল না। বিয়ের পর এতদিন কেটে গেছে, কিন্তু এই মোকাবিলার ঝামেলায় যে তার স্ত্রী'ই এক দিন তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে, তার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চাইবে জবাব চাইবে তার জানা ছিল না। জানা থাকলে তার দিকের জবাবদিহিটাও সে আগে থেকে তৈরি করে রাখতো। আর তা ছাড়া সে যদি জানতে পারতো নয়নতারা এই ঘরের ভেতরেই নিঃশব্দে শুয়ে আছে তাহলে কি সে-ই এ ঘরে শুতে আসতো!

মুখে প্রকাশ করবার মত কোনও তৈরি জবাব না থাকাতে সে আবার বললে—আমার হাত ছাড়ো—হাত ছাড়ো বলছি—

নয়নতারা বললে—হাত ছাড়লে কি তুমি আমার কথার জবাব দেবে?

সদানন্দ নয়নতারার তরফ থেকে এতখানি দৃঢ়তা আশা করে নি। বললে—তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এমন কোনও অন্যায় আমি করি নি। তুমি আমার হাত ছাড়ো বলছি—

নয়নতারা তবু হাত ছাড়লে না। তেমনি ভাবে সদানন্দর হাতটা ধরে রেখেই বললে—ন্যায় অন্যায়ের কথা কেন তুললে? আমি তো ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুলি নি। আমি শুধু তোমার এই রকম ব্যবহারের কারণ জানতে চেয়েছি।

সদানন্দ বললে—আমি তোমার সঙ্গে কী এমন খারাপ ব্যবহার করেছি? আমি তো তোমাকে কোনও রকম কষ্ট দিই নি, এ বাড়িতে তোমার আদর-যত্নের কোনও ত্রুটি হয়েছে, তাও তো নয়।

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমি তো সে কথাও বলি নি তোমাকে। আমি কি তোমাকে কখনও বলেছি শ্বশুরবাড়িতে এসে আমার আদর-যত্ন হচ্ছে না? কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, এটা তো সত্যি? এটা তো অস্বীকর করতে পারবে না? আগুন সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছ। তারপরেও কি আমার ওপর তোমার কোন কর্তব্য নেই?

—কর্তব্য? সদানন্দ কথাটা শুনে যেন নিজের মনেই শব্দটা একবার উচ্চারণ করলে।

—হ্যাঁ, কর্তব্য! আমার ওপরেও তো তোমার একটা কর্তব্য আছে। বউ-এর ওপর স্বামীর যেমন একটা কর্তব্য থাকে তেমনি।

সদানন্দ বললে—তোমার সঙ্গে আমি কর্তব্য করা নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। এটা ঝগড়া করবার সময়ও নয়।

—ঝগড়া?

নয়নতারা যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—ঝগড়া আমি তোমার সঙ্গে কখন করলুম? আমি কি তোমার সঙ্গে একটাও ঝগড়ার কথা বলেছি? আর এখন যদি কথাগুলো না বলি

তো কখন বলবো? তোমার সঙ্গে আমার দেখাই বা হচ্ছে কখন? তুমি তো আমাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নাও—

সদানন্দ বলে উঠলো—দেখ, বিয়ে আমি তোমাকে করেছি সত্যি, কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাকো যে, আমি তোমার সঙ্গে স্বামীর মতন ব্যবহার করবো, আমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করবো তো সে কথা তুমি ভুলে যাও। তোমার সঙ্গে পারতপক্ষে আমার দেখা হবে না—

নয়নতারা সদানন্দর এই স্পষ্ট কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—এই-ই কি তোমার শেষ কথা?

সদানন্দ বলেল—হ্যাঁ, এই-ই আমার শেষ কথা। কিন্তু এর পরেই তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করবে, তাহলে আমি তোমায় বিয়ে করলুম কেন! তার উত্তরে বলি আমি ভুল করেছিলুম। আমি অন্য লোকের কথায় বিশ্বাস করে ভুল করেছিলুম। আমাকে তারা সবাই স্তোকবাক্য দিয়েছিল। সেই তাদের কথা বিশ্বাস করাই আমার অন্যায় হয়েছিল। সেই বিশ্বাস করার মধ্যে যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে তো স্বীকার করছি আমি অন্যায় করেছি। তার জন্যে তুমি আমায় যা শাস্তি দেবে আমি তা মাথা পেতে নিতে রাজি আছি—

নয়নতারার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। কিন্তু অনেক কষ্টে তা চেপে রেখে বললে—শাস্তি? আমি তোমায় শাস্তি দেব? স্ত্রী হয়ে আমি তোমাকে শাস্তি দেব?

—তা অন্যায় যখন করেছি তখন শাস্তি অস্বীকার করবো কী করে?

নয়নতারা বললে—যখন অন্যায় করেছিলে তখন তো শাস্তির কথা তোমার মনে পড়ে নি? তখন তখন শাস্তির কথাটা মনে পড়লে হয়ত আমার জীবন এমন করে নষ্ট হতো না—হয়তো আমি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতুম!

সদানন্দ খানিকক্ষণ কী ভাবলে। তারপর বললে—তুমি শাস্তিও দেবে না আবার যন্ত্রণাও ভোগ করবে, এর প্রতিকার আমি কী করে করবো বলো তো?

নয়নতারা বললে—কিন্তু তুমিই বলে দাও আমি তোমায় কী শাস্তি দেব?

সদানন্দ বললে—তোমার যা শাস্তি মনে পড়ে তাই-ই দাও, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু ওই যে বললুম তোমার সঙ্গে পারতপক্ষে আমার দেখা হবে না—

—কিন্তু আমি যদি সেই শাস্তিই দিই? আমি যদি বলি তোমাকে রোজ রাতে আমারই ঘরে আমারই বিছানায় শুতে হবে?

সদানন্দ যেন একটু দ্বিধায় পড়লো। বললে—আমি তোমার সব শাস্তি মাথা পেতে নেব, শুধু ওই একটা শাস্তি ছাড়া—

—কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, ও কি তোমার কাছে একটা শাস্তি?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ।

নয়নতারা সদানন্দর হাতটা তখন ছেড়ে দিয়েছে। হাত ছেড়ে দিয়ে আরো কাছে এসে সদানন্দর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বললে—তাহলে আমি কী করবো?

—তুমি কি করবে তা তুমিই জানো, আমি কী বলবো?

—কিন্তু আমি তো তোমার স্ত্রী! স্ত্রীকে সাহায্য করাও তো স্বামীর একটা ধর্ম! তুমি না সাহায্য করলে কে আমায় সাহায্য করবে? আমার আর কে এখানে আছে?

সদানন্দ বললে—কেন, তোমার শাশুড়ী আছে, শ্বশুর আছে, তোমার নিজের বাবা আছে। কে নেই তোমার? কীসের অভাব তোমার? স্বামী যার নেই সে কি বেঁচে থাকে না? মনে করো আমি নেই। মনে করে নাও বিয়ের পরই তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, আমি মরে

গিয়েছি। এমন কি হয় না? এমন তো পৃথিবীতে কত মেয়ের জীবনে ঘটছে! আর তারাও তো বেঁচে আছে—

নয়নতারা বললে—এসব তুমি কী বলছো?

সদানন্দ বললে—যা বলছি তা ঠিকই বলছি। এখন আমায় যেতে দাও—

নয়নতারা দরজার দিকে পিঠ করে সদানন্দর দিকে চেয়ে রইল। বললে—আমি তোমাকে যেতে দেব না, এতদিন পরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবার একটা সুযোগ পেয়েছি, এ সুযোগ আমি ছাড়বো না। আজকে তোমাকে আমার কাছে থাকতেই হবে।

—তার মানে তোমার হুকুম মেনে আমাকে চলতে হবে, এই বলতে চাও?

—হুকুম বললে যদি তোমার পৌরুষে ঘা লাগে তাহলে অনুরোধ বলো। আমার এ অনুরোধ না হয় শুনলেই।

সদানন্দ বললে—যে অনুরোধ রাখা সম্ভব নয় তেমন অনুরোধ তুমি আমাকে কোর না। আমি তোমাকে মিনতি করছি, তোমার অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না।

—কিন্তু কেন? কেন আমার অনুরোধ রাখতে পারবে না তুমি? আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় নি? আমাকে কি খারাপ দেখতে? আমার বাবা-মা কিম্বা আমি কী তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছি?

—না।

—তাহলে?

সদানন্দ বললে—বলছি তো, তুমি সুন্দরী। তোমার মত সুন্দরী বউ কম লোকেরই আছে। কিন্তু তাতে কী? আমি তো তোমার কোনও দোষ দিচ্ছি না।

—তবে কার দোষ?

সদানন্দ বললে—দোষ যে করেছে আমি তাকে শাস্তি দেবার জন্যেই তোমার অনুরোধ রাখতে পারছি না। তুমি জানো না কত তাদের দোষ! তুমি জানো না তারা কত নিষ্ঠুর তারা কত নীচ! শুনলে তোমারও ঘেন্না হবে তাদের ওপর। জানতে পারলে আমার জন্যে তোমারও কষ্ট হবে নয়ন। তখন আর আমাকে ঘরে শুতে অনুরোধ করবে না—

—আমি জানি।

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি জানো? তুমি সব শুনেছ?

—শুনেছি।

—কালীগঞ্জের বউকে আমাদের এই বাড়িতে খুন করা হয়েছে তা তুমি শুনেছ? জানো, তার কোনও অপরাধ ছিল না? এই যা কিছু আমাদের সম্পত্তি দেখছো সব তাদের টাকায়। মা'র সিন্দুকের মধ্যে কত টাকা-কড়ি-গয়না-হীরে-মুক্তো আছে সব সেই কালীগঞ্জের বউ-এর টাকায় কেনা।

নয়নতারা বললে—জানি।

—তাও জানো তুমি? আর এও কি জানো তুমি যে সেই কালীগঞ্জের বউকে কর্তাবাবু দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল? তাও পাছে দিতে হয় তার জন্যেই তাকে খুন করা হয়েছে? তুমি জানো, কপিল পায়রাপোড়া বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের, সে কর্তাবাবুর অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে? জানো তুমি, মানিক ঘোষ নামে একজন প্রজা একদিন ভাত খেতে বসেছিল, সেই ভাতের থালা আমাদের বংশী ঢালী পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বাকি খাজনার দায়ে? জানো, ফটিক প্রামাণিক বলে আর একজন....

নয়নতারা কথার মধ্যিখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো—জানি জানি, আমি সব জানি—

কথা বলতে বলতে সদানন্দ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল। বললে—তুমি জানো?

—হ্যাঁ জানি। এতদিন তোমাদের বাড়িতে এসেছি, কানও খুলে রেখেছি, জানতে পারবো না? শুধু আমি কেন, এ-বাড়ির কারো সে-সব জানতে আর বাকি নেই—বলতে গেলে বোধ হয় এ গাঁয়েরও সবাই তা জানে।

—তাহলে? তাহলে কেন তুমি এর পরেও আমায় এ অনুরোধ করছো?

নয়নতারা বললে—যারা দোষ করেছে তাদের তুমি যত ইচ্ছে শাস্তি দাও না, আমি কিছু বলতে যাবো না, আমি কী দোষ করলুম যে আমাকে তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে?

সদানন্দ বললে—এর উত্তর তুমি চাও?

নয়নতারা বললে—এর উত্তর না দিলে আজ আমি তোমাকে ঘর থেকে যেতে দেব না। তোমাকে বলতেই হবে তোমার কর্তাবাবুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে কেন?

সদানন্দ বললে—কর্তাবাবুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে যাবে কেন? প্রায়শ্চিত্ত করবো আমি। আমিই কর্তাবাবুর একমাত্র বংশধর। আমি চাই আমার সঙ্গেই এ বংশের শেষ হয়ে যাক, এ বংশ নির্বংশ হোক, এ বংশ থেকে সব পাপ নিশ্চিহ্ন হোক—এ বংশ পবিত্র হোক—

নয়নতারা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—কিন্তু আমার কথার জবাব তো আমি পেলুম না! তুমি করবে প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু তার জন্যে আমি ভুগবো কেন?

সদানন্দ এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারলে না।

নয়নতারা বললে—কই চুপ করে রইলে যে, জবাব দাও—আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে কি তোমার প্রায়শ্চিত্তের ভাগ আমাকেও নিতে হবে? এই কি তোমার জবাব?

সদানন্দ বললে—ধরে নাও না-হয় তাই—

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমাকে কেন তুমি তাহলে এর মধ্যে জড়ালে? আমার কি তাহলে এখন থেকে কোন সাধ-আহ্লাদ থাকবে না? আমি কি তাহলে সারা জীবন এমনি করেই তোমাদের বাড়িতে একা একা রাত কাটাবো? আমার মনের কথা বলবার কোনও লোকই থাকবে না?

সদানন্দ কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না।

নয়নতারা সদানন্দর দুটো হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—কী? চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও—বলো আমি কী নিয়ে থাকবো? আমি কাকে আশ্রয় করে বাঁচবো? আমার জীবন কেমন করে সার্থক হবে? আমি কেন তোমার পূর্বপুরুষের পাপের ভাগী হতে যাবো? এর জবাব না দিলে আমি তোমাকে আজ ছাড়বো না। তোমাকে এর জবাব আজকে দিতেই হবে—

সদানন্দ আর পারলে না। নয়নতারার দুটো হাত সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—পাগলামি কোর না। সরো, পথ ছাড়ো, আমাকে যেতে দাও—

নয়নতারা চিৎকার করে উঠলো। বললে—পাগলামি আমি করছি, না তুমি করছো! বলছি তো, আমার কথার জবাব না দিলে আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না—

সদানন্দ বললে—এই রাত্তিরবেলা কেলেঙ্কারি না করে তুমি ছাড়বে না?

নয়নতারা বললে—কেলেঙ্কারির আর বাকিটা কী রেখেছ যে কেলেঙ্কারির ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? আমি যে এখনও তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি, এখনও যে আত্মঘাতী হই নি এইটেই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট।

সদানন্দ এবার কঠোর হয়ে উঠলো। বললে—ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি

আমাকে যেতে দেবে কি না তাই বলো?

নয়নতারা বললে—আমার কথার জবাব না দিলে আমি তোমাকে যেতে দেব না—

—কীসের জবাব চাও তুমি? কোন্ কথার জবাব?

—ওই যে বললুম, তুমি যদি আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখো তাহলে আমি কি নিয়ে থাকবো? আমি কাকে আশ্রয় করে বাঁচবো?

সদানন্দ বললে—তুমি কি নিয়ে থাকবে তার জবাবদিহি কি আমাকে করতে হবে?

নয়নতারা বলে উঠলো—আমি তো তোমারই স্ত্রী, এর জবাবদিহি তুমি করবে না তো কে করবে?

—আবার ওই এক কথা? বলছি, আমাকে যেতে দাও—সরো—

নয়নতারা বন্ধ দরজার ওপর পিঠ ঠেকিয়ে বললে—না, আমি আজ তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না, তুমি তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো—

—তাহলে যেতে দেবে না তো?

বলে সদানন্দ তার প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। সদানন্দ যেন কী ভাবলে একবার। তারপর সেখান থেকে একবার তার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। টেবিলের ওপর কী যেন সে খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগলো। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সদানন্দ হঠাৎ সামনে যা পেলে তাই-ই হাতে তুলে নিলে। নয়নতারার মনে হলো একটা কাচের ভারি দোয়াতদানি সেটা। সেই দোয়াতদানিটা দিয়েই সদানন্দ তার নিজের কপালে ঢাঁই ঢাঁই করে মারতে লাগলো।

নয়নতারা এই অভাবনীয় ঘটনার পরিণতিতে এক মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর সদানন্দর সামনে গিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। বললে—করছো কী, করছো কী?

কিন্তু সদানন্দকে রুখবে এমন শক্তি কার আছে তখন? নয়নতারা সদানন্দর হাত দুটো চেপে ধরে বিপদ আটকাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সদানন্দর গায়ে তখন যেন অসুরের শক্তির আবির্ভাব হয়েছে। সে তখনও একমনে ভারি কাচের দোয়াতদানিটা দিয়ে নিজের কপাল লক্ষ্য করে জোরে জোরে একটার পর একটা অনবরত আঘাত করে চলেছে। নিজেকে মারাত্মক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে যেন সে পৃথিবীর তাবৎ লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার পথ বেছে নিয়েছে—

আর নয়নতারা সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলে মানুষটার কপাল থেকে মুখে গায়ে কাপড়ে অঝোরধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে—

দেখতে দেখতে নয়নতারার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। সেই অস্পষ্ট অন্ধকার ঘরের ভেতরে সেই রক্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে প্রাণপণ আর্তনাদ করে উঠলো—মা—মা—মা গো—

হয়ত তখন মাঝরাত। মাঝরাতের বোধ হয় একটা যাদু আছে। বিশেষ করে শীতকালের মাঝরাতের। কদিন ধরে প্রীতির শরীর আর মনের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। সেই সেদিনই প্রথম একটু চোখ দুটো বুঁজিয়েছিল। তারপর শেষ রাত্রের দিকে ঘুম থেকে উঠল প্রীতি। সবাই তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চারিদিকে কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই। প্রীতির

যখন প্রথম বিয়ে হয়েছিল তখন শাশুড়ীর সঙ্গে নদীতে স্নান করতে যেত। কী কনকনে ঠাণ্ডা তখন। গ্রীষ্মকালে অত কষ্ট হতো না। কিন্তু শীতকালে ঘুম ভাঙতে চাইত না মোটে।

শাশুড়ী বলতো—তোমার কোনও ভয় নেই বউমা, দেখবে নদীর জল গরম। একবার নদীতে ডুব দিলে দেখবে সব শীত পালিয়ে গেছে—

তা সত্যিই, একবার নদীর জলে ডুব দিলে আর শীত করতো না। বাড়ি থেকে নদী বেশী দূর নয়। রাস্তার দুপাশে চৌধুরীদের বাঁশঝাড়। কেউ কোথাও নেই। ছোট মশাই কর্তাবাবুর ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। আকাশে তারাগুলো তখন পিট পিট করে চাইছে। কোথাও এতটুকু ধোঁয়া নেই, কুয়াশা নেই। কী মনে করে হঠাৎ তার খেয়াল হলো সেই নদীতে গিয়ে স্নান করে এলে ভাল হয়।

পাশেই রান্নাঘর। রান্নাঘরের ওপাশে গৌরী থাকে। সেখানে দরজার সামনে গিয়ে ডাকলে—গৌরী, ওলো গৌরী—

গৌরী বউদির গলা পেয়ে ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। কিছু বিপদ হলো নাকি বউদির! দরজা খুলেই বাইরে এসেছে। বললে—কী বউদি? কী হয়েছে?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ রে, নদীতে যাবি?

—নদীতে?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, তোর ছোট মশাই কর্তা মশাই-এর ঘরে শুয়েছে আজ, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে পড়ে গেল আজ তো শুক্লা ষষ্ঠী, আজকে নদীতে গিয়ে চান করে এলে হয়, তা চল্—খোকাও ফিরে এসেছে, বউমার ঘরে গিয়ে শুয়েছে—

তা গৌরীও আপত্তি করবার লোক নয়? সেও তৈরি হয়ে নিয়ে সঙ্গে গেল। রাস্তা নির্জন। নদীতে একটা ডুব দিয়ে সবে উঠেছে, দেখলে একজন সাধু। সাধুকে দেখে প্রীতি তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা দিতে যেতেই সাধু এগিয়ে এল।

বললে—এত রাত্রে তুই স্নান করতে এসেছিস যে বেটি?

প্রীতি বললে—আমার মানত ছিল বাবা—আজ শুক্লা ষষ্ঠী, আমার ছেলে আজ ঘরে ফিরে এসেছে তাই চান করতে এসেছি—

সাধু কী ভাবলে কে জানে, তারপর বললে—সামনে তোর খুব বিপদ আসছে বেটি, খুব হুঁশিয়ার—

প্রীতির বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। বললে—কী বিপদ বাবা? কীসের বিপদ? আমার খোকার কোন খারাপ হবে না তো?

সাধু বললে—হবে, খারাপ হবে। তুই তোর বাড়ি থেকে আমার ভক্তকে তাড়িয়ে দিয়েছিস, তাকে অপমান করেছিস—তোর খারাপ হবে না তো কার খারাপ হবে?

প্রীতি সাধুর পা জড়িয়ে ধরতে গেল, বলতে গেল—তুমি আমার খোকার কোনও অমঙ্গল কোর না বাবা, তুমি যা চাও আমি তাই-ই দেব, আমি আমার সর্বস্ব দেব তোমাকে, আমার যা হয় হোক, আমার খোকার যেন কোনও অমঙ্গল না হয় বাবা.....

বলতে বলতে সেই নদীর ধারেই প্রীতি সাধুর পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তার গলা দিয়ে কান্নার শব্দ বেরোল না। তারপর একটা অসহ্য যন্ত্রণায় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘুম ভেঙে যেতেই প্রীতি চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথায় সাধু, গৌরীই বা কোথায়? সে তো নিজের বিছানাতেই শুয়ে রয়েছে। কেউ তো কোথাও নেই তবে?

অন্ধকারের মধ্যে চোখ দুটো ভালো করে খুলে সেই অদ্ভুত স্বপ্নটা আবার মনে করবার চেষ্টা করলে সে। এমন স্বপ্ন কেন সে দেখতে গেল! কীসের বিপদ হবে তার? কখন সে

সাধুকে অপমান করলে? সাধুবাবা তো নিজেই একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

না, স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। তার কেন বিপদ হবে। খোকা এতদিন পরে বাড়ি ফিরে এসেছে। এতদিন পরে আজ সে বউমার ঘরে শুয়েছে। খোকার কেন অমঙ্গল হতে যাবে!

প্রীতি এক মনে অদৃশ্য বিধাতা-পুরুষকে লক্ষ্য করে প্রার্থনা করতে লাগলো—আমার খোকার কোনও অমঙ্গল কোর না ঠাকুর। সে ভাল থাকুক, আমার বড় সাধের একটি মাত্র ছেলে, তাকে তুমি দেখো ঠাকুর। তার ভাল কোর—

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দে প্রীতি চমকে উঠলো।

বউমার গলার আওয়াজ না? বউমা যেন চেঁচিয়ে খোকার সঙ্গে কথা বলছে! তবে কি ঝগড়া করছে নাকি দুজনে?

আর তারপরেই সেই বুকফাটা আর্তনাদ—মা—মা—মা গো—

ধড়মড় করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠেছে প্রীতি। তারপর আলোটা জ্বেলে নিয়ে খোকার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকতে লাগলো—খোকা—খোকা—খোকা—

কেউ সাড়া দিলে না—

প্রীতি আবার ডাকলে—বউমা—বউমা, বউমা কী হলো? চেঁচিয়ে উঠলে কেন? দরজা খোল —দরজা খোল—খোকা, দরজা খুলে দে—বলে প্রীতি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—

আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল ভেতর থেকে। দরজা খুলতেই হারিকেনের আলোয় প্রীতি দেখতে পেলে খোকা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার কপাল দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে মুখে গায়ে কাপড়ে মাখামাখি হয়ে গেছে।

খোকার চেহারাটা দেখেই ভয়ে আতঙ্কে আঁতকে উঠেছে প্রীতি।

বললে—ওমা, কী সব্বোনাশ, এত রক্ত এলো কোত্থেকে খোকা? তুই কী করেছিস? কে মেরেছে তোকে? এ কাণ্ড কী করে হলো বাবা? বউমা কোথায়?

সদানন্দ কোন উত্তর দেবার আগেই প্রীতি দেখলে ঘরের ভেতরে টেবিলের তলায় মেঝের ওপর বউমার শরীরটা লুটোচ্ছে!

প্রীতি আলোটা নিয়ে ভেতরে গিয়ে বউমার কপালে হাত দিয়ে দেখলে শরীরে কোনও সাড় নেই। মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রীতি ডাকতে লাগেলা—বউমা, বউমা, ও বউমা, কী হলো তোমার? কী হলো?

মেঝের আশেপাশেও নজর দিয়ে দেখলে। জায়গাটা রক্তে একেবারে ভেসে গেছে। এত রক্ত কোত্থেকে এল! কে কাকে মারলে! তবে কি বউমা মেরেছে খোকাকে?

—খোকা!

প্রীতি পেছন ফিরে দেখলে। কিন্তু খোকা কোথায় গেল? খোকা, ও খোকা, খোকা..............

প্রীতি চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—খোকা, কোথায় গেলি! ও খোকা—

কেউ সাড়া দিলে না। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে আবার ডাকলে—খোকা—খোকা—

কিন্তু তবু কেউ সাড়া দিলে না। প্রীতি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সেখানেও খোকা নেই। তারপর বারান্দা থেকে বেরিয়ে বার-বাড়িতে ঢুকে ডাকলে—খোকা—খোকা—

একবার বার-বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালে সোজা সদরের রাস্তা। সেখানেও দৌড়তে দৌড়তে গেল। ডাকতে লাগলো—খোকা, খোকা—খোকা—

কোনও সাড়া-শব্দ নেই খোকার। খোকা কোথাও নেই—

প্রীতি হারিকেনটা নিয়ে সেই উঠোনের মধ্যেই খানিক দাঁড়ালো। বার-বাড়ির কুকুরটা

বাড়ির গিন্নীকে দেখে কাছে এসে আদর করে ল্যাজ নাড়াতে লাগলো।

হঠাৎ পেছনে গৌরী এসে দাঁড়িয়েছে। প্রীতির চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। গৌরীকে দেখে প্রীতি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো—ওরে গৌরী, সর্বনাশ হয়েছে রে—

—কী সব্বোনাশ বউদি? কী হয়েছে?

—ওরে, খোকা আমার রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়েছে!

গৌরী কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে—খোকা কোথায় বউদি? খোকা তো ঘরে গিয়ে শুয়েছিল! তারপর কী হলো?

প্রীতি কাঁদতে কাঁদলে বললে—ওরে গৌরী, আমার খোকা পালিয়ে গেল—

গৌরী বললে—তা বউমা তো ঘরে ছিল, বউমা কোথায়?

প্রীতি বললে—ওরে গৌরী, আমিই বউমার সর্বনাশ করলুম রে, বউমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। আমার হাত-পা কাঁপছে। তুই যা, একবার তোর ছোট মশাইকে ওপর থেকে ডেকে নিয়ে আয় গিয়ে, ছোট মশাই কর্তাবাবুর ঘরে শুয়েছে আজ—যা-যা, শিগগির যা তুই—আমি বউমার কাছে গিয়ে বসি গে—

নয়নতারা তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য!

প্রীতি আবার খোকার ঘরে এল। বউমার কাছে নিচু হয়ে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতে লাগলো—বউমা, বউমা, কী হয়েছে তোমার? বলো, কথা বলো? খোকা তোমার কী করেছে?

নয়নতারা তখনও কোনও উত্তর দিচ্ছে না।

গৌরী দৌড়তে দৌড়তে আবার ফিরে এল।

বললে—ছোট মশাইকে ডেকেছি বউদি, তিনি আসছেন—

প্রীতি বললে—তুই এক কাজ কর গৌরী, ঘটি করে একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয় তো, বউমার মুখে-চোখে ছিটোই, বউমার জ্ঞান ফিরছে না, আমার কথারও জবাব দিচ্ছে না—

চৌধুরী মশাই ততক্ষণে এসে গেছেন।

বললেন—কী হলো? তুমি যে বললে বউমা বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেছে? আবার কোত্থেকে এল? তা খোকা কোথায়? এত রক্ত কোত্থেকে এল? দোয়াতদানিটা এখানে কে ফেললে?

প্রীতি বললে—খোকা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়েছে—

—সে কী? খোকা বউমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে নাকি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই কাল তুমি বললে বউমা বাপের বাড়ি গেছে, আর এখন বলছো খোকা বউমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে!

ততক্ষণে গৌরী এক ঘটি জল এনে হাজির করেছে।

প্রীতি ঠাণ্ডা জল আঁজলা করে নিয়ে নয়নতারার মাথায় ছিটোতে লাগলো। আর মুখ নিচু করে ডাকতে লাগলো—বউমা, ও বউমা, কথা বলো, কী হয়েছে বলো বউমা—বলো—

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

পর-চিতেন

মনে আছে এর পর থেকেই সদানন্দর জীবনে সব কিছুই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। এর পর থেকেই শুরু হলো তার সংঘর্ষ। নিজের সঙ্গে নিজের সংঘর্ষ আবার নিজের সঙ্গে পরের। আসলে এর পর থেকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই সদানন্দর সংঘর্ষ বেধে গেল।

যারা সাধারণ মানুষ তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। কিন্তু যারা পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করে চলতে চায় তাদেরই হয় যত বিপদ। তারা নিজেকেও ক্ষমা করে না পারিপার্শ্বিককেও না। পারিপার্শ্বিক যখন তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আসে তখন সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কখনও ধ্বংস হয়ে যায় আবার কখনও কখনও ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। কিন্তু তা-ই বা পারে কজন? বেশির ভাগই তো পারিপার্শ্বিকের চাপে নিঃশেষ হয়ে হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায় কেউ জানতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় এত জায়গা থাকে না যে ঐতিহাসিক তাদের নিয়ে দু'চার লাইন লিখবে। তাদের জায়গা থাকে একমাত্র উপন্যাসের পাতায়। একমাত্র ঔপন্যাসিকই বুঝি তাদের জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

তা সংসারে এক ফোঁটা চোখের জলের দামই কি কম!

সেদিনের সেই মাঝরাত থেকেই নয়নতারার এই কথাটা মনে হলো। মনে হলো চোখের জল সে আর ফেলবে না। সংসারে চোখের জলের যত দামই থাক, যে তার মর্যাদা দেয় না তার জন্যে সেও নিজের চোখের জল অপব্যয় করবে না।

কতক্ষণ যে সে অজ্ঞান হয়ে ছিল তা তার খেয়াল ছিল না। বোধহয় সমস্ত রাতটাই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। সমস্ত রাতের মধ্যে একবারও কিছু মনে হয়নি তার। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলে সকাল হয়েছে। পাশের খোলা জানালা দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে ঘরে। আগের রাতটার সেই ঘটনাও আস্তে আস্তে তার মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়তে লাগলো কেমন করে তার চোখের সামনেই মানুষটা দোয়াতদানি দিয়ে নিজের কপালে ঠাঁই ঠাঁই করে মেরেছিল। কেমন করে সমস্ত শরীরটা তার রক্তে একেবারে ভেসে গিয়েছিল। তারপরে আর কিছুই তার মনে ছিল না।

এতক্ষণে মনে পড়লো বাবার কথা। বাবা যদি এই সময় একবার আসতো তো আর এখানে থাকতো না সে। বাবার সঙ্গেই চলে যেত কেষ্টনগরে!

কিন্তু কেষ্টনগরে গিয়েই বা কী হবে? সেখানে গেলেই কি সে সুখে থাকবে?

আবার মনে হলো তাহলে কি সে হেরে যাবে? তার শাশুড়ীকে যে সে কথা দিয়েছিল সে বেহুলার মত তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে? তা তো কই সে পারলে না?

হঠাৎ শাশুড়ি ঘরে ঢুকলো। বললে—ভালো আছো বউমা?

নয়নতারার মনে হলো যেন তার নিজের মা আবার সশরীরে তার কাছে ফিরে এসেছে।

শাশুড়ি বললে—এই ওষুধটা খেয়ে নাও বউমা। আমি যে কী ভাবনায় পড়েছিলাম তোমার জন্যে।

তারপর একটু থেমে বললে—তোমার গায়ে কোনও ব্যথা হয়নি তো?

ওষুধটা খেয়ে নিয়ে নয়নতারা বললে—আমি যে আপনার কথা রাখতে পারলুম না মা, উনি যে আমার কথা কিছুতেই শুনলেন না। আপনি আমাকে যা বলেছিলেন আমি তা সব

কিছুই তো তেমনি করেই করলুম, সব কিছুই তেমনি করেই বললুম! এখন আমি কি করবো?

শাশুড়ি বললে—এখন ওসব কথা ভেবো না বউমা, তোমার এখন শরীর খারাপ, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো।

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—উনি এখন কেমন আছেন?

—কার কথা বলছো? খোকা? খোকা ভালো আছে।

—রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে? জ্বরটর হয়নি তো?

শাশুড়ি বললে—না—

নয়নতারা বললে—আমি ভাবতেই পারিনি মা যে উনি অমন করে নিজের মাথায় সমস্ত শাস্তিটা তুলে নেবেন। আমি ওটা কল্পনাই করতে পারিনি। পারলে টেবিল থেকে দোয়াতদানিটা আগেই সরিয়ে রাখতুম।

শাশুড়ি বললে—না বউমা, তোমার তো দোষ নেই, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে যা করবার তা করেছ। তুমি আমার কথা রেখেছ পুরোপুরি। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তো সে আমার। আজ যা কিছু হয়েছে সবটার জন্যে আমিই দায়ী।

নয়নতারা বললে—আপনার কেন দোষ হতে যাবে মা, দোষ আমার কপালের। আপনি যা কিছু করেছেন সব তো আমার ভালোর জন্যেই। আমার কপালে সুখ নেই তা আপনি কী করবেন?

তারপর একটু থেমে বললে—উনি এখন কোথায়?

শাশুড়ি কী যেন একটু ভেবে নিল। বললে—এই তো ওপরের ঘরেই রয়েছে।

—ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, এখন ভালো আছে একটু। ডাক্তারবাবু এসে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে. এই তো এখন খোকার ঘর থেকেই আসছি। এখন তার মাথায় কোনও যন্ত্রণা নেই। একটু আগেই এক গেলাস দুধ খাইয়ে এসেছি।

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছেন?

শাশুড়ি বললে—হ্যাঁ, এই এখ্‌খুনিই তো জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা।

—কী জিজ্ঞেস করছিলেন?

—জিজ্ঞেস করছিল তোমার শরীর কেমন আছে।

—আপনি কী বললেন?

শাশুড়ি বললে—আমি বললাম তুমি এখন একটু ভালো আছো।

নয়নতারা বললে—আমি আপনার কথা রাখতে পারলুম না মা, আপনার সাধ মেটাতে পারলুম না, আমি হেরে গেলুম। আপনি কেন আমাকে এ-বাড়ির বউ করে নিয়ে এসেছিলেন? অন্য কোনও মেয়ে হলে হয়ত আপনার সব সাধ মেটাতে পারতো। আমি আপনার কিছুই উপকার করতে পারলুম না মা—

বলে নয়নতারা ঝর-ঝর করে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললে।

শাশুড়ি নিজের আঁচল দিয়ে নয়নতারার চোখ দুটো মুছে দিতে দিতে বললে—কেঁদো না বউমা, তুমি কী করবে বলো, তোমার কোনও দোষ নেই—তুমি চুপ করো। তোমার মত বউ পেয়েও যে সুখী হলো না তার কপালে অনেক কষ্ট লেখা আছে—

নয়নতারা বললে—আমি এখন একবার ওঁর কাছে যাবো মা?

—কার কাছে। খোকার কাছে? কেন?

নয়নতারা বললে—আমি একবার গিয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করবো কেন উনি এমন করলেন,

নিজের ঘাড়ে সমস্ত শাস্তি তুলে নিয়ে উনি কাকে শাস্তি দিতে চাইলেন? যে আসল অন্যায় করেছে তাকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা যদি ওঁর না থাকে তো এমন ভীরুর মত কাজ কেন করলেন? আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করবো এর নাম কি পৌরুষ? এর নাম কি বীরত্ব?

বলতে বলতে নয়নতারা উঠে বসলো। বললে—আমি এখুনি একবার ওঁর কাছে যাবো মা, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না।

—না বউমা, এখন তোমার খোকার কাছে গিয়ে দরকার নেই। তারও শরীর খারাপ, তোমারও শরীরে জোর নেই, এখন হয়ত রাগের মাথায় তোমাকে কী বলে বসবে তখন তুমিও হয়ত আর সহ্য করতে পারবে না, তখন উল্টো বিপত্তি হবে —

নয়নতারা বললে—না মা, আমি যাবোই। আমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলে কি আমাকে এত অগ্রাহ্য করবেন? আমিও তো একজন মানুষ। উনি যা বলবেন তাই-ই আমাকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে?

—কিন্তু বউমা, তুমি তো ওর কথা সব শুনেছ। ওর রাগ তো তোমার ওপরে নয়, ওর যত রাগ আমাদের ওপর, ওর বাবার ওপর, ওর কর্তাবাবুর ওপর—তুমি গিয়ে বললেও কোনও ফল হবে না—

—কিন্তু সব অপরাধেরই তো ক্ষমা আছে মা!

শাশুড়ি বললে—ক্ষমাই যদি থাকবে তাহলে অমন করে কেউ আত্মঘাতী হতে চেষ্টা করে? তুমি নিজেই তো দেখলে। ওই দোয়াতদানিটার বদলে যদি ওখানে ছোরা-ছুরি কিছু থাকতো তাহলে কী সব্বোনাশ হতো বলো দিকিনি? আমার ভাবতেও বুক কেঁপে উঠছে—

নয়নতারা বললে—তবু আমাকে একবার যেতে দিন না মা। আমাকে উনি যত ইচ্ছে অপমান করুন তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু আমি হেরে গেলাম এ আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি কেন হেরে যাবো? আমি আমার নিজের স্বামীকে বশ করতে পারবো না এ যে আমারই লজ্জা! আমি লোককে মুখ দেখাবো কী করে? আমার নিজেরই তো নিজের মুখ দেখতে লজ্জা হচ্ছে!

শাশুড়ি বললে—তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না বউমা। তোমার দুর্বল শরীরে অত উত্তেজনা ভালো নয়। তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, আমি এখন যাই, আমি পরে আবার আসবো। তোমাদের ব্যাপারে আমারও শরীর ভালো যাচ্ছে না। আর শরীরেরই বা দোষ কী বলো! আমি একলা মানুষ কোন্ দিকে দেখবো—

নয়নতারাকে শুইয়ে দিয়ে প্রীতি বাইরে এল। তারপর নিজের ঘরে আসতেই দেখলে চৌধুরী মশাই ঘরের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। গৃহিণীকে দেখেই সামনে এগিয়ে এলেন।

বললেন—কী হলো? বউমা কী বলছে?

গৃহিণী বললে—আমায় জিজ্ঞেস করছিল খোকার কথা। জিজ্ঞেস করছিল খোকা কেমন আছে।

—বউমা জানে না বুঝি যে খোকা বাড়িতে নেই?

গৃহিণী বললেন—আমি বলেছি খোকা বাড়িতেই আছে, ওপরের ঘরে শুয়ে আছে। খোকার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল বড্ড।

—সে কী? এত কাণ্ডের পরেও?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, অনেক কথা বলছিল বউমা। বড্ড সম্মানে ঘা লেগেছে। বলছিল এত বড় অপমান সে সহ্য করবে না। বড্ড লজ্জা হয়েছে বউমার। বলছিল আর একবার

চেষ্টা করে দেখবে।

চৌধুরী মশাই বললেন—কিন্তু যখন জানতে পারবে যে খোকা বাড়িতে নেই, তখন? তখন যদি ওপরের ঘরে যায় কোনও দিন?

প্রীতি বললে—সে যখন জানতে পারবে তখন জানবে। আমি আর সে নিয়ে বেশি ভাবতে পারছি না। আমার আর এখন মাথার ঠিক নেই।

—কিন্তু খোকা যদি আর ফিরে না আসে?

—যদি ফিরে না আসে তখন অন্য বুদ্ধি বার করবো। যদি বলতুম খোকা নেই তখন যদি আবার কান্নাকাটি করতো! তখন আমি সামলাতুম কী করে? তুমি তো বলেই খালাস। সামলাবার বেলায় তো সেই আমিই। এখন যদি কিছু গণ্ডগোল হতো তো তোমরা তো আমারই দোষ দিতে। আমি যা করেছি সব দিক ভেবে-চিন্তেই করেছি।

চৌধুরী মশাই বললেন—তাহলে সকলকে বলে দিও যেন কেউ আবার বউমাকে উল্টো কথা না বলে দেয়। প্রকাশকেই যা ভয়। সে সব সময় যা বক্‌বক্ করে, হয়ত তখন বউমার কাছে সব ফাঁস করে দেবে। তা প্রকাশ কোথায়?

প্রীতি বললে—কোথায় আবার যাবে? তাকে পাঠিয়েছি খোকার খোঁজে—সে তো সেই সকাল বেলাই বেরিয়েছে, মুখে জল পর্যন্ত দেয়নি। তার জন্যেই তো বসে আছি—

চৌধুরী মশাই সব শুনে যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। মাঝরাত থেকেই তিনি একবার-ঘর একবার-বার করছেন। ভেতরে-বাইরে তাঁর অশান্তি। ছেলের বিয়ে দেবার আগে পর্যন্ত তেমন কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। মন দিয়ে সব কাজকর্ম দেখতে পারতেন। আদায়-পত্র নিয়েই তাঁর সময় কাটতো। কিন্তু এ কী বিপদ ঘাড়ে চাপলো তাঁর! এমনি করে আর কিছুদিন চললেই তো হয়েছে। জমিদারি করা একেবারে লাটে উঠে যাবে তাঁর। এত কষ্টের পয়সা সব সাত ভূতে লুটে-পুটে খাবে।

তিনি আর দাঁড়ালেন না সেখানে। বললেন—আমি আসি, আমার এখানে বসে থাকলে চলবে না,—ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—

বলে তিনি বার-বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

বহুদিন আগে কালীগঞ্জের জমিদারের কাছে নায়েবী করবার সময় কর্তাবাবু প্রথম শিখেছিলেন কাকে বলে পরচা, কাকে বলে খতিয়ান, কাকে বলে জমাবন্দী, কাকে বলে ওঠ্‌বন্দী, কাকে বলে খাতক, মহাজন, তমসুক, আর কাকে বলে নজরানা।

সাধ ছিল একদিন তিনিও নতুন এক জমিদারির মালিক হবেন। আর যেমন করে চক্রবর্তী মশাই পরের উপার্জিত ধনের ভোগ-দখল করছেন, তেমনি তিনিও করবেন। তিনিও প্রজার দখল দেবেন, প্রজা উচ্ছেদ করবেন, মহাজন হয়ে প্রজাদের টাকা দাদন দেবেন, খাজনা আদায়ের সময় নজরানা নেবেন।

তা সে সবই তাঁর হয়েছিল। বলতে গেলে হর্ষনাথ চক্রবর্তীর চেয়েও বেশি হয়েছিল। যখন কর্তাবাবুর ছেলে হয়েছিল তখন তাকেও নিজের শেখা বিদ্যের তালিম দিয়েছিলেন। ছেলেও সব কিছু মন দিয়ে শিখে নিয়েছিল। কিন্তু মানুষের তে আশার শেষ থাকে না। মনে হয় ছেলে না-হয় শিখলো। কিন্তু নাতি? তা নাতিও না-হয় শিখলো, সব সম্পত্তির আয়ও বাড়লো। কিন্তু নাতির নাতি? নাতির নাতির নাতি? আর শুধু তাও নয়, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ এ থাকবে তো!

কর্তাবাবুর পরে চৌধুরী মশাইয়েরও ছিল ওই একই চিন্তা। কীসের জন্যে এত পরিশ্রম, কীসের জন্যে এত অর্থ-উপার্জন? ছেলে যদি সংসারী না হয়, ছেলের যদি বংশরক্ষা না হয়—তাহলে কী হবে?

তা সেদিনও আবার রাত হলো।

কোটি-কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে কত কোটি-কোটি বার রাত হয়েছে। কিন্তু সেদিন রাত না হলে কার কী এমন লোকসান হতো!

চৌধুরী মশাই সেদিনও ওপরের ঘরে শুতে যাচ্ছিলেন। যাবার আগে বললেন—আমি যাই, আজকে একটু সকাল সকাল ওপরের ঘরে শুতে যাবো—

কদিন ধরেই চৌধুরী মশাই ওপরে শুচ্ছেন। তবু সেদিন যেন তাঁর একটু বেশি তাড়া ছিল। কদিন ধরেই চৌধুরী মশাইএর মনে হচ্ছিল বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর নয়।

প্রীতি বললে—আর কতদিন এমনি করে কষ্ট করবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি তো কেবল আমার শরীরের কষ্টের কথাই ভাবছো, আর কত টাকা যে নষ্ট হয়ে গেল তা তো কেউ ভাবছো না একবারও! টাকা নষ্ট হওয়াও যা, রক্ত নষ্ট হওয়াও তাই। রক্ত নষ্ট হলে তবু একদিন রক্ত হয়, ঘি-দুধ খেলে রক্ত বাড়ে, কিন্তু টাকা গেলে কি আর তা ফিরে আসে? জলের মত আমার টাকাগুলো খরচ হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি কিছু করতে পারছি না—

প্রীতি বললে—তা বলে মানুষকে তো মেরে ফেলা যায় না—

চৌধুরী মশাই রেগে গেলেন। বললেন—কেন? কেন মেরে ফেলা যাবে না? যে-মানুষ ভুগে ভুগে কষ্ট পাচ্ছে তাকে যদি গলা টিপে মারি অন্যায়টা কীসের শুনি?

প্রীতি বললে—তুমি বলছো কি? জলজ্যান্ত মানুষকে তুমি গলা টিপে মারবে?

—কেন মারবো না? তাতে রুগীও বাঁচবে, আমার টাকাও বাঁচবে।

—কিন্তু হাজার হোক নিজের বাবা তো তোমার! তাকে মারতে তোমার মনে লাগবে না?

চৌধুরী মশাই বললেন—কেন লাগবে? আগে হলে তবু লাগতো, কিন্তু এখন কেন লাগবে? এখন আমি পাথর হয়ে গিয়েছি। এখন মায়া-দয়া বলতে আর কিছু নেই আমার। কর্তাবাবুই তো একদিন আমাকে দয়া-মায়া করতে বারণ করেছিলেন। মায়া-দয়া করলে কি আর আমার এ জমি-জমা রাখতে পারবো মনে করেছ?

বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—বউমা কোথায়?

প্রীতি বললে—কোথায় আবার থাকবে? নিজের ঘরে—

—তা প্রকাশ কোথায়? প্রকাশ এখনও ফেরেনি?

—ফিরলে তো তুমি দেখতেই পেতে।

চৌধুরী মশাই কথাটা শুনে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন—আমি যে কোন্ দিকটা দেখি তা বুঝতে পারছি না। একটা মানুষ কত দিক সামলাবো বলো দিকিনি। একটা ছেলে ছিল তাও অমানুষ হয়ে গেল। তার দ্বারা কোনও কাজ হবার জো নেই। সে কোথায় গিয়ে রইল তারও কোনও ঠিক-ঠিকানা পেলুম না। হয় আমি পাগল হয়ে যাবো নয়তো আত্মহত্যা করবো!

কথাগুলো বলে চৌধুরী মশাই বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু প্রীতির অনেকক্ষণ ধরে কোনও ঘুম এলো না। আস্তে আস্তে অন্য রাতের মত সে-রাতেও চারদিকে সব শান্ত হয়ে এলো। অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দোতলার ঘরের দিকে কান পেতে রইলো প্রীতি। যদি কিছু শব্দ আসে, যদি কোনও কান্না কানে আসে! কারো চাপা-গলার আর্তনাদ! কথাটা

ভাবতেই প্রীতির মনে হলো তার গলাও যেন কেউ টিপে ধরেছে। গলা টিপে ধরলে কী রকম যন্ত্রণা হয় সেটাও কল্পনা করতে চাইলে প্রীতি। কিন্তু যদি কেউ টের পায়! আর মারতেই যদি হয় তো ডাক্তারি ওষুধ খাইয়েই তো মারা ভালো। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলেই হয়। তা হলে সে-ঘুম আর কোনও দিন ভাঙবে না। নিঃশব্দে আরামে মারা যাবে। খুন করার দায় থেকেই মানুষ অব্যাহতি পাবে।

হঠাৎ যেন বাইরে খট্ করে একটা শব্দ হলো।

প্রীতি কানটাকে খাড়া করে রইল। মানুষকে গলা টিপে মারলে কি ওই রকম খট্ করে শব্দ হয়? কিন্তু কেন? কেন মানুষকে খুন করবার দরকার হবে বুঝতে পারলে না সে! এই জন্যেই তো খোকা এমন হয়েছে!

কিন্তু প্রীতি জানতে পারলে না যে এ বাড়ির আর একটা ঘরে তখন আর একজনও জেগে রয়েছে।

নয়নতারা প্রতি দিনের মত সেদিনও চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। কিন্তু আর থাকতে পারলে না। চারিদিকে যখন সব নিঝুম হয়ে এল তখন বোঝা গেল কোথাও আর কেউ জেগে নেই। এই-ই তার সুযোগ। এইবার সে দরজা খুলে ওপরে যাবে। এবার সোজা গিয়ে তার ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেবে।

হয়ত দরজা খুলবে না মানুষটা। কিম্বা হয়ত দরজা খোলাই আছে! অসুস্থ মানুষের ঘরের দরজা তো খোলাই থাকে সাধারণত।

নয়নতারা শুধু গিয়ে তাকে একবার জিজ্ঞেস করবে—এ তুমি কী করলে? তুমি নিজের ওপরে কেন এমন শাস্তি নিলে বলো? কার জন্যে?

মানুষটা হয়ত মাঝরাত্রে হঠাৎ তাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। হয়ত কোনও কথার উত্তর দিতে পারবে না।

—তুমি কি আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে নিজের ওপর এই শাস্তি তুলে নিলে?

মানুষটা হয়ত তার কথার কোনও জবাব দেবে না। কিন্তু এবার আর ছাড়বে না নয়নতারা। এবার তার কাছ থেকে জবাব সে আদায় করবেই—

ভেতর-বাড়ি পেরিয়ে বার-বাড়ি। এতদিন বিয়ে হয়েছে নয়নতারার কিন্তু কখনও এমন করে বার-বাড়িতে আসেনি। বার-বাড়ি যাবার মুখেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলার ঘরে যেতে গেলে এই সিঁড়ি দিয়েই উঠতে হয়।

নয়নতারা টিপি টিপি পায়ে দেয়াল ধরে ধরে ওপরে উঠতে লাগলো।

কোথায় কোন্ ঘরে মানুষটা শুয়ে আছে তাও জানা নেই। শাশুড়ি শুধু এইটুকু বলেছে যে সে দোতলার ঘরে আছে। কিন্তু দোতলায় ক'টা ঘর? কর্তাবাবুর ঘর তো দোতলায়। হয়ত পাশাপাশি দুটো ঘর। একজন ঠাকুর্দা আর একজন নাতি। দু'জনেই অসুস্থ। তাই দু'জনেই ওপরে থাকে।

বড় ভয় করতে লাগলো নয়নতারার। একে শীতে সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, তার ওপর ভয়, যদি কেউ দেখে ফেলে! যদি কেউ সন্দেহ করে! যদি কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তো সে তাকে কী জবাব দেবে।

বাগানের দিক থেকে একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডেকে উঠেছে। ডাকটা শুনেই নয়নতারা সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়ালো। সিঁড়ির দু'পাশে দেয়াল। দু'পাশের দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে সাবধানে ওপরে উঠছিল নয়নতারা।

একবার মনে হলো দরকার নেই। মনে হলো যেমন চুপি চুপি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে আবার তেমনি করে সে ফিরে যাবে। এই কাঙালপনা তার আর ভালো লাগলো না। যে তার মুখ দেখতে চায় না, জোর করে তাকে তার নিজের মুখ দেখানো—এর চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে! বিয়ে করেছে বলে কি এতই ছোট হয়ে গেছে সে? এতই তাচ্ছিল্য করবার মত মানুষ নয়নতারা!

নয়নতারা ফিরেই আসছিল। কিন্তু আবার উঠতে লাগল। না, হেরে যাবার জন্যে সে এ-বাড়ির বউ হয়ে আসেনি। কেন হারতে যাবে সে? বাবা তো তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই শিখিয়েছে বরাবর। এখানে এই শ্বশুরবাড়িতেও সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

আবার সে ওপরে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির যেখানে শেষ ধাপ সেখানেই একটা বারান্দা মতন। তার পাশেই একটা ঘরের মত মনে হলো। ঘরের ভেতরে মনে হলো টিম্-টিম্ করে একটা হারিকেন জ্বলছে।

এটা কার ঘর? এই ঘরের মধ্যেই শুয়ে আছে নাকি সে?

নয়নতারার আবার যেন কেমন সঙ্কোচ হতে লাগলো। যদি তাকে দেখে আবার মানুষটা রেগে ওঠে! আবার সমস্ত শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নেয়! আবার যদি সে অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে! তখন তা সব জানাজানি হয়ে যাবে।

রাত তখন অনেক। সমস্ত নবাবগঞ্জ ঘুমোচ্ছে। এতটুকু সাড়াশব্দ নেই কারো।

দরজাটা বন্ধ। নয়নতারা বারান্দা দিয়ে পাশের জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ালো। জানালার আধখানা পাল্লা খোলা।

সেই খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে।

হঠাৎ অস্পষ্ট আলোয় মনে হলো ঘরের মধ্যে কে যেন নড়ে বেড়াচ্ছে! এ কার ঘর? এই কি কর্তাবাবুর ঘর নাকি?

হঠাৎ নজরে পড়লো তার শ্বশুর!

ভালো করে দেখলে চেনা যায় তার শ্বশুরকে। চৌধুরী মশাই এত রাত্রে ঘরের মধ্যে নড়ে বেড়াচ্ছেন কেন? এত রাত্তিরে চৌধুরী মশাই জেগে ঘরের মধ্যে কী করছেন?

বুকটা থর-থর করে কাঁপছে নয়নতারার। কিন্তু তবু চোখ দুটো বন্ধ করে থাকতে পারলে না।

দেখলে চৌধুরী মশাই আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আর তার একটু দূরে মেঝের ওপর শুয়ে আছে একজন বুড়ো মানুষ। ঘুমন্ত বুড়ো মানুষটার সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা।

হয়ত উনিই কর্তাবাবু। কর্তাবাবুর নামই সে বরাবর শুনে এসেছে। দেখেনি সে কখনও। একবার শুধু দেখেছিল। সেও ঠিক দেখা নয়। নতুন বউ হয়ে যখন এসেছিল সে তখন শুধু ওপরে উঠে একবার ঘোমটায় মুখ ঢেকে প্রণাম করেছিল কর্তবাবুকে। আর তারপর এই আজ।

নয়নতারার চোখ দুটো হঠাৎ বড় কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

নয়নতারা দেখলে চৌধুরী মশাই কর্তাবাবুর মুখের সামনে নিচু হয়ে বসলেন। কী যেন তিনি দেখতে লাগলেন কর্তাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে। তারপর দুটো হাত কর্তাবাবুর গলার কাছে তুলে নিয়ে এক মুহূর্ত বুঝি দ্বিধা করতে লাগলেন।

নয়নতারা একটা অজ্ঞাত বিপদ কল্পনা করে নিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করতে যাচ্ছিল। না না না, তোমরা খুনী, তোমরা সবাই খুনী! তুমি ঠিক বলেছিলে তুমি ঠিকই করেছিলে গো এ বংশের রক্তের মধ্যে পাপের জীবাণু মেশানো আছে! এরা কপিল পায়রাপোড়াকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে আত্মঘাতী করিয়েছিল, এরা মানিক ঘোষের ভাতের থালা পা দিয়ে ঠেলে ফেলে টিনের চাল খুলে নিয়েছিল, এরা ফটিক প্রামানিককে রাস্তায় পাগল করিয়ে ছেড়েছিল।

এদের তুমি ক্ষমা কোর না গো, এদের শাস্তি তুমি মাথায় তুলে নিয়েছ ঠিকই করেছ।
নয়নতারা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—না—না—না—
কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেবোবার আগেই পেছন থেকে ডাক এলো—বউমা—
সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা যেন বাস্তবে ফিরে এসেছে।
দেখলে পেছনে শাশুড়ি দাঁড়িয়ে আছে।
শাশুড়ী বললে—এসো বউমা, এসো, এদিকে এসো—
বলে সিঁড়ি দিয়ে আগে-আগে নিচে নামতে লাগলো। নয়নতারাও শাশুড়ির পেছন-পেছন নিচেয় এল। তারপর একেবারে নয়নতারাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে শাশুড়ি বললে—তুমি এত রাত্তিরে ওপরে গিয়েছিলে কী করতে?
নয়নতারা হতবাক হয়ে তখনও চুপ করে আছে। চোখের সামনে যেন তখনও দৃশ্যটা ভাসছে। তখনও যেন চৌধুরী মশাই কর্তাবাবুর গলার কাছে দুটো হাত উঁচু করে আছে—
—কই বউমা, কথা বলছো না যে? ওপরে কী করতে গিয়েছিলে, বলো!
নয়নতারা বললে—আপনি যে বলেছিলেন উনি ওপরের ঘরে আছেন। তাই দেখা করতে গিয়েছিলুম।
—তা বলে এই রাত্তির বেলা যেতে হয়? তোমার কি আক্কেল বলে কিছু থাকতে নেই? তুমি আমাকে যাবার আগে জিজ্ঞেস করলে না কেন? আমি কি তোমাকে যেতে বারণ করতুম? তুমি যে হঠাৎ ওপরে গেলে, তা ওপরে কখনও গিয়েছ তুমি?
নয়নতারা বললে—কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছিলুম না মা, আমি যে ছটফট করছিলুম ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে।
শাশুড়ি বললে—না, আর কখনও এমন কাজ কোর না, তুমি এ-বাড়ির নতুন বউ, আমাকে না বলে তুমি আর কোথাও যেও না। বুঝলে?
তারপর একটু থেমে বললে—তুমি জানলায় উঁকি দিয়ে কী দেখছিলে?
নয়নতারা কী বলবে বুঝতে পারলে না!
—বলো কী দেখছিলে?
নয়নতারা শাশুড়ির চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল।
বললে—আমি কিছু দেখিনি—
—দেখিনি মানে? আমি যে দেখলুম তুমি জানলায় উঁকি দিচ্ছ? এ কী রকম স্বভাব তোমার, পরের ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখা? বলো কী দেখেছ?
নয়নতারা বললে—আমি ওঁকে খুঁজছিলুম—
ওঁকে মানে? খোকাকে? খোকার সঙ্গে যদি দেখা করবার এত ইচ্ছে তোমার তো আমাকে বললে না কেন? আমিই তোমাকে সঙ্গে করে খোকার ঘরে নিয়ে যেতুম। এ-স্বভাব তো তোমার ভালো নয় বউমা—
হয়ত এই প্রসঙ্গে আরো অনেক কথা বলতো শাশুড়ি। কিন্তু বাইরে যেন কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।
—কই, কোথায় গেলে তুমি?
শাশুড়ি হঠাৎ কথা থামিয়ে বললে—তুমি বোস আমি আসছি—
বলে বাইরে চলে গেল।
আর নয়নতারা সেই নিজের ঘরের বিছানার ওপর বসে-বসেই ভাবতে লাগলো এ কী রকম বাড়ি! এ কী রকম বাড়িতে বিয়ে হয়েছে তার! এ কী রকম শাশুড়ি, এ কী রকম শ্বশুর, এ কী রকম সংসার! তাহলে তার স্বামী যা বলেছিল কিছুই তো মিথ্যে নয়? কালীগঞ্জের বউকে তাহলে এখানেই খুন করা হয়েছে! তাহলে কি সেই কালীগঞ্জের বউ-এর অভিশাপই শেষ পর্যন্ত ফললো?
বাইরের একটা শব্দে হঠাৎ নয়নতারা চমকে উঠলো। মনে হলো দীনুর গলা। দীনু বাইরে থেকে বলছে—ছোট মশাই, একবার শিগ্‌গির আসুন, কর্তাবাবু যেন কেমন করছেন—

জীবনের যদি কোনও একটা মানে থাকে তো সে-মানেটা হলো এই যে জীবন কখনও থেমে থাকে না, সে চলে। চলতে চলতে কখনও সে অচলায়তনে গিয়ে শেষ হয় আবার কখনও অনন্তে গিয়ে পরিপূর্ণতা পায়। এই পরিপূর্ণতা পাওয়াটাই হলো আসল পাওয়া। একদিন সদানন্দও এমনি করে চলতে আরম্ভ করেছিল। সেই চৌধুরী-বংশে জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল তার চলা। সব মানুষই তো এমনি করে চলা শুরু করে। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ এক-একজনেরই বা কেন মাঝপথেই অচলায়তন এসে পথ আটকে দাঁড়ায়? সদানন্দেরও এমনি যাত্রাপথের মাঝখানে একদিন বাধা এসে দাঁড়ালো। সে এক এমন বাধা যে তার মনে হলো সামনে চলবার আর বুঝি পথ নেই।
কিন্তু না, মানুষ তো পালিয়ে রেহাই পায় না। পালিয়ে যাওয়া মানেই তো থেমে যাওয়া। থামবার জন্যে তো সে জন্মায়নি। থেমে গিয়েছিল কর্তাবাবু, থেমে গিয়েছিল চৌধুরী মশাই। যদি সদানন্দ নয়নতারার সঙ্গে মানিয়ে-গুনিয়ে আপোস করে ঘরসংসার করতো তাহলেই সে হয়ত থেমে যেত। চৌধুরী মশাই-এর মতই সে চণ্ডীমণ্ডপে বসে সেরেস্তার খাতা-পত্র দেখতো! তার জমিজমার অঙ্ক বাড়তো আর বংশপরম্পরায় বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করতো।
কিন্তু তা হলো না।
নবাবগঞ্জের লোকের তখন পরের বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। কোথা থেকে কে যেন খবর এনে দিলে যে যুদ্ধ বেধেছে। বারোয়ারিতলায় নিতাই হালদারের দোকানের সামনের মাচায় সেদিনও তেমনি তাসের আড্ডা বসেছে।
কেদার দাস তাস খেলতে খেলতে জিজ্ঞেস করলে—কার সঙ্গে কার যুদ্ধ বেধেছে রে?
পাশেই ছিল পরমেশ মৌলিক। বললে—খেলার সময় বাজে কথা বলবিনে কেদার, খবরদার, আগে তাস দে—
যুদ্ধের কথা আর আলোচনা হলো না। যে যুদ্ধতে সারা পৃথিবীর ভূগোল-ইতিহাস রাজনীতি-অর্থনীতি সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামালো না। নবাবগঞ্জ যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো। পূজোর সময় যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী চলতে লাগলো আর বাকি বারোমাস ক্ষেত-খামারের কাজ।
সেদিনও রাত্রের দিকে কবিগান চলছে বারোয়ারিতলায়। বেশ ভিড় হয়েছে চারদিকে। কবিয়াল গান গাইছে ঃ

চৈত্র মাসে চালতে মিঠে
মিটে ডাহুকের রাও।
গাছের তলায় ছায়া মিঠে
মিঠে দখিন বাও ।।

খয়ের মিঠে পানে রে ভাই
পান মিঠে চুনে।
বয়েস কালে কামিনী মিঠে
ঘৃত মিঠে নুনে।

সারাদিনে খাটাখাটুনি করে সবাই আসর জাঁকিয়ে গান শুনতে বসেছে। বেশ মজা লাগছে। পৃথিবীর কোথায় কোন্ কোণে যুদ্ধ বেধেছে, মারামারি লাঠালাঠি চলেছে, কোথায় ইংলন্ড, কোথায় জার্মানী আর কোথায় বা জাপান তা জানবার দরকার নেই আমাদের। যুদ্ধ বাধলেও যা, আর না-বাধলেও তাই। আমাদের পক্ষে সবই সমান। আমাদের খেটে খাওয়ার কপাল। আমাদের যখন বরাবর খেটেই খেতে হবে তখন ও-সব রাজারাজড়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী! তার চেয়ে এই যাত্রা কবিগান পাঁচালি নিয়েই মেতে থাকি। আর আছে তাস। তাস খেলতে খেলতেই রাতগুলো কাবার করে দিই—

হঠাৎ আসরের এক কোণ থেকে অনুরোধ এলো—একটু রসের গান হোক এবার—আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম—

তা রসের গানই শুরু হলো একটার পর একটা।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম।
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও-বিষ ভখিতাম।।

সঙ্গে সঙ্গে সারা আসরময় হুল্লোড় পড়ে গেল। রীতিমত তারিফের হুল্লোড়। এই গানটা অনেকবার শুনেছে নবাবগঞ্জের লোক। তবু এ-গান যেন পুরোন হতে নেই নবাবগঞ্জের লোকদের কাছে। কবিয়ালের দল এলেই বায়না ধরে—ওই গানটা গাও হে, আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম—

ভিড়ের ভেতরে এক কোণে বসে একটা লোক একমনে গানটা শুনছিল। আর ভাবছিল রাধার কথা। ছোট বেলায় সেই রানাঘাটের রাধার বাড়িতেই গানটা প্রথম শুনেছিল সে।

হঠাৎ পাশ থেকে একজন বলে উঠলো—আরে সদা না? সদা তুই? তুই অ্যাদ্দিন পরে কোত্থেকে এলি?

সদানন্দ এতক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কেউ জানতে পারেনি তার কথা। চুপি চুপি এতকাল পরে এসে পৌঁছেছিল নবাবগঞ্জে।

পাশেই বসে ছিল কেদার। সেও দেখলে। সেও চিনতে পেরেছে। আরে তুই? তুই কোত্থেকে এলি?

শুধু কেদার নয়, কেদার, গোবর্ধন, নিতাই হালদার, গোপাল ষাট সবাই একবারে হই-হই করে উঠেছে। চৌধুরীবাড়িতে এতদিন এত কাণ্ড হয়ে গেল আর যাকে নিয়ে কাণ্ড সে-ই এতদিন পরে সশরীরে এখানে এসে হাজির!

—কোথায় ছিলি তুই এতদিন?

সকলেরই ওই এক প্রশ্ন। এ কী চেহারা হয়েছে সদার! এই ক'বছরে একেবারে ভোল পাল্টে ফেলেছে সদা। মুখে অল্প-অল্প খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে ছেঁড়া চটি।

সদানন্দ হাসতে লাগলো।

কেদার বললে—হাসছিস যে?

সদানন্দ বললে—ওই গানটা শুনে। ওই গানটা শুনলেই আমার অন্য কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় লোকটা ভুলে গাইছে। 'শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত' কথাটা ঠিক নয়, ওটা হবে 'টাকার পীরিত গরল মিশ্রিত'।

বলে আবার হাসতে লাগলো।

নিতাই বললে—তোর বাবার সঙ্গে দেখা করেছিস?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, বাবা বাড়িতে ঢুকতে দিলে না। বাড়ি থেকে বার করে দিলে—

বলে আবার হাসতে লাগলো।

পরমেশ মৌলিকও শুনছিল পাশে বসে। সেও অবাক হয়ে গেল। বললে—তোমাকে ঢুকতেই দিলেন না চৌধুরী মশাই?

পরমেশ মৌলিকের চাকরি চলে গিয়েছিল। শুধু পরমেশ মৌলিক নয়, সকলের চাকরিই চলে গিয়েছিল। কৈলাস গোমস্তা, দীনু কেউই নেই আর তখন চৌধুরী বাড়িতে। কৈলাস, দীনু, পরমেশ মৌলিক সবাই তখন চাকরি করছে বেহারি পালের আড়তে।

সত্যিই এ ক'বছরে নবাবগঞ্জের ভেতরে যে এত পরিবর্তন হয়ে গেছে তা সদানন্দ জানতো না। যখন নবাবগঞ্জে এসে সে পৌঁছেছিল তখন কেউই জানতে পারেনি। বহুবছর পরে আসা। বলতে গেলে এক যুগ। এই এক যুগে যে কত কী ঘটে গেছে তা যেন ভাবাও যায় না। সমস্ত পৃথিবীটাই সদানন্দের দেখা হয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রদক্ষিণ-পথে কেন যে আবার সে তার জন্মভূমিতে ফিরে এল তা সে-ই জানতো। ভেবেছিল সে এসে দেখবে তার রক্তারক্তির ফলে কোথায় কী প্রতিক্রিয়া হলো! যে কর্তাবাবু তাঁর বংশরক্ষে করবার জন্যে এত আয়োজন করেছিলেন তার শেষটাও দেখবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু শুধু কর্তাবাবুর শেষটাই নয়, ফিরে এসে অনেক কিছুরই শেষ দেখতে পেলে সদানন্দ। দেখলে যে-বাড়িতে একদিন সে জন্মেছে সে বাড়ি তখন ঠিক সেই কালীগঞ্জের জমিদারের বাড়ির মতই ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে সদানন্দ বারবাড়ির উঠোনে ঢুকলো। সেই উঠোন যেখানে বিধু কয়ালের ছেলে ধান-চাল-সরষে আর পাটের ওজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। ডান দিকে চণ্ডীমণ্ডপ। তার পাশেই বংশী ঢালীর ঘর। সব ফাঁকা। জায়গাটার চারদিকে আগাছা ঝোপঝাড় জন্মে একেবারে যাতায়াতের রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে ভেতর বাড়ি। ভেতরবাড়িতে ঢুকতে কেমন ভয় করতে লাগলো সদানন্দর। মনে হলো কে যেন পেছন থেকে ডাকলে—খোকা—

সদানন্দ শিউরে উঠেছে। কে?

ঠিক যেন মা'র গলার মতন। সদানন্দও ডাকলে—মা—

সদানন্দর গলার আওয়াজ পেয়ে একদল চামচিকে কড়িকাঠ থেকে ফর্ ফর্ করে বাইরে উড়ে গেল। অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি বারান্দায়। অনেকদিন যেন কারোর পায়ের স্পর্শও পড়েনি বাড়িতে। যেন সব বিশৃঙ্খলা চারদিকে। কিন্তু ভেতরবাড়ির দরজার সামনেই বাধা পড়লো। দরজার মাথায় তালা ঝুলছে। আর সামনে যাওয়া গেল না। সদানন্দ এবার চলে আসছিল। পাশে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। কেন মনে হলো যেন ওপরে দোতলায়ও সে গিয়ে দেখবে। এ সমস্ত বাড়িরই তো উত্তরাধিকারী সে। সে নরনারায়ণ চৌধুরীর পৌত্র, হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। তার এ-বাড়ির সর্বত্র যাবার অধিকার আছে।

আধখানা উঠেই মনে হলো যেন ওপরের ঘর থেকে একটা অস্পষ্ট আলোর ক্ষীণ রেখা আসছে। তাহলে ওপরে নিশ্চয়ই কেউ আছে। তার পায়ের বোধহয় আওয়াজ হয়েছিল সামান্য। সেই সামান্য আওয়াজেই কে যেন ভেতরে সচেতন হয়ে উঠেছে।

—কে?

শুনেই বোঝা গেল চৌধুরী মশাই-এর গলা। সমস্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন সজীব মানুষের চলা-ফেরা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছে। কোনও প্রত্যুত্তর না পেয়ে চৌধুরী মশাই আবার বললেন—কে? কে ওখানে?

সদানন্দ স্পষ্ট গলায় বললে—আমি—

চৌধুরী মশায় উত্তরটা শুনে বোধ হয় খুশী হলেন না। বললেন—আমি কে? নাম নেই—?

সদানন্দ বললে—আমি সদানন্দ—

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির মাথায় যেন বাজ পড়লো! সদানন্দর মুখের সামনে দরজাটা হাট করে খুলে গেল এক মুহূর্তে। আর সদানন্দ দেখতে পেলে সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবা।

খানিকক্ষণ দু'জনের মুখেই কোনও কথা নেই। যেন দু'জনেই দু'জনের সামনে ভূত দেখেছে। একদিন এই সদানন্দকে ঘিরে যে-লোকটার ভাবনা-চিন্তা-আনন্দ আর শান্তির শেষ ছিল না সেই তাকেই সামনে দেখে তিনি কী যে করবেন ভেবে পেলেন না। একদিন নিজের মাথায় আঘাত করে এ-বাড়ির কপালেও এক চরম আঘাত দিয়েছিল এই সদানন্দ। এই চৌধুরী মশাই-এর আজ সব গেছে। এই সদানন্দের জন্যে চৌধুরী মশাই সমস্ত গ্রামের লোকের কাছে চরম কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েছিলেন। এর জন্যেই তাঁর সর্বস্ব গেছে, তাঁর মান-মর্যাদা-বংশ সমস্ত ধুলোয় মিশেছে। এই এর জন্যেই তিনি আজ অভিশাপগ্রস্তের মত দিন কাটাচ্ছেন। আর তিনি যখন সর্বনাশের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছেন ঠিক তখনই কিনা আবার এ এসে হাজির হয়েছে!

—কেন এসেছ? কেন এসেছ বলো?

সদানন্দ কোনও উত্তর দিলে না। শুধু হাসলো একবার ঠোঁটের ফাঁকে।

—আবার হাসছো? তোমার লজ্জা করে না? কেন এলে আবার আমার বাড়িতে?

সদানন্দ তবু কোনও উত্তর দিলে না। যেমন হাসছিল তেমনিই হাসতে লাগলো।

—হাসছো কেন? কথার জবাব দাও?

সদানন্দ এবার স্পষ্ট করে হাসতে লাগলো। যেন চৌধুরী মশাই-এর সর্বনাশ দেখে সে খুশী হয়েছে। যেন বলতে চাইছে—আমি তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম কালীগঞ্জের বউ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে। তখন তো আপনারা আমার কথা শোনেননি। তখন তো আপনারা জোর করে আমাকে আমার ঘরে পুরে সুন্দরী বউকে সামনে লেলিয়ে দিয়ে দরজায় শেকল দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তো ভেবেছিলেন মেয়েমানুষের সুন্দর মুখ দেখে আমি ভুলে যাবো। ভেবেছিলেন দশ হাজার টাকার খেসারত আর আপনাদের দিতে হবে না। কিন্তু কোথায় গেল সেই দশ হাজার টাকার ধাপ্পা? এখন যে তার গুণোগার দিতে হচ্ছে দশ লাখ টাকার সেলামী গুনে দিয়ে! কিন্তু এই দশ লাখ টাকার সেলামী গুণে দিয়েও কি কালীগঞ্জের বউ-এর রক্তের ঋণ শোধ করতে পারবেন? এখনও যে অনেক গুণোগার বাকি আছে।

—বলো, কেন এসেছ তুমি? বলো, কথার জবাব দাও! কথা বলছো না কেন?

সদানন্দ জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল। তবু তার মনের কথাগুলো বুঝি চোখের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার চোখ দুটো বললে—কেন এসেছি? এসেছি মানুষ কেমন করে রক্তের ঋণ শোধ করে তাই দেখতে! কপিল পায়রাপোড়া, মাণিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিকের রক্ত, কালীগঞ্জের বউ-এর রক্ত কি মিথ্যে হবে?

চৌধুরী মশাই আর থাকতে পারলেন না। বললেন—কথার জবাব দেবে না তো বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, যাও বেরিয়ে—

সদানন্দ আর দাঁড়ালো না। সদানন্দ বেরিয়ে আসবার আগেই চৌধুরী মশাই-এর দরজাটা তার মুখের ওপরেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে আসতেই হঠাৎ যেন আবার সেই ডাক—খোকা—

সদানন্দ এক মুহূর্তের জন্যে একটু থমকে দাঁড়ালো। একবার চারিদিকে চাইলে। কই, কোথাও তো কেউ নেই, তবে কে তাকে ডাকলে?

—খোকা! তুই এসেছিস?

এবার সদানন্দ বড় ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বারান্দা পেরিয়ে সদরের দিকে পা বাড়াবার চেষ্টা করলে। হঠাৎ একটা কালো ছায়ার মত কে যেন পায়ের কাছে এসে তাকে শুঁকতে লাগলো।

—কে? কে? কে?

না, কেউ নয়। মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল সদানন্দ। ছায়াটা একটা কুকুর। তাদেরই আশ্রিত কুকুর। বাড়ি পাহারা দিচ্ছে উঠোনে বসে। অথচ অবলা জীবটা জানে না যে পাহারা দেবার মত কিছু নেই আর এ-বাড়িতে। এতদিন পাহারা দিয়েই কি তুই কিছু আটকাতে পেরেছিস! সর্বনাশ যখন আসে তখন হাজার পাহারা দিলেও আসে, পাহারা না দিলেও তা আসে। পাইক বরকন্দাজ-লাঠিয়াল-বন্দুক-রাইফেল দিয়েও তা রোধ করা যায় না। কারণ আর কেউ না জানুক সদানন্দ ভালো করেই জানতো—তুমি হাজার চেষ্টা করলেও জীবনের মত মৃত্যুকেও ঠেকানো যায় না। পৃথিবীতে একমাত্র মৃত্যুরই মৃত্যু নেই। এ-পৃথিবীতে একমাত্র মৃত্যুই অবিনশ্বর।

সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে সে সোজা এসে দাঁড়ালো বারোয়ারিতলায়। সেখানে তখন অসংখ্য মানুষের ভিড়। লণ্ঠন জ্বালিয়ে কবিয়ালের আসর বসেছে। কবিয়াল তখন সেই গানটাই রসিয়ে রসিয়ে গাইছে ঃ

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম ॥
কূলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও-বিষ ভখিতাম ॥

সদানন্দ সেখানে গিয়ে নিঃশব্দে ভিড়ের মধ্যে বসে পড়লো।

সে বহুদিনের কথা। সে-কথা সদানন্দের জানা না থাকলেও গ্রামের আর কারো জানতে বাকি ছিল না। ওই বেহারি পালের বউ সকলের আগে জেনেছিল। আর তারপর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো শুনতে বাকি ছিল না।

সদানন্দ চলে যাবার পর থেকেই রহস্যটা যেন আস্তে আস্তে আরো ঘনিয়ে আসছিল। কর্তাবাবুর মৃত্যুর পর অবশ্য কেউ বুঝতে পারেনি। মৃত্যু না মৃত্যু! বহুদিন ধরে যে-মানুষটা ভুগছিল তার মৃত্যুতে কে আর কী সন্দেহ করবে! যেমন ঘটা করে জমিদার-বাড়িতে শ্রাদ্ধ হয় তেমনি করেই তাঁর শ্রাদ্ধ হলো। লোকজন খেলেও প্রচুর। একেবারে পেট পুরেই খেলে সবাই। কিছু কিছু লোক ছাঁদা বেঁধেও বাড়িতে নিয়ে গেল। দক্ষিণা পেলে ব্রাহ্মণরা।

কাপড়ও পেলে বাড়ির লোকজনেরা। যারা পাতা পেতে খাবে না তারা ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেল। মোটকথা নবাবগঞ্জের গ্রামবাসীরা ক'দিন ধরে খুব একচোট আনন্দ করে নিলে।

শুধু একজনের কথা কারো মনে পড়লো না। সে বাড়ির ছেলে সদানন্দ।

বেহারি পাল একবার জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল—সদানন্দর কোনও খবর পেলেন নাকি চৌধুরী মশাই!

চৌধুরী মশাই কথাটা শুনে ক্ষেপে গেলেন। তবু মনের রাগ মনে চেপে রেখেই বললেন সে-ছেলের খোঁজখবর পেলেই বা কী লাভ? সে থাকলেও যা, না থাকলেও তাই—

বেহারি পাল বলতে গেল—কিন্তু হাজার হোক আপনার নিজের ছেলেই তো সে! সে যত অন্যায়ই করুক, আপনি কি বাপ হয়ে তাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন? অন্তত আপনি না হোক, তার গর্ভধারিণীও কি ভুলতে পারবেন তাকে?

কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ বেশি আলোচনা করতে চাইতেন না চৌধুরী মশাই। চৌধুরী মশাই যেন তারপর থেকে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। যেন আরো খিট্‌খিটে আরো গম্ভীর। কর্তাবাবুর দোতলার ঘরটা তখন খালিই পড়ে থাকতো। তিনি সেখানেই নিজের থাকবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপে কেউ এসে চৌধুরী মশাই-এর কথা জিজ্ঞেস করলেই সেরেস্তাদার বলতো—তিনি তো আর নিচেয় নামেন না, ওপরে আছেন—

কিন্তু সামান্য একটা আর্জি পেশ করবার জন্যে অনেকেই ওপরে যেতে চাইতো না। চৌধুরী মশাইও অনেক বাজে ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতেন। কিন্তু যখন সন্ধ্যে হয়ে আসতো তখন কেমন যেন একটা আতঙ্কে বুকটা শিরশির করে উঠতো। রাত্রে ভয়ে ভয়ে অনেক সময় যেন দম আটকে যাবার মত অবস্থা হতো। কে যেন গলা টিপে ধরতো তাঁর। ধড়মড় করে তিনি উঠে আলোটা জ্বালতেন। এক গেলাস জল খেতেন। তারপর আবার শোবার চেষ্টা করতেন।

পাশে শুয়ে এক-একদিন গৃহিণীর ঘুম ভেঙে যেত। বলতো—কী হলো? ঘুম আসছে না তোমার?

চৌধুরী মশাই বলতেন—না, জলতেষ্টা পেয়েছিল—

তারপর আবার জিজ্ঞেস করতেন—বউমা কোথায়?

গৃহিণী বলতো—কেন? বউমার কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? বউমা তার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে—

রাত্রে ওই পর্যন্তই।

কিন্তু সকাল বেলা বাড়ির আবার অন্য এক চেহারা। বাড়ির লোক বলতে তো মাত্র দু'জন। কর্তা আর গিন্নী। আর এ ছাড়া আছে আর একজন। পরের বাড়ির মেয়ে। তখন কর্তাবাবুও আর নেই, সদানন্দও নেই। সংখ্যায় দু'জন কমে গেছে। কিন্তু দু'-তিনজন প্রাণীকে কেন্দ্র করে যে নাটক ঘটে চলেছে তা বুঝি পৃথিবীর কোনও সংসারেই আগে কখনও ঘটেনি।

নয়নতারা তখন স্নান করে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ভিজে চুল শুকোচ্ছে।

হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে শাশুড়ি দৌড়ে এল কুয়োতলায়। বললে—বউমা তুমি কি কালা? কানে কালা হয়েছ নাকি তুমি?

নয়নতারা বললে—কেন মা? কি হয়েছে?

—তুমি আবার বলছো কী হয়েছে! আমি যে এদিকে তোমাকে ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেলছি তা তো তোমার কানে যায় না বাছা। না তুমি ভাবছো শাশুড়ি ডেকে ডেকে মরুক গে, আগে চুল তো শুকোই।

নয়নতারা সঙ্কোচে জড়োসড়ো হয়ে বললে—কিন্তু আমি তো শুনতে পাইনি মা—

শাশুড়ি বললে—তা শুনতে পাবে কেন? শুনলে যে গেরস্তের সংসারের সাশ্রয় হবে। সংসার পুড়ে যাক ঝুড়ে যাক তাতে তোমার কী? তোমাকে তো আর গতরে খেটে পয়সা উপায় করতে হয় না? যাকে পয়সা উপায় করতে হয় সে বুঝবে। বলি উনুনে যে দুধ পুড়ে যাচ্ছে সেই দুধপোড়া গন্ধও তো মানুষের নাকে আসে! তোমাকে দিয়ে কি বাছা আমার সংসারের কোনও কাজটাই হবে না বউমা, শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবার জন্যেই তোমাকে বউ করে বাড়িতে এনেছি? তবু বুঝতুম যদি নিজের স্বামীকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারতে—

বলতে বলতে শাশুড়ি যেমন এসেছিল তেমনি আবার গর-গর করে রান্নাবাড়ির দিকে চলে গেল।

নয়নতারাও শাশুড়ির পেছন পেছন রান্নাবাড়ির ভেতরে এসে দাঁড়ালো। দেখলে এক কড়া দুধ উনুনে জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, কারোর নজর ছিল না সেদিকে। সবাই সংসারের যে-যার কাজে ব্যস্ত। তারই মধ্যে সমস্ত দুধটা কখন পুড়ে একেবারে চাঁছি হয়ে গেছে। এতখানি লোকসানের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে যে কী করবে বুঝতে পারছিল না। গৌরী পিসীর মুখেও তখন কথা নেই। বিষ্টুর মাও দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গেছে। সবাই মিলে তখন রান্নায় হাত লাগিয়েছে। এই অবস্থায় নয়নতারার যেন নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ শাশুড়ির কথায় যেন তার চমক ভাঙলো। শাশুড়ি বললে—তুমি আবার ঠুঁটো জগন্নাথের মতন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলে কেন শুনি? তোমার ঘর আছে, তুমি ঘরে যাও না, ঘরে গিয়ে পটের বিবি সেজে শুয়ে থাকো না গিয়ে, খাবার হলে তোমাকে ডাকবো'খন, দয়া করে তখন খেয়ে নিয়ে আমার হেঁসেল মুক্ত করে দিও, যাও—

নয়নতারা সেইখানে দাঁড়িয়ে শাশুড়ির সমস্ত কথাগুলো শুনলো। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

শুয়ে পড়ে কখন যে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল তার খেয়াল ছিল না। শাশুড়ির ডাকাডাকিতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যেতেই নয়নতারা শুনতে পেলে শাশুড়ি বলছে—এত ঘুম তোমার কোত্থেকে আসে বৌমা? আর তাও বলি, আমি তোমাকে ঘরে গিয়ে শুতে বললুম বলে তুমিও অমনি শুয়ে পড়লে? বলি আক্কেল জিনিসটাও কি মাথা থেকে বিদেয় করে দিয়েছ তুমি? বুড়ি শাশুড়ি মরে মরে তোমাকে ভাত রেঁধে এনে তোমার মুখে তুলে দেবে আর তুমি দয়া করে গিলবে, এই কি তুমি চাও? তা তাই যদি চাও তো তাও দিতে পারি, তোমার মুখের কাছে ভাতের থালা এনে তোমাকে খাইয়ে দিতে পারি। তাই-ই দেব!

নয়নতারা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে রইল। বললে—আমায় মাফ করবেন মা, আমি বুঝতে পারিনি—কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

শাশুড়ি বলে উঠলো—তা তো ঘুমিয়ে পড়বেই বউমা, বাড়িতে এতগুলো দাসীবাঁদী আছে, তুমি ঘুমোবে না তো কে ঘুমোবে! ভগবান তোমাকে ঘুমোবার কপাল দিয়েছে, তুমি তো ঘুমোবেই। আমার খেটে মরার কপাল তাই আমি চিরটাকাল কেবল খেটেই মরবো—

তারপর আর কথা না বাড়িয়ে নয়নতারা গিয়ে খেতে বসতো। খেতে খেতে অনেক কষ্টে চোখের জলটাকে আটকে রাখতো। নইলে শাশুড়ি দেখতে পেলেই আবার নতুন করে সে-জন্যে গঞ্জনা দেবে। বাবা-মার কাছে বড় আদরে মানুষ হয়েছিল নয়নতারা। জীবনে গঞ্জনাটাকে তাই বরাবর সব চেয়ে ভয় করে এসেছে সে। আর এখন সেই গঞ্জনাই কিনা তাকে দিনের পর দিন শুনে যেতে হচ্ছে!

অথচ কী করেছে সে? কী অপরাধটা সে করেছে যে তাকে এত গঞ্জনা সহ্য করতে হবে?

গৌরী পিসীও যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল তখন। যে গৌরী পিসী বিয়ের পর তাকে অত আদর করতো, তারই বা ব্যবহার অমন হয়ে গেল কেন কে জানে?

বেহারি পালের বউ চুপি চুপি চুপি এক-একদিন এসে হাজির হতো।

বলতো—তোমার শাশুড়ি কোথায় বউমা?

নয়নতারা বলতো—বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন, ডেকে দেব?

বেহারি পালের বউকে বড় ভালো লাগতো নয়নতারার। কিন্তু শাশুড়ির ভয়ে দিদিমা বেশি আসতেও পারতো না। যখন দুপুরবেলা সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়তো তখন টিপি টিপি পায়ে নয়নতারার ঘরে এসে বসতো।

বলতো—কেমন আছো বউমা?

প্রথম প্রথম বেহারি পালের বউকে দেখলেও ভয় পেয়ে যেত নয়নতারা। মনে হতো যদি দিদিমা শাশুড়িকে বলে দেয়! তাই শুয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে বসতো।

বেহারি পালের বউ বলতো—উঠলে কেন বউমা, তুমি শুয়ে থাকো না, আমি দেখলুম এ-বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে কিনা তাই তোমার কাছে এলুম। তা সকালবেলা শাশুড়ি তোমাকে অত বকছিল কেন বউমা, তুমি কী করেছিলে কী?

প্রথম প্রথম নয়নতারা নিজের দুঃখের কথা কিছু বলতো না। কিন্তু পাশের বাড়ির কথা কত দিন আর চাপা থাকে? বেহারি পালের বউ বলতো—তোমার শাশুড়ি তোমাকে খেতে-টেতে দেয়?

নয়নতারা বলতো—দেয়—

বেহারি পালের বউ সবই জানতো। তার কাছে কিছু লুকোন চলতো না। বলতো—তুমি মিছে কথা বলছো, বউমা, আমি সব দেখেছি, তোমার খাওয়াই হয়নি আজকে—

নয়নতারা অবাক হয়ে যেত বেহারি পালের বউ-এর মুখের দিকে চেয়ে। তারপর আর কিছু করতে না পেরে তার কোলে মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলতো।

কাঁদতে কাঁদতে বলতো—আমার কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করে না দিদিমা—কিচ্ছু ভালো লাগে না। ওরা একটু দূরে সরে গেলেই আমি ভাতগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিই, কুকুরে এসে সব খেয়ে যায়।

বেহারি পালের বউ বলতো—খাবে কী বউমা, ক্ষিধে হবে কেন? তোমাকে কী খেতে দেয় তোমার শাশুড়ি তা তো আমার দেখতে বাকি নেই, ওই ডাল আর ভাত কেউ খেতে পারে?

তারপর আঁচলের ভেতর থেকে দিদিমা কতদিন খাবার বার করতো। কোনও দিন মাছ ভাজা, কোনও দিন বা পোস্তর বড়া। এমনি সব কত কী খাবার! বাড়িতে যা রান্না হতো সব বেছে বেছে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে এনে নয়নতারাকে খাওয়াতো।

বেহারি পালের বউ-এর কাছে নয়নতারা নিজের মনটা উজাড় করে ঢেলে দিত। বলতো—এ রকম কেন হলো দিদিমা? আপনি তো গোড়া থেকেই সব দেখে আসছেন, আমি কী এমন দোষ করেছি যে আমাকে শাশুড়ি মোটে দেখতে পারেন না—

দিদিমা বলতো—তোমার শাশুড়ি কি মানুষটা ভালো যে তোমাকে দেখতে পারবে বউমা?

নয়নতারা বলতো—কিন্তু আগে তো এমন ছিলেন না। আগে আমাকে কত আদর করতেন, তা তো আপনার দেখেছেন—

—ছাই আদর করতো, ছাই! ও এক নম্বরের বদমাইশ মেয়েমানুষ! আমি তোমার শাশুড়িকে চিনি না বলতে চাও?

—কিন্তু আমি তো শাশুড়িকে বরাবর ভক্তি শ্রদ্ধা করে এসেছি দিদিমা! আমি তো আমার দিক থেকে কোনও দোষ করিনি। আমার নিজের মা নেই, তাই বরাবর শাশুড়িকেই আমি আমার মা বলে মনে করেছি! আমার কি দোষ আপনিই বলুন?

বেহারি পালের বউ বলতো—দোষ তোমার নয় তো কার বউমা? দোষ তো সব তোমারই—

—আমার দোষ? কেন?

—তা তোমাকে কেন শাশুড়ি আদর-যত্ন করবে? তুমি শ্বশুর-শাশুড়ির কোনও উপকারে এসেছ? তুমি তোমার সোয়ামীকে ঘরে আটকে রাখতে পেরেছ? সোয়ামী না থাকলে মেয়েমানুষের আবার খাতির-যত্ন কী? কথায় বলে সোয়ামী নেই যার সে ঘরের বার। সোয়ামী-পুত কিছুই নেই তোমার, কে তোমাকে ভালোবাসবে বউমা? তুমি কি তোমার শাশুড়ির কোলে একটা নাতি তুলে দিতে পেরেছ?

নিজের অক্ষমতায় নিজের অসার্থকতায় নয়নতারা আরো ভেঙে পড়তো। বলতো—আপনি তো সব জানেন দিদিমা, আপনি জেনেশুনে তবু এই কথা কেন বলছেন?

এসব কথা বেশিক্ষণ হতো না। বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ হলেই বেহারি পালের বউ তাড়াতাড়ি উঠে যেত। যাবার আগে বলতো—আমি আসি বউমা, পরে আবার এক সময়ে আসবো'খন, তোমার শাশুড়ি মাগী দেখতে পেলে আবার অনর্থ বাধাবে—যাই—

কিন্তু বাইরে গিয়ে শাশুড়ির কাছে বেহারি পালের বউ আবার অন্য মানুষ। শাশুড়ি বলতো—এসো এসো মাসিমা, কী রাঁধলে আজকে?

এটা-ওটা কথা হবার পর বেহারি পালের বউ জিজ্ঞেস করতো—তোমার বউমা কোথায় বউ, বউমাকে যে দেখছিনে?

শাশুড়ি বলতো—বউমা আর কোথায় থাকবে, নিজের ঘরেই ঘুমোচ্ছে, ঘুম ছাড়া তো বউমার আর কোনও কাজ নেই—

এমনি করেই চলছিল নয়নতারার জীবন। যেদিন প্রথম বউ হয়ে এ বাড়িতে এসেছিল তখন এক-রকম, আবার যখন সদানন্দ বাড়ি থেকে চলে গেল তখন একেবারে অন্যরকম। কর্তাবাবু মারা যাবার পর থেকেই যেন একেবারে এ বাড়ির জীবন-যাত্রা অন্য দিকে মোড় ফিরলো।

সেদিন হঠাৎ শাশুড়ি বললে—বউমা, আজ রাত্তিরে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ো না, দরজা খুলে শুয়ো—বুঝলে?

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না নয়নতারা। বললে—দরজা খুলে শোব?

শাশুড়ি গম্ভীর মুখে বললে—হ্যাঁ—

নয়নতারা তবু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কেন মা? দরজা খুলে শোব কেন?

শাশুড়ী বললে—যা বলছি তাই কোর, তর্ক কোর না—

কিন্তু আপনিই তো আগে আমাকে রোজ দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে শুতে বলতেন?

শাশুড়ি তেমনি সুরেই বললে—আগে যা বলতুম বলতুম, আজ তুমি দরজা খুলে শোবে।

তবু কেমন যেন খটকা লাগলো নয়নতারার মনে। হঠাৎ শাশুড়ি তাকে দরজা খুলে শুতে বলছে কেন?

বললে—আপনি বুঝি আজ রাত্তিরে আমার ঘরে শোবেন?

শাশুড়ি এতক্ষণে রেগে গেল। বললে—তুমি তো দেখছি খুব বেয়াদব মেয়ে বউমা। আমি তোমার ঘরে শুই না-শুই তাতে তোমার কী? আমি যা বলছি তাই করবে—যাও এখন—

এসব কথা বেহারি পাল জানে। বেহারি পালের বউও জানে। আর শুধু বেহারি পালের বউই নয়, ওই নিতাই হালদার, কেদার গোবর্ধন যারা বারোয়ারিতলায় নিতাই হালদারের দোকানের সামনের মাচায় বসে তাস খেলে তারাও জানে। যেসব মেয়েরা নদীতে চান করতে যায় আর এ-বাড়ির ও-বাড়ির গল্প করে তারাও জানে। এককালে নবাবগঞ্জের চৌধুরীবাড়ির নতুন বউ নয়নতারাকে নিয়ে কত হইচই বেধে গিয়েছিল কত কানাঘুঁষো চলেছিল। কালের খরস্রোতে সে-সব প্রসঙ্গ প্রায় ভেসে গিয়েছে এখন। কিন্তু এতদিন পরে সেই সদানন্দকে দেখে আবার যেন সব মনে পড়তে লাগলো তাদের।

গান তখনও পুরোদমে চলেছে ঃ

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্মময় ॥
নারীর মিলতে যেমন ভুলতে তেমন,
দুই দিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে চায় না ফিরে
আপনি হয় অন্তর।

বেহারি পালও গান শুনছিল। বলতে গেলে বেহারি পালই বেশি চাঁদা দিয়েছিল গানের জন্যে। নবাবগঞ্জের মাথা এখন বেহারি পাল। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে ডাকলে, ওগো শুনছো—

বেহারি পালের বউ-এর তখন ঘুমে চোখ ঢুলছে। গান শুনে এসে শুতে পারলে বাঁচে। বললে—কী?

—কাকে এনেছি দেখ। চৌধুরী মশাই-এর ছেলে সদানন্দ।

বউ-এর যেন বিশ্বাস হলো না। বললে—বলছো কী? আমাদের সদানন্দ? এতদিন কোথায় ছিল সে?

বেহারি পাল বললে—চৌধুরী মশাই-এর কাছে গিয়েছিল, ছেলেকে নাকি চৌধুরী মশাই বাড়িতে ঢুকতেই দেয়নি, তাড়িয়ে দিয়েছে দূর করে। তাই আর কোথায় যাবে, তাকে আমাদের বাড়িতে ডেকে এনেছি—

বেহারি পালের বাড়িতে ঘর-দোরের অভাব নেই আর আগেকার মতন। এখন যুদ্ধের কল্যাণে ব্যবসাও আরো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। আরো টাকাপয়সা হয়েছে। বেহারি পালের বউ বাইরে বেরিয়ে এল। বলল—কই কোথায় সদানন্দ, দেখি—

সদানন্দর মুখে সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। ময়লা পাঞ্জাবি, ছেঁড়া চটি কিন্তু হাসি মুখ।

বেহারি পালের বউ বললে—এতদিন কোথায় ছিলে বাবা তুমি? সে-ই তুমি এলে, আর কিছু দিন আগে আসতে পারলে না, তাহলে আর নয়নতারার এমন করে সর্বনাশ হতো না—আহা—

সদানন্দ কিন্তু নির্বিকার। সে তখন হাসছে।

বেহারি পালের মনে পড়তে লাগলো সেই ঘটনাটা। নয়নতারাই পরে বলেছিল। শাশুড়ি যেমন বলেছিল তেমনি করে দরজা খুলে রেখেই শুয়েছিল নয়নতারা। তারপর হয়ত একটু তন্দ্রাও এসেছিল। জানালা দিয়ে আকাশের জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল বিছানার ওপর।

হঠাৎ যেন একটা কীসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘুমটা ভাঙতেই দেখলে কে

যেন একেবারে বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কে? কে?

নয়নতারা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল মানুষটাকে। চিনতে পারলে। এক মুহূর্তে নয়নতারা নিজের কাপড়টা সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। না, স্বপ্ন তো নয়, সত্যিই তো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মানুষটাকে—

নয়নতারা আর থাকতে পারলে না। চিৎকার করে উঠলো—মা—মা—মা—

নয়নতারার সমস্ত শরীরটা তখন ঘামে ভিজে উঠেছে। তার চিৎকারে ঘরটা আবার ফাঁকা। মনে আছে অনেক রাত্রে শাশুড়ি এসে তার পাশে শুয়ে পড়েছিল। তার পরে কখন সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর কিছুই খেয়াল ছিল না তার। কিন্তু যে মানুষটা তার ঘরে এসেছিল সে তখন উধাও। নয়নতারা বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিক দেখলে। কেউ কোথাও নেই। তাহলে কে তার ঘরে ঢুকেছিল?

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার। তাড়াতাড়ি শাশুড়ির ঘরের সামনে এসে আবার ডাকতে লাগলো—মা, মা—দরজাটা একটু খুলুন—

কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

কিন্তু শাশুড়িকে না ডেকে অন্য কী উপায়ই বা আছে তার? অথচ রাত্রে ডাকলে হয়ত শাশুড়ি রাগ করবে!

নয়নতারা আবার ডাকলে—মা, ওমা—

এতেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন দরজায় ধাক্কা দিতে হলো। হয়ত মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সারাদিনের ঝঞ্ঝাটের পর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে আছে।

—মা, মা, ওমা—

এবার সাড়া পাওয়া গেল। দরজার খিল খুলে শাশুড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। বললে—কে? বউমা? কী হলো?

নয়নতারা বললে—আমার খুব ভয় পাচ্ছে—

শাশুড়ি ব্যাপার শুনে রেগে উঠলো—সবই কি তোমার ঢং বউমা? তোমার ভয় পাচ্ছে তো আমি কি করবো? তোমার ভয় পাচ্ছে তো এ-কথাটা বলবার জন্যে এই ভর-দুপুর-রাতে আমার ঘুম না ভাঙালে তোমার চলতো না? কাল সকালে বললে তোমার মহাভারত এমন কী অশুদ্ধ হয়ে যেত শুনি?

নয়নতারা বললে—আমার খুব ভয় করছিল মা, মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার ঘরে ঢুকেছে—

—তুমি আর ঢং কোর না বউমা, তোমার ঘরে কে ঢুকতে যাবে শুনি? কার এত দায় পড়েছে যে এত রাত্তিরে না ঘুমিয়ে তোমার ঘরে ঢুকতে যাবে?

নয়নতারা বললে—চোর-ডাকাত কত কী থাকতে পারে তো! আপনি আমাকে দরজা খুলে রেখে শুতে বলেছিলেন তাই বলছি...আপনি তো আমার পাশেই শুয়েছিলেন, কখন উঠে গেলেন আমি টের পাইনি—

শাশুড়ি বললে—তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি চলে এসেছি। আমার যে আবার নিজের বিছানা ছাড়া অন্য কারো বিছানায় ঘুম আসতে চায় না। আর চোর-ডাকাতের কথা বলছো, তা চোর-ডাকাতের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তোমার ঘরে তারা ঢুকতে যাচ্ছে! তোমার সোনা-দানা সব তো আমার সিন্দুকের মধ্যে! তোমার ঘরে ঢুকে ডাকাতরা কী নেবে শুনি?

—কিন্তু মা, আমি কাল থেকে রাত্তিরে দরজায় খিল দিয়ে শোব।

শাশুড়ি বললে—কালকের কথা কালকে হবে। ও-সব কথা রাতদুপুরে বলে কী হবে?

তার চেয়ে আমাকে এখন একটু ঘুমোতে দাও—। তুমি তো সারাদিন ঘুমিয়েই কাটাও, আমি সারাদিন গতরে খেটে রাত্তিরটুকু যে একটু ঘুমোব তোমার জ্বালায় কি তারও যো নেই—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না শাশুড়ি। নয়নতারার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঘুমোতে গেল।

নয়নতারা সেখানে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করবে বুঝতে পারলে না। ঘরে গিয়ে সে ঘুমোবে কেমন করে? ভাবলে হারিকেনটা জ্বালিয়ে রাখলে হয়। কিন্তু এ বাড়িতে এতদিন এসেছে, হারিকেন কোথায় থাকে তাও তো সে জানে না।

আস্তে আস্তে সে আবার নিজের ঘরে গেল। নিজের ঘরের খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই। বড় ভয় করতে লাগলো তার। কিন্তু এমন করে সমস্ত রাত একলা-একলা সে জেগে থাকবে কী করে? না-ঘুমিয়ে কত দিন কাটাবে? দূরে বারোয়ারিতলায় বোধ হয় যাত্রার রিহার্সাল চলছে। কিছু কিছু গান-বাজনার অস্পষ্ট সুর কানে ভেসে আসছে। এখন একজন কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভলো লাগতো। দিদিমা যদি আসতো এ-সময় তো খুব ভালো হতো। ওই একটা লোক+ ওই একটা লোকের কাছেই তবু মনের কথা খুলে বলা যায়। আর এখানকার অন্য সবাই-ই যেন তার পর!

অথচ আগে শাশুড়ি কত আদর করতো তাকে। এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত ওই শাশুড়ির কাছেই তখন যা-কিছু মনের কথা খুলে বলতে পারতো। যখন সেবার বাবা এসে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তখন তো সে ওই শাশুড়ির মুখের দিকে চেয়েই বাবার সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি। কিন্তু এখন? এখন আর বাবা আসছে না কেন? এখন বাবাও কি তাকে ভুলে গেল?

হয়ত এমনিই হয়। হয়ত সব মেয়ের জীবনেই এমনি হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পর সব বাবা-মাই হয়ত এমনি করে মেয়েকে ভুলে যায়। বলতে গেলে হয়ত কেবল মা'ই মেয়েকে মনে রাখে। সত্যি তার কপালটাই খারাপ! নইলে সেই মা-ই বা কেন চলে যাবে? মা যদি এখন বেঁচে থাকতো তো সে নিজেই মার কাছে চলে যেত। মা'কে গিয়ে বলতো—মা, এবার থেকে আমি আর শ্বশুরবাড়ি যাবো না, আমি এখন থেকে তোমার কাছেই থাকবো। তুমি আমায় থাকতে দেবে না?

মা হয়ত তবু সান্ত্বনা দিত তাকে। আদর করতো তাকে। মা হয়ত বলতো—তুই কিছু ভাবিসনি মা, ও-রকম কত ছেলে বাড়ি থেকে রাগ করে চলে যায়, তারপর দেখেছি একদিন আবার ফিরে আসে। ও কিছু না, তুই কিছুদিন কষ্ট করে থাক্, দেখবি সদানন্দ আবার একদিন তোর কাছে ফিরে আসবে—

কিন্তু হঠাৎ চোখ দু'টো ঘুমে ঢুলে আসতে লাগলো। কিন্তু দরজা খুলে রাখলে ঘুম আসবে কী করে?

নয়নতারা আর থাকতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়ে বিছানার ওপর গিয়ে গা এলিয়ে দিলে। দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে, কিন্তু তবু ঘুম আসছে না। বিছানার ওপর একবার এপাশ একবার ওপাশ করতে লাগলো। কিন্তু তবু কিছুতেই ঘুম এলো না। কেবল মনে হতে লাগলো তার ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে, যদি শাশুড়ী জানতে পারে! যদি বকে শাশুড়ি!

না, আর নয়, নয়নতারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলো। না হোক ঘুম, ঘুম না হলে অবশ্য তার শরীর খারাপ হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে নিয়ে তো সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হবে না। তাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি হবে এটাকেই নয়নতারার সব চেয়ে বেশি ভয়।

হঠাৎ শাশুড়ির কথায় ঘুম ভেঙে গেল নয়নতারার।

—বউমা, বলি তুমি নিজে গিয়ে চা খাবে, না তোমার মুখের কাছে এনে চায়ের বাটি ধরবো? তুমি যদি বলো তো তাও আনতে পারি। আনবো?

শাশুড়ির কথায় লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল নয়নতারা। কখন যে চোখ দুটো জুড়ে ঘুম এসে গিয়েছিল তা তার খেয়াল ছিল না। চারদিকে রোদ উঠে গেছে। জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরের ভেতরটা একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে। এত দেরি পর্যন্ত তো কখনও ঘুমোয়নি সে! এ কী করে হলো! এ কেন হলো!

বাইরে এসে দাঁড়াতেই তার আগের রাত্রের সব ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগলো। দিনের আলোয় ঘটনাকে যেন স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। তবে কি স্বপ্ন দেখেছিল নাকি সে? তার ঘরে যে ঢুকেছিল সেও কি স্বপ্নের মানুষ? সেই ভয় পেয়ে শাশুড়ির ঘরের সামনে এসে ডাকা! সেই শাশুড়ির বকুনি! সবই স্বপ্ন নাকি তাহলে? নয়নতারা অনেকবার করে ঘটনাগুলোকে মনে করবার চেষ্টা করলে। স্বপ্নই যদি হবে তো সে এতক্ষণ ঘুমোল কী করে? শেষরাত্রের দিকে ঘুম এসেছিল বলেই তো এত বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছে। বিছানায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঘুম আসতো তো সে কি এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠতো!

সবাই যখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত তখন নয়নতারাও রান্নাঘরের দরজার সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। সবাই কাজ করছে। এ সময়ে সে যদি তার নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকে তাহলেও দোষ হবে তার। আবার শুধু যদি চুপচাপ দাঁড়িয়েও থাকে তাহলেও দোষ হবে।

শাশুড়ি হঠাৎ বলে উঠলো—তুমি আবার যাবার-আসবার পথের ওপর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছো কেন শুনি? নিজের কাজও করবে না, কাউকে কাজও করতে দেবে না। হয় এখান থেকে সরে যাও না-হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো, খাবার সময় তোমাকে ডেকে পাঠাবোখন। এখন সরো দিকিনি এখান থেকে, পথ ছাড়ো—

নয়নতারা কী করতো বলা যায় না, কিন্তু তার আগেই চৌধুরী মশাই হঠাৎ ভেতরবাড়িতে এসে হাজির। তিনি কথা বলতে বলতে ঢুকছিলেন—ওরে গৌরী, কোথায় গেলি? চণ্ডীমণ্ডপে যে চা দিতে হবে, সব ভুলে গেলি নাকি?

নয়নতারা শ্বশুরকে দেখে মাথার ঘোমটাটা আর একটু মুখের ওপর টেনে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। কিন্তু আবার সেই ঘর! তার নিজের ঘর। সেই ঘর আর বাইরের বারান্দা—এইটুকুই তার পরিক্রমার পরিধি। এইটুকুর মধ্যেই তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। এই বন্দিত্ব থেকে কি তার মুক্তি নেই।

সারা দেশ ঘুরে সদানন্দর তখন একটা বিশেষ উপলব্ধি হয়েছে। এই উপলব্ধি হয়েছে যে সমস্ত পৃথিবীটাই আসলে নবাবগঞ্জ। এই নবাবগঞ্জটাই যেন বড় আকার নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বংশটাই যেন ডালপালা ছড়িয়ে সারা পৃথিবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কর্তাবাবুর মত পৃথিবীতে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কর্তাবাবু ছড়িয়ে রয়েছে, এই চৌধুরী মশাই-এর মত হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ চৌধুরী মশাইও এই পৃথিবীতে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু তারাই যেন ভেতরে ঢুকে সব কিছু তিলে তিলে ধ্বংশ করে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

এই চৌধুরীবাড়িও তেমনি করে তিলে তিলে নিঃশেষ হতে চলেছিল তখন। যেদিন সদানন্দর বিয়ে হলো সেইদিন বুঝি তা প্রথম প্রকাশ পেলে। তারও আগে থেকে হয়ত শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখন কেউ তা টের পায়নি। ছাই-চাপা আগুনের মত তা ভেতরে ভেতরে গুম্‌রে মরছিল। কিন্তু প্রথম ধোঁয়া দেখা গেল বোধহয় সেই সদানন্দর বিয়েকে উপলক্ষ করে। তার পর থেকেই যা শুরু হলো তা সদানন্দ নবাবগঞ্জের লোকের কাছে শুনেছে।

প্রকাশমামা নাকি তখনও হঠাৎ এক-একদিন নবাবগঞ্জে এসে উদয় হতো। রেল-বাজারের স্টেশন থেকে নেমে সাইকেল-রিক্‌শা চড়ে এসে হাজির হতো।

নিতাই হালদারের দোকানে যারা বসে থাকত তারা জিজ্ঞেস করতো—কী গো শালাবাবু, সদার কোনও খোঁজখবর পেলেন?

প্রকাশমামা রিক্‌শার ওপর বসেই চিৎকার করে বলতো—আমার ভাই কথা বলবার এখন সময় নেই, পরে কথা হবে—

প্রকাশমামা বরাবরই ব্যস্তবাগীশ লোক। কোনও দিনই তার গল্প করবার সময় ছিল না। সদানন্দর বিয়ে দেওয়ার সময় তার তো নাইবার-খাবার সময়ই ছিল না। সেটা যদি বা মিটলো, তারপর সদানন্দকে পুলিসে ধরা। আর তারপর বাড়ি ছেড়ে সদানন্দর পালিয়ে যাওয়া। এক-একবার একটা কাণ্ড হয়েছে আর প্রকাশমামা লাল হয়ে উঠেছে। ক্রমে-ক্রমে তার জামা-কাপড়ের বাহার বেড়েছে। ভাগলপুরের বাড়িতে বউকে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছে, আর রাণাঘাটের রাধার ঘরে গিয়ে বাবুয়ানির মেজাজ উড়িয়েছে। প্রকাশমামা রাধার ঘরে গেলে সেদিন উৎসব লেগে যেত। রাধার রান্নাঘর থেকে মাছ-মুরগী আর ইলিশ মাছের ভুরভুরে গন্ধ সমস্ত পাড়াটা মাত করে দিত। গন্ধ বেরোলেই পাড়ার মেয়েরা বুঝতো রাধার বাবু এসেছে—

সেদিন অনেক দিন পরে আবার ঘর থেকে মাংস রান্নার গন্ধ বেরোল।

এমনিতে রাধা ডালভাত-আলুভাতে খেয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকাশমামার তাতে রুচি হয় না। বলে—ও কি খাওয়া! তার থেকে উপোস করে থাকা ভালো।

প্রকাশমামা খাবে তো কালিয়া-পোলাও খাবে আর তা যদি না পায় তো খাবেই না। যখনই রাধার বাড়িতে আসতো তখন একেবারে বাজার থেকে মুরগী কিম্বা পাঁঠার মাংস আলু পেঁয়াজ সব কিছু নিয়ে ঢুকতো।

সেদিনও বাড়ি ঢোকবার মুখেই প্রকাশমামা ডাকলে—রাধা, এই রাধা—

চেনা গলার ডাক পেয়েই রাধা ধড়মড় কর উঠে বসলো। তারপর পড়ি-কি-মরি করে উঠোনে এসে সদরের হুড়কো খুলে দিলে। প্রকাশমামা বললে—মাংস এনেছি, এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দে আর মাংসয় বেশ গরগরে ঝাল দিবি—ঝাল না হলে মুখে মাল একেবারে আলুলি ঠেকে—

বলে মাংসর থলিটা রাধার হাতে দিয়ে পা দুটো ধুয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর জামার পকেট থেকে বোতলটা বার করে রেখে গায়ের জামাটা খুলে ফেলল। তারপর আলনা থেকে রাধার একটা শাড়ি লুঙ্গির মতন করে পরে নিয়ে রাধার বিছানায় বাবু হয়ে বসলো।

একেবারে কায়েমী বন্দোবস্ত প্রকাশমামার। এইটেই তার বরাবরের নিয়ম। যে দু'এক দিন রাধার বাড়ি থাকবে ততদিন রাধার বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও নড়বে না। ওই তক্তপোষের ওপর বসে সিগারেট টানতে টানতে মদ গিলবে আর কেবল চিৎপাত হয়ে ঘুমোবে।

রাধা রান্নাঘরে উনুনে আগুন দিয়ে দিয়েছে তখন। তারই ফাঁকে একবার এল। বললে—তা এতদিন পরে আমাকে বুঝি মনে পড়লো গা?

প্রকাশমামা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—আসতে যে পেরেছি এই তোর ভাগ্যি। বাড়িতে যে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়েছে....

—কেলেঙ্কারি? আবার কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড হলো?

প্রকাশমামা বললে—আমার সেই ভাগ্নেকে দেখেছিস তো? বেটা একেবারে আস্ত অপোগণ্ড। অত লাগ্‌সই মেয়ে দেখে বিয়ে দিলুম, তা বউ-এর সঙ্গে মোটে শোবে না—

—শোবে না মানে?

—শোবে না মানে শোবে না! কত রকমের বেকুব লোকই যে আছে সংসারে তাই ভাবি। বাপের অত টাকা। ঠাকুর্দা মারা যাবার পর তো সব তার বাবাই পেয়েছে। ঠাকুর্দার এক ছেলে। আবার আমার ভাগ্নেটাও ছিল বাপের এক ছেলে। তবু বলে বউ-এর সঙ্গে শোবে না—

—কেন? বউ কি নষ্ট নাকি?

—আরে দূর, আমি নিজে দেখে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছি, এখন সে-সব পুরোন কাসুন্দি থাক্, ভাগ্নেটা আর এক কাণ্ড করে বসেছে। হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়েছে—

রাধা চম্‌কে উঠলো। বললো—পালিয়েছে মানে? তোমার ভাগ্নে তো আমার এখেনে এসেছিল!

—তোর এখেনে? তোর এখেনে আমার ভাগ্নে এসেছিল? কবে? কদ্দিন আগে?

প্রকাশমামা খবরটা শুনে একেবারে তক্তোপোষের ওপর লাফিয়ে উঠে বসেছে। বললে—তুই এতক্ষণে তো কিছু বলিসনি আমাকে? তা হঠাৎ তোর এখেনে আসতে গেল কেন?

রাধা বললে—সে কি নিজে এসেছে? তোমার ভাগ্নেকে তো আমি চিনি, সে কি আমার কাছে আসবার ছেলে? আমি বাজার করে রাস্তা দিয়ে আসছি দেখি তোমার ভাগ্নে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মনে হলো ডাক্তারখানা থেকে বেরোচ্ছে—

—তারপর?

রাধা বললে—আমি চিনতে পেরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম মাথায় কী হয়েছে?

—তা কী বললে সে?

রাধা বললে—সে-কথার জবাব দিলে না তোমার ভাগ্নে। জামা কাপড়ের চেহারা দেখে বুঝলুম একটা কিছু হয়েছে। তা জোর করে তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলুম। বুঝলুম ক'দিন খায়নি কিছু। কাছে একটা পয়সাও নেই, তার দুর্দশার একশেষ। তোমার খবর জিজ্ঞেস করলুম, কিছুই বললে না সে।

—তারপর কোথায় গেল সে তাই বল্ না। আমি তো তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছি।

রাধা বললে—কোথায় গেল তা কি সে আমায় বলে গেছে? আমার এ-ঘরে ঢুকতেই চায়নি প্রথমে। আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেনি। এমন ভাব দেখালে যেন আমাকে সে চেনেই না। কিন্তু আমি ছাড়িনি তবু। বাড়িতে এনে খাওয়ালুম দাওয়ালুম। বললুম এখেনে আরাম করে শোও। তা শুলো। আমি এই তক্তপোষটা ছেড়ে দিলুম তার শোবার জন্যে, আর আমি গিয়ে পাশের বাড়িতে শুলুম। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ঘরের দরজা খোলা। কোথাও নেই সে। আমাকে না-বলে-কয়ে মাঝরাত্তিরেই চলে গেছে—

—তারপর?

রাধা বললে—তারপর আর কী! তারপর আর জানি না—

খবরটা শুনেই প্রকাশমামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে এসেছে নবাবগঞ্জে। এইরকম একবার কোথাও গিয়েছে আর নবাবগঞ্জে ফিরে এসেছে। চেষ্টার কসুর করেনি কিছু প্রকাশমামা। দিদি বলতো—কী রে, খবর পেলি কিছু?

যেমন-যেমন খবর পেত প্রকাশমামা তেমনি-তেমনি এসে দিদির কাছে খবর দিয়ে যেত। আর টাকা নিয়ে যেত। রাধার কাছে খবরটা পেয়েই সোজা দিদির কাছে চলে এসেছিল।

দিদি বলতো—তাহলে বেঁচে আছে তো সে?

প্রকাশমামা বলতো—বেঁচে থাকবে না কোথায় যাবে শুনি? দেখবে আমি তাকে ঠিক খুঁজে বার করবো। ওদিকে রেলবাজারে পুলিসকে লাগিয়েছি, রাণাঘাটের পুলিসকে লাগিয়েছি। সকলকে টাকা খাইয়েছি কি মিছিমিছি? তা রাণাঘাটে একবার যখন তাকে দেখা গেছে তখন নিশ্চয়ই কলকাতায় গেছে সে—। এবার গিয়ে কলকাতার পুলিসকে গিয়ে টাকা খাইয়ে আসবো—

দিদি বলতো—তা কলকাতায় যাবে কী করে সে? তার কাছে কি টাকা আছে? টাকা-পয়সা তার কাছে তো কিছুই নেই, ঘর থেকে এক কাপড়েই তো বেরিয়ে গেছে। একটা গামছা পর্যন্ত নিয়ে যায়নি সঙ্গে করে। রেলে উঠবে কী করে? টিকিট্‌চেকাররা ধরবে না?

প্রকাশমামা বলতো—টিকিট? টিকিট কেউ কেনে ভেবেছ আজকাল? আমার মতন যারা বোকা-সোকা মানুষ তারাই কেবল টিকিট কেটে মরে। যুদ্ধের সময় এখন কে-ই বা টিকিট কাটছে আর কেই-ই বা টিকিট চাইছে! তা দাও, আরো শ, পাঁচেক টাকা দাও দিকিনি, এবার কলকাতার পুলিসকে গিয়ে ধরতে হবে—

শুধু টাকাই বরাবর নিয়ে গেছে প্রকাশমামা, কিন্তু কাজের কাজ তখনও পর্যন্ত কিছুই হয়নি। সদানন্দও আর বাড়ি ফিরে আসেনি।

তা এবার প্রকাশমামা শ' পাঁচেক টাকা পকেটে পুরে আবার কলকাতায় গিয়ে হাজির হলো। কলকাতা মানেই প্রকাশমামার কাছে স্বর্গ। টাকা থাকলে কলকাতা সকলের কাছেই স্বর্গ। তবে বিশেষ করে প্রকাশমামার কাছে। ট্যাঁকে যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ কাকে ভয় করবো বলো? কেন ভয় করতে যাবো কাউকে? আমি কি তোমার চেয়ে কোনও অংশে ছোট হে?

প্রকাশমামা যখন রাধার বাড়িতে যায় তখনও যেমন বুক ফুলিয়ে ঢোকে এখানেও তেমনি। এই মাসির বাড়িতে। মাসি এখন বুড়ি হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মাসি যখন বুড়ি ছিল না, তখন থেকে প্রকাশমামা এ-বাড়ির বাঁধা গাহেক। যখনই দিদির কাছে টাকা পেয়েছে তখনই সারা বাঙলাদেশের সব জায়গায় গিয়ে ফুর্তি উড়িয়েছে। প্রথমে ভাগলপুর থেকেই শুরু হয়েছিল ঘোড়দৌড়। তারপর যেখানেই এতটুকু ফুর্তির ছিটেফোঁটা গন্ধ পেয়েছে সেখানে গিয়েই ফুর্তির ঘোড়দৌড় উড়িয়েছে প্রকাশমামা।

কলকাতায় তখন ব্ল্যাক-আউট চলছে। কালীঘাটের বাজারের পাশের গলিগুলোতে তখন তেমন আর জৌলুস নেই। বাড়িউলী মাসির খদ্দের তখন আরও কমে গিয়েছে। চারিদিকে অন্ধকার। রাস্তার আলোগুলোর মুখ ঢাকা। কারোর মুখ যে ভালো করে দেখবে তার উপায় নেই। ক'দিন আগেই বোমা পড়ার সময় কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়ছিল। মাসির বড় দুর্ভাবনা হতো। খরচ-পত্তোর চলবে কী করে!

গলি দিয়ে কেউ তেমন লোক গেলে সবাই ছেঁকে ধরে।

মেয়েরা বলে—কোথায় যাচ্ছো গো? ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?

লোকটা বলে—আমি আসছি, আমার কাজ আছে ওদিকে—

বোঝা গেল লোকটা একজন এ-পাড়ার কাঁচা খদ্দের। তখন আর ছাড়ন-ছোড়ন নেই। কেউ হাত ধরে টানে, কেউ জামা ধরে, কেউ বা কোঁচার খুঁট। লোকটাও আসবে না, মেয়েরাও ছাড়বে না। সেই অন্ধকার ফালি-গলির মধ্যে তখন টানাটানি পড়ে গেল। সন্ধ্যে থেকে কারো বউনি হয়নি তখনও। অনেকের কেরোসিন তেল কেনবার পয়সা পর্যন্ত

জোটেনি। আর সেই সময় যদিই বা একটা খদ্দেরের মুখ দেখা গেল তো সে-ও কিনা হাতছাড়া হয়ে যাবে!

লোকটা বললে—ছাড়ো ছাড়ো, ওগো ছাড়ো আমাকে—

মেয়েদের মধ্যে একজন বেশ ডাকাবুকো। সে বললে—কেন বাপু, ছাড়বো কেন তোমাকে? আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? আমাদের ঘরে বসলে কি তুমি এঁটো হয়ে যাবে?

লোকটা বললে—আমার দলের লোক আছে ক্ষুদির বাড়িতে, আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—আমাকে ছাড়ো—একি, কাপড় ছাড়ো, আমাকে ন্যাংটো করে দেবে নাকি?

কথাটা শুনে একজন লোকটার কোঁচার খুঁটটা আরো জোরে টেনে ধরলে। বললে—তা ক্ষুদির চেয়ে কি আমরা খারাপ দেখতে? আমরা কি সুখ দিতে পারি না?

লোকটা আর পারলে না। জোর করে কোঁচাটা এঁটে ধরে বললে—আমার কাছে টাকা নেই, মাইরি বলছি টাকা নেই, টাকা-ফাকা সব ওদের কাছে আছে—আমাকে মিছিমিছি ধরছো তোমরা—

এ-সব যুক্তি মেয়েদের অনেক শোনা আছে। ঢোকবার ইচ্ছে না থাকলে এ-সব ধাপ্পা সকলেই দেয়। এ-সব কথা এ-পাড়ার মেয়েরা বিশ্বাস করে না।

বলে—দেখি, টাকা আছে কি না, পকেট দেখি—

বলে সবাই মিলে লোকটার জামার পকেট হাতড়াতে লাগলো—

লোকটা তখনও চেঁচাচ্ছে—বলছি আমার কাছে টাকা নেই, তবু শুনছে না, এ কি গেরো—

একজন বলে উঠলো—তা টাকা না থাকুক, আট আনা পয়সাও নেই?

—না, আট না পয়সাও নেই—

—তাহলে চার আনা?

কিন্তু কারোর মুখের কথায় অত বিশ্বাস কী? ততক্ষণে জামার পকেট, কাপড়ের ট্যাঁক, সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ফেলেছে সবাই। কোথাও টাকাকড়ি কিছু নেই।

এবার লোকটাকে সবাই হতাশ হয়ে ছেড়েই দিচ্ছিল। ইঁদুরই যদি ধরতে না পারলো তো তেমন বেড়াল পুষে লাভ কী?

লোকটা চলেই যাচ্ছিল। এতক্ষণে যেন লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। সে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই চলতে আরম্ভ করলো।

হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন মেয়ের খেয়াল হলো। বললে—ওরে, কাছাটা দেখলি নে? কাছাটার মধ্যে যদি টাকা থাকে!

ততক্ষণে লোকটা একটু এগিয়ে গিয়েছে। একজন মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সামনে গিয়ে পথ আটকে ধরেছে। বললে—দেখি, তোমার কাছা দেখি—

পেছন-পেছন আরো সবাই বলা-নেই-কওয়া নেই লোকটার কাছাটা টেনে খুলে দিয়েছে।

লোকটা চিৎকার করে উঠেছে—আরে করো কী, কাছা টানতে হবে না, আমি নিজেই দেখাচ্ছি—

কিন্তু এ-লাইনের মেয়েরা এত সহজে মুখের কথায় বিশ্বাস করে না। তারা কাছাটা খুলতেই দেখল কাছার মুড়োতে টাকা বাঁধা রয়েছে।

—এই তো টাকা রয়েছে! এতক্ষণ চালাকি হচ্ছিল?

লোকটা খপ করে টাকাটা ধরে ফেলেছে। কিছুতেই দেবে না টাকা। বললে—এ আমার

টাকা নয় গো, এ পরের টাকা, ছাড়ো—ছাড়ো—

বলে মেয়েদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করলে।

মেয়েরা তখন পাড়া কাঁপিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—ও মাসি, মাসি, এই দেখ পালিয়ে যাচ্ছে—

মাসি চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়ালো—কী লা, কী হয়েছে ওখানে? কে পালাচ্ছে?

মেয়েরা বলে উঠলো—এই দেখ না মাসি, টাকা নেই বলে পালাচ্ছিল, এদিকে কাছায় টাকা লুকিয়ে রেখেছে—

মাসি সামনে গিয়ে লোকটাকে ভালো করে দেখলে। তারপর মেয়েদের বললে—আরে, তোরা ওর কাছা ছাড়, কাছা ধরেছিস কেন? তুমি এসো বাবা, আমার মেয়েদের কথায় কিছু মনে কোর না, এসো, তোমার টাকা কেউ কেড়ে নেবে না, তোমার কোনও ভয় নেই, এসো এসো—

অনেক দিন পরে একটা খদ্দের এসেছে, মাসি তাকে সহজে হাত-ছাড়া করতে চাইলে না। আদর করে লোকটার হাত ধরে ডাকতে লাগলো। বললে—কিছু ভয় নেই বাবা তোমার, আমার সঙ্গে এসো—

লোকটা বললে—আমি ক্ষুদির বাড়ি যাচ্ছি, ওখানে আমার দলের লোকরা আছে—

—তা দলের লোকরা থাকলেই বা। ওরা ক্ষুদির বাড়িতে আছে থাকুক, তুমি আমার বাড়িতে থাকো। ক্ষুদির চেয়েও ভালো ভালো মেয়ে আছে আমার কাছে। তুমি আগে দেখই না, দেখতে দোষ কী বাছা? পছন্দ না-হয় ক্ষুদির কাছেই যেও। আর যদি পছন্দ হয় তো এখেনেই রাতটা থাকো। কাল সকালে আবার তোমার দলবলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—

কিন্তু এদিকে যখন এমনি টানা-হ্যাঁচড়া চলেছে ওদিকে গলির মোড়ে তখন প্রকাশমামা ঢুকছে। অন্ধকার আশ-পাশ দেখে দেখে পা টিপে টিপে চলেছে। ট্রেনটা দেরি করে আসাতেই এই দুর্ঘট। নইলে, বিকেল বিকেল এলে এমন হতো না।

সামনে দিয়েই একটা লোক মাথা মুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো প্রকাশমামার। সদানন্দ না! তাকে দেখে মাথায় মুড়ি দিয়েছে!

পেছন থেকে ডাকলে—এই সদা, সদা—সদা না?

ডাক শুনে লোকটা আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে।

প্রকাশমামার সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো—এই সদা, সদা, আমি তোর প্রকাশমামা রে, সদা—

লোকটা তখন আরো জোরে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছে। এবার প্রকাশমামা দৌড়তে লাগলো। তাকে দেখে বোধহয় পালাচ্ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসেছিল। ভাবতে পারেনি যে মামা আবার তার পিছু ধাওয়া করবে!

লোকটাও যত জোরে যায় প্রকাশমামাও তত আরো জোরে যেতে লাগলো। শেষে দৌড়ে গিয়ে লোকটার চাদরটা চেপে ধরে ফেললে।

—কী রে, পালাচ্ছিস যে? এত ডাকছি তোকে মোটে শুনতে পাচ্ছিস না?

কিন্তু মুখটা কাছ দেখেই কেমন চটকা ভাঙলো। সদা নয়। অন্য লোক। এ-পাড়ায় এসেছিল বলে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে বেরোচ্ছে। খানিক দূরে গিয়ে চাদর খুলে গায়ে জড়িয়ে নেবে।

ততক্ষণে চাদরটা ছেড়ে দিয়েছে প্রকাশমামা। বললে—কিছু মনে করবেন না দাদা, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলুম আমার ভাগ্নে সদা—

বলে আর কথা বাড়ালে না প্রকাশমামা। ছি! ছি! লোকটা ভদ্রলোক বলে কিছু বললে

না। অন্য ধরনের লোক হলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যেত! সত্যিই তো সদা কেন এখানে আসতে যাবে? সে তো ভালো ছেলে। এমন সন্দেহ হলোই বা কেন তার? বোধহয় নেশাটার মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে। ছিঃ—

তারপর মাসির বাড়ির সামনে আসতেই দেখে অবাক কাণ্ড!

এতক্ষণে মাসিও দেখতে পেয়েছে তাকে। মেয়েরাও দেখে ফেলেছে।

—ওমা, ভালো মানুষের ছেলে যে? তুমি কখন এলে বাবা? কী ভাগ্যি আমার, তবু মাসিকে মনে পড়লো এ্যাদ্দিন বাদে—

যে-লোকটা এতক্ষণ কাছা নিয়ে সামলাতে পারছিল না, সে এই সুযোগে ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। কাছা আঁটতে আঁটতে সে তার নিজের পথে চলে গেল। এতদিন পরে পুরোন খদ্দের এসে গেছে আর উটকো খদ্দেদের দরকার নেই। মাসির একগাল হাসি বেরোল ভালো মানুষের ছেলেকে দেখে।

বললে—এসো বাবা, এসো, তা খাওয়া-দাওয়া তো কিছু হয়নি তোমার? একেবারে ট্রেন থেকে নেমেই আসছো তো?

প্রকাশমামা গোড়াতেই পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে ফেলে দিলে।

বললে—এই নাও, মাংস-ডিম-মাছ যা আনবার আনাও, মালও আনাও,—তোমার কাছে একটা কাজের জন্যে এসেছি—

মাসি তখন টাকা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা আঁচলে বেঁধে ফেলেছে। খবর পেয়ে গিরিধারীও এসে গেছে। বাড়ির মেয়েরাও প্রকাশমামাকে দেখে কিল্‌বিল করে উঠেছে। আর ভাবনা নেই। এবার হোটেল থেকে মাংস-ডিম-মাছ সব এসে যাবে। ব্ল্যাক-আউটের বাজারে খদ্দেরপাতি কিছু নেই। আজ অনেকদিন পরে কিছু ভালোমন্দ পেটে পড়বে তবু।

বললে—কী খাবে তুমি বলো বাবা—

প্রকাশমামা বললে—ও দিশি-ফিশি নয়, আজ বিলিতি খাবো। তুমিও তো বিলিতি খেতে ভালোবাসো।

মাসি বললে—না বাবা, আজকে আমার একাদশী, আজকে আমার বিলিতি খেতে নেই, আমি দিশিই খাবো। তা আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি পরোটা না ভাত কী খাবে?

প্রকাশমামা বললে—ভাত-ফাত নয়, পরোটা। পরোটা আর পাঁঠার মাংস।

গিরিধারীকে সেই রকম অর্ডার দেওয়া হলো। বাড়ির অন্য মেয়েরাও পেসাদ পাবে। সুতরাং বেশি করেই আনতে হবে। মাসি হিসেব করে টাকা দিয়ে দিলে গিরিধারীকে।

প্রকাশমামা মাসিকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে মাসি—

—কী কাজ?

—তোমার সেই বাতাসী! বাতাসী আছে?

—কেন, বাতাসীর ঘরে বসবে নাকি তুমি?

প্রকাশামামা বললে,—আরে তা কেন, সেই বড়বাবুর জন্যে বলছি। বড়বাবু আসে তো?

মাসি বললে—না বাবু, বড়বাবু এখন বাতাসীকে পাকাবাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। এখানে গোলমাল হচ্ছিল!

—কিন্তু বড়বাবুকে দিয়ে আমার যে একটা কাজ করাতে হবে!

—কী কাজ?

—আমার ভাগ্নেকে চেনো তো? সেই সেবার নিয়ে এসেছিলুম তোমার কাছে! সেই ভাগ্নেটা আমার হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বুঝলে? এদিকে নতুন বউ বাড়িতে রয়েছে,

ওদিকে সেও পালিয়েছে। এখন তোমার বড়বাবু যদি একটু সাহায্য করে তা তাকে উদ্ধার করা যায়। ওরা তো ডিটেকটিভ পুলিস, বুঝলে না, ওদের অসাধ্যি কিচ্ছু নেই। তা আমি টাকা যা খরচ লাগে সব দেবো—

মাসি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা ছাড়বে?

প্রকাশমামা বললে—বড়বাবু যত চাইবে। টাকার জন্যে কিছু আটকাবে না।

ততক্ষণে গিরিধারী হোটেল থেকে পরোটা-মাংস-ডিম সব এনে হাজির করেছে।

মাসি বললে—ঠিক আছে, তুমি এখন খেয়ে-দেয়ে নাও, আজ রাত্তিরে তো আর কিছু হবে না, কাল সকালে যা হয় সব ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু আমার বখরা যেন ঠিক থাকে বাবা। দেখো—

প্রকাশমামা বললে—সে-সব নিয়ে তুমি ভেবো না—

সেদিনও রাত্রে নয়নতারা ঘুমোচ্ছিল। ক'দিন ক'রাত না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন তার গায়ে হাত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা চীৎকার করে উঠেছে—কে? কে?

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকা দিতেই হাতটা তার গা থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

নয়নতারা সামনের দিকে চোখ মেলে দেখতেই মানুষটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু মানুষটাকে চিনতে দেরি হলো না নয়নতারার। রাত কত কে জানে! নয়নতারা উঠে বসলো। কিন্তু অন্যদিনের মত চেঁচিয়ে উঠলো না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝে নিয়েছে সে। তারপর নিজের শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলে। মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে। আজ এর একটা বিহিত না করলে চলবে না। রোজ রোজ এ আর সহ্য করা উচিত নয়।

বেহারি পালের বউ-এর সকাল-সকাল ঘুম আসে না। প্রথম রাতটা আড়ামোড়া খায়। কিছুতেই আর ঘুম আসতে চায় না। তারপর মাঝরাত থেকে একটু একটু হাই ওঠে।

সেদিন সবে ঘুম আসছিল এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—দিদিমা, ও দিদিমা—

মিহি মেয়েলি গলা।

বেহারি পালের বউ-এর কেমন সন্দেহ হলো। এ যেন চেনা-চেনা গলা মনে হচ্ছে! তাড়তাড়ি দরজাটা খুলে বাইরে আসতেই দেখে আগাগোড়া চাদরে ঢেকে কে যেন ঘোমটা দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে? বউমা?

নয়নতারা সামনে এল এবার। বললে—হ্যাঁ দিদিমা, আমি—

—একি? বউমা? তুমি এত রাত্তিরে?

নয়নতারা তখন হাঁপাচ্ছে। বেহারি পালের বউএর মনে হলো যেন নয়নতারা অনেক দূর থেকে দৌড়তে দৌড়তে তাদের বাড়িতে এসেছে।

নয়নতারা বললে—দিদিমা...

কিন্তু বলতে গিয়েও মনের কথাটা পুরো বলতে পারলে না। হাঁপাতে লাগলো।

দিদিমা বললে—কী হলো বউমা এত রাত্তিরে? তুমি এত হাঁপাচ্ছো কেন? তোমা শাশুড়ি কোথায়?

নয়নতারার মুখে তখনও কোনও কথা বেরোচ্ছে না। বেহারি পালের বউ সব দেখেশুনে বললে—তুমি ঘরের ভেতরে এসো বউমা। তুমি বড় হাঁফাচ্ছো। এসো এসো—

বলে নয়নতারাকে নিজের ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর বসালে। তারপর হারিকেন জ্বেলে ভালো করে নয়নতারার মুখটা দেখলে। খুব ভয় পেলে মানুষের যেমন হয়, নয়নতারারও ঠিক তেমনি চেহারা হয়েছে তখন। জিজ্ঞেস করলে—এবারে বলো তো বউমা, কী হয়েছে তোমার? বাড়ি থেকে চলে এলে কেন? কেউ কিছু বলেছে?

নয়নতারা তবু কিছু বললে না।

—শাশুড়ি জানে যে তুমি এখনে চলে এসেছ?

তবু নয়নতারার মুখে কোনও জবাব নেই। যেন একটা অজ্ঞাত ভয়ে নয়নতারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

—কী হলো? তোমার মুখে কোনও কথা নেই কেন?

এতক্ষণে নয়নতারার মুখে যেন একটু কথা বেরোল। বললে—আপনি যেন কাউকে বলবেন না দিদিমা যে আমি এখানে এসেছিলুম। কেউ যেন একথা জানতে না পারে।

দিদিমা বললে—কিন্তু কাল সকালবেলা? কাল সকালে যদি তুমি এখানে থাকো তাহলে তো সবাই-ই জানতে পারবে, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না তখন।

নয়নতারা বললে—কাল সকাল হবার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাবো দিদিমা। আজ এই রাতটুকুই শুধু আপনার এখানে আমাকে একটু থাকতে দিন—

দিদিমা বললে—তা তো থাকতে দিচ্ছি, এখানে তোমাকে থাকতে দিতে তো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার শাশুড়ি? তোমার শাশুড়ি তো লোক ভালো নয় বউমা। শাশুড়ি জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে ভেবেছ?

নয়নতারা বললে—আমার শাশুড়ি জানতে পারবে না দিদিমা। ভোর হবার আগেই আমি চলে যাবো। শুধু রাতটুকু আপনার এখেনে থাকতে দিন আমাকে—

—কিন্তু কেন বলো তো বউমা? তোমার কি একলা ঘরে শুতে ভয় করে?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ বড্ড ভয় করে।

—তা সে কথাটা শাশুড়িকে বললেই পারো। তাহলে তোমার শাশুড়ি তোমার পাশে শুতো।

নয়নতারা বললে—শাশুড়িকে সে-কথা বলতে আমার ভয় করে দিদিমা।

দিদিমা বললে—তা বটে, যার ছেলেই ও-রকম বাপ-মার কাছে থাকতে পারলে না তো তার বউই বা থাকবে কী করে?

তারপর একটু থেমে বললে—তা হ্যাঁ বউমা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি বলো তো সদা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? তোমার সঙ্গে কি তার কিছু ঝগড়া হয়েছিল?

নয়নতারা বললে—দিদিমা, আপনি তো সব জানেন তাহলে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি সবই আমার কপালের দোষ। কপাল ছাড়া আর কাকে দোষ দেব বলুন?

দিদিমা বললে—গাঁয়ের লোক নানা রকম কথা বলছে কি না। ছাই ভস্ম মাথা-মুণ্ডু নানারকম কথা কানে আসছে। তোমার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলে সে তো তোমার নামেই দোষ দিচ্ছে—

—আমার নামে! আমার নামে দোষ দিচ্ছেন আমার শাশুড়ি?

দিদিমা বললে—তা থাক গে, সে-সব কথা এখন থাক। ওসব তোমর এখন শুনে কাজ নেই—তুমি কি মনে করেছ তোমার শাশুড়ির কথা আমি বিশ্বাস করি? ও হলো গিয়ে ঝাড়-

মিথ্যেবাদী। আমি তোমার বাবার কথাও বলি, কিছু মনে কোর না, তোমার বাবা কি আর পাত্র পেলেন না, এই চৌধুরীবাড়িতে তোমার মতন মেয়ের বিয়ে দিতে হয়? তোমার মত এমন যার রূপ তার কি পাত্তোরের অভাব?

তারপর নিজেই আবার সে-প্রসঙ্গ বদলে বললে—যাক গে, সে-কথা এখন বলে লাভ নেই বউমা, এখন কী হয়েছিল তোমার তাই বলো, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খাবে?

নয়নতারা বললে—না দিদিমা, এত রাত্তিরে কেউ খায়!

দিদিমা বললে—তাহলে? তাহলে তোমার জন্যে আমি কী করবো তাই বলো?

নয়নতারা বললে—আমার জন্যে আপনার ঘুম হলো না। তাই ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি কী করবো বলুন তো দিদিমা! রাত্তির হলেই আমার ও-বাড়িতে বড্ড ভয় হয়। রাত হলেই ভয়ে আমার বুক দূর-দূর করে ওঠে—

—কেন? রাত্তিরে অত কীসের ভয়?

নয়নতারা বললে—আচ্ছা দিদিমা, রাত্তিরে যদি রোজ আপনার কাছে এসে শুই তো আপনার আপত্তি আছে?

দিদিমা বললে—ওমা, সে কী কথা! তুমি ওদের বাড়ির বউ হয়ে আমাদের বাড়ি শুলে লোকেই বা কী বলবে আর তোমার শাশুড়িই বা তা করতে দেবে কেন? মিছিমিছি ভাববে আমি বুঝি তোমার কানে ভাঙচি দিয়েছি—

বাইরে পশ্চিমপাড়ার দিক থেকে মুরগী ডেকে উঠতেই নয়নতারা জানালার বাইরের আকাশটার দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—ভোর হয়ে এলো বুঝি দিদিমা! আকাশটার দিকে চেয়ে দেখুন তো?

দিদিমাও জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বললে—সকাল এখনও হয়নি, এইবার হবো-হবো—

নয়নতারা এতক্ষণ বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়েছিল। এবার উঠে বসলো। বললে—এবার তাহলে যাই দিদিমা, এখন চলে না গেলে সবাই আবার জেনে ফেলবে—

দিদিমা বললে—চলো তোমাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি, অন্ধকারের মধ্যে তুমি একলা যেতে পারবে না—

নয়নতারা তখন ভালো করে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে। যাবার জন্যে একেবারে তৈরি।

বাইরে বারান্দায় পা বাড়িয়েই বললে—আসি দিদিমা—

কিন্তু চেয়ে দেখলে দিদিমাও তার পেছনে পেছনে আসছে। বললে—আপনি আবার আসছেন কেন দিদিমা, আমি ঠিক যেতে পারবো।

যদি—তোমাদের সদর দরজা বন্ধ থাকে? অন্ধকার রাস্তায় তুমি একলা যাবে?

কিন্তু বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে নয়নতারা বড় ভয় পেয়ে গেল। আসবার সময় ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিল। তখনও কোনও দিকে কিছু ভাবেনি। এখন ফেরবার সময় যেন গা ছম্-ছম্ করতে লাগলো তার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই সদরে ঢোকবার মুখে ডানদিকে চণ্ডীমণ্ডপের কাছেই কোথাও কালীগঞ্জের বউকে খুন করা হয়েছিল। কথাটা মনে পড়তেই পা দুটো যেন আরো ভারি ঠেকলো। পেছনে ফিরে চেয়ে বললে—দিদিমা আপনি যান, আমি এসে গেছি, দরজা খোলা আছে—

দিদিমা বললে—তুমি আগে ভেতরে ঢোকো বউমা, আমি দেখি তবে যাবো—

দিদিমা দাঁড়িয়ে দেখলে নয়নতারা বারবাড়ির উঠোনে ঢুকলো। তারপর আর দেখা গেল না। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বউমার চেহারাটা।

নয়নতারা আসবার সময় বারবাড়ির দরজাটা খুলে চলে এসেছিল। দরজাটা তখনও তেমনি খোলাই রয়েছে। ভেতরবাড়িতে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজায় আবার খিল লাগিয়ে দিলে। এতটুকুও শব্দ হলো না। তারপর পা টিপে টিপে আবার তার নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলো। কিন্তু এমন করে আর ক'দিন চলবে? এমনি করে প্রত্যেক রাত্রে কি দিদিমার বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাতে হবে নাকি তাকে?

কিন্তু নিজের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই যেন ভূত দেখে নয়নতারা চমকে উঠলো। মনে হলো তার ঘরের দরজা আগলে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—কোথায় গিয়েছিলে বউমা?

শাশুড়ির গলার শব্দটা নয়নতারার বুকে গিয়ে শেলের মত বিঁধলো।

—বলো কোথায় গিয়েছিলে?

নয়নতারা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। শাশুড়ির মুখের দিকে চাইতেও যেন তার ভয় করছিল। নয়নতারা কল্পনাও করতে পারেনি যে তার অনুপস্থিতিটা শাশুড়ির চোখে ধরা পড়বে। অথচ জানবার তো কথাও নয় কারো। যাবার সময় সে তো কোনও শব্দও করেনি। নিঃশব্দেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

—কই কথা বলছো না যে? দরজা হাট করে খুলে রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি, বলো? না বললে তোমায় ঘরে ঢুকতে দেব না। বলো?

নয়নতারা কী বলবে বুঝতে পারলে না। সে যেন বোবা হয়ে গেছে তখন।

—চুপ করে আছো যে, কথার জবাব দাও!

—কুয়োতলায় গিয়েছিলুম।

—কুয়োতলায় গিয়েছিলে? মিছে কথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না? ছিঃ, এ-বাড়ির বউ হয়ে তোমার এই মতি? তুমি ভেবেছ আমি কিছু দেখিনি? আমি নিজের চোখে দেখলুম তুমি সদর দিয়ে ঢুকে বার-বাড়ি হয়ে ভেতরে এলে আর বলছো কিনা তুমি কুয়োতলায় গিয়েছিলে?

নয়নতারা চুপ করে রইল।

কিন্তু শাশুড়ি ছাড়লে না। বললে—কী হলো? ভেবেছ চুপ করে থাকলেই সাতখুন মাফ হয়ে যাবে? ভেবেছ বোবার শত্রু নেই, না? কিন্তু এও তোমাকে বলে রাখি বউমা, এ-বাড়ির বউ হয়ে এরকম উড়ু-উড়ু স্বভাব আমি সহ্য করবো না। যদি এ-বাড়ির নিয়ম-কানুন মেনে চলতে পারো তো ভালো আর তা যদি না মেনে চলতে পারো তো তার ফল খারাপ হবে—এই তোমায় বলে রাখছি—

নয়নতারা তখনও চুপ করে ছিল।

শাশুড়ি বললে—আমার কথা কানে ঢুকলো, না ঢুকলো না? ঢুকলো?

নয়নতারা ঘাড় নাড়লো। বললে—হ্যাঁ—

শাশুড়ি বললে—আর একটা কথা, তুমি যেখানে রাত কাটিয়ে এলে তাদের বলে দিও, আমাদের বাড়ির শাশুড়ি-বউতে যা কিছু হয় তা নিয়ে যদি অন্য কেউ মাথা ঘামায় তো তাদেরও আমি ছেড়ে কথা বলবো না। আমি সকলের হাঁড়ির খবর জানি। নতুন দু'টো পয়সার মুখ দেখেছে বলে যেন কেউ চৌধুরীদের সঙ্গে টেক্কা না দিতে আসে—বুঝলে? এখন যাও—

এতক্ষণ যা-কিছু হচ্ছিল সবই বেহারি পালের গিন্নীর কানে গেল। শোবার ঘর ছেড়ে বেহারি পালের বউ একেবারে বাগানের পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কান পেতে ছিল।

কথাবার্তার শব্দে বেহারি পাল নিজেও এসে গিন্নীর পাশে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—কে এসেছিল গো?

—ওদের বউ।

বেহারি পাল বললে—তা তো শুনেছি, আমি আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে সব শুনেছি। তা ওদের বউ এত রাত্তিরে বাড়ি থেকে চলে এসেছিল কেন? শাশুড়ি-বউতে ঝগড়া হয়েছে নিশ্চয়ই!

গিন্নী বললে—সে-সব তো কিছু ভাঙলে না। ভয়ও তো আছে। যা গুণের শাশুড়ি—

বেহারি পাল বললে—ছেলে কি আর সাধে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—

গিন্নী বললে—আহা, বউমার জন্যে বড় কষ্ট হয়, একেবারে কচি বয়স তো। নিজের মা'টা ছিল, তাও পট করে মারা গেল! একেই বলে কপাল!

বেহারি পাল বললে—কোনও পথ না পেয়ে বুঝি তোমার কাছে ছুটে এসেছে?

গিন্নী বললে—ওই শোন না, সেই জন্যেই তো শাশুড়ী মাগী খোঁটা দিচ্ছে। বলিহারি শাশুড়ির নজর। মাঝ-রাত্তিরেও মাগীর চোখে ঘুম নেই, বউএর পেছনে লেগেছে—

বেহারি পাল বললে—চলে এসো, তুমি চলে এসো, ওদের শাশুড়ি বউতে ঝগড়া, তাতে আমাদের কী? আমাদের নিজেদের ঝঞ্ঝাট কে সামলায় তার ঠিক নেই, আমরা ওদের নিয়ে ভেবে মরছি! ওদের ছেলে ওদের বউ, ওরাই সামলাক—

কিন্তু গিন্নী বললে—তা আমি কি ওদের বাড়ির কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, আমি ভাবছি বউটার কথা, বউটা তো পরের বাড়ির মেয়ে, তার কেন মাঝখান থেকে এত ভোগান্তি!

বেহারি পাল বললে—তা দোষ তো ছেলেটার। ছেলেটাই বা বিয়ে করতে গেল কেন? যদি জানতোই যে তার বাপ-মা-ঠাকুর্দা এমন তো তা জেনে শুনেও কেউ বিয়ে করে?

গিন্নী বললে—তুমি ছেলেটারই দোষ দেখছো। ছেলেটা কী করবে? ছেলের বাপ-ঠাকুর্দা যদি অমন করে মিথ্যে স্তোক না দিত তো সে কি বিয়ে করতো? সে তো বিয়ের দিন গায়ে-হলুদের সময়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল! তাকে তো জোর করে বেঁধে ধরে এনে বিয়ে করতে পাঠালে, তুমি তো সব দেখেছ—

খোলা আকাশের তলায় বাগানের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। আকাশ তখনও ভালো করে ফর্সা হয়নি। বেহারি পালেরও অনেক কাজ। পরের বাড়ির কেচ্ছা শুনলে তার পেট ভরবে না। তাদেরও সংসার আছে, সংসারের দায়-দায়িত্ব আছে। সব বাড়ির যা-যা আছে তাদেরও তো সবই আছে। বরং অনেক বেশি মাত্রাতেই আছে।

বললে—এসো, এসো চলে এসো তুমি। ভোর হয়ে আসছে—

ও-বাড়ি থেকে তখন আর কোন আওয়াজই আসছে না। গিন্নীও আর দাঁড়ালে না। আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চলে এলো।

বেহারি পাল বললে—ও নিয়ে আর ভেবো না তুমি।

গিন্নী বললে—আমি কি ভাবতুম! বউটা যদি রাততিরে আমাদের বাড়ি না আসতো আমিই কি ও নিয়ে মাথা ঘামাতুম মনে করেছ?

বেহারি পাল বললে—তা ভেবে আর তুমি কী-ই বা করবে? আমিও কিছু করতে পারবো না, তুমিও কিছু করতে পারবে না। শেষকালে মাঝখান থেকে আমাদের ওপর ওরা যত ঝাল ঝাড়বে।

গিন্নী বললে—তা যাক, আমরা কিছু না-ই বা করতে পারলুম, মাথার ওপর ভগবান বলে তো একজন আছে। ভগবান তো সবই দেখছে। তার চোখ তো কেউ এড়াতে পারবে না—

আর ওদিকে চৌধুরী মশাই তখন জেগেই ছিলেন। গৃহিণী ঘরে আসতেই বললেন—কী হলো? বউমা এলো?

গৃহিণী বললে—হ্যাঁ এসেছে—

—তা কী বললে? বেহারি পালের বাড়িতে কেন গিয়েছিল এত রাত্তিরে তা কিছু বললে না?

প্রীতি বললে—বলবে আবার কী? আবার বলছে কি না কুয়োতলায় গিয়েছিল! ভেবেছে আমি কিছু টের পাইনি!

চৌধুরী মশাই বললেন—তা হলে তো দেখছি বউমা সোজা মেয়ে নয়।

প্রীতি বললে—তা আমিও কি সোজা মেয়ে? আমিও দেখাতে পারি কে কত সোজা আর কে কত ব্যাঁকা—

নবাবগঞ্জে যখন এই আধিপত্য আর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, কলকাতা শহরে তখন আর এক ষড়যন্ত্রের জাল পাততে শুরু করছে প্রকাশমামা। কলকাতায় তখন যুদ্ধের আমল। যুদ্ধের আমল মানে লুঠের আমল। সে এমন এক আমল যখন আয় আর ব্যয়ের কোনও হিসেব নেই। জীবন আছে মৃত্যুও আছে তখন, কিন্তু জীবন-মৃত্যুর কোনও মূল্যায়ন নেই। অথচ এককালে যেমন এই শহর থেকে লোকে পালাতে ব্যস্ত ছিল তেমনি আবার এই শহরে তখন ফিরে আসতে পারার জন্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বিহার-আসাম-উড়িষ্যা-ঢাকা-চট্টগ্রাম থেমে ট্রেনে করে লোক আসছে তো আসছেই। সকলেরই এক কথা—কলকাতায় চলো। আসলে কলকাতা তখন সাউথ-ইষ্ট-এশিয়ার মিলিটারি হেড্‌কোয়ার্টার্স। যুদ্ধের সব মাল সাপ্লাই হচ্ছে এই কলকাতা থেকে। টাকা কামাতে চাও এখানে এসো, আর টাকা ওড়াতে চাও তো তাও এখানেই এসো। ফুর্তি লুটতে চাও আর ফতুরই হতে চাও তো এখানেই তোমাকে আসতে হবে। এমন দরাজ শহর দুনিয়াতে আর কোথাও পাবে না। বাঁচি যদি তো কলকাতায় গিয়ে বাঁচবো, আর যদি মরি তো কলকাতাতে গিয়েই মরবো।

প্রকাশমামার দৌড় সাধারণত ভাগলপুর আর রাণাঘাট পর্যন্ত। দেশে কালে-ভদ্রে কখনও গেছে, কিন্তু টাকা সেখানে নিয়ম করে পাঠিয়েছে বরাবর। ফুর্তিই করুক আর যা-ই করুক সমস্ত মনটা পড়ে থাকে তার ভাগলপুরে। জমিজমা তেমন নেই যে সেই চাষবাসের ওপর নির্ভর করে সংসার চলবে। বরাবর গলগ্রহ। ছোটবেলায় গলগ্রহ ছিল পিসেমশাইএর। বড়লোক পিসোমশাইএর বাড়িটাই ছিল বলতে গেলে তার নিজের বাড়ি। নিজের বাপ-মা মারা গিয়েছিল ছোট বয়েসে। সেই তখন থেকেই একসঙ্গে মানুষ হয়েছিল প্রীতি আর প্রকাশ।

যেন দুই ভাই বোন।

কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায় নিজে হাত-টান মানুষ। টাকা হাত দিয়ে বেশি গলতো না। তাই প্রকাশের তেমন পছন্দ হতো না পিসেমশাইকে।

একদিন প্রকাশ জিজ্ঞেস করেছিল—এত টাকা তোমার কে খাবে পিসেমশাই? তুমি মরে গেলে কার জন্যে টাকা রেখে যাবে?

পিসেমশাই বলতো—কেন, আমার যখন নাতি হবে সে খাবে—

পিসেমশাই-এর বিষয়-বুদ্ধি দেখে প্রকাশ তখনই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কবে পিসেমশাইএর

মেয়ের বিয়ে হবে, কবে আবার সেই মেয়ের ছেলে হবে তখনকার কথা ভেবে বুড়ো টাকা জমাচ্ছে। এরই নাম যাকে বলে দূরদৃষ্টি!

ও-সব দূরদৃষ্টি ফুরদৃষ্টির ধার ধারতো না প্রকাশ রায়। তার মত ছিল দিয়তাং ভূজ্যতাং। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ দু'দিনের জন্যে মাত্র আসে। সে-দু'টো দিন কেটে গেলে সবাইকেই একদিন চোখ উল্টে চিৎপটাং হতে হবে। সুতরাং ফুর্তিই সকলের জীবনের একমাত্র সার-বস্তু হওয়া উচিত। এই জীবনদর্শন নিয়ে প্রকাশ রায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল আর এই জীবন-দর্শনে আস্থা রেখে সে জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছিল। এর পর পিসেমশাই একদিন তার বিয়ে দিয়ে দিলে। পিসেমশাই ভেবেছিল বিয়ে দিয়ে দিলেই প্রকাশের দায়িত্বজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হবে আর তখন টাকা উপার্জনের দিকে সে মনোযোগ দেবে। অর্থাৎ টাকার ওপর তার মায়া বসবে।

পিসেমশাইএর দূরদৃষ্টি এই প্রথমবারই বুঝি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছিল। টাকার ওপর মায়া তো প্রকাশের বসেই নি, উল্টে টাকা ওড়াবার প্রবৃত্তিটাই ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

আসলে টাকাকে যারা অশ্রদ্ধা করে টাকাও বুঝি তাদের অশ্রদ্ধা করে। টাকার মূল্য যে বোঝে না টাকাও বুঝি তার মূল্য দেয় না। টাকার জগতের এমনই নীতি যে ভালোবাসার মানুষকে সে বুকে করে রাখে।

কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের বসত-বাড়ির লাগোয়া একটা জায়গায় তিনি প্রকাশের জন্যে একটা ছোট বাড়ি করে দিলেন। বললেন—তুই তোর ঘর-সংসার ওইখানে পাত্, আমার ঘাড়ে আর কদ্দিন থাকবি?

কিন্তু ঘর-সংসার পাতবো বললেই পাতা যায় না। তার জন্যে রেস্ত লাগে। প্রকাশ রায়ের সেই জিনিসটিরই বড় অভাব ছিল বরাবর। এমন সময় প্রীতির বিয়ে হলো নবাবগঞ্জে। প্রকাশ বউ-ছেলে-মেয়ে ছেড়ে সেই যে দিদির কাছে গিয়ে রইল, সেখান থেকে আর এলো না। দিদিও ছাড়লে না তাকে। বললে—আর কিছুদিন থেকে যা তুই, তারপর একদিন গেলেই হবে। তোর তো সেখানে কোনও রাজকার্য নেই—

তখন থেকে প্রকাশ দিদির ফাই-ফরমাস খাটে আর সেই ফাই-ফরমাসের সুবাদে একবার রেলবাজার, একবার রাণাঘাট আর একবার কলকাতা করে বেড়ায়। কাজ কি দিদির কম!

এতগুলো জায়গার মধ্যে কলকাতার ওপরেই ছিল প্রকাশ রায়ের বেশি টান। যে কাজটা রেলবাজারেই সমাধা হয়ে যায় তার জন্যে প্রকাশ রায়ের কলকাতায় না গেলে চলে না। এই কলকাতায় কত রূপই না দেখেছে প্রকাশ। দিনের কলকাতা, সন্ধ্যের কলকাতা, রাত্রের কলকাতা ছাড়াও ঝগড়ার কলকাতা, মারামারির কলকাতা, ফুর্তির কলকাতা, টাকার কলকাতা আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদের কলকাতা, বস্তির কলকাতা, অভাবের কলকাতা, দারিদ্র্যের কলকাতা, সমস্তই সে দেখেছে। তাই কলকাতা দেখতে তার আর বাকি নেই কিছু। তবু ফুরসৎ পেলেই প্রকাশ রায় কলকাতায় চলে আসে। দু'তিন দিন এখানে কাটায়, তারপর আবার টাকার খ্যাঁচ পড়লেই নবাবগঞ্জে ফিরে যায়।

এবার প্রকাশ রায় এসেছিল একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে।

মাসি বলেছিল—বড়বাবুকে বলে যা করবার আমি করে দেব, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না বাবা। সে দায় আমার ওপর ছেড়ে দাও তুমি—

প্রথম দু'দিন গায়ের ঘাম মারতেই কেটে গেল প্রকাশ রায়ের। কেবল পেট ভরে দু'বেলা পরোটা-মাংস খেতে লাগলো আর নেশার ঘোরে পড়ে-পড়ে ঘুমোতে লাগলো।

একদিন জিজ্ঞেস করলে—কই মাসি, কিছু হলো?

মাসি বললে—অত তাড়া কীসের, এ কি তাড়াহুড়োর কাজ যে হুট্ বলতে করে দেব! বাতাসীকে বলেছি, বাতাসী আবার ফুরসৎ মত বড়বাবুকে বলবে—

প্রকাশ বললে—এ-কথা বলতে ফুরসতের আবার কী দরকার? এ বলতে তো একমিনিটও লাগে না—

মাসি বললে—কী যে বলো তুমি তার ঠিক নেই। যে-কাজের যা নিয়ম। বড়বাবুর মেজাজ কি সব দিন সমান থাকে, মেজাজ বুঝে তো কথা বলতে হবে। বড়বাবুর মাথায় হাজারটা ঝঞ্ঝাট। সে-সব ঝঞ্ঝাট ভুলতে বাতাসীর বাড়িতে আসে, আর এখানেও যদি ঝঞ্ঝাটের কথা ওঠে তো মানুষের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাবে না? তাহলে মাগ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার কী দোষ করলো?

প্রকাশ রায় বললে—তা বটে—

মাসি বললে—বড়বাবুর কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, এই তোমার কথাই ধরো না বাবা, তোমারও তো বাড়িতে মাগ-ছেলে-মেয়ে আছে, তবু তুমি মাসির বাড়িতে কেন আসো বলো? ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ভোলবার জন্যেই তো। নইলে মিছিমিছি টাকা নষ্ট করতে কে চায় বলো? কিছু ফায়দা পাও বলেই তো মাসির বাড়িতে আসো। তোমাদের মতো ভালোমানুষের ছেলেদের পায়ের ধুলো পড়ে বলেই তো আমার মেয়েরা দুটো পেটে খেতে পায়। নইলে তোমাদের বাড়িতে কি পরোটা-মাংসের অভাব, না তোমাদের বাড়িতে খাওয়া জোটে না? তা তো নয়।

মাসি মিষ্টি কথা বলতে যেমন, আবার পকেট কাটতেও তেমনি।

প্রকাশ বললে—ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বোঝ মাসি তাই করো, আমি এই শুয়ে রইলুম—

কিন্তু সত্যি-সত্যি শুয়ে প্রকাশ থাকে না! খেয়ে উঠেই বেরিয়ে পড়ে ঘুরতে। ঘুরতে-ঘুরতে কাঁহা-কাঁহা চলে যায় তার ঠিক নেই। বড়বাজারের দুধওয়ালা ধর্মশালা থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়ি পর্যন্ত কোথাও ঘুরতে বাকি থাকে না তার। ভালো করে নজর দিয়ে দেখে সকলকে। সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলোয়। যাবে আর সে কোথায়? এই শহরেই কোথাও কোনও কোণে সদা আছে নিশ্চয়ই। যেখানে যে-আস্তানাতেই থাকুক রাস্তায় কি একবারের জন্যও বেরোবে না?

তারপর আছে কলকাতার বাজারগুলো। যে-যেখানে থাকুক, বাজারে একবার আসতেই হবে। সদা কি আর বাজার করতে আসবে? তা নয়। তবু অনেকগুলো লোককে একসঙ্গে বাজারেই পাওয়া যায়। সন্ধ্যেবেলা আর বেরোতে পারে না প্রকাশ। তখন ব্ল্যাক-আউট। তখন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে মিলিটারি-লরির ধাক্কা লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে খতম। তখন এই মাসির বাড়িই ভালো। তখন এ-পাড়া আবার জম-জমাট। আগে যেমন ফাঁকা ছিল এখন আবার তেমনি জম-জমাট। তখন বস্তির বাড়িতে বাড়িতে মদের সঙ্গে ফুলুরি-পেঁয়াজির চাট জমে ওঠে। কোনও কোনও বাড়িতে আবার গান-বাজনার ঠাট্টা। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যখন ট্যাঙ্ক-বারুদ-বোমার ঘায়ে কোটি-কোটি লোকের জীবনান্ত অবস্থা তখন এ-প্রান্তে যৌবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি কাণ্ড চলে।

কিন্তু সেদিন একটা অঘটন ঘটে গেল। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল প্রকাশ রায়। বিকেল হবো-হবো। মিলিটারিস্পেশাল এসেছে। খুব ভিড় চারদিকে। প্রকাশ সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। সদা যদি মিলিটারিতে নাম লিখিয়ে থাকে! সদার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

—হটো, হটো, হট্ যাও—

কোথা থেকে মানুষের একটা ঢেউ এসে প্রকাশকে একেবারে অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যখন চমক ভাঙলো দেখলে কে একজন হোমরা-চোমরা মানুষ যাচ্ছে, তার জন্যেই এত সতর্কতা। যুদ্ধের সময় মানুষকে আর মানুষ বলেও মনে করে না কেউ। যেন সবাই গরু ভেড়ার সামিল।

হঠাৎ পায়ে কী একটা ঠেকতেই প্রকাশ চেয়ে দেখলে। মানি-ব্যাগের মতন ঠিক। জিনিসটা কুড়িয়ে তুলে নিতেই চারিদিকে চেয়ে দেখলে। কেউ দেখে ফেলেনি তো! তারপর সেটা পকেটে পুরে ফেলে একেবারে সোজা প্লাটফরমের বাইরে। কিন্তু সেখানে গিয়েও স্বস্তি পেলে না। ভেতরে কী আছে কে জানে? সেখান থেকে একেবারে মাসির বাড়িতে চলে এসেছে। সেখানে নিজের ঘরখানাতে ঢুকেই দেখলে একটা মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে।

বললে—তুই এখন যা বাপু এখেন থেকে, আমার কাজ আছে—

মেয়েটা চলে যেতেই প্রকাশ দরজা বন্ধ করে দিলে। একেবারে খিল বন্ধ। শালীদের কাউকে বিশ্বাস নেই।

মানি-ব্যাগটা খুলতেই হাত কাঁপতে লাগলো ঠক্ ঠক্ করে। হে মা কালী, হে মা জগদম্বা, তোমাকে আমি জোড়া-পাঁঠা বলি দিয়ে পূজো দেব মা। ভেতরে যেন টাকা থাকে মা।

হঠাৎ বাইরে থেকে মাসির গলা শোনা গেল—ওগো ছেলে, ও ভালোমানুষের ছেলে, বলি ভর সন্ধ্যেবেলায় দরজায় খিল্ দিলে কেন গা? আমার মেয়ে আছে নাকি ঘরে?

ব্যাগটার মধ্যে কিছুছু নেই। একেবারে ফাঁকা ব্যাগ। প্রকাশ রায়ের কপালটাই ফুটো। যেমন তার ফুটো কপাল, তেমনি ফুটো ব্যাগ!

প্রকাশ রায় তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে।

মাসি বললে—ওমা, তাই বলি! আমি ভাবলুম কাকে ঘরে ঢুকিয়ে তুমি বুঝি খিল দিয়েছ! খবর আছে। আমি বাতাসীর বাড়ি গিয়েছিলুম—

—তাই নাকি? তা কী খবর? বড়বাবু রাজি হয়েছে?

মাসি বললে—তা তো হয়েছে। কিন্তু বড়বাবু বলেছে তোমার ভাগ্নের ছবি চায়। ছবি না হলে খুঁজে বার করবে কী করে?

প্রকাশ বললে—ছবি তো নেই আমার কাছে। কিন্তু চেহারা বলে দিতে পারি। লম্বা গড়ন, ফরসা গায়ের রং, টিকোলো নাক, চুলগুলো সব সময় উস্কো-খুস্কো থাকে। বেশ ভাবুক-ভাবুক চেহারা।

মাসি সব শুনলো। বললে—ও-সব বললে তো চিনতে পারবে না, একটা ছবি হলে তাড়াতাড়ি ধরা যাবে, নইলে পুলিসের লোক, বুঝতেই পারছো তো, গা করবে না মোটে—

তারপর একটু থেমে বললে—আর টাকা! টাকার কথাটাও বলি। মোটা টাকা লাগবে কিন্তু—

প্রকাশ বললে—আমি তো বলিইছি টাকা দেব। তা কত টাকা লাগবে মোট?

মাসি বললে—আগাম দিতে হবে কিছু তারপর বাকিটা তোমার ভাগ্নেকে পাওয়া গেলে তখন দিলেই চলবে—

প্রকাশ বললে—একশো টাকা এখন দিতে পারি আগাম। তাতে চলবে?

—একশো টাকা মাত্তোর?

মাসির প্রথমে অনিচ্ছে ছিল। তারপর বললে—তা দাও, এখন একশো টাকাই দাও, বাকি-ন'শো কিন্তু হাতে হাতে শোধ করতে হবে।

—ন'শো! প্রকাশ রায় টাকার অঙ্কটা শুনে যেন চমকে উঠলো।

বললে—মোট এক হাজার? যুদ্ধের বাজার বলে দাম বাড়লো নাকি? একটু কমসম করে হয় না?

মাসি বললে—তুমি যে কী বলো বাবা তার ঠিক নেই! জিনিস-পত্তোরের দাম চারদিকে কী-রকম আগুন হয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছো না? আগে আমার এই বাড়িতেই চার-আনা আট-আনার লোক বসিয়েছি, এখন পারি?

প্রকাশ বললে—আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। গরজ যখন আমার তখন আর টানা-হ্যাঁচড়া করবো না, যা চাইছো তাই-ই দেব, আমার কাজ উদ্ধার হলেই হলো—

মাসি বললে—আর টাকাটা বড়বাবু তো নিজে নেবে না। বড়বাবু তেমন লোকই নয়। অমন মানুষ হয় না, তা জানো? নেহাৎ ভালোবাসার মেয়েমানুষ আবদার ধরেছে তাই রাজি হয়েছে। কিন্তু দলের লোকেরা তো আর ধম্ম করতে পুলিসের চাকরিতে ঢোকেনি, তারা তে নেবে! টাকাটা তাদের জন্যে—

প্রকাশ রায় বললে—ঠিক আছে, এখন তো একশো টাকা রইলো তোমার কাছে, ওটা তুমি বাতাসীকে দিয়ে দিও—আমি আগে আমার ভাগ্নের ফটোটা নিয়ে আসি—

মাসি ততক্ষণে একশো টাকার নোটটা কপালে ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে ফেলেছে। তখন তার কাজ হয়ে গেছে। আর দেরি না করে বাইরে চলে গেল।

ভেতর থেকে প্রকাশ বললে—তাহলে কালকে সকালের ট্রেনেই আমি চলে যাচ্ছি মাসি, আমার হিসেবটা বুঝিয়ে দিও—

নবাবগঞ্জে সেদিনও আবার অনেক রাত হয়েছে। আবার সব নিরিবিলি, আবার সব নিঝুম। এই সব রাত্রেই বুঝি মানুষের সব কলঙ্ক সব পাপ সাপের মত গর্ত থেকে বাইরে মুখ বাড়ায়। বাড়িয়ে শিকারের লোভে বুকে হেঁটে পরিক্রমা শুরু করে। পরিক্রমা করে কলকাতা থেকে নবাবগঞ্জ সর্বত্র।

—দিদিমা, দিদিমা, ও দিদিমা, আমাকে বাঁচাও...ও দিদি...

বেহারি পালের বউ-এর ঘুম বড় পতলা। একটু শব্দ হলেই ঘুম ভেঙে যায়। আওয়াজটা কানে আসতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো। তারপর সমস্ত জিনিসটা আন্দাজ করে নিলে। ওই তো, ঠিক যেন ও-বাড়ির বউমার গলার মত!

বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে গেল।—বললে—ওগো, শুনছো—ওগো—

বেহারি পাল মশাই উঠলো। বললে—কী হলো?

গিন্নি বললে—জানো, হঠাৎ চৌধুরীদের নতুন বউ আমাকে দিদিমা বলে যেন ডাকলে—আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম। নতুন বউ যেন বললে—দিদিমা আমাকে বাঁচাও। তা আমি একবার ও-বাড়িতে যাই, বুঝলে? আমার বড় ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে নিশ্চয় কিছু বিপদ হয়েছে—

—সে কী? এই এত রাত্তিরে তুমি ওদের বাড়িতে যাবে কি গো! ওরা যদি কিছু বলে তখন? সেদিন কত কী কথা শোনালে শুনতে পেলে না? ওদের শাশুড়ি-বউ-এর ঝগড়াতে তোমার থাকবার দরকার কী? অপমান করলে তখন তো গায়ে লাগবে—

কিন্তু গিন্নী বললে, না গো, বউটার বড় কষ্ট, আবার হয়ত কিছু কষ্ট দিচ্ছে ওরা, আমি যাই, বলা যায় না, শাশুড়ী যা গুণের মানুষ, মারধোরও করতে পারে।

বলে আর দাঁড়ালে না। কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একেবারে সদর মাড়িয়ে চৌধুরী বাড়ির বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়লো।

হঠাৎ আবার সেই ডাক—ও দিদিমা আমাকে বাঁচাও—ও দিদিমা...

বার-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে ভেতর-বাড়ির দরজায় গিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো।

—ও বউ, বউ, দরজা খোল। বউমা অত চেঁচাচ্ছে কেন? কী হয়েছে বউমার?

জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে বেহারি পালের বউ আবার বলতে লাগলো—ও বউ, বউ, আমি তোমার মাসিমা, দরজাটা খোল—

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। অন্ধকারে চৌধুরী-গিন্নীর চেহারাটা অস্পষ্ট ছায়ার মত দাঁড়িয়ে।

— কে?

বেহারি পালের বউ বলে উঠলো—আমি বউ আমি। বউমা অত চেঁচিয়ে উঠলো কেন গা? কী হয়েছে বউমার? আমাকে ডাকলে কেন?

প্রীতি বললে—আমার বউমার কী-হলো না-হলো তা নিয়ে তোমার তো দেখছি খুব মাথা ব্যথা মাসিমা!

মাসিমা বললে—তা মাথা ব্যথা হবে না বউ? মেয়েটা অমন করে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাবলুম গিয়ে দেখে আসি কী হলো! মানুষের বিপদে-আপদে কি চুপ করে থাকতে পারা যায়?

প্রীতি বললে—আমার বউ-এর বিপদ-আপদের জন্যে তোমার বুঝি খুব ভাবনা? তা এতই যদি ভাবনা তো আমার বউকে কাল নিজের বাড়িতে আটকে রাখলেই পারতে? আবার সোহাগ করে আসতে দিলে কেন? তোমার বাড়িতেই খেতো শুতো থাকতো?

মাসিমা স্তম্ভিত হয়ে গেল বউ-এর কথা শুনে।

বললে—তুমি কী বলছো বউ? আমি বউমাকে আমার বাড়িতে আটকে রাখবো?

প্রীতি বললে—তা আমি কি অন্যায় বলেছি মাসিমা? কাল রাত্তিরে বউমা তোমার বাড়িতে যায়নি বলতে চাও? নিজের শাশুড়ি থাকতে তার কোন্ দায় পড়েছিল তোমার বাড়িতে যাবার শুনি? আজকে পরের বাড়ির দিদিমার ওপরে বউমার এত টানই বা হলো কেন? তবু যদি নিজের দিদিমা হতো তো তাও বুঝতাম—

বেহারি পালের বউ বললে—আমার আসাই ঘাট হয়েছে বউ, কর্তা ঠিকই বলেছিল, এখন বুঝছি না-এলেই বুঝি ভালো হতো।

প্রীতি বললে—সে-কথাটা আগে বুঝলে আমাকেও এত কথা বলতে হতো না আর তোমাকেও এত কথা শুনতে হতো না মাসিমা—

বেহারি পালের বউ বললে—ঠিক আছে বউ, আমি আসি—

বলে আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু পেছন থেকে প্রীতি আবার ডাকলে!

বললে—একটা কথা শুনে যাও মাসিমা, পরের বাড়ির গেরস্তালি ব্যাপারে নাক গলাতে চেষ্টা করা, এটা ভাল কাজ নয়। আমার বউমা খেতে পেলে কি পেলে না, আমার বউমা রাত্তিরে একলা ঘরে শুতে ভয় পেলো কি পেলো না, সেটা দেখার কাজ আমার, পরের কাজ নয়—

বেহারি পালের বউ বললে—কিন্তু আমি তো তোমাদের পর মনে করি না বউ। পর মনে করলেই পর হয়। এতদিনে তুমিও আমাকে পর মনে করোনি, আমিও তাই। তা আজ

যদি আমি পর হয়ে গিয়ে থাকি তো সে আমার কপাল বউ, সে আমার কপাল—

বলে বেহারি পালের বউ আর সেখানে দাঁড়লো না। সোজা নিজের বাড়িতে চলে এল।

বেহারি পাল সদরেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—কী হলো? খুব কথা শোনালে তো? আমি তোমাকে বললুম যেও না—তুমি সেই গেলে!

বেহারি পালের বউ সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে। বেহারি পালও পেছনে-পেছনে এসে দাঁড়ালো ঘরের ভেতরে।

বললে—দেখ, যখন মানুষের সময় খারাপ হয় তখন এমনিই হয়। তখন আর কারোর সঙ্গে মানুষ ভালো ব্যবহার করতে পারে না, তখন কাউকেই আর সহ্য হয় না—

বউ বললে—তা আমি কি ওদের টাকায় ভাগ বসাতে গেচি, না আমার সঙ্গে ওদের সেই সম্পর্ক! পাশাপাশি বাস করলে বিপদে-আপদে মানুষ মানুষের বাড়ি যায় না?

বেহারি পাল বললে—সে-কথা তো সবাই জানে। কিন্তু ওরা কি সেই ধরনের লোক? দেখনি আমার একটু পয়সা হয়েছে বলে কর্তামশাই আমাকে কী-চোখে দেখতো? যখন অবস্থা ভালো ছিল না আমার তখন এক-রকম ব্যবহার পেইছি, তারপর আবার যখন আমার অবস্থা ভালো হলো তখন অন্য রকম। তখন থেকে তো কর্তামশাই আমাকে মানুষ বলেই মনে করতেন না—। অসুখের সময় কতদিন দেখা করতে গিয়েছি, যেন আমি গরু না ভেড়া, মানুষ না পাথর! নিজে না খেয়ে না পরে, লোকজনকে সুদে টাকা দিয়ে জমি-জমা করেছি, সে সব তো কানে গেছে কর্তামশাইএর।

বউকে এসব পুরোন কথা শোনোনো বৃথা। কারণ এসব নবাবগঞ্জের সবাই জানে। এত লোক বেহারি পালের দোকানে সওদা করতে আসতো, কিন্তু কর্তামশাইএর বাড়ি থেকে কখনও এক পয়সার সওদা করতেও কেউ আসেনি।

কৈলাস গোমস্তাকে একদিন রাস্তায় বেহারি পাল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা কৈলাস, আমার দোকান তো তোমাদের কর্তামশাইএর বাড়ির পাশেই, তো কই তোমরা তো কোনও দিন আমার দোকান থেকে একটা আধলার জিনিসও সওদা করো না? আমার মাল কি খারাপ, না আমি ওজনে কম দিই, নাকি বাজার দরের বেশি দাম নিই—

কৈলাস বলেছিল—আজ্ঞে, তা নয়, আমি হলুম গিয়ে হুকুমের চাকর, আমি কী করবো বলুন? আমার ওপর যেমন হুকুম হবে আমি তেমনি তামিল করবো—

বেহারি পাল বলতো—তোমার কোনও দোষ নেই কৈলাস, তোমাকে আমি বলছি না। আমি তোমার কর্তাবাবুর কথাই বলছি। নিতাই হালদারের দোকানের ওপরও আমার কোনও রাগ নেই। আর আমার দোকান থেকে না কিনলে যে আমি উপোস করবো তাও নয়, কথাটা আমার মনে হয়েছে বলেই তোমায় জিজ্ঞেস করছি—

তা বেহারি পাল তখন থেকেই জানতো যে কারোর অবস্থা ভালো হোক, কারোর টাকা হোক এটা কর্তাবাবুর কাছে ভালো লাগতো না।

কিন্তু আশ্চর্য, কোথায় গেল সেই কর্তাবাবু আর কোথায় গেল তাঁর সেই টাকা। তাঁর অত সাধের নাতির বিয়ের পর তিনি ভেবেছিলেন জীবনে যা-কিছু অন্যায় যা-কিছু অত্যাচার তিনি করেছেন সব বুঝি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ভেবেছিলেন ভবিষ্যৎ-কাল তাঁকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে দিয়েই বুঝি অমর করে রাখবে। ক্ষণকালের পাপের দাগ চিরকালের কষ্টিপাথরে ধরা পড়বে না। তিনি যাবার আগে এই মিথ্যে বিশ্বাস নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করেছেন যে পরবর্তীকালের কাছে মহাপুরুষ আখ্যা পেয়ে তিনি ধন্য হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জানতেও পারেননি যে-অপমৃত্যু দিয়ে তিনি নিজের হাত সুদৃঢ় করেছেন সেই হাতই তাঁর আত্মজের হাত হয়ে একদিন তাঁকেই আবার কলঙ্কিত করবে। পরোক্ষভাবে তাঁর কৃত সমস্ত অপঘাত-মৃত্যু একদিন সুদে-আসলে তাঁরও অপঘাত-মৃত্যুকে ডেকে আনবে!

মানুষের জীবন যদি অত সহজ-সরল হতো তাহলে ইতিহাসের পাতায় যত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ লেখা আছে তার একটাও ঘটতো কিনা সন্দেহ। কিম্বা যত মহাপুরুষের নাম পৃথিবীতে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁদের আবির্ভাব হয়ত এত সত্যও হতো না। আর এত অনিবার্যও হয়ত হয়ে উঠতো না। ধর্মের গ্লানির সঙ্গে মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের বোধহয় এটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটা যখনই বিচ্ছিন্ন হয় তখনই বাধে যত বিরোধ। তাই এক-একবার বিরোধ বাধে আর বিশ্বসংসার আর সমাজ কয়েক যুগ ধরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যারা জীবনে ভোগ-সর্বস্ব তারা তখন বলে—বেশ আছি। বেশ থাকার সংজ্ঞা তাদের আলাদা, তাই বিপর্যয়ের মধ্যেই তারা আরাম পায় স্বস্তি পায়। কিন্তু সংসারে এমন এক-একজনও থাকে যে বলে এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও প্রভু, এর থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো।

কর্তাবাবুর অত সাধের গড়া সংসারে চৌধুরী মশাই মুক্তি চাননি। তিনি বলেছিলেন—বেশ আছি। আমার অনেক জমি, আমার অনেক সম্পত্তি, আমার অনেক প্রজা। আমার সিন্দুকে অনেক হীরে, অনেক জহরৎ, অনেক টাকা। চৌধুরী মশাইএর গৃহিণীও ভাবতো এই তো বেশ আছি। আমি আমার সন্তানের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ এনেছি, আমার ঘর-আলো-করা বউ হলো, এবার ঘর-আলো-করা একটা নাতি হবে। আমার কত আরাম, কত সুখ, কত শান্তি। এই আরাম-সুখ আর শান্তির আশাতেই প্রকাশমামা এই নবাবগঞ্জ ছাড়তে চাইতো না। কখনও যেত রাণাঘাটের রাধার বাড়ি, কখনও কালীঘাটের মাসির বাড়ি। আবার কখনও সেই আরামকে দীর্ঘস্থায়ী করতে মা-কালী-মার্কা বোতলের আশ্রয় নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো। মনে মনে বলতো—বেশ আছি। আর তাদেরই বা দোষ কী! কে-ই বা সুখে ছিল না! তাস-পাশা-দাবা খেলে আর যাত্রার মহড়া দিয়ে নিতাই হালদার, গোপাল ষাট, কেদার, গোবর্ধনও আরামে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল সারা জীবন। বলতো যুদ্ধের কথা থাক, আগে তাস ফেলো। আর ওদিকে কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে এদিকের বেহারি পাল পর্যন্ত কেউ এর ব্যতিক্রম ছিল না।

কিন্তু এদের মধ্যে একজনই শুধু বলে উঠলো—আমি বেশ নেই। আমি এ সহ্য করবো না। এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও, এর থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো।

সংসার থেকে পালিয়ে গেলেই কি মুক্তি আসে? পরিত্রাণ চাইলেই কি পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

রাত তখন অনেক। নবাবগঞ্জে তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সদানন্দ সেই অবস্থাতেই নবাবগঞ্জের রাস্তা দিয়ে দৌড়তে শুরু করেছে। ওরা আমাকে সংসারের নাগপাশ দিয়ে বাঁধতে চাইছে। ওরা আমাকে অন্যায়ের জাল ফেলে বন্দী করতে চাইছে। আমাকে তুমি মুক্তি দাও, অমাকে তুমি পরিত্রাণ করো। সমস্ত কলুষ বিনাশ করে আমাকে তুমি পরিশুদ্ধ করো। আমাকে বাঁচাও!

আস্তে আস্তে এক সময়ে পৃথিবীতে দিন হলো। দিগন্তে সূর্য উঠলো, লোকালয়ে কোলাহল। নবাবগঞ্জ পেরিয়ে কোমলপুর, কোমলপুর পেরিয়ে ছুটিপুর। ছুটিপুর পেরিয়ে আরো অনেক দূরে চলো। আরো অনেক দূর তোমাকে যেতে হবে সদানন্দ। আরো অনেক দেশ।

মনে আছে যখন খেয়াল হলো তার তখন নবাবগঞ্জ ছাড়িয়ে সে অনেক দূর চলে এসেছে।

মনে হলো কে যেন পেছন থেকে ডাকলে—কে গো তুমি? বাড়ি কোথায় গো তোমার?

মেয়েলি গলা। গলাটা শুনেই সদানন্দ পেছন ফিরলো। হাতে বাজারের থলি, মাথায় ঘোমটা। ডুরে শাড়ি পরা মেয়েমানুষ।

রাস্তার মেয়েমানুষ এমন করে সাধারণত কোনও অচেনা পুরুষকে ডাকে না। সদানন্দ অবাক হয়ে গেল দেখে।

—প্রকাশবাবু তোমার কে হয় বল তো? মামা না?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

—আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আমার নাম রাধা। আমাকে মনে পড়ে তোমার? সেই তোমার মামার সঙ্গে তুমি আসতে আমার বাড়িতে। মনে পড়েছে?

সদানন্দ যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই চলতে চলতে বললে—হ্যাঁ—

কিন্তু রাধা একেবারে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। বললে—তোমার মাথায় কী হয়েছে? ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছ কেন?

সদানন্দ বললে—ডাক্তার বেঁধে দিয়েছে—

—তুমি যাচ্ছো কোথায়?

সদানন্দর তখনও যাবার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনও উত্তর না বেরোতে রাধার কেমন সন্দেহ হলো। সদানন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেও অবাক লাগলো। একটা ধুতি আর গেঞ্জি শুধু। গায়ে অন্য কোনও জামাও নেই। সন্দেহ হতেই রাধা সদানন্দর হাতটা ধরে ফেললে। বললে—এসো, আমার বাড়িতে এসো—

সদা আপত্তি করতে গেল। কিন্তু রাধ ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে—আমি তোমাকে ছাড়ছি নে, তোমার মামা শুনলে কী বলবে বলো তো! বলবে তুমি সদাকে রাস্তায় দেখলে তবু এই অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিলে?

আর কোনও ওজর-আপত্তিতে কাজ হলে না। রাধার সেই পুরোন বাড়িটা। অনেকবার সদানন্দ মামার সঙ্গে গিয়েছিল আগে। সে-সব ছোটবেলাকার ব্যাপার। তখন সদানন্দ বুঝতো না কিছু। যাত্রা শুনে ফেরবার মুখে শেষরাত্রে রাধার বাড়িটাই ছিল প্রকাশমামার আশ্রয়। প্রকাশমামা এসে রাধাকে খুব চোট্‌পাট করতো। এই রাধা ঘুম থেকে ওঠবার পর ঘোলের সরবৎ করে দিয়েছে। রাধার বাড়িতে বসে মাছের ঝোল দিয়ে দু'জনে মিলে কতদিন ভাত খেয়েছে। তারপর সন্ধ্যেবেলা প্রকাশমামা বোতল বের করে মদ খেতে শুরু করেছে। তখন রাধা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়েছে। সে-সব দিনে সদানন্দ কিছু বুঝতো না বলে প্রকাশমামা অনেক রকম মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়েছে তাকে। রাধার বাড়িতে রাধার হাতের রান্না খেলে জাত যায় বলে প্রকাশমামা বার-বার রাধার বাড়িতে ভাত খাওয়ার কথা বাবাকে বলতে বারণ করে দিয়েছে।

সেদিন সেই সকালবেলা সদানন্দকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাধা অনেক খাতির করলে। সদানন্দ চেয়ে দেখলে ঘরের ভেতর সেই তক্তপোষটা তখনও রয়েছে, সেই পুতুল-ভরা কাচের আলমারিটা। কাঠের জলচৌকির ওপর রাধার সেই ঠাকুর। কেষ্ট ঠাকুর। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাধা পূজো-করতো রোজ। দেখে মনে হলো সেদিনও সে পুজো করেছে। তখনও ঠাকুরের সামনে ফুল বেলপাতা রয়েছে।

দুপুরবেলা খেয়ে উঠে সদানন্দ বললে—আমি এবার যাই—

রাধা বললে—তোমার তো বিয়ে হয়েছে, না?
সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—
—বউ কেমন হলো?
সদানন্দ বললে—ভালো।
রাধা বললে—তোমার মামা কিন্তু আমাকে বলেছিল তোমার নাকি বউ পছন্দ হয়নি। তুমি বউএর সঙ্গে নাকি শোও না।
সদানন্দ বললে—আমার মামার কথা তুমি বিশ্বাস করো নাকি?
রাধা বললে—বিশ্বাস আর কী করেই বা করি! তোমার মামাই তো আমাকে এ-পথে এনেছিল। তখন অনেক কিছু কথা দিয়েছিল, অথচ একটা কথাও রাখলে না—
সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কী কথা দিয়েছিল?
রাধা বললে—তুমি তার ভাগ্নে হও, সব কথা তোমাকে বলাও যায় না। আর সে-সব আজকের কথাও নয়, বলতে গেলে এখন আর মনেও পড়ে না সে-সব কথা। তখন যে কী মতি হয়েছিল আমার, তোমার মামার কথাতেই ভুলে গিয়ে চলে এসেছিলুম, নইলে কি আর আজ আমার এই দশা হয়? তখন শুনেছিলুম তোমার মামার নাকি অনেক টাকা, মস্ত বড় জমিদার। ভেবেছিলুম শান্তি না-পাই সুখ তো পাব। ভালো শাড়ি পরতে পাবো, ভালো-ভালো গয়না পরতে পাবো—
কথা বলতে বলতে সেদিন রাধার চোখ দু'টো কেমন যেন ভারি হয়ে উঠতে লাগলো।
—ওই শাড়ি-গয়নার লোভই আমাকে পথে নামিয়েছিল বাবা। নইলে তো অন্য কোনও লোভ ছিল না। গরীবের ঘরে জন্মেছিলুম বলে বড় দুঃখ ছিল আমার। ভেবেছিলুম তোমার মামার সঙ্গে গেলে যদি দুঃখটা ঘোচে তো তাই-ই বা মন্দ কী! কিন্তু পরে বুঝলুম সব মিথ্যে কথা। তোমার মামার যে কিছুই নেই তা কী করে তখন আমি বুঝবো? বাড়িতে যে তোমার মামার একটা বউ আছে সে-কথাটাও আমাকে একবার বলেনি মুখ ফুটে—
সদানন্দ বললে—তা তুমি মামাকে ছেড়ে চলে গেলে না কেন?
রাধা বললে—ছেড়ে যাবো কোথায় বাবা, ছেড়ে গেলে কে আর আমায় দেখবে বলো? আর তোমার মামাকে তো চেন, যতবার কথাটা কানে তুলেছি ততবার একটা-না-একটা ছুতো দিয়েছে। আর তারপর এখন তো বয়েস হয়ে গেছে, এখন এই বয়েসে আর কোথায় যাবো, বেশ আছি। একবার কালীঘাটে মায়ের দর্শন করবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাও হলো না—
সদানন্দ বললে—তা তুমি পালিয়ে গেলে না কেন? মামাকে ছেড়ে তোমার বাবা-মার কাছেও ফিরে যেতে পারতে?
রাধা বললে—তুমি ছেলেমানুষ বাবা তাই ও-কথা বলছো। বয়েস হলে বুঝতে সংসারে কেউ কারো নয় বাবা, কেউ কারো নয়, বাবাই বলো আর মা'ই বলো, সবাই পর। শুধু একলা তোমার মামার দোষ দিয়ে লাভ কী? তোমার মামাকে ছেড়ে যদি অন্য কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াতুম তো সেও এই একই রকম করতো—
বলে রাধা কাঁদতে লাগলো।
সদানন্দ আর কথা বাড়াতে দিল না। কথা বাড়ালেই কান্না বাড়বে রাধার। এ-রাধাকে আগে কখনও দেখেনি সদানন্দ। আগেকার রাধা গান গেয়েছে, পান-দোক্তা খেয়ে হেসেছে, বোধবয় মদও খেয়েছে প্রকাশমামার সঙ্গে। কিন্তু এতদিন পরে এ এক অন্য রাধাকে দেখলে সদানন্দ। এবারকার এ-রাধা ঠাকুরপূজো করে। এ-রাধা কালীঘাটে মায়ের দর্শন করতে চায়। এ-রাধা কাঁদে। নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রাধা বললে—তুমি শুয়ে পড়ো বাবা—দরজায় খিল দিয়ে দাও, আমি আসি—
—কিন্তু তুমি? তুমি কোথায় শোবে?
—আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমার কি আর শোবার জায়গার অভাব? এ-পাড়ায় আমাদের অনেক বাড়ি আছে, যার-তার বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে পড়ে থাকবো। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না—
বলে রাধা চলে গিয়েছিল। মনে আছে সেই তক্তপোষের ওপর শুতে কেমন খারাপ লেগেছিল সদানন্দর। তবু রাধার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয়নি তার। পরের দিন সকালে উঠেই কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল সে, যেখানে গেলে নবাবগঞ্জের কেউ আর তার নাগাল পাবে না।
কিন্তু মাঝ রাত্রে হঠাৎ একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো দুম্-দুম্ করে কেউ যেন তার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।
সদানন্দ ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। রাধা নাকি! ঘরে হয়ত রাধার জিনিসপত্র আছে, তাই নিতে এসেছে।
খিলটা খুলতেই সদানন্দ দেখলে একজন অচেনা লোক। টলছে। খুব মদ গিলেছে বোধহয়।
—এতক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি, খুলছিস না কেন? মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছিলি নাকি?
কথাটা বলেই তারপর বোধহয় একটু খেয়াল হলো। বললে—তুমি কে বাবা? হ্যাঁ?
নেশার ঘোরের মধ্যেও লোকটার বোধহয় একটু জ্ঞান ছিল তখনও। বুঝতে পেরেছে যে-লোকটার সঙ্গে কথা বলছে সে মেয়েমানুষ নয়, পুরুষমানুষ।
—কাকে চাই?
লোকটা বললে—আপনাকে ডিস্টার্ব করলুম নাকি ভাই? হাত জোড় করছি, আমাকে মাফ করুন, আমি জানতুম না, রাধার যে বাঁধাবাবু আছে তা একদম স্রেফ ভুলে গিয়েছিলুম—
সদানন্দ বললে—ঠিক আছে, আপনি আসুন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—
বলে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো সে।
লোকটা তখনও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। বললে—আপনি কোথায় যাচ্ছেন ব্রাদার?
কিন্তু সদানন্দ সে-কথায় কান দিলে না। রাধার বাড়ি ছেড়ে একেবারে বাজারের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। বাজার তখন ফাঁকা। রেল-স্টেশনের বাজার। বন্ধ দোকান-ঘরগুলোর সামনের মাচাতেই অনেক ব্যাপারি শুয়ে আছে। তারপর সেখান থেকে একেবারে সোজা রেল-স্টেশনের প্লাটফরম্।
শব্দটা রাধার কানেও গিয়েছিল। যা ভয় করছিল সে তাই-ই হয়েছে। দৌড়তে দৌড়তে নিজের ঘরের কাছে এসেই যা দেখলে তাতে মাথায় রক্ত উঠে গেল। বললে—তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এলে? আমার ঘরে লোক ছিল তাকে কোথায় বার করে দিলে?
লোকটা হেসে উঠলো দাঁত বার করে, বললে—তা আমি কী করে জানবো তোমার বাবু এসেছে আজকে? আমার অপরাধটা কী দেখলে? দরজায় তাহলে নোটিশ লিখে দেওয়া উচিত ছিল। এমন বেদিনে আসে কেন তোমার বাবু?
রাধা আর থাকতে পারলে না। সোজা একেবারে লোকটার গলাটা চেপে ধরলে। বললে—তাবলে তুমি আমার ঘরের লোককে তাড়িয়ে দিলে কেন তাই আগে বলো? কেন তাড়িয়ে দিলে? বলো? না বললে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো, বলো?

লোকটা একে নেশায় টলছে, তার ওপরে মাঝরাত, তার ওপর আবার রাধা খুব জোরে গলাটা টিপে ধরেছে। এমন অবস্থার জন্যে তৈরি ছিল না সে। বলতে গেল—ছাড়ো আমাকে, ছেড়ে দাও...

কিন্তু রাধা তাকে কিছুতেই ছাড়বে না। বললে—আগে তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও আগে—

লোকটা তখন কাবু হয়ে গেছে। তার গলাটা তখনও ধরে রেখেছে রাধা।

বললে—আমি তোমার এখানে থাকবো বলেই যে এসেছিলুম, আমি না-হয় আরো বেশি টাকা দেব—যত টাকা চাইবে তত টাকাই না-হয় দেব—

রাধা চেঁচিয়ে উঠলো—তোমার টাকায় আমি ঝ্যাঁটা মারি, আমায় তুমি টাকা দেখাচ্ছ, বেরোও এখেন থেকে, বেরিয়ে যাও—

লোকটা সেই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার সেদিন চৌধুরী মশাই-এর বাড়ির ভেতর থেকে গোলমাল উঠলো।

সদানন্দ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর প্রথম প্রথম কেউ বুঝতে পারেনি। ঘটা করে শ্রাদ্ধ হলো কর্তাবাবুর। ঘটা বটে, কিন্তু আগেকার মত তেমন ঘন-ঘটা যেন নয়। আগের মত ভিয়েন বসলো বারবাড়ির উঠোনে। গ্রামের লোকও এল পাত পেড়ে খেতে। কিন্তু সবাই নয়। নেমন্তন্নর ব্যাপারেও কিছু উনিশ-বিশ করা হলো। চৌধুরী মশাই বললেন—একটু কষে লিস্টি করো কৈলাস, খরচা আর বাড়াতে চাই নে? এমনি কর্তাবাবুর অসুখে অনেক খরচ হয়ে গেছে—

রাত্রে যখন যে-যার বাড়ি চলে গেছে তখন বেহারি পালের বউও কাজ-কর্ম সেরে বাড়ি চলে আসছিল। হঠাৎ দেখলে নয়নতারা নিজের ঘরের দরজার চৌকাট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কেমন খারাপ লাগলো দেখতে। এত লোক-জন, এত খাওয়া-দাওয়া, এর মধ্যে বাড়ির পুত্রবধূ এ-রকম মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

জিজ্ঞেস করলে—কী বউমা, তোমার মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? তুমি খাওনি?

নয়নতারা এতক্ষণে যেন একজন শুভাকাঙ্খীর দেখা পেয়েছে এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলে—আপনি খেয়েছেন দিদিমা?

দিদিমা বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তো খাবোই, কিন্তু তুমি এ-বাড়ির বউ, তোমাদের বাড়িতে এত লোকজনের আনাগোনা, তুমি কোথায় সকলকে দেখা-শুনা করবে, আর তুমিই কিনা মুখ গম্ভীর করে আছো?

নয়নতারা মুখে একটু হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে—কই, গম্ভীর মুখ করে থাকিনি তো!

দিদিমা বললে—নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলো তো বউমা কী হয়েছে তোমার? খাওয়া হয়নি বুঝি? খেয়েছ? খেয়েছ তুমি?

ও-দিক থেকে শাশুড়ি বুঝি হঠাৎ সেই দিকেই আসছিল। তার কানে গিয়েছে কথাটা।

বললে—কে? কে খায়নি মাসিমা? কার কথা বলছো?

মাসিমা বললে—এই বউমার কথা বলছি। বউমার মুখখানা শুকনো-শুকনো দেখলুম কি না তাই জিজ্ঞেস করছিলুম বউমা খেয়েছে কি না—

শাশুড়িও বউয়ের দিকে চেয়ে বললে—কী বউমা, তুমি খাওনি?

নয়নতারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু উত্তর দিলে না। উত্তর দিলে বলতে হতো কেউ তাকে খেতে বলেনি তো সে খাবে কী করে?

কিন্তু শাশুড়ি সে দিক দিয়েও গেল না। বললে—খাওনি তুমি? কিন্তু খাওনি কেন? এত লোক খেয়ে গেল আর তুমিই বা খেলে না কেন? কেউ বলবে তবে তুমি খাবে? একটু খেয়ে নিয়ে আমার উপকার করবে তাও তোমার দ্বারা হবে না?...তবু যদি একটা ছেলে বিয়োতে পারতে তো বুঝতুম—

মাসিমা বললে—আহা কেন তুমি ওকে বকছো বউ, ও পরের বাড়ির মেয়ে, সেদিন সবে নতুন বউ হয়ে এসেছে, ও নিজের মুখে কী করে খাওয়ার কথা বলে? তোমারই ওকে খাওয়াতে বসানো উচিত ছিল।

—তুমি রাখো তো মাসিমা! নতুন বউ! আমরা কি কোনওকালে বউ হইনি, না শাশুড়ির ঘর করিনি। আমি যদি আমার শাশুড়ির কাছে অমন বেয়াড়াপানা করতুম তা আমার শাশুড়ি আমার মুখে ঝামা ঘষে দিত না—

মাসিমা বললে—বউ, তুমি তোমার শাশুড়ির নামে অমন করে কথা বলো না, আমি তাঁকে চিনতুম, তিনি স্বগ্যে গেছেন, একদিনের জন্যেও তিনি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেননি—

প্রীতি বললে—তুমি তো আমার শাশুড়ির দিকটাই কেবল দেখলে মাসিমা। আমার দিকটার কথাও ভাবো। আমি কি আমার শাশুড়ির সঙ্গে কোনওদিন গলা উঁচু করে কথা বলেচি, না বলবার সাহস হয়েছে!

—যাকগে, সেসব পুরোন কথা থাক, এখন তুমি খেয়ে নেবে এসো বউমা—এসো—বলে বেহারি পালের বউ নয়নতারার হাত ধরে টানলে।

প্রীতি তার আগেই চেঁচিয়ে ডাকলে—ওলো ও গৌরী, বউমাকে খেতে দিসনি কেন, হ্যাঁ? কোনও দিকে কি তোর হুঁশ থাকে না?

গৌরীরও তখন খাওয়াদাওয়া চুকে গেছে। সে তখন পান চিবুচ্ছে। সে রান্নাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললে—ওমা, তাই নাকি? বউমা খায়নি? তা আমাকে বলবে তো? বউমা কি কুটুম্ব মানুষ নাকি যে ডেকে খাতির করে খাওয়াতে বসাতে হবে? আমরা সবাই যখন খেতে বসলুম তখন একটা পাতা পেতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেই হতো—

বেহারি পালের বউ বললে—তুমি আর কথা বাড়িও না বাছা, কী দেবার আছে দাও দিকিনি বউমাকে, আমি পাশে বসে খাওয়াচ্ছি—

খেতে খেতে নয়নতারা যখন দেখলে কেউ কোথাও নেই তখন কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললে—আর খেতে পারবো না দিদিমা, আমাকে আর খেতে বলবেন না আপনি—

দিদিমা বললে—না খাও, ওদের কথায় রাগ করতে নেই, রাগ করলে নিজেই ঠকবে—

নয়নতারা বললে—এর পরেও এই ছাই আমার গলায় ঢোকে?

দিদিমা বললে—গলায় ঢুকুক আর না ঢুকুক, জোর করে গিলে ফেল। তোমার তো এই খাওয়ার বয়েস। আর তা ছাড়া খাবেই বা না কেন? কার ওপর রাগ করে তুমি উপোস করবে? শাশুড়ি মানুষেরা ওরকম বলেই থাকে। আমার শাশুড়িও আমাকে ওরকম কত বলেছে। তোমার শাশুড়ি যখন বউ মানুষ ছিল তখন কত খোঁটা খেয়েছে নিজের শাশুড়ির

কাছে। এখন মারা গেছে তাই অত তার গুণপনা ব্যাখ্যা হচ্ছে। আবার তুমিও যখন শাশুড়ি হবে তখন তুমিও তোমার বেটার বউকে অমনি বকবে। এ সব-বাড়ির নিয়ম। ও নিয়ে রাগ করতে নেই—

নয়নতারা বললে—আপনি সব জানেন না তাই ওকথা বলছেন দিদিমা, জানলে আর বলতেন না—

দিদিমা বললে—কেন, আগে যে তোমাকে শাশুড়ি খুব আদর করতো দেখেছি। তোমাকে সিন্দুকের চাবি দিয়ে দিয়েছিল।

নয়নতারা বললে—সে চাবি এখন নিয়ে নিয়েছেন—

—সে কী? নিজে থেকে যে তোমার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিল, আবার নিজেই সে-চাবি নিয়ে নিয়েছে?

—হ্যাঁ!

—কেন? কী করেছিলে তুমি?

—আমি আবার কী করবো! চাবি আমার কাছে থাকলেও আমি সিন্দুক কোনও দিনই ছুঁইনি। একদিন উনিই আমাকে বললেন চাবি দিয়ে দিতে, আমিও দিয়ে দিলুম—

হয়ত আরো কথা হতো এ প্রসঙ্গে কিন্তু ঠিক সেই সময়ে শাশুড়ি সেখানে আসতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। বললে—কী, এখন বউমার রাগ ভাঙলো?

মাসিমা বললে—তুমি আর অমন খোঁটা দিয়ে কথা বোল না বউ, একটু আদর করলেই পারো তুমি নিজে—

প্রীতি বললে—আমাকে কে আদর করে তার ঠিক নেই আমি করবো বউ-এর আদর। আমার কি সময় আছে মাসিমা যে জনে জনে দেখে বেড়াবো কে আদর পাচ্ছে কে পাচ্ছে না। সেই রাত থাকতে উঠিচি আর কখন যে শুতে যেতে পারবো তার ঠিক নেই, আমার মাথা-হাত-পা সব টন্‌টন্ করছে তা জানো?

ততক্ষণ আরো অনেক রাত হয়েছে। সারা বারবাড়ির উঠোনে তখন কলাপাতা নিয়ে রাস্তার কুকুরদের টানাহ্যাঁচড়া চলছে। বেহারি পালের বউ আর দাঁড়ায়নি সেখানে।

বাড়িতে আসতেই বেহারি পাল জিজ্ঞেস করলে—কীগো এত দেরি যে তোমার?

গিন্নী বললে—এদের শাশুড়ি-বউ-এর কাণ্ড দেখছিলুম, তাই দেখতেই দেরি হয়ে গেছে। নইলে খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

—শাশুড়ি-বউ-এর-ঝগড়া? বেহারি পাল উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

তা এসব সেই গোড়ার দিকের কথা। এর পর অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। অনেক ঝড় বয়ে গেছে চৌধুরীবাড়ির ওপর দিয়ে। সেদিনকার সেই ঘটনার পর বেহারি পালের বউ-এরও ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বলতে গেলে দু-বাড়ির মধ্যে আর মুখ-দেখাদেখিও নেই।

তারপর সেদিন হঠাৎ বিকেল বেলাই চৌধুরী মশাই-এর বাড়ির ভেতর থেকে আবার সেইরকম গোলমাল উঠলো।

রেল বাজারের পাটের আড়তদার প্রাণকৃষ্ণ সা মশাই বেহারি পালের দোকানে বসে বৈষয়িক কথাবার্তা বলছিল।

হঠাৎ চৌধুরী মশাই-এর বাড়ির ভেতরের গোলমাল শুনে বললে—ও কীসের গোলমাল পালমশাই?

বেহারি পাল বললে—ওই, শাশুড়ি-বউতে শুরু হয়েছে—

—শাশুড়ি-বউ?

প্রাণকৃষ্ণ সা মশাই অবাক। বললে—গলা তো একজনেরই শুনতে পাচ্ছি। ও বোধহয় চৌধুরী মশাই-এর গিন্নীর গলা। কাকে বকছে এত?

—ওই ছেলের বউকে।

—কেন? ছেলে তো শুনি নিরুদ্দেশ। তা ছেলের বউ আবার কী দোষ করলো?

বেহারি পাল বললে—কে জানে কী দোষ করেছে। ছেলে পালিয়ে গেছে সেটাও বউ-এর দোষ। বউকে শুনি শাশুড়ি নাকি পেট ভরে খেতেও দেয় না। আমার গিন্নী মাঝে মাঝে লুকিয়ে-গিয়ে খাইয়ে আসতো, এখন আবার তাও বন্ধ হয়ে গেছে—

—কেন?

বেহারি বললে—ওই যে আমার কারবার একটু বড় হয়েছে। আপনি আগে ওখেনে যেতেন এখন আমার কাছে আসেন এটাও ওদের ভালো লাগে না। সহ্য হয় না আর কি!

প্রাণকৃষ্ণ সা তবু খুশী হলো না কারণটা শুনে। বললো—তাই ছেলেই বা বিয়ে থা করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কেন? আমরা তো কিছু বুঝতে পারিনে। আর তারপর থেকে চৌধুরী মশাইও দেখেছি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আর মন দিচ্ছেন না আগের মত—! ছেলে চলে যাওয়াতে বোধ হয় মনটা ভেঙে গেছে—

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর সা মশাই নিজের কাজে চলে গেল। বেহারি পাল বাড়ির ভেতরে যেতেই দেখলে গিন্নী চৌধুরীবাড়ির দিকে কান পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্তাকে দেখেই বললে—ওই শোন, শুনছো তো?

বেহারি পাল বললে—শুনেছি তো, কিন্তু শুনে তো কোনও লাভ নেই। কিছু তো করতে পারবো না আমরা। শুধু মনের কষ্ট—

গিন্নী বললে—ওসব আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, জানো? যাতে আমার কানে আসে। অথচ আমি কী দোষ করলুম। তোমাদের শাশুড়ি-ছেলে-বউ-এর ব্যাপার, আমি তার মধ্যে কে? আমি তো কেউই নই। নেহাৎ কষ্ট কহ্য করতে না পেরে আমার বাড়িতে ছুটে এসেছিল, এই আমার দোষের মধ্যে দোষ হয়েছিল! তা আমি এর কী করবো বল?

বেহারি পাল বললে—তুমি না-শুনলেই পারো? শুনছো কেন? আসলে তো রাগ তোমার ওপরে নয়, রাগ আমার ওপরে। আমার অপরাধ আমার কারবার কেন বড় হয়েছে, আমার কেন টাকা হয়েছে। প্রাণকৃষ্ণ সা মশাই এখন আমার এখানে কেন এত আসে....তা তুমি তোমার নিজের কাজ করো গিয়ে, ওদিকে কান দিয়ে লাভ নেই।

বলে ওদিককার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলে বেহারি পাল।

বাতাসীর নতুন বাড়িটা ভালো। মাসির সস্তার বাড়ি ছেড়ে বড়বাবু বাতাসীকে একেবারে পাকা দোতলা বাড়িতে এনে তুলেছিল। মাসির বাড়িতে বড় আজে-বাজে লোকের আনাগোনা। ওতে ইজ্জৎ চলে যেত বড়বাবুর।

বড়বাবুদের কাছে ইজ্জতের দামটাই সব চেয়ে বেশি। ঘরের দরজায় খিল দিয়ে আমি যা-ই করি, বাইরে তো ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চলতে হবে। সেই ইজ্জতের জন্যেই বাতাসীর পাকাবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে দামী-দামী গয়নাও উঠেছিল। সারাদিন ধরে বাতাসীর আর কোনও কাজ থাকে না। দুপুর বেলা বিছানায় শুধু গড়ানো আর বিকেল হতে-না-হতে গা

ধুয়ে খোঁপা বেঁধে সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসে থাকা। কখন বড়বাবু আসবে তারই জন্যে প্রতীক্ষা।

একটা তো মাত্র মেয়েমানুষ। কিন্তু তার জন্যে সাজ-সরঞ্জামের কিছু কমতি নেই। দারোয়ান, ঝি, রাঁধুনী। বড়বাবুর সেবায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়। সন্ধ্যে হয় আর ঘড়ির দিকে তাকায় বাতাসী। হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে।

তা সেদিন বেলাবেলিই এসে গেল বড়বাবু।

ঘরে ঢুকেই দেখে বাতাসী একমনে কী একটা দেখছে।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—কী দেখছিলে?

—এই ছবিটা!

—ছবি? ফটো? এ কার ফটো?

বড়বাবু ফটোটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। উস্কো-খুস্কো মাথার চুল, লম্বা নাক, গায়ের রংটাও ফরসা মনে হচ্ছে।

—এ কার ছবি?

—মাসি দিয়ে গেছে আমাকে। এই ছেলেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। এর মামা এসেছে কলকাতায় খুঁজতে। কোথাও পাচ্ছে না একে। তুমিই তো ফোটো চেয়েছিলে এর। বলেছিলে ফোটো না পেলে খুঁজে বার করতে পারবে না। এর নাম নিচেয় লেখা রয়েছে পড়ে দেখ না—

বড়বাবু পড়ে দেখলে ফোটোর তলায় লেখা রয়েছে—সদানন্দ চৌধুরী—

সদানন্দ চৌধুরী! বড়বাবু ছবিখানা নিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর বললে—এ বাড়ি থেকে পালিয়েছে কেন?

বাতাসী বললে—সে আমি কী জানি—মাসি আমাকে দিয়েছে আমি তাই তোমাকে দিলুম—

বড়বাবু অফিসে উদয়াস্ত খাটে। অফিসের কাজে কখনও তাকে যেতে হয় কলকাতার বাইরে। আবার অনেকদিন কলকাতাতেই দিন কাটে। অফিসের লোক থেকে শুরু করে অফিসের বাইরের লোক সবাই তটস্থ থাকে বড়বাবুর ভয়ে। অফিসে কনস্টেবলরা বড়বাবুকে দেখলে চোখের আড়ালে চলে যায়। বড় জাঁদরেল সাহেব বড়বাবু। এককালে স্বদেশী ছোকরাদের ধরে ধরে আগা-পাশ-তলা বেত মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। সেকালে কত স্বদেশী ছেলে যে বড়বাবুর হাতে খুন হয়েছে তার ঠিক নেই। তারপরে যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধ থেমেও গেছে। কিন্তু প্রতাপ তখনও কমেনি বড়বাবুর। ররং বেড়েছে।

এক-একদিন সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছোয় আর যখন রাত কাবার হয়ে যায় তখন উঠে পড়ে। কোথা থেকে একটা জিপগাড়ি এসে বাড়ির তলায় রাস্তায় দাঁড়ায় আর বড়বাবু তখন ঘুম থেকে উঠে গিয়ে সেই গাড়িতে গিয়ে বসে। আর গাড়িটা বড়বাবুকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বাতাসী আর দেখতে পায় না বড়বাবুকে।

তখনকার মত বাতাসীর ছুটি। তারপর যখন আবার বিকেল হবে তখন থেকে শরীরটাকে ঘষে মেজে তৈরি করে নিতে হবে। সেজে-গুজে অপেক্ষা করতে হবে বড়বাবুর পথ চেয়ে।

কিন্তু বড়বাবুর অফিসে সেই সময়ই যত কাজ। মোটা বুট-জুতোর ভারি শব্দে তখন লালবাজার থর্ থর্ করে কাঁপবে। লালবাজারটা বড়বাবুর অফিস, কিন্তু সারা কলকাতাটা জুড়ে বড়বাবুর দাপট। বড়বাবুর দাপটে রাইটার্স-বিল্ডিং থেকে পুলিস কমিশনার পর্যন্ত সবাই নিশ্চিন্ত। যখনই কোথাও গোলমাল হবে তখন কে সামলাবে—? সামন্ত!

এক-একটা তেমন ঘোরালো কেস হলেই ভার পড়ে সামন্তর ওপর। একটা মস্ত ডাকাতির কেস থেকেই নাম-ডাক হলো সুশীল সামন্তর। ডাকাতিটা স্বদেশীদের করা। কিন্তু কিছুতেই তার কিনারা করা যায় না। হোম-মিনিস্ট্রি থেকে কড়া অর্ডার এলো। এক-একজনকে ভার দিয়ে পাঠানো হলো। সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো।

শেষকালে ফাইলটা এলো সামন্তর কাছে।

সামন্ত শুধু কালপ্রিটদের ধরে ফেললো তাই-ই নয়, সব ছেলেগুলোর লম্বা জেলও হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সামন্তর প্রমোশন। সামন্তর পার্সোন্যাল ফাইল গেল ডেপুটি কমিশনারের কাছে। ডেপুটি কমিশনার ডেকে পাঠালে সামন্তকে।

বললে—সামন্ত, তোমার জন্যে আমি প্রমোশনের রেকমেণ্ড করে দিলুম—

শেষকালে ফাইলটা গেল কমিশনারের কাছে। সেখানে এক-কথায় চোখ বুজেই সই হয়ে গেল।

কিন্তু প্রমোশন হওয়াই কাল হলো সুশীল সামন্তর। প্রমোশন না হলে হয়ত এ-সব কিছুই হতো না।

একদিন হাতে-নাতে একটা কেস ধরে ফেললে সুশীল সামন্ত। বড়বাজারের মস্ত বড় একজন মার্চেন্ট। ইলেকট্রিক কারেণ্ট চুরি করে ফ্যাক্টরির জন্যে। লক্ষ লক্ষ টাকা গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে কারবার চালাচ্ছে বহু বছর ধরে। খবরটা পেয়েই লুকিয়ে লুকিয়ে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিলে। তারপর একদিন সোজা গিয়ে হাজির হলো ফ্যাক্টরিতে। ফ্যাক্টরি তখন চলছে। সামন্ত গিয়েই সোজা হাজির পাওয়ার-হাউসে।

পাওয়ার-হাউসের চিফ-ইনজিনীয়ার খবর দিলে মূলচাঁদ আগরওয়ালাকে। মূলচাঁদ আগরওয়ালা হুঁশিয়ার ব্যবসায়ী মানুষ। সহজে দমে না। এ খবরেও দমলো না। সঙ্গে সঙ্গে চিফ-ইনজিনীয়ারকে বললে—তুমি গিয়ে দারোগা সাহেবকে খাতির করে বসাও, আমি আসছি—

মূলচাঁদ আগরওয়ালা বহুদিনের কারবারী। অনেক মিনিস্টার চরিয়েছে, অনেক লাটসাহেবকেও চরিয়েছে। সে জানে কী করে ক্ষমতাওয়ালাদের চরাতে হয়। গাড়িটা নিয়ে বেরোল। সোজা চলে গেল কমিশনারের অফিসে। মূলচাঁদ আগরওয়ালার মুখ চেনে সবাই। কমিশনারের ঘরে বসে অনেকক্ষণ কী সব কথা হলো কেউ জানে না।

যখন কমিশনারের ঘর থেকে মূলচাঁদ বেরোল তখন একটা ঘণ্টা কেটে গেছে। সবাই দেখলে মূলচাঁদ ঘরে ঢোকবার সময়েও যেমন হাসিমুখ, বেরোবার সময়েও তেমনি। সোজা বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে গেল।

কিন্তু এ-ঘটনার তিন দিন পরে হঠাৎ ডেপুটি সামন্তকে ডেকে পাঠালো।

বললে—সমন্ত, তুমি কী করেছিল হে?

সুশীল সামন্ত তো অবাক। বললে—কেন স্যার?

ডেপুটি বললে—তোমার ডিমোশন্ হয়ে গেল যে হঠাৎ—

সামন্ত বললে—কেন স্যার? কী করেছি আমি?

—কী জানি। হঠাৎ বড় সাহেব আমাকে ডেকে তোমার ফাইলটা চেয়ে পাঠালো, তারপর এই দেখ কী রিমার্ক লিখে দিয়েছে। আন্‌ফিট ফর কনফারমেশন। কনফার্ম হবার যোগ্য নয়।

সুশীল সামন্ত অবাক হয়ে গেল দেখে। এই সেদিন অত বড় একটা কেস্ ধরে ফেললে। গভর্নমেন্টের বছরে লাখ লাখ টাকার লোকসান বেঁচে গেল। কোথায় তার স্পেশ্যাল রিওয়ার্ড হবার কথা, তা নয় একেবারে ডিমোশান!

ডেপুটি বললে—তোমার হাতে কী কেস আছে এখন বল তো!

সামন্ত বললে—এখন তো স্যার মূলচাঁদের ফ্রড্ কেসটা হাতে রয়েছে। প্রায় এক কোটি টাকার ফ্রড্ কেস্—

ডেপুটি মূলচাঁদের নাম শুনে একেবারে চমকে উঠেছে। বললে—করেছ কী তুমি, মূলচাঁদকে ধরেছ? মূলচাঁদ আগরওয়ালা? সর্বনাশ করেছ! একেবারে ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছ?

সামন্ত বুঝতে পারলে না। বললে—কেন স্যার? মূলচাঁদ কত বড় জোচ্চোর তাকে ধরে কী খারাপটা করেছি? আমার তো রিওয়ার্ড পাওয়ার কথা—

—আরে দূর, মূলচাঁদ কে জানো? ও যে বড় সাহেবের পেয়ারের পার্টি। মাসে যে পনেরো-কুড়ি হাজার টাকার ভেট্ দেয় বড় সাহেবকে। তারপর আছে মিনিস্টারেরা। তুমি আর ধরবার লোক পেলে না! ধরতে গেলে কিনা একেবারে মূলচাঁদকে?

এ সেই ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকের কথা। পুলিসের লাইনে তখনও সাদা চামড়ার রাজত্ব। সুশীল সামন্তর জীবনেও তখন চাকরির গোড়ার দিক। তখন কলেজ থেকে বেরিয়ে সামনে বড় আদর্শ নিয়ে কাজ করতে ঢুকেছিল পুলিসের চাকরিতে।

কিন্তু চাকরিতে ঢুকে সুশীল সামন্ত পৃথিবীটা যত দেখতে লাগলো ততই সব আদর্শ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো। দেখলে এ পৃথিবীতে যে সৎ হবার চেষ্টা করবে তারই যত দুর্ভোগ। যে সত্যি কথা বলবে তাকেই তত শাস্তি পেতে হবে। অথচ তুমি চুরি করো, ঘুষ নাও, মিথ্যে কথা বলো, চড়চড় করে তোমার চাকরিতে উন্নতি হয়ে যাবে।

তা সেই দিন থেকেই সামন্ত একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। দু'হাত ঘুষ নিতে লাগলো, দশ মুখে মিথ্যে কথা বলতে লাগলো। সামন্তর আসামীদের মধ্যে সৎ লোকের জেল হয়ে গেল, অসৎ লোকেরা ছাড়া পেয়ে যেতে লাগলো। লালবাজারের হেড্ কোয়ার্টারে সামন্তর তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ! যে মূলচাঁদকে ধরতে গিয়ে তার এত বদনাম, সেই মূলচাঁদের কাছ থেকেই সে তখন দু'হাতে মুঠো-মুঠো ঘুঁষ নিতে লাগলো। গভর্নমেণ্ট মরে মরুক, আগে তো নিজের পেট। আগে নিজের পেট ভরলে তখন গভর্নমেণ্টের ভালোর কথা ভাবা যাবে। তখন কেউ কোনও আর্জি নিয়ে এলেই সামন্ত বলতো—মাল-টাল কিছু এনেছ?

মাল মানে টাকা! টাকা না ছাড়লে সামন্ত কথাই বলবে না। আগে কড়ি ফেল তখন তেল মেখো।

এই হলো বড়বাবু। সেই সামন্তই পুলিস লাইনে থেকে-থেকে শেষকালে একদিন রাঘব-বোয়াল হয়ে উঠলো। মদের গন্ধ একবার নাকে গেলেই হলো, টাকার ছোঁয়াচ একবার পেলেই হলো, মেয়েমানুষের নাম একবার শুনলেই হলো। তখন আর সামন্তকে পায় কে।

সেই একদিন কোথায় কোন্ কেসের ভার নিয়ে কোথায় গিয়েছিল, সেখান থেকে যখন ফিরলো তখন সঙ্গে একটা মেয়ে। মেয়েমানুষ।

সামন্ত জিজ্ঞেস করলে—তোমার নামটা যেন কী?

মেয়েটে বললে—বাতাসী।

—বাতাসী? শুধু বাতাসী? আর কিছু নেই?

মেয়েটা বললে—বাতাসীবালা দাসী।

ও দাসী-ফাসীর দরকার নেই। সেখান থেকে মেয়েটাকে সোজা একেবারে নিয়ে এসে তুললো মাসির বাড়িতে।

সামন্ত গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার এখানে খালি ঘর আছে? এ থাকবে—

মাসি তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেল—ওমা, কী বলছেন বড়বাবু! দরকার হলে আপনার জন্যে আমি ঘর খালি করে দেব—

তারপর বাতাসীর দিকে চেয়ে বললে—কী নাম তোমার মেয়ে?

বাতাসী বললে—বাতাসী—

মাসি বললে—বাঃ, খাসা নাম। যেমন খাসা দেখতে, তেমনি খাসা নাম।

এ হলো সেই দিককার কথা। তখনই সদানন্দকে ভুল করে এই বাতাসীর ঘরেই বসিয়ে দিয়েছিল প্রকাশমামা। আসলে তখন প্রকাশমামাও জানতো না যে ঘরটার ভেতরে আবার একটা মেয়ে এসে জুড়ে বসেছে!

সেই থেকেই বড়বাবু একটা আলাদা বাড়ির সন্ধান করছিল। শেষকালে যখন এ বাড়িটা পেলে তখন এখানেই তুলে নিয়ে এল বাতাসীকে। কিন্তু বাতাসী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও মাসি বাতাসীকে ছাড়লে না। বড়বাবুর মেয়েমানুষকে খাতির করা মানে বড়বাবুকেই খাতির করা।

সেদিনও মাসি এল। বললে—কীরে, বড়বাবুকে ছবিটা দিয়েছিস?

বাতাসী বললে—দিয়েছি মাসি, এখন বড়বাবুর তো মেজাজ, কাজের ভিড়ে যদি ছবিখানা হারিয়ে যায় তো গেল।

—তোকে তো বলেছি তুই টাকা পাবি। বড়লোকের এক মাত্তোর ছেলে, বাড়ি থেকে পালিয়েছে, খুঁজে দিতে পারলে তুইও টাকা পাবি, আমারও দুপয়সা হবে। তুই একটু বাছা মনে করিয়ে দিস আজ। তার মামা এসে আমার বাড়িতে বসে ধরনা দিচ্ছে। বুঝলি, আজকে বড়বাবু এলে খোঁচারি।

কিন্তু যে-সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিন নয়নতারার কাহিনী গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে যে একদিন এমন করে আগুন জ্বলে উঠবে তা সেদিন কেউ কল্পনা করে উঠতে পারেনি। নবাবগঞ্জের মানুষ কেউই এত কাণ্ডের জন্যে তৈরি ছিল না। গ্রামের লোক সবাই যার-যার আপন-সংসার নিয়েই বিব্রত থাকে। তার মধ্যে সবটুকুই কাটে তাস-পাশায়। এরই মধ্যে কারও বউএর ছেলে হয়, কারো আবার ছেলে হয়ে মরেও যায়। ছেলে হলে শাঁখ বাজে, অন্নপ্রাশনে দু'চারজন নেমন্তন্নও পায়। আবার সেই ছেলেই মারা গেলে গলা ফাটিয়ে ছেলের মা দু'চারদিন কাঁদে, তারপর আবার নদীর ঘাটে গিয়ে পাড়ার বউ ঝিদের সঙ্গে ঝগড়াও করে।

তা এবাব অন্য রকম।

প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই সেদিনও এসেছিল বেহারি পালের সঙ্গে কথা বলতে।

বেহারি পাল বললে—সা'মশাই, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, বড় জরুরী কাজ—

সা'মশাই বললে—কী কাজ?

বেহারি পাল বললে—পরশুদিন সকাল বেলার দিকে আপনাকে একবার নবাবগঞ্জে আসতে হবে—

—কেন?

—হ্যাঁ, আমরা দল বেঁধে সবাই সেদিন চৌধুরী মশাই-এর বাড়ি যাবো। আপনাকেও সঙ্গে থাকতে হবে—

প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই অবাক। বললে—কেন? দল বেঁধে চৌধুরি মশাই-এর বাড়ি যাবেন কেন আপনারা?

বেহারি পাল বললে—সে এক কাণ্ড হয়েছে—

—কী কাণ্ড বলুনই না?

প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই-এর কৌতূহল আরো বেড়ে গেল।

বেহারি পাল বললে—তবে একটা কথা আপনাকে চুপি চুপি বলি, কথাটা এখন কাউকেই বলবেন না। চৌধুরী মশাই-এর ছেলের বউ আমাদের সবাইকে যেতে বলেছে—

—চৌধুরী মশাই-এর ছেলের বউ? এই তো সেদিন শাশুড়ি-বউতে খুব ঝগড়া হচ্ছিল শুনতে পাচ্ছিলুম!

বেহারি পাল বললে—হ্যাঁ, সেই ব্যাপারেই ওদের বউ আমার গিন্নীকে ডেকে যেতে বলেছে। বলেছে সবাইকে নিয়ে আসবেন—

তা শুধু প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই-ই নয়, আরো অনেককেই বলা হলো। সে এক সর্বনেশে কাণ্ড ঘটে গেল। বেহারি পালের গিন্নী নিজে গিয়ে সবাইকে বলে এল।

নিতাই হালদারের বিধবা মা বললে—কী, ব্যাপারটা কী বউ-মা, গিয়ে কী হবে?

বেহারি পালের বউ বললে—তুমি গিয়েই দেখো না কী হবে। আমি আগের থেকে কী করে বলবো কী হবে? ওদের বেটার-বউ আমাদের যেতে বলেছে তাই তোমাকে বলছি—

—কখন যাবো?

—কাল। কাল সকাল বেলাই তোমরা সবাই আমাদের বাড়ি যেও, তখন আমরা একসঙ্গে সব যাবো।

—তবে যে সেদিন বলেছিলে কাউকে ঢুকতে দেয় না ভেতরে? বউ-এর সঙ্গে নাকি কাউকে কথা বলতে দেয় না, দেখা করতেও দেয় না—

বেহারি পালের বউ বললে—দেখা করতে না-ই বা দিলে, আমরা যদি জোর করে ঢুকে পড়ি তো কে কী করবে? আমাদের তাড়িয়ে দেবে? তা বলে একটা দুধের মেয়েকে বাড়িতে পুরে কষ্ট দেবে, আর আমরা গাঁয়ের পাঁচজন থাকতে কিছু মুখ ফুটে বলতেও পারবো না? আমরা কি মরে গেছি, না ওদের ভয়ে মুখ বুঁজে বসে থাকবো?

সকলেরই ওই এক কথা। সকলেই বললে—ওদের বাড়ির মধ্যে যদি ওরা বউকে মারে-ধরে তো আমরা পর হয়ে কী করতে পারি?

বেহারি পাল বললে—আমরা সব করতে পারি। দরকার হলে চৌধুরী মশাই-এর বেয়াইকে কেষ্টনগরে খবর দিতে পারি, চাই কি পুলিসেও ডাইরি করতে পারি—

কথাটা অনেকের মনঃপুত হলো, আবার অনেকের মনঃপুত হলোও না। চৌধুরী মশাই গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক। অনেকেই আবার নানাভাবে চৌধুরী মশাই-এর কাছে উপকৃত। অনেকের টিকিও আবার চৌধুরী মশাই-এর কাছে বাঁধা। পালে-পার্বণে চৌধুরী মশাই-এর বাড়িতে বলতে গেলে সবাই-ই পাত পেড়ে খেয়ে এসেছে। শুধু চৌধুরী মশাইই নয়, কর্তাবাবু যখন সক্ষম মানুষ ছিলেন তখন সবাই তাঁকে ভয়-ভক্তি-সমীহ করে এসেছে। এই তো সেদিন কর্তাবাবুর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম, তার কয়েক মাস আগে ছেলের বিয়েতেও খুব ঘটা হয়েছিল। তখনও কত আদর-আপ্যায়ন পেয়েছি। এখন চৌধুরী মশাই-এর অবস্থা একটু কমজোরী হয়েছে বলে কি একেবারে মুখের ওপর কথা বলবো? মাথার ওপর তো এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে। এখনও তো কলি উল্টে যায়নি।

কিন্তু এত কাণ্ডের পেছনে যে কী হয়েছিল তা কেউ প্রত্যক্ষভাবে জানে না।

বেহারি পালের বউ বললে—তবে বলি শোন খুড়ীমা, আসলে কী হয়েছিল...

এ যেন যাত্রা-থিয়েটার-কবিগানের মত ঘটনা। সেদিনও অনেক রাত। সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। চৌধুরী-বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে তখন। কর্তাবাবু মারা যাবার পর থেকেই

কৈলাস সামন্তের কাজ কমে গেছে। সে সকাল-সকাল বাড়ি চলে যায় তখন। দীনুরও তেমন কোনও জরুরী কাজ থাকে না। এক চণ্ডীমণ্ডপের সেরেস্তার পরমেশ মৌলিক অনেকক্ষণ খেরো খাতাখানা নিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে। যখন চৌধুরী মশাই উঠতে বলে তখন সে উঠে হারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। তা তখন সে-ও বাড়ি চলে গেছে।

তা ইতিহাসের এও এক অমোঘ পরিহাস বই কি। একজন হর্ষনাথ নিচেয় নামে, তার জায়গায় আর একজন নরনারায়ণ চৌধুরী ওঠে। প্রাণলক্ষ্মী বোধহয় এমনিই রহস্যময়ী। তাই বোধহয় সে একজনের ঘরে সপ্রতিষ্ঠ থাকতে চায় না। একজনের ঐশ্বর্য যখন দম্ভের আকাশ ছুঁয়ে ঈশ্বরকে নাগালের মধ্যে পেতে চায় তখন সে বুঝি অন্য আর একজন লোকের উদার আশ্রয় খোঁজে। ঐশ্বর্য যখন অত্যাচারের প্রতীক হয়ে ওঠে তখনই বোধহয় প্রাণলক্ষ্মীর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। সে তখন নিঃশব্দে সকলের অগোচরে কণ্টক আশ্রয়ের অবরোধ ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বলে—আমাকে বাঁচতে দাও দিদিমা, আমাকে বাঁচাও—

কিন্তু কে শোনে কার কথা! তার আর্তনাদ হয়ত কারোর কানেই পৌঁছোয় না কোনভাবে। নবাবগঞ্জের লোক তখন নেশার ঘোরে ঘুমোবে, না প্রাণলক্ষ্মীর যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ শুনবে! কার এত সময় আছে? এমনি করে হয়ত মাসের পর মাস প্রাণলক্ষ্মীর কান্না গুমরে গুমরে একদিন মুখর হয়ে ওঠে, তখন সে গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, নগর জনপদ মহাদেশ ছেড়ে আর এক মহাদেশ, আর এক যুগের আশ্রয়ের জন্য প্রতিক্ষা করে। তখন সেই মহাদেশ সেই যুগ আবার কিছুদিনের জন্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে প্রাণলক্ষ্মীর আশীর্বাদে। আবার ধন-ধান্যে ঐশ্বর্যে-শান্তিতে ভরে ওঠে সে যুগ। আবার ধন্য হয়ে ওঠে মানুষের সমাজ। ইতিহাসের এমনি নিয়ম। এই নিয়মের এতদিন পৃথিবী চলে আসছে, হয়ত কোটি-কোটি বছর এই নিয়মেই চলবে।

সেদিন কী সৌভাগ্য হয়েছিল কে জানে। শুধু একজন তার কান্না শুনতে পেলে।

দিদিমা সেদিন অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল। ডাকাডাকিতে জেগে উঠলো। বললে—কে? কে?

বড় আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল নয়নতারা। দরজা খুলতেও তার ভয় হচ্ছিল সেদিন। মনে হলো কে যেন তার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বউমা, বউমা—

বাইরে থেকে শাশুড়ির গলা। বউমা, খিল দিয়ে শুয়েছ কেন? তোমায় বলেছি না দরজা খুলে শোবে! তবু দরজা বন্ধ করেছ? খোল দরজা, দরজা খোল—

না, নয়নতারা তখন তার বুকখানাকে পাথর করে ফেলেছে। কিছুতেই সে দরজা খুলবে না। যে যতই বলুক তাকে কেউ অপবিত্র করতে পারবে না। দম্ভের লেহন সে প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবে।

তারপর আবার শাশুড়ির সেই চিৎকার—কথা শুনছো না যে, খোল দরজা—

নয়নতারা ঘরের মধ্যে পাথরের মত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখা যাক, কে কী করে। দরজা যদি ভেঙে ফেলতে চায় তো ভেঙে ফেলুক। দরজা ভেঙে যদি ভেতরে ওরা ঢুকতে চায় তো ঢুকুক। তোমাদের পীড়নে আমি নতজানু হবো না, আত্মসমর্পণ করবো না কারোর কোনও প্ররোচনায়।

—খুলবে না তো দরজা? ঠিক আছে, দেখি তুমি কত বড় শয়তান মেয়ে হয়েছো...

বৃষ্টি তখন আরো জোরে জোরে পড়ছে। পাশের বাগানের গাছগুলোর পাতায় তখন আরো আলোড়ন চলেছে। পৃথিবী বোধহয় রসাতলে তলিয়ে যাবে তখন। নয়নতারা তখন স্থাণুর মত ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনছে।

কে জানে কেন, তারপর আর দরজায় ধাক্কা পড়লো না। নয়নতারা জানলাটা খুলে বাইরে চেয়ে দেখলে। তার মনের ভেতরের সমস্ত আলোড়ন যেন বাইরের প্রকৃতিতে প্রতিরূপ গ্রহণ

করেছে। বাইরে যা ঘটছে সে যেন আর শুধু বাইরেরই নয়, তার ভেতরেরও। ঝড়-বৃষ্টিতে ভেতর আর বাহির তার কাছে যেন একাকার হয়ে গেছে।

নয়নতারা জানালা বন্ধ করে দিয়ে আবার তার বিছানায় এসে বসলো। কে তাকে বাঁচাবে! কে তাকে আশ্রয় দেবে! যে ছিল আশ্রয়-দাতা সে নিজের আদর্শ নিয়েই নিরুদ্দেশ। সত্যিই তো, তোমার কাছে যদি আমার নিরাপত্তার চেয়ে তোমার নিজের আদর্শই বড় হয় তো হোক, আমি আর কোনও দিন তোমার কাছে আশ্রয়ের জন্যে ভিক্ষে চাইতে যাবো না। তোমার ভীরুতাই তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। একদিন আমিও যেদিন আমার আশ্রয় খুঁজে নিতে আরো দূরে সরে যাবো সেদিন তোমার ভীরুতাই আমাকে সাহস যোগাবে। আমাকে পথ দেখাবে!

অনেকক্ষণ পরে মনে হলো বৃষ্টিটা যেন একটু থেমেছে। জানালার বাইরে তখন আর বাতাসের দাপাদাপি নেই। নয়নতারা কান পেতে শুনতে চাইলে কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কি না। কেউ কোথাও জেগে আছে কি না।

তারপর যখন নিশ্চিন্ত হলো তখন আবার দরজা খুললো সে। খুব আস্তেই দরজা খুলতে হলো যাতে কেউ না জেগে ওঠে। তারপরে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলে না কী করবে সে। তবে কি এখান থেকে সে চলে যাবে? যেমন করে তার আশ্রয়-দাতা একদিন তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তেমনি করে এ-বাড়ি ত্যাগ করবে!

দিদিমার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

ফকির আবার ডাকলে—মা—মা—

এবার দিদিমা উঠে পড়লো। বললে—কে রে? ফকির?

ফকির বেহারি পালের মুহুরি। বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে গোলাঘরের পাশে থাকে।

ফকির বললে—মা, ও-বাড়ির বউমা তোমাকে ডাকছেন।

বেহারি পালের বউ বললে—ও-বাড়ির বউমা? আমাকে ডাকছে?

ফকির বললে—হ্যাঁ, মা—

—তা তুই কী করে জানলি? তোকে কি ডাকলে?

—হ্যাঁ, কুয়োতলা থেকে আমাকে ডেকে বললেন তোমাকে ডেকে দিতে—

বেহারি পালের বউ আর দাঁড়ালো না। একেবারে সোজা বাগানের শেষ প্রান্তে চলে এল। একটু আগেই ঝড়-বৃষ্টি হয়ে জল-কাদা-পেছল হয়ে গেছে চারদিকে। শুকনো পাতা পড়ে জায়গাটা ভরে গেছে। তারই ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে একেবারে গোলাঘরের পেছনে বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো। বেড়ার ঠিক ওপারেই চৌধুরীদের কুয়োতলা। সেই কুয়োতলার চারপাশে ভ্যারেণ্ডাগাছের ঝোপ্। রাত্তির বেলা সেখানে সাপ-খোপ থাকতে পারে। কিন্তু সে-সব ভয় করতে গেলে নয়নতারার চলবে না।

দিদিমা বেড়ার ওপারে এসেই নয়নতারাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—কী বউমা। তুমি ডেকেছ আমাকে?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ দিদিমা, আমাকে এরা মোটে বেরোতে দেয় না। পাছে আপনার কাছে চলে যাই। চারদিকে দরজায় চাবি দিয়ে রেখে দেয়—এক দণ্ডের জন্যে বেরোতে দেয় না—

—আমিও বউমা ক'দিন থেকে তোমার কথা খুব ভাবছি। তোমার শাশুড়ি তো আমাকেও ঢুকতে দেয় না তোমাদের বাড়িতে, পাছে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাই। সেদিন তোমার চেঁচামেচি শুনে আমি তোমাদের ভেতর-বাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলুম, কিন্তু তোমার শাশুড়ি আমাকে যাচ্ছেতাই করে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। তারপর থেকে আর চেষ্টা করিনি—। তা আজ যে বড় তুমি আমাকে ডাকলে? তোমার শাশুড়ি জানতে পারবে না?

নয়নতারা বললে—আমি আর কাউকে ভয় করি না দিদিমা। আমি এতদিন অনেক সহ্য করেছি, আর সহ্য করবো না ঠিক করেছি—

দিদিমা বললে—কিন্তু আমি তো বুঝতে পারি না তোমার দোষটা কী? তোমার ওপর কেন তোমার শাশুড়ির এত রাগ—

নয়নতারা বললে—দোষ আমার অনেক দিদিমা, সত্যি আমার অনেক দোষ। আজও আমার ঘরে একজন ঢুকতে চেয়েছিল—আমি তাই এ-ক'দিন রোজ রাত্তিরে দরজায় খিল দিয়ে শুচ্ছি! আজকে আমার শাশুড়ি শাসিয়ে গেছে, বলেছে এবার দেখে নেবে আমি কত বড় শয়তান মেয়ে—

—সে কী? এই কথা তোমাকে বলেছে? কেন, তুমি কী করেছিলে?

—ওই যে আমি ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শুয়েছি!

—তা দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে অপরাধটা কী করেছ তুমি? তুমি একলা ঘরে শুয়ে থাকো, দরজায় খিল তো দেবেই। খিল দেবে না?

নয়নতারা বললে—না, শাশুড়ি চায় আমি রোজ দরজার খিল খুলে রেখে দিয়ে শুই—

—সে কী বউমা? কেন? এ তো ভালো কথা নয়!

নয়নতারা বললে—সেই কথা বলতেই তো আমি আজকে কুয়োতলায় এসেছি।

—কিন্তু তুমি দরজার খিল বন্ধ করে শুলে তোমার শাশুড়ির কীসের লোকসান?

নয়নতারা বললে—লোকসান আছে দিদিমা।

—কী লোকসান? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নয়নতারা বললে—বলছি তো, সেই কথা বলতেই এত রাত্তিরে আপনাকে ডেকেছি দিদিমা। আপনি শুনুন মন দিয়ে। আমি যা বলবো তা লুকিয়ে ছাপিয়ে বলবো না, আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মুখের সামনেই বলবো, গ্রামের দশজনকে শুনিয়ে বলবো।

দিদিমা বললে—তার মানে কী বউমা? তুমি কী বলছো আমি তো তার কিছুই বুঝতে পারছি না—তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির মুখের সামনে কী বলবে?

নয়নতারা বললে—কী বলবো তা তখনই আপনারা সবাই শুনতে পাবেন—কিন্তু আপনার আসা চাই দিদিমা, দাদামশাইকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন আপনি। আর গাঁয়ের যাঁরা-যাঁরা মাতব্বর লোক তাঁদের সবাইকে নিয়ে আসবেন আমাদের বাড়িতে—

দিদিমা আরো অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখে কোনও কথা বেরোল না।

নয়নতারা বললে—আসবেন তো দিদিমা ঠিক! যদি না আসেন তো আমার এ মুখ আর আপনারা দেখতে পাবেন না। জানবেন আমি নির্ঘাত আত্মঘাতী হবো, এই আপনাকে আজ আমি বলে রাখছি—

দিদিমা বললে—ছিঃ বউমা, ও-কথা মুখে আনতে নেই। তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে, ও-কথা কি বলতে আছে কখনও?

নয়নতারা বললে—না, আমি যা বলছি তা ঠিকই বলছি। বলুন আপনারা ঠিক আসবেন? আসবেন বলুন?

দিদিমা বললে—তা আসবো—

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ আসবেন। সকলকে ডেকে নিয়ে আপনারা দল বেঁধে আসবেন—

দিদিমা বললে—অন্য লোকের কথা বলতে পারি নে বউমা, দেখবো চেষ্টা করে। আর তোমার দাদামশাইকে বলবো আরো দশজনকে বলতে। পাড়া-গাঁয়ের ব্যাপার, বুঝতেই তো পারছো? কে আসে না-আসে তা আগে থেকে কিছুই বলা যায় না—

—তবু আপনারা চেষ্টা করবেন সকলকে আনতে। আর যদি কেউ না আসতে চায় তবু

আপনি আর দাদামশাই নিশ্চয় আসবেন—

দিদিমা বললে—কিন্তু বউমা, তুমি তো বলছো আসতে, কিন্তু যদি আমাদের ভেতরে ঢুকতে না দেয়? সেদিন ঢুকতে গিয়ে কি অপমানটা আমাকে সইতে হলো তা তো তুমি জানো। তাই ভাবছি অপমান করলে তখন কী করবো?

নয়নতারা বললে—তখন তো আমি আছি দিদিমা। আপনারা আমার নাম করবেন। বলবেন আপনার বউমা আমাদের ডেকেছে—। আর আপনারা এসেছেন জানলে আমিই ভেতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবো—

দিদিমার তবু যেন ভয় গেল না। বললে—কী জানি বউমা, শেষকালে যদি কিছু হয়?

—কী আর হবে?

তখন যদি তোমার শাশুড়ি তোমার ওপর আরও হেনস্থা করে?

নয়নতারা বললে—হেনস্থার আর বাকি কী রেখেছে দিদিমা! হেনস্থার আর কতটুকু আপনারা জানেন আর কতটুকু আপনারা কল্পনা করতে পারেন? হেনস্থার আমার কিছুই বাকি নেই দিদিমা, হেনস্থার চরমে এসে ঠেকেছে এখন, নইলে এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে এই কুয়োতলায় এসে এমন করে আপনাদের মুহুরিকে দিয়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে আপনাকে ডেকে পাঠাই? আপনি বুঝতে পারছেন না দিদিমা যে আমি মরে বেঁচে আছি? দিনের আলো হলে বুঝতে পারতেন আমার চোখে এখন আর জল বেরোয় না, শরীরে বোধ হয় রক্তও নেই আমার, নইলে চোখ দিয়ে হয়ত রক্তই বেরোত। কিন্তু এখন আর জলও বেরোয় না, রক্তও বেরোয় না, এখন আমি বুকটাকে পাথর করে ফেলেছি দিদিমা—সেদিন আমি সব বলবো, আপনাদের সব বলবো, কোনও কথা লুকিয়ে রাখবো না—

বলতে বলতে নয়নতারা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

দিদিমা বললে—আচ্ছা বউমা, তুমি এখন যাও, শেষকালে আবার তোমার শাশুড়ি দেখতে পেলে অনথ বাধাবে। আমরা ঠিক যাবো, কাল বাদে পরশু ঠিক যাবো। কালকের দিনটায় সকলকে খবর দিতে হবে, তারপর পরশু শুক্কুরবার, সেদিন সকাল বেলাই যাবো—

এর পরে নয়নতারা আর দাঁড়ায়নি সেখানে। যেমন এসেছিল তেমনি আবার নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

বেহারি পালের বউ বাড়িতে এসে নিজের ঘরে ঢোকবার আগে একবার কর্তাকে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠালে—ওগো শুনছো?

বেহারি পালের ঘুমে তখন চোখ জুড়ে ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। বললে—কী হলো আবার? আবার কী হলো?

নয়নতারা বারান্দাটার কাছে গিয়ে টিপি টিপি পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে তখন আবার ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো।

পৃথিবীতে যারা একটা বাঁধা-ধরা পথ ছেড়ে হঠাৎ অন্য পথ ধরে তাদের কেউ পাগল বলে, কেউ বলে প্রতিভা। কিন্তু সদানন্দ পাগলও নয়, প্রতিভা তো নয়ই। সাধারণ গ্রামের একজন ছেলে মাত্র। কিন্তু কেমন করে যেন এই সাধারণ সংসারের সাধারণ নিয়মগুলোর বিরুদ্ধেই সে একদিন বিদ্রোহ করে বসলো। অথচ আপোস-রফা করে চললে তার তো কোনও দুঃখই ছিল না। বেশ আরামে সংসারের একজন হয়ে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো।

সমরজিৎবাবু যখন সদানন্দকে প্রথম দেখেছিলেন তখনই বুঝতে পেরেছিলেন ছেলেটার মধ্যে যেন কোথায় একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। শুধু আলাদাই নয়, যেন বিশেষ একজনও বটে।

প্রথমে সদানন্দকে দেখেই গৃহিণী জিজ্ঞেস করেছিল—এ কে গো? একে কোত্থেকে আনলে?

সমরজিৎবাবু বলেছিলেন—একে নিয়ে এলুম সঙ্গে করে—এ আমার কাছে থাকবে—

সেকালের আদর্শ সংসার। ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে সংসার জম-জমাট। কত লোক এসে বাড়িতে থাকছে, খাচ্ছে, আবার একদিন চলেও যাচ্ছে। দেশের কোনও অনাত্মীয় লোক হয়ত রোগের চিকিৎসা করতে কলকাতায় এল। কিন্তু উঠবে কোথায়? চলো, সরকার মশাই-এর বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাক। তারপর চিকিৎসা করতে হয়ত একমাস দু'মাস লাগলো। ততদিন এখানেই থাকো, এখানে খাও, এখানেই রাত্তিরে ঘুমোও।

সদানন্দ ঘটনাচক্রে এসে এই রকম এক সংসারেই আশ্রয় পেলে।

সমরজিৎবাবুর সঙ্গে হঠাৎ রানাঘাট স্টেশনে দেখা হয়ে গিয়েছিল সদানন্দর। এমন তো কত লোকের সঙ্গে কত লোকেরই দেখা হয় কত জায়গায়। তা বলে কেউ তো কাউকে একেবারে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে না!

সমরজিৎবাবু বলেছিলেন—তুমি আমাদের বাড়ি যাবে?

সদানন্দ বলেছিল—আপনি নিয়ে গেলে যাবো।

—কিন্তু তোমার বাবা-মা, তোমার আত্মীয়-স্বজন, তারা?

সদানন্দ বলেছিল—তারা সবাই আছে—

—তাহলে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি সেদিন সদানন্দ। সমরজিৎবাবু ভূয়োদর্শী লোক। অনেক দেখে, অনেক শুনে, অনেক ভুগে এক-একজন ভূয়োদর্শী হয়। কিন্তু অনেকে আবার জন্মসংস্কারের বশেই সংসারে ভূয়োদর্শী হয়ে জন্মায়। সমরজিৎবাবু হয়ত তাদেরই দলে। অনেক টাকার মালিক হলেই কেউ পুঁজিপতি হয় না, কিম্বা নিঃসম্বল হলেই কেউ সর্বহারা লক্ষ্মীছাড়া হয়না। সমরজিৎবাবুর সব কিছু থেকেও নিজে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত মানুষ। অন্তত নিজের বাড়িতে তিনি নিরাসক্ত হিসেবে জীবন-যাপন করতেন। ঐশ্বর্য তাঁকে স্পর্শ করতো না বলে পরের দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করবার মত অন্তঃকরণটা তাঁর ছিল।

কিন্তু পৃথিবী তার দাবী কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়ে তবে তো মানুষকে মুক্তি দেয়। তাই বোধহয় সমরজিৎবাবুরও টাকার প্রয়োজন তখনও ফুরিয়ে যায়নি।

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন—তা কোথায় পেলে তুমি ওকে?

সমরজিৎবাবু বললেন—রানাঘাট স্টেশনে—

গৃহিণী বললেন—ইস্টিশানে একজন অচেনা লোককে দেখলে আর তাকে বাড়িতে এনে তুললে? ওকে দিয়ে কী কাজ হবে তোমার?

সমরজিৎবাবু বললেন—এই দেখ তোমার বুদ্ধি, আমি কি ওকে কাজ করাবার জন্যে বাড়িতে এনে তুলেছি? আমার যারা আছে তারা সবাই-ই কি কাজের লোক? তুমি যে টবে গণ্ডা গণ্ডা ফুলগাছ পুঁতেছ, ফুলগাছ দিয়ে কি তোমার কিছু কাজ হয়?

গৃহিণী বললে—ওমা, ফুলগাছ পুঁতেছি তো ফুলের জন্যে—

—তা সদানন্দকেও একটা ফুল বলে মনে করো। ফুলগাছে যেমন জল দিতে হয়, ওকেও না হয় তেমনি ভাত খেতে দিলে। সংসারে মানুষের জঙ্গলের মধ্যে ওই সদানন্দর মত এক-একজন মানুষ ফুল হয়েই জন্মায়—এইটে ভুলে যেও না—

গৃহিণী কর্তার কথায় খুশি হলো না। সমরজিৎবাবু বললেন—কথাটা তোমার পছন্দ হলো না তো? তা তো হবেই না!

গৃহিণী বললে—তা অচেনা-অজানা মানুষকে বাড়িতে এনে তুললে রাগ হবে না? সেবার তো তুমি পুরী থেকে ওমনি একটা ছেলেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে, শেষকালে সে তোমার ঘড়ি চুরি করে পালালো না? শেষকালে এও যদি সেই রকম হয়?

সমরজিৎবাবু বললেন—হলে হবে! না হয় কিছু চুরি করেই পালাবে! ঘড়ি চুরি হওয়াতে কি আমি রাস্তার ভিখিরি হয়ে গেছি? কী জানো, অবিশ্বাস করে লাভ করার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো—

—তাহলে তুমি ঠকো—বলে গৃহিণী রাগ করে চলেই যাচ্ছিল।

সমরজিৎবাবু বললেন—চলে যেও না, চলে যেও না, দাঁড়াও—

বলে এক কাজ করলেন। বলে নিজের চেয়ার থেকে উঠলেন। তারপর দেরাজ থেকে পাঁচশো টাকা বার করলেন। পাঁচটা একশো টাকার নোট।

গৃহিণী কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে—টাকা বার করছো কীসের জন্যে?

—দেখ না, কী করি!

বলে সদানন্দ ডেকে পাঠালেন। সদানন্দ আসতেই সমরজিৎবাবু বললেন—একটা কাজ করতে পারবে বাবা, এই পাঁচশো টাকা পোস্টাফিসে গিয়ে মনিঅর্ডার করে আসতে পারবে?

সদানন্দ বললে—দিন, কিন্তু কোন্ ঠিকানায়, কার নামে মনি-অর্ডার করবো?

সমরজিৎবাবু একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিলেন। বললেন—এই নাও, রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশনের নামে—

বলে কাগজটা এগিয়ে দিলেন সদানন্দর দিকে। সদানন্দ কাগজটা আর নোটগুলো নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

গৃহিণী বললে—এতগুলো টাকা তুমি দিলে বিশ্বাস করে? যদি পালিয়ে যায়?

সমরজিৎবাবু বললেন—চাঁদা তো আমায় দিতেই হয়। দান-খয়রাতের টাকা যদি খোওয়া যায় তো যাবে। বিশ্বাস করে না হয় ঠকলুমই—

কিন্তু না, আধঘন্টার মধ্যেই আবার সদানন্দ ফিরে এল। হাতে মনি-অর্ডারের রসিদ।

—করেছ?

সদানন্দ বললে—করেছি, কিন্তু আমি আর এখানে থাকবো না কাকাবাবু, আমার থাকতে আর ভালো লাগছে না।

—কেন?

—আমার মনে হচ্ছে আপনি মনিঅর্ডার করবার জন্যে আমাকে পাঠাননি, আপনি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে আপনি অবিশ্বাস করেছেন—বলুন আপনি আমায় অবিশ্বাস করেছেন কি না?

সমরজিৎবাবু হাসলেন। হেসে গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন—কী উত্তর দেবে দাও, সদানন্দর কথার জবাব দাও—

গৃহিণী বললে—আমি কী জবাব দেব?

সমরজিৎবাবু বললেন—অবিশ্বাস তোমায় আমি করিনি সদানন্দ। অবিশ্বাস করেছে তোমার কাকীমা। তোমার কাকীমার জন্যেই আমি তোমায় পরীক্ষা করলুম—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আপনি তো জানেন আমি নিজে থেকে আপনার এখানে আসতে চাইনি—আপনিই আমাকে জোর করে আপনার বাড়িতে নিয়ে এলেন।

তা সত্যি! রাণাঘাট স্টেশনে তখন শেষ রাত। রাধার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদানন্দ সোজা স্টেশনেই এসেছিল। ভেবেছিল আর যেখানেই সে যাক নিজের বাড়িতে সে আর যাবে না।

—না বাবা, এর পরে আর তোমাকে যেতে দিতে পারবো না। অবিশ্বাস আমিই করি আর তোমার কাকীমাই করুক, ও একই কথা, অপরাধ আমাদের দুজনেরই—

কাকীমা বললে—তুমি কিছু মনে কোর না বাবা, এর আগে অনেকবার উনি ঠকেছেন তো, তাই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তোমার কাকাবাবুর কিছু দোষ নেই, দোষ আমারই। সব মানুষ কি সমান হয় বাবা? তুমিই বলো না সমান হয়?

সমরজিৎবাবু বললেন—আমি তোমাকে বললুম সদানন্দ তেমন ছেলে নয়, তবু তুমি কেন সন্দেহ করলে? তোমার জন্যেই তো এই কাণ্ড হলো! এখন তুমি সামলাও।

গৃহিণী রেগে গেল। বললে—তুমি কেবল আমার দোষই দেখলে। তোমাকে তো সংসার করতে হয় না। সংসার যে করে সে বোঝে! এই এতগুলো লোক কী খাবে, কী পরবে, সে কি তুমি কোনও দিন ভেবেছ? সব তো সেই আমাকে ভাবতে হবে।

সমরজিৎবাবু বললেন—ওই দেখ তুমি আবার ঝগড়া আরম্ভ করলে? আমি ঝগড়ার কথাটা কী বলেছি তোমাকে? তুমিই তো কেবল বলতে জানা-নেই শোনা-নেই কাকে বাড়ির মধ্যে তুললে—

সদানন্দ দেখলে তাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীতে কথা-কাটাকাটি হতে হতে প্রায় ঝগড়ার উপক্রম হতে চলেছে। সদানন্দ কথার মধ্যেখানেই বাধা দিলে।

বললে—কেন আপনারা আমার মত একটা সামান্য লোককে নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করছেন, তার চেয়ে আমি বরং চলে যাই—

সমরজিৎবাবু বললেন—হ্যাঁ, তুমি চলেই যাও বরং, তোমাকে আনা আমারই দোষ হয়েছিল—

কাকীমা বললে—না, তুমি যেতে পারবে না, তোমার কাকাবাবু বরাবর আমার নামে দোষ দিতে পারলে আর ছাড়বেন না। কেন, আমি কী অন্যায়টা করেছি শুনি? সেবার তোমার ঘড়ি চুরি যায়নি? সেবার কী আমি উটকো লোক ঘরে এনে তুলেছিলুম?

সদানন্দ বললে—কেন অশান্তি করছেন কাকীমা, আমি তো বলছি আমি উটকো লোক, আমি চলে যাচ্ছি—

কাকীমা এবার সদানন্দের দিকে চেয়ে বললে—তুমি থামো তো, তোমার যাওয়া হবে না। তোমাকে যেতে দিলে তবে তো তুমি যাবে!

সমরজিৎবাবু বললেন—বাঃ, তুমি তো বেশ, এদিকে ওকে বিশ্বাসও করবে না, আবার ওকে চলে যেতেও দেবে না, এতো বেশ মজা—

কাকীমা হয়তো কাকাবাবুর কথায় রেগে গিয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সদানন্দ বললে—ঠিক আছে, কাকীমা, আপনি থামুন, আমি যাব না, আমি থাকবো—

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে—মা, দাদা-বাবু এসেছে—

—খোকা এসেছে? খোকা এসেছে?

সমরজিৎবাবুও যেন একটু উৎসুক হয়ে উঠলেন। বললেন—কে? খোকা? এতদিন পরে খোকা এলো?

কাকীমা আর দাঁড়ালো না। সোজা ভেতরে চলে গেল।

কে-ই বা খোকা আর সেই খোকা এলে এত হৈ-চৈই বা কেন তা সদানন্দ সেদিন

জানতো না। খোকা আসার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমরজিৎবাবু আর কাকীমার মুখের চেহারা আমুল বদলে গেল।

সদানন্দ ঘর ছেড়ে চলে আসতে যাচ্ছিল। বললে—আমি আসি কাকাবাবু—

সমরজিৎবাবু বললেন—আসি মানে? তুমি চলে যাচ্ছো? এই যে এখখুনি তুমি বললে তুমি যাবে না! আবার চলে যাচ্ছো যে? যদি যেতে হয় তো তোমার কাকীমাকে বলে যাবে। আমি কিছু জানি না—

সদানন্দ আর কথা না বলে একতলায় চলে এল। এসে নিজের ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে সারা বাড়িময় যেন হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেছে। চাকর-ঠাকুর-ঝি সবাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে দাদাবাবুর আসবার খবর পেয়ে। কে দাদাবাবু? এতদিনের মধ্যে একদিনও তো সে-দাদাবাবুর নাম শোনেনি!

মহেশ শশব্যস্ত হয়ে ওপরের দিকে যাচ্ছিল। সদানন্দ তাকেই ডাকলে। বললে—কে এসেছে গো!

মহেশের তখন কথা বলবার সময় নেই। বললে—দাদাবাবু—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—দাদাবাবু কে?

কিন্তু সে-কথার জবাব দেবার মত সময় মহেশের ছিল না। তার আগেই সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সদানন্দ সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে মনে হলো যেন একটা গাড়ির আওয়াজ হলো। গাড়িটা বোধহয় দাদাবাবুকে নামিয়ে দিয়েই আবার চলে গেল। তারপর সেখানে দাঁড়িয়েই সদানন্দ দেখলে একটা সাদা কোট-প্যান্ট পরা লোক ভারি জুতো পরে দুম্-দুম্ শব্দ করতে করতে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। তারপর ভেতরে ঢুকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। পেছন থেকে মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু মনে হলো দাদাবাবুর বয়েস খুব কম নয়। পেছন থেকে দেখে যতটুকু বোঝা যায় তাতে মনে হলো—ত্রিশ কি বত্রিশ বছর। কিন্তু বেশ ভালো স্বাস্থ্য।

মহেশ আবার তর-তর করে নিচেয় নেমে এসে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল।

সদানন্দ তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

মহেশ এসে বললে—আপনি তখন কী বলছিলেন আমাকে?

সদানন্দ বললে—বলছিলুম কে এলেন?

—দাদাবাবু।

—দাদাবাবু? দাদাবাবু কে?

মহেশ বললে—আজ্ঞে বাবুর ছেলে। এই একই ছেলে বাবুর! এই এখ্খনি বাড়িতে এলেন কিনা, তাই বউদিদিকে খবর দিতে গিয়েছিলুম।

তবু কথাটা কেমন দুর্বোধ্য লাগল সদানন্দের কাছে। এ-বাড়ির ছেলেই যদি হয় তো তাহলে এত হৈ-চৈ কেন? বাড়ীর ছেলে বাড়িতে আসবে তার জন্যে সবাই এত সন্ত্রস্তই বা কেন?

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—দাদাবাবু কোত্থেকে এল?

লোকটা গলা নিচু করে বললে—দাদাবাবু তো রোজ বাড়িতে থাকে না, অনেক দিন পর পর বাড়িতে আসে, তাই—

এরপর আর কিছু কথা জিজ্ঞেস করা ভালো হবে কি না বুঝতে পারলে না সদানন্দ। এ-বাড়িতে সে নতুন এসেছে। বলতে গেলে সমরজিৎবাবু তাকে জোর করেই ধরে নিয়ে এসেছেন। তার পক্ষে এত কৌতূহল থাকা ভালো না।

কিন্তু মহেশ নিজে থেকেই আবার বলে ফেলল—দাদাবাবু পুলিসে চাকরি করে কি না, তাই বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় দাদাবাবুকে। এই তো দাদাবাবু এখন এল, এখুনি খাওয়া-দাওয়া করে আবার আপিসে চলে যাবেন—

এতক্ষণে বুঝতে পারলে সদানন্দ। মহেশও চলে গেল। সদানন্দ তার নিজের ঘরখানার মধ্যে এসে ঢুকলো। কোথায় কী করতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, আর কোথায় বৌবাজারের কোন্ এক সংসারের ভেতরে একেবারে অন্দরমহলে এসে ঢুকে পড়ল। অচেনা অনাত্মীয় লোক। কোনও দিন কোনও সূত্রে এদের সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না। অথচ এই কদিনের মধ্যেই একেবারে একাকার হয়ে গেল সে কেমন করে?

আসলে এর পেছনে যা কিছু কৃতিত্ব সবই সমরজিৎবাবুর। সেই রাণাঘাটের অন্ধকার প্লাটফরমের ওপর সেদিন যদি সদানন্দ না থাকতো তো সমরজিৎবাবুর অনেক টাকার লোকসান হয়ে যেত। ট্রেন তখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। সদানন্দ ব্যাগটা নিয়ে এক লাফে ট্রেনে উঠেই বললে—এই ব্যাগটা কি আপনার? আপনি ফেলে যাচ্ছিলেন—

সমরজিৎবাবু তখন গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন। অত রাত্রে অন্ধকারে তিনি যে ট্রেনে উঠতে পেরেছিলেন তাই-ই যথেষ্ট। হঠাৎ অচেনা একটা গলার শব্দে ছেলেটার দিকে চাইতেই দেখলেন সে তাঁর ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই অবাক হয়ে গেছেন। এই ব্যাগটার মধ্যেই তো তাঁর টাকা-কড়ি যা-কিছু সর্বস্ব।

তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ, এটা তো আমারই ব্যাগ—কোথায় পেলে তুমি?

—প্লাটফরমের ওপর পড়ে ছিল, অন্ধকারে বোধহয় আপনার সঙ্গের লোক দেখতে পায়নি—

সমরজিৎবাবু বললেন—এই দেখ মহেশের কাণ্ড—মহেশ তো থার্ড ক্লাসের কামরায় রয়েছে—ভাগ্যিস তুমি ছিলে তাই বাবা, নইলে তো আমার সব্বোনাশ হয়ে যেত—

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। সদানন্দ বললে—তাহলে আমি আসি—

বলে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে যাচ্ছিল। সমরজিৎবাবু বললেন—আরে, করছো কী, করছো কী? কাটা পড়ে যাবে যে—

বলে সদানন্দর হাতটা চেপে ধরলেন। তারপর নিজের কাছে বসিয়ে বললেন—বোস এখানে, পরের স্টেশনে নেমে যেও—

ট্রেন তখন সত্যিই জোরে চলতে আরম্ভ করেছে। সদানন্দ আর নামতে পারলে না।

সমরজিৎবাবু বললেন—তোমার তো টিকিট নেই, স্টেশনে যদি টিকিট চায় তো টিকিট দেখাবে কী করে? সঙ্গে টাকা আছে?

সদানন্দ বললে—না—

—টাকা নেই? আমার কাছে টাকা আছে, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি, এই নাও—

বলে একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বার করে সদানন্দর দিকে এগিয়ে দিলেন।

সদানন্দ বললে—দশ টাকা নিয়ে কী করবো? এক টাকার বেশি তো লাগবে না। আর আপনার ঠিকানাটা আমায় দিন, যদি কম লাগে তো বাকি পয়সা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব—

সমরজিৎবাবু অবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। এমন কথা তো কেউ বলে না আজকাল! এ কী ধরনের ছেলে!

বললেন—তোমার নাম কী? থাকো কোথায়?

একে একে অনেক প্রশ্ন করলেন সমরজিৎবাবু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন। সদানন্দও কিছু-কিছু উত্তর দিলে। কিন্তু সমরজিৎবাবুর কেমন যেন সন্দেহ হলো। তিনি বুঝতে পারলেন

ছেলেটা আসল খবরটা বলতে চাইছে না। এইটুকু শুধু বুঝলেন যে সৎবংশের ছেলে, কিন্তু কোনও কারণে বাড়িতে আর ফিরে যেতে চায় না।

শেষকালে দশ টাকার একটা নোট সদানন্দের হাতে গুঁজে দিতে চাইলেন। বললেন—টাকাটা তুমি রাখোই না, পরে না-হয় আমার ঠিকানায় বাকিটা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিও, আর তুমি আমার যা উপকার করেছ তার জন্যেও তো কিছু তোমার বখশিশ পাওয়া উচিত। ওগুলো তো আমার খোওয়া যেতোই—তুমি না থাকলে কি আমি ও-সব ফেরত পেতুম মনে করেছ?

তারপর যখন পরের স্টেশন এল, সদানন্দের নামবার কথা। তখন হঠাৎ সমরজিৎবাবু বললেন—তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাবে?

—আপনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ, আমার বাড়িতেও যেতে পারো—কলকাতায় বউবাজারে আমার নিজের মস্ত বাড়ি আছে। আমার বাড়িতে অনেক ঘর, তোমার কোনও কষ্ট হবে না।

সদানন্দ বললে—আমাকে সেখানে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারবেন?

—কাজ করবার তোমার দরকার কী?

সদানন্দ বললে—কিন্তু আপনার বাড়িতে আমি কী করবো? আমি আপনার ঘাড়ে বসে থাকবো কেন? আপনি যদি কোনও কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন তো আমি যেতে পারি—

তা সেই কথাই রইল। সমরজিৎবাবুর সঙ্গে সেই কলকাতাতেই সেদিন চলে এসেছিল সদানন্দ। তারপর থেকেই সে রয়ে গেছে এখানে। মাঝে-মাঝে সমরজিৎবাবুর কাছে গিয়ে বলে—কই, আমাকে কিছু কাজ দিলেন না তো আপনি?

সমরজিৎবাবু বলেন—দেব, দেব, হুট করে অমনি বললেই কি আর কাজ দেওয়া যায়? আমার ছেলেকে বলে তোমাকে একটা কাজ করে দেব। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? কাজ দিলেই তো হলো?

—কবে আপনার ছেলেকে বলবেন?

সমরজিৎবাবু বললেন—ছেলে আসুক আগে, তবে তো বলবো—সে তো সব সময় কলকাতায় থাকে না, বাইরে-বাইরে ডিউটি পড়ে তার। যখন হেড্‌কোয়ার্টারে আসবে—তখনই বলবো—

সেই ছেলে এতদিন পরে হেড্‌-কোয়ার্টারে এসেছে। এইবার বোধহয় সমরজিৎবাবু তাকে সদানন্দের কথা বলবেন। সদানন্দ নিজের ঘরের মধ্যে চলে গেল। কিন্তু মন থেকে ভাবনাটা গেল না। সমরজিৎবাবু কী করে বুঝবেন যে কারো বাড়িতে অন্নদাস হওয়ার অগৌরব কত! তার জন্যে সমরজিৎবাবুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে, সবই হচ্ছে, তবু প্রতিদানে সে কোনও কাজ করছে না। এর যন্ত্রণা সদানন্দ কী করে ব্যাখ্যা করবে!

খানিক পরে হঠাৎ আবার একটা গাড়ির শব্দ হলো রাস্তায়। বাড়ির ভেতরে চাকর-ঠাকুরের আবার সেই ব্যস্ততা। অনেক পায়ের শব্দের আনাগোনা। তারপর মনে হলো যেন গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার শব্দ হলো।

সদানন্দ বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

মহেশের যেন তখন আর তত ব্যস্ততা নেই। বললে—দাদাবাবু চলে গেল—

—চলে গেল মানে?

মহেশ বললে—দাদাবাবু খেয়ে-দেয়ে অফিসে চলে গেল—

—আবার কখন আসবে?

মহেশ বললে—তার কি কিছু ঠিক আছে? হয়ত অনেক দিন আর আসবেই না। পুলিসের চাকরির তো এই নিয়ম। দাদাবাবুর আসা যাওয়ার কোনও ঠিকঠাক নেই। দাদাবাবুর বিয়ে হবার আগে থেকেই এই রকম চলছে, ওই জন্যেই তো বউদির মনেও সুখ নেই—

কথাগুলো বলে মহেশ মুখটা ভারি করে নিজের কাজে চলে গেল।

বউবাজারে সমরজিৎবাবুর বাড়িতে নিজের ঘরখানায় সদানন্দ যখন একলা শুয়ে থাকতো তখন নানা চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করতো। কোথায় সেই নবাবগঞ্জ, সেই নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলা, কালীগঞ্জ, প্রকাশমামা, সেই কর্তাবাবু, সেই চৌধুরীমশাই, সেই নয়নতারা। নয়নতারার শেষ কথাটা তখনও তার কানে বাজতো—আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে কি তোমার প্রায়শ্চিত্তের ভাগ আমাকেও নিতে হবে?

কথাগুলো মনে পড়লেই সদানন্দ অন্যমনস্ক হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। সব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করতো। নবাবগঞ্জের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনবার চেষ্টা করতো। মনে করতে চেষ্টা করতো যে সে-সদানন্দ মারা গেছে, সে-সদানন্দ আত্মহত্যা করেছে, সে-সদানন্দ খুন হয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে কখন সে আবার এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়তো তাও খেয়াল থাকতো না।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য সেই নয়নতারার মা'র মৃত্যুর পর থেকেই ভেঙে পড়েছিলেন। একদিন কাজ করেন তো পরের দিন শুয়ে থাকেন।

ক'দিন থেকেই বলেছিলেন—জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বর ব্যবস্থাটা করতে হবে নিখিলেশ, ওটা যেন ভুলো না—

তা নিখিলেশ সে-সব ব্যবস্থা আগেই করে দিয়েছিল। তবু মাঝে-মাঝে বলতো—নয়নতারাকে একবার খবর দেব মাস্টার মশাই?

মাস্টার মশাই বলতেন—না না, সে সেখানে আরামে রয়েছে, তাকে আবার কেন বিব্রত করবে, এ অসুখ আমার দু'দিনেই ভালো হয়ে যাবে—তুমি বরং তত্ত্ব পাঠাবার ব্যবস্থাটা করে দাও। ওর মা নেই যখন তখন ও-দায়িত্বটাও আমার, বুঝলে না—

সেই ব্যবস্থাই হচ্ছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে নিখিলেশ শেষ ট্রেনে ফিরছে, হঠাৎ মাস্টার মশাই-এর বাড়ি থেকে লোক এসে ডাকাডাকি—

নিখিলেশ বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসে অবাক।

—কে?

—আমি বিপিন দাদাবাবু, আপনাকে একবার ডাকতে এলুম।

—তোমার তো কালকে তত্ত্ব নিয়ে নবাবগঞ্জের যাবার কথা। ও-সব কেনা-কাটা তো তৈরি।

বিপিন বললে—তা তো তৈরি কিন্তু মাস্টার মশাই-এর শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে। তাই আপনাকে একবার খবর দিতে এলুম—

—এখন কেমন আছেন?

—ভালো নয় দাদাবাবু! আমি খবর পেয়েই দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি ওই কাণ্ড। আপনাকে ছাড়া আর কাকে খবর দেব বলুন।

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বাইরে এসে বললে—চলো চলো—

কিন্তু যার কাছে জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে কালীকান্ত ভট্টাচার্যের এত আগ্রহ,

তার শ্বশুর-বাড়িতে সেদিন তখন আর এক কাণ্ড শুরু হয়েছে। সকলের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই, বেহারি পাল, বেহারি পালের বউ, নিতাই হালদারের মা সবাই এসে হাজির।

পরমেশ মৌলিক ভেতরে খবর দিতে গেল। চৌধুরী মশাই খবর শুনে বললেন—কেন? ওরা এসেছে কেন? কী দরকার ওদের?

পরমেশ মৌলিক বললে—আজ্ঞে তা জানি নে, বলছেন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন—

—সবাই মিলে দেখা করবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিন্নীর কানেও কথাটা গেল। বললে—তাই নাকি? বেহারি পালের বউও এসেছে? নিতাই হালদারের মা?

চৌধুরী মশাই বললেন—তাই তো শুনলুম। শুনলুম সা'মশাইও নাকি ওদের সঙ্গে আছে।

—কী বলতে চায় ওরা?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা তো কিছু বলেনি। সবাইকে বৈঠকখানা ঘরে নাকি বসিয়েছে—

চৌধুরী মশাই আর দাঁড়ালেন না। সোজা যেমন অবস্থায় ছিলেন তেমনি ভাবেই বেরিয়ে গেলেন। তখনও তিনি কল্পনা করতে পারেননি কতখানি বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বেহারি পালের বউ হঠাৎ ভেতর-বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পেছনে গ্রামের আরো কয়েকজন মহিলা।

—আমরা এলাম বউ।

প্রীতি বললে—কী ব্যাপার মাসিমা? হঠাৎ?

মাসিমা বললে—বউমা ডেকেছে আমাদের—

—আমার বউমা তোমাদের ডেকেছে?

—হ্যাঁ বউ, বলেছে গ্রামের সকলকে ডেকে নিয়ে আসতে—

প্রীতি যেন চমকে উঠলো। বললে—কই কোথায় গেল বউমা, দেখি জিজ্ঞেস করে কী জন্যে ডেকেছে—

ওদিকে বার-বাড়িতে চৌধুরী মশাই যখন গেলেন তখন দেখলেন নবাবগঞ্জের তাবৎ গণ্যমান্য লোক সবাই এসে সেখানে বসে পড়েছে। পরমেশ মৌলিক না-জেনে সবাইকে বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে বসতে দিয়েছে।

—কী ব্যাপার, আপনারা হঠাৎ আমার বাড়িতে এ-সময়ে?

প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই অগ্রণী হয়ে বলে উঠলেন—আপনার বউমা সকলকে আসতে বলেছেন!

চৌধুরী মশাই তো হতবাক। খানিকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার বউমা? আমার বউমা আপনাদের ডেকে পাঠালেন আর আমরা জানতে পারলুম না! আমি তো এর রহস্য কিছুই বুঝতে পারছি না—

প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই বললেন—হয়ত আপনি জানেন না চৌধুরী মশাই। সব কথা তো পুরুষ-মানুষেরা জানতে পারেন না, জানা সম্ভবও নয়। মেয়েদের ব্যাপার, মেয়েরাই জানে—

চৌধুরী মশাই-এর রাগ হয়ে গেল। বললেন—তা আপনারা তো হলেন পুরুষ, আপনাদের কাছে গিয়ে কি আমার বউমা আসতে বলেছেন? এ বাড়ির বউদের তো সে-

নিয়ম নেই? কী করে তিনি আপনাদের ডাকলেন? আপনাদের বাড়িতে গিয়ে? না চিঠি দিয়ে?

বেহারি পাল মশাই বললে—না চৌধুরী মশাই, আপনার বউমা আমার পরিবারকে ডেকে বলেছেন—

চৌধুরী মশাই এতক্ষণে যেন বুঝলেন। বললেন—ও, এতক্ষণে বুঝলাম। তা তিনি আপনার পরিবারকে কী বলেছেন?

—বলেছেন সবাইকে নিয়ে আজ আপনার বাড়িতে আসতে—

চৌধুরী মশাই বললেন—কী উপলক্ষে?

—তা তিনি বলেননি। শুধু বলেছেন আসতে—

চৌধুরী মশাই বললেন—আমার বউমা ছেলেমানুষ, তিনি কাকে কী বললেন আর আপনারাও তাই শুনে নাচলেন? আপনাদের তো উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেই আমি বলে দিতুম আপনাদের আসতে হবে কি আসতে হবে না—

এ কথায় সকলেই চুপ করে রইলেন।

—বলুন সা'মশাই, আপনিও বলুন পাল মশাই, হালদার মশাই, সরকার মশাই, আপনারাই বলুন। চুপ করে রইলেন কেন? আমি অন্যায় কিছু বলিনি, আপনারাই বুঝে দেখুন। আমার বাড়ির কুলবধূ হয়ে তিনি আমাকে খবর না দিয়ে আপনাদের খবর দিলেন, এটা কী রকম কথা? আপনারা কি বলতে চান তিনি আপনাদের সামনে এসে হাজির হবেন? এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

সা'মশাই এ-কথার কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে পাল মশাই-এর মুখের দিকে চাইলেন।

পাল মশাই বললে—আপনার বউমার হয়ত এমন কোনও কথা আছে যা সকলকে না শোনালে তাঁর চলবে না! তাই হয়ত ডেকেছেন আমাদের—

—খবরদার! একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন। আমার বংশের কুলবধূ, তাঁর সম্বন্ধে অমন যা-তা কথা বলবেন না—

পাল মশাই বললে—তাহলে আপনার বউমাকে জিজ্ঞেস করে আসুন, তিনিই বলবেন তিনি কী জন্যে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যদি আমাদের চলে যেতে বলেন তো আমরা চলে যাবো—

হঠাৎ ভেতর থেকে একটা মেয়েলি গলায় চিৎকার উঠলো—বউমা, বউমা, তুমি ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? কোথায় যাচ্ছো—বউমা—

কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটবার ঘটে গেছে। সবাই দেখলে চৌধুরী-বাড়ির কুলবধূ হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে সশরীরে একেবারে বৈঠকখানার ভেতরে এসে হাজির।

সবাই-ই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। চৌধুরী মশাই এতক্ষণ বেশ গম্ভীরভাবেই কথা বলছিলেন। কিন্তু এবার তিনিও তাঁর বউমার কাণ্ড দেখে যেন হতবাক হয়ে গেলেন।

ভেতর থেকে শাশুড়ি তখনও ডাকছে—বউমা বউমা, চলে এসো, ভেতরে চলে এসো—

নয়নতারা তখনও ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে শাশুড়ির কথায় কোনও কান না দিয়ে সকলকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো—আপনারা কেউ যাবেন না, আমি এ-বাড়ির কুলবধূ, হ্যাঁ কুলবধূ, আমার অধিকার আছে আপনাদের ডাকবার। সেই অধিকারেই আমি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি—

পেছন থেকে শাশুড়ি আবার ডাকলে—বউমা—

—আপনারা সবাই শুনুন, আমার পিতৃতুল্য শ্বশুরমশাই এখানেই আছেন, আপনারাও

রয়েছেন, আমি যা বলবো সকলের সামনে প্রকাশ্যেই বলবো। আমার শ্বশুরমশাই একটু আগেই আমাকে এ-বাড়ির কুলবধূ বলেছেন আপনাদের কাছে। আমি সেই চৌধুরীবংশের কুলবধূ হিসেবেই আমার সব কথা আপনাদের কাছে পেশ করবো—

চৌধুরী মশাই বললেন—বউমা, তুমি ভেতর-বাড়ি ছেড়ে বার-বাড়িতে এলে যে? যা বলবার ভেতর-বাড়িতে গিয়ে তোমার শাশুড়িকে বললেই পারতে। এখানে এলে কেন তুমি?

নয়নতারা বললে—না, আমি এখানে সকলের সামনে বলবো—এতদিন আমার লজ্জার মর্যাদা যখন কেউ দেয়নি তখন আর কারোর কাছ থেকে লজ্জা-সম্ভ্রম-শালীনতার কথা আজ আর আমি শুনবো না।

—কিন্তু বউমা তুমি চৌধুরী-বাড়ির বউ হয়ে বৈঠকখানা ঘরে আসবে তা বলে?

নয়নতারা শ্বশুরের মুখের ওপরেই বলে উঠলো—হ্যাঁ আসবো। এখানে না এলে আমার সব লজ্জার কথা সকলকে বলবো কী করে? আপনারা কি আমার লজ্জার মুখ রেখেছেন যে বৈঠকখানা ঘরে আসতে আমি লজ্জা পাবো?

চৌধুরী মশাই এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তোমার তো বড় বাড় হয়েছে বউমা, তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো?

নয়নতারা বললে—আপনি গুরুজন, আমার সঙ্গে আপনি যদি গুরুজনের মতন ব্যবহার করতেন তা হলে নিশ্চয়ই আমিও আপনার মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পেতুম না। কিন্তু আজকে আমি যা করেছি তা বাধ্য হয়েই করেছি। আপনারাই আমাকে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে নিজের কথা কবুল করতে বাধ্য করেছেন—

শাশুড়ি পেছন থেকে আবার ডাকলে—বউমা, ভেতরে এসো বলছি—ভেতরে এসো—

বেহারি পালের বউ এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। বললে—বউমা কী বলছে বলতে দাও না বউ, তুমি কেন বাগড়া দিচ্ছ মাঝখান থেকে?

শাশুড়ি বললে—বাগড়া দেব না? বাড়ির বউ হয়ে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? আর তোমরা সবাই মজা দেখবে বলতে চাও?

নিতাই হালদারের মা'র অনেক বয়স হয়েছে। গণ্ডগোলের মধ্যে তার বুকটা কেমন কাঁপছিল। সবাই মিলে তাকে এখানে ডেকে এনেছিল। বুড়ি আসতে চায়নি প্রথমে। সবাই যা বলছিল তা তার কানে যাচ্ছিল। এবার তার মুখ ফুটলো। বললে—বউমার কী হয়েছে গা? একঘর লোকের সামনে বৈঠকখানায় গেল কেন?

একদিকে বৈঠকখানার ভেতরে পুরুষের ভিড় আর এধারে ঘরের বাইরে বার বাড়ির বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে।

পরমেশ মৌলিক চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে চৌধুরী মশাইকে ডেকে দিয়েছিল। তারপর বাড়ির বউমার আবির্ভাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এতদিন খোকাবাবুর বিয়ে হয়েছে, তবু একদিনের জন্যেও বউমার মুখ দেখেনি। সেই বউমাকে বৈঠকখানা ঘরে আসতে দেখে সে আরো ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কৈলাস গোমস্তার তখন কাজ কমে গিয়েছিল। কর্তাবাবুর মারা যাওয়ার পর থেকেই বলতে গেলে তেমন আর কোনও কাজ ছিল না। সকাল বেলা আসতো, কিছুক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে পরমেশ মৌলিকের খাতাগুলো দেখতো। তারপর দুপুরবেলা নিজের বাড়িতে খেতে চলে যেত। আবার খাওয়াদাওয়ার পর ফিরে এসে চৌধুরী মশাইয়ের কাছে বসে হিসেবের বাকি কাজগুলো করে দিত।

সেদিনও এসেছিল কৈলাস। কিন্তু হঠাৎ হৈ-চৈ গোলমাল শুনে একেবারে নিচেয় চলে

এসেছে। পাশেই দীনু দাঁড়িয়েছিল। তার কাছে এসে কৈলাস জিজ্ঞেস করলে—এখেনে কী হচ্ছে রে দীনু—

নয়নতারা বৈঠকখানা ঘরের ভেতরে তখনও বলে চলেছে—আপনারা অনেকেই আমার বিয়ের সময় আমাকে দেখেছেন, সেদিনও আমাকে আপনারা দেখেছেন, আজ আবার এতদিন পরেও দেখছেন। বলতে পারেন আমার এ-চেহারা হয়েছে কেন? কেন আমি এত শুকিয়ে গিয়েছি?

প্রশ্নটা করে নয়নতারা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার নিজেই বলতে লাগলো—মানুষ শুকিয়ে যায় মনের কষ্টে। আমার পাশের বাড়ির দিদিমা আমাকে অনেক দিন বলেছেন—বউমা, তোমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? তুমি একটু ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করতে পারো না? না খেলে তোমার শরীর যে টিকবে না। আমি এর উত্তরে কিছুই বলতে পারিনি দিদিমাকে। বলবো কী করে? আমার মনে যে কষ্ট তা বাইরের লোককে আমি বলবো কী করে? বাড়ির বউ হয়ে বাইরের লোকের কাছে তা কি বলা যায়? কারণ এ তো আমার শ্বশুরবাড়ি, এ তো আমার স্বামীর বাড়ি—। শ্বশুরবাড়ি, স্বামীর বাড়ি, সে তো মেয়েমানুষের কাছে তীর্থস্থান। সেখানকার নিন্দে করতে নেই, সেখানকার নিন্দে শুনতেও নেই। আমার মা এখানে আসবার আগে বার বার করে আমাকে বলে দিয়েছিল—শ্বশুর-শাশুড়িকে দেবতার মত ভক্তি করবে। তাঁদের মুখের ওপর কথা বোল না। আমার মা আর আজকে বেঁচে নেই। মা যদি আজ বেঁচে থাকতো তো মাকে বলতুম—মা তোমার কথা আমি রাখতে পারলুম না, আমাকে তুমি ক্ষমা কোর। আর তা ছাড়া বিয়ের পর তো নিজের বাবা-মাও পর হয়ে যায়, তখন শ্বশুর-শাশুড়িই বাবা-মা'র জায়গা নিয়ে নেন। তাঁদের মেয়ে হয়ে তাঁদের বাড়ির পুত্রবধূ হয়ে আমি কি তাঁদের নামে নিন্দে করতে পারি? নিন্দে করলেও তা কি কোনও শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে করা উচিত? বলুন, আপনারা সকলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনারাই বলুন, তা কি করা উচিত?

প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই একেবারে সামনের দিকে বসে ছিল।

বললেন—না না বউমা, তা করা উচিত নয়, তাঁরা তোমার পিতৃ-মাতৃ তুল্য! তাঁদের নিন্দে তোমার মুখে শোভা পায় না—

নয়নতারা বলতে লাগলো—হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই বলছেন, তাঁদের নিন্দে মহাপাপ, আমি যদি আজ আপনাদের কাছে তাঁদের নামে কোনও অপবাদ দিই তাহলে পরলোকে গিয়ে নরকেও আমার স্থান হবে না। আমি সে-জন্যে আপনাদের আজ ডেকে পাঠাইনি।

এতক্ষণে চৌধুরী মশাই-এর যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।

পেছন দিকে ঘরের বাইরে চৌধুরী মশাই-এর গৃহিণী এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার চৌধুরী মশাই-এর দিকে চেয়ে বললে—ওগো, তুমি এখনো শুনছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? বউমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসতে পারছো না? বউমাকে ধরে টেনে নিয়ে এসো—

চৌধুরী মশাই কাছে এলেন। কথাটা ভালো করে শুনতে পাননি। জিজ্ঞেস করলেন—কী বলছো?

—বলছি, আমার বাড়ির বউকে নিয়ে সবাই যে মজা দেখতে এসেছে, এটা বুঝতে পারছো না?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা তুমি কি বলতে চাও আমি সবাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দোব?

—হ্যাঁ, তাড়িয়ে দেবে। আমার বাড়ির ভেতরের ব্যাপারে ওঁরা কেন নাক গলাতে আসবেন? ওঁরা কে? ওরা আমাদের খাওয়ায় না আমাদের পরায়?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা ভদ্দরলোকদের কি সোজাসুজি তাড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি?

গৃহিণী বললে—তা তুমি তাড়িয়ে দিতে না পারো, আমি ভেতরে গিয়ে ওদের চলে যেতে বলি।

—তুমি ওদের সামনে যাবে? কী বলছো তুমি?

—তা সামনে গেলে দোষ কী? আমাদের ইজ্জৎ যদি ওরা রাখতে না পারে তো ওদের ইজ্জৎ রাখতে আমাদের বয়ে গেছে—

চৌধুরী মশাই বললেন—না না, এখন অমন করো না, শেষকালে গায়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে—

বলে চৌধুরী মশাই আবার ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন।

নয়নতারা তখনও ঘরের ভেতরে তেমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তখনও এক মনে বলে চলেছে—আপনারা জানেন আমার স্বামী আমার সঙ্গে ঘর করেন নি। কিন্তু কেন করেন নি তা কি জানেন আপনারা? জানেন? যদি না জেনে থাকেন তো আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। ঘর করেন নি কারণ তিনি ছিলেন সত্যিকারের পুরুষমানুষ! হ্যাঁ, সত্যিকারের পুরুষমানুষ!

সমাগত ভদ্রলোকদের মধ্যে তখন বেশ একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

—বিশ্বাস করুন, তাঁর ওপর আমার কোনও অভিযোগ নেই। তিনি এ বাড়িতে জন্মে যা কিছু দেখেছেন তাতে তাঁর এ-বংশের ওপরেই অশ্রদ্ধা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে তাঁকে এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ছাড়তে হবে—

বলতে বলতে নয়নতারার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। একবার খানিকক্ষণের জন্যে দম নিয়ে সে আবার বলতে লাগল—তারপর আমার স্বামী একদিন এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন—আমাকে ত্যাগ করে গেলেন।

ততক্ষণে ওদিকে বারোয়ারীতলায় খবর চলে গেছে। কেদার দৌড়তে দৌড়তে নিতাই হালদারের দোকানে এসে হাজির।

সবাই তখন একমনে তাস নিয়ে মেতে ছিল।

কেদার তখনও হাঁফাচ্ছে! বললে, ওরে, মজার কাণ্ড হয়েছে, চৌধুরীবাড়ীতে মজার কাণ্ড শুরু হয়েছে—

—কী কাণ্ড?

—চৌধুরী-বাড়ির বৈঠকখানায় সদার বউ নাকি সওয়াল-জবাব করছে—

—কীসের সওয়াল-জবাব?

ব্যাপারটা অনেকের কানেই তখনও যায়নি। জিনিসটা বুঝতে অনেকেরই তখনও সময় লাগলো। নিতাই বললে—তারক জ্যাঠা থেকে বেহারি পাল মশাই পর্যন্ত সবাই হাজির।

নিতাই হালদার শুনে বললে—হ্যাঁ, তাই বোধ হয় আমার মা-ও গেছে সেখানে। বলছিল বটে চৌধুরী বাড়িতে যাবে—তা কী জন্যে গেছে রে?

—সদার বউ যে সবাইকে ডেকেছিল। তার নিজের কথা নাকি শোনাবে সকলকে!

সদার বউ! সদার বউকে বিয়ের সময় সবাই-ই দেখেছে। বউ দেখে সেদিন সদার ওপর সকলের হিংসেও হয়েছিল। কী ফর্সা সুন্দরী বউ সদার! তারপর সে বউকে আর কখনও দেখেনি তারা। তারপর শুধু শুনেছিল সদা বউ ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

—তুই জানলি কী করে?

কেদার বললে—আরে, আমি যে ওখান দিয়ে আসছিলুম, আসতে গিয়ে দেখি ওখানে ওদের সদরে খুব ভিড়। তা ভিড় দেখে আমিও ভেতরে ঢুকলুম। গিয়ে দেখি সবাই হাজির। সামনে বারবাড়ির উঠোনে লোকের ভিড়ে ভেতরে কিছু দেখতে পাইনে। শেষকালে উঁকি দিয়ে দেখি ভেতরে সবাই বসে। সব চেনা মুখ। তারক জ্যাঠা আর সা'মশাই একেবারে সামনের সারিতে। আর ঘরের মধ্যে সকলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সদার বউ—

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—সদার বউ?

কেদার বললে—হ্যাঁ রে, সদার বউ!

তবু যেন কারো বিশ্বাস হলো না। জিজ্ঞেস করলে—কী বলছিস তুই? সদার বউ? বৈঠকখানা ঘরে? একঘর বেটাছেলের সামনে? গুল মারবার আর জায়গা পাসনি? সদার বউ বৈঠকখানা ঘরে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে?

কেদার বললে—মাইরি বলছি, মা-মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না—তোরা যদি বিশ্বাস না করিস তো এই আমি মা-মঙ্গলচণ্ডীর মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করে আসছি, এই দেখ্—

বলে বটগাছটার দিকে দৌড়ে চলে গেল। বটগাছের তলায় সিমেন্ট-বাঁধানো বেদীর ওপর মঙ্গলচণ্ডীর একটা পাথরের মূর্তি ছিল। সেখানে গিয়ে মূর্তির মাথাটা ছুঁয়ে বললে—এই দেখ্, মা'র মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, মাইরি বলছি সদার বউ বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে এলুম—

এতক্ষণে যেন সকলের বিশ্বাস হলো। জিজ্ঞেস করলে—কী রকম দেখলি?

কেদার বললে—উঃ, কী ফর্সা তোদের কী বলবো, যেন রূপ ঠিকরে বেরোচ্ছে—

গোপালেরই যেন বেশি আগ্রহ, বললে—কী বলছিল?—

—আমি কি সব শুনেছি। ভিড়ের জ্বালায় কি ভেতরে ঢোকা যায় যে সব শুনবো?

গোপাল ঝাট সকলের দিকে চেয়ে বললে—চল্ ভাই দেখে আসি—

তাস্-টাস সব পড়ে রইলো। নিতাই হালদার তার দোকানের ভার তার চাকরটার হাতে ছেড়ে দিয়ে ছুটলো চৌধুরী-বাড়ির দিকে। যেন দেরি হয়ে গেলে সব মজা খতম হয়ে যাবে।

ওদিকে বৈঠকখানার ভেতরে তখন নাটকের পঞ্চম অঙ্ক চলছে।

তারক চক্রবর্তী বলছেন—আপনি আপনার বউমাকে বলতে দিন চৌধুরী মশাই, উনি যা বলছেন তা আগে বলতে দিন, তারপরে আপনার যা বলবার তা বলবেন।

চৌধুরী মশাই বললেন—তা আপনারা কি ভাবেন বউমা মিছে কথাগুলো বলে যাবে আর আমি চুপ করে সব শুনে যাবো?

নয়নতারা বলে উঠলো—না, আমি একটাও মিছে কথা বলিনি। আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই বললুম। আমি নিজের চোখে দেখেছি উনি কর্তাবাবুর গলা চেপে ধরেছেন...

—মিথ্যে কথা! সব আগাগোড়া মিথ্যে কথা!—চৌধুরী মশাই জোরে প্রতিবাদ করে উঠলেন।

ভেতর থেকে প্রীতি বলে উঠলো—বউমা, এত বড় আস্পর্ধা তোমার, শ্বশুরের নামে তুমি এত বড় মিছে কথা বলো! তোমার জিভ খসে যাবে বলছি, মাথার ওপর ভগবান আছে সে কথা ভুলে যেও না—

বেহারি পালের বউ বললে—তুমি চুপ করো না বউ, বউমা কী বলছে আগে বলতে দাও না—

—তুমি থামো মাসীমা, পরের বাড়ির কেচ্ছা শুনতে খুব ভালো লাগছে তোমাদের, না? কিন্তু আমিও জানি এ বউকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়।

ভেতর থেকে নয়নতারাই এ কথা উত্তর দিলে—শায়েস্তা আমাকে যথেষ্ট করেছেন মা আপনারা, শায়েস্তা করে করেই তো আপনারা আজকে আমাকে এতগুলো ভদ্রলোকের সামনে আমার মুখ খুলতে বাধ্য করলেন। আপনারা শায়েস্তা না করলে কি আমারই আজকে এত সাহস হতো? আজ যখন আমাকে শায়েস্তা করে করে আমাকে একেবারে মরীয়া করে তুলেছেন, তখন আর আপনাদের বারণ শুনবো কেন? আজকের কথা তো তখনই আপনাদের ভাবা উচিত ছিল। তখন কত কেঁদেছি কত আপনার পায়ে ধরেছি, তখন তো আমার একটা কথাও শোনেননি আপনারা?

তারপর একটু থেমে নয়নতারা আবার বলতে লাগলো—না, আমার একটা কথাও তখন কেউ শোনেনি। আমার চোখের সামনে একজন মানুষ খুন হয়ে গেলেও আমি মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারলুম না যে এ বাড়িতে আর একটা খুন হয়েছে! খুন এ বাড়িতে আগে আরও অনেক হয়েছে। সে-সব আমার শোনা কথা। আমার স্বামীই আমাকে তখন বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু টাকার জন্যে কি মানুষ এতই অন্ধ হয় যে নিজের বাবাকেও খুন করতে বাধে না? তাহলে এ টাকা কীসের জন্যে? সুখের জন্যে, না খুনের জন্যে? আর টাকাই যখন সমস্ত তাহলে আমাকে কেন এ বাড়ির বউ করে আনা হয়েছিল? আমার বাবা গরীব, আমার বিয়ের সময় বাবা তো একটা পয়সাও নগদ দিতে পারেননি। তাহলে কি রূপ? আমার রূপের জন্যে?

নয়নতারা নিজেই প্রশ্নটা করে নিজেই উত্তরের প্রতীক্ষায় সকলের দিকে চাইলে। বললে—আপনারা বলুন রূপ ছাড়া আর কী হতে পারে? রূপ ছাড়া আর কীসের জন্যে আমাকে এই নরক-পুরীতে বউ করে আনা হলো?

কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিলে না। উত্তর বোধহয় চায়ওনি নয়নতারা। এবার সে নিজেই তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলে।

বললে—হ্যাঁ, রূপই আমার কাল হলো। এই রূপের জন্যেই আমি এ বাড়ির বউ হয়ে এলুম। আমার কাজ হলো আমার স্বামীকে আমার রূপ দেখিয়ে ভুলিয়ে বশ করা। ছলা-কলা করে বশ করে তাকে দিয়ে এই চৌধুরী-বাড়ির বংশরক্ষা করা। আর কিছু নয়, শুধুই বংশরক্ষা আর তারই প্রতিবাদে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আর আমি?

নয়নতারার সমস্ত শরীরে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। বলতে বলতে তার যেন নেশা লেগে গিয়েছিল! জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরম। শুধু নয়নতারাই নয়, যারা যারা ঘরের মধ্যে বসে ছিল, দাঁড়িয়ে ছিল, আশে-পাশে থেকে সব কিছু শুনছিল তাদেরও সকলেরই যেন তখন নেশা লেগে গিয়েছিল।

—আর আমি?

নয়নতারা চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। প্রশ্নটা সকলের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে যেন সুবিচারের আশায় তাদের করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

বললে—আর আমি? আমার তখন কী কর্তব্য আপনারাই বলুন? আপনারা সবাই গ্রামের বিচক্ষণ গণ্যমান্য ভদ্রলোক, আমি আপনাদের কাছেই প্রশ্ন করছি এমন অবস্থায় আমার কী কর্তব্য থাকতে পারে? আমার এই রূপ এই বয়স তখন কার কোন্ কাজে লাগবে? আমাকে দিয়ে তখন আমার শ্বশুর-শাশুড়ির কোন্ উদ্দেশ্য সার্থক হবে? বলুন? আমি সেই অবস্থায় তাঁদের সেই আশা কেমন করে মেটাবো, আপনারাই বলুন?

এবারেও কেউ এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলে না।

—বলুন, আমি মেয়েমানুষ হয়ে তাঁদের এ আশা কেমন করে মেটাবো? হাজার সদিচ্ছে থাকলেও কি আমি তাঁদের সে ইচ্ছে মেটাতে পারি? মেয়েমানুষের দ্বারা কি তা সম্ভব?

তারপর আবার একটু থেমে বলতে লাগলো—না, পারি না। কেউই পারে না। আমার বিয়ের আগে আমার মা আমাকে অনেক করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল। আমি মা'র সব কথা বর্ণে বর্ণে মেনেছি। মা বলে দিয়েছিল শ্বশুরকে দেবতার মত ভক্তি করবে, তা করেছি। শাশুড়ির সেবা করতে বলেছিল মা, তা-ও করেছি। মা যা-যা বলেছিল, আমি তা সমস্তই মেনেছি। কিন্তু মা'র একটা কথা শুধু আমি রাখতে পানিনি, কিছুতেই মানতে পারিনি—

তারক চক্রবর্তী মশাই আর থাকতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কী কথা মানতে পারোনি মা?

—সেই কথা বলতেই তো আজকে আপনাদের সকলকে ডেকেছি। আমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতো তো আজকে আমি মাকেই বলতুম যে, মা তোমার সব কথা আমি মাথা নিচু করে মানতে পারলুম না। আমাকে তুমি সে-জন্যে ক্ষমা কোর। মা বেঁচে থাকলে মা আমার কথার উত্তরে কী বলতো জানি না। কিন্তু আমার মা নেই, তাই আপনাদের মত গুরুজনদেরই আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের কাছেই আমি প্রশ্ন রাখছি, আপনারাই বলুন, আমার কি অন্যায় হয়েছে? আমি কি অন্যায় করেছি?

এবার সা'মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ কথাটা তুমি রাখতে পারোনি মা?

—আমার শাশুড়ি আমায় বলেছিলেন রাত্রে আমার ঘরের দরজা খুলে শুতে—

—কেন?

নয়নতারা বললে—আমিও আমার শাশুড়িকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন? কেন আমি দরজা খুলে শোব? তা শাশুড়ি কোন কারণ বলেননি। যখন আরো একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, তখন তিনি বলেছিলেন—তর্ক কোর না বউমা, আমি যা বলছি তাই করো—

শাশুড়ি পেছন থেকে বলে উঠলো—মিছে কথা বোল না বউমা, তোমার ভালোর জন্যেই আমি তোমাকে দরজা খুলে শুতে বলেছিলুম। বলেছিলুম—তোমার একলা ঘরে শুতে ভয় করতে পারে, আমি সংসারের কাজ-কর্ম সেরে তোমার পাশে গিয়ে শোব।

নয়নতারা বললে—হয়ত আপনি তাই-ই বলেছিলেন মা, হয়ত আমিই শুনতে ভুল করেছিলুম, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি কি তারপর একদিনও আমার ঘরে আমার পাশে এসে শুয়েছিলেন? আমার নিজের মা হলে যা করতো তা কি আপনি কোনও দিন করেছেন তারপর? না অন্য একজনকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?

—বউমা!

চৌধুরী মশাই এবার চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—মনে রেখো বউমা, তুমি তোমার শাশুড়ির নামে যা-তা দোষ দিচ্ছ! শাশুড়ি তোমার মায়ের মতন, তাঁর নামে দোষ দিলে নরকেও কিন্তু তোমার স্থান হবে না।

নয়নতারা এবার শ্বশুরের দিকে মুখ তুলে চাইলে। বললে—নরকেই তো এখন আমার স্থান হয়েছে বাবা, নরকেই তো আমি এখন বাস করছি। এ-বাড়িকে নরক ছাড়া আর কী বলবো বলুন? নরক কি এর চেয়েও কষ্টের জায়গা মনে করেন? নরকের কি এর চেয়েও জঘন্য চেহারা? নরকের কথা কি শুধু মহাভারতেই লেখা আছে, এ পৃথিবীতেও কি নরক নেই? আর তাছাড়া এ-বাড়িই যদি নরক না হয়, তবে নরক আর কোথায়? কোথায় নরক খুঁজতে যাবো?

পেছন থেকে শাশুড়ি বলে উঠলো—তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে বউমা। কিছু বলি না বলে তুমি একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছ! হা-ঘরের বাড়ি থেকে মেয়ে এনেছিলুম বলেই

আজ আমার এই দুর্দশা!

নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—মা, দোহাই আপনার, আমাকে যা বলেন বলুন, আমার বাবাকে আপনি আর গালাগালি দেবেন না আমার সামনে। আমি যত অপরাধই করে থাকি, আমার বাবার কিন্তু কোনও দোষ নেই। তাঁকে আর দয়া করে এই নরক-কুণ্ডে টেনে আনবেন না, আপনার পায়ে পড়ছি—

তারক চক্রবর্তী মশাই অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন।

বললেন—তারপর মা? তারপর তুমি ঘরে দরজা খুলে শুলে, না দরজা বন্ধ করে শুলে?

নয়নতারা বললে—আমি শাশুড়ির কথা অমান্য না করে দরজা খুলেই শুলুম, কিন্তু সেইদিনই রাত্তিরে আমার ভুল ভেঙে গেল—

কেদাররা তখন এসে গেছে। একেবারে উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে।

গোপালরাও ছিল পেছনে। তারাও একবার সদার বউকে চোখের দেখা দেখবে। সেই কতদিন আগে বিয়ের সময় সদার বউকে দেখে সবাই চক্ষু সার্থক করেছিল। এতদিন বাদে আবার তাকে দেখবার সুযোগ এসেছে। এমন রূপসী বউকে ছেড়ে সদা কেমন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এটা নিয়ে বহুদিন গবেষণা করেছে তারা। তাসের আড্ডায় বসে অনেক তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু কোনও ফয়সালা হয়নি কোনদিন। সেই বউ কিনা আজ দ্রৌপদীর মত একেবারে কৌরবদের সভায় এসে হাজির হয়েছে! এটাও তো এক তাজ্জব কাণ্ড! তবে কি কোনও কেলেঙ্কারি কাজ করে ফেলেছে নাকি রে বউটা!

কেদার একেবারে সকলকে ঠেলে ঠুলে সামনে একটা জায়গা করে নিয়েছে। গোপালদেরও কাছে টেনে নিয়ে বললে—উই দ্যাখ্—

কেদারও দেখলে। গোপালও দেখলে। সবাই-ই দেখলে। আহা, কী রূপ রে! দেখেছিস মাথার চুলগুলো কী-রকম কোঁকড়ানো? চোখ দুটো খুব বিউটিফুল, না?

—চুপ কর্ না, কী বলছে শুনি ভালো করে?

সা'মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী দেখলে মা? বলো, বলো, কী দেখলে বলো?

শাশুড়ি কিন্তু তখন তার আগের কথার জের ছাড়েনি। বলে উঠলো—তোমার বাবার নাম কেন তুলবো না? তিনি তো শুনেছি মাস্টার, তা মাস্টার হয়ে নিজের মেয়েকে এই শিক্ষা দেওয়া? এ কোন্ শিক্ষা শুনি? যে-মেয়ের লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, যে-মেয়ে একঘর ভর্তি পুরুষমানুষের সামনে ঘোমটা খুলে খ্যামটা নাচতে পারে, তার বাবা কি আবার মাস্টার?

—মা! নয়নতারার বুকে যেন কথাগুলো শেলের মত বিঁধলো। বললে—আমি আপনার পায়ে ধরে বলছি মা আমাকে আপনি যা-তা বলুন, যত ইচ্ছে শাস্তি দিন সে আমার সহ্য হবে, কিন্তু আমার বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না—আপনাদের পায়ে পড়ছি—

শাশুড়ি বললে—তা এতই যদি বাপের ওপরে তোমার টান তো কই, বাপ তো তোমার একটা খবরও নিলে না এতদিনে, একবার তো দেখতেও এল না যে, যাই মেয়েকে একবার দেখে আসি গিয়ে! আর মেয়ের খোঁজ না-হয় না নিলে কিন্তু জামাইকেও তো একবার দেখতে ইচ্ছে করে—মেয়ে-জামাই কেমন আছে, একটা চিঠি লিখেও তো সে-খবরটা মানুষ নেয়—

বেহারি পালের বউ-এর তখন আসল কথাটা জানবার ইচ্ছে। বললে—তুমি থামো না বউ, বউমা যা বলতে চায় তা বলতে দাও না—

কিন্তু শাশুড়ির কথার উত্তর দিলে নয়নতারা। বললে—দোহাই মা আপনার, এমন প্রার্থনা করবেন না আপনি, আমি তো দিনরাত ভগবানকে তাই বলছি যেন এর মধ্যে বাবা আর

না এসে পড়েন! আমি যা কষ্ট পাচ্ছি তা পাচ্ছি, বাবা আমার এ-কষ্ট দেখলে আর বাঁচবেন না—তাঁকে আর বাঁচাতে পারবো না। আর শুধু বাবা কেন, আমার কষ্টের কথা জানলে আজ এখানে যাঁরা হাজির, তাঁরাও কানে আঙুল দেবেন—

তারক চক্রবর্তী মশাই বললেন—আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছিনে মা, কী এমন ব্যাপার যে শুনলে কানে আঙুল দিতে হবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—আপনারা উঠুন সা'মশাই, আপনারা আর কেন বসে আছেন, আমার বউমা পাগল, পাগল না হলে এমন প্রলাপ কেউ বকে?

নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্ষেপে উঠলো। বললে—পাগল? আমি পাগল? আমি প্রলাপ বকছি? কিন্তু রোজ রাত্রে তাহলে আপনি পাগলের ঘরে ঢোকেন কেন? কীসের জন্যে, কোন্ আকর্ষণে পাগলের কাছে তবে যান? আমি পাগল। অন্ধকারে রাত্রে আমার ঘরে ঢোকবার সময় তো মনে থাকে না আমি পাগল? তখন তো আমি পাছে টের পাই, তাই টিপি-টিপি পায়ে আমার ঘরে ঢোকেন! বলুন, আমার কথার জবাব দিন? বলুন, কেন আমার ঘরে ঢোকেন বলুন?

চৌধুরী মশাই-এর মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পাথরের মত তিনি তখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

—বলুন? চুপ করে থাকবেন না। আমার কথার জবাব দিন? নিজের হাতের আঙুল দিয়ে নিজের বাবার গলা টিপে মারতে পেরেছেন বলে ভেবেছেন আমাকেও গলা টিপে মারবেন? বলুন, জবাব দিন? একটু আগে আমাকে নরকের ভয় দেখালেন! ভয় দেখাতে আপনার লজ্জা করে না? এর চেয়ে বীভৎস নরক-কুণ্ডু আর কী হতে পারে? নরক-কুণ্ডু না হলে শ্বশুর হয়ে ছেলের বউ-এর ঘরে কেউ ঢুকতে পারে? হায় রে, আজ আমিই হলুম পাগল, আশ্চর্য! আপনি ভেবেছেন আমাকে পাগল বলে আপনি পার পাবেন? পাগল হলে কি এ-বাড়িতে আমি কাউকে আস্ত রাখতুম? বলুন, জবাব দিন আমার কথার?

চারিদিকে থমথমে আবহাওয়া। সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরম যেন হঠাৎ এক মুহূর্তে উত্তাপের বরফ হয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলো বেহারি পাল। বললে—ছি ছি চৌধুরী মশাই, এটা সত্যি একটা বড় অন্যায় কাজ হয়েছে আপনার—

তারক চক্রবর্তী বললেন—কই চৌধুরী মশাই, আমরা তো বিশ্বাস করতে পারছি না আপনি এ কাজ করতে পারেন—আপনি আমাদের নবাবগঞ্জের বিশিষ্ট একজন ভদ্রলোক হয়ে...

চৌধুরী মশাই-এর নিচু মাথা তখন আরো নিচু হয়ে গেছে। সকলের ধিক্কার-গঞ্জনার মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে তখন।

কিন্তু পেছন থেকে চৌধুরী-গিন্নীর গলার আওয়াজ হঠাৎ সব গুঞ্জন স্তব্ধ করে দিলে। পেছন থেকে চৌধুরী গিন্নী বলে উঠল—চৌধুরী মশাইকে আপনারা সবাই মিলে দোষ দিচ্ছেন কেন? চৌধুরী মশাই-এর কী দোষটা দেখলেন আপনারা? দোষ দিতে হয় আমাকে দোষ দিন। আমি যেমন বলেছি চৌধুরী মশাই তেমনি করেছেন। এছাড়া আমাদের উপায় কী ছিল বলুন? আমার ছেলে নেই, ছেলে অনেকদিন হলো নিরুদ্দেশ, তাহলে আমার এই এত সম্পত্তি এ-সব কে খাবে? কে দেখবে? কার জন্যে তাহলে এই সংসার করা? তাহলে সব কিছু ছেড়ে বনে চলে গেলেই হয়! কোন্ সুখের জন্যে লোকে ছেলের বিয়ে দেয়? কীসের আশায়? বংশই যদি না রইল তো এ ছাই সংসার দিয়ে হবেই বা কী? আমার শ্বশুর অনেক সাধ করে নাতির জন্যে সোনার হার গড়িয়ে রেখে দিয়ে গেছেন, সে হার তাহলে কার গলায় পরাবো? এছাড়া আমাদের আর কী গতি ছিল বলুন? বউমা আমাদের

নামে দোষ দিচ্ছে এখন, কিন্তু বউমারও তো মা হতে ইচ্ছে করে? সেই বউমাই বা কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? আমরা যখন থাকবো না, তখন তো বউমাই এ-সংসারের মালিক হবে, তখন? তখন বউমার কার জন্যে কীসের আশায় সংসার করবে? আপনারা অন্যায়টা আমাদেরই দেখলেন, কিন্তু আমাদের দুঃখটা তো বুঝলেন না—

তারক চক্রবর্তী উপস্থিতদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবীণ লোক। বললেন— কিন্তু বউমা, হাজার দুঃখ থাক তোমার, তা বলে চৌধুরী মশাই-এর এই আচরণ তো সহ্য করা যায় না—

চৌধুরী-গিন্নী ভেতর থেকে বললে— যদি সহ্য করা না যায় তো আমরাও আর বউমাকে সহ্য করবো না। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ এনেছিলুম, সেই ছেলেকেই যখন বউমা বশ করতে পারলে না, তখন অমন বউমাকেও আমার দরকার নেই। যাদের বাড়ির মেয়ে তাদের বাড়িতেই আবার চলে যাক— দুষ্টু গরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো—

— তা বললে তো চলবে না বউমা— আমরা পাঁচজন গ্রামের ভদ্রলোক থাকতে তোমার বউমাকে আমরা অপমান করে তাড়িয়ে দিতে দেব না— তোমরা তাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। তাতে আমাদের গ্রামের অকল্যাণ হবে—

চৌধুরী-গিন্নী তেমনি গলা উঁচু করেই বললে— কিন্তু অমন বউও আমার দরকার নেই, আমি অমন বউকে খাইয়ে পরিয়ে বাহার করে ঘর সাজিয়ে রাখতে পারবো না। ও এখুনি বিদেয় হয়ে যাক—

কথাটা খুবই রূঢ়। সকলেরই খট্ করে কানে লাগলো।

নয়নতারা বললে— কিন্তু আমিও আর থাকতে চাই না মা এখানে, এই নরককুণ্ডুতে। আমাকে পায়ে ধরে সাধলেও আমি থাকছি না—

— তাহলে তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাও। তা সে বাপের বাড়িই যাও আর রেল-বাজারে গিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকো আমি সে-সব দেখতে যাচ্ছিনে— আমার বংশই যদি রক্ষে না হলো তোমার মত বউ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো?

নয়নতারা বললে— বংশ আপনাদের রক্ষে হবে না মা। আপনি হাজার চেষ্টা করলেও হবে না, আমিও হাজার চেষ্টা করলেও হবে না। কালীগঞ্জের বউ-এর যে-সর্বনাশ আপনারা করেছেন, তারপরে তার অভিশাপ ফলবে না বলতে চান?

চৌধুরী মশাই-এর মুখ দিয়ে এতক্ষণ কোনও কথাই বেরোয়নি। তারক চক্রবর্তীমশাই তাঁর দিকে চেয়ে বললেন— বউমাকে যদি বাপের বাড়ি পাঠাতেই হয় চৌধুরী মশাই তো এমনি পাঠালে চলবে না, রীতিমত যেমন নিয়ম আছে তেমনি নিয়মে পাঠাতে হবে—

সা'মশাই বললে— হ্যাঁ এমনি পাঠিয়ে দেবেন না, আপনার বউমাও তো চলে যেতে চাইছেন। আপনার সরকার আর একজন দাসীকে সঙ্গে দিয়ে ওঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। সেই ভালো—

বেহারি পালও একটা কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। চৌধুরীবাড়ির সদরে নজর পড়তেই সবাই দেখলে জনতিনেক লোক হাঁড়ি, থালা, বারকোষ নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। একজনের মাথায় আবার আম-কাঁঠালের ঝুড়ি।

বিপিনও বাড়ির ভেতরে এত ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেছে!

কে একজন এগিয়ে গিয়ে বুঝি জিজ্ঞেস করলে— কোত্থেকে আসছো গো তোমরা? এ সব কী?

বিপিন বললে— আসছি কেষ্টনগর থেকে, জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব নিয়ে—

সঙ্গে সঙ্গে খবরটা এক মুখ থেকে আর এক মুখে রটে যেতে যেতে একেবারে আসরের ভেতরে গিয়ে কথাটা পৌঁছুলো। বেহারি পালের বউ দাঁড়িয়ে সব শুনছিল এতক্ষণ। তার

পাশেই নিতাই হালদারের মা। তার পাশে পাড়ার আরো ক'জন মেয়েমানুষ ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর দরজার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল চৌধুরী-গিন্নী। ঘরের ভেতরে চৌধুরী মশাই, তারক চক্রবর্তী, বেহারি পাল, সা' মশাই, সকলের কানেই কথাটা গিয়ে পৌঁছলো। কে? কোথা থেকে এসেছে? কেষ্টনগর থেকে? জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব?

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে গেল। এতক্ষণ ছন্দ তাল লয় সব ঠিক মত বজায় ছিল, কিন্তু এবার যেন সব বেতাল হয়ে গেল।

চৌধুরী-গিন্নী তত্ত্বওয়ালাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। বিপিনের সামনে এসে বললে— এসো এসো বাবা তোমরা, এসো—

কিন্তু নয়নতারার কানে কথাটা যেতেই নয়নতারা ভিড় ঠেলে নিজেই বৈঠকখানার বাইরে চলে এসেছে। দিদিমণিকে সেই অবস্থায় দেখে বিপিনও যেন হাসতে ভুলে গিয়েছিল।

নয়নতারা বিপিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে— বিপিন, তুমি?

— মাস্টার মশাই জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব পাঠিয়েছেন দিদিমণি। তুমি ভালো আছো?

নয়নতারা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলো— জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব আর নামাতে হবে না এখানে, তোমরা সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

বিপিন চমকে উঠেছে। বললে— কেন দিদিমণি, দাদাবাবু এত কষ্ট করে সব যোগাড়-যন্তর করলেন, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো?

— হ্যাঁ, এখুনি ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

তখনও বিপিন কিছু বুঝতে পারছে না— সে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল নয়নতারার দিকে। বাড়ির ভেতরে যত লোক জমেছিল সবাই তখন একদৃষ্টে নয়নতারার কাণ্ড দেখছে!

চৌধুরী-গিন্নী বললে— ওরা তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, তুমি ফেরত পাঠাচ্ছো কেন বউমা?

— হ্যাঁ ফেরত যাবে ওরা! যে বাড়িতে জামাই নেই, সেখানে আবার বাবা জামাইষষ্ঠী পাঠিয়েছে! ফিরে যাও, ফিরে যাও বলছি!

বিপিনদের তখনও হতভম্ব ভাবটা কাটেনি। বললে— ফিরে যাবো?

নয়নতারা বললে— হ্যাঁ, আমি বলছি ফিরে যাবে। যদি ফিরিয়ে নিয়ে না যাও তো আমি এই মাটিতে সব ফেলে দেব। যাও ফিরে, এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমাদের জামাইবাবু এ বাড়িতে নেই। এ বাড়িতে আর কখনও তিনি আসবেনও না। আমিও আর এ বাড়ির কেউ নই, তোমরা যাও, যাও— চলে যাও—

বিপিনরা কী করবে বুঝতে পারছিল না। চৌধুরী মশাই হঠাৎ এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন— কী করছো বউমা, ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? ওরা তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, ওদের কী অন্যায় হয়েছে? ওরা থাক্, এসো, তোমরা এসো—

কিন্তু নয়নতারা হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। বললে— না, ওরা আর এখানে দাঁড়াবে না— বলে বিপিনের হাতের বারকোষটা ঠেলে দিতেই তার ওপরের দই রাবড়ির মাটির হাঁড়িগুলো মাটিতে পড়ে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে সমস্ত উঠোনময় ছড়িয়ে গেল।

এসব কতদিনের কথা। সে-সব দিনের কথা এমন করে যে আবার একদিন পর্যালোচনা করতে হবে এ-কথা কি সেদিনকার সদানন্দ ভেবেছিল! তখন কি একবারও মনে হয়েছিল যে এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার জন্যে তাকে আবার একদিন জবাবদিহি করতে হবে!

আজ তো তার সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। একদিন নবাবগঞ্জের সমস্ত সম্পত্তির যে

একমাত্র ওয়ারিশন হতে পারতো, তার মাতামহের ভাগলপুরের সমস্ত সম্পত্তিরও যে একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পারতো সে-ই কিনা আজ নিঃস্ব! চৌবেড়িয়ায় রসিক পালের অতিথিশালার এক কোণে তাকে যে আজ দিনাতিপাত করতে হয় এও নাকি তার অপরাধ! আশ্চর্য!

তবে কি সদানন্দ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে শুধু অপরাধই করেছে?

তার চেয়ে যদি সে নবাবগঞ্জের সংসার-জীবনকেই স্বীকার করে নিত, পিতৃপুরুষের পাপের আর অন্যায়ের আর অত্যাচারের ওয়ারিশন হয়ে সব সহ্য করে যেত তাহলে আর আজ এমন করে তাকে রসিক পালের আশ্রয়েও থাকতে হতো না, আর আসামী হতেও হতো না।

মনে আছে সেদিন কলকাতার সেই অন্ধকার দিনগুলোতে এক-একবার তার বাড়ির কথা মনে পড়তো। মনে পড়তো কালীগঞ্জের বউ-এর কথা। মনে পড়তো নয়নতারার কথা। নয়নতারার কথা মনে পড়লেই মনটাকে সে অন্য খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করতো। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করতো। তার অতীতকে সে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতো। তারপর যখন আর কিছু ভালো লাগতো না তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তো। বেরিয়ে যত দূর ইচ্ছে হেঁটে-হেঁটে চলে যেত। তারপর আবার এক সময়ে বাড়িতে এসে ঢুকে পড়তো। দেয়ালে-দেয়ালে কত রকম পোস্টার লাগানো থাকতো। কোনওটাতে লেখা থাকতো 'সাবধান, শত্রুর চর নিকটেই আছে।'

সমরজিৎবাবু বেশ অদ্ভুত লোক। কোনও কিছুতেই বিকার নেই তাঁর। এত বড় একটা যুদ্ধ চলে গেছে, কলকাতার বুকের মধ্যে জাপানীদের বোমা পড়েছে, দলে দলে কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি নির্ভয়ে কলকাতায় ছিলেন।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—আপনার তখন ভয় করেনি?

সমজিৎবাবু হাসতেন। বলতেন—কীসের ভয়? তা সে তো যেখানে যাবে সেখানেই প্রাণের ভয় আছে। ধরো ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে, সে-ট্রেনও তো কলিশন্ হয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে, তখন? তুমি পালাবে কোথায় সদানন্দ? বইতে পড়োনি—পলাইবার পথ নাই যম আছে পিছে—

সমরজিৎবাবুর কাজের মধ্যে কাজ ভোর চারটের সময় উঠে ট্রামে করে গঙ্গায় যাওয়া, সেখানে গিয়ে অবগাহন স্নান করে বাড়িতে এসে পূজো করা। সেই পূজোই চলতো এক ঘণ্টা ধরে। তারপরে খবরের কাগজ নিয়ে বসতেন।

সদানন্দ মাঝে মাঝে কাছে যেত। বলতো—আমার কথাটা একটু ভেবেছেন কাকাবাবু? আপনি আমাকে বলেছিলেন একটা কাজ যোগাড় করে দেবেন—

সমরজিৎবাবু বলতেন—কেন, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

সদানন্দ শেষকালে একদিন বলছিল—হ্যাঁ, অসুবিধে হচ্ছে, আমি আর কতদিন আপনার ঘাড়ে বসে বসে খাবো? আমার লজ্জা করে। কারো দয়ার দান নিতে আমার ভালো লাগে না। একদিন-দুদিন হয়, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু মাসের পর মাস এ-রকম ভালো লাগে? এবার আমাকে আপনি ছেড়ে দিন—

বলে আর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা তার নিজের ঘরে চলে এসেছিল। সমরজিৎ-বাবু যে-ঘরটায় তাকে থাকতে দিয়েছিলেন সেটা বেশ বড়। বৌবাজারের মত জায়গার তুলনায় বলতে গেলে সে-ঘরে আলো-হাওয়া ভালোই ছিল। সদানন্দ প্রথম দিন থেকেই ঘরটার মধ্যে শুয়ে পড়ে থাকতো। কোনও কাজ নেই, আবার কোন অকাজও নেই তার। বাড়িটার ভেতরে চাকর বাকরের অনেক খুচরো কথাবার্তা কানে আসতো। তার মধ্যে অনেক

কথাই তাদের নিজেদের সম্পর্কে। সংসারের ছোটোখাটো খুঁটি-নাটি নিয়ে বচসা, আর নয়তো হাসি-হাট্টা এক-এক সময় সদানন্দকে নিয়েও আলোচনা হতো। লোকটা কে? বাবুর কে হয়, কেন এখানে আছে, কত দিন এখানে থাকবে, এখানে কী সুত্রে এল, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ।

সেদিন নিজের ঘরে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মহেশ তার ঘরে এল। বললে, আপনি বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন নাকি দাদাবাবু? বাবু বলছিলেন।

সদানন্দ বললে—আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না মহেশ। তুমি তো জানো আমি এখানে আসতে চাইনি, তোমার বাবুই এখানে জোর করে নিয়ে এসেছেন—

মহেশ বললে—কিন্তু এখানে না থাকলে আপনি যাবেন কোথায়? আপনি তো রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন—

সদানন্দ চম্‌কে উঠলো—আমি রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি কে বললে?

মহেশ হাসতে লাগলো। বললে—আমি জানি—

সদানন্দ উঠে বসলো। বললে—তুমি কী করে জানলে? বলতেই হবে তুমি কী করে জানলে?

মহেশ বললে—বাবু যে মা'কে বলছিল। মা আপনার কথা বাবুকে বলছিল কিনা। মা'র কথায় বাবু বললে—ওকে কিছু বোল না তুমি, ও বড়ঘরের ছেলে, রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—

তারপর একটু থেমেই বললে—আপনি বাবুর ওপর রাগ করবেন না দাদাবাবু, বাবুর কষ্টটা আপনি তো দেখতে পান না। বাইরে তো বাবু বেশ হাসি-খুশী, কিন্তু বাবুর মনের ভেতরে কোনও সুখ নেই—

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে—মনে সুখ নেই? কেন?

মহেশ বললে—সে দাদাবাবু অনেক কথা। টাকা থাকলেই কি মানুষের সুখ হয়? আমাদের টাকা-কড়ি কিছু নেই, তবু আমরা বাবুর চেয়ে শতগুণে সুখী। আমরা পড়ি আর ঘুমোই। কিন্তু বাবুর দু'চোখে ঘুম নেই—

প্রথম প্রথম অবাক লেগেছিল সদানন্দর। যে-মানুষ সদানন্দর মত অসুখী লোককে বাড়িতে ডেকে এনে নিজের মত আদর-যত্ন করছে তার সুখ-দুঃখের দিকটা তো কখনও সদানন্দ ভাবেনি। নিজের দুঃখটাকেই বড় করে দেখে পৃথিবীর আর সকলকে সুখী মনে করার মধ্যে কেমন আত্মরতির আনন্দ থাকে। সেই আনন্দেই সে এতদিন বিভোর হয়ে ছিল। এবার যেন তার মনের তৃতীয় নয়ন খুলে গেল।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কাকাবাবুর কিসের দুঃখ সত্যি করে বলো তো?

মহেশ বললে—আপনি তো জানেন না, ওই যে সেদিন দাদাবাবুকে দেখলেন!

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ দেখেছি, কখনও বাড়ি আসে আবার কখনও বাড়ি আসে না—

মহেশ বললে—হ্যাঁ, তা আপনি যেন কাউকে বলবেন না, সেই দাদাবাবু তো বাবুর নিজের ছেলে নয়—

—সে কী? নিজের ছেলে নয়?

—না। বাবু ওকে পুষ্যি নিয়েছেন—

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। এতদিন এ-বাড়িতে এসেছে, অথচ এ-কথাটা তো কখনও কানে আসেনি তার। এতদিনের সমস্ত ঘটনাটা পর্যালোচনা করে করে অনেক

ঘটনার অনেক ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করলে সে। কিন্তু পালিত-পুত্রই যদি হয় তো তাতে দুঃখটা কিসের! ছোটবেলা থেকে যদি এমন বাবার কাছেই মানুষ হয়ে থাকে তো তাকে নিয়ে তো সুখী হবারই কথা। আর, তা ছাড়া ছেলেও তো জানে একদিন এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে নিজেই।

—না, আপনি আমার বাবুর ওপর রাগ করবেন না দাদাবাবু। বড়দাদাবাবু যদি মানুষ হতো তো বাবুর কোনও দুঃখু থাকতো না। কিন্তু বড়দাদাবাবু যে মানুষ নয়। দেখেন না অনেক দিন রাতে বাড়িতেই আসে না বড়দাদাবাবু!

—তা তোমার বাবুর কোনও ছেলেমেয়ে কিছুই হয়নি?

মহেশ বললে— না, ছেলে-মেয়ে কিছু হয়নি বলেই তো বাবুর দুঃখু। আবার যাকে পুষ্যি নিলেন সেও তো কেমন মনের মতো হলো না। তাই আপনার ওপর এত টান পড়ে গেছে। আপনাকে বাবুর খুব পছন্দ হয়েছে দাদাবাবু। আমাকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করেন আপনাকে ভালো খেতে দিচ্ছি কিনা। আপনি যা খেতে ভালোবাসেন তা-ই বাজার থেকে আনতে বলেন। সত্যি দাদাবাবু, আপনাকে বাবু কী চোখে যে দেখেছেন তা বলতে পারি নে—

সদানন্দ বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও মহেশ, তোমাদের বড়বাবু মনের মতো ছেলে কেন হলো না তাই বলো তো? বাবু তো ভালো করে দেখে শুনেই তবে তাকে নিয়েছিলেন, তবে? বড়দাদাবাবু দোষটা কী করেছে?

মহেশ বললে, ওই যে বললুম, বড়দাদাবাবু রাত্তিরে বাড়িতে থাকে না—

—তা বাড়ি থাকে না সে তো চাকরির জন্যে। পুলিসের চাকরিতে যখন যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানে তো যেতেই হবে। বড়দাদাবাবুকে তো চাকরির জন্যই বাইরে বাইরে রাত কাটাতে হয়—

মহেশ গলা নিচু করে এবার বললে—না দাদাবাবু তা নয়। ও আপনি ভুল শুনেছেন, আসলে বৌদিদিকে পছন্দই হয় না বড়দাদাবাবুর।

সদানন্দ বললে—পছন্দ হয় না কেন? দেখতে খারাপ?

—আজ্ঞে না, বাবু নিজে হাজার-হাজার মেয়ে দেখে তার মধ্যে থেকে বেছে তবে এই বৌদিকে ঘরে এনেছে। খারাপ দেখতে হলে কি বাবু এঁকে ঘরের বউ করতেন? সেজন্যে নয়। বড়দাদাবাবুর যে বাইরে-বাইরে মন। বড়দাদাবাবুর যে বাইরেও একটা সংসার আছে—সেই দিকেই যে বড়দাদাবাবুর মন পড়ে থাকে—

সদানন্দ বললে—সে কে?

—আজ্ঞে তাকে বড়দাদাবাবু বাড়ি ভাড়া করে রেখে দিয়েছে। মাইনে-টাইনে বড়দাদাবাবু যা পায় সব সেখানেই ঢালে, বাবুকে একটা পয়সাও দেয় না। অথচ বড়-দাদাবাবু আগে এমন ছিল না—

সদানন্দ বললে—তা তোমার বাবু কি ছেলের মাইনের টাকা চায়?

মহেশ বললে—আজ্ঞে তা চাইবে কেন? বাবুর কি টাকার অভাব যে বাবু ছেলের মাইনের টাকা নিয়ে সংসার চালাবে? রাণাঘাটে বাবুর অত জমি-জমা পুকুর বাগান, সেই টাকাই কে খায় তার ঠিক নেই। শুধু আম-কাঁঠালের বাগানই তো তিনশো বিঘের, তারপরে একটা বিল সেটাও চারশো বিঘের ওপর, সে সব টাকাও খাবার লোক নেই, সে-সব দেখাশোনা করবারও লোক নেই, বড়দাদাবাবুর চাকরি করবার তো দরকারই ছিল না। বাবুর সঙ্গে তো এই নিয়েই বড়দাদাবাবুর মন-কষাকষি। বাবুর কথা না শুনে বড়দাদাবাবু ওই চাকরি নিলে, আর তখন থেকেই বড়দাদাবাবুর স্বভাব-চরিত্তির খারাপ হয়ে গেল—। তা পুলিসের

চাকরিতে মানুষের স্বভাব-চরিত্তির কি ঠিক থাকে? আপনিই বলুন দাদাবাবু? আমার বাবুও তো তাই বলেন। ওই চাকরিতে ঢোকবার আগে তো বড়দাদাবাবুর কোনও গণ্ডগোল ছিল না। লেখাপড়া করতো, তারপর একদিন বিয়ে হলো—তারপর কার পাল্লায় পড়ে যে চাকরি নিয়ে বসলো, সেই তখন থেকেই এই কাণ্ড—। এখন চাকরি করে যা কামায় সব সেই রাক্ষুসীর গব্ভে ঢালে—

মহেশ হয়তো আরো অনেক কিছু বলতো, কিন্তু হঠাৎ দোতলা থেকে সমরজিৎবাবু ডাকতেই সে চলে গেল।

সদানন্দ সেখানে বসে বসে মহেশের কথাগুলোই ভাবতে লাগলো। এক জায়গার অশান্তি থেকে দূরে থাকবার জন্যেই সে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু এখানে এই কলকাতায় এসেও সে আর এক অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে নাকি? এক বন্ধন থেকে আর এক বন্ধনে? রাণাঘাটের জমি-জমা বাগান-পুকুর থেকে টাকা আনবার সময়েই তাহলে তার সঙ্গে সমরজিৎবাবুর দেখা! আর সেই জন্যেই এ বাড়িতে তার এত খাতির! সমজিৎবাবু কি চান সে এ-বাড়ির পালিত পুত্র হয়ে জীবন কাটাবে আর তাঁর জমি-জমা বাগান-পুকুর দেখাশোনা করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খাবে! তা যদি হতো সে তো নবাবগঞ্জেই থাকতে পারতো। নবাবগঞ্জের জমি-জমা বাগান-পুকুর নিয়ে সে তো দিব্যি দিন কাটাতে পারতো আর আরাম করে চৌধুরী-পরিবারেরও বংশ-বৃদ্ধি করে যেত।

সদানন্দ ঠিক করলে—না, এখানে থাকা তার আর চলবে না এখানকার এই নির্ঝঞ্ঝাট স্বাধীনতাও তার কাছে দাসত্বেরই সমান। কিন্তু এখান থেকে চলে গিয়েই বা সে কী করবে? কোথায়ই বা যাবে? যেখানে যার কাছেই যাবে সেখানেই তো তারা তার কাছ থেকে মূল্য চাইবে। মুল্য না দিলে সংসারে কেউই কিছু দেয় না! পৃথিবীতে বাঁচতে গেলেই কি তবে ট্যাক্স দিতে হবে? আত্মসম্মানের ট্যাক্স, নয়তো পরাধীনতার ট্যাক্স, আর নয়তো স্বার্থত্যাগের ট্যাক্স!

মহেশের কাছে কথাগুলো শুনে আর বাড়ির ভেতরে থাকতে পারলে না সে। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু রাস্তাতেই কি শান্তি আছে! মানুষগুলোকে দেখে দেখে মনে হলো সবাই যেন ছুটছে। কোথায় ছুটছে সবাই? বউবাজারের মোড়ের কাছে আসতেই একজন লোক এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে—দাদা, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

দেশলাই!

লোকটা যেন কল্পনা করে নিয়েছে সদানন্দ সিগারেট খায়।

বললে—আপনি সিগ্রেট খান্ না? ঠিক আছে—

বলে দেশলাই-এর খোঁজে বোধহয় অন্য একজনের সন্ধানে চলে গেল। নেশার খোরাকে টান পড়েছে লোকটার। অথচ দেশলাই কিনবে না। কত পান-বিড়ি-দেশলাই-এর দোকান রয়েছে। সেখানে পয়সা খরচ করে দেশলাই কিনলেই পারো। আর দেশলাই কিনতেই যদি এত পয়সার টানাটানি তাহলে নেশা করা কেন!

বাড়ির কাছে আসতেই একটা ভিখিরি এসে দাঁড়ালো—একটা পয়সা দাও বাবু—

সদানন্দ তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। লোকটার হাত-পা খসে গেছে। হাতের পায়ের আঙুলগুলো নেই। সদানন্দ পকেট থেকে পয়সা বার করে দিতে গেল। কিন্তু পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠলো। টাকা-পয়সাগুলো কোথায় গেল? একটা ব্যাগের মধ্যে রেখেছিল টাকা-পয়সা। সমরজিৎবাবু তার হাত-খরচের জন্যে দিয়েছিলেন। জামার কোনও পকেটেই নেই। অথচ বেরোবার সময় মনে আছে বুক-পকেটে ব্যাগটা নিয়েই বেরিয়েছিল সে।

লোকটা তখনও হাতটা বাড়িয়ে আছে।

সদানন্দ বললে—পয়সা নেই আমার কাছে—

বলে আবার বাড়ির রাস্তা ধরলো। কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে আসতেই মহেশের সঙ্গে দেখা। মহেশ বললে—বাবু আপনাকে ডাকছিলেন দাদাবাবু—

—আমাকে?

—হ্যাঁ, বলছিলেন নতুন লোক, কোথায় ঘুরে বেড়ায় একলা-একলা! এখন দিনকাল খারাপ, সন্ধ্যের সময় তুই বেরোতে দিলি কেন একলা? আমার ওপরে বকুনি।

সদানন্দ সোজা ওপরে চলে গেল। সমরজিৎবাবু সেই রোজকার মত নিজের বিছানার ওপর বসে ছিলেন। বললেন,—সন্ধ্যেবেলা কোথায় গিয়েছিলে তুমি? আমি মহেশের কাছে শুনে ভাবনায় পড়েছিলুম। এ কলকাতা শহর, তুমি নতুন মানুষ এখানে, নতুন মানুষ দেখলেই এখানকার গুণ্ডাবদ্‌মায়েসরা চিনতে পারে। আর কখনও সন্ধ্যেবেলা বেরিও না, বুঝলে? যুদ্ধের পর এ-জায়গা আরো খারাপ হয়ে গেছে—

সদানন্দ উত্তরে কিছু বললে না।

—তোমার কাছে হাত খরচের টাকা আছে তো?

সদানন্দ বললে—হাত খরচের টাকা আমার আর চাই না—

—কেন? তোমাকে যে দশটা টাকা দিয়েছিলুম সেটা খরচ হয়ে গেছে?

—না খরচ হয়ে যায়নি, চুরি হয়ে গেছে।

সনরজিৎবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—চুরি হয়ে গেছে মানে? কে চুরি করলে? আমার বাড়ির চাকর-বাকর কেউ?

—না, রাস্তার একটা লোক। আমার কাছে দেশলাই চাইবার নাম করে এসে কখন ব্যাগটা তুলে নিয়েছে টের পাইনি—বলে সমস্ত ঘটনাটা বলে গেল।

সমরজিৎবাবু বললেন—ওই জন্যেই তো আমি তোমাকে বলি তুমি গ্রামের ছেলে, তোমাকে সবাই ঠকিয়ে নিতে পারে। তা যাকগে, এই নাও, এই টাকা-কটা রাখো তোমার কাছে। এবার খুব সাবধানে রেখো। টাকাকে অত তাচ্ছিল্য কোরো না, বুঝলে? সংসারে টাকা খুব খারাপ জিনিস নয়। টাকা ব্যবহার করতে সবাই জানে না বলেই টাকার এত বদনাম—

টাকা ক'টা নিয়ে সদানন্দ আবার তার নিজের ঘরে চলে এল।

কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দে সদানন্দের ঘুম ভেঙে গেছে। মনে হলো দোতলায় যেন তুমুল হট্টগোল চলছে। সমরজিৎবাবুর চড়া গলা শোনা যাচ্ছিল একদিকে আর অন্যদিকে একজন পুরুষের গলা।

সদানন্দ ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। গোলমালটা ঠিক মাথার ওপর হচ্ছিল।

বাইরে বারান্দায় আসতেই দেখলে মহেশও দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির নিচে।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—ওপরে কীসের গোলমাল মহেশ?

মহেশ বললে—বড়দাদাবাবু এসেছে—

সদানন্দ বললে—বড়দাদাবাবু এসেছে তো কাকাবাবু এত চেঁচাচ্ছেন কেন? মনে হচ্ছে যেন খুব রাগ করেছেন?

—বড়দাদাবাবু আজকে মদ খেয়েছে যে। এসে বউদিকে খুব মারধোর করেছে—

—সে কী? কেন, মারধোর করেছে কেন?

মহেশ বললে—মদ খেলে কী মানুষের জ্ঞান-গম্যি কিছু থাকে! বড়দাদাবাবু যে এক-

একদিন বেশি খেয়ে ফেলে!

ওদিকে সমরজিৎবাবু তখন চিৎকার করছেন—বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও—আর যদি কখনও মদ খেয়ে বাড়ি ঢোক তো তোমাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—

ওদিক থেকে ছেলেও চিৎকার করছে—হ্যাঁ ঢুকবো, আলবাৎ ঢুকবো—

সমরজিৎবাবু এবার ডাকলেন—মহেশ, মহেশ, এদিকে আয় তো—

মহেশ সব শুনছিল সদানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সে বোধহয় জানতো এবার তার ডাক পড়বে।

সদানন্দ বললে—ওই তোমার ডাক পড়েছে মহেশ, যাও—

মহেশ বললে—দেখেছেন, আমার কপালের গেরো! এখন বড়দাদাবাবুকে বাড়ি থেকে ধরাধরি করে বার করে দিতে হবে।

—বাড়ি থেকে বার করে দেবে মানে?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে মহেশ সোজা ওপরে উঠে গেল। তাকে দেখে সমরজিৎবাবু বললেন—যা, খোকাকে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়ে আয়। আর যেন কখখনো ভেতরে না ঢোকে। যত সব নচ্ছার কুলাঙ্গার হয়েছে, এমন ছেলের আমি মুখদর্শন করতে চাই নে—যা—

কিন্তু মাতালকে জব্দ করা কি অত সহজ! মহেশ কাছে যেতেই বড়দাদাবাবু তার দিকে তেড়ে এসেছে। বললে—আয়, আমার দিকে এগিয়ে আয়, দেখি তোরই একদিন কি আমার একদিন!

বলে হঠাৎ নিজের দরজায় দুম্-দুম্ করে লাথি মারতে লাগলো। দরজা খোল, দরজা খোল।

সমরজিৎবাবু বলে উঠলেন—দরজা খুলো না বউমা, খবরদার দরজা খুলো না, দেখি কী করতে পারে?

বউমা বোধহয় ভয় পেয়ে তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে দরজায় খিল দিয়েছিল। তখন সে আরো ভয় পেয়ে গিয়েছে। শ্বশুর বললেও হয়ত দরজা খুলতো না।

সমরজিৎবাবুর ছেলে তখন রাগে একবার দরজায় লাথি মারে আর একবার মহেশকে মারতে আসে!

এসব ঘটনা নতুন নয় মহেশের কাছে। মহেশের যেমন নতুন নয়, এ-বাড়ির অন্য কারো কাছেও আবার তেমনি নতুন নয়। মাঝে-মাঝে এরকম ঘটনা যে ঘটে তা মহেশের কথাতেই বোঝা গিয়েছিল। শুধু সদানন্দ নতুন এ-বাড়িতে এসেছে বলে তার কাছে সবটাই নতুন লাগছিল।

কিন্তু বড়দাদাবাবুর গায়ে যত জোরই থাক, মদ খেয়ে নেশা হবার পর মানুষ বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সেই দুর্বল মানুষকে নিয়ে বিশেষ সমস্যা থাকে না। মহেশ তার বড়দাদাবাবুকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর সেই মাঝরাত্রে বাড়ির বাইরে রেখে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিলে।

সদানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দৃশ্যটা দেখেছিল। সদর দরজা বন্ধ করতেই সদানন্দ বললে—মহেশ, তোমার বড়দাদাবাবু কি বাইরেই সারা রাত পড়ে থাকবে নাকি?

পেছন থেকে সমরজিৎবাবুর গলা শোনা গেল। তিনি বললেন —হ্যাঁ, ও বাইরেই পড়ে থাকুক আর জাহান্নমেই যাক তোমার তা দেখবার দরকার নেই। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না—

সদানন্দ বুঝতে পারেনি সমরজিৎবাবু কখন সিঁড়ির নিচেয় এসে দাঁড়িয়েছেন। সমরজিৎবাবুর মুখ-চোখের চেহারা যেন তখন অন্য রকম হয়ে গেছে।

সদানন্দ আর কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। সমরজিৎবাবু তাকে ডাকলেন।

বললেন—শোন—

সদানন্দ কাছে যেতেই বললেন—তুমি তো চাকরি চাইছিলে আমার কাছে, চাইছিলে না? আমার খোকাকেও আমি চাকরি করে দিতে চাইনি। নিজে থেকেই ওই চাকরি যোগাড় করে নিয়েছে। যোগাড় করে নিয়ে এখন এই কাণ্ড করছে। অথচ ওর চাকরি করার কোনও দরকার ছিল না। আমার যা সম্পত্তি আছে তা দেখাশোনা করলেই ওর চলে যেত। কিন্তু ক্ষমতা! ক্ষমতার লোভই ওর সর্বনাশ করে দিয়েছে। এর পরও তুমি চাও আমি এই ছেলেকে বলে তোমার চাকরি করে দিই? বলো? জবাব দাও?

সদানন্দ কোনও জবাব দিলে না। জবাব দেবার অবশ্য তার অনেক কিছুই ছিল। অবশ্য জবাব দিতে পারতো যে চাকরি করলেই কি আর আপনার ছেলের মত সবাই মাতাল হবে। লক্ষ-লক্ষ লোকই তো চাকরি করছে, কই, সকলেই কি আপনার ছেলের মত মদ খেয়ে মাতলামি করছে?

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। তখন সেই রাত দু'টোয় তো আর এ-কথা বলবার সময় নয়। তাই-কিছুই বললে না সদানন্দ। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের ভেতরে চলে এল। তারপর আলো নিভিয়ে বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু মন থেকে ঘটনাটা কিছুতেই দূর করতে পারলে না। সমরজিৎবাবুর কথাই ঘুরে-ফিরে কেবল মনে পড়তে লাগলো। ভগবান সমরজিৎবাবুকে দিয়েছেন যেমন অনেক, আবার মনে কিছু তেমনি কেড়েও নিয়েছেন। এমন করে যদি কেড়েই নেবেন তাহলে এমন করে তাকে দেওয়াই বা কেন? আর, একটা কথাও মনে পড়তে লাগলো। যেদিন সদানন্দ প্রথম এখানে এসেছিল সেদিন তার মনে হয়েছিল এরা কত সুখী! মনে হয়েছিল অন্তত এদের সংসারে কোনও ফাঁকি নেই। কিন্তু এই-ই কি এদের সুখের নমুনা? তাহলে পৃথিবীতে কোনও সংসারেই কি সুখ নেই?

আর মনে পড়তে লাগল আর একজনের কথা। এতদিন এ বাড়িতে সে এসেছে, কিন্তু একদিনও তাকে দেখেনি সদানন্দ। শুধু মহেশের কাছে শুনেছে তার কথা। সমরজিৎবাবু হাজার-হাজার মেয়ের মধ্যে থেকে বেছে তাকে এ বাড়ির ছেলের বউ করেছেন। তার রূপ দিয়ে ছেলেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন এ-রকম হলো! তাকে দেখা দূরে থাক্ তার গলার আওয়াজটুকু পর্যন্ত শুনতে পায়নি সে। সে যে আছে এ-বাড়িতে তারও তো কোনও প্রমাণ পায়নি সদানন্দ।

তবে কি এও আর একজন নয়নতারা!

রেল বাজারের স্টেশনে চেনা মুখ দেখেই গৌর মোদক ডাকলে—ও শালাবাবু, আসুন—আসুন—

খদ্দের দেখলেই গৌরের ডাকা অভ্যেস। ট্রেন থেকে যারা নামে তারা গৌরের দোকানে এসে বসে, এটা-ওটা খায়। ট্রেন এসে থামলেই গৌর ভেতরের ক্যাশ-বাক্সতে চাবি দিয়ে রাস্তার সামনে এসে খদ্দের ধরে।

প্রকাশ রায় খেতেও যেমন, পকেটের পয়সা খরচ করতেও তেমনি।

বললে—কী আছে আজ?

গৌর বললে—কচুরি, সিঙ্গারা, রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা, পান্তুয়া—

প্রকাশমামা আর বলতে দিলে না। বললে—থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। অত টাকা নেই আমার কাছে। শুধু চা দাও—

—শুধু চা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কলকাতায় গিয়ে সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন একেবারে হাত খালি। এখন নবাবগঞ্জে গিয়ে টাকা নেব তবে আবার কলকাতায় যেতে পারবো।

যখন প্রকাশমামার খাওয়া প্রায় হয়ে গিয়েছে সেই সময় হঠাৎ গৌর মোদক কথাটা বললে। বললে—শালাবাবু, আপনাদের বউ সেদিন বাপের বাড়ি গেল দেখলুম।

বাপের বাড়ি! সদার বউ!

কথাটা খট্ করে যেন প্রকাশমামার কানে বাজলো। বললে—কী বললে তুমি?

—আজ্ঞে সেদিন এখান দিয়ে আপনাদের বউ বাপের বাড়ি গেলেন কিনা, তাই বললুম।

প্রকাশমামা অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি ঠিক দেখেছ? কবে?

গৌর বললে—এই তো ক'মাস আগে। সঙ্গে আপনাদের কৈলাস গোমস্তা মশাই ছিল। তিনিই তো বললেন, বউমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন—

প্রকাশমামা আর দাঁড়ালো না। চায়ের দামটা দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। ট্রেন থেকে নেমে আরো কিছু খদ্দের তখনও দোকানে ঢুকে পড়েছে। গৌর মোদক তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

একটা সাইকেল-রিকশা ধরে একেবারে সোজা নবাবগঞ্জে এসে হাজির। কতদিন পরে প্রকাশমামার নবাবগঞ্জে আসা। সেই যে সদানন্দরই খোঁজে গিয়েছিল, তারপর সেই ব্যাপারেই মানদা মাসিকে খোসামোদ করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। দু'হাতে টাকাও খরচ হয়েছে, অথচ কাজের কাজও কিছু এগোয়নি। দিদি তো তা বোঝে না। কলকাতা কি সোজা জায়গা! সেখানে একটা পয়সা ছাড়া কেউ কথা বলে না। চারদিকে মারামারি কাটাকাটি। তারপর যুদ্ধের পর ভিড় তেমনি বেড়েছে। কোথা থেকে সব পঙ্গপালের মত দলে দলে লোক এসে হাজির হয়েছে। শেয়ালদা স্টেশনের কাছে গেলেই ছোট-ছোট ছেলেরা হাত পাতে। বলে—পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও না—

আসবার সময় মাসি বলেছিল—তুমি যেন আসতে বেশি দেরি কোর না ছেলে, টাকা নিয়েই চলে এসো—

বড়বাবুও কথা দিয়েছে সদানন্দকে খুঁজে বার করে দেবে। কিন্তু দেরি হচ্ছে শুধু সময়ের অভাবে। আর সময়টাও সত্যিই বড় খারাপ পড়েছে চারদিকে। সব কিছু যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। মানদা মাসিরও যেন টাকার টানাটানি পড়ে গেছে ঠিক এই সময়ে। কেবল টাকা চায়। রাধার কাছে গেলেও সে টাকা-টাকা করে। বাড়ি থেকে বউও লিখেছে টাকা পাঠাও। চারদিক থেকে যদি সবাই এমন টাকা-টাকা করে তো সে একলা মানুষ কোত্থেকে এত টাকা পাবে? টাকা দেবার মালিক তো ওই একজনই। দিদি! সেই দিদি যদি একদিন হাত গুটিয়ে বসে তো তা হলেই চিত্তির।

কিন্তু প্রকাশমামা জানতো না যে পৃথিবী তখন তলে-তলে অন্য এক ভূগোল সৃষ্টি করে চলেছে। ভূগোলের রং বদলাতে শুরু করেছে নিঃশব্দে। যা ছিল লাল তা সমস্তই তখন বুঝি সবুজ হতে শুরু করেছে। শুধু ভূগোলই বা কেন, ইতিহাসও তখন নতুন মানুষের কলমে

নতুন করে লেখা হয়ে চলেছে আর এক নতুন কালিতে। একের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে বহুর, বড়র সঙ্গে ছোটর আর ভেতরের সঙ্গে বাইরের। মতবাদের সঙ্গে মতবাদের বিরোধে সারা পৃথিবীটা তখন ভাগ-ভাগ হয়ে গেছে। নবাবগঞ্জের চৌধুরী বাড়িটার মত অতীতের কর্তাবাবুরা নিজেদের সমস্ত কৃতকার্যের মধ্যে নিজেদের ধ্বংসস্তূপ দেখে নিজেরাই হতবাক হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। আর কপিল পায়রাপোড়া মাণিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকের দল তখন কবরের তলা থেকে হা-হা করে প্রতিশোধের অট্টহাসি হেসে সমস্ত নবাবগঞ্জকে সচকিত করে তুলছে।

বেহারি পাল তার দোকানে বসে দেখলে রিক্শাটা আসছে।

—করে এলে হে শালাবাবু?

—আজ্ঞে, আজ পাল মশাই আজ—আপনাদের খবর সব ভাল তো?

বারোয়ারিতলায় নিতাই হালদারের দোকানের মাচার ওপরকার পৃথিবীটার মূলও বুঝি তখন সব কাণ্ডকারখানা দেখে ধসে গিয়েছিল। আগেকার সে জলুস আর নেই কারো। অন্যদিন হলে তারা শালাবাবুকে ডাকতো। তার সঙ্গে দু'একটা রসিকতার কথা বলতো। কিন্তু সবাই শালাবাবুকে দেখে নিঃশব্দে শিউরে উঠলো। একটা উদ্যত খড়্গ যেন সকলের মাথার ওপর ঝুলছে।

রিকশার ওপর বসে শালাবাবু নিজ থেকেই বললে—কী গো, আমি এলুম! কেমন আছো গো সব তোমরা?

—ভালো।

শালাবাবু কথার রেশটা বাড়াবার জন্যে বলে উঠলো—কলকাতায় থেকে থেকে আর নবাবগঞ্জে আসতে ইচ্ছে করে না হে—তোমরা সব কেমন ঝিম্ মেরে গেছো মনে হচ্ছে! তোমাদের তাস খেলা কেমন চলছে?

এ-কথার আর কেউ কোনও সাড়-শব্দ দিলে না। রিকশাটা গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে চৌধুরীবাড়ির সদরে।

—এই রাখ্ রাখ্, এখানেই রাখ্ বাবা।

দাম মিটিয়ে দিয়ে চারদিকে চেয়ে কেমন অবাক হয়ে গেল প্রকাশ। কই, সব কোথায় গেল? চণ্ডীমণ্ডপে এমন সময় তালা ঝুলছে কেন? পরমেশ মৌলিক কোথায় গেল সেরেস্তা ছেড়ে? বাড়ির সদরের কাছে কাদের একটা গরু বেশ গুছিয়ে আয়েস করে বসে জাবর কাটছিল।

প্রকাশ বললে—এ কাদের গরু রে বাবা, আর জায়গা পেলে না, যাওয়া-আসার রাস্তার ওপর বসে পড়েছে, একেবারে আক্কেল বলে কিছু নেই—

ভেতরে বার-বাড়ির উঠোনে ঢুকে আরো অবাক—দীনু—দীনু—

শালাবাবুর গলার আওয়াজ পেয়ে কোথা থেকে সেই বার-বাড়ির কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আদর দেখাতে এল। তাকে দেখে প্রকাশমামা কিছু বুঝতে পারলে না। কুকুরটা এমন একটা জীব নয় যে তাকে প্রশ্ন করলে কিছু হদিস পাওয়া যাবে। কিন্তু এরা সব গেল কোথায়? কৈলাসেরও তো থাকার কথা!

—কৈলাস, কৈলাস!

কৈলাস কি আজকাল এত সকাল-সকাল বাড়ি চলে যায় নাকি?

কিন্তু বারবাড়ির বৈঠকখানার দিকে নজর পড়তেই আরো অবাক হয়ে গেল। সে-ঘরের দরজাতেও তালা ঝুলছে। আশ্চর্য তো, তালা ঝুলছে কেন? ভেতরে কারো সাড়াশব্দই বা নেই কেন? গৌরী, বিন্তুর মা—তারাও তো অন্ততঃ ভেতরে থাকবে!

ভেতরে বাড়িতে যাবার পথেই আটকে যেতে হলো। সেখানেও তালা ঝুলছে। এ কী হলো! এমন তো হয় না! তাহলে সব গেল কোথায়? বউমা না হয় বাপের বাড়ি গেছে বুঝলাম। কিন্তু এরা? এরা সবাই কোথায় গেল? জামাইবাবু দিদি, বাড়ি ছেড়ে সবাই গেল কোথায়?

সেই বার-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে দোতলার ঘরখানার দিকেও চেয়ে দেখলে। জানালাগুলো সব বন্ধ। তাহলে কি কেউ বাড়িতে নেই?

হঠাৎ পায়ে একটা কী ঠেকতেই চমকে উঠেছে প্রকাশ। পেছন ফিরেই দেখে সেই কুকুরটা। কুকুরটা একেবারে পায়ে-পায়ে তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে।

প্রকাশ একটা লাথি ছুঁড়লে তার দিকে—যা যা, পালা এখান থেকে, পালা—যা—

—কেমন আছেন শালাবাবু? এখন এলেন?

পাশের বেড়ার ওধার থেকে কার যেন গলা ভেসে এল।

প্রকাশ চেয়ে দেখলে ফকির। বেহারি পালের মুহুরি ফকির। ফকিরের দিকে এগিয়ে গেল প্রকাশ। বললে—এরা সব গেল কোথায় বলো তো ফকির? আমি যাবার আগে দেখে গেলুম একরকম, আর এসে এ-সব কী দেখছি! দিদি কোথায়? জামাইবাবু? তোমরা কিছু জান?

ফকির বললে—চৌধুরী মশাই তো নেই, উনি ভাগলপুরে চলে গেছেন—

—ভাগলপুরে? কেন? তাহলে এখানকার সব দেখাশোনা কে করছে? আরি দিদি? দিদিও কি জামাইবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরে গেল নাকি?

রাস্তা থেকে হঠাৎ কে যেন বললে—কে? শালাবাবু নাকি? কখন এলেন?

প্রকাশ চেয়ে দেখলে। পরমেশ মৌলিক। পরমেশ মৌলিক রাস্তা দিয়ে বারোয়ারি-তলার দিকে যাচ্ছিল। শালাবাবুকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

পরমেশ মৌলিককে দেখে প্রকাশ যেন অকূলে কূল পেলে। তাকে লক্ষ্য করে রাস্তার দিকেই চলতে লাগলো সে। বললে—কী হে, চণ্ডীমণ্ডপে তালা ঝুলছে কেন? তোমরা সব কাজ-কর্ম করো না?

পরমেশ বললে—আজ্ঞে চৌধুরী মশাই তো নেই, তিনি ভাগলপুরে চলে গেছেন—

প্রকাশ বললে—তা জামাইবাবু ভাগলপুরে চলে গেছেন বলে কি একেবারে চিরকালের মত চলে গেছেন? তিনি না থাকলে কি আর তোমরা কাজকর্ম কিছু করবে না? আর দিদি? দিদিও কি সঙ্গে গেছে নাকি? এসব এখন দেখছে কে? কৈলাস কোথায় গেল? আর দীনু? দীনু কোথায়?

পরমেশ তবু কিছু উত্তর দিলে না। তার মুখে যেন কথা ফুরিয়ে গিয়েছে।

—কী গো, উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমার দিদির কথা বলছি!

পরমেশের মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোচ্ছিল না। কী কথাই বা সে বলবে? সে-সব দিনের মর্মান্তিক ঘটনা তো নবাবগঞ্জের লোকের কারো আর জানতে বাকি নেই! এমন সর্বনাশ যে হবে তা বুঝি কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ এই তো সেদিনের ঘটনা।

রাস্তায় তখন আর একজন কে যাচ্ছিল। সেও প্রকাশকে দেখতে পেয়েছে। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—কী শালাবাবু, কখন এলেন?

প্রকাশ দেখলে—বংশী ঢালী। তারপর আস্তে আস্তে আরো অনেকে জুটে গেল।

সকলেরই এক প্রশ্ন। কখন এল শালাবাবু? এতদিন কোথায় ছিল? প্রকাশ বললে—আমার দিদিও কেন এই সময়ে ভাগলপুরে চলে গেল? কবে আসবে তারা?

ততক্ষণে সদর দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারাও শালাবাবুকে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেছে। এত ঘটনার পর যে চৌধুরীবাড়ির মালিক-পক্ষের কেউ আবার এ-বাড়িতে আসবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। সে-সব কাণ্ড কি সহজ কাণ্ড! সারা গাঁ-ময় তখন টি টি পড়ে গেছে। চৌধুরী মশাই-এর নামে তখন ছি-ছিৎকার পড়ে গেছে সব জায়গায়। সবাই আড়ালে আলোচনা করে, কিন্তু গণ্যমান্য ভদ্রলোকের বাড়ির বউ ঝির ব্যাপার, সব কথা প্রকাশ্যেও বলতে চায় না কেউ, অথচ বলবার মত এমন বিষয়টা চেপে রাখতেও কেউ পারে না। কানাঘুষো থেকে প্রথমে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে সেটা পৌঁছোয়। তারপর গ্রাম ছাড়িয়ে একেবারে মহকুমা শহরে।

তারপর?

শালাবাবুর মাথায় তখন বজ্রাঘাত হয়েছে। আবার বললে—তারপর?

এ কি সহজ ব্যাপার যে এক কথায় সব কাণ্ডটা বলতে পারবো! এত সময় তোমারও নেই, আর আমার কলমেও এত জোর নেই যে সেদিনকার সব কেলেঙ্কারির কাহিনী তোমাকে বিশদ করে বলতে পারবো!

কোথাকার কোন্ নরনারায়ণ চৌধুরী একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এখানে এই নবাবগঞ্জে তিনি একটা কালজয়ী বংশের প্রতিষ্ঠা করে যাবেন আর পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাঁর অবিনশ্বর কীর্তিকলাপ যুগ যুগ ধরে এখানে সুচিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাঁর সেই স্বপ্নের কী গতি হলো তা তিনি দেখে যেতে পারলেন না বটে, কিন্তু দেখলে তাঁর পুত্র, তাঁর পৌত্র আর নবাবগঞ্জের এপাড়া-সেপাড়ার অগণিত জনসাধারণ। আর যাদের দেখবার সৌভাগ্য হলো না তারা শুনলো। শুনে ছি ছি করতে লাগলো বটে কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্যে ছি ছি করলে তিনি তা শুনতে পেলেন না। নিজের অপঘাত-মৃত্যুর পাপে তাঁর আত্মা তখন কোথায় কোন্ লোকে ছটফট করছে কে জানে! এক গণ্ডুষ জলের জন্যে তিনি কোথাও অশরীরী আর্তনাদ করছেন কিনা তারও কোনও সংবাদ জানবার তখন উপায় নেই।

কিন্তু যারা হাতের কাছের মানুষ, তাদের খবর তখন জানা যাচ্ছে। চৌধরী মশাই তখন আর বাড়ি থেকে বেরোন না। চণ্ডীমণ্ডপের কাছারিতেও আসেন না। যখন কারো দেখা করবার দরকার হয় তখন তাঁর কাছেই সবাই যায়। দরকার হলে টাকা চায়, টাকা দেয়। খাজনার টাকা দিতে গেলে চৌধুরীবাড়ির বার-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায় গিয়ে উঠে তাঁর কাছে যেতে হয়।

নয়নতারা চলে যাবার পর থেকেই যেন বাড়িটার লক্ষ্মীশ্রী চলে গিয়েছিল। হয়ত নয়নতারা ছিল লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে পারেননি চৌধুরী মশাই। সদানন্দকে যেমন একদিন কেউ ধরে রাখতে পারেননি তেমনি নয়নতারাকেও কেউ ধরে রাখতে পারেনি চৌধুরীবাড়িতে। যাবার দিন বারোয়ারিতলায় আর লোক ধরে না। চৌধুরীবাড়ির সদরেও আর লোকের কম্‌তি নেই।

আগে আগে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কৈলাস গোমস্তা। মাঝখানে রজব আলির ছই-ঢাকা গরুরগাড়ি। গরুরগাড়িতে সামনে-পেছনে পর্দা। ভেতরের কাউকে দেখা যায় না। তুমি যে কায়দা করে নয়নতারার চেহারাটা একবার দেখবে তারও উপায় নেই। পর্দা তুলে ভেতরে উঁকি দেবারও উপায় নেই কারোর। সেখানে আছে দীনু। দীনু গাড়ির পেছন-পেছন পাহারা দিতে দিতে চলেছে।

কেদার কাছাকাছি গিয়ে দীনুকে জিজ্ঞেস করলে—ভেতরে তোমাদের বউ কি একলা যাচ্ছে নাকি গো? আর কেউ নেই?

দীনু বললে—না, বউমানুষ কি একলা বাপের বাড়ি যায়? সঙ্গে গৌরীপিসী আছে—

বেহারী পালের বউ বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল। নয়নতারা একলা ঘর থেকে বেরিয়ে গরুরগাড়িতে গিয়ে উঠলো। ওঠবার আগে একবার দিদিমার বাড়ির দিকেও চাইলে। কাউকে সেখানে দেখতে পাবার কথা নয়। তবু চেয়ে দেখলে। তারপর কাউকে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসলো। আর তার পেছনে-পেছনে গৌরীও গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

নয়নতারা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামে একটা চাপা হাহাকার পড়ে গেল।

—তা হ্যাঁ গো, বউমার বাপকে খবর দেওয়া হয়েছে তো?

একজন বললে—এ কি আর দেবার মত খবর যে আগে থেকে দেবে। মেয়ে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে তখনই বাপ জানতে পারবে।

আর একজন বললে—আহা, কী কপাল করেই বউটা এসেছিল! একদিনের তরেও সুখ পেল না গো। নিজের ভাতারই যাকে ছেড়ে চলে গেল তার আবার শ্বশুরবাড়ি! আর শ্বশুরের তো ওই কীর্তি! কী ঘেন্না মা, কী ঘেন্না!

অন্য একজন বললে—আর বউ-এর গয়না? গয়নাগাঁটি সঙ্গে নিয়ে গেল তো?

—সে তারক-জ্যাঠা আগেই বলে রেখে দিয়েছিল। যেমন সেজেগুজে বউ শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল তেমনি সাজিয়ে-গুছিয়েই বউকে বাপের বাড়ি পাঠাতে হবে। এমনি তাড়িয়ে দিলে চলবে না।

আগের লোকটা বললে—তা এতই যদি নাতির শখ চৌধুরী মশাই-এর তো চৌধুরী মশাই নিজেই তো আর একটা বিয়ে করতে পারতো!

—তাতেও যে লোকলজ্জা!

—এতই যদি লোকলজ্জার ভয় তো তখন মনে ছিল না? এখন লজ্জা-সরমের আর বাকীটা কী রইল?

পাশের লোকটা বললে—তা অত হ্যাঙ্গামে যাবার দরকারটা কী ছিল? গাঁয়ে তো ছেলের অভাব নেই, কারো কাছ থেকে দেখে-শুনে পছন্দ করে একটা পুষ্যিপুত্তুর নিলেই পারতো চৌধুরী মশাই!

নিতাই বললে—কেন, তার চেয়েও তো সোজা পথ ছিল একটা—

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো—কী পথ? কী পথ?

নিতাই বললে—কেন, চৌধুরী-গিন্নীর কি ছেলে হবার বয়েস ফুরিয়ে গিয়েছে? একটা ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তা আর-একটা তো বিয়োতে পারতো—

সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে।

কেদার বললে—দূর, চৌধুরী-গিন্নীকে সেদিন দেখলি নে তুই? কী রকম বুড়ি হয়ে গিয়েছে! সে-পথ থাকলে কি আর চৌধুরী মশাই চেষ্টা করতো না?

কিন্তু যাঁদের নিয়ে এত আলোচনা, এত কানাঘুষো, তাঁদের তখন আর চোখে দেখতে পায় না কেউ। আগে চৌধুরী মশাই নিজেই ক্ষেত-খামার দেখতে বেরোতেন। যেদিন বাগান ঘেরা হবে সেদিন নিজে সকাল থেকে গিয়ে জন-মজুরের কাজের তদারকি করতেন। কিন্তু তার পর থেকে আর তাঁর টিকি দেখতে পাওয়া যেত না।

লোকে বলতো—আহা, মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন চৌধুরী মশাই—

—কীসের কষ্ট? কষ্টটা কীসের?

—না, অমন জোয়ান ছেলে, এই বুড়ো বয়সে একমাত্তর ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বাপের মনে কষ্ট হয় না?

—তা অমন লোকের কষ্ট হওয়াই উচিত। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে। মাথার ওপর ভগবান বলে কেউ নেই ভেবেছে চৌধুরী মশাই? ভেবেছে ডুবে-ডুবে জল খেলে কেউ টের পাবে না?

একজন বললে—তবে ভাই বউ বটে, হ্যাঁ! বউ-এর মত বউ! অন্য কেউ হলে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিত। এ-বউ লেখাপড়া জানা বলে সকলকে জানান দিয়ে শ্বশুরের মুখে জুতো মেরে চলে গেল!

—যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল!

একজন অনেকক্ষণ ধরে বিবেচনা করে ভেবেচিন্তে বললে—আসলে ছেলেটারই দোষ! সব দোষই সদার। বাড়িতে সোমত্ত বউ রেখে সদা পালালোই বা কেন?

নিতাই বললে—কেন পালাবে না? সে কি আমাদের মত গো-মুখ্য? আমাদের বাপ-মা যাকে-তাকে একটা গলায় ঝুলিয়ে দিলে আর আমরাও তাকে নিয়ে ঘর করি। কিন্তু সদা তো কলেজে পড়েছে! রেল-বাজারের ইস্কুলে আর কলেজে যে এত বছর পড়লো তা কি মিছিমিছি! পেটে তার বিদ্যে পড়েছে যে!

—তুই থাম্, সেজন্যে সদা বাড়ি ছাড়েনি। ছেড়েছে অন্য কারণে।

—কী কারণে ছেড়েছে?

এই প্রশ্নে এসেই সবাই থেমে যায়। কেউ বলে বাপের ওপর রাগ করে, কেউ বলে কলকাতার কোন মেয়ের সঙ্গে নাকি লাভ ছিল।

—দূর দূর, সব বাজে কথা! ছেড়েছে সংসার করবে না বলে।

—কেন সংসার করবে না?

—আরে, দেখতিস না ছোটবেলা থেকেই কেমন বিবাগী-বিবাগী ভাব। কখনও আমাদের সঙ্গে তাস খেলেছে? আমাদের ক্লাবে যাত্রা করেছে? সেবার কত করে ধরলুম 'পাষাণী' বইতে বিশ্বামিত্র ঋষির পার্টটা নিতে, তা নিলে? কতবার দেখেছি একলা-একলা মাঠে-মাঠে ঘুরতে। ওপারে কালীগঞ্জের বাবুদের ভাঙা বাড়িটা পড়ে আছে, কতদিন হাট করতে গিয়ে দেখেছি সে ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। দেখা হলে জিজ্ঞেস করতুম—কী রে, ওখানে ঢুকছিস কী করতে? সদা হাসতো, কিছু বলতো না। আমি তখনই জানি ও একদিন বিবাগী হয়ে যাবে!

—বিবাগী হয়ে যাবে কেন! কোন্ দুঃখে?

—তোদের মতো মুখ্য মানুষদের নিয়েই যত জ্বালা! 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পালায় দেখিসনি, নিমাই বউকে ছেড়ে চলে গেল?

আসলে চৌধুরী-বংশ নিয়ে তর্কই হয়, কিন্তু ফয়শালা কিছুই হয় না। কিংবা হয়ত একটা ফয়শালা হোক সেটা কেউ চায় না। মনে হয় তারপর কী হবে সেইটেই তারা দেখবে। এখন তো বউ চলে গেছে, এখন চৌধুরী মশাই কী করবে? আবার কি বিয়ে করবে, না

পুষ্যি নেবে?

কিন্তু একদিন দেখা গেল ননী ডাক্তারকে নিয়ে কৈলাস সামন্ত হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির সদরে ঢুকছে!

—ডাক্তারবাবুকে ডেকেছে কেন গো গোমস্তা মশাই? কার অসুখ?

কৈলাস বললে—গিন্নীমার!

অসুখ এমন সব বাড়িতেই হয়ে থাকে। তবে নবাবগঞ্জের কারো বাড়িতে অসুখ করলে হুট্ করে কেউ ডাক্তার ডাকে না, টোট্‌কা-টাট্‌কা খেয়েই সেরে যায় সকলের জ্বরজারি। রেল-বাজারের ননী ডাক্তারকে ডাকলে মোটা টাকার গুনোগার দিতে হয়। কর্তাবাবুর যখন অসুখ হয়েছিল তখন রোজ আসতো ননী ডাক্তার। টাকার বাণ্ডিল নিয়ে গেছে তখন। কিন্তু আবার কার অসুখ? ছোটখাটো অসুখ হলে তো আর ননী আসতো না।

তারপর সেই ননী ডাক্তার রোজ-রোজ আসতে লাগলো।

কৈলাস গোমস্তাকে দেখেই সবাই জিজ্ঞেস করে—কী গো গোমস্তা মশাই, তোমাদের গিন্নীমা কেমন আছেন?

কৈলাস মুখ গম্ভীর করে বলে—না গো, ভালো না, বড্ড বাড়াবাড়ি—

কৈলাস গোমস্তা আড়ালে চলে গেলেই সবাই বলাবলি করে—বাড়াবাড়ি হবে না? পাপের ফল ফলবে না? চোখর জল ফেলতে ফেলতে বউটা চলে গেছে, তার চোখের জল কি মিথ্যে হবে গো?

কথাটা সবাই সায় দেয়। চোখের সামনে সমস্ত বাড়িটার ওপর যে অলক্ষ্মী নেমে আসছিল তা সকলের চোখেই পড়েছিল। সন্ধ্যে হলেই আলো নিভে যেত চণ্ডী-মণ্ডপের। পরমেশ মৌলিক অনেকক্ষণ চৌধুরী মশাই-এর জন্যে খেরো খাতা কোলে করে বসে থাকতো। তারপর যখন দেখতো চৌধুরী মশাই তখনও আসছেন না তখন আস্তে আস্তে দীনুকে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠাতো। দীনু ভেতর থেকে এসে বলতো—আজ আর ছোট মশাই খাতা দেখবেন না, কালকে দিনের বেলা দেখবেন বললেন—

আর তারপর একদিন বজ্রাঘাত হলো।

সবাই শুনলো—চৌধুরী-গিন্নী মারা গেছে।

সে এক অদ্ভুত মৃত্যু! কোনও কান্না-কাটির শব্দ নেই। আর কাঁদবার তখন কে-ই বা ছিল বাড়িতে যে কাঁদবে! গৌরী গিয়ে ডেকে এনেছিল বেহারি পালের বউকে। বেহারি পালের বউ এল। বেহারি পাল নিজেও এল। খবর পেয়ে আরো অনেকে এল। বুড়োমানুষ তারক চক্রবর্তী লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করে এসে হাজির হলো।

বেহারি পালের বউ যখন ভেতরের ঘরে গিয়ে পৌঁছুল তখন চৌধুরী-গিন্নী স্থিরদৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে আছে। মনে হলো যেন বলছে—তোমরা বলে দাও, আমি কী দোষ করেছি, আমাকে বলে দাও তোমরা—

কিন্তু তখন কে-ই বা সে কথা বলে দেবে, আর কে-ই বা সে প্রশ্নের উত্তর শুনবে! প্রশ্ন আর উত্তরের ঊর্ধ্বলোকে আর এক মহাজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন চৌধুরী গিন্নীর ছোট প্রশ্নটা যেন একেবারে নিরর্থক হয়ে গেছে। যখন চৌধুরী-গিন্নীকে নিয়ে পাড়ার ছেলেরা নদীর ধারের শ্মশানের চিতার ওপর তুললো, তখনও সেই প্রশ্নটা যেন তার চোখের তারায় অনির্বান হয়ে ঝুলছিল। আর তারপর যখন তার সমস্ত শরীরটা আগুনের শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখনও বুঝি তার সে প্রশ্নটার উত্তর মেলেনি। তাই বুঝি সে প্রশ্ন ধোঁয়া হয়ে সমস্ত আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে কি-দিগন্তে ছুটে বেড়াতে লাগলো। অনুচ্চারিত শব্দে যেন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সকলকে প্রশ্ন করতে লাগলো—তোমরা বলে দাও, কী

অপরাধ করেছি আমি, বলে দাও তোমরা—

—তারপর?

তারপর চৌধুরী মশাই একেবারে একলা হয়ে গেলেন। একেবারে একলা। সেই যে দোতলার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন, সেখান থেকে আর বেরোলেন না। গৌরী রান্না করে খাবার দিয়ে আসে তাঁর ঘরে। আপন মনে বিড়বিড় করে তিনি যেন সব-সময় কী বকেন আর তারপর যখন সন্ধ্যে হয় তখন চারদিকে জানালা দরজা বন্ধ করে বিছানায় এলিয়ে পড়েন।

কিন্তু তাঁরও ওই এক প্রশ্ন! তোমরা বলে দাও, কী অপরাধ করেছি আমি, বলে দাও তোমরা—আমার পূর্বপুরুষের এই সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য, এই স্থাবর অস্থাবর এত গয়নাগাঁটি-জমিজমা-পুকুর-বাগান এ কার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি যাবো? কার ওপর গচ্ছিত করে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো? এই সর্ষে ছোলা-ধান-পাটের ক্ষেত, এই পুকুর, বিল, বাগান—এসব কিছুর স্বত্ব কে ভোগ করবে? কার উত্তরাধিকারের মধ্যে দিয়ে আমি অতীন্দ্রিয়লোকে গিয়ে অনন্তকাল ধরে অক্ষয় হয়ে বাঁচবো?

এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ হতো। কথা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন মানুষের গলা দিয়ে অস্পষ্ট একরকম শব্দ বেরোয় ঠিক তেমনি। কর্তাবাবুর অশরীরী উপস্থিতি যেন তাঁকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতো।

কর্তাবাবুর অশরীরী উপস্থিতির অসহ্যতায় চৌধুরী মশাই সন্ধ্যেবেলাই দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিতেন। তবু রেহাই পেতেন না তিনি। কর্তাবাবুর গলা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠতো। তিনি স্পষ্ট গলায় বলতেন—মায়া-দয়া কোর না বাবা, কারোর ওপর মায়া-দয়া কোর না, মায়া-দয়া করলেই সর্বনাশ, তাহলে এই জমি-জমা, পুকুর-বাগান কিছুই আর থাকবে না—

চৌধুরী মশাই বলতেন—কিন্তু আমি তো মায়া-দয়া করিনি কর্তাবাবু, আমি তো কারোর ওপর কোনও মায়া-দয়া দেখাইনি। আমি তো কারোর এক পয়সার বাকি খাজনা ছাড়িনি, যে আমায় ঠকাতে চেয়েছে তাকে তো আমি রেহাই দিইনি, আমি তো স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে নিজের পুত্রবধূকেও অব্যাহতি দিইনি? তবে? তবে কেন আমার এ সর্বনাশ হলো? তোমার কথা বর্ণে বর্ণে মেনেও কেন আমি সর্বস্বান্ত হলাম?

এ-প্রশ্নের কোনও জবাব মিলতো না কারো কাছে। সবাই তখন চৌধুরী মশাই-এর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন সকলের সান্নিধ্য থেকে। সে তখন তাঁর এমন এক জীবন যাকে গ্রহণ করাও বলে না আবার বর্জন করাও বলে না। তখন তিনি নিজের জন্মভূমি, নিজের বাড়ি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কেউ এলেও তার সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। যেন নিজের কৃত-কর্মের অপরাধের বোঝায় তিনি নিজেই ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত!

শালাবাবু সমস্ত ঘটনাগুলো শুনলে। তার চোখের সামনে দিয়ে অনেকগুলো স্বপ্ন, অনেকগুলো স্মৃতি যেন খুব তাড়াতাড়ি ভেসে গেল। সেই কবে দিদির বিয়ের সময় সে নিজের বউ আর ছেলে মেয়ে ছেড়ে ভাগলপুর থেকে চলে এসেছিল, তার পর থেকে এই নবাবগঞ্জকে কেন্দ্র করেই ; তার জীবন কত দিক পরিক্রমা করেছে। সেই সদানন্দ যখন ছোট ছিল তখন তাকে নিয়ে কোথায় কোথায় গেছে। কতদিন রানাঘাটে রাধার বাড়িতে, কতদিন কলকাতার কালীঘাটে। আর যখনই টাকার দরকার পড়েছে তখনই এসে হাত পেতেছে দিদির কাছে। টাকা চাইলেই দিদি তার সিন্দুকটা খুলেছে আর দু'হাতে টাকা বার করে দিয়েছে। সেই দিদির মারা মাওয়ার খবর শুনে প্রকাশের মত লোকও কেমন অসহায়ের

মত বাড়িটার দিকে শেষবারের মত চেয়ে দেখলে। তার মনে হলো সব শেষ। চিরকালের মত সব শেষ।

—আর জামাইবাবু? জামাইবাবু কোথায় গেল?

বেহারি পাল মশাই বললে—তোমার জামাইবাবু তো কিছুদিন এখানেই ছিল। একদিন দেখলুম গরুর গাড়িতে করে ইস্টিশানের দিকে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—কোথায় যাচ্ছেন চৌধুরী মশাই, তা চৌধুরী মশাই বললেন—ভাগলপুরে শ্বশুর মশাই-এর নাকি অসুখ—

শালাবাবু চমকে উঠেছে। বললে—পিসেমশাইএর অসুখ? তাই নাকি? কী রকম অসুখ?

বেহারি পাল বললে—তা কী জানি, তোমার জামাইবাবু তো গেছেন সেই মাসখানেক হলো এখনও তো এলেন না। আর কী জন্যেই বা আসবেন বলো? এখেনে তো আর কেউ রইল না। তোমার দিদি রইল না, তোমার ভাগ্নেও রইল না, আর তোমার ভাগ্নে-বউ সেও পর্যন্ত রইল না। তাহলে আর এখানে একলা একলা পড়ে থাকবেন কী নিয়ে বলো না? কার জন্যে পড়ে থাকবেন? আর সম্পত্তি? যাদের জন্যে সম্পত্তি করা তারাই যখন রইল না তখন আর কাদের জন্যেই বা সম্পত্তি দেখবেন?

এরপর শালাবাবু আর দাঁড়ালো না। বললে—যাই—

বেহারি পাল আবার বললে—আর তা ছাড়া তোমার পিসেমশাই-এরও তো কেউ নেই? কীর্তিপদবাবুর? তাঁরও তো অনেক টাকা! সুলতানপুরের অত সম্পত্তি! তিনি মারা গেলে তো তোমার জামাইবাবু সব পাবে। তোমার পিসেমাশাই-এর তো আর কোনও সন্তান নেই?

প্রকাশ বললে—না।

—তাহলে? তোমার জামাইবাবুই তো এখন সেই সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশান। তারপর তোমার জামাইবাবুর পর আর কে পাবে? সদা ফিরে এলে সদা পাবে, আর নয় তো তুমি!

এত কথা প্রকাশের মনে পড়েনি। তাহলে? তাহলে তো শেষ পর্যন্ত পিসেমশাই-এর সমস্ত সম্পত্তি তার কপালেই নাচছে। কী আশ্চর্য! কথাটা খেয়াল হতেই আর দাঁড়ালো না প্রকাশ। বললে—যাই পাল মশাই, আমি যাই—

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললে—যাই হে, কিছু মনে কোর না তোমরা, পিসেমশাই-এর অসুখ, এ সময়ে আমার বাইরে থাকা উচিত নয়—

বলে রেল-বাজারের দিকে হন হন করে হাঁটা দিলে। তাড়াতাড়ি পা চালালে দুটোর ট্রেনটা ধরা যাবে!

পেছন থেকে বেহারি পাল জিজ্ঞেস করলে—খাওয়ার কী হবে তোমার শালাবাবু? দুটো খেয়ে গেলে হতো না?

চুলোয় যাক গে খাওয়া! টাকা ছড়ালে কপালে খাওয়া অনেক জুটবে। এখন যদি গিয়ে ভালোয় ভালোয় প্রকাশ দেখে পিসেমশাই মারা গেছে তবেই সুরাহা। জামাইবাবু একলা আর কত খাবে! দেখা-শোনা করতেও তো লোক দরকার! আর তারপরে জামাইবাবুই বা আর ক'দিন? জামাইবাবু মারা গেলে তখন?

কথাটা কল্পনা করতেই প্রকাশ দু'হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলে। হে মা কালী, হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমি জীবনে কোনও পাপ করিনি, জীবনে কখনও কোনও অন্যায় করিনি, জীবনে কারো টাকা মারিনি, আমার দিকে একটু দেখো মা। আমি বড় অনাথ! কে সম্পত্তি

করে যায় আর কে তা খায়! ইচ্ছাময়ী সবই তোমার ইচ্ছা, আমরা তো কেবল নিমিত্ত মাত্র। জয় মা কালী, জয় মা মঙ্গলচণ্ডী!

বলে মোবারকপুরের রাস্তা ধরলে। মোবারকপুরের রাস্তাটা পেরোলেই সাইকেল রিকশার আড্ডা। সেখান থেকে এক দৌড়ে একেবারে সোজা রেল-বাজার।

প্রকাশ হন-হন করে রাস্তা মাড়াতে লাগলো।

সমরজিৎবাবু ঠিকই করে ফেলেছিলেন। রোজ-রোজ অশান্তির চেয়ে চিরকালের মত একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে রাখা ভালো। যেদিন রাণাঘাট স্টেশনে সদানন্দকে দেখেছিলেন সেইদিন থেকেই একটা ক্ষীণ ইচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। তারপর বাড়িতে অশান্তিটা যত বেড়েছে ততই সে ইচ্ছেটা আরো বড় হয়ে মনের মধ্যে দৃঢ়-মূল হয়েছে। পৈত্রিক সম্পত্তিটার কথা ভেবেই একদিন নিজের করে নিয়েছিলেন তাঁর খোকাকে। ভেবেছিলেন স্বভাবচরিত্র ভালো, বংশটাও ভদ্র, এক বিধবা ছাড়া তখন খোকার কেউ ছিল না আর। যতদিন বুড়ি-মা বেঁচে ছিল ততদিন তাকে মাসে মাসে পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছেন। তারপর যেদিন তিনি মারা গিয়েছেন তখন থেকে মুক্তি।

একদিন খোকা এসে সামনে দাঁড়ালো। সমরজিৎবাবু বললেন—কী হলো? চাই কিছু তোমার?

খোকা বললে—না, চাই না কিছু—

—তাহলে?

খোকা বললে—আমি একটা চাকরি নিয়েছি—

চাকরি! চাকরি শুনেই সেদিন বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন সমরজিৎবাবু। বললেন—চাকরি নিয়েছ মানে? কে তোমায় চাকরি নিতে বলেছে? কিসের চাকরি?

—পুলিসের।

পুলিসের চাকরি! সমরজিৎবাবুর তখন যেন বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বললেন—হঠাৎ যে তুমি চাকরি নিলে? কত মাইনে?

—দেড় শো টাকা।

—দেড় শো টাকা মাইনে নিয়ে কি তুমি রাজা হবে? আমি তো চারদিকে চাঁদাই দিই মাসে দেড় শো টাকা করে। আর তুমি এ বাড়ির ছেলে হয়ে কিনা দেড় শো টাকা মাইনের চাকরি করবে?

গৃহিণী গোলমাল শুনে ঘরে এসে দাঁড়ালো। বললে—কী হয়েছো গো? কী বলছো খোকাকে?

সমরজিৎবাবু বললেন—ওই দেখ, তোমার ছেলে দেড় শো টাকা মাইনের পুলিসের চাকরি নিয়েছে—

গৃহিণী বললে—সে কী রে খোকা, তোকে চাকরি নিতে কে বললে?

খোকা বললে—কেউ বলেনি—

—কেউ বলেনি তো চাকরি নিতে গেলি কেন? দরখাস্ত করেছিলি?

—না।

অন্য ছেলের বাবা-মা'রা ছেলের চাকরি পাওয়ার খবরে খুশী হয়, খুশী হয়ে কালী-বাড়িতে গিয়ে পুজো দেয়। কিন্তু এ-বাড়িতে সেদিন উল্টো হয়েছিল। ছেলের চাকরি পাওয়ার

খবর যেন তাদের কাছে শোক সংবাদ বলে মনে হয়েছিল। খোকা রোজ ময়দানে ফুটবল খেলতে যেত। সেখান থেকেই একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়েছিল। বন্ধুর বাবা পুলিসের একজন বড় অফিসার। খোকার স্বাস্থ্য দেখে তাঁর খুব ভালো লেগেছিল।

বলেছিলেন—তুমি চাকরি করবে?

কী খেয়াল হয়েছিল খোকার কে জানে! বলেছিল—হ্যাঁ—

বলতে গেলে খোকার সেই স্বাস্থ্য দেখেই চাকরি। আর তার সঙ্গে তার ফুটবল খেলতে পারার গুণ। সমরজিৎবাবুও যে তাকে নিজের ছেলে করে নিয়েছিলেন সেও সেই স্বাস্থ্য। অন্য লোকের যে জিনিসটা থাকলে জীবন সুখের হয়, খোকার কাছে সেই জিনিসটাই শেষ পর্যন্ত হলো কাল।

প্রথম দিকে সমরজিৎবাবু বলেছিলেন—তুমি চাকরি ছেড়ে দাও—তোমার চেয়ে যাদের অবস্থা খারাপ তারা এ চাকরি পেলে বেঁচে যাবে—

কিন্তু খোকার মনে তখন ক্ষমতার লোভ। বাড়িতে বসে বসে খাওয়ার মধ্যে আরাম থাকলেও ক্ষমতা নেই। চাকরিতে ক্ষমতা আছে। দশজনকে হুকুম করতে পারবে। দশজনে ভয়-ভক্তি করবে। চোর-গুণ্ডা-বদমায়েসরাও খাতির করবে।

তখন একদিন সমরজিৎবাবু দেখলেন ছেলে রাত করে বাড়ি ফিরছে। আবার কোনও দিন রাত্রে বাড়িতে ফিরছেও না। জিজ্ঞেস করলে বলে—ডিউটি ছিল। তারপরে একদিন দেখলেন মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। সেদিন আর দেরি করলেন না। একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে শুভদিনে খোকার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এ-সব ঘটনা সদানন্দ এ-বাড়িতে আসার অনেক আগেকার ঘটনা। কিন্তু ক দিন এখানে থাকতে থাকতে সদানন্দ সব জেনে ফেললে! যেদিন অনেক রাত্রে প্রথম কাকা-বাবুর সঙ্গে তার ছেলের কথা-কাটাকাটি হয়েছিল, যেদিন মহেশ তার বড় দাদাবাবুকে বাড়ি থেকে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল, সেইদিন থেকেই সন্দেহটা গাঢ় হয়েছিল তার। তারপর থেকে আরো অনেকবার ওই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হলো। সমরজিৎবাবু ক্রমেই যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠছিলেন। ভলো করে আগেকার মত আর কথা বলতেন না সদানন্দের সঙ্গে। কিন্তু সদানন্দও ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। সময় পেলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো। কোথায় সেই নবাবগঞ্জের ফাঁকা অবহাওয়া আর কোথায় এই ঘিঞ্জি শহরের গোলমাল। ক'দিন আগেই এখানে দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে, চলতে ফিরতে ভয় করে সকলের। তবু বাড়ি থেকে না বেরিয়েও কেউ থাকতে পারে না। কিন্তু এই শহর ছাড়া কোথায়ই বা সে যাবে! বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিল তখন কিছুই ঠিক ছিল না কোথায় সে যাবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন সে এখানে এসে পড়েছে তখন কী-কাজই বা সে এখানে করবে! এ পৃথিবীটাই হয়ত এমনি। এখানে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কেবল প্রয়োজনের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রয়োজন থাকলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো, তোমার সঙ্গে আমি এক বিছানায় শোব, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আমি আবার তোমাকে দূর করে দেব। কিন্তু কেন ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে না তোমার সঙ্গে? কেন প্রয়োজনের বদলে প্রীতি দিয়ে তুমি আমাকে আকর্ষণ করবে না?

সেদিন রাস্তায় চলতে চলতে দেখলে বুড়ি মতন একজন মেয়েমানুষ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে। সদানন্দ অবাক হয়ে গেল! তার দিকে এমন করে চেয়ে দেখছে কেন?

মনে হলো বুড়িটা যেন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাচ্ছে। যেতে যেতে তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—আপনি আমায় কিছু বলবেন?

বুড়িটা বললে—তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?

সদানন্দ বললে—আমি বউবাজারে থাকি।

—বউবাজারে! বউবাজারে থাকো বাবা তুমি তা এদিকে এসেছো কেন? কোনও কাজ আছে বুঝি?

সদানন্দ বললে—না এমনি বেড়াচ্ছি—কেন? আপনার কিছু দরকার আছে?

বুড়িটা বললে—দরকার তো ছিল বাবা, কিন্তু তোমাকে তা বলি কী করে তাই ভাবছি—। তুমি বামুন তো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণ! কেন?

—আমি বললে কি আর তা বিশ্বাস করবে বাবা? তোমরা তো আজকালকার ছেলে, ঠাকুর-দেবতাতে তো তোমাদের বিশ্বাস নেই। তাই বলবো কি না ভাবছি।

সদানন্দ বললে—বলুন না কী বলবেন?

বুড়ি বললে—আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম বাবা।

স্বপ্ন?

—হ্যাঁ বাবা স্বপ্ন। ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছিল যে সকাল বেলা চান করে আসার পথে যদি কোনও বামুনের ছেলেকে দেখতে পাস তা তাকে বাড়িতে এনে তার চরণ পুজো করিস!

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। এ আবার কী কথা! চরণ-পুজো!

বললে—আপনি আমার চরণ-পূজো করবেন? কেন?

বুড়ি বললে—ওই যে বললুম বাবা ঠাকুরের স্বপ্ন। তা আমার সঙ্গে একবার আমার বাড়িতে যাবে? আমি তোমার চরণ-পূজো করবো!

সদানন্দর কেমন সন্দেহ হলো। চেনা নেই শোনা নেই যার-তার বাড়িতেই বা যাবে কেন সে?

বললে—দেখুন, আমি আপনাকে চিনি না আর আপনি আমার চরণ-পূজো করবেন কেন তাও বুঝতে পারছি না। এরকম স্বপ্নই বা আপনি দেখতে গেলেন কেন? আর আমি ছাড়া কি আর বামুন কেউ নেই কলকাতায়? আপনার বাড়ির পাশেই তো কত বামুন পেতে পারেন।

বুড়ি বললে—তাতে তো কাজ হবে না বাবা! চান করে উঠেই যে আমি তোমার মত বামুনকে প্রথম দেখেছি। অন্য কোন বামুনের চরণ-পূজো করলে তো আমার কোনও লাভ হবে না!

সদা তবু বুঝতে পারলে না। বললে—লাভ মানে? আমার চরণ-পূজো করে আপনার কী লাভ?

বুড়ি বললে—তোমাকে আর দুঃখের কথা বলবো কী বাবা। আমার বাতের অসুখ। বাতের অসুখে আমি জের-বার হয়ে যাচ্ছি। শেষকালে বাবা তারকনাথের মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়েছিলুম। সেখানে বাবা স্বপ্ন দিলেন যে পূর্ণিমের দিন গঙ্গায় চান করবি, চান করে আসার পথে প্রথম যাকে বামুন বলে জানতে পারবি তার চরণ-পূজো করলে তোর বাতের ব্যথা সেরে যাবে। এ কোমরের ব্যথা আমার এমন যে একেবারে নড়ে বসতে পারিনে। তা তুমি বাবা আমার এ উব্‌কারটা করতে পারবে না!

এ এক অদ্ভুত প্রস্তাব! এমন ঘটনা সদানন্দ জীবনে কখনও শোনেনি কারো কাছ থেকে।

বললে—আমার চরণ-পূজো কী করে করবেন? কতক্ষণ সময় লাগবে?

বেশিক্ষণ তোমায় কষ্ট দেব না বাবা। তোমার পায়ে ফুল-গঙ্গাজল দিয়ে পেন্নাম করবো আমি আর বাজারের মিষ্টি এনে তোমাকে দেব, আর তুমি পেসাদ করে দেবে! আধঘণ্টার মধ্যেই তোমায় আমি ছেড়ে দেব বাবা—বেশি সময় লাগবে না—

—আপনার বাড়ি এখান থেকে কতদূর?

—এই তো কাছেই বাবা, বেশি দূর নয়।

সদানন্দ কী ভেবে বললে—আচ্ছা চলুন—

তার সামান্য চরণ-পূজোয় যদি বুড়ির ও-বাতের ব্যথা সারে তো কী এমন তার ক্ষতি। সদানন্দ বুড়ির পেছন-পেছন চলতে লাগলো। একটা গলি দিয়ে ঢুকে আর একটা গলির ভেতরে কিছুক্ষণ গিয়ে বুড়ি বললে—এই আমার বাড়ি, এসো বাবা, আমার সঙ্গে এসো—

বলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো। তারপর একটা দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো। কে একজন এসে দরজা খুলে দিলে। পাশেই একটা ঘর। সেই ঘরের মধ্যে সদানন্দকে নিয়ে গিয়ে বললে—তুমি এখেনে একটু বোস বাবা—

সদানন্দকে ঘরে বসিয়ে তারপর বুড়ি ভেতরের দিকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর ভেতরে গিয়ে গলা নামিয়ে ডাকতে লাগলো—কই রে বাতাসী, কোথায়? ও বাতাসী—

বাতাসী ভেতরে কী করছিল কে জানে! মাসির ডাকে সামনে এসে বললে—কী মাসি?

মাসি বললে—ওলো, সেই ছেলেটাকে এতদিনে পেয়েছি রে?

—কোন্ ছেলেটাকে?

মাসি বললে—সেই যে, সে-বার খোঁজখবর করবার জন্যে তোকে দিয়ে বড়বাবুকে একটা ছবি দিয়েছিলুম, সেই যে আমার প্রকাশ ছেলের কাছ থেকে আগাম একশো টাকা নিইছিলুম। পরে আরো ন'শো টাকা দেবার কথা আছে? তোর মনে পড়ছে না?

—তা কী করে তাকে চিনতে পারলে?

মানদা মাসি বললে—চিনতে পারবো না বাছা? তার ছবি তো তোর কাছে দিইছিলুম বড়বাবুকে দেবার জন্যে। বড়বাবুকে ছবিটা দিয়েছিলি তুই?

বাতাসী বললে—সে তো আমি সেই দিনই দিয়েছিলুম—

মানদা মাসি বললে—তা সে ছবিটা এখন কোথায়? বড়বাবুর কাছে না তোর কাছে?

—সে তো বড়বাবুর কাছে দিইছিলুম, বড়বাবুর কাছেই আছে।

—তা বড়বাবু আজকে আসবে তো?

বাতাসী বললে—এই তো ভোর বেলাই বাড়ি চলে গেল, বড়বাবুর বাড়িতে এখন আবার গণ্ডগোল চলছে কিনা, কলকাতায় থাকলে আপিস থেকে সোজা এখেনেই চলে আসবে—

মানদা মাসি বললে—এখন ছেলেটাকে তো ভুজুং দিয়ে তোর বাইরের ঘরে এনে বসিয়ে রেখে এসেছি। যতক্ষণ না বড়বাবু আসে ততক্ষণে তোর এখানে আটকে রাখতে পারবি নে? তুই খাবার-দাবারের কিছু বন্দোবস্ত কর। আমি যাই অনেকক্ষণ ছেলেকে বসিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি—

সমরজিৎবাবুর পূর্বপুরুষ যেমন গ্রামের জমি-জমা করেছিলেন, তেমনি বুঝেছিলেন যে গ্রামে যত জমিজমাই থাক, কলকাতায় একটা সম্পত্তি করতেই হবে। ভাঁড়ার যখন উপচে পড়ে তখন বাড়তি সম্পত্তি কোথায় লগ্নী করবো তার সমস্যা উদয় হয়। সেই আদিকালে এই

বউবাজার অঞ্চলের বাড়িটার উদ্ভব হয় সেই কারণেই। তখন কর্তারা থাকতেন গ্রামে। গ্রামের জমিজমা থেকে গ্রাসাচ্ছাদন আসতো। কিন্তু ছেলেদের লেখা-পড়া করতে থাকতে হতো কলকাতায়। তখন এই আজ-কালকার মতন হোস্টেল বোর্ডিং এসব থাকলেও কর্তা-ব্যক্তিরা সেখানে ছেলেদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। খাওয়ার কষ্ট থাকার কষ্ট ছাড়াও আরো ছিল একটা ভয়— সেটা হচ্ছে কুসঙ্গে পড়ে খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবার ভয়! তারপরে আছে চরিত্রহানির আশঙ্কা।

সমরজিৎবাবুর পূর্বপুরুষরা তাই কেউ এখানে থেকে লেখা-পড়া করবার সময় অন্য ছেলেদের মত কুসঙ্গে পড়ে মদ্যপান যেমন করেননি, তেমনি খৃষ্টানও হননি কিম্বা ব্রাহ্মও হননি। বরং দেব-দ্বিজে ভক্তি আর পূজো-পার্বণের প্রতি আসক্তিই তাঁদের উত্তরোত্তর বেড়ে এসেছে। সেই বংশের শেষ পুরুষ হচ্ছেন সমরজিৎবাবু। আর সেই সমরজিৎবাবু একলাই তখনও অতি কষ্টে বংশের ঐতিহ্যটা টানতে টানতে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছিলেন। কোথাও বন্যা কিম্বা দুর্ভিক্ষ হলে মনে কষ্ট হতো। বাপ-পিতামহের টাকা এই সব কাজে ব্যয় করতে পারলে মনে হতো তিনি টাকা সদ্ব্যয় করছেন। এ ছাড়া ছিল দান। সৎ-উদ্দেশ্য দাতব্য করতে তাঁর আপত্তি হতো না। রামকৃষ্ণ মিশনের যতগুলো শাখা আছে সবগুলোতে মাঝে-মাঝে টাকা পাঠাতেন। টাকা পাঠিয়ে মনের কষ্ট লাঘব করতে পেরে যেন মনে মনে পরিত্রাণ পেতেন।

কিন্তু উদ্বেগ ছিল ওই একটা বিষয়েই। ছেলে ফুটবল খেলতে পারে ভালো এ-খবরটা শুনে তাঁর ভালো লেগেছিল। খেলার জন্যে স্কুল থেকে পাওয়া অনেক মেডেল দেখে তিনি তাকে বরাবর উৎসাহই দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন সেই ছেলেই আবার প্রথম মাতাল হয়ে বাড়িতে ঢুকলো সেই দিনই তাঁর টনক নড়লো।

ছেলের সামনে গিয়ে তিনি মুখোমুখি দাঁড়ালেন। খোকা তখন টলছে। জিজ্ঞেস করলেন— তুমি মদ খেয়েছ?

খোকা লজ্জায় মাথা নিচু করলো।

সমরজিৎবাবু আবার গলা চড়ালেন—কথা বলছো না কেন? তুমি মদ খেয়েছ?

খোকা অনেক পীড়াপীড়ির পর উত্তর দিলে—দেখতে তো পাচ্ছো মদ খেয়েছি, আবার জিজ্ঞেস করছো কেন মিছিমিছি?

সমরজিৎবাবু রাগতে যাচ্ছিলেন। রেগে গিয়ে হয়ত একটা অশালীন কাণ্ড করেও ফেলতেন, কিন্তু গৃহিণী এসে বাধা দিলে। সমরজিৎবাবুকে ধরে ফেললে। বললে—করছো কী তুমি?

বলে খোকাকে নিয়ে গিয়ে ঘরে শুইয়ে দিলে। তারপর কর্তার কাছে এসে বললে—তুমি করছিলে কী? ওর সঙ্গে অমন কথা বলতে আছে? তুমি জানো ও রাগী ছেলে!

ততক্ষণে সমরজিৎবাবুও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। সাধারণত তিনি মেজাজ কখনও গরম করেন না। কিন্তু তাঁর সাধের সংসারের ভিতের ওপরেই বুঝি আঘাত লেগেছিল সেদিন। এত সাধ করে তিনি যে ছেলেকে নিজের করে নিয়েছিলেন তার কাছ থেকে আঘাত আসাতেই সেটা এত বেশি করে লেগেছিল তাঁর বুকে।

তারপর আর বেশিদিন দেরি করেননি তিনি। তার কিছুদিন পরেই সেই ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ এনেছিলেন।

কিন্তু যা ভেবেছিলেন তা হয়নি। তার পর যত দিন গেছে, মনে মনে যত দুঃখ পেয়েছেন আর সংসারের ওপর বৈরাগ্য তাঁর তত বেড়েছে। আরো বেশি পূজোপাঠের দিকে মন গেছে।

গঙ্গায় ডুব দেবার সময় আরো বেশি করে ভগবানকে ডেকেছেন। একেবারে যখন অনিবার্য হয়েছে তখন ছাড়া আর কখনও দেশে যাননি। যখন গেছেন তখন কলকাতা থেকে দিন কতকের জন্যে মুক্তি পাবার জন্যেই গেছেন। পূর্বপুরুষের বিরাট দালানবাড়িটার ভেতরের ঘরে গিয়ে অনেক দিন চুপ করে খাটের ওপর শুয়ে থেকেছেন। গোমস্তা-নায়েব এসে জমিজমার ফসলের হিসেব দিয়েছে। ধান-পাট-তরিতরকারি বেচার টাকা দিয়েছে। তিনি যথারীতি তা নিয়েছেন। কিন্তু কখনও হিসেবের চুল-চেরা বিচার করে নিজের অবসর-যাপনের শান্তি ক্ষুন্ন করেননি। তর্ক করে গোমস্তার ভুল ধরতেও চেষ্টা করেননি। কার জন্যেই বা সে-সব করবেন। নিজের একটা তো শরীর। তার ওপর তাঁর জীবনের মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে আসবার দিকে। তিনি জানতেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই সব কিছুই একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ আর এখানে আসবে না। তারপর যারা এখানে থাকবে তারাই সব কিছু ভোগ-দখল করবে। সুতরাং মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

কিন্তু সদানন্দ আসবার পর থেকেই যেন আবার তাঁর আশা হয়েছিল।

গৃহিণী ঘরে এলে ডাকলেন। বলতেন—শোন—

গৃহিণী কাছে আসতো।

তিনি বলতেন—এ কটা কথা কাউকে যেন বোল না। সদানন্দ ছেলেটাকে তোমার কেমন লাগে?

গৃহিণী বলতো—ভালোই তো, কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

—না, এমনি তোমায় জিজ্ঞেস করছি। এতকাল এ-বাড়িতে তো রয়েছে! তুমিও তো দেখছো। স্বভাব-চরিত্র কেমন মনে হচ্ছে তোমার?

গৃহিণী বলতো—স্বভাব-চরিত্র আমি কেমন করে জানবো, আমি থাকি বাড়ির ভেতরে, সে থাকে বাইরে বাইরে, আমি কি আর দেখতে গেছি সে বাইরে গিয়ে কী করছে না-করছে?

সমরজিৎবাবু বলতেন—তা তুমি যা জানো তা জানো, আমার কিন্তু ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে—আমি মহেশকে ওদের দেশে পাঠিয়েছি খবরাখবর আনতে—

—কীসের খবর?

—ওই সদানন্দর দেশে কে আছে না-আছে, এই সব জানতে। কলকাতা থেকে নবাবগঞ্জ তো আর বেশি দূর নয়। রাণাঘাট থেকে আরো কাছে। সকালবেলা গিয়ে আবার রাত্তিরেই ফিরে আসা যায়।

গৃহিণী বললে—সে-খবর নিয়ে তুমি কী করবে?

সমরজিৎবাবু বললেন—সদানন্দকে যা-যা জিজ্ঞেস করেছি তার তো সবই ঠিক ঠিকই উত্তর দিয়েছে। এখন মহেশ গিয়ে দেখে এসে কী বলে দেখি, তারপর ভাবছি ও যদি রাজী হয় তো আমি ওকে বরাবর এখানেই রেখে দেব।

—রেখে দেবে মানে? তোমার কি এক ছেলেকে নিয়েও মনের আশ মিটলো না? তার বিয়ে দিয়েছ, তার বউ এখানে রয়েছে। একে বাড়িতে রাখলে তার কী হবে? সে কোথায় যাবে?

সমরজিৎবাবু বললেন—সে সব আমি ভাবিনি ভাবছো? বউমা আমার সঙ্গে থাকে ভালো আর নয়ত খোকার সঙ্গে চলে যাক। আমি কাউকে এ-বাড়িতে থাকতেও বলবো না কিম্বা চলে যেতেও বলবো না। কিন্তু আমার এই শেষ বয়সে আর এ-সব সহ্য হচ্ছে না। আমি অন্তত যাবার সময় দেখে যেতে চাই যে আমি বাড়িতে এমন একজনকে রেখে গেলাম যে মানুষের মত মানুষ। আমার পূর্বপুরুষের এই সমস্ত সম্পত্তি একজন অমানুষের হাতে

পড়বে এটা ভাবলে আমি পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবো না। এ ব্যাপারে তুমি আর কোনও আপত্তি কোর না—

গৃহিণী বললে—তুমি তো বললে, কিন্তু ওর তো বাপ-মা আছে, ভাই-বোন কেউ আছে—তারা যদি অমত করে?

—তাদের সঙ্গে যদি অত সম্পর্ক থাকবে তো কেউ এমন করে বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে পারে?

গৃহিণী বললে—কী জন্যে চলে এসেছে তা কি তুমি জানো?

—সে সব আমি এবার জিজ্ঞেস করবো। তাই তো মহেশকে পাঠিয়েছি সেখানে। দেখি মহেশ এসে কী বলে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—বউমা কোথায়?

—বউমা নিজের ঘরে শুতে গেছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তুমি বউমাকে যেন এ-সব কথা আবার বলো না। ভেবো না বউমাকে আমি কোনও রকমে বঞ্চিত করবো। আমি যখন তাঁকে এ-বাড়িতে বউ করে এনেছি তখন তার ভরণ-পোষণের সব রকম ব্যবস্থা করে তবে সব করবো। খোকা থাকুক আর না থাকুক, বউমার কোনও কষ্ট হবে না—

সদানন্দ নিচের ঘরে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। তার ধারণাও ছিল না যে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তারই মাথার ওপরকার আর একটা ঘরে তখন দুজন মানুষ দুর্ভাবনার জাল পাততে বসেছে। হঠাৎ সদরে আওয়াজ হতেই কি যেন দরজা খুলে দিলে।

ভেতর থেকে ঠাকুর বললে—কে?

—আমি মহেশ। দরজা খোল ঠাকুর।

সারাদিন মহেশের দেখা পাওয়া যায়নি। এতক্ষণ কোথায় ছিল সে! সদানন্দ বিছানা ছেড়ে উঠলো। দরজার বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখলে মহেশ। একেবারে ধুলোমাখা চেহারা। সারাদিন রোদে-ধুলোতে ঘুরলে যেমন তামাটে চেহারা হয় মানুষের তেমনি হয়ে গেছে মহেশ।

—কোথায় ছিলে মহেশ? সারাদিন তোমায় দেখতে পাইনি!

মহেশ হাসলো। এক মুখ হাসি। বললে—আপনি এখনও ঘুমোননি? খাওয়া হয়েছে তো?

সদানন্দ বললে—আমার এত সকাল সকাল ঘুম আসে না। তুমি বুঝি ভোরবেলা বেরিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, ভোরের ট্রেন্ না ধরলে যে বেলা পুইয়ে যায়, মাথায় কড়া রোদ লাগে।

—রাণাঘাটে গিয়েছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ, বাবু পাঠিয়েছিলেন। সেই সাতসকালে গিয়েছি, আর এখন আসছি। যাই বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি—

বলে মহেশ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সদানন্দ আবার নিজের ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না। রাণাঘাট! মহেশ রাণাঘাটে গিয়েছিল। রাণাঘাটের আর চারটে স্টেশনের পরেই রেল-বাজার। রেল-বাজারে নেমে পাঁচ মাইল হেঁটে পার হলেই তো নবাবগঞ্জ। নবাবগঞ্জের কথাটা মনে পড়তেই সদানন্দ যেন একেবারে সশরীরে সেখানে চলে গেছে। মনে হলো বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। বিরাট সমারোহ চারিদিকে। কীসের উৎসব চলেছে যেন ভেতরে। সে যে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে তার জন্যে সেখানে যেন কোথাও তো কোনও দুঃখ নেই, অনুতাপ-অনুশোচনা কিছুই নেই। বেশ সুখে আছে

সবাই। বারোয়ারিতলার সেই মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের পাশে নিতাই হালদারের দোকানের মাচার ওপর বসে তখনও সবাই তাস খেলছে। এ কী হলো? এমন তো হবার কথা নয়। এত বড় আঘাত সে নিজের মাথায় তুলে নিলে, এত বড় আঘাত সে সকলকে দিতে চাইলে, অথচ কারোর মনে কোনও দাগ তো লাগলো না? সে তো সকলের ভালোর জন্যেই, সকলের মঙ্গলের জন্যেই এই আচরণ করেছিল।

হঠাৎ নজরে পড়লো নয়নতারা দাঁড়িয়ে আছে।

নয়নতারার পরনে একখানা বেনারসী শাড়ি। বিয়ের সময় যে-বেনারসীটা সে পরেছিল সেইটে। সিঁথির সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করছে সিঁদুর।

সদানন্দ নয়নতারার দৃষ্টি এড়িয়ে চলে আসছিল, কিন্তু নয়নতারা দেখতে পেয়ে গেছে। একেবারে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো সে।

বললে—তুমি?

সদানন্দ কোনও জবাব দিলে না তার কথার।

—তুমি তো চলে গিয়েছিলে। আবার এলে যে?

সদানন্দ চারিদিকে চেয়ে বললে—এখন দেখছি না-এলেই হয়ত ভালো হতো!

—কেন?

—আমি চলে গেলুম বলে কোথাও কোনও ব্যতিক্রম নেই। কোনও দুঃখ, কোনও ফাঁক কিছুই নেই। তুমিও তো আর সে-রকম নেই।

নয়নতারা বললে—কেন সে-রকম থাকবো? তুমি কি ভেবেছিলে তুমি না থাকলে পৃথিবীর চলা বন্ধ হয়ে যাবে? আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠবে না? না আমিও আর সিঁথিতে সিঁদুর দেব না, আমিও বেনারসী শাড়ি আর পরবো না। তুমি ভেবেছিলেটা কী? ভেবেছিলে তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব ওলোট-পালট হয়ে যাবে!

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ আমারই ভুল হয়েছিল।

নয়নতারা বললে—শুধু ভুল নয়, তোমার অন্যায়ও হয়েছিল। কিন্তু তোমার ভুলের জন্য আমি ভুগতে রাজি নই, তোমার অন্যায়ের ভাগ আমি নিতে রাজি নই. এটা জেনে রেখো। তুমি ভেবেছিলে সকলের তালে তাল না দিয়ে তুমি অক্ষয় কীর্তি রেখে যাবে। তা হবে না। পৃথিবী তোমাকে তা হতে দেবে না। আমিও তোমাকে তথাগত বুদ্ধদেব হতে দেব না, শ্রীচৈতন্যদেবও হতে দেব না। সেই জন্যেই আজ এত ঘটা করে বেনারসী পরেছি, এত জাঁক করে সিঁথিতে সিঁদুর পরেছি—এ বাড়িতেও তাই এত বেশি ঘটা করে আজ লক্ষ্মীপূজো হচ্ছে—দেখছো তো, তুমি থাকবার সময় যত ঘটা হতো তার চেয়েও বেশ ঘটা হচ্ছে তুমি চলে যাবার পর—

—দাদাবাবু, দাদাবাবু!

হঠাৎ ঘরের দরজায় ধাক্কার শব্দে সদানন্দর তন্দ্রা ভেঙে গেল। তবে কী স্বপ্ন দেখছিল সে এতক্ষণ! এইটুকুর মধ্যেই এতখানি স্বপ্ন দেখে ফেললে সে! আর যাদের চিরকালের মত সে ত্যাগ করে এসেছে, যাকে ত্যাগ করে সে চরম আঘাত দিয়েছে, যার জীবন নষ্ট করে দিয়ে সে নিরুদ্দেশের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজেছে, তাদের স্বপ্নই কি দেখতে হয় এই সময়ে?

—দাদাবাবু, দাদাবাবু—

সদানন্দ বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার খিলটা খুলে দিতেই দেখলে মহেশ দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ সারাদিন রাণাঘাটে কাটিয়ে এসেছে। ট্রেনে গেছে এসেছে। মুখ-হাত-পা তখনও ধোওয়া হয়নি। সেই অবস্থাতেই ওপরে বাবুর সঙ্গে কথা বলেছে। তারপর সেখান থেকে

আবার তাকে ডাকতে এসেছে।

বললে—আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি! আমি যে বাবুকে বললুম আপনি জেগে আছেন—

—তোমার বাবুও কি এখনও জেগে আছেন?

—হ্যাঁ, বাবুর রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না। বাবুও জেগে আছেন, মাও জেগে আছেন। আপনি যদি পারেন তো একবার ওপরে যান—তিনি একবার ডাকছেন আপনাকে—

সদানন্দ বললে—যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি। কিন্তু কী এত জরুরী কাজ যে এখুনি ডাকছেন।

বলে গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে নিলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

সেদিন সকাল থেকেই মনের ভেতরে বড় অস্থিরতা ভোগ করছিলেন সমরজিৎবাবু। মহেশকে পাঠিয়েছিলেন নবাবগঞ্জে। সারাদিনের পর যখন সন্ধ্যে হলো তখন একবার ঘড়ি দেখলেন। তারপর যখন রাত আটটা বাজলো তখন আর একবার ঘড়ি দেখলেন। তারপর রাত ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়লো। গৃহিণী ঘরে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন—মহেশ এখনও এল না কেন?

তা ভাবলেন হয়ত ট্রেন লেট আছে। তারপর যখন অনেক রাত্রে মহেশ এল তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

বললেন—কী রে, কী হলো? নবাবগঞ্জে গিয়েছিলি?

মহেশ বললে—হ্যাঁ বাবু গিয়েছিলুম। নবাবগঞ্জ কি এখেনে? রেল-বাজারে নেমে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা, গিয়ে পৌঁছুতেই তো দু ঘন্টা গেল।

—তারপর গিয়ে কি দেখলি তাই বল্! দাদাবাবু যা বলেছে সব সত্যি? হরনারায়ণ চৌধুরী বলে কেউ আছে সেখানে? কত বড় বাড়ি দেখলি? জমিদার তারা?

মহেশ বললে—না বাবু, তারা ওখানে কেউ নেই।

—কেউ নেই মানে? সব মিথ্যে কথা বলেছে নাকি তবে?

মহেশ বললে—আজ্ঞে না বাবু, মিথ্যে কথা নয়। দাদাবাবু যা বলেছে সব সত্যি। সেই বাড়িও দেখে এলুম, বাড়িটাও আজ্ঞে খুব বড়। কিন্তু বাড়িতে কেউ লোক নেই—

—কেউ নেই? কেউ নেই মানে? বাব-মা সব কোথায় গেল? সদানন্দ তো বললে ও বিয়ে করেছে, ওর বউও তো আছে সেখানে, তারা কোথায় গেল? কাউকে জিজ্ঞেস করলি না কেন?

মহেশ বললে—সোজা কথায় কি জিজ্ঞেস করা যায়? আমাকে নতুন লোক দেখেই তো সবাই ছেঁকে ধরলে। সবাই জিজ্ঞেস করে কোথায় বাড়ি তোমার, কে তোমাকে পাঠিয়েছে, এত খবর তোমার জানার দরকারটা কী, হ্যান্-ত্যান্ অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো গাঁয়ের লোক। আমার নাম-ধাম জানতে চাইলে। মহাকুশকিলে পড়েছিলুম। শেষকালে একটা মিছে কথা বলে পার পেয়ে গেলুম—

—কী মিছে কথা?

—বললুম আমি ঘটক। পাত্তরের খোঁজে এসেছি। তা শুনে সবাই হেসে অস্থির। সবাই বললে তার তো বিয়ে হয়ে গেছে মশাই। তার বউকে ছেড়ে সে ছেলেও কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সমরজিৎবাবু বললেন—আর অবস্থা কেমন ওদের?

মহেশ বললে—অবস্থা খুব ভালো। জমি-জমার নাকি শেষ নেই। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি। কিন্তু খাবার লোক দ্বিতীয় কেউ নেই।

—তা বাবা-মা কোথায় গেছে কিছু শুনলি?

মহেশ বললে—শুনলুম ঠাকুদাদা মারা গেছে, মা-ও ক'মাস আগে নাকি মারা গেছে। বাপ ছিল কিন্তু তিনিও নাকি চলে গেছেন সুলতানপুরে—

—সুলতানপুর? সে কোথায়?

মহেশ বললে—ভাগলপুরে। ভাগলপুরের কাছে সুলতানপুরে নাকি দাদা-বাবুর মামার বাড়ি। দাদামশাই-এর কোনও ছেলে নেই, তাই জামাই গেছে সেখানে দেখা-শোনা করতে। তাঁরও নাকি অসুখ। সবাই বললে দাদামশাই-এর আর বাপের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্তোর ওয়ারিশান নাকি একলা দাদাবাবু—

সমরজিৎবাবু সমস্ত শুনলেন। সদানন্দ যা যা বলেছিল তা সবই বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। এতটুকু এদিক-ওদিক হলো না।

তারপর গৃহিণীর দিকে চাইলেন। বললেন—দেখলে তো, শুনলে তো সব? আমি বলেছিলুম তোমাকে যে সদানন্দ মিছে কথা বলবার ছেলে নয়।

তারপর মহেশের দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ রে, দাদাবাবু এখন কি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে পড়েছে?

—আজ্ঞে দেখলুম তো জেগে আছেন।

সমরজিৎবাবু বললেন—তা হলে একবার আমার কাছে ডেকে দে তো। বলবি আমি একবার ডাকছি—

মহেশ চলে গেল।

মহেশ চলে গেলেই গৃহিণী বললে—এত রাত্তিরে আবার ডেকে পাঠাচ্ছ কেন ওকে?

সমরজিৎবাবু বললেন—আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

—কী ঠিক করেছ?

—আমি সদানন্দকে এখানেই রাখবো। অনেক দিন ধরেই ঠিক করেছিলুম। কিন্তু কাউকে বলিনি। যেদিন রাণাঘাট থেকে আসছিলুম সেই দিনই আমার অবাক লেগেছে।

কেউ তো অমন করে কারো জিনিষের জন্য ঝুঁকি নেয় না। আর জিনিসটা ও নিয়ে নিলেই বা আমি কী বলতুম! তা এবার আমি আর কোনও কথা শুনবো না—

গৃহিণী বললে—তা বামুনের ছেলে তোমার এখানে থাকতে রাজি হবে কেন?

ঠিক সেই সময়েই সদানন্দ এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালো। বললে—আমাকে ডেকেছিলেন কাকাবাবু—

সমরজিৎবাবু বিছানার ওপর বসেছিলেন। বললেন—এসো, এই চেয়ারটায় বসো—

সদানন্দ তখনও কিছু বুঝতে পারেনি। সে সোজা একটা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসলো।

সমরজিৎবাবু বললেন—একটা কথা তোমাকে অনেক দিন ধরে বলবো বলবো করছি। কিন্তু বলা হয়নি। তুমি আমার কাছে অনেক দিন চাকরির কথা বলেছ। আমিও তোমাকে কথা দিয়েছিলুম তোমায় একটা চাকরি করে দেব। কিন্তু তুমি তো এ বাড়িতে অনেকদিন আছো বাবা, আর আমাদেরও দেখছো। আমার যা টাকা-কড়ি দেশের জমিজমা আছে তাতে চাকরি আমার কোনও দিন করতে হয়নি। শুধু আমার নয়, আমার ছেলেরও চাকরি না করলেও চলতো। কিন্তু আমার অমতেই ও চাকরি নিয়েছে। চাকরি নিয়েছে বলে আমার

তত দুঃখু নেই, দুঃখ আমার অন্য কারণে, জানো?

বলে সমরজিৎবাবু একটু থামলেন।

সদানন্দ মনে হলো এতদিন যা ভয় করছিল সে সেই কথাগুলোই হয়ত বলবেন কাকাবাবু।

সমরজিৎবাবু তারপর একে একে তাঁর জীবনের চরম দুঃখের কাহিনীগুলো বলতে লাগলেন। সেই পূর্বপুরুষের আদি-পত্তন থেকে শুরু করে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী। তাঁদের বংশ-পরিচয় তাঁদের ঐতিহ্য, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা-চিন্তা-ভাবনার কথাও বাদ দিলেন না। তারপর শুরু করলেন তাঁর নিঃসন্তান জীবনের মর্মান্তিক দিকটার কথা। কেমন করে দত্তক নিলেন খোকাকে। সেই খোকাকে কেমন করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলেন। আর তারপর সেই ছেলেই আবার কেমন করে অমানুষ হয়ে গেল তাঁরই চোখের সামনে। তারপর কেমন করে সেই ছেলেকে সৎপথে আনবার জন্যে তার বিয়ে দিলেন। সমস্ত বলে গেলেন গড়গড় করে মুখস্থ পড়ার মতন।

তারপর বললেন—এই দেখ, তোমার কাকীমা রয়েছেন, তোমার কাকীমাকেই জিজ্ঞেস করো, আমি একটি কথাও বাড়িয়ে বলছি না, বা অতিরঞ্জিতও করছি না—

সদানন্দ চুপ করে সব শুনছিল। এ আবার কী-রকম সংসার! এ আবার মানুষের কী রকম সমস্যা!

সমরজিৎবাবু হঠাৎ বললেন—তোমার নিজেরও বাবা আছেন, তিনি গুরুজন। তাঁদের মনে আমি কোনও আঘাত দিতে চাই না। কিন্তু তুমি তো নিজেই বলেছ যে তুমি আর সেখানে ফিরে যেতে চাও না। বলেছ তো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আমি আর সেখানে ফিরে যেতে চাই না—

—কিন্তু তোমার স্ত্রী? তুমি তো বিয়ে করেছ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না।

সমরজিৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি কোনও সন্তান হয়েছে?

সদানন্দ বললে—না, সন্তান যাতে না হয় সেই জন্যেই আমি স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি—

উত্তরটা শুনে সমরজিৎবাবু কেমন অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তার মানে? তুমি সন্তান চাও না?

—সদানন্দ বললে—না—

সমরজিৎবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—সন্তানের জন্যেই তো মানুষ বিবাহ করে, আমাদের শাস্ত্রের তো তাই-ই বিধান। সন্তানই যদি না চাইবে তো তুমি বিবাহ করলে কেন?

সদানন্দ বললে—আমি বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছি—আমি বিয়ে করতে চাইনি।

—বিবাহ করতে যদি না চেয়ে থাকো তো কেউ কি কাউকে বিবাহ করাতে বাধ্য করতে পারে? তোমার তো আর বাল্যবিবাহ হয়নি? তুমি তো উপযুক্ত বয়েসেই বিবাহ করেছ—

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আমি উপযুক্ত বয়েসেই বিয়ে করেছি, তখন আমার সব কিছু বোঝবার বয়েস হয়েছে—

—তাহলে? এ তো বড় অদ্ভুত কথা শোনালে তুমি আমাকে সদানন্দ। তাহলে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি তোমার কোনও মনোমালিন্য হয়েছে?

সদানন্দ বললে—না, তাও না—

—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য হয়নি তবু সন্তান চাও না? আর তোমার

স্ত্রী? তোমার স্ত্রীও কি তোমার মত সন্তান কামনা করেন না?

সদানন্দ বললে—তিনি কী চান তা আমি জানি না—

—জানো না মানে?

সদানন্দ বললে—সে-সম্বন্ধে আমার স্ত্রী আমাকে কিছু বলেননি!

সমরজিৎবাবুর কেমন যেন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কেমন?

সদানন্দ বললে—মনে হয় ভালো—

—মুখশ্রী?

সদানন্দ বললে—মুখশ্রী সুন্দর। আমার বাবা সুন্দরী দেখেই আমার জন্যে পাত্রী পছন্দ করেছিলেন।

তবু কিছু আন্দাজ করতে পারলেন না সমরজিৎবাবু। বললেন—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বাক্যালাপ হয়েছে তো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

—কতদিন তোমরা বিবাহিত জীবন যাপন করেছ?

সদানন্দ বললে—একদিনও না—

সমরজিৎবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন—আশ্চর্য তো...

কিন্তু তার কথা আর শেষ হলো না। কথাটা শেষ হবার আগেই সেই আগের দিনের মতই একটা হট্টগোল-গোলমাল শুরু হয়ে গেল। মহেশ দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে—মা, বড়দাদাবাবু এসেছেন—

কথাটা শুনেই সমরজিৎবাবু আর তাঁর গৃহিণীর মুখটা যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল। একটা যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি দিয়ে সমরজিৎবাবু গৃহিণীর দিকে চাইলেন। বললেন—তুমি বউমাকে বলো দরজায় খিল দিয়ে দিতে, আমি নিচেয় যাচ্ছি—

বলে তিনি শশব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

সদানন্দ এর পর আর সেখানে দাঁড়ালো না। সোজা নিজের ঘরে চলে এসে দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

ক'দিন ধরে সদানন্দর এই সব কথাগুলোই মনের মধ্যে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। কোথায় একটা বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে এতদূর এসে আত্মগোপন করে আছে, আর এখানেই কি না তার জন্যে আর একটা বন্ধন প্রস্তুত! ক'দিন ধরে সর্বক্ষণ সে ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাড়িতে থাকতে ভালো লাগেনি। একটু বিশ্রাম করেই আবার সে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। কখনও কখনও ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়েছে। সমরজিৎবাবু ভোররাত্রে গঙ্গাস্নান করতে বেরোন। সেই শব্দটা কানে যেতেই সেও বেরোয়। বেরিয়ে চলতে চলতে অনেক দূর চলে যায়। দরকার হলে কখনও বাসে উঠে পড়ে, আবার কখনও বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটে।

এমনি সেদিনও হাঁটছিল। সেইদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সে বাসে উঠে পড়েছিল আবার একসময়ে বাস থেকে নেমেও পড়েছিল সে খেয়াল ছিল না তার। তারপর গঙ্গার ধারে আসতেই এই ঘটনা।

ঘরটার মধ্যে একটা চেয়ারের ওপর সদানন্দ অনেকক্ষণ ধরে বসে ছিল। অনেকক্ষণ

কারো কোনও সাড়া-শব্দ নেই। কোথায় যে কার বাড়িতে এসেছে সে তাও জানা ছিল না।

এমন সময় আবার সেই বুড়িটা এসে হাজির হলো। সঙ্গে আর একজন কে একটা লোক। খালি গায়ে খালি পায়ে। গলায় একটা ময়লা পৈতে ঝুলছে। দেখলে মনে হয় যেন পুরুত ঠাকুর। বুড়িটার হাতে একটা রেকাবি। তার ওপর বেলপাতা ধান দুর্বোঘাস, আর চন্দনের ছোট একটা বাটি। আর একপাশে একটা জ্বলন্ত প্রদীপ।

বুড়ি ঘরের ভেতরে এসেই বললে—তোমার খুব দেরি করিয়ে দিলুম বাবা, কিছু মনে করলে না তো?

সদানন্দ কিছু জবাব দিলে না সে-কথার।

বুড়িটা হাতের রেকাবিটা মেঝের ওপর রেখে বললে—এসো বাবা, আমার সঙ্গে এসো, মুখ-হাত-পা ধুয়ে নেবে এসো—

বলে আগে আগে চলতে লাগলো। সদানন্দও চলতে লাগলো তার পেছন-পেছন।

ভেতরে একটা কল-ঘরের ভেতরে ঢুকে সদানন্দ হাত-পা-মুখ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এল। বললে—শিগগীর শিগগীর করুন, আমি বেশিক্ষণ দেরি করতে পারবো না—

হঠাৎ পাশের জানলার দিকে নজর পড়তেই দেখলে এক জোড়া চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

বুড়ি মানুষটা বললে—ও মেয়ে, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আয় না—

বলতেই একজন মেয়েমানুষ একেবারে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালো।

সদানন্দ এদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে তখন। এ সব কারা? এ কোন্ বাড়িতে সে এসেছে? এ মহিলাটিই বা কে? তা-কে ঘিরে এই উৎসব, এ তার ভার লাগলো না।

পুরুত-ঠাকুর সদানন্দর দিকে চলে বললে—আপনি এখানে এই মেঝের ওপর একটু দাঁড়ান—

সদানন্দ চেয়ার থেকে উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ধূপ জ্বালা হয়ে গেছে। মানদা মাসি আয়োজনের কিছু ত্রুটি রাখেনি। অনেক দিন থেকে আশা ছিল এই টাকাটা পাবার। একশো টাকা আগাম হাতে পাওয়া গেছে। বাকি ন'শো টাকা পাওয়া যাবে তার এই ভাগ্নেকে খুঁজে দিতে পারলে। এতদিনে বুঝি সে-আশা তার মিটবে। তারপর ছেলেটিকে যেমন করে হোক বড়বাবু ফিরে আসা পর্যন্ত আটকে রাখলেই হলো। বড়বাবু এলে একেবারে সরাসরি তার হাতে তুলে দেবে। বাতাসীকেও সেই টাকার কিছু ভাগ দিতে হবে। অবশ্য তা দিতে মানদা মাসির আপত্তি নেই। বড়বাবু না হলে এ-সব কে সামলাবে!

বাতাসী পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এবার পুরুত-ঠাকুর বুড়ির দিকে চেয়ে বললে—আপনি আসুন মা এখেনে। এই ঘটিতে জল নিয়ে ছেলের পায়ে ঢালুন—

পুরুত-ঠাকুর যা বললে বুড়িও তাই করতে লাগলো। একবার জল ঢালে, আর একবার ফুল দেয় পায়ের পাতার ওপর। ফুল-বেলপাতা-গঙ্গাজল পায়ের পাতার ওপর পড়ে জায়গাটা বেশ নোংরা হয়ে গেল। সঙ্গে চলেছে সংস্কৃত শ্লোক। পুরুতটা শ্লোক বলে আর বুড়ি সেটা আওড়ায়। চরণ-পূজো যেন শেষ হতে চায় না।

শেষকালে একটা ছোট পাথরের বাটিতে গঙ্গাজল রাখা হলো। পুরুত-ঠাকুর সদানন্দকে তার বাঁ পায়ের বুড়ো-আঙুলটা সেই জলের ওপর ছোঁয়াতে বললে। সদানন্দও ঠিক তেমনিই করলে। তারপর সেই জলটা বুড়ি চুমুক দিয়ে মুখে ঢেলে দিলে।

সদানন্দ দেখে অবাক হয়ে গেল। তার পায়ের ধুলোসুদ্ধ জলটা বুড়ি নির্বিকার চিত্তে খেয়ে নিলে!

সদানন্দ বললে—এবার তাহলে আমি যাই?

বুড়ি বললে—ওমা কোথায় যাবে? তোমাকে মিষ্টি দেব, আমাকে পেসাদ করে দেবে না?

কিন্তু বুড়ির কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ নিচের সিঁড়িতে দুম দুম করে জুতোর আওয়াজ হতে লাগলো। আওয়াজটা ক্রমেই ওপরের দিকে উঠে আসছে।

বাতাসীর মুখটা তখন শুকিয়ে গেছে। বড়বাবু হঠাৎ আবার ফিরে আসছে নাকি?

বাতাসী বললে—ও মাসি, ওই বোধ হয় বড়বাবু এল?

মাসিও চমকে উঠেছে। বলল—সে কী রে? বড়বাবু? এখন? এই অসময়ে?

বাতাসী যা ভেবেছে তাই-ই। সিঁড়ি দিয়ে আওয়াজটা উঠতে উঠতে একেবারে সশরীরে ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছুলো। বড়বাবু সারা রাত এই বাড়িতেই কাটিয়েছে। ভোরবেলার দিকে চলে গিয়েছিল। এখন আর তার আসবার কথা নয়। কিন্তু কী একটা কাজে আবার এসেছে। এসেই এ-সব কাণ্ড দেখে অবাক। সোজা সদানন্দর দিকে চেয়ে দেখলে। সদানন্দও বড়বাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

বড়বাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে—এ কে?

বড়বাবু আসলে বাতাসীর দিকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, কিন্তু যে-কেউ এর উত্তর দিলেই চলতো। কারণ বড়বাবুর প্রশ্ন করবার অধিকারও ছিল এ-ক্ষেত্রে। এ-বাড়ির ভিতরে যদি এমন সব অবাঞ্ছিত লোকের আনাগোনাই হয় তাহলে কীসের জন্যে পকেটের পয়সা খরচ করে বাতাসীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করা! তাহলে সেই আগে যেমন মানদা মাসির টিনের বস্তিবাড়িতে ঘর ভাড়া করেছিল তেমনি সেখানেই তো বাতাসীকে রাখতে পারতো।

—বলো এ কে?

অথচ কয়েক ঘণ্টা আগে যখন বড়বাবু চলে গেছে তখন এখানে কেউই ছিল না।

মানদা মাসির হাতে গঙ্গাজলের খালি পাথরের বাটিটা তখনও ধরা রয়েছে। মানদা মাসি কল্পনা করতেও পারেনি যে এই অসময়ে বড়বাবু এসে হাজির হবে।

পাণ্ডা ঠাকুর বড়বাবুকে চেনে না, সদানন্দকে চেনে না, বাতাসী, মানদা মাসি কাউকেই সে চেনে না। দু'চার আনা পয়সার লোভে সে এই যজমানের বাড়ি এসেছিল। এইটেই তার পেশা। তখনও তার হাতে নৈবেদ্যের রেকাবি আর ঘণ্টা রয়েছে। কিন্তু ঘটনার এত আকস্মিকতায় সেও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এ লোকটাই বা কে? আর যার চরণপূজোর জন্যে তাকে ডেকে আনা হয়েছে সে-ই বা কে? এই নতুন বাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এমন করে চমকেই বা উঠলো কেন?

মানদা মাসি কৈফিয়তের সুরে বলতে লাগলো—আজ্ঞে বড়বাবু, আমিই একে ডেকে এনেছি, আমারই দোষ হয়েছে, বাতাসীর কোনও দোষ নেই—

বড়বাবু পূজোর আয়োজনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এসব কী হচ্ছে? এ কীসের পূজো?

এর উত্তর কে কী দিত তা জানবার আগেই বাতাসী বড়বাবুকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। বললে—তুমি এদিকে এসো, তোমাকে বলছি সব—

বড়বাবু বললে—কেন ওঘরে যাবো? আমার বাড়িতে এ-সব কী হচ্ছে তা আমাকে জানতে হবে না? আমি কি কেউ নই? আমার বিনা হুকুমে কে কী করছে এ-সব তাও তোমরা বলবে না?

বাতাসী বললে—আঃ তুমি চেঁচাচ্ছ কেন অত? সব বলছি তোমাকে, তুমি ও-ঘরে চলো না?

বড়বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে—কেন ওঘরে যাবো? আমাকে এখানে এই ঘরে সকলের সামনেই বলতে হবে। এতো লুকোচুরির কী আছে?

—আছে, লুকোচুরির আছে। কেন আছে তা ও-ঘরে তোমাকে বলবো—বলে বাতাসী জোর করে বড়বাবুকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বাতাসী বললে—তুমি আবার হঠাৎ ফিরে এলে কেন?

বড়বাবু বললে—আমার অফিসের চাবিটা ফেলে গিয়েছি। তা আমার বাড়িতে আমি ফিরে আসবো তার জন্যে তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? ও কে? ও-সব পূজোটুজো করছে কেন তোমার মাসি?

বাতাসী বললে—ওকে তুমি চিনলে না?

বড়বাবু বললে—না, কেন? কে ও?

—ও সেই যার ছবি তোমাকে দিয়েছিলুম, বলেছিলুম ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে! ওই লোকটাই সে। ও বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। নাকি খুব বড়লোকের ছেলে, ওর মামা এসে মাসিকে ধরেছিল। বলেছিল কিছু টাকা দেবে। তাই ওকে আজ রাস্তায় ধরেছে মাসি। ধরে আমার এখানে এনেছে তোমাকে দেখাবার জন্যে।

বড়বাবু বললে—তা আমি কী করবো?

বাতাসী বললে—তুমি পুলিসের লোক, ভয় দেখিয়েই ধরে রাখবে, নইলে আবার পালিয়ে যেতে পারে তো।

বড়বাবু তখন আলমারি থেকে ফেলে-যাওয়া চাবিটা নিয়েছে। বললে—এই সব ঝঞ্ঝাট আমার বাড়ির মধ্যে কেন? আমি এ-সব টলারেট করবো না এই তোমায় বলে রাখছি। তুমি ওদের চলে যেতে বলো—

বাতাসী বললে—ওরা তো আজ বাইরের ঘরে বসেছে—তাতে তোমার ক্ষতি কী হচ্ছে?

বড়বাবু বললে—আজ বাইরের ঘরে ঢুকেছে, কাল যদি আবার ভেতরের ঘরে ঢোকে? আজ আমি দেখে ফেললুম তাই, অন্য দিনও কেউ ঢোকে কিনা তা কে জানে! তুমি ওদের বেরিয়ে যেতে বলো—

বাতাসী বললে—ওমা, বেরিয়ে যেতে অমনি বলা যায়?

—তাহলে আমার বাড়িতে কোন্ সাহসে ওরা ঢোকে?

—তা মাসির সঙ্গে আমাদের এতদিনের জানা-শোনা, আমার বাড়িতে এলে তাড়িয়ে দেব?

বড়বাবু বললে—হ্যাঁ, তাড়িয়ে দেবে, তুমি না তাড়িয়ে দিতে পারো, আমি এখুনি গিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছি—

বলে বড়বাবু গট্‌গট করে সোজা বাইরের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু বাতাসী এসে রাস্তা আটকে দিলে। বললে—ওগো, না না, অমন কাজ কোর না, মাসির অনেকগুলো টাকা নষ্ট হবে—

বড়বাবু জ্বলে উঠলো—মাসির টাকা নষ্ট হবে তা আমার কী? মাসি আমার কে? মাসি কেন আমার বাড়ি আসে? তুমি তাকে বারণ করে দিতে পারো না? ওরা এখখুনি চলে যাক, ওরা চলে না গেলে আমি কিন্তু ওদের জুতো মেরে তাড়িয়ে দেব, এই তোমায় বলে রাখছি। ওদের তুমি চলে যেতে বলো গিয়ে—

বাতাসী বললে—সে না হয় আমি চলে যেতে বলছি, কিন্তু ওর কী হবে? ওই লোকটার?

—ও কে?

—ওরই নাম তো সদানন্দ চৌধুরী?

বড়বাবু কী যেন ভাবলে। বললে—দেখি, ও-ঘরে গিয়ে কী করতে পারি—

বলে বড়বাবু পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বাতাসীও গেল সঙ্গে সঙ্গে।

তখনও সদানন্দ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়িটার দিকে চেয়ে বলছে—আমি যাই তাহলে এবার, আপনার কাজ তো হয়ে গেছে—আমি এবার চলি—

মানদা মাসি অত বিপদের মধ্যেও বড়বাবুর আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। সে কিছু বলবার আগেই বড়বাবু ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকেই সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—আপনি কে? কী নাম আপনার?

সদানন্দ তখন এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না। তবু সহজে ঘাবড়ে যাবার মানুষ সে নয়। বললে—আমার নাম সদানন্দ চৌধুরী—

—আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?

সদানন্দ জবাবে কী বলবে প্রথমে ভেবে উঠতে পারলে না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—আমার খুশী পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আমি যা করেছি, তা খুব বুঝেশুনেই করেছি। তার জন্যে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজি নই—

—তার মানে? আপনি জানেন কারো বাড়িতে ঢুকে পড়া একটা ক্রাইম? কার হুকুমে আপনি আমার বাড়িতে ঢুকেছেন? বলুন, এ-বাড়িতে আপনি কেন ঢুকেছেন?

সদানন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে বড়বাবুর দিকে। বললে—আপনি জানেন না আমি কেন এ-বাড়িতে এসেছি?

বড়বাবু বললে—না, আমি শুনিনি, আপনি বলুন—

সদানন্দ বললে—যদি এখনও না শুনে থাকেন তো এই বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞেস করুন।

—ওকে জিজ্ঞেস করতে যাবো কেন? ও কে? ও এ বাড়ির কেউ নয়। আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনিই এর জবাব দিন।

মানদা মাসি কথার মাঝখানে বলে উঠলো—হ্যাঁ, বড়বাবু, আমিই ওকে এ-বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছি। আমার কথাতেই ও এখানে এসেছে—

বড়বাবু ধমকে উঠলো—তুমি চুপ করো, তুমি কেন কথা বলছো? যাকে জিজ্ঞেস করেছি সে জবাব দেবে।

মানদা মাসি বাতাসীর দিকে হতাশ ভাবে চাইলে। বললে—ও বাতাসী, তুই বল্ না মেয়ে, বল না আমিই ওকে ডেকে এনেছি—

বাতাসী কী বলবে! বড়বাবুর মুখের সামনে কথা বলবার সাহস আছে নাকি তার। সেও তখন ভয়ে কাঁপছে। তারও তো দোষ। সে-ই তো বড়বাবুকে না বলে বাইরের লোককে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে।

বড়বাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলো—বলুন কেন এসেছেন এ বাড়িতে?

সদানন্দ আর থাকতে পারলে না। বললে—দেখুন, আপনি কে আমি জানি না। আমি এখানকার কাউকেই চিনি না। কিন্তু আপনি সব কিছু না জেনে কেন আমার নামে দোষ দিচ্ছেন?

বড়বাবু বললে—আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই বলছি। আপনি এখানে থাকেন কোথায়?

সদানন্দ বললে—আপনার অত কথা জিজ্ঞেস করার দরকার কী! আপনি যখন এতই [illegible] করছেন আমাকে চলে যেতে দিন, আমি চলে যাচ্ছি—

বলে সদানন্দ বাইরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কিন্তু বড়বাবু যেতে দিলে না। একেবারে বাইরে যাবার পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললে—যাচ্ছেন কোথায়? আমার কথার জবাব দিন আগে—

সদানন্দ বললে—আপনি কি ভেবেছেন আপনার চোখরাঙানি দেখে আমি ভয় পাবো? আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না?

—কী—

বড়বাবু সদানন্দর গলা টিপে ধরেছে। সদানন্দও বড়বাবুর গলায় হাত দিয়ে টিপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতাহাতি কাণ্ড হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু তার আগেই একটা অঘটন ঘটলো। হঠাৎ সেই নাটকীয় ঘটনার মধ্যে আবির্ভাব হলো মহেশের।

—বড়দাদাবাবু।

মহেশ ঘরে ঢুকেই হতভম্ব হয়ে গেছে। এমন কাণ্ড হবে তা সে আশা করেনি। সে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল। তখনও হাঁফাচ্ছে সে। এক ঘরের মধ্যে বড়দাদাবাবু আর দাদাবাবু দুজনকে দেখতে পাবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। মহেশকে দেখে বড়বাবুও অবাক, সদানন্দও অবাক।

বড়বাবু যেন মিইয়ে গেল মহেশকে দেখে। বললে—তুই?

মহেশ তখনও হাঁফাচ্ছে। কিন্তু এখানে আসবার আগে তার বিশ্বাসই হয়নি যে তার জন্যে এখানে এতখানি বিস্ময় জমা হয়ে আছে। আগেও ঘটনাচক্রে কয়েকবার এখানে আসতে হয়েছে তাকে। কখনও বাবুকে জানিয়ে আবার কখনও না-জানিয়ে। তবে বিশেষ বিপাকে না পড়লে সে কখনও আসেনি।

কিন্তু এবার সদানন্দ চৌধুরীকে এখানে দেখে সে আরো অবাক হয়ে গেছে।

সদানন্দর তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। এই অপরিচয়ের জগতে এতক্ষণে একটা চেনা মুখ দেখে যেন সে বেঁচে গেল। বললে—মহেশ তুমি?

মহেশও বলে উঠলো—দাদাবাবু আপনি? আপনি এখানে কী করতে। আমার বাবুর অসুখ তাই আমি বড়দাদাবাবুকে খবর দিতে এসেছি।

এতক্ষণে সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন যেন এই সামান্য কথাতেই একেবারে হাল্‌কা হয়ে উঠলো। সদানন্দর আজো মনে আছে সেদিন সেই মহেশের সেখানে আসার পর যেন নতুন করে সবাইকে চিনতে পারলে সে। এই হলো মহেশের বড়দাদাবাবু। আর ওই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওই-ই তাহলে সেই মেয়েটা, যাকে মহেশ রাক্ষুসী বলে বর্ণনা করেছিল। কী বিচিত্র মানুষের নিয়তি আর কী বিচিত্র এই কলকাতা শহর!

জীবনে আরো অনেকবার সদানন্দ কলকাতায় এসেছে, কিন্তু এমন বিচিত্র ঘটনার মুখোমুখি কখনও হয়নি সে। আজও ভাবলে অবাক হতে হয় তার নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে।

কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে সে-সব কথা অত ভাববার সময় ছিল না তার। বড়দাদাবাবুও যেন তখন সেই ঘটনার পর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এতগুলো লোকের সামনে বড়দাদাবাবু যে কী করবে তা বুঝতে পারছিল না।

বললে—বাবার অসুখ? কী অসুখ?

সদানন্দও জিজ্ঞেস করলে—কখন অসুখ হলো? কাল রাত্তিরেও তো আমার সঙ্গে কাকাবাবুর কথা হয়েছে—

মহেশ বললে—ভোরবেলা তো বাবু চান করতে গেলেন, তারপরে ফিরে আসতেই বুকটা কেমন ব্যথা করতে লাগলো, তারপর শুয়ে পড়লেন—

বড়দাদাবাবু বললে—তা আমাকে খবর দিতে কে বলেছে তোকে?

মহেশ বললে—কেউ বলেনি। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম খুব। তাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে দিয়েই এখানে ছুটে এলুম—

সদানন্দ বললে—চলো মহেশ আমি যাই,—

মহেশ বড়দাদাবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আপনি যাবেন না বড়দাদাবাবু?

—আমি পরে যাবো, তুই যা—

বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে মহেশ বললে—আপনাকে যে আমি এখানে পাবো তা ভাবতে পারিনি, আপনি এখানে কেমন করে এলেন?

সদানন্দ সমস্ত ঘটনাটা বলে গেল মহেশকে। মহেশ শুনে অবাক। বললে—কী আশ্চর্য, আমি যদি না এসে পড়তুম তো কী হতো বলুন তো? দেখলেন তো ওই রাক্ষুসীটাকে? সাধ করে কি বাবু আমার অত রেগে গেছেন ছেলের ওপর? আর আপনিই বা কেন যার-তার কথায় সেখানে-সেখানে যান বলুন তো! বাবু কতদিন আপনাকে বারণ করেছেন না!

ওদিকে সমরজিৎবাবু তখন বউবাজারের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। একটু আগেই ডাক্তার তাঁকে দেখে বিদায় নিয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িটাই তখন থম থম করছে। অন্য দিন একতলার পেছন দিকটা চাকর-ঠাকুর-ঝিদের কথাবার্তা ঝগড়া-ঝাঁটিতে মুখর হয়ে থাকে। কখনও বা ভেতর-বাড়ি থেকে রান্নার শব্দও আসে। কিন্তু সেদিন সে-সব কিছুই নেই। দেখে বোঝা যায় কোথায় যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। সুখের সংসারের ভিতে কোথায় যেন একটা সর্বনাশের ফাটল ধরেছে।

মহেশ আগে আগে বাড়িতে ঢুকছিল, সদানন্দও ঢুকলো পেছন পেছন। মহেশ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই সদানন্দ বললে—তুমি ওপরে গিয়ে দেখে এসো মহেশ, আমি পরে যাবো—

মহেশ বললে—না, আপনিও আসুন না দাদাবাবু, আসতে কী হয়েছে?

কথাটা শুনে সদানন্দও ওপরে গেল। তারা ওপরে যেতেই কে যেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে অন্য ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাকাবাবু তখন বিছানায় চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। তাঁর পাশে বসে আছে কাকীমা। কাকীমা মহেশকে দেখতে পেলে, সদানন্দকেও দেখলে। কিন্তু মুখে কিছু কথা বললে না। সমরজিৎবাবু চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর দিকে চেয়ে সদানন্দর মনে হচ্ছিল তিনি যেন সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তির কোলে আশ্রয় পেয়েছেন।

কাকীমা মহেশকে ডেকে গলা নিচু করে কী যেন বললে। মহেশ এসে বললে—দাদাবাবু, মা একবার আপনাকে ডাকছেন—

সদানন্দ যেতেই কাকীমা বললে—কোথায় বেরিয়েছিলে তুমি, উনি তোমায় খুঁজছিলেন—এখন ওষুধ খেয়ে একটু ঘুমোচ্ছেন—

মাথার ওপর পাখাটা বন বন করে ঘুরছিল। সমরজিৎবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা মনে হচ্ছিল সদানন্দর। কোথাকার মানুষ সে, কোন্ চৌধুরী-বংশের সন্তান, সেখান থেকে কোন অমোঘ নির্দেশে এ কোথায় এসে আর এক সম্পর্কের জালে জড়িয়ে গেল!

হঠাৎ সদর রাস্তায় একটা গাড়ির শব্দ হতেই মহেশ বললে—এই বড়দাদাবাবু এসেছে—

কাকীমা বুঝতে পারেনি প্রথমে। বললে—কে? খোকা? খোকা এ-সময়ে আসবে কেন? সে তো এ-সময়ে আসে না কখনও—

সদানন্দর কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। আবার সেই লোকটার সঙ্গে এখানে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে। কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগলো তার। বললে—কাকীমা, আমি এখন আসি তাহলে—

কাকীমা বললে—কেন বাবা, ওকে তুমি দেখনি, ও আমার ছেলে আসছে, তুমি থাকো না এখানে—

সদানন্দ বললে—না, আমি যাই—

বলে ঘর থেকে বেরোতে যেতেই আবার সেই বড়বাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সদানন্দকে দেখেই তার চোখ দুটো যেন কেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। তার কালীঘাটের বাড়িতেও যে-দৃষ্টি দিয়ে সদানন্দকে দেখেছে এখানে তার নিজের পৈতৃক বাড়িতেও সেই একই দৃষ্টি। যেন পারলে সদানন্দকে জেলে পুরে দিয়ে সে বাঁচে।

সদানন্দকে দেখিয়ে বললে—মা, এ কে?

কাকীমা বললে—ও? ও সদানন্দ!

বড়বাবু বললে—সদানন্দ তো বুঝলুম, কিন্তু ও আমাদের বাড়িতে কেন? কে আমাদের বাড়িতে ওকে ঢুকতে দিয়েছে?

কাকীমা বললে—আঃ, তুই অত চেঁচাচ্ছিস কেন? দেখছিস কর্তার অসুখ—

—অসুখ বলে কি সব সহ্য করতে হবে? আমি তোমার কাছে জানতে চাই কেন তুমি যাকে তাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছ? কে একে এ-বাড়িতে আনলে?

—কাকীমা বললে—আমাকে কেন ও-সব কথা জিজ্ঞেস করছিস? আমি কি কোনও ব্যাপারে থাকি? যে বাড়ির মালিক তার অসুখ ভালো হলে তাকে জিজ্ঞেস করিসখন্, এখন ও-মানুষ ঘুমোচ্ছেন, এখন চেঁচামেচি করছিস কেন?

বড়বাবু বললে—তা যতদিন কর্তার অসুখ থাকবে ততদিন ওকে এ-বাড়িতে রাখবে নাকি তোমরা?

কাকীমা বললে—ওরে খোকা, তুই চুপ কর, একটু আস্তে কথা বলতে পারিস নে?

—আমি যা বলছি আগে সেই কথার জবাব দাও। এ কতদিন আমাদের এখানে আছে? কী করতে আছে? এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী? আমি তোমার কাছে সেই কথাটা আগে জানতে চাই—

কাকীমা বললে—ওরে তুই কেন এখন আসতে গেলি? কে তোকে এখন আসতে বললে? আমি সকাল থেকে ওই মানুষকে নিয়ে পড়েছি, বিপদের ওপর বিপদ চলছে আমার, আর তার ওপর তুই এখন এলি জ্বালাতে? তোর এত বয়েস হলো, একটা আক্কেল-জ্ঞান বলে কিছু থাকতে নেই?

বড়বাবু বলে উঠলো—আমার আক্কেলের কথা আমি বুঝবো, কিন্তু তোমাদের আক্কেলটাই বা কী রকম? একটা চোর-ডাকাত কি না ঠিক নেই, তাকে তোমরা একেবারে অন্দর-মহলে এনে ঢোকালে!

কাকীমা বলে উঠলো—তোর সঙ্গে আমি এখন কথা বলতে পারি নে, তুই যা, তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা এখন—

—কেন বেরিয়ে যাবো? আমার নিজের বাড়ি থেকে কেন বেরিয়ে যাবো?

কাকীমা মহেশকে ডাকলে—ওরে মহেশ, তোর বড়দাদাবাবুকে বাইরে বার করে দিয়ে আয় না, আমি যে আর পারছি না-রে—

বড়বাবু বললে—দেখ, অনেকদিন তোমরা আমাকে বার করে দিয়েছ বাড়ি থেকে। কিন্তু ভেবো না আজকে আমি নেশা করেছি। আমি যা বলছি সব ভেবেচিন্তেই বলছি, আমি আজ আর বেরিয়ে যাবো না।

মহেশ তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

কাকীমা তাকে লক্ষ্য করে বললে—কী রে, কথা কানে যাচ্ছে না তোর?

মহেশের তবু সাহস হচ্ছিল না। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইল।

বড়বাবু এবার সদানন্দের দিকে এগিয়ে এল। বললে—আপনি দাঁড়িয়ে কী দেখছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান—

সদানন্দ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এতটুকু নড়লো না। যেন কারোর কোনও কথা তার কানে ঢোকেনি।

কাকীমা নিজেই এবার ছেলে আর সদানন্দর মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বললে—কেন ওকে যেতে বলছিস তুই? কর্তা ওকে নিজে এখানে এনে তুলেছেন, চলে যেতে বললে কর্তা নিজেই বলবেন—

বড়বাবু বললে—আমিও এ-বাড়ির মালিক, আমারও ওকে চলে যেতে বলবার অধিকার আছে। আমিই ওকে চলে যেতে বলছি, ও যাক—

এতক্ষণে কর্তার বোধ হয় একটু তন্দ্রা ভাঙলো। চেঁচামেচিতে তিনি চাইলেন এদিকে। দুর্বল গলায় বললেন—কে? কী হয়েছে?

কাকীমা সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর কাছে গিয়ে বললেন—তুমি কেমন আছো? বুকের ব্যথাটা আছে এখনও?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সমরজিৎবাবু বললেন—ও কে এসেছে?

কাকীমা বললে—খোকা তোমার অসুখের খবর পেয়ে এসেছে—

—ও চেঁচাচ্ছে কেন?

বড়বাবু বললে—আমি বলছি এ আমাদের বাড়িতে আছে কেন? একে আপনি আমাদের বাড়িতে কেন থাকতে দিয়েছেন?

—কার কথা বলছিস তুই?

কাকীমা বললে—খোকা সদানন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে—

—কেন?

সমরজিৎবাবু সামান্য কথা বলতে গিয়ে হাঁফাচ্ছিলেন। যেন মনে হলো তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

বড়বাবু বললে—আপনি কেন যেখান থেকে যাকে-তাকে বাড়িতে এনে ঢুকিয়েছেন? যাকে চেনেন না তাকে কী বলে বাড়িতে তুলেছেন?

সমরজিৎবাবু সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই ছেলের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর উঠে বসলেন। ক্লান্ত শরীরটা যেন তিনি আর বইতে পারছেন না। বললেন—কী করে তুমি জানলে যে আমি ওকে চিনি না, জানি না? আমি না জেনে ওকে আমার বাড়িতে এনেছি, কে তোমাকে বললে?

কাকীমা কাছে গিয়ে বললে—ওগো তুমি উঠে বসলে কেন, শোও, শুয়ে পড়ো—

সমরজিৎবাবু কাকীমার কথায় কান না দিয়ে বললেন—বলো কে তোমাকে বললে।

বড়বাবু বললে—কেউ আমাকে বলেনি, আমি নিজে জানি। আমাদের পুলিস রিপোর্ট আছে—

—রেখে দাও তোমাদের পুলিস রিপোর্ট! আজ তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি শুনে নাও, আজ থেকে তুমি আমার ছেলে নও—

কাকীমা বলে উঠলো—ওগো তুমি চুপ করো, তোমার শরীর খারাপ, শুয়ে পড়ো তুমি—

—না, আমি শোব না, এ ভেবেছে কী? ভেবেছে ও যা করবে আমি তাই সহ্য করবো? ও পুলিসের চাকরি করে বলে আমি ওকে ভয় পাবো? ও জানে না যে এ বাড়ির ছেলে নয় ও! আমি এ বাড়িতে ওকে ঠাঁই না দিলে ও এই লেখাপড়া শিখতো, না খেতে পেত? ওকে মানুষ করেছে কে? ওর বাবা না আমি? কে ওকে ছোটবেলা থেকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছে? ও আজ এত বড় লায়েক হয়েছে যে আমারই খেয়ে-পরে আবার আমার ওপরেই চোটপাট করে? এত বড় নির্লজ্জ যে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আমার বাড়িয়ে ঢোকে! বাড়িতে বউমা থাকতে বাইরে রাত কাটায়?

বড়বাবুও গলা চড়ালো। বললে—যা করি বেশ করি, যা করি আমি আমার নিজের উপায় করা পয়সায় করি। আপনার কাছ থেকে তো আমি একটা পয়সাও নিই না—

—ঠিক আছে, আমার-পয়সার ওপরে যদি তোমার এতই অশ্রদ্ধা তবে এবার থেকে আমার টাকা-পয়সা আর একটাও পাবে না তুমি। আমার সব টাকা-পয়সা জমি-জমা সব আমি ওই সদানন্দকেই দিয়ে যাবো—আমি সদানন্দকেই এবার উইল করে সব দিয়ে যাবো।

বড়বাবু বললে—আপনার টাকা-পয়সা আমি চাইও না। কিন্তু যাকে আপনার টাকা-পয়সা দিয়ে যাবেন বলছেন জানেন সে একটা স্কাউন্ড্রেল? আজকে তাকে কোন্ পাড়ায় আমি দেখেছি তা জানেন?

সমরজিৎবাবু বললেন—সে যাই হোক, তোমার চেয়ে সদানন্দ ভালো তার প্রমাণ আমার আছে—সে প্রমাণ নিয়ে তবে আমি কথা বলছি—

বড়বাবু বললে—আমার কাছেও প্রমাণ আছে—

সদানন্দ এবার আর পারলে না। সে সমরজিৎবাবুর কাছে গিয়ে বললে—কাকাবাবু আপনি চুপ করুন, আপনার শরীর খারাপ, আমি আর এ সমস্তর মধ্যে থাকতে চাই না। আমাকে আপনি মুক্তি দিন, আমি চলে যাই—আপনাদের সংসারে আমি কেন মিছিমিছি অশান্তির সৃষ্টি করি মাঝখান থেকে—

সমরজিৎবাবু বললেন—কেন তুমি চলে যাবে? তুমি কি ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি? ও পুলিসের চাকরি করে বলে ভেবেছে ওর যা ইচ্ছে তাই করবে?

সদানন্দ বললে—না, সেজন্যে নয়, আমার টাকা-পয়সা-জমি-জমার কিছুতেই দরকার নেই—ওসব আমি অনেক দেখেছি—

সমরজিৎবাবু বললেন—তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি তোমার সম্বন্ধে সব খবর পেয়ে গেছি, মহেশকে নবাবগঞ্জে পাঠিয়ে আমি সমস্ত খবর এনেছি—। আমি তোমাকে আমার বাড়িতে রাখবো। তোমার টাকার অভাব নেই তাও আমি জানি। কিন্তু আমার অভাব আছে তোমার মত ছেলের—

বড়বাবু বললে—কিন্তু যদি প্রমাণ করতে পারি ও একটা ইম্‌পসটার, একটা স্কাউন্ড্রেল—

সমরজিৎবাবু বললেন—স্কাউন্ড্রেল ও নয়, তুমি! আমি অনেক পাপ করেছিলুম তাই তোমার মত স্কাউন্ড্রেলকে আমি নিজের ছেলের মতন মানুষ করতে চেয়েছিলুম—

কাকীমার আবার ভয় হয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললে—ওগো তুমি চুপ করো, চুপ করে শুয়ে পড়ো—তোমার শরীর খারাপ—

সমরজিৎবাবু বললেন—আমায় তুমি চুপ করতে বোল না, আমার যদি আজ শক্তি থাকতো তো আমি অমন ছেলের গলা টিপে মেরে ফেলতুম, তবে চুপ করতুম—সদানন্দকে বলে কিনা স্কাউন্ড্রেল, বলে কিনা সদানন্দের পুলিস-রিপোর্ট আছে—

—হ্যাঁ আছে, আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি এক্ষুনি—প্রমাণ আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে—

বলে বড়বাবু হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে তার পাশের ঘরে চলে গেল। আর তার খানিকক্ষণ পরেই একটা ছবি নিয়ে ফিরে এল। বললে—এই দেখুন, এটা ফোটোগ্রাফ কিনা আপনারা দেখুন, মিলিয়ে দেখে নিন—

কাকীমা দেখলে, সমরজিৎবাবুও দেখলেন—হ্যাঁ, সদানন্দেরই ফোটোগ্রাফ সেটা। কোনও সন্দেহ নেই।

বড়বাবু বললে—এতক্ষণ আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না, এখন বিশ্বাস হলো তো?

সবাই তখন বিস্ময় বিমূঢ়।

বড়বাবু আবার জিজ্ঞেস করলে—বলো, বলো কার ছবি এটা?

কারোর মুখেই কোনও কথা নেই। সকলের মনের এতদিনকার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যেন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।

—বলো তোমরা, চুপ করে রইলে কেন, বলো?

কাকীমা আর থাকতে পারলে না। খোকাকে জিজ্ঞেস করলে—তা ওর ছবি তোর কাছে এলো কী করে?

বড়বাবু বললে—যার ছবি তাকেই জিজ্ঞেস করো না! সে তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে!

সদানন্দ আর দাঁড়ালা না সেখানে। সকলের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্যে সে ঘরের বাইরে চলে এলো। তারপর সোজা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তার নিজের ঘরে। আর তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল তুলে দিলে।

কিন্তু সেইভাবে কতক্ষণ কেটেছিল কে জানে, হঠাৎ বাইরে থেকে মহেশ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগেলো—দাদাবাবু, দরজা খুলুন, দাদাবাবু—

সেদিন সেই কতকাল আগে বৌবাজারের একটা বাড়ির একখানা দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতরে সদানন্দর মনে যে-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আজও মনে আছে। তারপরে এতদিন কেটে গেছে, এত বিপর্যয় আর এত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তার স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয়নি।

মনে আছে সারাদিন সে সেই ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছিল। তার মনে হয়েছিল কী হবে তার সেখানে থেকে। ভাগ্যের কোন্ এক অমোঘ তাড়নায় যখন সে নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তখন সারা পৃথিবীটাই তো তার ঘর। তবে আর কেন সে ঘরের মায়া করছে। এই চারটে দেয়াল ঘেরা আশ্রয়ে এসে সে কি আর একটা বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকবে?

মাঝখানে কতবার মহেশ দরজায় ধাক্কা দিয়েছে—'দাদাবাবু দরজা খুলুন—দরজা খুলুন—"

কিন্তু যে স্থির-প্রতিজ্ঞ মানুষ একদিন সহস্র মায়ার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আসতে পেরেছে, সে কি আর এই সামান্য সমরজিৎবাবুর ক'টা টাকার আকর্ষণে ভুলবে। একদিন

কর্তাবাবুর কথায় ভুলেছে সে, একদিন কর্তাবাবুর কথায় নয়নতারার মত একটা নির্দোষ মেয়ের জীবন সে নষ্ট করে দিয়েছে। নয়নতারা তার স্বামীকে হারিয়েছে, নয়নতারার মা হবার সম্ভাবনাও সে নষ্ট করে দিয়েছে, এর পরও যদি এখানে এই সমরজিৎবাবুর আশ্রয়কেই সে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে তার বিধাতাপুরুষের কাছে সে কোন্ কৈফিয়ৎ দেবে? নিজের জীবনে তার কি আরাম করবার কোনও অধিকার আছে? তার শরীরের আর মনের সুখভোগ করবার সমস্ত মালিকানা স্বত্বই তো সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে চলে এসেছে। এই ত্যাগ আর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েই তো তাকে সারাজীবন পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। এর থেকে তো তার আর মুক্তি নেই। অন্যের জীবন নষ্ট করে দিয়ে নিজের আরাম-ভোগের মধ্যে যে নীচতা তা যেন তাকে কখনও স্পর্শ না করে। সেই নীচতা থেকে যেন সে পরিত্রাণ পায়।

আবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো মহেশ।

ডাকতে লাগলো—দাদাবাবু, দরজা খুলবেন না? দরজা না খুললে কিন্তু আমি দরজা ভেঙে ফেলবো—

কিন্তু এততেও সদানন্দ অচল-অটল-প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যেমন শুয়ে ছিল তেমনিই শুয়ে রইল।

শেষকালে সদানন্দ আর থাকতে পারলো না। কাকীমার গলার আওয়াজ এল বাইরে থেকে—হ্যাঁ বাবা সদানন্দ, তুমি না খেলে যে আমরাও কেউ খেতে পারছি না, আমরাও তোমার মত সারাদিন উপোস করে থাকবো বলতে চাও?

সদানন্দ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে। খুলতেই দেখলে মহেশ দাঁড়িয়ে আছে। পাশে কাকীমা।

কাকীমা বললে—কী বাবা, তুমি কি চাও আমরাও তোমার মত সারা দিন উপোস করি?

সদানন্দ অপরাধীর মত চুপ করে রইল।

কাকীমা আবার বললে—তোমার কাকাবাবু রোগী মানুষ, জানো তুমি খাওনি শুনে তিনিও জলস্পর্শ করেননি। বউমাও এতক্ষণ খায়নি, আমি এখুনি তাকে খাইয়ে দিলুম। কত বেলা হলো তা জানো। বিকেল তিনটে বেজে গেছে যে ঘড়িতে—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আপনি আর কাকাবাবু আপনারা খেয়ে নিলেন না কেন?

কাকামী বললে—তুমি তো বেশ কথা বললে বাবা, তুমি বাড়ির ছেলে হয়ে না-খেয়ে রইলে আর আমরা বুড়ো-বুড়ি খেয়ে নেব? তা কখনও কেউ পারে?

সদানন্দ বললে—কিন্তু কাকাবাবু তো রোগী মানুষ, তাঁকে যা খাওয়ার খেতে দিলেন না কেন?

কাকীমা বললে—আমি তো অনেক বলেছি, এখন তুমি বলে-কয়ে যদি তাঁকে খাওয়াতে পারো তো দেখ, আমার কথা তিনি শুনবেন না—

সদানন্দ আর কী করবে। বললে—চলুন দেখি, আমি বুঝিয়ে বলছি—

বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে কাকাবাবুর ঘরে গেল। সমরজিৎবাবু তখন ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সকাল থেকে অনেক উত্তেজনা গেছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছেন ছেলের সঙ্গে। জীবনে তিনি কখনও কষ্ট পাননি। অনায়াস-লব্ধ অর্থ তাঁকে কেবল আরামই দিয়েছে, কিন্তু সে-অর্থের অসদ্ব্যয় করবার দুর্মতি তাঁর কখনও হয়নি। তিনি জানতেন তাঁর অনুপার্জিত অর্থের ওপর তাঁর নিজস্ব কোনও অধিকার নেই। তাই নিজের ভরণ-পোষণের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকু রেখে বাকিটুকু তিনি দান-ধ্যান ব্যয় করেছেন। তারপরে আছে পরলোকের চিন্তা। পূর্বপুরুষের স্মৃতিটুকুই ছিল তাঁর একমাত্র

পুঁজি। ওই পুঁজিটুকু তিনি কার কাছে গচ্ছিত রেখে যাবেন এই চিন্তাই মাঝে-মাঝে তাঁকে পীড়িত করতো। যাকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন তার ওপরেই তাঁর ভরসা ছিল। কিন্তু দিনে দিনে যখন তাঁর ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁকে উৎপীড়নের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল ঠিক তখনই এই সদানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপর যত দিন যেতে লাগলো ততই তিনি সদানন্দের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। স্থির করলেন এই সদানন্দের হাতেই তিনি পূর্বপুরুষের সমস্ত স্মৃতির পুঁজি গচ্ছিত রেখে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন।

কিন্তু সদানন্দ নিজেই সে-সাধে বাধ সাধলো সেদিন।

কেন যে সদানন্দ সমস্ত কিছু অস্বীকার করলে তার কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। তবে কি সদানন্দ এ-সব কিছুই পছন্দ করছে না? তাহলে তিনি কী করবেন? কার হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে তিনি নিজের শেষ-জীবনের পরিত্রাণ খুঁজবেন?

—ওগো, এই তোমার সদানন্দ এসেছে।

সমরজিৎবাবু চোখ খুললেন। খুলে সামনেই সদানন্দকে দেখে তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠলো।

সদানন্দ বললে—কাকাবাবু, আপনি কিছু খাচ্ছেন না কেন?

সমরজিৎবাবু বললেন—তুমি না খেলে কি আমি খেতে পারি? আমিও ঠিক করেছি খাবো না কিছু—

—কিন্তু কেন? কেন আপনি খাবেন না? আমার না খাওয়ার কারণ তো আপনি জানেন! চোখের সামনে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগগুলোর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘেন্না হলো। অথচ সেই কথাগুলোই দেখলুম আপনারা নির্বিবাদে বিশ্বাস করে গেলেন—

সমরজিৎবাবু বললেন—তা বলে কোনও অবস্থাতেই কি অত রাগ করতে আছে সদানন্দ। আমি তোমাকে সুস্থ মানুষ বলেই জানতুম। তোমার কাছে আমি এ-রকম ব্যবহার আশা করিনি। তুমি কি জানো না যে বিশ্বাস করার মধ্যেই মনের উদারতা প্রকাশ পায়?

সদানন্দ বললে—তা বলে কারো মুখের কথায় কালোটাকে সাদা বলে বিশ্বাস করতে হবে?

সমরজিৎবাবু বললেন—তুমি এতদিনেও আমার ছেলেকে চিনলে না? তা যদি না চিনে থাকো তো তুমি আমাকেও চেনোনি। আমাকে যদি ভালো করে চিনতে তাহলে আর এমন করে আমার ওপর রাগ করে নিজেও কষ্ট পেতে না, আমাকেও কষ্ট দিতে না—

কাকীমা হঠাৎ বলে উঠলো—কিন্তু বাবা, তুমি করেছিলে কী যে তোমার ছবি খোকাদের অফিসে চলে গেল?

সদানন্দ বললে—আমার কাছে এর উত্তর চাইবেন না কাকীমা। যদি উত্তরের জন্যে বেশি পীড়াপীড়ি করেন তো আমাকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এর চেয়ে ঘৃণ্য জিনিস আর কিছুই নেই—

—তা তোমার নামে কি কোনও পুলিস-কেস হয়েছিল কখনও?

সমরজিৎবাবু মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠলেন। গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন—তোমার ছেলেই ভালো আর সদানন্দ খারাপ এই-ই কি তোমার কথা?

সদানন্দ বলে উঠলো—আত্মসমর্থনে কোনও কথা বলাই আমার কাছে ঘেন্নার জিনিস। তার জন্যে আমি কারো কাছে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই, এমন কি তার চেয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে সোজা—

কাকীমা বললে—না বাবা, তাহলে তোমাকে বলতে হবে না। বরং তুমি খেয়ে নাও,

আমরাও দুটি মুখে দিই—

বলে ডাকলে—মহেশ, দাদাবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দে—

সদানন্দ বললে—আমি খাবো, কথা দিচ্ছি আমি খাবো, কিন্তু কাকাবাবু অসুস্থ মানুষ, আগে কাকাবাবু খান—

কথাটা শুনে সমরজিৎবাবু হাসলেন। হাসি ঠিক নয় সেটা, যেন কান্নারই তা আর এক রূপ।

তিনি গৃহিণীর দিকে চাইলেন। বললেন—আমি জানতুম সদানন্দ আমার কথা রাখবে। তুমিই কেবল বলছিলে সদানন্দ আর থাকবে না এ-বাড়িতে, এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—কেমন, এখন আমার কথাটা বিশ্বাস হলো তো?

কাকীমা বললে —তা আমি কী করে জানবো বলো, মহেশ ওদের দেশের বাড়ি দেখে এসে যা বললে তাতে মনে হয়েছিল ও কেন এখানে থাকতে যাবে। এ-বাড়ির চেয়ে হাজার গুণ বড় ওদের বাড়ি, এদের জমি-জমা-সম্পত্তির কি শেষ আছে? মহেশ তো সব শুনে এসেছে—

সমরজিৎবাবু বললেন—আমি তোমাকে আজ একটা অনুরোধ করবো বাবা, তোমাকে আজ কথা দিতে হবে। তোমার কাছ থেকে কথা পেলে তবে আমি আজ খাবো।

সদানন্দ বললে—বলুন কী কথা?

সমরজিৎবাবু বলতে লাগলেন—তুমি এতদিন আমার এ-বাড়ির সব কিছু জেনে গেছ নিশ্চয়ই, আর আমরা যে ব্রাহ্মণ নই তাও তো তুমি জানো।

সদানন্দ বললে—আমি জাত মানি না—

সমরজিৎবাবু বললেন—সেই সাহসেই আমি তোমাকে বলতে সাহস পাচ্ছি বাবা, আমার কেউ নেই, আমার এমন কেউ নেই যে যাকে রেখে যার হাতে সব কিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি। তবু অন্তত বুঝবো এমন একজনের হাতে সব ভার দিয়ে গেলাম যে আমার পূর্বপুরুষের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে—

বলে একটু দম নিলেন। তারপর বললেন—তুমি হয়ত বলবে আমার তো ছেলে রয়েইছে, তাহলে আর নতুন করে তোমাকে কেন অনুরোধ করছি। করছি এই জন্যে যে তার ওপর আমার আর ভরসা নেই—সে অমানুষ। সেই অমানুষের হাতে সব কিছু দিয়ে চলে গিয়ে আমি নরকে থেকেও শান্তি পাবো না—

সদানন্দ চুপ করে সব শুনছিল। কিছু উত্তর দিলে না।

সমরজিৎবাবু বললেন—তোমাকে আমি সেদিন এই কথাগুলোই বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাধা পড়েছিল। এখন আজ তুমি আমার সামনে বলো তুমি রাজি—

সদানন্দ বললে—আপনি কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না—

সমরজিৎবাবু গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি বলে দাও আমি কী বলতে চাই—

কাকীমা বললে—আমি আর কী বলবো, তুমিই বলো না—

সমরজিৎবাবু বললেন—ঠিক আছে, তাহলে আমিই বলি। আমি আমার ছেলেকে আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তোমাকে আমার সব কিছুর উত্তরাধিকারী করতে চাই—তুমি রাজি?

সদানন্দ কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন প্রস্তাব যে সমরজিৎবাবু কোনও দিন করতে পারেন তা সে কল্পনাই করতে পারেনি।

তার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনও কথা বেরোল না। তারপর অনেক কষ্টে বললে—কিন্তু এ কথা আমাকে বলবার আগে আপনি কি সব দিক বিবেচনা করে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, আমি সব ভেবে দেখেছি। যেদিন থেকে তুমি এখানে এসেছ সেইদিন থেকেই আমি ভেবেছি। ভেবে ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়েছি শেষ পর্যন্ত। আমি জানি তুমি ব্রাহ্মণ, আর আমি শূদ্র। তুমি বিবাহিত, তোমার অভিভাবকরা আছেন, তাও ভেবেছি। তারপর মহেশকে তোমাদের দেশে পাঠিয়ে অন্যান্য সব খবরও সংগ্রহ করেছি। তার পরেও আমি তোমাকে এই প্রস্তাব করছি—

সদানন্দ বললে—এ সম্বন্ধে আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন কাকাবাবু—আমি এখনই এ-সম্বন্ধে কোনও কথা দিতে পারছি না—

সমরজিৎবাবু বললেন—না, তোমাকে আর ভাবতে কোনও সময় দেব না। এখনই তোমায় মত দিতে হবে—

সদানন্দ বললে—এখনই মত দিই কী করে বলুন, আপনার ছেলেকেও তো জিজ্ঞেস করতে হবে, তিনি রাজি আছেন কি না—

—ছেলে? আমার ছেলে? যার কথা বলছো তুমি সে আমার ছেলে নয়, সে কুলাঙ্গার, তাকে আবার জিজ্ঞেস করবো কী? জানো তুমি সে মদ্যপ, লম্পট, সে চরিত্রহীন। অমন সোনার প্রতিমা দেখে তাকে বিয়ে দিয়েছি, তবু সে রাত্রে বাড়িতেও আসে না, অন্য আর একটা সংসার আছে তার। অমন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবো আমি? সে কী মানুষ যে তাকে আমি জিজ্ঞেস করবো? আমার বউমাকে তুমি দেখনি বাবা, বিয়ে হওয়ার পর থেকে আমার বউমার মুখে কেউ কখনও হাসি দেখেনি, তা জানো? ছেলে শুধু আমাদের জীবনই নষ্ট করেনি, সে বউমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছে। —আমার বউমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়, মনে হয় তার কষ্টের জন্যে তো আমিই দায়ী। বউমা সারাদিন কারো সঙ্গে কথা বলে না, কেউ তার মুখও দেখতে পায় না। এ দুঃখ তো আমার জন্যেই, আমিই তো ওই বউকে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেছি—

সদানন্দ বললে—কিন্তু তবু সব শোনার পর আপনার ছেলে যদি আপত্তি করেন?

—আপত্তি করলে করতে পারে। কিন্তু আমার জিনিস আমি যাকে খুশী দিয়ে যাবো তাতে কার কী আপত্তি আছে তা জানবার আমার দরকার নেই ; জানতে চাইও না।

—কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার এ বিরোধ বাধিয়ে দরকার কী? আমি তো এ-সব কিছুই চাই না, আমার এ-সব দরকারও নেই। অথচ এই নিয়ে হয়ত তিনি ঝগড়া বিবাদ-মামলা করবেন, তখন কী হবে? তারপর তিনি বিবাহিত, তাঁকে যদি আপনি ত্যাগ করেন তাহলে তো এ-বাড়িও তাঁকে ত্যাগ করতে হবে?

—নিশ্চয় ত্যাগ করতে হবে। তাকে আমি আর এ-বাড়িতে থাকতে দেব না—

সদানন্দ যেন মহা বিপদে পড়লো। এ কী বিপত্তি!

বললে—কিন্তু তাঁর স্ত্রী? তাঁর সহধর্মিণী?

সমরজিৎবাবু বললেন—তুমি কি ভেবেছ আমি সে-কথা ভাবিনি? সে-ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। তার যাবজ্জীবন ভরণ-পোষণের জন্যে যা করা প্রয়োজন তার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে যাবো। তিনি ইচ্ছে করলে এ-বাড়ির একটা অংশে থাকতে পারেন আর তাঁর যদি অভিরুচি হয় তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে চলে যেতেও পারেন—তাঁর ভবিষ্যতের জন্যে আমার একটা দায়িত্ব আছে বলেই আমি এটা করেছি—

বলে গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন—আমার সেই দলিলটা কোথায়?

কাকীমা বললে—তোমার বালিশের তলায় দেখ, ওখানেই রেখে দিয়েছ—

দলিলটা সমরজিৎবাবু নিজেই বালিশের তলা থেকে বার করে সামনে খুললেন।

বললেন—এই দেখ, উকিলকে দিয়ে আমি সব কিছু পাকা করিয়ে রেখে দিয়েছি, তোমার নামটাও বসিয়ে দিয়েছি এখানে। তুমি রাজি হলে শুধু তোমার সইটা এখানে নিয়ে নেব, কালই উকিলবাবু এখানে আসবেন, তুমি রাজি তো?

সদানন্দ চুপ করে রইল।

—বলো রাজি কি না?

সদানন্দ বললে—আমাকে ক্ষমা করুন কাকাবাবু, আমি রাজি হতে পারলাম না—

সমরজিৎবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে খানিকক্ষণ সদানন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন—তুমি রাজি নও?

—না।

'না' শব্দটা বড় নিষ্ঠুর শোনালো সমরজিৎবাবুর কাছে। তিনি ঠিক এতখানি হয়ত আশঙ্কা করেননি। কিম্বা তাঁর মনে হলো তিনি হয়ত ভুল শুনছেন।

বললেন—সত্যিই তুমি রাজি নও?

সদানন্দ বললে—আমি একজনের সংসার ভাঙতে রাজি নই।

—আমার মনের শান্তির জন্যেও রাজি হতে পারো না? না হয় আমি মারা যাবার পর তুমি এ-সম্পত্তি অন্য কাউকে দিয়ে দিও। তখন তো আমি দেখতে আসছি না। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিনের জন্যেও তুমি রাজি হতে পারো না সদানন্দ?

সদানন্দ বললে—না—কিছুতেই না, আমাকে আপনি এ ব্যাপারে আর মিছিমিছি পীড়াপীড়ি করবেন না—

বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর আবার যেমন এসেছিল তেমন নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলো। আসবার সময় তার মনে হলো যেন পেছনে অনেক দীর্ঘশ্বাস অনেক অশ্রুপাতের বোঝা সে কাকাবাবু আর কাকীমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে চলে এল। কিন্তু কাকে সে বোঝাবে যে এ তার ত্যাগ নয়, এ তার যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে এতদূরে এসে পৌঁছিয়েছে, এখানে এসেও কি সে সেই যন্ত্রণার শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় নিজের গলায় তুলে নেবে! সদানন্দর মনে হলো তার পায়ের তলার মাটিটা যেন টলছে।

—শোন সদানন্দ ; শোন, যেও না—

সমরজিৎবাবুর গলার আওয়াজ শুনে সে থমকে দাঁড়ালো। তারপর পায়ে-পায়ে আবার সে এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—আমায় ডাকছিলেন?

—তুমি কী রকম ছেলে আমি বুঝতে পারছি না সদানন্দ! আমি তোমায় টাকা দিতে চাইছি আর তুমি নিচ্ছ না, এ তো বড় তাজ্জব ঘটনা? এমন তো হয় না। তুমি কি জানো আমার এ সম্পত্তির দাম?

সদানন্দ বললে—আমার জেনে কী লাভ?

সমরজিৎবাবু বললেন—কিন্তু একদিন তো তুমি আমার কাছে একটা চাকরিই চেয়ে ছিলে। তা তুমি চাকরি করবে?

—কী চাকরি?

—এই ধরো তুমি আমার কাছে কাছে থাকবে, আমার দেখাশোনা করবে, আমার সম্পত্তির হিসেবপত্র রাখবে। তার বদলে তুমি মাইনে নেবে, থাকবে, আর এখানে দুবেলা খাওয়া পাবে, রাজি?

সদানন্দ বললে—আগে হলে হয়ত রাজি হতুম কাকাবাবু, কিন্তু এত কাণ্ডর পর আর আমার রাজি হওয়া চলে না—

বলে আবার চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কাকীমা বললে—তাহলে বাবা তোমার কাকাবাবু তো আজ কিছুই খাবেন না। তুমিও যখন খেলে না—

সদানন্দ বললে—আমার আর এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোই লাগছে না কাকীমা। কেবল মনে হচ্ছে আপনারা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাইছেন। আমি তাহলে কীসের জন্যে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, কীসের অভাব ছিল আমার? আমি কি আমার নিজের বাড়িতে নিজের পরিচয়ে নিজের সংসার নিয়ে আরামে থাকতে পারতুম না?

কাকীমা বললে—তা তো সত্যিই, তুমি সে-সব ছেড়েই বা চলে এলে কেন? কীসের জন্যে?

সদানন্দ বললে—সে বললেও আপনি বুঝতে পারবেন না কাকীমা, মানুষ কত নীচ হতে পারে তা কি আপনি জানেন? আপনারা আপনাদের ছেলেকে দেখেছেন, ভাবছেন অত বড় নীচ মানুষ আর নেই, কিন্তু আমার ঠাকুর্দাকে তো দেখেননি, তাহলে বুঝতেন পশুরাও বোধ হয় তার চেয়ে ভালো। আমার ঠাকুর্দার তুলনায় আপনারা ছেলে তো দেবতা। তাই আপনারা যখন তার নিন্দে করছিলেন আমি তখন মনে মনে হাসছিলুম। ভাবছিলুম আপনারা যদি আমার ঠাকুর্দাকে দেখতেন, আমার বাবাকে দেখতেন তাহলে কী বলতেন। আমার লজ্জা এই যে আমি সেই বংশের ছেলে।

বলে সদানন্দ দুই হাতে মুখ ঢাকলো।

কাকীমা বললে—কিন্তু বউমাকে যে ছেড়ে চলে এলে, তাকে কে দেখবে? তার কী করে চলবে? কী নিয়ে সে থাকবে?

—ছেড়ে চলে না এসে কী করি বলুন? তার সঙ্গে সংসার করলে আমি শুধু চৌধুরী-বংশ বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই যে করতে পারতুম না।

—তা তুমি তো বাপের এক ছেলে?

—আপনারা কেউ বুঝবেন না কাকীমা, আমার যন্ত্রণার কথাটা কেউই কিছুতে বুঝবেন না। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে যখন এখানে চলে এসেছিলুম তখন ভেবেছিলুম এখানে এসে অন্তত একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে সকলের চোখের আড়ালে যে কটা দিন বাঁচি কাটিয়ে দেব, কিন্তু তাও আমার হলো না। আমি এখানে এসেও আবার আর একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়লাম, এখন আমি কী করি বলুন তো? আপনারা এমনভাবে আমাকে ভালবাসবেন এ তো আমি ভাবতে পরিনি। আপনারা কেন আমায় এত ভালবাসলেন? আপনারা কেন আমায় এত আপনার করে নিলেন? আপনারা কেন আমায় আপনাদের নিজের সর্বস্ব দিতে চাইছেন? কেন আমার এই ক্ষতি করছেন?

বলতে বলতে সদানন্দর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। যেন জ্বালা করতে লাগলো সে দুটো।

সদানন্দ চোখ দু'টো কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে আবার বলতে লাগলো—আমার অনেক দুর্ভাগ্য যে আমি নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বংশে জন্মেছি, নাহলে আর আমাকে এই এত দুর্ভাগ্য সইতে হতো না। এত পাপ চোখ দিয়ে দেখতে হতো না। তার বদলে যদি আপনাদের এই সংসারে জন্মাতুম তো পৃথিবীতে কার কী ক্ষতিটা হতো? আমি নিজের জন্মের অধিকারেই এই যা-কিছু সব ভোগদখল করতুম। কারো কিছু বলবারও থাকতো না তাহলে—বাড়ি ছেড়ে পালাবারও দরকার হতো না—

কাকীমা বললে—তাহলে তো আর কোনও কথাই ছিল না বাবা—তাহলে আর ভেবে ভেবে তোমার কাকাবাবুর এই রকম শরীর খারাপও হতো না—। কিন্তু কপাল বাবা,

আমাদেরই কপাল, নইলে তোমার মত ছেলে থাকলে কি আমাদের এত কষ্ট!

সমরজিৎবাবু উঠে বসে ছিলেন এতক্ষণ, এবার শুয়ে পড়লেন। কী রকম যেন ছট্‌ফট করতে লাগলেন।

কাকীমা কাছে গেল। বললে—কী হলো? তোমার কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেব?

মহেশ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বাবুর কষ্ট দেখে সে এবার কাছে এগিয়ে এল।

সবাই সমরজিৎবাবুর সামনে গিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল। কাকীমা বললে—কিছু খাবে? ওষুধ এনে দেব?

সমরজিৎবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, না।

—কিছুতেই খাবে না!

সদানন্দ অসহায়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কাকীমা সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—তুমি একটু বলো না বাবা, তুমি বললেই উনি ওষুধ খাবেন, ডাক্তার অত করে বলে গেছে, তবু উনি কিছু খাননি—ডাক্তার ছানা খেতে বলেছিলেন, তাও তৈরি করিয়েছি, সকাল থেকে বকাবকিতে সে-সব কিছুই মুখে দিলেন না—

সদানন্দ কাকাবাবুর সামনে গিয়ে বললে—কাকাবাবু, ওষুধটা খেয়ে নিন না—

সমরজিৎবাবু আবার মাথা নাড়লেন—না—

সদানন্দ আবার বললে—ডাক্তারবাবুকে কি আবার ডেকে আনা হবে কাকাবাবু? মহেশ যাবে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে?

সমরজিৎবাবু তখনও সেই একইভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন—না—

কী যে হলো, সেই ভোরবেলা থেকে শুরু করে এই সংসারে যেন ঝড় বয়ে যেতে শুধু করেছিল। কিন্তু তার পরিণতি যে এমন হবে তা কে জানতো!

সদানন্দ কী যে করবে বুঝতে পারলে না। কাকীমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি একটু বলুন কাকীমা, আপনার কথা হয়ত কাকাবাবু শুনবেন।

কাকীমা বললে—আমার কথা শুনবেন না, বরং তুমিই বলো। তোমাকে বড্ড ভালোবাসেন উনি, তোমার কথায় আপত্তি করতে পারবেন না—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমি কী বলবো বলুন তো কাকীমা, আমি কি ওঁর কথা রেখেছি যে উনি আমার কথা রাখবেন?

কাকীমা বললে—তা তুমি বলো না যে ওঁর কথায় রাজি, তাহলে আর উনি কিছুতেই খেতে আপত্তি করবেন না—

—বলবো?

—হ্যাঁ, বলো না। মুখের কথা বলতে তোমার ক্ষতিটা কী? তারপর যা ভালো বিবেচনা হয় তাই-ই করবে। বলো বাবা বলো, বুড়ো মানুষ, তোমার মুখের কথা শুনলে তবু ওঁর প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে—

সদানন্দ আর দেরি করলে না। সমরজিৎবাবুর মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—কাকাবাবু, আপনি যা বললেন তাইতেই আমি রাজি—আপনি শান্ত হোন, ওষুধ খেয়ে নিন—

এতক্ষণে সমরজিৎবাবুর মুখটা যেন কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সদানন্দর দিকে চেয়ে কী যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু বলতে না পেরে স্থির দৃষ্টি দিয়ে শুধুই সদানন্দকে দেখতে লাগলেন।

সদানন্দ বললে—আমি রাজি কাকাবাবু, আমি রাজি—

এবার ঠোঁটটা শুধু একটু নড়ে উঠলো।

—কিছু বলবেন?

সমরজিৎবাবু কী বললেন কেউ বুঝতে পারলে না।

—ডাক্তারবাবুকে ডাকবো?

সমরজিৎবাবুর ঠোঁটটা একটু যেন ফাঁক হলো। অস্পষ্ট গলায় বললেন—উকিল—

এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলে। মহেশ উকিলবাবুকে ডাকতে গেল। তারপর যখন উকিলবাবু এল তখন আরো অনেক বেলা হয়ে গেছে। তখন অনেকটা সামলে নিয়েছেন তিনি। বালিশের তলা থেকে সেই দলিল বেরোল, উইল বেরোল। সমরজিৎবাবুর সই করাই ছিল। সেখানে উকিলবাবুও নিজে সই করলে। সদানন্দকেও একটা সই দিতে হলো। সমরজিৎবাবুর এবং তাঁর স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে শ্রীমান সদানন্দ চৌধুরী। নিবাস নবাবগঞ্জ, স্টেশন রেল-বাজার, থানা হাঁসখালি, জেলা নদীয়া। আর তাঁর পালিত পুত্র শ্রীমান সুশীল সামন্তকে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি...

সমস্ত ঘটনাটা যখন মিটলো তখন বৌবাজারে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নবাবগঞ্জে অত সকাল সকাল সন্ধ্যে হয় না। সমরজিৎবাবুকে ওষুধ খাইয়ে সকলে খাওয়া-দাওয়া সেরে রান্নাঘরের পাট উঠতে আরো অন্ধকার হয়ে গেল। সমরজিৎবাবু তখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

কাকীমা বললে—তুমি এবার শুতে যাও বাবা, আমি তো আছি, তোমার সারাদিন খাটুনি গেছে খুব—

নিজের ঘরে এসেই সদানন্দ বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। আলোটা নিভিয়ে দেবার কথাও তার খেয়াল হলো না। এ সে কী করলে! নয়নতারার জীবনটা নষ্ট করে দিয়ে সে এখানে এই সমরজিৎবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জীবন কাটাবে নাকি! এই নিচিন্ত আরামের মধ্যে এতদিনকার এত বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটবে! তাহলে নবাবগঞ্জ কী দোষ করলে!

কাল সকালে ওই দলিল যথারীতি রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। আইন-কানুন-স্ট্যাম্প-সই-সাবুদ সমেত পাকাপোক্ত দলিল। কারো এক্তিয়ার নেই দলিলের হেরফের করে। তারপর থেকে এই বাড়ির অকাতর উত্তরাধিকার একমাত্র তার। সমরজিৎবাবুর একমাত্র ওয়ারিশান সদানন্দ চৌধুরী। ও শুধু সম্পত্তির হিসেব। আসল চুক্তিটা আরো কঠিন আরো কঠোর। সদানন্দকে সারা জীবন এই সম্পত্তির দায়ভাগ বয়ে বয়ে বেড়াতে হবে। সমরজিৎ সামন্তর পূর্ব-পুরুষের সমস্ত পাপের বোঝা তার ওপরেই বর্তালো। স্বেচ্ছায় এবং বহাল-তবিয়তে সে এক মুহূর্তে নিজের পরিচয় আমূল পরিবর্তন করে দিলে! এক কালির আঁচড়ে, এক কলমের খোঁয়ায়। এ কী বিচিত্র জীবনের গতি তার। তার সৃষ্টিকর্তার এ কী নির্দয় পরিহাস।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস সদানন্দর নজরে পড়লো। সদানন্দ দেখলে তার ঘরের দরজার তলা দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে একটা ভাঁজ-করা কাগজ ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। উঠেই কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলো। ওপরে নিচেয় কারো নাম নেই। তাতে মোটা মোটা মেয়েলী অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"আপনি আমাদের সংসারে আসার পর থেকে আমার জীবনে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। আমার অতীত তো ছিলই না, বর্তমানও ছিল না! একমাত্র ভবিষ্যৎটুকুই টিম-টিম করে প্রদীপের মত জ্বলছিল। আপনি আসার পর আজ তাও হঠাৎ নিভে গেল। আমার

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব আজ নিঃশেষ হয়ে গেল। আপনি কেন এলেন? আমার মত হতভাগিনী নারীর এ সর্বনাশ করে আপনার কী লাভ হলো? আপনি কি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে পারেন না? আমার মত নিরপরাধ নারীর উপকারের জন্য আপনি কি এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারেন না? যদি এই উপকারটুকু করতে পারেন তো আমি আপনার ওপর চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ইতি”

কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের শেষ জীবনটা যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটবে তা আগেই তাঁর জানা ছিল। গৃহিণী আগেই গিয়েছিলেন, থাকবার মধ্যে ছিল এক মেয়ে। কিন্তু কন্যা-সন্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধরে নেয় যে সে পরের ঘরে যাবার জন্যেই জন্মেছে। সুতরাং তার ওপর আশা-ভরসা কেউ করে না। কিন্তু সেই মেয়ের মৃত্যু-সংবাদও যখন কানে এল তখন আর তাঁর বেঁচে থাকবার কোনও অর্থ রইল না। ভেবেছিলেন সকলকে রেখে সকলকে সুস্থ-সমর্থ দেখে তিনি পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারবেন। তা আর হলো না। আগে মাঝে মাঝে নবাবগঞ্জ থেকে তবু চিঠি আসতো। চিঠির মধ্যে যদি দেখতেন লেখা আছে প্রীতিলতা ভালো আছে, সদানন্দ ভালো আছে, জামাইও সুস্থ আছে তাহলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। তাঁর আর কিছু কামনা ছিল না। পৃথিবী ভেসে যাক, ডুবে যাক, তাতে তাঁর কিছু এসে যেত না। শুধু প্রীতিলতা, সদানন্দ আর জামাই ভালো থাকলেই হলো।

আর জমি-জমা? ও তো থাকবেই। জমি-জমা থাকলেই প্রজা-পাঠক থাকবে, আর প্রজাপাঠক থাকলেই তারা খাজনা দেবে। আর যতদিন তারা খাজনা দেবে ততদিন তিনিও খেতে-পরতে পাবেন। তাছাড়া মানুষ আর কী চায়? একটা তো পেট তাঁর, কত আর তিনি খাবেন? জামাইএরও এমন অবস্থা নয় যে তাঁর সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে চাইবে। বাকি রইল সদানন্দ। এই যা-কিছু তিনি রেখে গেলেন সবই শেষ পর্যন্ত তার।

এ-সব কথা তিনি অবসর সময়ে ভাবতেন আর ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়তেন। তখন প্রকাশের বউ এসে ডাকতো—পিসেমশাই, উঠুন, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে—

কীর্তিপদবাবু বলতেন—তুমি আমার খাবার ঢাকা দিয়ে চলে যাও, আমি পরে উঠে খাবো—

আসলে প্রকাশকেই দেখতে পারতেন না পিসেমশাই। তাঁর গৃহিণী কবে মারা গেছে তার ঠিক নেই কিন্তু টাকার লোভে গৃহিণীর সম্পর্কিত লোকেরা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। তারা তখনও পেছনে লেগে রয়েছে, আঠার মত আটকে আছে সারা জীবন।

শেষকালে প্রকাশের বউ একদিন রাত্রে আবার ডাকতে লাগলো—পিসেমশাই উঠুন, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে—

কিন্তু সেদিন আর কেউ সাড়া দিলে না। আরো অনেকবার ডাকাডাকি হলো তবু সাড়া দিলেন না কীর্তিপদবাবু। তখনই চারদিকে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো যে সুলতানপুরের কীর্তিপদবাবু মারা গিয়েছেন।

ধ্বংস যখন শুরু হয় তখন বোধ হয় এমনি করেই শুরু হয়। একদিন কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর শেষ দেখেছে পৃথিবী, শেষ দেখেছে নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীর, আবার বৌবাজারের সমরজিৎবাবুর শেষ দেখবার জন্যেও পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে। আর এবার শেষ দেখলে ভাগলপুরের কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের। সে বড় নিঃশব্দ শেষ। আগে বাবার মৃত্যু হয়, তারপরে মৃত্যু হয় সন্তানের। এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কীর্তিপদবাবুর বেলা

সে-নিয়ম উল্টে গেল। আগে সন্তান, তার পরে বাবা। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে পৃথিবীর সব নিয়ম-কানুন বুঝি পালটে গেল।

ছোটমশাই যখন সুলতানপুরে এসে পৌছোলেন তখন সব শেষ। নেহাৎ শেষ-কৃত্যটা না করলে নয় তাই করলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি সব কিছু চুকিয়ে আবার তাঁর নবাবগঞ্জে ফিরে যাবার কথা। সেইভাবেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন মনে মনে। কিন্তু ফিরেই বা যাবেন কোথায়? সেই নবাবগঞ্জেও যা, এই সুলতানপুরেও তাই। সেখানেও সেই খাঁ-খাঁ বাড়িটার ভেতরে দম আটকে আসা নিঃসঙ্গতা, এখানেও তাই। শ্বশুরমশাই-এর বিরাট বাড়িটার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যেন ছোটমশাই তাঁর দীর্ঘশ্বাসের নিঃশব্দ আর্তনাদ শুনতে পেলেন। খাতা-পত্র-দলিল-দস্তাবেজ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্য, এত জমি-জমার মালিক ছিলেন তাঁর শ্বশুর, এতও বোধ হয় আগে কল্পনা করতে পারেননি তিনি। এ সব কিছুর মালিক তাহলে একলা তিনি।

একজন বৃদ্ধ লোক সেদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এল।

—কে? কে তুমি?

—পেন্নাম হই ঠাকুর মশাই। আমি গরীব ব্রাহ্মণ এ-গ্রামের। অধীনের নাম শ্রীনিরাপদ চক্রবর্তী, আপনার প্রজা।

—কী চাই তোমার, বলো?

—মুখুজ্জে মশাই-এর কাছে আমার মাসোহারা বরাদ্দ ছিল তিন টাকা করে। তিনি প্রতি মাসে আমাকে টাকাটা দিতেন।

ছোটমশাই রেগে উঠলেন। বললেন—যিনি আপনাকে টাকা দিতেন তিনি তো আর এখন নেই। তিনি থাকলে নিশ্চয়ই আপনাকে মাসোয়ারা দিয়ে যেতেন, কিন্তু আমি এখন আর ওসব দিতে পারবো না।

নিরাপদ চক্রবর্তী বললে—তিনি ছিলেন আমাদের মা-বাপ, তিনি নেই, এখন আপনিই আমাদের মা-বাপ, তাই আপনার কাছেই হাত পাতছি। দিলে গরীবের বড় উপকার হতো—

বিরক্ত হয়ে ছোটমশাই বাক্স থেকে একটা টাকা বার করে বৃদ্ধকে দিলেন। বললেন—যান, এর বেশি আর হবে না, এটা নিয়ে খুশী হয়ে চলে যান—

নিরাপদ চক্রবর্তী টাকাটা হাত পেতে নিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল। ছোটমশাই ভাবলেন আপদের শান্তি হলো। কিন্তু বিপদ শুরু হলো পরের দিন থেকেই। পরের দিন সকাল থেকেই দলে দলে লোক আসতে লাগলো। একজন আসে তো পিছু পিছু আসে আর একজন। সকলেরই এক আর্জি। টাকা। মুখুজ্জে-মশাই নাকি সবাইকেই জীবদ্দশায় সাহায্য করতেন। সেই সাহায্য তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন বন্ধ না হয়ে যায়। এই তাদের মিনতি।

সুলতানপুরের মানুষ যে এত ভিখিরি তা জানলে বোধ হয় ছোটমশাই আগে থেকেই সাবধান হয়ে যেতেন।

বললেন—আপনারা কি টাকার গাছ পেয়েছেন আমাকে? আমার শ্বশুরমশাই-এর কেউ ছিল না, তাই তিনি দিতে পারতেন, কিন্তু আমার তো তা নয়, আমার নবাবগঞ্জে সংসার রয়েছে—সেখানে খরচ করতে হয়—

একজন বললে—তাহলে নিরাপদ চক্রবর্তী মশাইকে কালকে দিলেন কেন?

হঠাৎ কোথা থেকে একজন ষণ্ডামার্কা লোক এসে হাজির হলো। হাজির হয়েই সকলকে তাড়া করলে—যান যান, আপনারা যান এখান থেকে, ঠাকুরমশাই এসেছেন এখানে, শোকে-দুঃখে এখন কাতর হয়ে রয়েছেন, আর এই সময়ে কিনা তাঁকে বিরক্ত করা—যান—

বলতে গেলে সে-ই সকলকে তাড়িয়ে দিতে তবে ঠাণ্ডা হলো। একান্তে অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মত কাছে এসে বললে—শুনুন ঠাকুরমশাই,.এই সুলতানপুরের লোকগুলো বড় নচ্ছার পাজি, কাউকে একটা পয়সা দেবেন না, দেখেছে আপনি ভালো লোক, তাই একেবারে পেয়ে বসেছে। আপনি এখেনে নতুন লোক, কাউকে চেনেন না। আপনি যদি এমনি করে দান-খয়রাত শুরু করেন তো বিপদে-পড়বেন, আপনার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবে এরা। আমি যাকে যাকে দিতে বলবো কেবল তাকে তাকে দেবেন—

ছোটমশাই হঠাৎ অতি-আত্মীয়তার সাবধানবাণীতে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছিনে—

লোকটা বললে—চিনবেন চিনবেন, আপনার শ্বশুরমশাই আমার পরামর্শ ছাড়া এক-পা নড়তেন না। হঠাৎ দরকার হলে রাত-বিরেতেও আমাকে ডাকতেন। বলতেন—অশ্বিনী, একবার আমার কাছে এসো তো একটা পরামর্শ আছে। তা তিনি তো এখন স্বর্গে চলে গিয়েছেন, এবার থেকে আপনিও ডাকবেন। তা খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে আপনার?

ছোটমশাই বললেন—আমার শালার পরিবার আছে। তারাই দু'বেলা যা'হোক দু'মুঠো ফুটিয়ে দিচ্ছে—

—তা সে-খাবার আপনার মুখে রুচছে তো?

—কেন, ও-কথা বলছেন কেন?

—না—না, মানে প্রকাশকে তো আমি চিনি। সে তো বরাবর বাউণ্ডুলে মানুষ ছিল। জানি না, এখন কেমন আছে। সে তা বউ ছেলে মেয়ে এখানে রেখে চিরকাল আপনার ঘাড়ে বসে খেয়েছে। তা এখন কোথায় আছে সে?

ছোটমশাই বললেন—কলকাতায়—

—তা সে কলকাতায় থাকুক আর যেখানেই থাকুক, আপনার ও-সব-যা-তা খাওয়ার দরকারটা কী! এই মুখুজ্জেমশাই যে অকালে মারা গেলেন, তা কেন মারা গেলেন তা জানেন? কারণ ভালো যত্ন-আত্তি তো হতো না। আমায় একবার আড়ালে ডেকে বলেছিলেন—অশ্বিনী, আমি-আর এ সব ছাই-পাঁশ খেতে পারছিনে, এই রকম খাওয়া খেলে আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। তুমি আমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচাও। আমি বললুম ঠিক আছে, এবার থেকে আপনার বউমা রান্না করে দেবে, আপনি তাই-ই খাবেন, কিন্তু হলে হবে কী, দুদিন যেতে-না-যেতেই গাঁয়ে কথা উঠলো। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, আমি নাকি সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার জন্যেই মুখুজ্জেমশাইকে তোয়াজ করছি। এ রকম ছ্যাঁচড়া জায়গা তো আর পৃথিবীতে নেই ঠাকুরমশাই, তা শেষ পর্যন্ত যা হবার তা হলো, মুখুজ্জেমশাইকে মেরে তবে সবাই ঠাণ্ডা হলো।

লোকটার নাম অশ্বিনী ভট্টাচার্য। পর পর ক'দিন সকালে-বিকেলে আসতে লাগলো। এসেই জিজ্ঞেস করতো—খাওয়া হয়েছে?

ছোটমশাই বলতেন—হ্যাঁ—

—পেট ভরেছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ পেট ভরেছে—

অশ্বিনী ভট্টাচার্য বললে—দেখবেন, এখানে লজ্জা করলে ঠকবেন। এমনি সবাই আপনাকে খাওয়ানোর জন্যে খুব আগ্রহ দেখাবে, বুঝলেন। প্রথম-প্রথম আপনাকে সবাই অমন খোসামোদ করতে চাইবে, কিন্তু আপনি যেন কারো খোসামোদে ভুলবেন না, খোসামোদে ভুললেই একেবারে সব্বোনাশ—

—কেন আমাকে খোসামোদ করবে কেন সবাই?

অশ্বিনী ভট্টাচার্য বললে—খোসামোদ করবে না? কী বলছেন? আমার মতন কী নিঃস্বার্থ মানুষ সবাই? এখানকার সব মানুষ যে আপনার টাকার গন্ধ পেয়েছে। আপনার নিজের টাকা তো আছেই, তার ওপর মুখুজ্জে মশাই-এর টাকা, সবই যে আপনি একলা পেয়েছেন সেটা জানতে তো কারোর বাকি নেই। আমি নিজে ঠাকুরমশাই এই টাকা জিনিসটাকে বড্ড ঘেন্না করি। এই যে আপনার কাছে আমি আসি, কেন এত ঘন ঘন আসি বলুন তো? কেন?

ছোটমশাই বলতে পারলেন না। বললেন—কেন?

—কেন আসি শুনবেন? আসি, কারণ আপনাকে ভালোমানুষ পেয়ে সবাই যাতে ঠকিয়ে নিতে না পারে তাই। সুলতানপুরের লোক তো কেউ ভাল নয় ঠাকুরমশাই। মুখুজ্জেমশাইকেও ঠিক এই রকম ঠকাতো, আমি ছিলুম বলে তাই তিনি বেঁচে গেছেন, নইলে ভাবছেন এ-সব কিছু থাকতো, সব দশভূতে লুঠে-পুটে চেটে খেয়ে নিত—

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি রোজ সকাল বেলা এসেই জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছেন ঠাকুর-মশাই আজ?

সেদিন ছোটমশাই-এর শরীর ভালো ছিল না। বললেন—তেমন ভালো নয়—

অশ্বিনী ভট্টাচার্য চিন্তিত হয়ে উঠলো—কেন? ভালো নয় কেন? খাওয়া-দাওয়া ভালো হচ্ছে না নিশ্চয়ই! এই জোয়ান বয়েসে ভালো করে না খেলে শরীর ভালো থাকবে কেমন করে? দুধ খাচ্ছেন?

ছোটমশাই বললেন—দুধ? দুধ এখানে কে দেবে?

—কেন? দুধ এখেনে কে দেবে মানে? ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা, আপনি গাঁয়ের জমিদারও বটে, আবার জামাইও বটেন, আপনি দুধ খেতে পাবেন না? ক'টা গরু আপনি চান বলুন? আমি গরু যোগাড় করে দেব। গরুর অভাব সুলতানপুরে? টাকা ফেললে এখানে কী না পাওয়া যায়?

ছোটমশাই বললেন—না না, গরু-টরু আমার দরকার নেই, আমি তো আর সুলতান-পুরে থাকতে আসিনি, নবাবগঞ্জেই আমার নিজের কত গরু রয়েছে—

—দাঁড়ান, কাল থেকে আপনার দুধের ব্যবস্থা করছি আমি—

বলেই উঠে চলে গেল। পরদিন সকালেই আবার এসে হাজির। সঙ্গে একটি মেয়ে। মেয়েটির হাতে একটি দুধের গেলাস।

ছোটমশাই চমকে উঠলেন। এ আবার কে?

—পেন্নাম কর, পেন্নাম কর। দুধের গেলাসটা রেখে আগে ঠাকুরমশাইকে পেন্নাম কর।

মোটা আটপৌরে একটা তাঁতের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে দুধের গেলাস নিয়ে মেয়েটা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। গেলাসটা তক্তপোশের ওপর রেখে ছোট মশাইকে গড় হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছোটমশাই দু'হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে গেলেন। বললেন—থাক্ থাক্।

অশ্বিনী ধমকে উঠলো—কেন, থাকবে কেন ঠাকুরমশাই? কর পুঁটি, পেন্নাম কর। পেন্নাম করলে তোর সাত-জন্ম সার্থক হয়ে যাবে, এমন বামুনঠাকুর এ তল্লাটে আর পাবিনে—

বাপের কথায় পুঁটি ছোটমশাই-এর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ছুঁয়ে প্রণাম করলে। ছোটমশাই ভালো করে দেখলেন মেয়েটাকে। বেশ আঁটসাঁট করে খোঁপা বাঁধা। দেহটাও তার খোঁপার

মত বেশ আটসাঁট। গড়ন-পেটনও বেশ। সকাল বেলাই বেশ সেজেছে-গুজেছে। বললেন—এ কে তোমার অশ্বিনী?

—আজ্ঞে এ হলো পুঁটি। আমার মেয়ে। ওর ভালো নাম একটা আছে, সেটা ওর গর্ভধারিণী জানতো। হ্যাঁ রে, তোর ভালো নামটা কী রে?

মেয়েটা জড়োসড়ো হয়ে বললে—নলিনী!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, নলিনী। আমরা পুঁটি বলেই ডাকি। নে, এইবার দুধের গেলাসটা এগিয়ে দে, নিন ঠাকুরমশাই, দুধটা খেয়ে নিন—পুঁটি রোজ ভোরে আপনাকে দুধ দিয়ে যাবে। দুধ না খেলে শরীর টিঁকবে কেন?

ছোটমশাই দুধের গেলাসটা নিয়ে বললেন—আবার দুধ কেন কষ্ট করে আনতে গেলে অশ্বিনী, দুধ খাইয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখে কার কী লাভ বলো দিকিনি? আর কার জন্যেই বা বেঁচে থাকবো? কেন বেঁচে থাকবো বলতে পারো? এত টাকা-কড়ি কাকে দিয়ে যাবো? কে আছে আমার?

অশ্বিনী রেগে গেল। বললে—ও-সব অলক্ষুণে কথা বলবেন না ঠাকুরমশাই, আপনার সম্পত্তি আপনার বংশধররাই ভোগ-দখল করবে—

—আমার বংশধর? আমার বংশধর আবার কোথায়?

অশ্বিনী ভট্টাচার্য বললে—সে কী, বংশধর নেই বলে আপনি শরীরটা ঠিক রাখবেন না? আপনি বলছেন কী? বংশধর না-হয় এখন নেই, কিন্তু বংশধর হতে কতক্ষণ? আবার একটা বিয়ে করে ফেলুন, তখন আবার বংশধর হবে!

এবার আর হাসি চাপতে পারলেন না ছোটমশাই। বললেন—কী যে তুমি বলো অশ্বিনী, তার ঠিক নেই। এই বয়েসে আবার বিয়ে?

—কেন? আপনার আবার বয়েসটা এমন কী শুনি!

ততক্ষণে দুধ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গেলাসটা নিয়ে পুঁটি চলে যাচ্ছিল। অশ্বিনী মেয়ের দিকে চেয়ে বললে—রোজ ভোরে এমনি করে দুধ নিয়ে আসবি, বুঝলি? মনে থাকে যেন। ভুলিসনে—যা—

পুঁটি চলে গেল। কিন্তু অশ্বিনী গেল না। এই এত টাকার সম্পত্তির লোভটা সে মন থেকে দূর করতে পারলে না। সেই দিন থেকেই পুঁটি রোজ ভোরবেলা এসে দুধ দিয়ে যেতে লাগলো। একেবারে টাটকা গরুর দুধ। সেই গরম দুধ খেয়েই ছোটমশাই-এর শরীরটা বেশ ক'দিনের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলো আবার। বেশ কাজ করতে ইচ্ছে হলো। মনেও বল পেলেন। এত শোক-দুঃখ সব ভুলে যেতে লাগলেন। গরম দুধ খাইয়ে পুঁটি চলে যেতেই অশ্বিনী এসে হাজির হতো। অশ্বিনী ভট্টাচার্য আসার পর থেকে বাজে লোকদের আনাগোনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বাজে লোকরা বাজে কথা বলে আর ছোটমশাই এর কাজ থেকে কিছু খসাতে পারতো না। অশ্বিনী ভট্টাচার্য একাই তখন মালিক, একাই তখন মালিকের রক্ষাকর্তা।

কিন্তু সব পণ্ড করে দিলে প্রকাশ। অশ্বিনী ভট্টাচার্য তখন কিছুই জানে না। বড় আনন্দে তখন দিন কাটছে তার। একবার যদি কোনও রকমে মেয়েটাকে ছোটমশাই-এর গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারে তো বাস্। তখন আর কে তাকে পায়। তখন এই সুলতান-পুরের আর নবাবগঞ্জের বুকের ওপর বসে সকলের দাড়ি ওপড়াবে সে, এইটেই তার জীবনের বড় জয়।

সেদিনও ভাগলপুরে সকাল হয়েছে, অন্য দিনকার মত সেদিনও অশ্বিনী ভট্টাচার্য পুঁটিকে সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠিয়ে দুধ আনতে পাঠিয়েছে। তারপর সেই দুধ উনুনে জ্বাল

দেওয়া হয়েছে। তারপর সেজে-গুজে ছোটমশাইকে সেই দুধ আবার খাওয়াতে গেছে।

প্রকাশ রায় তখন ট্রেন থেকে নামলো। নেমে আর বেশি দেরি করেনি। সেখান থেকে সোজা একেবারে সুলতানপুর। তাড়াতাড়ি রিক্শা থেকে নেমেই বাড়িটাতে ঢুকে পড়েছে। কতদিন সুলতানপুরে আসেনি সে। আগে বউ-ছেলে-মেয়ের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা তো রইলই। সে তো আর ফস্‌কে যাচ্ছে না। আগে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিদি নেই যে শুধু দিদিকে খাতির করলেই চলবে। এখন প্রকাশ রায়ের ভগবান বলো, আল্লা বলো, সব কিছুই ওই জামাইবাবু! জামাইবাবু রাখলে রাখবে মারলে মারবে।

কিন্তু জামাইবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে দেখে অবাক কাণ্ড! এমন কাণ্ড যে দেখতে হবে তা প্রকাশ আশা করেনি। দেখে, জামাইবাবু একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে দুধ খাচ্ছে, আর একটা মেয়ে পায়ের কাছে বসে জামাইবাবুর পা টিপে দিচ্ছে!

ওই অবস্থায় জামাইবাবুকে দেখে, প্রকাশ যেন এক মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। জামাইবাবুও তেমনি, আর পুঁটির তো কথাই নেই। ছোটমশাই সোজা হয়ে বসে পুঁটিকে বললেন—থাক, থাক, আর পা টিপতে হবে না—

পুঁটি পা ছেড়ে দিয়ে গেলাসটা নিয়ে চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু প্রকাশ তখন পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘরের বাইরে যাবার রাস্তা নেই।

জিজ্ঞেস করলে—এ কে জামাইবাবু?

ছোটমশাই বললেন—এ হলো অশ্বিনী ভট্টাচার্যির মেয়ে—তা তুমি কখন এলে?

—অশ্বিনী ভট্টাচার্যির মেয়ে? তা এখানে কেন?

—ও দুধ দিতে এসেছে, পা'টা কামড়াচ্ছিল কিনা তাই....

প্রকাশ বললে—তা পায়ের আর দোষ কি? পা তো কামড়াবেই, কিন্তু তা বলে অশ্বিনী ভট্টাচার্যের মেয়ে এসে আপনার পা টিপে দেবে? পা টেপবার আর কোনও লোক পেলেন না আপনি?

—এই সুলতানপুরে আমার কে আর আছে বলো! আর তো কেউ নেই—

—আর কেউ না থাকে, আমি তো আছি।

বলে পুঁটিকে তাড়া করলে। বললে—যা, তুই বাড়ি যা—

পুঁটি তখন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু প্রকাশ আর দেরি করলে না। জামাই বাবুর পায়ের কাছে বসে দু'হাতে তাঁর পা দুটো কোলে তুলে নিয়ে টিপতে লাগলো।

ছোটমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন—তুমি আবার কেন পা টিপতে বসলে?

—তা আপনার পা কামড়াচ্ছে,আমি টিপবো না? কোথাকার কোন্ অশ্বিনী ভট্টাচার্যির মেয়েকে দিয়ে কী বলে আপনি পা টেপাতে গেলেন? ওর গায়ে কি জোর আছে আমার মত?

ছোটমশাই বললেন—না না, থাক্ থাক্, আর টিপতে হবে না, আমার পা আর কামড়াচ্ছে না তুমি পা ছাড়ো—

বলে ছোটমশাই নিজের পা দুটো প্রকাশের কোল থেকে টেনে নিলেন। তারপরে বললেন—তুমি তো ট্রেন থেকে নেমে সোজা এসেছ, এখন যাও, বউমার সঙ্গে দেখা করে এস, আমি এখানেই আছি—

প্রকাশ উঠলো। বললে—ঠিক আছে, আপনি যেন কোথাও বেরোবেন না, আমি এখ্খুনি আসছি—

বলে বেরোল। কিন্তু বাড়ির দিকে নয় একেবারে সোজা চলে গেল অশ্বিনী ভট্টাচার্যির

বাড়ি। আগে জিনিসটার ফয়শালা হয়ে যাক, তারপর নিজের বাড়িতে যাবে সে।

অশ্বিনী ভট্টাচার্যির বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—অশ্বিনী—অশ্বিনী—

অশ্বিনী বেরিয়ে আসতেই প্রকাশ বলে উঠলো—বলি ভেবেছিস কী তুই? নিজের আইবুড়ো মেয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ভেবেছিস আমার ভগ্নিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিবি? আমি তোর মতলব বুঝি না ভেবেছিস? খবরদার বলছি তোর মেয়ে যদি ও-মুখো হয় তো ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, এই তোকে বলে রাখছি—

অশ্বিনীও কম যায় না। বললে—কী, এত বড় আস্পর্ধা তোর, আমার বাড়ি বয়ে তুই গালাগালি দিতে আসিস—

ততক্ষণে আশেপাশে লোকজন জমে গিয়েছিল। একজন তেড়ে যায় তো ও-দিক থেকে আর একজন তেড়ে আসে।

সব লোক তখন প্রকাশ রায়ের দলে ভিড়ে গেছে। প্রকাশ চেঁচিয়ে উঠলো—আয় দেখি তোর কত তেজ, আমার ভগ্নিপতিকে তোর জামাই করা বার করছি। ভেবেছিস আমি মরে গেছি?

নিরাপদ চক্রবর্তী বললে—দেখ না বাবা, অশ্বিনী তোমার ভগ্নিপতির কাছে আমাদের কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। ভেবেছে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সব সম্পত্তি নিয়ে গ্রাস করবে!

প্রকাশ বললে—গ্রাস করা দেখাচ্ছি, আমি ছিলুম না বলে তলে তলে এত মতলব। আমি এসে দেখি ওর মেয়েটা আমার ভগ্নিপতির পা দুটো কোলে নিয়ে টিপে দিচ্ছে! তার চেয়ে তোর মেয়েকে বাজারের বস্তিতে ভাড়া খাটাতে পাঠালি না কেন? তাতে মেয়ের রোজগারে আরো বেশি করে পেট ভরতো—

এতক্ষণে অশ্বিনী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। প্রকাশের দিকে ছুটে আসতে আসতে বললে—তবে রে শালা, আমার মেয়ের নামে বদনাম দেওয়া, তোকে আজ মেরেই ফেলবো—

শেষ পর্যন্ত হয়তো সেইখানেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেত কিন্তু তার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে পুঁটি এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে—বাবা, তুমি ওদের কাছে যেও না, ওরা তোমাকে একলা পেয়ে মেরে ফেলবে—

জিনিসটা এর পরে আর আর বেশি দূর গড়ালো না। অশ্বিনী ভট্টাচার্যিও রাগে গজ-গজ করতে লাগলো, প্রকাশও তাই। মাঝখানে নিরাপদ চক্রবর্তীরা শুধু একটু হতাশ হলো। একটা গুরুতর কিছু ঘটলে যেন তাদের ভালো লাগতো।

প্রকাশ চলে আসার সময় শুধু বলে এলো—ঠিক আছে, আজ কিছু বললুম না, কিন্তু সাবধান, আর কখনও এ-মুখো হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—হ্যাঁ—

যে-জীবনকে কেন্দ্র করে এতগুলো চরিত্র একদিন আবর্তিত হতে শুরু করেছিল, তারা যে কে কোথায় জড়িয়ে পড়লো, নিয়তির অন্ধ আঘাতে কে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেল তা নিয়ে যেন সদানন্দর ভাবনার কোনও দায় নেই। সে যেন পৃথিবীতে শুধু নির্বিকার নির্বিকল্প নিরঙ্কুশ আর নিঃসঙ্গ হয়ে বাঁচবার জন্যেই জন্মেছে। অথচ তাকে জড়িয়েই লোকের যত স্বপ্ন যত সাধ, যত সাধনা। সে নবাবগঞ্জ ছেড়ে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাই সব কিছু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। কালীগঞ্জের বউ-এর অপঘাতে মৃত আত্মা যেন তার সঙ্গে

জড়িত সবগুলো মানুষকে পেছন থেকে তাড়া করে চলছিল তখনও।

বউবাজারের একতলার ঘরখানার বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে সদানন্দ সেই কথাই ভাবছিল। রাত তখন কত কে জানে। হয়ত শেষ রাতই হবে। কিংবা হয়ত মাঝরাত। জামার পকেটে তখনো সেই চিঠিখানা রয়েছে। সেখানা বার করে আবার সে পড়তে লাগলো। নিজে কাউকে সুখ দিতে পারেনি সে। সুখ দিতে হয়ত চেষ্টা করেও সুখ দিতে পারেনি। হয়ত চেষ্টা করে কোনও মানুষকে সুখ দেওয়া যায়ও না। কিন্তু দুঃখ দেওয়া তো সহজ। দুঃখ যে-কোনও মানুষ যে-কোনও মানুষকে দিতে পারে। তার জন্যে কষ্ট করার দরকার হয় না। আমাকে দুঃখ দিয়েছে আমার পূর্ব-পুরুষ, আমি তার দায়ভাগ নিয়ে দুঃখ দিয়েছি নয়নতারাকে। এমনি করে মানুষে মানুষে বংশ-পরম্পরায় সুখ-দুঃখের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছি। এই-ই আমার দুঃখ। এর থেকে আমি মুক্তি চাই। আমি সমস্ত শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি চাই। আমি নিজের মুক্তি চাই, সব মানুষকেও সুখ-দুঃখের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে চাই। তা হলে কেন আমি আবার এখানে এই সমরজিৎবাবুর পরিবারের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হতে রাজি হলুম। কেন দাসখতে সই দিতে গেলুম।

সদানন্দ এবার স্থির সিদ্ধান্ত করে নিলে। সে বিছানা ছেড়ে উঠলো। আলনা থেকে নিজের জামাটা গায়ে গলিয়ে নিলে। তারপর আস্তে আস্তে দরজার খিলটা খুললে। না, আমি এখানে থাকবো না। তুমি সম্মতি দিলেও থাকবো না, অসম্মতি দিলেও থাকবো না। আমি কোথাও থাকবার জন্যে জন্মাইনি। চলাই আমার নিয়তি। সুতরাং তুমি ভয় পেও না। কারো ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কাজ আমার নয়। নয়নতারার ভবিষ্যৎ হয়ত আমি নষ্ট করেছি, কিন্তু তার দায়িত্ব তো আমার নয়। সে দায় আমার পূর্বপুরুষের। কিন্তু তুমি আমার কে? কেউই নও। তোমাকে আমি চাক্ষুষ কখনও দেখিইনি। আমাকে এ চিঠি না লিখলেও আমি এখানে থাকতুম না। একজনের ভবিষ্যৎও নষ্ট করেছি বলে তোমার ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করবো এমন পাষণ্ড আমি নই।

—কে? দাদাবাবু? কোথায় যাচ্ছেন?

অত রাত্রেও মহেশ ঠিক টের পেয়েছে।

সদানন্দ থমকে দাঁড়ালো! মহেশ কাছে এসে আলোটা জ্বালিয়ে দিলে।

—কোথায় যাচ্ছেন এত রাত্তিরে?

—আমি চলে যাচ্ছি মহেশ—

—চলে যাচ্ছেন? কেন? কোথায়?

—তা জানি না। তুমি কাউকে বোল না। আর বলে দিলেও আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

বলে সদানন্দ সদর-দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো। অন্য দিন এই সময়েই সমরজিৎবাবু গঙ্গাস্নান করতে বেরোন। রাস্তার আলোগুলো বেশ ফিকে হয়ে এসেছে।

মহেশ পেছন থেকে বললে—আপনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন কিন্তু সেখানে তো কেউ নেই আপনাদের। আমি তো গিয়ে দেখে এসেছি। আপনাদের বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে।

—কেন? তারা সব কোথায় গেল?

—আপনার মা মাস কয়েক আগে মারা গেছে—

—তাই নাকি? তা হবে!

—আপনাকে বলিনি, বাবু বলতে মানা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন মায়ের মারা যাবার খবর শুনে আপনি কষ্ট পাবেন।

সদানন্দ কিছু বললে না। শুধু হাসলো একটু। মহেশ চেনে না সদানন্দকে, তাই ও

কথা বললে। সমরজিৎবাবুই কি তাকে চিনতে পেরেছেন। নইলে তিনিই বা ও কথা বললেন কেন?

বললে—তুমি কাকাবাবুকে কিছু বোল না।

—তা না-হয় বলবো না, কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেনই বা কেন?

সদানন্দ এর উত্তর কি দেবে। আর দিলেই কি মহেশ বুঝতে পারবে? শুধু বললে—যাচ্ছি আমার আর থাকতে ভালো লাগছে না এখানে তাই। যাই—

মহেশ আরো একটু এগিয়ে এল। বললে—বাবু যদি আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন তো কী বলবো?

সদানন্দ বললে—কেন, আমি যে-কথাগুলো বলছি এই কথাগুলোই বোল। তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে না—

—তা আবার আসবেন তো?

সদানন্দ বললে—না মহেশ, আমাকে আর আসতে বোল না, এখানে যেন আর আমাকে আসতে না হয়।

—আপনি এ-বাড়িতে যতদিন ছিলেন বাবুর মনে তবু একটু সুখ ছিল। বাবুর মুখে হাসি বেরিয়েছিল—

সদানন্দ বললে—বাবুর মনে হয়ত সুখ ছিল, কিন্তু তোমার বড়দাদাবাবুর মনে হয়ত কষ্ট হচ্ছিল।

এ কথার উত্তর মহেশ আর কিছু বলতে পারলে না। সদানন্দ আর না দাঁড়িয়ে সোজা হন হন করে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু কোথায় যাবে সে? কোন দিকে?

রাস্তায় তখন অল্প লোক চলাচল শুরু হয়েছে। কেউ যাচ্ছে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে। কেউ বা গঙ্গাস্নান করতে। হ্যারিসন রোড ধরে সোজা চলতে চলতে একেবারে বড়বাজারের ধার পর্যন্ত একটানা চলে এল। বেশ সোজা মসৃণ রাস্তা। সদানন্দর জীবনের মত সর্পিল নয়, জটিলও নয়। কতদিন সমরজিৎবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ সব রাস্তায় বেড়িয়েছে সে। কতদিন হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছে, আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এসেছে। কতদিন রাস্তার ধারে ফেরিওয়ালার বেচা-কেনা দেখেছে, ফেরিওয়ালার হারমোনিয়াম বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর পরে নেচে নেচে টোট্‌কা ওষুধ দাঁতের মাজন বিক্রি করার কৌশল লক্ষ্য করেছে। এবার শুধু যাওয়ারই পালা, ফেরবার পালা নয়। আজও সে প্লাটফরমের বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে পারে, কিন্তু যে-বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে এসেছে, সে-বাড়িতে আর সে ফিরতে পারে না।

—বাবুজী!

হঠাৎ ডাক শুনে সদানন্দ পেছনে ফিরে তাকালো। আরে, এ যে সেই পাঁড়ে। পাঁড়েজী।

পাঁড়েজীর সঙ্গে অনেকদিন আগে ঘটনাচক্রে আলাপ হয়ে গিয়েছিল একদিন। এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একদিন একটা ধর্মশালার সামনে পাঁড়েজী তাকে ধরেছিল। ভদ্রলোকের মত চেহারা দেখে বলেছিল—বাবুজী একটা আংরেজী চিঠি পড়ে দেবেন হুজুর?

সদানন্দ বলেছিল—দাও—

বিরাট পাথরের তৈরি ধর্মশালা। পাঁড়েজী সেইখানকার খাস দারোয়ান। ভেতরে পাথর-বাঁধানো উঠোন। সামনে বিরাট গেট। সেইখানে একটা কোণের দিকে পাঁড়েজীর থাকবার ঘর। চিঠিখানা তার মালিককে দেখাতে চায়নি। সেটা এসেছিল তার দেশের কাছারি থেকে। কে একজন আত্মীয় মারা গেছে। তার সম্পত্তির ভাগীদার ছিল পাঁড়েজী। চিঠিটা সেই সংক্রান্ত। চিঠিটা পড়ে দিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সদানন্দ। থাকবার বেশ ভালো

বন্দোবস্ত। তারপর আরো কয়েক দিন দেখা হয়ে গিয়েছিল পাঁড়েজীর সঙ্গে। সে-সব পুরোনো কাহিনী। আজ এতদিন পরে হঠাৎ আবার তার সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছো পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী বললে—গঙ্গায় গিয়েছিলুম নাইতে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

হঠাৎ সদানন্দ বললে—তোমার ধর্মশালায় থাকা যায় পাঁড়েজী? ঘর খালি আছে নাকি?

পাঁড়েজী বললে—আপনি থাকবেন? না আউর কোই থাকবে?

সদানন্দ বললে—আমিই থাকবো, আবার কে থাকবে?

—তা হলে আসুন আমার সঙ্গে—আমি তো এখন ধর্মশালায় যাচ্ছি।

সদানন্দ বললে—তোমার ঘর আছে, জানা রইল, যদি আসি তো আসবো। আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি পাঁড়েজী—

পাঁড়েজী বললে—বাড়িওয়ালা তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? তা থাকুন না। আমার সঙ্গেই থাকবেন, যে-কদিন থাকতে চান থাকবেন—

বলে পাঁড়েজী চলে গেল। সদানন্দ আরো জোরে চলতে লাগলো। আরো আরো জোরে। আশ্চর্য, কলকাতার রাস্তার মত এত লম্বা রাস্তা বোধ হয় পৃথিবীর কোনও দেশে নেই। নবাবগঞ্জের রাস্তা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেত। এখানে কিন্তু তা আর শেষ হয় না, ফুরোয় না, চলে চলে যেন আর তা অতিক্রম করতে পারা যায় না। এদিকে তখন লোকের চলাচল আরো বেড়েছে। ট্রামে বাসে লোকের ভিড় বাড়ছে। ফুটপাথেও ভিড় বাড়লো বেশ। সদানন্দ বড় রাস্তা ছেড়ে এবার পাশের একটা গলিতে ঢুকলো। এতক্ষণ সদানন্দর সেই বাড়িতেই কথা মনে পড়লো। এতক্ষণে তার চলে আসার খবরটা বোধ হয় কাকাবাবুর কানে গেছে। কাকীমা হয়ত খবরটা পেয়ে কাকাবাবুর কাছে এসেছে। দুজনে মিলে মহেশকে জিজ্ঞেস করছেন—দাদাবাবু কেন গেছে। যাবার সময় কী বলে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে। দুজনের প্রশ্নের হয়ত আর শেষ নেই তাঁদের। এমন করে এত যত্ন কেউ যে পায়ে ঠেলতে পারে এ কথাটা তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না। কিন্তু আর একটা ঘরে? আর একটা মানুষের অন্তরের অন্তঃপুরে?

হঠাৎ একটা আচমকা আনন্দ যেন সদানন্দকে একেবারে বিভ্রান্ত করে দিলে।

হাঁটতে শুরু করে কোথা দিয়ে তখন কোথায় চলে এসেছিল সদানন্দ সেদিকে খেয়াল ছিল না তার। চারদিকে চেয়ে যেন তার চমক ভাঙলো। বড়বাজার থেকে একেবারে শেয়ালদস্টেশনের প্লাটফরম। সমস্ত লোকজন একটা নির্দিষ্ট দিকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। পাশেই দাঁড়ানো একটা ট্রেন। ট্রেনটা বুঝি তখনই ছেড়ে দেবে, ইঞ্জিনটা দূরে ফোঁস ফোঁস করে তাই সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে, তাই সকলের এত ব্যস্ততা! সবাই ছুটছে।

কিন্তু ও কে? নয়নতারা না! সদানন্দ আরো জোরে পা দুটোকে চালিয়ে দিলে। পাশে ও কে? কার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠতে যাচ্ছে! না কি ভুল দেখছে সদানন্দ। চোখ দুটো দুই হাত দিয়ে ভাল করে মুছে নিলে সে। নয়নতারাই তো। অন্তত পেছন থেকে ঠিক সেই রকম। পাশ থেকে আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা নেই। পাশে পাশে যে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে খুব কথা বলছে। এখানে নয়নতারা কোত্থেকে এল! এই কলকাতায়!

আশেপাশে সামনে অনেক লোকের আড়াল পড়ছে বার বার। ওগো তোমরা সরে যাও, দেখি আমাকে ভাল করে দেখতে দাও, তোমরা আড়াল কোর না। সদানন্দ আরো জোরে পা চালাতে লাগলো। কিন্তু ওরা তখনও অনেক দূরে। এদিকে ট্রেনের গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দিলে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। ইঞ্জিন থেকেও হুইসল বাজলো।

নয়নতারা পেছনে আর সঙ্গের ছেলেটা তখন আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। ট্রেনটা

চলতে আরম্ভ করতেই ছেলেটা আগে উঠে পড়েছে। উঠেই নয়নতারার একটা হাত ধরে তাকে কামরার ভেতর তুলে নিলে।

এবার পাশ থেকে সদানন্দ নয়নতারার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলে। একেবারে স্পষ্ট। হ্যাঁ আর কোনও সন্দেহ নেই, একেবারে নয়নতারাই ঠিক।

সদানন্দর কী মতিভ্রম হলো। সে চিৎকার করে ডাকলো—নয়নতারা—নয়নতারা—

সদানন্দর গলার আওয়াজটা প্রথমে নিখেলেশের কানে গেল। বললে—তোমার নাম ধরে কে যেন ডাকলো মনে হচ্ছে?

নয়নতারা বললে—কী যে তুমি বলো? আমার নাম ধরে এখানে আবার কে ডাকবে? এখানে আবার আমাকে কে চেনে?

বলে জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে।

সদানন্দকে নয়নতারা দেখতে পেলে না, কিন্তু সদানন্দ দেখতে পেলে—সেই নয়নতারা। কোনও ভুল নেই আর। একেবারে অবিকল নয়নতারা। কিন্তু সঙ্গে কে? নয়নতারা কলকাতায় এসেছে কেন?

ট্রেনটি তখন হু-হু শব্দে প্লাটফরম পেরিয়ে দূরের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

ট্রেনটা মিলিয়ে গেল বটে কিন্তু সদানন্দ অনেকক্ষণ সেই প্লাটফরমের ওপরেই হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যেন এতদিন ধরে যে বইটা সে পড়ে আসছিল সেই বইটার পাতাগুলো হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া লেগে সব ওলট-পালোট হয়ে গেছে আর তারপর সেই ঝড় একেবারে বইটার প্রথম পৃষ্ঠাটাতেই এসে ঠেকেছে। বইটা যে কতদূর সে পড়েছিল তাও আর তখন তার মনে নেই, শুধু প্রথম শব্দটাই তখন তার চোখের ওপর জ্বল-জ্বল করে ভেসে উঠতে লাগলো—নয়নতারা, নয়নতারা—নয়নতারা—

ওই একটা শব্দ! ওই নয়নতারা' শব্দটা দিয়েই যেন তার জীবনের গ্রন্থ শুরু হয়েছিল। এতদিন পরে যখন শেষের দিকেই তার এগিয়ে যাবার কথা, তখন এ কোন্ ঝড়ের দাপটে আবার সে প্রথম পৃষ্ঠায় শব্দটায় এসে পৌঁছুল!

সত্যিই তো! নয়নতারাই তো! নয়নতারা ছাড়া আর কেউই তো নয় ও। ও যদি নয়নতারাই হয় তো সঙ্গে ও কে?

মহেশের কথাগুলো মনে পড়লো। মহেশ আজ ভোরবেলা তাকে বলেছিল—নবাবগঞ্জের বাড়িতে সে গিয়েছিল, সে দেখে এসেছে সেখানে তারা কেউ নেই। কেউ নেই তো গেল কোথায় তারা! তবে কি নবাবগঞ্জের সেই বাড়ি, সেই বাগান, সেই ক্ষেত-খামার, সব হাত-বদল হয়ে গেছে? মা মারা যাবার পর কি তবে তাদের সংসার এমন করে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল যে কারোর পক্ষেই আর সেখানে থাকা সম্ভব হলো না?

মহেশ যখন তাদের নবাবগঞ্জের বাড়ির কথা বলেছিল তখন সে সম্বন্ধে তার জানবার কোনও আগ্রহ ছিল না। যে-জীবন সে সেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছে সেখানে ফিরে যাবার যখন কোনও প্রশ্ন আর নেই তখন কেনই বা তার আগ্রহ থাকবে! কিন্তু আজ মনে হলো মহেশের সঙ্গে আর একবার দেখা হলে ভাল হয়। আর একবার দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করবে কার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কে কী বললে! নয়নতারা সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেছে কিনা, সে কোথায় গেছে তাও কেউ জানে কি না! ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা তার হঠাৎ জানতে ইচ্ছে করতে লাগল।

ট্রেন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্লাটফরমের ভিড় তখন পাতলা হয়ে গেছে।

সদানন্দ আবার ফেরবার জন্যে উল্টোদিকে চলতে লাগলো। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে সে! যে-মানুষ নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, পৃথিবীর আদর-যত্নে যার কোন স্পৃহা নেই, সারা পৃথিবীটাই তো তার ঘর হওয়া উচিত। এখানে এই ফাঁকা প্লাটফরমের ওপরেই সে বসে পড়তে পারে, এটাকেই তার বাড়ি মনে করতে পারে সে। মাথার ওপরের আকাশটাই তার বাড়ির ছাদ, আর এই চারদিকের লোকজন-চিৎকার-রোদ-আলো-অন্ধকার, স্নেহ-ভালবাসা, ঘৃণা—এই-গুলোই তার ঘরের চারটে দেয়াল। এক-কথায় এই পৃথিবীটাই তার সংসার।

কিন্তু না, সংসারী লোকের পক্ষে এ রকম সংসার তো হতে পারে না। সংসারী লোকের জন্যে চাই খানিকটা আড়াল, চাই একটুখানি আব্রু। সদানন্দ নিজের মনেই বিচার করতে লাগলো। সে সংসারী লোক, না সংসার ছাড়া? সংসার-ছাড়া লোককেই তো লোকে লক্ষ্মীছাড়া বলে। লক্ষ্মীকে তো পায়ে ঠেলেছে সে। যে-লক্ষ্মী নিজে তার কাছে এসেছিল সে লক্ষ্মীকেই সে ইচ্ছে করে বিদায় দিয়েছে। লক্ষ্মীকে সে চায়নি। তার মনে হয়েছে যারা লক্ষ্মীকে ঘরে বন্দী করেছে তারা লক্ষ্মীর আশীর্বাদই পায়নি। লক্ষ্মীকে সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। এমন করে বিতরণ করতে হবে যাতে সবাই লক্ষ্মীর ভাগ পায়। কিন্তু কোথায় তা ঘটছে? কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীও তা করেননি, নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীও তা করেননি। এমন কি বউবাজরের সমরজিৎবাবুও লক্ষ্মীর প্রসাদ পাননি। সবাই শুধু লক্ষ্মীর অপমানই করেছে। কিন্তু এই সকলের সঙ্গে অসহযোগিতা করেই কি সে লক্ষ্মীর অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়?

হঠাৎ তার খেয়াল হলো যে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন সে আবার বউবাজারের সেই গলিটার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে। ভোররাত্রে যে-বউবাজারের বাড়িটা থেকে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল আবার কেন সে সেখানেই এসে দাঁড়ালো? কার আশায়? তবে কি সে সত্যি-সত্যিই নয়নতারার খবর নেবার জন্যে এত অগ্রহী!

কিন্তু যে-বাড়ি থেকে সে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, সে বাড়িতে সে আবার কেমন করে ঢুকবে? কেমন করে সেখানে গিয়ে বলবে যে সে এসেছে!

সমরজিৎবাবুর কাছে তার আসার খবরটা পৌঁছলেই তিনি হয়ত তাকে ডেকে পাঠাবেন। জিজ্ঞেস করবেন—কী হলো, শুনলুম তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলে?

সদানন্দ বলবে—হ্যাঁ, চলে গিয়েছিলুম—

—কিন্তু কেন? কেন তুমি চলে গিয়েছিলে?

সদানন্দ বলবে—চলে গিয়েছিলুম, কারণ এখানে আপনার বাড়ির লক্ষ্মীর অপমান হয়েছে—

—লক্ষ্মীর অপমান? সে আবার কী? আমি তো তোমার কথার মানে বুঝতে পারছি না!

সদানন্দ তখন নিজের কথাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবে—একদিন আমি যে-কারণে বাড়ি থেকে চলে এসেছিলুম, সেই দুর্যোগ আপনার এ-বাড়িতেও ঘটেছে কাকাবাবু। আপনার অনেক অর্থ আছে, সেই অর্থ আপনার পূর্বপুরুষ কী করে উপার্জন করেছেন তা আমি জানি না, যদি সৎ পথে সে অর্থ না এসে থাকে তো আমি সে অর্থ নিজের ব্যবহারের জন্যে নিতে পারি না—

সমরজিৎবাবু হয়ত সদানন্দর কথা শুনে অবাক হয়ে যাবেন। বলবেন—তুমি কি পাগল হয়ে গেছ সদানন্দ? এসব কথা তো পাগলে বলে! তোমার মত কথা বললে কি সংসার চলতো?

সদানন্দ বলবে—আপনার ছেলে মাতাল, আপনার ছেলে চরিত্রহীন, এটা দেখে যেমন আপনার খারাপ লাগছে তেমনি আপনার পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধেও তো তাই ভাবা উচিত। তাঁরা মাতাল ছিলেন কিনা, তাঁরা চরিত্রহীন ছিলেন কিনা তা নিয়ে কি আপনি কখনও ভেবেছেন? তাঁরা তেমনি প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছেন কিনা তারও কি বিচার করেছেন? তাঁরাও তেমনি খারাপ ছিলেন কিনা তাও তো ভাবতে হবে। তাঁদের কোনও পাপ থাকলে আপনাকে তো তার প্রায়চিত্ত করতে হবে!

সমরজিৎবাবু সদানন্দের এই যুক্তি শুনে হয়ত আবাকই হয়ে যাবেন।

সদানন্দ আবার বলবে—আমি জানি কাকাবাবু, আপনি আমাকে পাগল বলবেন, আপনি আমার কথা শুনে হাসবেন। শুধু আপনি কেন পৃথিবীর সব লোকই আমার কথা শুনে বলবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু লোকের কথা শুনে আমি চলবো, না লোকে আমার কথা শুনে চলবে? কোনটা ভাল আপনিই বলুন?

কিন্তু কথাবার্তাগুলো সবই আনুমানিক। এ-সব কথাবার্তা হয়ত হবেও না। হয়ত তাঁর কাছে তার আসার খববটাও পৌঁছবে না। শুধু মহেশকে ডেকে সদানন্দ তার প্রশ্নগুলো করেই আবার চলে আসবে।

—আচ্ছা মহেশ, তুমি তো নবাবগঞ্জে গিয়েছিলে, তা সেখানে কী কী দেখে শুনে এলে?

মহেশ বলবে—আমি তো বলেছি আপনাকে সেখানে আপনাদের বাড়ির কেউই নেই। আপনার ঠাকুর্দাদা মারা গেছেন, আপনার মা মারা গেছেন। আপনার বাবা.......

—আমি তাদের কথা বলছি না, নয়নতারা কোথায় আছে কিছু শুনেছ?

—নয়নতারা? নয়নতারা কে?

সদানন্দ বলবে—আমার স্ত্রী—

মহেশ হয়ত কিছু একটা উত্তর দিত, কিন্তু তার আগেই সদানন্দ একেবারে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছে। যে-বাড়িটা থেকে ঘণ্টা-কয়েক আগে সে চলে এসেছিল সেই বাড়িটার সামনেই তখন বেশ চড়া রোদ উঠেছে। আর তার সামনে অনেক লোকও জড়ো হয়েছে। অত লোক কেন ওখানে? কিসের ভিড় ওদের ওখানে? ওরা কী করছে?

দূরে রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সদানন্দ দেখতে লাগলো। আস্তে আস্তে যেন লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো সেই বাড়িটার সামনে।

সদানন্দ সেখান থেকে চলে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখলে সমরজিৎবাবুর ছেলে একটা জীপ্ গাড়ি করে এসে দাঁড়ালো। সেই বড়বাবু। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক তার দিকে এগিয়ে এল। সকলের মুখই যেন গম্ভীর-গম্ভীর। যেন কী একটা আকস্মিক বিপদপাতে সকলেই হতচকিত। তবে কি জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে, সমরজিৎবাবু তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কোন এক সদানন্দ চৌধুরীকে উইল করে দিয়ে দিয়েছে? তাতেই কি এত ভয়? তাতেই কি এত উত্তেজনা?

কিন্তু মহেশকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মহেশকে দেখতে পাওয়া গেলে তা জিজ্ঞেস করা যেত। বাড়ির মধ্যে মহেশই একমাত্র লোক যাকে জিজ্ঞেস করলে সমস্ত খবর সঠিক ভাবে পাওয়া যেত।

একজন বাইরের লোক সদানন্দের সামনে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—

এখানে কী হয়েছে মশাই?

সদানন্দ বললে—আমি কিছু জানি না—

লোকটা কৌতূহলী প্রকৃতির। সে রাস্তার ভেতরের দিকে আরো এগিয়ে গেল। রাস্তায় চলতে চলতে ভিড় দেখে যারা অনাবশ্যক কৌতূহলী হয়ে ওঠে, লোকটা সেই জাতের।

চড়া রোদ মাথার ওপর তখন আরো চড়া হয়ে উঠলো। কিন্তু তবু যেন কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। একবার মনে হলো সে-ও কাউকে জিজ্ঞেস করে—ওখানে কী হচ্ছে? কিন্তু যেন কেমন সঙ্কোচ হতে লাগলো। কাকে সে জিজ্ঞেস করবে? কেউ যদি তাকে চিনে ফেলে! এতকাল ধরে এই-বাড়িতে সে কাটিয়েছে, এতকাল ধরে এ-পাড়াতে সে বাস করে এসেছে, অনেকেই তার মুখ চেনে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—আপনি এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

হঠাৎ একটা চেনা-মুখ ভিড়ের মধ্যে ঢুকলো। সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটা চেনা মুখ। সেই মানদা মাসি! আর তার পেছন-পেছন বাতাসী।

ওরা এসেছে কেন? ওরা কী করতে এসেছে?

হঠাৎ সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন অসাড় হয়ে এল তার। আগের দিনই যাঁর সঙ্গে এত কথা বলেছে, তাড়াতাড়ি তাঁর এই পরিণতি সে কল্পনা করতে পারেনি। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও তাঁর উদ্বেগ ছিল কেমন করে তাঁর পূর্বপুরুষের সমস্ত স্মৃতির পুঁজি সদানন্দ চৌধুরীর ওপর গচ্ছিত রেখে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নেবেন। সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়েছে। কিন্তু যাবার আগে তিনি জেনে যেতে পারেননি তাঁর সমস্ত ইচ্ছে বানচাল করে দিয়ে আর একজন অজ্ঞাতে তাঁকে প্রতারিত করেছে! জানতে পারেননি সদানন্দ চৌধুরী তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক কপর্দকও স্পর্শ করেনি। না জেনেছেন ভালোই হয়েছে, জানতে পারলে তাঁর মৃত্যুও হয়তো শান্তির মৃত্যু হতো না।

হয়ত এই-ই হয়। সংসারে এই জিনিস ঘটে বলেই সংসারকে মানুষ মায়া বলে। সেই জন্যেই হয়ত মানুষ মায়ার বন্ধন কেটে জীবদ্দশাতেই বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে মুক্তির সন্ধান খোঁজে।

সামনে দিয়ে সমরজিৎবাবুর মরদেহটা শ্মশানের দিকে চলতে লাগলো।

সদানন্দ সমজিৎবাবুর সেই মরদেহের সামনে মাথা নিচু করে দুই হাত জুড়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো। মনে মনে সেই অদৃশ্য আত্মাকে উদ্দেশ্য করে জানাতে লাগলো—আমি আপনাকে প্রণাম করি, আপনার অনন্ত বেদনা আর অফুরন্ত মমতাকে আমি প্রণাম করি। আপনার দেওয়া সম্পত্তি গ্রহণ না করে আমি যে আপনার অজ্ঞাতসারে চলে যাচ্ছি এর জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে আমি সম্মান করি বলেই অপরকে বঞ্চিত করার কলুষ থেকে আমি নিজেকে মুক্ত রাখলাম। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

মরদেহটা ধীর গতিতে দূরে চলে গেল। মহেশের সঙ্গেও আর দেখা করা হলো না। অথচ মহেশের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সে এখানে এসেছিল। আর এখানে না এলে কি সে জানতে পারতো যে এ-বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তার চিরকালের মত শেষ হয়ে গেছে!

সদানন্দ রাস্তায় চলতে চলতে ভাবতে লাগলো যে-সম্পত্তির জন্যে সমরজিৎবাবুর এত উদ্বেগ শেষ পর্যন্ত তা কার ভোগে লাগবে কে জানে! আজ রেজিস্ট্রি অফিসে সমরজিৎবাবুর উইল রেজিস্ট্রি হবে কি না তা জানতেও পারবে না সে। আর জানবার দরকারও বোধ হয় হবে না।

হঠাৎ দেখলে সামনে দিয়ে মহেশ দৌড়তে দৌড়তে যাচ্ছে—

সদানন্দ ডেকে উঠলো—মহেশ—মহেশ—

কিন্তু গলা দিয়ে তার একটুকু শব্দ বেরোল না। যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সকাল বেলা ঘটে গেল তা জীবনে, এর পরে মহেশের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে গেল। আর তা ছাড়া মহেশকে ডেকে সে কী প্রশ্নই বা করবে? নয়নতারার কথা জিজ্ঞেস করতেই তো এসেছিল মহেশের কাছে! কিন্তু এই অসময়ে কি কাউকে নয়নতারার কথা জিজ্ঞেস করা যায়?

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বড়বাজারের সেই ধর্মশালাটার কথা মনে পড়লো।

বড়বাজারের ধর্মশালাটা কোনও দানশীল লোক পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় একদিন শহরের বুকের ওপর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল। হয়ত কোনও অবাঙালী। ভেবেছিল এই শহর থেকে তো অনেক পয়সাই কামানো গেল। এইবার পুরুষানুক্রমে এই শহরের ঋণ শোধ করা যাক্‌। হয়ত কোনও অবাঙালী কর্তাবাবুরই কীর্তি এটা। তখনকার দিনে এর উপযোগিতা ছিল অনেক। যারা পরেশনাথের মন্দির, হাওড়ার পুল, কি গঙ্গা-মাই, কিম্বা কালীঘাট দর্শন করতে আসতো তাদের এটা কাজে লাগতো। তারপর কলকাতা ধনে-জনে আরো পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর সমৃদ্ধি ক্রমেই কমে গেছে। ভারতবর্ষে আরো অন্য কয়েকটা শহর কলকাতার চেয়ে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। যারা একদিন কলকাতাকে শোষণ করেছিল তারা আর নেই। কিন্তু তাদের বংশধররা এখন আর সোজা পথে শোষণ করে না। তাদের হাতে আছে দিল্লী। সেই দিল্লীর মসনদে যারা বসে আছে তাদের হাত দিয়ে এমন কলকাঠি নাড়ে যাতে শোষণ বলে মনে হয় না। মনে হয় গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের আড়ালে কার কোন্ কারচুপিতে রাতারাতি একটা রাজ্য বড়লোক হয় আবার আর একটা রাজ্য মুমূর্ষু হয়ে ধোঁকে। সেই ব্রিটিশ আমলের শেষ দিক থেকেই এটা চলে আসছে। ১৯১২ সালে যখন রাজধানী চলে গেল দিল্লীতে, তখন থেকেই। কিন্তু যখন কলকাতা থেকে আস্তে আস্তে সবই চলে গেল তখন ইংরেজদেরও বোধ হয় নাভিশ্বাস উঠেছে এখানে। তারা চলে গেল বটে, কিন্তু শোষণ থামলো না। শুধু হাত-বদল হলো ১৯৪৭ সালের পর থেকে।

কলকাতা একটার পর একটা অনেক বিপর্যয় দেখেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর থেকে যে-বিপর্যয় দেখতে শুরু করলো তার বুঝি আর তুলনা নেই। তখন কেবল শুরু হলো ভাঙার ইতিহাস। রাস্তায় তখন একবার গর্ত হলে আর সে গর্ত মেরামত হয় না। ভিড়ের জ্বালায় তখন মানুষ আর নড়তে পারে না। দেশ ভাগ করে দুঃখ ভোগ করার দায় কেবল বাঙালীদের ঘাড়েই যেন বেশি করে চাপলো। তখন কলকাতার গর্ব করার মত সব কিছুই চলে গেছে। থাকবার মধ্যে রইলো কেবল গোটাকতক ধর্মশালা এখানে ওখানে ছড়িয়ে। সেগুলো অন্য শহরে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যায় না বলেই রয়ে গেল।

—পাঁড়েজী!

ধর্মশালার সামনে গিয়ে সদানন্দ দেখলে সেখানেও ভিড়। রাজ্যের ভিখিরি এসে সদরের সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের হাতেই থালা-গেলাস মগ, একটা-না-একটা কিছু রয়েছে।

একেবারে গেটের সামনেই একজন কে দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দ তাকেই জিজ্ঞেস করলে—পাঁড়েজি, পাঁড়েজী নেই?

লোকটা বললে—পাঁড়েজি বাইরে গেছে, কোঠিমে নেই হ্যায়—

সদানন্দ আবার ফিরে এল। অথচ পাঁড়েজীই তাকে আসতে বলেছিল। পাঁড়েজীকে কথা দিয়েছিল সে এখানে এসে উঠবে। মাঝরাত থেকেই এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

ভেবেছিল এখানে এসে সে জিরিয়ে নেবে। কিন্তু এখন আবার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে তাকে।

কিন্তু ভাগ্য ভালো, বড়রাস্তার মোড়ে আসতেই পাঁড়েজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—এ কি বাবুজী, আপনি চলে যাচ্ছেন? আমি একটু বাইরে গিয়েছিলুম, আসুন, আসুন—

বলে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল পাঁড়েজি। বিরাট উঠোন ভেতরে। পাথরের তৈরি বিরাট চক্‌-মিলান বাড়ি। চারদিকে সার-সার ঘর। চারতলা বাড়ি। সব ঘরে লোক গিশ্‌-গিশ্‌ করছে। অনেক মানুষের ভিড় ভেতরে। যেন কোনও বিশেষ উৎসব হচ্ছে।

কোণের দিকে একটা ঘরের দরজার তালা খুলে পাঁড়েজী বললে—আসুন ভেতরে আসুন। আমি তো সকাল থেকেই আপনার জন্যে বসে ছিলুম, আপনি এত দেরি করলেন, আমি ভাবলুম আপনি বুঝি ভুলে গেলেন—

সদানন্দ বললে—না, ভুলবো কী করে? আমি তো বলেই ছিলুম আজকে এখানে থাকবো—

পাঁড়েজী বললে—আজকে কেন বাবুজী, যত দিন ইচ্ছে থাকুন না, কলকাতার বাড়িওয়ালারা বড় বদ্‌মাইশ হুজুর, ভাড়া বাকি ফেললেই তাড়িয়ে দেবে। তা আপনার বাক্স-প্যাঁট্‌রা সব কি সেখানেই পড়ে আছে? আপনি ছেড়ে কথা বলবেন না বাবুজী, আপনিও মামলা জুড়ে দিন। আমার জানাশোনা ভালো ভকিলসাহাব আছে, বড় জাঁদরেল ভকিল সাহেব—

পাঁড়েজী খুব কথা-কইয়ে লোক। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে এই ধর্মশালার তদারকি করে আসছে। লেখাপড়া কিছুই জানে না। পুরোন আমলের লোক। বহুদিন কলকাতায় থেকে থেকে ভালো বাঙলা বলতে শিখেছে।

হঠাৎ বললে—বাবুজী আপনি সেই আংরেজি চিঠি পড়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে? সেই চিঠিতে আমার অনেক লাভ হয়েছে। আমি চল্লিশ বিঘে জমির মালিক হয়েছি এখন—সব আপনার কিরপায় হলো বাবুজী—

সদানন্দ তখন একটা খাটিয়ার ওপর বসে পড়েছিল। সারাদিন হাঁটার পর এই তার প্রথম বসা। এত লোক দেখেছে সদানন্দ, এত জাগয়ায় গেছে, এত লোকের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু এখানে এই পাঁড়েজীর অন্ধকার ঘরখানার ভেতরে বসে যে-আরাম পেলে সে তার যেন তুলনা নেই।

বললে—তোমার এই ঘরখানা বেশ পাঁড়েজী—আমি একটু শুয়ে পড়ি, কেমন?

—শুয়ে পড়ুন না, তা জামা-কাপড় বদলাবেন না?

সদানন্দ বললে—যা পরে আছি এ ছাড়া আর জামা-কাপড় নেই আমার—

—সব বুঝি বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে? তা থাক, কাজ চলাবার মত জামা-কাপড় পরে কিনে নেবেন। পয়সা লাগবে না—

—পয়সা লাগবে না কেন?

পাঁড়েজী বললে—পয়সা লাগবে, কিন্তু নগদ পয়সা লাগবে না। আমাদের এই ধর্মশালার মালিকের কাপড়ের ব্যাওসা। কাপড়ের কারবার করে মালিকের অনেক টাকা। বোম্বাইতে কাপড়ের মিল আছে, আমার কাপড় কিনতে হয় না— আমি আপনাকে কাপড় এনে দেব।

সদানন্দ বললে—তার চেয়ে তুমি বরং আমাকে একটা চাকড়ি যোগাড় করে দিতে পারো পাঁড়েজী?

—চাকরি? কীসের চাকরি?

সদানন্দ বললে—যে-কোনও চাকরি, যে-কোনও মাইনে। চাকরি না করলে খাবো কী? যদি কারো ছেলে পড়াবার দরকার হয় তো তাও করতে পারি, আমি বি-এ পাস, যে-কোনও ক্লাসের ছেলেকে পড়াতে পারবো—

পাঁড়েজী বললে—আমার মালিকের অনেক ছেলে আছে বাবুজী, মালিককে আমি একদিন আপনার কথা বলবো। এখন মালিকের মেয়ের বিয়ে চলছে তো—

—মালিকের মেয়ের বিয়ে?

—হ্যাঁ, দেখেছেন না ধর্মশালায় কত ভিড়। সব বরযাত্রী, কাল বিয়ে হয়ে গেছে। এখন পনেরো দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া চলবে। সব পাটনা থেকে এসেছে—

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললে—বাড়িওয়ালা তো আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তা খেলেন কোথায়?

সদানন্দ বললে—খাই নি কিছু—

—সে কী, দিনভর কিছুছু খান নি? তা এতক্ষণ আমাকে বলেন নি কেন? দাঁড়ান আমি আসছি—

বলে চট্ করে কোথায় বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর একটা মস্ত বড় শালপাতায় করে অনেকগুলো পুরি তরকারি নিয়ে এসে হাজির।

বললে—নিন্ বাবুজী, খেয়ে নিন্—

সদানন্দ খাটিয়া থেকে উঠলো। শালপাতা-শুদ্ধ পুরি-তরকারিটা নিলে। সেই সময়ে ভেতর থেকে কে যেন ডেকে উঠলো—পাঁড়েজী—পাঁড়েজী—

পাঁড়েজী বললে—ওই মালিক ডাকছে, আমি আসছি বাবুজী, এখুনি আসছি—

বলে পাঁড়েজী তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল।

সদানন্দ শালপাতাটার খাবারটা নিয়ে তখনও বসে ছিল। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তার। কিন্তু মুখ-হাত-পা ধোওয়া হয় নি! মুখে-হাতে-পায়ে জল দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু জল কোন্ দিকে? উঠোনের মধ্যে কোথাও নিশ্চয় কল আছে।

বাইরে উঠোনে বেরিয়ে সদানন্দ কল্ খুঁজতে লাগলো। অনেক শালপাতার খালি ঠোঙা উঠোনে ছড়ানো রয়েছে। একজন লোককে দেখে সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—জলের কলটা কোন্ দিকে?

—ওই যে ওদিকে—

বলে লোকটা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলে।

ধর্মশালা বাড়িটা অদ্ভুত। কত রকমের লোক আসছে, আবার ভেতরে থেকে বাইরে যাচ্ছে। কেউ যেন কাউকে চেনে না, চেনবার চেষ্টাও করে না। সে যে একজন অচেনা লোক এখানে এসেছে তাতেও কারো যেন মাথা-ব্যথা নেই। উঠোনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে সদানন্দ একেবারে সদরের মস্ত বড় গেটটার কাছে এসে দাঁড়ালো। কোথায়? এদিকে কল-চৌবাচ্চা কোথায়? কোন্ দিকে?

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই সদানন্দ দেখলে একজন মেয়ে-ভিখিরি কোলে একটা ঘুমন্ত ছেলে নিয়ে তার হাতের শালপাতাটার দিকে হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

কেমন এক রকমের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো সদানন্দর। মেয়ে-ভিখিরিটার পাশে আরো অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দৃষ্টিও ওই শালপাতাটার দিকে।

—বাবুজী—

একটা কাতর অস্পষ্ট শব্দ। কিন্তু সামান্য শব্দটা যেন আর্তনাদ হয়ে সদানন্দর কানে এসে বাজলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দ শালপাতাটা তার দিকে এগিয়ে দিলে। মেয়ে-ভিখিরিটা তার ছেঁড়া শাড়ির আঁচলটা পাততেই সদানন্দ তার ভেতরে পুরি-তরকারি সুদ্ধ ফেলে দিলে।

কিন্তু নবাবগঞ্জ তো আর কলকাতা নয়। আর কলকাতা যেমন নয় তেমনি আবার সুলতানপুরও নয়। সদানন্দর জীবনে একদিন এই কলকাতা, নবাবগঞ্জ আর সুলতানপুর যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে এই বয়েসে ভাবতে গিয়ে বড় অবাক লাগতে লাগলো তার। সেদিন কি সদানন্দ ভাবতে পেরেছিল তার একটা জীবন এতগুলো জায়গা আর এতগুলো মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠবে! যে-সমরজিৎবাবুকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, তাঁর চেয়েও অবাক হবার মত মানুষ যে তাকে ভবিষ্যতে আরো দেখতে হবে তাই কি সে জানতো!

কতদিন ওই শেয়ালদা স্টেশন থেকে সে ট্রেনে উঠে সুলতানপুরে গেছে। কতদিন নৈহাটি গেছে, কতদিন আবার নবাবগঞ্জে গিয়েছে। একটা জীবনে সে কত অসংখ্য মানুষের জীবন দেখতে পেয়েছে। তার একটা জীবনে কত অসংখ্য মানুষের জীবনের ছায়া পড়েছে তারই কি কোনও সীমা-পরিসীমা আছে। এক-এক সময় ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে সে নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছিল, যে-স্বপ্ন নিয়ে সে নয়নতারাকেও ত্যাগ করেছিল, সে-উদ্দেশ্য কি তার সার্থক হয়েছে? এই চৌবেড়িয়ার রসিক-পাল মশাই-এর অতিথিশালায় পড়ে থাকবার জন্যেই কি সে এত কষ্ট স্বীকার করেছে? পৃথিবী কি তার কথা শুনেছে? পৃথিবীর মানুষ কি তার মনের মত মানুষ হয়েছে? নবাবগঞ্জের মানুষের জন্যে যে সে এত কিছু করেছে তা কি সার্থক হয়েছে? সদানন্দর জন্যেই নবাবগঞ্জের লোক হাসপাতাল পেয়েছে, স্কুল পেয়েছে, তা কি কিছুই নয়? সদানন্দর জন্যেই যে নয়নতারার সংসারের দারিদ্র্য ঘুচেছে সেটাও কি কিছু নয়?

আর তার বাবা, নবাবগঞ্জের চৌধুরী মশাই?

শেষ-জীবনে যে তাঁর কষ্টভোগ হয়েছিল তার জন্যেও কি সদানন্দ দায়ী?

একদিন নবাবগঞ্জের সবাই দেখলে চৌধুরী মশাই আবার এসে হাজির। তাঁর আগেকার সে চেহারা আর নেই। সাইকেল-রিকশাটা আবার বারোয়ারিতলা দিয়ে এসে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সঙ্গে প্রকাশ মামা।

প্রকাশ বাড়ির ভেতরে নেমে দরজার চাবিগুলো একে-একে খুলতে লাগলো। তারপর দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোতলার ঘরের চাবিটাও খুলে ফেললে। ধুলোয় ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ঘর ঝাঁট দিয়ে তবে বসবাসের যোগ্য হলো।

খবর পেয়ে বেহারি পাল মশাই এল। মুখোমুখি দেখা প্রকাশের সঙ্গে।

—কে? পাল মশাই না? কেমন আছেন সব আপনারা?

বেহারি পাল বললে—চৌধুরী মশাই এসেছেন শুনলাম—

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ জামাইবাবু এসেছে—

—তা খবর সব ভালো তো?

একে-একে আরো সবাই এল। বুড়ো তারক চক্রবর্তীর কাছেও খবরটা গিয়েছিল। তিনিও খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন। বহুকালের পুরোন সব লোক। সকলের বয়েস হয়েছে। পুরোন লোক দেখলেই পুরোন স্মৃতি সব মনে পড়ে যায়। একদিন এই বাড়িতেই চৌধুরী মশাই-

এর ছেলে সদানন্দর বিয়েতে সবাই দল বেঁধে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে। কর্তাবাবুর শ্রাদ্ধেও খাওয়া-দাওয়া করেছে। চৌধুরী গিন্নী এখানেই মারা গিয়েছে। তাতে অবশ্য তেমন ঘটা হয় নি। কিন্তু সব চেয়ে যে-ঘটনাটা সকলের মনে দাগ কেটে আছে সেই নয়নতারার ব্যাপার। এতদিন পরে ছোটমশাই-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন আবার সবাই-এর পুরোন কথাগুলো নতুন করে মনে পড়তে লাগলো।

ক'দিন ধরেই নানা লোক আসা-যাওয়া করতে লাগলো। কিন্তু চৌধুরীমশাই কারো সঙ্গেই দেখা করলেন না। প্রকাশ মামাও জামাইবাবুর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিলে না।

সে সকলকেই বললে—না, দেখা হবে না। জামাইবাবুর শরীর খারাপ।

একজন বললে—তা এতদিন পরে চৌধুরী মশাই এলেন, একবার চোখের দেখাও দেখতে পাবো না শালাবাবু?

প্রকাশ বললে—না, আমি সকলের মতলব বুঝতে পেরেছি—

—মতলব আবার কী থাকতে পারে শালাবাবু! গাঁয়ের জমিদার গাঁয়ে এসেছে। তাঁকে একবার পেন্নাম করে চলে যাবো, তাও হবে না?

বেহারি পাল জিজ্ঞেস করলে—সদানন্দর খবর কিছু পেলে নাকি তোমরা?

প্রকাশ বললে—না না, সে বেঁচে নেই আর—

—বেঁচে নেই মানে?

বেহারি পাল প্রকাশের কথা বলার ভঙ্গি দেখে ক্ষুণ্ণ হলো। এমন করে কেউ কথা বলে? বললে—বেঁচে নেই মানে কী? খোঁজখবর কিছু নিয়েছ তোমরা?

প্রকাশ মামা বললে—খোঁজখবর আর নেব কী? মারা গেলে কি কারো খোঁজখবর পাওয়া যায়?

—তা জলজ্যান্ত মানুষটা মারা গেলে খোঁজখবর পাওয়া যাবে না? পুলিসের খাতাতেও তো একটা হিসেব থাকবে তার!

প্রকাশ বললে—পুলিশের কাছে কি খোঁজখবর নিইনি ভাবছেন? আমি কলকাতায় নিজে গিয়ে ছ'মাস কাটিয়েছি. পুলিসের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি, কোনও ফায়দা হয়নি। এখন আমিই বা কী করবো আর জামাইবাবুই বা কী করবে?

—আর নয়নতারা?

প্রকাশ বললে—তার আর নাম করবেন না আপনি। আমারই ঘাট হয়েছিল, অমন মেয়েকে এ-বাড়ির বউ করে আনা। সেই অলক্ষুণে বউ এসেই তো সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। নইলে জামাইবাবুরও এই দশা হতো না, আর দিদিও এমন বেঘোরে মারা যেত না—

একজন বললে—তাহলে তো শালাবাবু, আপনারই পোয়া বারো। চৌধুরী মশাই-এর সব সম্পত্তি এখন আপনারই কব্জায়—

—আরে দূর! আমার কি তেমনি কপাল?

বেহারি পাল জিজ্ঞেস করলে—কেন বাবাজী! তুমি ছাড়া তো চৌধুরী মশাই-এর আর কেউ ওয়ারিশ রইল না!

প্রকাশ বললে—সে তো রইল না জানি। সেই জন্যেই তো জামাইবাবুকে কোথাও ছাড়ি না। কিন্তু শত্তুরের তো আর অভাব নেই মশাই। তারা যে সব তলে তলে অন্য মতলব ভাঁজছে!

—কী মতলব?

প্রকাশ বললে—সুলতানপুরের লোকদের তো চেনেন না, এমন নির্লজ্জ লোক সব, নিজের আইবুড়ো মেয়েদের সব জামাইবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে, পাঠিয়ে তাদের দিয়ে

জামাইবাবুর পা টিপে দেওয়াচ্ছে, তা জানেন? আমি ভাগ্যিস ছিলুম তাই রক্ষে—

কেন? কিসের জন্যে পা টেপাচ্ছে? টাকার জন্যে? চৌধুরী মশাইকে খোসামোদ করবার জন্যে?

—আরে না, আমার জামাইবাবুকে জামাই করবার জন্যে!

—তা ছোটমশাই-এর তো আর মতিভ্রম হয়নি!

প্রকাশ বললে—মতিভ্রম এখনো না-হয় হয়নি। কিন্তু হতেই বা কতক্ষণ? আপনারা পুরুষমানুষ হয়ে এই কথা জিজ্ঞেস করছেন? পুরুষ হল পুরুষ, পুরুষ মানুষ কখনও বুড়ো হয়?

সবাই কথাটা বুঝলো। তা বটে! বিয়ে করতে আর কতক্ষণ লাগে? বিয়ে একটা করে ফেললেই হলো। টাকার যখন অভাব নেই তখন কনেরও অভাব নেই কোথাও।

তা প্রকাশ সেই জন্যেই চৌধুরী মশাই-এর কাছ ছাড়ে না। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সুলতানপুর থেকে চৌধুরী মশাই একলাই আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশ ছাড়েনি। জামাইবাবুকে এক মিনিট কাছ-ছাড়া করতে ভয় লাগে প্রকাশের। বলে—সম্পত্তির লোভ বড় লোভ হে, ওতে লঘু-গুরু বিচার থাকে না।

চৌধুরী যখন একলা থাকেন তখন হিসেব নিয়ে বসেন। তখন প্রকাশকেও ঘরের ভেতর ঢুকতে দেন না। তখন আর কাউকেই বিশ্বাস করেন না তিনি। দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতর বসে বসে কেবল হিসেব করেন। কত বিঘে বাগান আর কত বিঘে ধান-জমি আর কত বিঘে বিল। আর বসত-বাড়িটারও আলাদা একটা দলিল বার করেন। বসত-বাড়িটার দামও কম করে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা। প্রাণকৃষ্ণ সা রেল-বাজারের আড়তদার। তার সঙ্গেই লেন-দেনের কথাবার্তা চলছিল। তিন লাখ যদি পেয়ে যান তাহলে আর পীড়াপীড়ি করবেন না তিনি। যা পাওয়া যায়। এখানে না থাকলে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না। এখানকার তিন লাখ আর সুলতানপুরের সাত। এই পুরো দশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেবেন তিনি! আর বাকি রইল সোনা-দানা। তারও একটা মোটা দাম আছে। সবটা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। কেউ বিষ খাওয়াতে পারে। পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস নেই।

সেদিন হিসেব করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। চৌধুরী মশাই সা' মশাইকে খবর দিয়েছেন। সকাল বেলাই আসবে। তার আগে দলিলপত্র ঠিক করে রাখছিলেন। রাত তখন অনেক। প্রকাশ বাইরের বারান্দায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ বার-বাড়ির সদরের দিকে নজর পড়তেই মনে হল সদর দরজা ঠেলে একটা পালকি এসে ঢুকলো। চার বেহারার পালকি। পালকিতে এত রাত্রে কে এল!

চৌধুরী মশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলেন।

পালকি থেকে কে একজন ঘোমটা-দেওয়া চেহারা নামলো। নেমে হাঁটতে হাঁটতে ভেতর-বাড়িতে ঢুকলো। আর তাকে দেখা গেল না। তারপর সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল! সিঁড়ি দিয়ে ওপরে দোতলায় উঠেছে। তারপর একেবারে তাঁর জানলার সামনে। ঘোমটার ভেতরে মুখখানার দিকে চেয়ে যেন চেন-চেনা মনে হলো।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কে?

মেয়েলী গলায় উত্তর এল—আমি কালীগঞ্জের বউ—

কালীগঞ্জের বউ শব্দটা শুনতেই চৌধুরী মশাই-এর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়েই তিনি অচৈতন্য হয়ে সেখানে পড়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পড়ার শব্দটা প্রকাশের কানে গেছে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার মনে হলো যেন অশ্বিনী ভট্টাচার্য তাকে লুকিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। আসতে গিয়ে চৌকাঠে পা লেগে হোঁচট খেয়েছে—

প্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠছে—তবে রে শালা অশ্বিনী, তুই এখেনেও আমাকে জ্বালাতে এসেছিস?

কিন্তু না, স্বপ্নের ঘোরটা কেটে যেতেই দেখলে জামাইবাবু অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে আছে।

প্রকাশ চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—জামাইবাবু, ও জামাইবাবু কী হয়েছে আপনার? অমন করে শুয়ে পড়ে আছেন কেন? জামাইবাবু—

শেষ পর্যন্ত সেদিন প্রকাশের হাঁক-ডাকে পাড়ার লোকজন এসে জড়ো হয়েছিল। বেহারি পাল মশাই এসেছিল, তারক চক্রবর্তী মশাই এসেছিল। নিতাই হালদারের মাচার ওপর বসে যারা অনেক রাত্তির পর্যন্ত তাস খেলছিল তারাও শালাবাবুর চেচাঁনি শুনে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এসেছিল।

সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল সেদিন সেই চৌধুরীবাড়িতে।

শেষকালে দরজা শাবল মেরে ভাঙা হলো। ননী ডাক্তার এল। ক'দিন ধরে ওষুধ খেয়ে তবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন চৌধুরী মশাই।

প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছিল আপনার জামাইবাবু? অমন করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন?

বেহারি পাল, তারক চক্রবর্তী, তারাও সবাই জিজ্ঞেস করলে—কিছু ভয় পেয়েছিলেন নাকি?

কিন্তু চৌধুরী মশাই কারোর কোনও কথার জবাব দিলেন না। তিনি যে সেদিন কাকে পালকি চড়ে আসতে দেখেছিলেন, কাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তাও কাউকে বললেন না। তিনি আপন মনেই সেই সেদিনকার ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। যতই ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর ভয় করতে লাগলো। মনে হলো যেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একটা ভারি জগদ্দল পাথর হয়ে তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে। সে-বোঝা তিনি বুক থেকে আর কিছুতেই নামাতে পারছেন না।

সাতদিন পর বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হাতের কাছে দলিল-দস্তাবেজগুলো ছিল, সেইগুলো নিয়েই তাঁর দুর্ভাবনা ছিল খুব। কাউকে বিশ্বাস নেই সংসারে। এই-গুলোর ওপরেই সকলের নজর। যতক্ষণ না সেটা তিনি প্রাণকৃষ্ণ সা'মশাই-এর হাতে দিতে পারছেন ততক্ষণ যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

প্রকাশকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন—সা' মশাই আসেননি?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ জামাইবাবু, এসেছিল, আপনার তখন অসুখ, আপনি অসুখে পড়েছিলেন, তাই চলে গেলেন। আবার আসবেন বলে গেছেন—

চৌধুরী মশাই বললেন—আর একবার ডাকো তাকে, ডেকে পাঠাও—

প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই বহুদিনের আড়তদার। কর্তাবাবুর আমল থেকে লেনদেন আছে এ-বংশের সঙ্গে। যখনই কারবারে কাঁচা টাকার তার দরকার হতো কর্তাবাবুর কাছে আসতো। কর্তাবাবুর কাছে টাকা নিতে আসতো।

সেই সা' মশাই সেদিন এল। সা' মশাই আসতেই চৌধুরী মশাই প্রকাশকে বললেন—তুমি ঘর থেকে একবার বেরিয়ে যাও প্রকাশ—

প্রকাশ কেমন থতমত খেয়ে গেল। বললে—আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো?

—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবে।

প্রকাশ তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কেন বেরিয়ে যাবো জামাইবাবু, শেষকালে যদি কোনও দরকার-টরকার পড়ে?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, তোমাকে আমার কোনও দরকার পড়বে না, তুমি এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—

প্রকাশ বললে—কিন্তু যদি আবার অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যান তখন কে দেখবে? তার চেয়ে বরং আমি থাকি—

চৌধুরী মশাই আর থাকতে পারলেন না, সোজা দাঁড়িয়ে উঠে তেড়ে গেলেন। বললেন—তুমি বেরোও বলছি, আগে বেরোও—

তবু প্রকাশ নড়ে না। বললে—আজ্ঞে আমি থাকলে দোষটা কী? আমি তো কিছু করছি না?

চৌধুরী মশাই প্রকাশের গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিলেন। বললেন—যত কিছু বলি না, তত তোমার বড় বাড় হয়েছে! বার বার বলছি বেরিয়ে যাও তবু থাকতে চাও এখানে! কেন? আমার সব জিনিস তোমার জানবার দরকার কী? সা' মশাই-এর সঙ্গে যদি আমার দরকারী কথা থাকে তো তাও তোমায় শুনতে হবে?

চড় খেয়ে প্রকাশের তখন চোখে জল এসে গিয়েছিল। বিশেষ করে সা' মশাই-এর সামনে চড় খেলে চোখে জল তো আসবেই। সেই অবস্থায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলতে লাগলো—আমাকে আপনি চড় মারলেন জামাইবাবু? আজ দিদি থাকলে আমার এত অপমান সইতে হতো না—দিদি নেই বলেই......

চৌধুরী মশাই ধমক দিলেন—থামো তো, দিদির কথা আর তুলো না। তোমার জন্যেই তো দিদি মারা গেল। তুমিই তো যতো নষ্টের গোড়া—

—আমার জন্যে দিদি গেল? আমি যত নষ্টের গোড়া? আপনি বলছেন কী জামাইবাবু?

প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই টাকাকড়ির লেন-দেন নিয়ে কথা বলতে এসেছিল। এই সব ঝগড়া বাগবিতণ্ডার মধ্যে তাকে পড়তে হবে তা ভাবতে পারেনি।

কথার মাঝখানেই বললে—কেন আর ও-সব নিয়ে কথা কাটাকাটি করছেন চৌধুরী মশাই, ও সব কথা এখন বন্ধ করুন না—

চৌধুরী মশাই বললেন—দেখুন না কত বড় শয়তান, আমার ছেলেকে ওই প্রকাশই ছোটবেলা থেকে বিগড়ে দিয়েছে। ওর জন্যেই তো সদানন্দ অমন করে বিগড়ে গেল—

প্রকাশ বলে উঠলো—আমি বিগড়ে দিলুম না আপনারা বিগড়ে দিলেন? আপনি আর কর্তাবাবু—

—তুমি থামো, তুমি আর কথা বলো না। বেছে বেছে অমন বউকে কে আনলে শুনি? আমি, কর্তাবাবু, না তুমি? তুমি যদি অমন বউ ঘরে না আনতে তাহলে তোমার দিদি অমন করে মারা যায়? এই নবাবগঞ্জের এই বাড়ি এমন করে শ্মশান হয়ে যায়? দেখছো না এ বাড়ি কী হয়েছে? নইলে আমি এই সম্পত্তি জলের দরে বিক্রী করি? এই তো সা' মশাই তো সবই জানেন, আপনিই বলুন, আপনি তো বরাবর সবই দেখে আসছেন সা' মশাই, বলুন আপনি।

তারপরে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—জানেন সা' মশাই, ছোটবেলা থেকে এ ছেলেটাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যেত, কোথায় রাণাঘাট, কোথায় কেষ্টনগর, কোথায় কলকাতা, সেই সব দেখেই তো সে বিগড়ে গেল—

প্রকাশ বললে—বা রে, বা, এখন সব দোষ হলে আমার—

—তা তোমার দোষ হবে না তো দোষ হবে আমার? তুমি বেছে বেছে ওই বউ ঘরে আনোনি? তুমি বলোনি যে ওই বউ আনলে সদানন্দ সংসারী হবে, বউএর রূপ দেখে সব ভুলে যাবে? বলোনি তুমি?

প্রকাশ বললে—তা তো বলেই ছিলুম, তা সেটা কি মিথ্যে বলেছিলুম? বলুন না সা' মশাই আপনিও তো বউমাকে দেখেছিলেন, অমন রূপসী বউ ক'টা লোকের বাড়িতে আছে, আপনিই বলুন? বাইরে যার অমন রূপ ভেতরে ভেতরে যে তার মনে কালকেউটের বিষ তো আমি কী করে জানবো বলুন—

প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই বললে—সে যা হয়ে গেছে গেছে, বাবাজী তুমি চুপ করো, চৌধুরী মশাই যা বলছেন তাই করো—

প্রকাশ বললে—তাহলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো বলতে চান?

সা' মশাই বললেন—হ্যাঁ, যখন উনি বেরিয়ে যেতে বলছেন তখন বেরিয়েই যাও—আমাদের কাজ-কর্ম আছে, তোমার সামনে তো সে-সব কথাবার্তা হবে না—

প্রকাশ যেন কী রকম বিমূঢ় হয়ে গেল কথাগুলো শুনে। বললে—বুঝতে পেরেছি, যেই টাকাকড়ির কথা উঠেছে তখন আমি পর হয়ে গেলুম, আর যখন ভাত রান্নার কথা হবে তখনি আমি বড় আপনার লোক, না? জামাইবাবু যখন সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তখন কে তাঁকে দেখেছিল শুনি? তখন তো আমি ছাড়া আর কোনও শর্মা কোথাও ছিল না—

চৌধুরী মশাইএর ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল। তিনি বললেন—আর কথা নয়, তুমি এবার বেরিয়ে যাও দিকি, এখ্‌খুনি বেরিয়ে যাও, তোমাকে আর ভাত রাঁধতে হবে না, টাকা ছড়ালে লোকের অভাব হবে না আমার, তুমি একেবারে বেরিয়ে যাও এখান থেকে, এ-বাড়ি থেকেই বেরিয়ে যাও—

বলে ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন চৌধুরী মশাই, কিন্তু সেই মুহূর্তেই কে একজন অচেনা লোক এসে হাজির হলো। লোকটিকে দেখে তিনজনেই অবাক। কে এ?

প্রকাশ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—কে আপনি?

লোকটা বললে—আমি চৌধুরী মশাইএর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

চৌধুরী মশাই বললেন—আমি চৌধুরী মশাই—

লোকটা বললে—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল, কথাটা আমি সকলের অসাক্ষাতে বলতে চাই—

চৌধুরী মশাই এমনিতেই বিরক্ত হয়ে ছিলেন, তার ওপর আগন্তুকের কথায় মেজাজ আরো ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। বললেন—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

প্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, আগে বলুন কোত্থেকে আসছেন? বলা নেই, কওয়া নেই অমনি দেখা করলেই হলো? যা বলতে চান সকলের সামনেই বলুন। তা বুঝতে পেরেছি, বিয়ের কথা বলতে এসেছেন তো?

লোকটা কেমন হয়ে গেল। বললে বিয়ে? কার বিয়ে?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ, চৌধুরী মশাই-এর বিয়ে। আপনি চৌধুরী মশাই-এর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন তো? তা আমি বলে দিচ্ছি আমার জামাইবাবু বিয়ে করবেন না। সম্পত্তির লোভে আপনারা সবাই চৌধুরী মশাইএর বিয়ে দিতে চান, সে আমরা জানি, তা সে আমরা হতে দেব না। আমি চৌধুরী মশাইএর শালা, আমার নাম প্রকাশ রায়, আমাকে না জিজ্ঞেস করে চৌধুরী মশাই বিয়ে করবেন না—

লোকটা বললে—না, আমি সে-কথা বলতে আসিনি—

—তাহলে—

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি চুপ করো না প্রকাশ, তোমার অত কথা বলবার দরকার কী? উনি এসেছেন আমার সঙ্গে কথা বলতে, যা বলতে হয় আমি বলবো, তুমি কে?

প্রকাশ বললে—তা সেইজন্যেই তো আমি আপনাকে একলা ছেড়ে কোথাও যাই না, শেষকালে কে আপনাকে ঠকিয়ে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবে, তখন তো আপনিই 'হায়' 'হায়' করবেন। সুলতানপুরের অশ্বিনী ভট্টাচার্যিটা তো আপনাকে প্রায় গেঁথেই ফেলেছিল, আমি না থাকলে ছাড়ান্ পেতেন?

প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই-এর সময়ের দাম আছে। বাজে কাজে সময় নষ্ট হচ্ছিল বলে এতক্ষণ খুঁতখুঁত করছিল। এবার প্রকাশের দিকে চেয়ে বললে—তুমি বাবাজী একটু চুপ করো না, ভদ্রলোককে যা বলবার বলতে দাও না—

লোকটি এবার বললে—কালীকান্ত ভট্টাচার্য আপনার বেয়াই ছিলেন তো?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, তা তিনিই কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

—না, তিনি আর কী করে পাঠাবেন, তিনি এক বছর আগে মারা গেছেন—

—মারা গেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি ছিলেন আমার মাস্টার মশাই, তাঁর মেয়ে নয়নতারার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে হয়েছিল তো?

নয়নতারা নাম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে যেন আবহাওয়াটা গরম হয়ে উঠলো। চৌধুরী মশাই এতক্ষণে লোকটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলেন।

বললেন—আপনার নাম?

লোকটা বললে—আমার নাম নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রকাশ এতক্ষণে চিনতে পারলে। বললে—ও, আপনাকে তো আমি চিনি মশাই, আপনি ছিলেন বেয়াই মশাইএর ডান হাত। তাই বলুন! তা আপনি হঠাৎ কী উদ্দেশ্যে?

লোকটি বললে—নয়নতারার বিয়ের সময় মাস্টার মশাই মেয়েকে প্রায় আট-দশ হাজার টাকার গয়না দিয়েছিলেন। আপনার পুত্রবধূকে আপনারা বাপের-বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই গয়নাগুলো তো তার সঙ্গে দেননি। নয়নতারার পক্ষ থেকে আমি এখন সেইগুলো দাবী করতে এসেছি—

এর চেয়ে সামনে যদি হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হতো তাতেও বুঝি চৌধুরী মশাই এত চমকে উঠতেন না।

কিন্তু প্রকাশ রায় সহজে কিছু সহ্য করবার লোক নয়। জবাবটা দিলে সে। বললে—নয়নতারার গয়না? আপনি বউমার গয়না চাইতে এসেছেন?

নিখিলেশ বললে—হ্যাঁ—

—আপনার লজ্জা করলো না সেই গয়না চাইতে? যে বউ এই বংশের কুলে কালি দিয়েছে তার নাম করতে লজ্জা হলো না আপনার? আপনি আবার সেই গয়না বাড়ি বয়ে চাইতে এসেছেন?

নিখিলেশ বললে—আমি তো কিছু অন্যায় দাবী করিনি, যে-গয়না তার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছিল শুধু সেই গয়নাগুলোই চাইতে এসেছি। যখন সে আপনাদের বাড়ি থেকে চলে যায় তখন তো সঙ্গে কিছুই নিয়ে যায়নি সে। সব কিছু এখানেই রেখে গিয়েছিল আর আপনারাও তাকে কিছু গয়না পরে যেতে দেননি—

চৌধুরী মশাই এতক্ষণে আবার কথা বললেন।—তা বউমাই কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?

নিখিলেশ বললে—আজ্ঞে না, আমি তো মাস্টার মশাইএর সমস্ত কিছুই দেখাশোনা করতুম, নয়নতারার বিয়ের সময় জিনিসপত্র কেনা-কাটা করা থেকে শুরু করে শীতের তত্ত্ব, জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব পাঠানো পর্যন্ত সমস্তই আমাকে করতে হতো। মাস্টার মশাইএর তো

কাজকর্ম করবার আর কেউ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর যা-কিছু করণীয় সব আমিই করেছি। নয়নতারার স্বার্থ দেখা তো আমারই কাজ, তাই আমি এসেছি—

—তা বউমার সঙ্গে কি ফিরে গিয়ে আপনার দেখা হবে?

—হ্যাঁ, দেখা হবে।

—তা একটা কথা তাকে গিয়ে বলবেন যে যে-বাড়ি সে এত তেজ দেখিয়ে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেই বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে যাওয়া গয়না পরতে তার ইজ্জতে বাধবে না তো? এ গয়না তার ছুঁতে ঘেন্না করবে না তো?

নিখিলেশ বললে—কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি তাতে তো মনে হয় সে তেজ দেখিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে যায়নি! সে ভদ্রভাবেই এখান থেকে চলে গেছে—

চৌধুরী মশাই বললেন—তা জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব ভেঙে চুরমার করে তছনছ করে দেওয়া যদি তেজ দেখানো না হয় তো তেজ দেখানো আবার কাকে বলে তা তো জানি না। পাড়ার লোকজন ডেকে শ্বশুর-শাশুড়ীর ইজ্জতে ঘা দেওয়া যদি তেজ দেখানো হয় তো তেজ দেখানো আর কাকে বলবো তাও তো বুঝতে পারছি না। এই তো এই সা'মশাইও সেদিন এখানে হাজির ছিলেন, ইনিও তো সাক্ষী আছেন, আমি সত্যি বলছি না কি মিথ্যে বলছি উনিই বলুন না! উনিই বলুন আজ পর্যন্ত কোনও বাড়ির বউ কারো শ্বশুরকুলে এমন করে কলঙ্ক দিয়েছে? আপনি জানেন যে সেই ঘটনার পর আমার স্ত্রী এত আঘাত পান যে সেই দিনই তিনি শয্যা নেন আর সেই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হয়ে ওঠে? আমার বউমার জন্য যেমন আমার একমাত্র ছেলে বিবাগী হয়ে যায় তেমনি আমার সংসারও তারপর থেকে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

নিখিলেশ বললে—গয়না আপনি দেবেন না-দেবেন সে আপনার অভিরুচি, কিন্তু অকারণে নিজের পুত্রবধূর নামে মিথ্যে দোষারোপ করবেন না।

—মিথ্যে দোষারোপ? আপনি বলতে চান আমি এই বয়েসে মিছে কথা বলছি?

নিখিলেশ বললে—মিছে কথার আবার কম বয়েস বেশি বয়েস আছে নাকি? যাদের মিছে কথা বলা স্বভাব বুড়ো বয়েসেও মিছে কথা বলতে তাদের আটকায় না।

—তার মানে?

নিখিলেশ বললে—তার মানে বোঝবার সময় আমার নেই। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। যদি নয়নতারার গয়নাগুলো দিতেন তো যাতে ঠিক-ঠিক নয়নতারার হাতে পৌঁছোয় তা ব্যবস্থা করতে পারতুম। আমি চলি—

প্রকাশ বললে হ্যাঁ আসুন, আর বউমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো বলবেন যে সে যেন মনে রাখে যে মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন, তাঁর আর এক নাম দর্পহারী মধুসূদন, তিনি কাউকে রেহাই দেন না। অত বড় লঙ্কার রাজা দশানন, তিনি পর্যন্ত রেহাই পাননি তা বউমা তো কোন্ ছার। কথাটা বউমাকে জানিয়ে দেবেন—

বলতে বলতে প্রকাশ নিখিলেশের পেছন পেছন বাড়ির সদর গেটের দিকে চলে গেল।

চৌধুরী মশাই আর দেরি করলেন না। প্রকাশ চলে যেতেই দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছেন। তারপর সিঁড়ির দিকের জানালা দু'টোও বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলেন।

বললেন—আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে যে দু'টো কথা বলবো সা' মশাই তারও যো নেই, এমনিই হয়েছে আমার কপাল—

সা' মশাই বললে—আপনার শরীর খারাপ ছোটমশাই, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না—

চৌধুরী মশাই বললেন—ব্যস্ত কি সাধে হই সা' মশাই, আজকে যদি আমার উপযুক্ত ছেলে কাছে থাকতো তো আমি কি ব্যস্ত হতুম?

সা' মশাই বললে—তা সদানন্দের কোনও খবর পেলেন নাকি?

চৌধুরী মশাই বললেন—ছেলের নাম আর আমার সামনে মুখে আনবেন না সা'মশাই, আমি জীবনে তার আর মুখ-দর্শনও করবো না—ওই ছেলেই আমার জীবনের মস্ত অভিশাপ।

সা' মশাই বললে—কিন্তু সেই ছেলে যদি কোনওদিন আবার ফিরে আসে?

চৌধুরী মশাই বললেন—সেই জন্যেই তো এখানকার ওখানকার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছি। বিক্রি করে দিয়ে টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রেখে দেব, তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে টাকা ভাঙাবো আর খাবো—

হায় রে মানুষের আশা, আর হায় রে মানুষের স্বপ্ন! মানুষ কত আশা করেই না সংসার গড়ে আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত নিপুণভাবেই না সেই সংসার আবার ভাঙে! নরনারায়ণ চৌধুরীর সেই নিজের হাতে গড়া সংসার যে এমন করে তিন পুরুষের মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে তা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন! এই বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট, প্রত্যেকটি কাঠ, প্রত্যেকটি লোহার টুকরো পর্যন্ত ছিল তাঁর কাছে বড় মমতার সামগ্রী। বড় মমতা দিয়ে বড় স্নেহ দিয়ে এ-বাড়ির প্রতিটি সামগ্রী তিনি একদিন সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর বংশধরদের ভবিষ্যৎ পাকা করবার জন্যে। কিন্তু তিনি কি জানতে পেরেছিলেন যে একদিন তাঁরই নাতি সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বড়বাজারের এক অখ্যাত ধর্মশালার এক কোণে একটা অন্ধকার ঘরে তার জীবন কাটাবে!

ধর্মশালার জীবন এক অদ্ভুত ধরনের জীবন। ধর্মশালার ভেতরে কখন কে আসছে আবার কখন কে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে তা কারো বলবার সাধ্য নেই। হঠাৎ এক-একদিন হয়ত মানুষে-মানুষে ঘর ভর্তি হয়ে গেল, দু'দিন পরে তারপর আবার হয়ত সব ফাঁকা। তখন খাঁ-খাঁ করে ভেতরটা! কিন্তু ক'দিনই বা সদানন্দ তা দেখতে পায়—আর ক'দিনই বা সে নিজের ঘরে থাকে! পাঁড়েজী দুটো ছাত্র পড়ানোর কাজ করে দিয়েছিল। সকালবেলা একটা ছাত্র আছে, তারা দেয় চল্লিশ টাকা, আর সন্ধ্যে-বেলা আর একজন, তারা দেয় পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু মাইনে পাবার দুদিন পরেই হাত ফাঁকা হয়ে যায়।

পাঁড়েজী বলে—আপনার কাপড়টা যে ছিঁড়ে গেছে বাবুজী, একটা কাপড় কিনুন এবার—

সদানন্দ বুঝতে পারে না। বললে—ও থাক গে যাক, ওটুকু ছিঁড়লে ক্ষতি কী? আমাকে তো আর ওরা কাপড় দেখে মাইনে দিচ্ছে না, আমার পড়ানো খারাপ না হলেই হলো—

পাঁড়েজী শীতের সময় একটা আলোয়ান কিনে দিয়েছিল তার মালিকের গদি থেকে। এত যে ঠাণ্ডা পড়েছে সেদিকে খেয়াল ছিল না সদানন্দর। সেই শীতের মধ্যেই হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে পড়িয়ে ফিরতো।

পাঁড়েজী বলতো—আপনার জাড়া লাগে না বাবুজী? কোনদিন আপনার বোখার হবে ঠিক—

বোখার হোক আর না হোক ক'দিন সদানন্দ খুব কাশিতে ভুগলো। কাশতে কাশতে শেষকালে প্রায়ই দম আটকে আসতো।

সেদিন পাঁড়েজী আর স্থির থাকতে পারলে না। কোথা থেকে পাঁড়েজী একটা গরমের

আলোয়ান কিনে এনে দিলে। বললে—রাত্তিরে আপনাকে বেরোতে হয়, এটা পরে বেরোবেন বাবুজী—

তা পড়ানো তো ঘণ্টাখানেকের কাজ মাত্র! তারপরে সদানন্দ যে কোথায় যায় তা পাঁড়েজী বুঝতে পারে না। অনেক রাত্রে যখন সদানন্দ ফেরে তখন বউবাজারের রাস্তা রীতিমত ফাঁকা। তখন পা দু'টো আর যেন চলতে চায় না।

ধর্মশালার বড় ফটকটা তখন বন্ধ করে দেয় পাঁড়েজী। মধ্যেখানের দরজাটা শুধু খুলে রেখে দেয়। যে তখন ভেতরে আসতে চাইবে সেই ছোট গর্তটার মধ্যে মাথা গলিয়ে তাকে ঢুকতে হবে। কেউ ভেতরে মাথা গলালেই পাঁড়েজী উঠোনের কোণে চাপাটি বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করবে—কে? কোন্ হ্যায়?

চাপাটি তৈরি করে পাঁড়েজী অনেকক্ষণ সদানন্দর জন্যে অপেক্ষা করে। উনুনের আগুন নিবে যায় তখন। তবু ফটকের দিকে চেয়ে পাঁড়েজী হাঁ করে বসে থাকে। কখনও কখনও নিজের কাঠের বাক্সটা থেকে পুরোন 'রাম-চরিত মানস'টা বার করে উচ্চারণ করে করে পড়তে থাকে। আর উঠোনের বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময়টা মাঝে মাঝে দেখে নেয়।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে তখন কলকাতায়। শীতে হি-হি করে সবাই কাঁপে। পাঁড়েজী গরম উনুনটার পাশে বসে হাত পাগুলো একটু সেঁকে নেয়।

ঠিক তখন সদানন্দ ঢোকে।

পাঁড়েজী দেখেই অবাক। বললে—আপনার আলোয়ান কোথায় গেল বাবুজী! সেদিন যে নতুন আলোয়ান কিনে দিলাম!

সদানন্দ সে-কথায় কান দিলে না। ঘরের ভেতরে ঢুকে হাতের বইটা রেখে বললে—রুটি করেছ নাকি পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে—আপনার আলোয়ানটা কোথায় গেল তাই বলুন বাবুজী? আলোয়ানটা কোথায় ফেলে এলেন?

সদানন্দ বললে—সে কোথায় হারিয়ে গেছে বোধ হয়—

—হারিয়ে গেছে মানে? নতুন আলোয়ানটা ওমনি হারিয়ে গেল?

সদানন্দ বললে—হারিয়ে গেলে আর কী করবো বলো? আমি তো আর ইচ্ছে করে হারাইনি—

—তা ছাত্রের বাড়িতে ফেলে আসেন নি তো? সেখানে ফেলে এলে কাল ঠিক ফিরে পেয়ে যাবেন।

সদানন্দ বললে—তাহলে তো ফিরে পাবোই। কালই গিয়ে সেখানে খোঁজ করবো—তুমি ও নিয়ে কিছু ভেবো না।

তার পরের দিন সদানন্দ যখন বাড়ি ফিরে এল পাঁড়েজী দেখলে সেদিনও সদানন্দর গায়ে আলোয়ান নেই। বললে—কই, আলোয়ান কোথায় গেল? পেলেন না?

সদানন্দ বললে—যাক্ গে আলোয়ান, তুমি ওই সামান্য আলোয়ান নিয়ে আবার মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছো কেন পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী বললে—তা সত্তর টাকা দামের জিনিসটা সামান্য জিনিস হলো? আমার এক মাসের মাইনে, তা জানেন? আলোয়ানটা তাহলে সত্যি-সত্যিই হারালেন?

সদানন্দ বললে—তুমি বোঝ না পাঁড়েজী, আলোয়ানের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি তা জানো? কলকাতায় যে কত লোকের আলোয়ান নেই, তা তারা কি সব মরে গেছে? তুমি দাও, আমাকে খেতে দাও—

আশ্চর্য, যে মানুষটা লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অকাতরে ছেড়ে আসতে পারলে তাকে

পাঁড়েজী আলোয়ানের মূল্য বোঝাতে চাইছে! কিন্তু তার জন্যে পাঁড়েজীরই বা এত দরদ কেন? কে এই পাঁড়েজী যে সদানন্দর জন্য এত ভাবে! সদানন্দ মাঝে মাঝে পাঁড়েজীর কথা ভেবে অবাক হয়ে যায়। সংসরে এমন ঘটনা কেন ঘটে! কেন একজন বেহার-বাসী লোক তার জন্যে রাত জেগে না খেয়ে বসে থাকে? কেন তার ঠাণ্ডা লাগবে বলে তাকে আলোয়ান কিনে দেয়? সমস্ত পৃথিবীর লোক যখন নিজের স্বার্থ চিন্তা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করবার সময় পায় না তখন কেন এমন এক-একজন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়! কোথায় ছিল পাঁড়েজী, কী এক ঘটনায় দু'জনে একদিন ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল, আর কোথাকার কোন্ নবাবগঞ্জের সদানন্দ চৌধুরী তার সঙ্গে এক ছাদের তলায় এসে জীবন কাটাতে লাগলো। যখন বউবাজারের সমরজিৎবাবুর বাড়িতে সে ছিল তখনও তো সে জানতো না যে ভবিষ্যতে এখানে এই ধর্মশালায় এমন করে তাকে দিন কাটাতে হবে!

কিন্তু সেদিন যা হবার তাই হলো।

প্রত্যেক দিন ভোরবেলা সদানন্দ ঘুম থেকে উঠতো। উঠেই চলে যেত বাইরে। সেদিন আর সে উঠলো না। বিছানা থেকে মাথাই তুলতে পারলে না সে।

পাঁড়েজী একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর মাথায় হাত ছোঁয়াতেই চমকে উঠেছে।

বললে—ইস্, আপনার যে বোখার হয়েছে বাবুজী, আপনার গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে—

সদানন্দ তখন অচৈতন্য একেবারে। তার নড়বারও ক্ষমতা নেই, কথা বলবারও ক্ষমতা নেই। ক'দিন একেবারে বেঁহুশ হয়ে কাটলো। কোথা দিয়ে দিন গেল রাত গেল তাও তার খেয়াল হলো না। যত জ্বালা পাঁড়েজীর। ডাক্তার ডেকে আনা ওষুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে হলো তাকে। যখন জ্ঞান হলো একটু তখন সদানন্দ চেয়ে দেখলে পাঁড়েজী তার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

পাঁড়েজী বললে—এখন কেমন আছো বাবুজী?

সদানন্দ বললে আমি আজকে উঠবো পাঁড়েজী, আমার হাতটা একটু ধরো তো—

পাঁড়েজী ধমক দিয়ে উঠলো—আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন তো, ডাক্তার আপনাকে শুয়ে থাকতে বলেছে, আমি দরজায় শিকলি দিয়ে যাচ্ছি, ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না—

বলে সত্যি-সত্যিই দরজায় শিকল দিয়ে চলে যেত পাঁড়েজী।

কিছুতেই যেন সদানন্দর কিছু খারাপ হতে দেবে না পাঁড়েজী। যেন পাঁড়েজীই সদানন্দর ভালো-মন্দের নিয়ন্তা।

কিন্তু আর কতদিন সদানন্দ চুপচাপ শুয়ে থাকবে! সেদিন আর থাকতে পারলে না সদানন্দ। বললে—আমি আজ বেরোবই, তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে না পাঁড়েজী, আমাকে ছেড়ে দাও—

পাঁড়েজী বললে—কিন্তু আপনি সকাল-সকাল ফিরে আসবেন বলুন?

সদানন্দ বললে—আমি ফিরে আসি না-আসি তোমার কি? জানো আমার কত কাজ? আমার অসুখের জন্যে কত কাজ আটকে আছে?

পাঁড়েজী বললে—আপনি অসুখ বাধাবেন আর দোষ হলো আমার?

সদানন্দ বললে—তোমারই তো দোষ, তুমিই তো আমাকে বাইরে বেরোতে দাও না,

ঘরে শেকল-বন্ধ করে আটকে রেখে দাও—

পাঁড়েজী বললে—আপনি আলোয়ানটা না হারালে তো আর আপনার অসুখ করতো না—আপনি আলোয়ান হারালেন কেন?

সদানন্দ বললে—তা যাদের আলোয়ান আছে তাদের বুঝি অসুখ বিসুখ করে না?

বলে রাগ করে তাড়াতাড়ি ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ধর্মশালার সামনে একটা বুড়ি মতন মেয়েমানুষ এসে হাজির। তখন ধর্মশালাটা ফাঁকা। পাঁড়েজী তখন সবে সদর গেটে এসে বসেছে। বুড়িটাকে দেখেই কেমন সন্দেহ হলো পাঁড়েজীর। বুড়িটার গায়ে বাবুজীর আলোয়ান কেন?

সঙ্গে সঙ্গে পাঁড়েজী বুড়িটাকে ধরে ফেলেছে। বললে—কে তুমি? এ আলোয়ান কোথায় পেলে? এ কার আলোয়ান?

বুড়ি বললে—আমি খোকাকে খুঁজতে এসেছি বাবা—

—খোকা? খোকা কে?

বুড়িটা তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার হাতখানা পাঁড়েজী জোরে টিপে ধরেছে। বললে—বলো এ আলোয়ান কার? কোত্থেকে চুরি করেছ?

বুড়িটা সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেললে। বললে—আমাকে খোকা দিয়েছে এটা।

পাঁড়েজী বললে—খোকা কে আগে তাই বলো? কোথায় তোমার খোকা? কোন্ বাড়িতে থাকে?

বুড়ি কাঁদতে কাঁদেতে বলতে লাগলো—আমার খোকা যে এ বাড়িতে থাকে গো, এই ধর্মশালায়। খোকা যে বলেছিল। ক'দিন ধরে খোকাকে দেখতে পাইনি তাই খোকাকে দেখতে এলুম—

পাঁড়েজী বুঝলো বুড়িটা চোর। বললে—তোমাকে আমি পুলিসে দেব, চলো থানায় চলো, চলো থানায়—

পাঁড়েজী বুড়িকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগলো। বললে—বলো তোমার নাম কী? এ আলোয়ান আমি নিজে বাবুজীকে কিনে দিয়েছি, আমার চেনা আলোয়ান, আমি তোমাকে জেলে পাঠাবো, চলো—

বুড়ি ভয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—না বাবা দারোয়ান, আমাকে তুমি জেলে দিও না, তুমি খোকাকে একবার ডেকে দাও, খোকা নিজে আমাকে আলোয়ানটা দিয়েছে, আমি চাইনি, খোকাকে তুমি একবার ডেকে দাও—

পাঁড়েজী বললে—এখানে খোকা বলে কেউ নেই, তোমাকে থানায় যেতে হবে। বলো তোমার নাম কী?

বুড়ি বললে—আমার নাম কালীগঞ্জের বউ বাবা, কালীগঞ্জের বউ বললেই খোকা আমাকে চিনতে পারবে, তুমি একবার ডেকে দাও না বাবা—

হঠাৎ সদানন্দ সেই সময়ে সেই দিকেই আসছিল। ধর্মশালার সামনে আসতেই বুড়ি চিনতে পেরেছে। খোকাকে দেখে বুড়ি গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলো—ও খোকা এই দ্যাখ, দারোয়ান আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছে—

সদানন্দও অবাক। বললে—এ কি, কালীগঞ্জের বউ, তুমি এখানে?

বুড়ি হাউ-মাউ করে তখন কাঁদছে। এ সেই আনন্দের কান্না। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আনন্দে চোখে জল এসে সব কিছু ভাসিয়ে দেওয়া।

পাঁড়েজীও কাণ্ড দেখে অবাক। কিছুক্ষণ তার মুখে কোনও কথাও ছিল না। এবার বললে,—বাবুজী, একে আপনি চেনেন?

সদানন্দ বললে—তুমি একে কিছু বোল না পাঁড়েজী, এ আমার বড় আপনার লোক, এ হলো কালীগঞ্জের বউ।

কালীগঞ্জের বউ! কাঁহা কালীগঞ্জ, কিস্‌কা বহু সে সব কিছুই সে বুঝতে পারলে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলে যে বুড়ি বাবুজীর খুব আপনার লোক। কিন্তু আপনার লোক বলে অত দামী আলোয়ানটা তাকে দিয়ে নিজে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হবে!

বুড়ি তখন বলছে—ক'দিন তুমি যাওনি দেখে আমি বাবা আর থাকতে পারলুম না, তুমি বলেছিলে এই ধর্মশালায় তুমি থাকো তাই মরতে মরতে এলুম, ভাবলুম যাই দেখে আসি আমার খোকা কেমন আছে—

সদানন্দ বললে—আমার যে খুব জ্বর হয়েছিল—

—জ্বর? কেন বাবা, তোমার জ্বর হয়েছিল কেন? ঠাণ্ডা লাগিয়েছিলে বুঝি?

পাঁড়েজী মাঝখান থেকে বলে উঠলো—বোখার হবে না? একটা আলোয়ান কিনে দিয়েছিলুম বাবুজীকে তাও তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, এ রকম করলে বাবুজীর তবিয়ৎ ঠিক থাকে?

বুড়ি বললে—তা তোমার নিজের আর আলোয়ান নেই নাকি বাবা? তা হলে আমাকে এ আলোয়ান দিলে কেন?

সদানন্দ বললে—ও সব কথা থাক, এখন কী বলতে এসেছিলে বলো? ওষুধ খাচ্ছো তুমি? ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলে আর?

—হ্যাঁ বাবা, তোমার দয়াতেই এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম বাবা, তুমি আমার জন্যে যা করেছ সে আমি মরে গিয়েও মনে রাখবো—

সদানন্দ বললে—তা এই শরীর নিয়ে তুমি আবার এখানে আসতে গেলে কেন? কে আসতে বললে? এই শীতের মধ্যে কেউ জ্বর থেকে উঠে বেরোয়? চলো, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, চলো—

বলে সদানন্দ বুড়ির হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পাঁড়েজী বাধা দিলে। বললে—আপনি কেন যাচ্ছেন বাবুজী, আপনি আমার ঘরে থাকুন, আমি কালীগঞ্জের বহুকে কোঠি পৌঁছে দিচ্ছি—

বুড়িটা বললে—হ্যাঁ বাবা, তাই ভালো ; তুমি কেন যাবে বাবা, তুমি থাকো, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, এই দারোয়ানবাবাই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেখন্—

বলে পাঁড়েজীর পাশে পাশে চলতে লাগলো। সদানন্দ পেছন থেকে বললে—পাঁড়েজী, তুমি কালীগঞ্জের বউকে একেবারে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে আসবে, বুঝলে? মাঝরাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এসো না যেন—

শীতের রাত্রে বড়বাজারের রাস্তাও তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। সরু সরু গলি। এঁকে-বেঁকে চলেছে। সন্ধ্যেবেলা কারবারীরা দোকান খুলে রাস্তাটা আলোয় আলো করে রেখেছিল। একটু আগে তারা চলে গেছে। তখন সব অন্ধকার। বুড়িকে ধরে ধরে পাঁড়েজী চলছিল। কোন্ দিকে বুড়ির বাড়ি তাও জানে না পাঁড়েজী।

বুড়ি বললে—খোকা বড় ভালো ছেলে দারোয়ানবাবা, খোকা না থাকলে আমি মরে যেতুম—

বুড়ির বয়েস হয়েছে অনেক। ভালো করে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না।

বললে—তোমাকে বাবা আর আসতে হবে না, আমি ঐটুকু হেঁটে চলে যেতে পারবো—

পাঁড়েজী ছাড়লে না তবু। বললে—না, সে হয় না বহুজী, বাবাজী বলে দিয়েছে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছি দিতে—আমি তোমার বাড়ি তক্ যাবো, চলো—

বাড়ি মানে সেই রকম বাড়ি। সে-বাড়ির না আছে দেয়াল, না আছে ছাদ। একটা বিরাট প্রাসাদের পেছনে একটা খাটালের মতন জায়গা। গরু-মোষ বাঁধা থাকে সেখানে সার সার। সকাল বেলাটার ওই জায়গাটাতেই দুধের জন্যে মানুষের ভিড়ে ভিড় হয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা তার অন্য রকম চেহারা। তখন শুধু কয়েকটা লম্ফ টিম টিম করে জ্বলে।

পাঁড়েজী প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ কোথায় এল সে!

বললে—এখানে কোথায় থাকো তুমি বহুজী? এ তো ভঁইসের খাটাল—

বুড়ি বললে—আমি ভিখারী মানুষ দারোয়ানবাবু, এই গয়লারাই আমাকে থাকতে দিয়েছে দয়া করে—

পাঁড়েজী বললে—কিন্তু বাবুজীর সঙ্গে তোমার জানপহচান হলো কী করে?

বুড়ি বললে—এমনি রাস্তায়, আমি রাস্তায় ভিক্ষে করছিলুম, আমার থাকবার জায়গাও ছিল না, খোকা আমাকে এখানে এনে থাকতে দিলে—আমার কাপড় কিনে দিলে, শীতের জন্যে আমার গায়ের কাপড় কিনে দিলে—

পাঁড়েজী হতবাক্ হয়ে গেল। যে-মানুষটার নিজেরই থাকবার খাবার ঠিক নেই সেই মানুষটা কিনা আবার তার মত আর একজনের থাকা-খাওয়ার ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে। চারদিক থেকে খাটালের নোংরা দুর্গন্ধ নাকে আসছে। এতদিন ধরে পাঁড়েজী বড়বাজারে আছে, এরকম জায়গার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই ছিল না এতদিন। অথচ বাবুজী এই ক'দিনের মধ্যে এই জায়গারও খবর পেয়েছে।

পাঁড়েজী চলেই আসছিল। কিন্তু বুড়িটা পেছন থেকে ডাকলে।

বললে—ও দারোয়ানবাবা, একটা কথা বলি শুনে যাও—

পাঁড়েজী দাঁড়ালো। বললে—কেয়া?

বুড়ি বললে—আচ্ছা বাবা, খোকা আমাকে কালীগঞ্জের বউ বলে কেন ডাকে তা তুমি জানো? কালীগঞ্জের বউ কে?

পাঁড়েজী আরো অবাক। বললে—কালীগঞ্জের বহু তো তুমিই, তোমারই নাম তো কালীগঞ্জের বহু—

—না বাবা, আমার নাম তো রাজুবালা, আমি কেন কালীগঞ্জের বউ হতে যাবো? খোকা কেবল আমাকে ওই নামে ডাকবে। আমি যত বলি আমার নাম রাজুবালা তত খোকা আমাকে কালীগঞ্জের বউ বলে ডাকবে। কে কালীগঞ্জের বউ তা তুমি বলতে পারো বাবা?

পাঁড়েজী বললে—তা তুমি বাবুজীকে জিজ্ঞেস করলেই পারো—

বুড়ি বললে—জিজ্ঞেস করেছি, তা তার কিছু জবাব দেয় না খোকা—তুমি খোকাকে একটু জিজ্ঞেস করো তো বাবা—

পাঁড়েজী জিজ্ঞেস করবে বলতেই বুড়ি বললে—ওই দেখ আমার ঘর, একদিকে গরু-মোষ থাকে, আর একদিকে আমি থাকি। খোকা আমাকে ভিক্ষে করতে বারণ করেছে। তা আমার কপালে যদি দুঃখু থাকে তো খোকার কী দোষ, খোকা কী করবে? আমার চিরকাল এমন দুর্দশা ছিল না বাবা, একদিন এই আমিই আবার রাজরানী ছিলুম, সে সব কেউ জানে না—

বলে বুড়ি একগাদা দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলো। সে কাহিণীর আর শেষ হয় না। কবে নাকি কোন জমিদারের বউ ছিল বুড়ি, দেওর আর ভাসুরপোরা মিলে তার সম্পত্তি গ্রাস করে নিয়েছে। বিধবা পেয়ে তাকে দিয়ে কী সব কাগজে সই করিয়ে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। তারপর থেকে এই দোরে দোরে ভিক্ষে করেই তার দিন কাটছিল!

অত সব কথা শোনবার দরকার ছিল না পাঁড়েজীর। খানিকটা শুনে সোজা আবার ধর্মশালায় চলে এল।

কিন্তু ধর্মশালায় এসে দেখলে সেখানে বাবুজীর কাছে তখন আর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে অচেনা মুখ। পাঁড়েজীকে দেখেই সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো পাঁড়েজী, কালীগঞ্জের বউকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছ?

পাঁড়েজী বললে—হ্যাঁ বাবুজী, লেকিন বুড়ি জিজ্ঞেস করছিল ওকে আপনি কালীগঞ্জের বউ বলে ডাকেন কেন? ওর নাম তো রাজুবালা—

সদানন্দ হাসলো। বললে—ও তুমি বুঝবে না পাঁড়েজী, ও কেউই বুঝবে না।

পাঁড়েজী বললে—কিন্তু ও তো নিজেই বললে ওর নাম রাজুবালা—

সদানন্দ বললে—রাজুবালা হোক, আর যা-ই হোক, আমি ওকে কালীগঞ্জের বউ বলে ডাকি, ওই বলে ডেকে আমি সুখ পাই পাঁড়েজী, আমি যদি সুখ পাই ওই বলে তাহলে তুমি কেন আপত্তি করছো? জানো পাঁড়েজী, পৃথিবীতে যাদেরই কেউ দেখবার নেই তারা সবাই-ই হলো কালীগঞ্জের বউ।

বলে পাশের লোকটার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর কী হলো মহেশ?

মহেশ একপাশে চোরের মতন দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বলতে লাগলো—তারপর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর বড়দাদাবাবু এ-বাড়িতেই এসে উঠেছেন।

—আর কাকীমা?

—তাঁর কথা আর বলবেন না দাদাবাবু, বড় কষ্ট তাঁর। এককালে মা'র কথাতেই সংসার চলতো, এখন চলে বাতাসীর কথায়। বাতাসীকে চেনেন তো? সেই যে বড়দাদাবাবুর মেয়েমানুষ?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ তা চিনি—

—আর সেই সঙ্গে আমাদেরও হয়েছে যত হেনস্থা। বউদি এখন কেউ নয়, মা'ও এখন কেউ নয়, এখন সেই রাক্ষুসীটাই হয়েছে বাড়ির গিন্নী। দেখুন মানুষের কী নিয়তি! বাবু অত করে যা ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন, এখন কিনা তাই-ই সত্যি হলো!

—আর তোমার বউদি? তিনি কেমন আছেন?

মহেশ বললে—তিনি বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন তা কারো জানবার উপায় নেই, তবে আগেও যেমন ঘর থেকে বেরোতেন না, এখন আরো তেমনি। দিন-দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছেন—

তারপর একটু থেমে বললে—এখন আমি যাই দাদাবাবু, পরে আবার আসবো—

সদানন্দ বললে—আমি তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে ডেকেছিলুম মহেশ, সেই নবাবগঞ্জে গিয়েছিলে তুমি, সেখানকার কথা আমার আরো জানা দরকার, সেদিন সব কথা তাড়াতাড়িতে শোনা হয়নি, এখন বলো তো সেখানে গিয়ে কী দেখেছিলে তুমি—

মহেশ বললে—সবই তো বলেছিলুম আপনাকে, বলেছিলুম যে সেখানে কেউই নেই, আপনার কর্তাবাবু মারা গিয়েছেন, আপনার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—

—তাই নাকি? আগে তো তুমি তা বলোনি! কী জন্যে তাড়িয়ে দিয়েছে? কেন তাড়িয়ে দিয়েছে?

—গাঁয়ের লোক যা আমাকে বললে তাই-ই আমি আপনাকে বলছি। আমি তো আর

নিজের চোখে কিছু দেখিনি। সে নাকি গাঁয়ের সমস্ত লোক দেখেছে!

সদানন্দ বললে—তা কী করেছিল নয়নতারা?

—আজ্ঞে শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। গাঁ-সুদ্ধ লোক নাকি এসে জড়ো হয়েছিল আপনাদের বাড়িতে। সব লোক মজা দেখতে ছুটে এসেছিল। শেষ-কালে কান্নাকাটি ঝগড়া কিছু আর বাকি ছিল না। লজ্জায় আপনার মা মারা গেছেন, আর আপনার বাবাও দেশত্যাগী হয়েছেন—

—দেশত্যাগী হয়েছেন।

—হ্যাঁ, দেশত্যাগী হয়ে সুলতানপুরে আপনার দাদামশাই-এর দেশে গেছেন।

সদানন্দ কী যেন ভাবতে লাগলো! সেই সব পুরোন কথাগুলো একে একে সব মনে পড়তে লাগলো তার।

সেই তার জন্মভূমি, সেই তার নয়নতারা। এতকাল এই কলকাতার বউবাজারে আর এই বড়বাজারের ধর্মশালাটার মধ্যে থেকে নবাবগঞ্জের কথা সে প্রায় ভুলতেই বসেছিল। শুধু মাঝখানে একদিন নয়নতারার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফরমে। তাও কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু সেই একমুহূর্তের দেখাই যেন এখনও তার জীবনে এখন অক্ষয় হয়ে রয়েছে, এই এতদিন পরেও।

খানিকক্ষণ পরে বললে—মহেশ, এবার তোমাকে আর আটকাবো না, তুমি যাও—তোমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে—

মহেশ বললে—হ্যাঁ, পরে আবার একদিন আসবো দাদাবাবু, আজ যাই—

সদানন্দ বললে—পরে হয়ত আর আমাকে পাবে না এখানে, এমনিতেই আমার শরীর খারাপ। এই দেখ না, আমি তো কদিন খুব জ্বরে ভুগে উঠলুম—

পাঁড়েজী এতক্ষণ সব কথা শুনছিল পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বললে—বোখারে ভুগলেন তো আপনারই নিজের দোষে, ঠাণ্ডা লাগলে বোখার হবে না?

মহেশ তখন চলে গেছে। তার বাড়িতে নতুন মনিবের তখন অনেক হুকুম, অনেক হাঁক-ডাক।

সদানন্দ বললে—সত্যিই আমি আর থাকবো না এখানে পাঁড়েজী, কাল ভোরবেলা আমি একবার দেশে যাবো—

—দেশে যাবেন? কিন্তু আপনার ছেলে-পড়ানো? তারা কী বলবে? তাদের খবর দিয়েছেন?

সদানন্দ বললে—তারা বড়লোকের ছেলে, আমি না পড়ালে তারা আর একজন মাস্টার যোগাড় করে নেবে। কিন্তু কাল ভোরের গাড়িতে আমাকে দেশে যেতে হবেই।

বলে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগলো সে। এক মুহূর্তে সে যেন—কলকাতা থেকে একেবারে সোজা নবাবগঞ্জে চলে গেছে। একেবারে সোজা সেই চৌধুরীবাড়িতে। সমস্ত পাড়ার লোক জড়ো হয়েছে। সকলে ঘিরে ধরেছে নয়নতারাকে। নয়নতারা চৌধুরী-বংশের সম্মান ধুলোয় লুটিয়েছে, নয়নতারা চৌধুরী-বংশের মুখে কালি মাখিয়েছে, এ অপরাধের ক্ষমা নেই। সবাই বলছে এ অপরাধের জন্যে তাকে শাস্তি দাও, তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও, তাকে অপমান করে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।

রাত্রে সদানন্দ ধর্মশালার ঘরটার ভেতরে শুয়ে শুয়েও ছট্‌ফট করতে লাগলো। বহুদিন ধরে তার মনে হয়েছিল সে বুঝি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। সংসারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন, এমন কি নিজের বন্ধন থেকেও সে পরিত্রাণ চেয়েছে। নিজেরও তো একটা প্রয়োজন বলে বস্তু আছে। নিজের প্রয়োজনের বন্ধনটাই মানুষের সব চেয়ে বড় বন্ধন। যে

নিজেকে অস্বীকার করতে পেরেছে তার কাছে তো প্রয়োজনটা আর কোনও বন্ধন নয়। সদানন্দ এতদিন কামনা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে, ক্ষুধা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে আঘাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে। সে চেয়েছে আঘাত পেতে। আঘাত পেয়ে আঘাতের ঊর্ধ্বে উঠতে। কিছু না পেয়ে সব পাওয়ার পরিতৃপ্তি পেতে। নিজের উপার্জিত অর্থ সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতে চেয়েছে সে, যাতে অর্থ না-থাকার যন্ত্রণা সে উপলব্ধি করে। শীতের কাপড় পরকে বিলিয়ে দিয়েছে যাতে শীত পাওয়ার কষ্টটা সে উপভোগ করতে পারে। লোভ, সুখ, সৌভাগ্য থেকে সে দূরে থাকতে চেয়েছে। সংসার থেকে বনে পালিয়ে গিয়ে নয়, সংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে সে সংগ্রাম করতে চেয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই সে এতদিন এখানে-ওখানে কাটিয়েছে।

কিন্তু সেদিন সেই ধর্মশালাটার ঘরখানার মধ্যে রাত জেগে জেগে আত্ম-সমালোচনা করতে করতে তার মনে হলো সে হয়ত ভুল করেছে। এ হয়ত তার জীবনের যোগ-বিয়োগের ভুল। এ ভুল শোধরাতে হবে।

সদানন্দ পাশের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকতে লাগলো—পাঁড়েজী—পাঁড়েজী—

পাঁড়েজী অনেক রাত থাকতেই ঘুম থেকে ওঠে। উঠে গঙ্গায় নিয়ে স্নান করে আসে। তখন অন্ধকার থাকে চারিদিক। তখন সে গলা ছেড়ে গঙ্গা-স্তোত্র আওড়ায়।

হঠাৎ সদানন্দর নজরে পড়লো গঙ্গাস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে পাঁড়েজী রাস্তা থেকে ধর্মশালায় ঢুকছে।

সদানন্দকে দেখেই পাঁড়েজী বললেন—এত ভোরে কোথায় যাচ্ছেন—বাবুজী, ঠাণ্ডা লাগবে যে—

সদানন্দ বললে—আমি আজ ভোরের ট্রেনেই দেশে যাবো পাঁড়েজী, আমাকে ক'টা টাকা দিতে পারো?

—দেশ? কোথায় আপনার দেশ বাবুজী?

—নবাবগঞ্জ।

—নবাবগঞ্জ? সে কোথায়? কত দূর?

সদানন্দ বললে—সে তুমি চিনবে না পাঁড়েজী, সে এখান থেকে বেশি দূর নয়। এক পিঠের ট্রেন ভাড়া চার টাকার মতন পড়বে। আর বাকিটা হেঁটে চলে যাবো।

—কবে ফিরবেন?

সদানন্দ বললে—দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবো। আমাকে দশটা টাকা দিলেই চলবে—

পাঁড়েজী ঘর থেকে একটা দশ টাকার নোট এনে সদানন্দর হাতে দিলে। সদানন্দ টাকাটা নিয়েই বাইরে চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে পাঁড়েজী বললে—এখ্‌খুনি চলে যাচ্ছেন?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, এখান থেকে সোজা শেয়ালদা স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে, তারপর ভোর পাঁচটার সময় ট্রেন ছাড়বে—

বলে সদানন্দ অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়ালো। ঘড়িতে তখন বোধ হয় ভোর চারটে। চারদিকে তখনও রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। তবু অত ভোরেও অনেক লোক রাস্তায় বেরিয়েছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। হাড়ের ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সদানন্দর মনে হলো তা হোক, তার যত কষ্টই হোক, যত শীতই করুক, এতে ভয় করলে চলবে না, এতে থেমে গেলে চলবে না, এতে হতাশ হলেও চলবে না। বাধা যত আসে তত মঙ্গল, কাঁটা যত ফোটে ততই সুখকর। এ পথের শেষে যা আছে তার দিকে লক্ষ্য স্থির

রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। পথটাও সত্যি, পথের শেষটাও সত্যি। এই পথটাকে অতিক্রম না করতে পারলে তো আর সে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছোতে পারছে না। হোক, তার আরো কষ্ট হোক, আরো যন্ত্রণা! তার নিজের যন্ত্রণা একদিন সকলের কল্যাণ হয়ে সকলকে অভিষিক্ত করুক, এইটেই তার ভরসা, এইটেই তার আকাঙ্খা!

নৈহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ানোর খানিকক্ষণ পরেই ডাউন ট্রেনটা আসে। তখন হুড়-হুড় করে যে যে কামরায় পারে টপ্‌টপ্ করে উঠে পড়ে। আগে স্টেশনটা ছিল ছোট, পরে বড় হয়েছে। প্ল্যাটফরমও অনেকগুলো। দিনে দিনে লোকও বেড়ে যাচ্ছে। শহরও বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের সংখ্যাও যেন হু-হু করে বেড়ে চলেছে।

বেহারি পালের বউ বলেছিল—তা আজকেই যাবে কেন বাবা? এতদিন পরে এলে, দু'দিন দেশে থাকো না—

সদানন্দ বলেছিল—কোথায় থাকবো?

বেহারি পাল মশাইও বলেছিল—কেন, আমরা কি তোমার পর? আমাদের বাড়িতেও থাকতে পারো।

কিন্তু সদানন্দর তখন আর থাকবার ইচ্ছে ছিল না। বললে—না। আর থাকা চলবে না আমার এখানে—

বেহারি পালের বউ বললে—শেষকালের দিকে বড় কষ্ট হয়েছিল বাবা নয়নতারার। সে কাণ্ড এ গাঁয়ের সবাই দেখেছে। তা নয়নতারার আর দোষ কী বলো? ওই বউ যে এতদিন অত সহ্য করেছে, সেইটেই এক অবাক কাণ্ড—

সদানন্দ সব ঘটনাই শুনেছিল। বললে—তারপর?

বেহারি পালের বউ বললে—তারপর তোমার দাদামশাই চেপে ধরলেন তোমার বাবাকে। তারক চক্কোত্তি মশাইও বললেন—চৌধুরীবাড়ির বউকে এমন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। আমরা পাঁচজনা বিচক্ষণ মানুষ থাকতে এ আমরা হতে দেবো না।

তারপর রজব আলির গাড়ি জোড়া হলো। পাড়ার সব মানুষ ভিড় করে উঠোনে তখনও দাঁড়িয়ে। যারা কেষ্টনগরের ভট্টাচার্যি মশাই-এর কাছ থেকে মেয়ে-জামাই-এর জন্যে জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল তারা তখন বাসি মুখে জলটুকু পর্যন্ত না দিয়ে আবার সেই খালি থালা-বারকোশ নিয়ে চলে গেছে। অমন অলুক্ষণে কাণ্ড নবাবগঞ্জে কেউ কখনও দেখেনি। তারপর নয়নতারা এসে উঠোনে দাঁড়ালো। আমি দেখলুম নয়নতারা একটা বেনারসী শাড়ি পরেছে। বাড়ির বউ বাপের বাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু গায়ে একটা গয়না পর্যন্ত নেই। যা দু'চার গাছা সোনার চুড়ি হাতে ছিল তাই-ই শুধু তখন হাতে রয়েছে।

আমি গিয়ে বললুম—এ কী বউমা, তুমি গয়না পরলে না কেন? তোমার গয়না-টয়না সব কোথায় গেল?

নয়নতারা আমার দিকে চাইলে। তার চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করছে।

বললে—দিদিমা, আসল জিনিসেই যখন ফাঁকি তখন আর গয়না নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো?

বলে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো নয়নতারা। উঠোনে তখন অনেক লোকের ভিড়।

সে-সব কোনও দিকেই তখন আর তার ভ্রূক্ষেপ নেই। একেবারে লোকের ভিড় ঠেলে সোজা কুয়োতলার দিকে চলে গেল। সেখানে মাটির জালায় জল ছিল ঘটি করে সেই জল নিয়ে মাথার সিঁথিতে ঢালতে লাগলো।

গোপালের মা ছিল দাঁড়িয়ে। সে তো দৌড়ে গিয়ে বউমার হাত দুটো ধরে ফেলেছে। বললে—করছো কী বউমা, করছো কী? সিঁদুর ধুয়ে ফেলছো কেন?

কিন্তু কে আর কার কথা শোনে তখন? নয়নতারা এক হাতে ঘটি করে তখন নিজের সিঁথির ওপর জল ঢালছে, আর এক হাতে সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে তুলে ফেলছে। সিঁথিটা একেবারে বিধবার মত সাদা করে তবে ছাড়লে।

আমিও আর থাকতে পারলুম না। বললুম—করছো কী বউমা, করছো কী?

আর আমিও নয়নতারার হাতটা চেপে ধরবার চেষ্টা করতে গেলাম। কিন্তু নয়নতারা এক ধাক্কায় আমার হাত সরিয়ে দিলে।

বললে—আমাকে বাধা দেবেন না দিদিমা—

আমি বললাম—এয়োতির চিহ্ন হলো সিঁদুর, ও কি মুছতে আছে বউমা, ওতে যে তোমার অকল্যেণ হবে—

নয়নতারা রেগে উঠলো—অকল্যাণের আর কতটুকু বাকি আছে দিদিমা যে অকল্যাণকে ভয় করবো?

বললাম—কিন্তু তুমি শুধু তোমার অকল্যাণের কথাই বা ভাবছো কেন বউমা, সদানন্দর অকল্যাণের কথাটাও তো ভাবতে হয়!

নয়নতারা বললে—তা তিনিই কি আমার কথা কখনও ভেবেছেন যে আমি তাঁর কথা ভাববো?

বলে আর এক কাণ্ড করে বসলো নয়নতারা। পেতলের ঘটিটা দিয়ে দু' হাতের দু'টো শাঁখা দুম্ দুম্ করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে ফেললে, আর তারপর হাতের নোয়াটা খুলে মুচড়ে বাগানের ঝোপের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

ফেলে দিয়ে বললে—এবার এ আপদগুলো ঘুচলো দিদিমা, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন এ ভড়ং আর কখনও জীবনে না পরতে হয়—

আশপাশের লোক তখন সবাই স্তম্ভিত হয়ে নয়নতারার কাণ্ড দেখছে। নয়নতারা আর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা রজব আলির গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

আমি আর কী বলবো, আর কে-ই বা তখন কী বলবে।

জীবনে অনেক কাণ্ড দেখেছে বেহারি পালের বউ। আর শুধু বেহারি পালের বউ-ই বা কেন? বেহারি পাল নিজেই কি কিছু কম দেখেছে? কে কম দেখেছে এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে? তারক চক্রবর্তীও তো বুড়ো মানুষ। অনেক কিছু কাণ্ড দেখা আছে তার। গোপালের মা, চৌধুরি মশাই-এর গিন্নি, চৌধুরী মশাই, প্রাণকৃষ্ণ সা' কেউই কোনও বউএর এমন কাণ্ড আগে কখনও কোনও সংসারে ঘটতে দেখেনি, শোনেও নি।

রজব আলির গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। গৌরীপিসী গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু নয়নতারা তাকে গাড়িতে উঠতে দিলে না। বললে—না, তোমাকে আর উঠতে হবে না গাড়িতে, আমার সঙ্গে এসে আর ভড়ং করতে হবে না—

গৌরীপিসী আর এগোল না। কিন্তু পেছনে-পেছনে চলতে লাগলো কৈলাস গোমস্তা।

তারক চক্রবর্তী মশাই বলে দিলে—কৈলাস, তুমি বাবা আমাদের বউমাকে একেবারে কেষ্টনগরে ওর বাবার হাতে তুলে দিয়ে তবে ফিরে আসবে, বুঝলে?

কৈলাস গোমস্তা কথাটা বুঝলো কিনা তা বোঝা গেল না। সে তখন গাড়ির পেছন-

পেছন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

বেহারি পালের বউ কথা বলতে বলতে কেঁদে ভাসিয়ে ফেললে। বললে—তারপর বউমার কথা কত ভেবেছি বাবা, ভেবেছি গিয়ে একবার দেখা করে আসি, তা কোথায়ই বা যাবো, আর কোথায় গেলেই বা বউমার সঙ্গে দেখা হবে, তাও বুঝতে পারিনি। তারপর এখন তো তোমাদের বাড়ির এই হাল দেখলে, ওদিকে চেয়ে দেখলেও কান্না পায়। তোমার মা মারা যাওয়ার পর ও-বাড়ির দিকে আর চেয়েই দেখিনি আমি—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সদানন্দ উঠলো।

দিদিমা বললে—উঠছো কেন বাবা? কোথায় যাচ্ছো?

সদানন্দ বললে—এবার যাই দিদিমা—

দিদিমা বললে—এতদিন পরে যদি ফিরে এলে তো আবার চলে যাচ্ছো কেন বাবা? দু'টো দিন না হয় থাকলেই এখানে—

সদানন্দ বললে—থাকলে আমার চলবে না দিদিমা—

দিদিমা বললে—কী এমন তোমার কাজ যে দু'টো দিনও থাকতে পারবে না? তুমি আজকাল কী করছো? কোথায় আছো?

সদানন্দ বললে—থাকার আমার কোনও জায়গাই নেই দিদিমা, যখন যেখানে থাকি তখন সেইটাই আমার থাকবার জায়গা।

দিদিমা বললে—ধন্যি বাপ বটে হয়েছিল তোমার। তবে তোমাকে বলি বাবা, রেল-বাজারের আড়তদার প্রাণকেষ্ট সা' মশাই আছেন, তার কাছেই তোমার বাবা এই তোমাদের সব সম্পত্তি-টম্পত্তি বেচে দিচ্ছেন। তোমার দাদামশাই নিজে কিছু জমি-বাগান কিনতে চেয়েছিলেন, তা তোমার বাবা কী বললেন, জানো, বললেন—আমি মিনিমাগ্না লোককে বিলিয়ে দেব, তবু আপনাকে আমি এসব কিছুই বেচবো না। তা আমাদেরই ওপর চৌধুরী মশাইএর যত রাগ, তা জানো বাবা!

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কেন, [illegible]দের ওপর বাবার রাগ কেন?

—ওই যে, নয়নতারার হয়ে আমি [illegible]থা বলতুম। আমরা যে বলতুম বউমার ওপর কেন এত হেনস্তা করছেন! বউমা পাছে আমার কাছে আসে তাই শেষের দিকে তাকে আটকে রাখতো তোমার মা, তা জানো—

সদানন্দ আর শুনলো না। এবার সত্যিই ঘরের বাইরে এসে দাঁড়লো। তার মনে পড়তে লাগলো বহুদিন আগে এই নবাবগঞ্জ থেকেই একদিন যাত্রা শুরু করেছিল সে। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় একদিন এই চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল সে। তারপর ছোটবেলার আদর-আনন্দর মধ্যে কখন কোন্ ফাঁকে একটা দার্শনিক মনের জন্ম হয়েছিল তা সে নিজেও জানতো না। সেই মনটা সুখে-স্বস্তিতে শান্তি পেত না, দুঃখে-বেদনায় ক্লান্ত হতো না। কেবল খুঁজে বেড়াতো নিজের ভেতরের নিজেকে। নিজের সেই অদৃশ্য অন্তরাত্মাকে। তাকে সে দেখতে পেত না কখনও। তবু তাকে উদ্দেশ্য করে বলতো—আমাকে বলে দাও কেমন করে আমি তোমাকে পাবো, কেমন করে আমি আমার সমস্ত জটিল-কুটিল প্রশ্নের সমাধান করবো?

কিন্তু সদানন্দর এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

কেষ্টনগরের সেই ঠিকানার কথাটা মনে ছিল সদানন্দর। বহুদিন আগে একদিন নয়নতারার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সেই বাড়িটাতে। সেই বিয়ের ঘটনার কথাটা ভাবতেও যেন তার আতঙ্ক হলো। তার জীবনের এক মহা বিপর্যয় বুঝি সেটা।

—আচ্ছা কালীকান্ত ভট্টাচার্য বাড়িতে আছেন?

রাস্তা দিয়ে একজন যাচ্ছিল। সদানন্দ তাকেই ডাকলে। বললে—এইটেই তো কালীকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি না? এখানকার কলেজের মাষ্টার মশাই?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো নেই—

—নেই?

—না, তিনি তো বছর দুয়েক হলো মারা গেছেন। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—মারা গেছেন?

সদানন্দ কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতন সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তাহলে? তাহলে নয়নতারা কোথায় আশ্রয় পেলে? নবাবগঞ্জ থেকে হাতের শাঁখা ভেঙে সিঁথির সিঁদুর মুছে চলে এসে কোথায় গিয়ে উঠলো? তাহলে কাকে আশ্রয় করে সে বাঁচবে? আশ্চর্য, সদানন্দ নিজের মনেই হেসে উঠলো। নয়নতারার জন্যে সে নিজেই তো দায়ী, অথচ সে-ই কিনা তার দুর্ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে!

তবু সদানন্দ স্থির থাকতে পারলে না। ভদ্রলোক তখন অনেক দূরে চলে গেছে। সদানন্দ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেল। বললে—আচ্ছা কালীকান্ত ভট্টাচার্যের এক মেয়ে ছিল, তার কি হয়েছে বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন—সে মেয়ের তো নবাবগঞ্জে না কোথায় বিয়ে হয়েছিল, বোধহয় তার শ্বশুরবাড়িতেই আছে। সে মেয়ে এখানে নেই—

সদানন্দ বুঝলো ভদ্রলোক বেশি কিছু জানেন না। তাঁকে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা বৃথা। ভদ্রলোক যেদিকে যাচ্ছিলেন সেইদিকেই আবার চলতে লাগলেন। সদানন্দ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না।

তারপর আস্তে আস্তে আবার স্টেশনের দিকে চলে এল। তার প্রতিশোধ নেবার প্রচেষ্টার যে এই পরিণতি হবে তা কে জানতো! অথচ কী-ই বা সে করতে পারে! নয়নতারার সঙ্গে দেখা হয়নি ভালোই হয়েছে। দেখা হলে কী-ই বা সে বলতো! বড় জোর বলতো—আমায় তুমি ক্ষমা কোর—

যেন কাউকে ক্ষমা করতে বললেই কেউ ক্ষমা করে! যেন ক্ষমা করার ক্ষমতাই সকলের আছে! যেন ক্ষমা করার মত অপরাধ সদানন্দ করেছে!

তারপর কলকাতার ট্রেনটাতে উঠে এক কোণে নিজের আশ্রয় করে নিলে সে। আসবার সময় পাঁড়েজীকে বলে এসেছিল দু' একদিনের মধ্যে সে ফিরবে। অথচ তার আগেই যে তাকে কলকাতায় ফিরতে হবে তা কি সে তখন নিজেই জানতো!

নৈহাটি স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছোবার আগেই গাড়ির ভেতরে হই-চই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নৈহাটির আগের স্টেশনে একটা থার্ড ক্লাস কামরার এক কোণে একজন প্যাসেঞ্জারকে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছিল সবাই। অত শীতের মধ্যেও লোকটার গায়ে কোনও গায়ের কাপড় ছিল না। অনেকক্ষণ ধরেই লোকটা থর-থর করে কাঁপছিল। তারপরেই হঠাৎ কী যেন হলো। লোকটা সেইখানেই বেঞ্চি থেকে টলে নিচের মেঝেতে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা শোরগোল উঠলো গাড়িতে।

—কী হলো মশাই? লোকটা কি পড়ে গেল নাকি?

পাশের লোকটা তখনো বিস্ময়ের চমক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এতক্ষণে তার মুখে কথা ফুটলো।

বললে—কী জানি, আমি তো বুঝতেই পারিনি আগে, ভদ্রলোক আপন মনে এতক্ষণ তো চোখ বুঁজে বসে ছিলেন—

মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল সদানন্দর। কপালের সেই চোট-লাগা

জায়গাটা দিয়ে তখন ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছিল।

—আর কেউ আছে ভদ্রলোকের সঙ্গে?

না, কেউ নেই। কে আর থাকবে সদানন্দর! পৃথিবীতে সদানন্দদের মত মানুষদের হয়ত কেউই থাকে না। কেউ থাকবার জন্যে সদানন্দর মত মানুষদের হয়ত জন্মই হয় না। কেউই যদি থাকবে তার তাহলে মানুষের মুক্তি কী করে আসবে? কী করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? সদানন্দের কেউ যদি থাকতো তাহলে তো পৃথিবীর এগিয়ে চলা কবে থেমে যেত!

ট্রেনটা নৈহাটি স্টেশনে পৌঁছুতেই একজন বললেন—এখানে ওঁকে নামিয়ে দিন মশাই, গার্ডকে খবর দিন, ডাক্তার হাসপাতাল যা হোক সবই আছে নৈহাটিতে—

তখন অফিস টাইম। অফিসযাত্রী প্যাসেঞ্জাররা নৈহাটি স্টেশনের প্লাটফরমে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তৈরি হয়ে। কিন্তু ট্রেনটা এসে থামতেই গার্ডের কাছে খবর চলে গেছে। খবর চলে গেছে যে একজন প্যাসেঞ্জার গাড়ির ভেতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। গার্ডের কাছে ফার্স্ট-এড-এর বাক্স আছে। সামান্য ব্যাপার হলে গার্ড সাহেব নিজেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে।

অন্য প্যাসেঞ্জাররা তখন ট্রেনে ওঠবার জন্যে ব্যস্ত-ব্যতিব্যস্ত। তার ভেতর থেকে কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে সদানন্দকে কামরা থেকে নামিয়ে আনলে। স্টেশন মাস্টার নিজে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে ভিড় জমে গেল।

গার্ড বললে—এখুনি হস্‌পিট্যালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন মাস্টার মশাই, আমার মনে হয় কেসটা সিরিয়াস—

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন মহিলা সামনে এগিয়ে এল। সদানন্দর দিকে চেয়ে দেখেই বললে—এঁকে আমার কাছে দিন, আমি এঁর দেখাশোনা করবো—

সবাই মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, বিবাহিতা মহিলা। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। বোঝা যাচ্ছে অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছিলেন। ডেলি-প্যাসেঞ্জার। অনেকের মুখ চেনা।

স্টেশন মাস্টারও দেখেছেন মহিলাটিকে। চিনতে পারলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কেউ হন নাকি ইনি?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ, ইনি আমার....আমার আত্মীয়—আমি এঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।

—আপনি এই নৈহাটিতেই থাকেন?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ—

স্টেশন মাস্টার আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম?

—আমার নাম নয়নতারা। নয়নতারা ব্যানার্জি।

—ইনি আপনার কী রকম আত্মীয় হন্?

—আমার খুব নিকট-আত্মীয়। আপনি দয়া করে শুধু একটা স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে দিন, শিরগির, দেরি করবেন না—খুব তাড়াতাড়ি...

সদানন্দর জীবনে সে এক মহা সংগ্রামের সময়। সংগ্রাম সারা জীবনই সে করেছে। সে কেবল সংগ্রাম করেছে আর বারে বারে সংগ্রামকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর একটা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সংগ্রাম কি শুধু বাইরের সঙ্গে? বাইরের সঙ্গে যে-সংগ্রাম সে তো সহজ সংগ্রাম। কিন্তু ভেতরের সঙ্গে যে-

সংগ্রাম সেই সংগ্রামই কঠোর। সেই কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েই সে সেদিন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন নবাবগঞ্জ থেকে বেরিয়ে যখন সে কেষ্টনগরে গিয়েছিল তখন ভেবেছিল সে শুধু একবারের জন্যে নয়নতারার সঙ্গে দেখা করবে। দেখা করে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে। শুধু বলবে যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো—

ক্ষমা! মুখের ক্ষমা যে ক্ষমা নয় তা কি সদানন্দ জানতো না? ক্ষমা সকলকে করাও যায় না, আবার সকলের কাছে ক্ষমা চাওয়াও যায় না। হাজার অপরাধের পরও যে ক্ষমা চায় তার ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই, কিন্তু তবু তারপরেও যে ক্ষমা করে তার ক্ষমা করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। কিন্তু সদানন্দ কি আশা করেছিল নয়নতারা তাকে ক্ষমা করবে!

সেদিন চৌধুরী মশাইএর ঘুমই হয়নি সারা রাত। ভোরের দিকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা। আগে দীনু আসতো সকাল বেলা চা দিতে। চা খাবার খানিক পরে পরমেশ মৌলিক এসে পড়তো। তারপর একে একে প্রজা-পাঠক-খাতক-দেন্‌দার এসে হাজির হতো। চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমস্ত জমিদারি তদারকি কাজটা হয়ে যেত। কোন ক্ষেতে লাঙল পড়বে, কোন খামারের ছোলা মাড়াই হবে, কোন ফসল আড়তদারের কাছে পাঠাতে হবে তার হুকুম দিয়ে দিতেন তিনি। তারপর হয়ত ওপরে ডাক পড়তো কর্তাবাবুর ঘরে। সেখানে গিয়েও বৈষয়িক কাজ। বৈষয়িক কাজটাই ছিল তাঁর জীবন। ছোট বেলা থেকে বৈষয়িক কাজে হাত পাকিয়ে পাকিয়ে সে-কাজে তাঁর নেশা লেগে গিয়েছিল।

তারপর যখন বেলা দুপুর হতো তখন দীনু ডাকতে আসতো চান করবার তাগাদা দিতে। কুয়োতলায় দীনু জল তুলে দিত বড় মাটির গামলায়। দীনু তাঁকে তেল মাখিয়ে দিত। তারপর তিনি ঘটি করে মাথায় জল ঢালতে শুরু করতেন। তখন ভাত খাবার পাট। গৌরী সামনে ভাতের থালা এনে বসিয়ে দিত। তখনই যা একটু বিশ্রাম তাঁর। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করতেন—খোকা কোথায়, খোকা? খোকা খেয়েছে?

প্রীতি বলতো—সে কি আর বাড়িতে আছে? সে তো রানাঘাটে গেছে—

চৌধুরী মশাই বলতেন—রানাঘাটে? রানাঘাটে গেছে কেন? কার সঙ্গে গেছে?

প্রীতি বলতো—প্রকাশের সঙ্গে গেছে, রামনবমীর মেলা দেখতে—

প্রকাশের সঙ্গে সদানন্দ রানাঘাটে রামনবমীর মেলা দেখতে যায় এটা চাইতেন না চৌধুরী মশাই। কিন্তু তাঁর কথা আর কে শুনবে! শুধু বলতেন—কখন আসবে?

প্রীতি বলতো—প্রকাশের সঙ্গে যখন গেছে তখন তুমি ভাবনা করছো কেন, সে তো আর জলে পড়ে নেই—

আর তখন থেকেই চৌধুরী মশাই জানতেন জিনিসটা ভালো হচ্ছে না। কিন্তু উপায় নেই। ছেলের ওপরে তাঁর যতখানি অধিকার আছে তার স্ত্রীরও ঠিক ততখানি। স্ত্রী যদি চায় যে ছেলে ওই সবই করুক তবে তাই হোক। কাছারির কাজ-কর্ম শিখে দরকার নেই। সংসার জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাক। তিনি যতদিন আছেন ততদিনই সংসার আছে, তারপর তিনি যখন থাকবেন না তখন যা হবে, তা তো আর তিনি দেখতে আসছেন না। এই সব ভাবতে ভাবতেই তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তেন।

প্রীতি বলতেন—ওমা উঠে পড়লে যে, দুধ খেলে না?

সে-সব দিন কোথায় গেল! তিনি ভেবেছিলেন এক-রকম আর হলো আর এক-রকম। সেই ছেলেই বা কোথায় গেল আর সেই স্ত্রীই বা কোথায় চলে গেল! তারাই তাঁর আগে চলে গেল। এই যে তিনি সকাল থেকে চা-ও পেলেন না এক বাটি, এ কেউ দেখবারও নেই আজ। কাল রেল-বাজারের আড়তদার সা' মশাই জলের দরে সমস্ত কিছু কিনে নিয়েছে। সদরে গিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধি করে প্রকাশকে ভাগলপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাই রক্ষে, নইলে সে বড় গণ্ডগোল করতো। আজ যে এ-বাড়িতে তিনি এখনও বাস করছেন এটা তাঁর বে-আইনী কাজ। সা' মশাই অবশ্য কিছু বলবে না। আরো কিছু দিন তিনি এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু এ এখন সা' মশাইএর বাড়ি। আইনত এখানে থাকবার অধিকারও তাঁর নেই আর।

বারোয়ারিতলায় বোধ হয় সমস্ত রাতই কবিগান হয়েছে। তাই সকাল বেলার দিকে সব ঠাণ্ডা। চৌধুরী মশাই বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দার দিকে এলেন। দু'দিন আগের স্বপ্নটার কথা মনে পড়লো। আশ্চর্য, হঠাৎ জেগে জেগে অমন স্বপ্নটাই বা দেখতে গেলেন কেন? কালীগঞ্জের বউ এখানে আসতে যাবেই বা কেন, আর কী করেই বা আসবে? যে-মানুষ মারা গেছে সে-মানুষ কখনও বেঁচে উঠতে পারে! বংশী ঢালী তো তাকে চিরকালের মত শেষ করে দিয়েছে। তার সঙ্গের পালকি-বেহারাদের পর্যন্ত তো রেহাই দেয়নি সে। তবে? তবে কেন তিনি ভয় পেয়েছিলেন অমন করে? কেন তিনি অমন করে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

কালীগঞ্জের বউএর সেই কথাগুলো তাঁর কানে বাজতে লাগলো। কালীগঞ্জের বউ ওই উঠোনে দাঁড়িয়ে একদিন বলে গিয়েছিল—আমি এই শাপ দিয়ে গেলাম নায়েব মশাই, আমি যদি বামুনের মেয়ে হই তো একদিন আমার শাপ ফলবেই, দেখবে তুমি ঠিক নির্বংশ হবে—

ফাঁকা উঠোনটার দিকে চেয়ে চৌধুরী মশাই-এর একটা কথা মনে পড়লো। সত্যিই, কালীগঞ্জের বউ-এর সেদিনকার সেই অভিশাপ কি এমন করেই বর্ণে বর্ণে ফলতে হয়! এমন করে কর্তাবাবুর এমন সাধের সংসার নির্বংশ হতে হয়! সেদিন কি তিনিই ভাবতে পেরেছিলেন সেই বুড়ির কথাই একদিন নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি হবে!

একটু পরেই প্রকাশ এসে হাজির হলো। এই প্রকাশ, সেই যে একদিন চৌধুরী মশাইএর পিছু নিয়েছে সে বুঝি আর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে ছাড়বে না। হয়ত একেবারে তাঁকে নিঃশেষ করে তবেই তাঁকে রেহাই দেবে।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—সুলতানপুরের খবর কী?

প্রকাশ বললে—খবর ভালো, অশ্বিনী ভট্টাচার্যিকে খুব কষে বকে দিয়ে এলুম,—

—অশ্বিনী ভট্টাচার্যির কথা থাক, সে-কাজে তোমাকে পাঠিয়েছিলুম সে-কাজের কী হলো তাই বলো?

প্রকাশ বললে—সব ঠিক আছে দেখে এলুম, বিলের জমিতে এবার পাট ধান দু'টোই বুনেছে সিকদাররা।

—কিন্তু গেল সনের টাকাটা? টাকার কথা কী বললে?

—আজ্ঞে টাকা দিলে না।

—কেন? টাকা দিলে না কেন?

প্রকাশ বললে—বললে তোমার হাতে টাকা দেব না। যে মালিক তার হাতে টাকা দেব, তুমি কে? আমাকে এই রকম আরো কত কথা শোনালে। আমি বলে এলুম —আমিও তোমাকে দেখে নেব। এবার তোমার জমি খাস করে নেব তবে ছাড়বো—

চৌধুরী মশাই কিছু বললেন না। খানিক পরে বললেন—চলো, আজই সুলতানপুরে চলে যাবো আমি, এই সকালের ট্রেনে—

—সকালের ট্রেনে? তাহলে খাওয়া? দুটো ভাত চড়াবো?

চৌধুরী মশাই বললেন—আমার খাবার দরকার নেই, আমি খাবো না—

প্রকাশ অবাক হয়ে গেল। বললে—খাবেন না মানে? উপোস করে থাকবেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা একবেলা না হয় উপোসই করলুম, ক্ষতি কী?

—সে কী জামাইবাবু, আপনি না-হয় বুড়ো মানুষ উপোস করে থাকতে পারবেন, কিন্তু আমি? উপোস করলে যে কষ্ট হবে আমার। আমি কী উপোস করে থাকতে পারবো?

—খুব পারবে, খুব পারবে। আমি আর থাকবো না এখানে, আমার এখানকার কাজ সব মিটে গেছে। চলো—

—তার মানে?

—তার মানে আমি এ-বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি। আজ থেকে এ-বাড়ি রেল-বাজারের আড়তদার প্রাণকেষ্ট সা' মশাইএর।

প্রকাশ থমকে দাঁড়ালো। যেন বিশ্বাস করতে পারলে না কথাটা। জিজ্ঞেস করলে—আর জমি-জমা ক্ষেত-খামার?

—সমস্ত।

—সমস্ত বেচে দিলেন? কত টাকায় বেচলেন?

চৌধুরী মশাই চটে গেলেন। বললেন—সে-সব কথায় তোমার দরকার কী? আমি যদি লোকসান দিয়ে বেচি তো তোমার কী বলবার আছে?

প্রকাশ বললে—না, তা নয়, মানে বেহারি পাল মশাই আমাকে বলছিলেন কী না, বলছিলেন তিনি মোটা দর দিতে পারেন।

—মোটা দর? পাল মশাইএর বুঝি খুব টাকা হয়েছে? খুব টাকার গরম দেখাচ্ছে বুঝি? তাহলে তুমি পাল মশাইকে বলে এসো প্রকাশ যে আমি বরং সব জমি-জমা সরকারের খাস করে দেব তবু পাল মশাইকে দেব না, দশ লাখ টাকা দিলেও দেব না। দশ লাখ টাকা হয়েছে পাল মশাইএর?

প্রকাশ হতভম্বের মত চাইলে চৌধুরী মশাইএর দিকে। জামাইবাবু বলে কী! দশ লাখ! সে যে অনেক টাকা!

চৌধুরী মশাই বললেন—এই তো কাল সদা এসেছিল—

সদা? সদানন্দ? কোথায়? কখন?

—হ্যাঁ, কাল এখানে বারোয়ারিতলায় ওদের যাত্রা না কবিগান হচ্ছিল। সেই সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে এসেছিল।

—এসে কী বললে?

—কী আবার বলবে! আমি কী কিছু কথা বলতে দিয়েছি যে কথা বলবে? আমি দিয়েছি তাড়িয়ে!

প্রকাশ বললে—আপনি ঠিক দেখেছেন সদা এসেছিল? সেবার তো ওই রকম করে কালীগঞ্জের বউকেও এ-বাড়িতে আসতে দেখেছিলেন। ভুল দেখেন নি তো?

চৌধুরী মশাই তখন চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত। সারারাত ঘুম হয়নি, খাওয়া হয়নি। তারপর সদানন্দকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, মনটাও কেমন বিগড়ে ছিল। প্রকাশের কথায় আর কান দেবার সময় ছিল না তখন।

বললেন—চলো চলো, এখন ওসব কথা থাক—

প্রকাশ বললে—থাকবে কেন ওসব কথা, সদানন্দ এলো আর আপনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন? কোথায় গেল সে?

—কোথায় গেল তা কি আমি দেখতে গিয়েছি? দেখতে আমার বয়ে গেছে। সে কী আমার ছেলে? সে আমার শত্রু! তা কোথায় আর যাবে, তার যাবার জায়গা আছেই বা কোথায়? ওই পাল মশাইএর বাড়িতেই বোধ হয় গিয়ে উঠেছে। ওখানেই বোধ হয় খেয়েছে দেয়েছে—ওদের জন্যেই তো আজকে এই সব্বোনাশটা হলো আমার—

প্রকাশ বললে—যাই গিয়ে দেখে আসি সদা আছে কি না—

চৌধুরী মশাই বললেন—তা যাও, কিন্তু খবরদার বলছি, এখানে সদাকে ডেকে আনতে পারবে না, আমি তার মুখদর্শনও করবো না আর—

—আজ্ঞে না, তাই কখনও ডাকি? তার জন্যেই তো আমাদের এই হেনস্থা, তার জন্যেই তো আমার দিদি মারা গেল, তার জন্যেই তো আপনি জমিদারি বেচে দিলেন, আমি কি ভাবছেন জানি নে কিছু? ওকে খুঁজে বার করার জন্যে আমি কতবার কলকাতায় গেলুম, পুলিসকে কত টাকা ঘুঁষ দিলুম, আর সে কি না এখানে এসে হাজির হয়েছে—

বলে প্রকাশ দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে চৌধুরী মশাই বলে দিলেন —বেশি দেরি কোর না, এখ্খুনি আবার রওনা দিতে হবে।

ততক্ষণে প্রকাশ একেবারে সোজা পাল মশাইএর দোকানে গিয়ে হাজির। বেহারি পাল মশাই তখন সবে মাত্র তার দোকান খুলে বসেছে। তখনও ভালো করে ধুনো-গঙ্গা জল দেওয়া হয়নি। পেছনে ডাক শুনেই মুখ ফিরিয়ে দেখে শালাবাবু। বললে—কী শালাবাবু, কী খবর? কখন এলে আবার?

প্রকাশ বললে—পাল মশাই, শুনলাম সদা নাকি চলে এসেছে, আপনার বাড়িতে আছে? সে কোথায়?

পাল মশাই—সদা? সদা তো এসেছিল কাল। সে তো কাল রাত্তিরে ছিল আমার বাড়িতে, কিন্তু এখন সে তো নেই, সে চলে গেছে—

—চলে গেছে? কোথায় চলে গেল? কখন গেল?

পাল মশাই বললে—সে তো অনেকক্ষণ চলে গেছে। সে কি থাকবার ছেলে! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম কোথায় যাচ্ছো তা সে কথার কোনও উত্তরই দিলে না সে!

—তা তাকে একটু ধরে রাখতে পারলেন না আপনি? আপনি জানেন আমি তার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কলকাতায় গিয়ে পুলিসকে হাজার হাজার টাকা ঘুঁষ দিয়ে ধরবার চেষ্টা করছি, আর আপনি কিনা তাকে হাতের নাগালে পেয়ে ছেড়ে দিলেন? আর একটু আটকে রাখতে পারলেন না?

বেহারি পাল বললে—আরে তোমার ভাগ্নেকে আটকে রাখে, তেমনি সাধ্যি আছে কারো? তোমার জামাইবাবুর কাছে তো সদা গিয়েছিল, তা চৌধুরী মশাই তো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাকে—

তা তাড়িয়ে দেবে না? তাড়িয়ে দেওয়া কি অন্যায় হয়েছে? আপনিই বলুন না! ওই ছেলের জন্যেই তো আজ জামাইবাবুর এই হাল। নইলে যে-বাড়িতে এককালে লোক গম্ গম্ করতো সেই বাড়ি এখন শ্মশান হয়ে যায় এমন করে? ওই বাড়িতেই তো এককালে আপনারা গাঁ-সুদ্ধু লোক পাত পেতে খেয়ে এসেছেন, সে-সব কি কারো মনে নেই? তাই যে-ছেলের জন্যে এত কাণ্ড হলো, যে-ছেলের জন্যে দিদি মারা গেল, যে-ছেলের জন্যে বউমা জামাইবাবুর নামে এত কেলেঙ্কারি কথা রটালে সেই ছেলের মুখদর্শন কেউ করে?

কতখানি কষ্ট হলে বাপ হয়ে মানুষ ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় তা আপনারা বুঝতে পারলেন না?

পাল মশাই বললে—তা হাজার হলেও ছেলে বলে কথা, নিজের ছেলেকে অমন করে কেউ তাড়িয়ে দেয়? জানো, যখন বললুম যে বউমা চলে যাবার সময় মাথার সিঁদুর, হাতের শাঁখা ভেঙে ফেললে, তখন আর দাঁড়ালো না, তখন আর কিছুতেই থাকতে চাইলে না সদানন্দ, তখন সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল—

—তা ও-সব কথা আপনারা বলতে গেলেনই বা কেন?

—বলবো না? আমরা নিজের চোখে যা দেখেছি তা বলবো না? বউমার সঙ্গে কি তোমরা কেউ ভালো ব্যবহার করেছিলে?

এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে প্রকাশ আবার বাড়ি ফিরে এল। দেখলে ততক্ষণের মধ্যে চৌধুরী মশাই চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছেন।

প্রকাশকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো, সে আছে?

—আজ্ঞে না জামাইবাবু, নেই, চলে গেছে—

—ভালোই হয়েছে, চলো সা' মশাই-এর আসবার কথা আছে, চাবি দিতে হবে তাকে। চাবিগুলো তার হাতে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারবো—

দোতলার ঘরে চাবি-তালা দেওয়া হলো। একেবারে চিরকালের মত দেশ ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। দুজনেই নিচেয় নামলেন। সঙ্গে নিয়ে যাবার মত কিছুই নেই। যা দু-একটা খাট-বিছানা আলমারি-বাসনপত্র ছিল তা আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাকি যা পড়ে রইল তা পড়েই থাক। ওসব বোঝা। ওসব সুলতানপুরে অনেক আছে। আর কার জন্যেই বা নেওয়া! তিনি নিজেই বা কদিন বাঁচবেন? তিনি মারা যাওয়ার পর ওসব তো সাত ভূতে লুটে-পাটে খাবে।

তবু দেখতে ইচ্ছে হলো একবার। একতলায় নামলেন। পেছন-পেছন প্রকাশও আসতে লাগলো। মেঝের ওপর ধূলোর সর পড়েছে মোটা হয়ে। চলার পর স্পষ্ট পায়ের ছাপ পড়ছে। অন্দর-মহলের দরজাটা খুলতেই কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগলো। বহুদিনের চেনা জায়গা। বহু স্মৃতির জন্মভূমি। ওইখানে তিনি খেতে বসতেন, ওইটে তাঁর শোবার ঘর। আর ওই যে কোণের দিকের ঘরটা, ওইটে ছিল আঁতুড় ঘর। এইখানে জন্মেছিল সদানন্দ। গৌরী এসে প্রথম খবর দিয়েছিল যে কর্তাবাবুর নাতি হয়েছে।

কর্তাবাবু তখন রানাঘাটে। খবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। বলেছিলেন—কী বললে? ছেলে? ছেলে হয়েছে?

কৈলাস গোমস্তা বলেছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু—

সমস্ত বাড়িময় সেদিন কী আনন্দ! কর্তাবাবুর নাতি হয়েছে, নাতি হয়েছে। তোমরা শাঁখ বাজাও, উলু দাও, আনন্দ করো। যে যেখানে আছে তাকে খবর দাও, গাঁ-সুদ্ধ লোককে ডাকো, তারা এসে দেখে যাক। দেখে যাক চৌধুরী-বংশের ছেলে হয়েছে, চৌধুরী-বংশের উত্তরাধিকারী জন্মেছে। বাজাও, শাঁখ বাজাও।

—কে?

চৌধুরী মশাই চমকে উঠেছেন। তাঁর মনে হলো যেন সত্যিই কে উলু দিলো, কে যেন শাঁখ বাজালো। সমস্ত বাড়িটা যেন আনন্দে একেবারে গম্-গম্ করে উঠলো।

কিন্তু না, প্রকাশ পেছনেই ছিল। সে ভুল ভাঙিয়ে দিলে। বললে—জামাইবাবু, সা' মশাই এসেছেন—

এসেছে! চৌধুরী মশাই পেছনে ফিরে দেখলেন প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাই দাঁড়িয়ে আছে।

বললেন—এসে গেছেন? ভালোই হয়েছে, আমি ভাবছিলুম আপনার কথা—
—আপনি আজই চলে যাচ্ছেন নাকি?
—হ্যাঁ চলি, এই নিন আপনার চাবি—
সা' মশাই চাবিটা হাতে নিয়ে বললে—তা এত তাড়াতাড়ি যাবার কী দরকার ছিল, আর দুটো দিন থাকলেই পারতেন, এ আপনার নিজের দেশ, নিজের বাড়ি, আমি তো আর এত শিগ্‌গির এখানে আসছি না—
—না, আর এখানে থাকা যায় না। চৌধুরী মশাই বললেন—এখানে থাকলে সুলতানপুরের জমি-জমা আবার কে দেখবে? সেখানেও তো আমার শ্বশুরমশাই-এর জমি-জমা রয়েছে, সে-সব দেখবার লোকও তো নেই—
বলে প্রকাশের দিকে চেয়ে বললেন—এসো প্রকাশ—
প্রকাশও চলতে লাগলো পেছন পেছন। একদিন বড় আশা করে নরনারায়ণ চৌধুরী যে-বংশের যে-সংসারের পত্তন করেছিলেন চৌধুরী মশাই-এর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বোধহয় শেষ পর্যন্ত কালীগঞ্জের বউ-এর অভিশাপই ফললো। কে জানে!

নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বাড়ির সূতিকাগৃহে একদিন যে অসহায় শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি উঠেছিল, শাঁখ বেজেছিল, সেদিন সেই নৈহাটি শহরের একটা গলির ভেতরের বাড়িতে সেই শিশুটিই তখন আবার তেমনি করেই অসহায় হয়ে একটা বিছানার ওপর শুয়ে ছিল। কিন্তু তখন আর তার জন্যে কেউ শাঁখও বাজাচ্ছে না, উলুধ্বনিও দিচ্ছে না।
ওদিকে ধর্মশালার পাঁড়েজী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রোজ রাস্তার দিকে বসে থাকে—কই, বাবুজী তো আসছে না। কত লোক আসতো ধর্মশালায়, কত লোক আবার চলেও যেত। কলকাতা শহরে মানুষের আনাগোনার বিরাম নেই। বিরাট জনস্রোতের সঙ্গে কর্মস্রোত জড়িয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল বড়বাজারে।
মহেশ আসতো। জিজ্ঞেস করতো—আমার দাদবাবু আসেনি পাঁড়েজী?
পাঁড়েজী বলতো—নেই—
মহেশ বলতো—দাদাবাবুর এত দেরি হচ্ছে কেন আসতে?
শুধু মহেশ নয়, কালীগঞ্জের বউও আসতো। কোন্ বিরাট এক প্রাসাদের পেছনকার খাটাল থেকে বুড়ো মানুষ সদানন্দের দেওয়া আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হতো ধর্মশালার সামনে। পাঁড়েজীকে জিজ্ঞেস করতো—আমার খোকা এসেছে দারোয়ান বাবা?
পাঁড়েজী চাপাটি সেঁকতে সেঁকতে বলতো—না বুড়ি মাঈ, বাবুজী আসেনি—
মহেশও ফিরে চলে যেত, কালীগঞ্জের বউও আবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেমন করে এসেছিল তেমনি করে খাটালে ফিরে যেত।
কিন্তু তাদের কেউই জানতো না তাদের এত সন্ধানের মানুষটা তখন নৈহাটির একটা বাড়িতে বিছানার ওপর সমস্ত চেতন-অচেতনের অতীত হয়ে শুয়ে আছে।
পাড়ার ডাক্তারবাবু আসতো। শরীর পরীক্ষা করতো। বলতো—রোগী যেন কখনও উঠে না বসে, একেবারে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেবেন, নড়া-চড়া একেবারে বারণ—
প্রথমে ট্রেনটা থেকে যেদিন সদানন্দকে এখানে তুলে আনা হয়েছিল সেইদিন থেকেই

কোনও চৈতন্য ছিল না তার। কিন্তু সেদিন সদানন্দ প্রথম চোখ মেললে।
বললে—কালীগঞ্জের বউ, ও কালীগঞ্জের বউ—
গিরিবালা ঘর সাফ করছিল। সদানন্দর ডাক শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। গিয়ে ডাকতে লাগলো,—দিদিমণি—
নয়নতারা তখন কলঘরের ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে? কী বলছিস?
গিরিবালা বললে—নতুন বাবুর জ্ঞান ফিরেছে, দিদিমণি, বিড় বিড় করে কী সব বকছেন—
নয়নতারা আর দেরি করলে না। গিরিবালাকে কাছে বসিয়ে রেখেই কলঘরে গিয়েছিল সে। ওইটুকুর মধ্যেই হঠাৎ সদানন্দর জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে মাথার খোঁপাটা ঠিক করে একেবারে সোজা সদানন্দের ঘরে এল। এসে দেখল সদানন্দর চোখ দুটো খোলা। কিন্তু দৃষ্টিটা বিহুল। মুখে যেন কী বলছে বিড়-বিড় করে।
নয়নতারা একেবারে সদানন্দর মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। যদি তাকে চিনতে পারে। কিন্তু তাতেও সদানন্দর চোখের দৃষ্টির কোনও তারতম্য হলো না।
নয়নতারা তখন সদানন্দর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।
জিজ্ঞেস করলে—আমায় তুমি কিছু বলছো?
সদানন্দ তেমনি বিহুল দৃষ্টি দিয়ে বিড়-বিড় করে বললে—আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো কালীগঞ্জের বউ, তুমি কিচ্ছু ভেবো না—
নয়নতারা কী বলবে বুঝতে পারলে না। আশ্চর্য, ও হয়ত নয়নতারাকে চিনতেও পারছে না। চিনতে পারলে হয়ত ঠিক আগেকার মত বিছানা থেকে ওঠবার চেষ্টা করতো, উঠে ঘর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও হয়ত করতো।
নয়নতারা বললে—তুমি ওসব কথা ভুলে যাও, তুমি ওসব কথা আর ভেবো না।
সদানন্দ বলে উঠলো—কেন তাহলে ওরা আমাকে ঠকালে?
নয়নতারা এবার তার মুখটা সদানন্দর কানের কাছে নিয়ে এসে বললে—ওগো তুমি ওসব কথা ভুলে যাও, এই দেখ আমি, আমাকে চিনতে পারো? আমি নয়নতারা—
সদানন্দ এবার নয়নতারার দিকে চাইলে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। নয়নতারা শাড়ির আঁচলটা দিয়ে সদানন্দর চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।
বললে—ছিঃ, কেঁদো না, কাঁদতে নেই।
সদানন্দ বললে—কিন্তু ওরা আমাকে ঠকালে কেন? আমি তো বলেছিলুম তোমাকে টাকা না দিলে আমি বিয়ে করবো না, তবু কেন ওরা ঠকালে আমাকে? তবু কেন ওরা তোমাকে খুন করলে?
নয়নতারা আবার বললে—তুমি ঘুমোও, তুমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো, বুঝলে? ঘুমোও, চোখ বোঁজ—
সদানন্দ বললে—তুমি তো কোনও দোষ করোনি, তাহলে কেন ওরা তোমাকে এত বড় শাস্তি দিলে? ওরা কপিল পায়রাপোড়াকে মেরেছে আমি কিচ্ছু বলিনি, মানিক ঘোষের সর্বনাশ করেছে তবু কিছু বলিনি, ফটিক প্রামাণিককে পাগল করেছে, তখনও তো আমি কোনও কথা বলিনি, কিন্তু তোমার টাকা কেন ঠকিয়ে নিলে ওরা? কেন তোমাকে ওরা খুন করলে? তোমাকে খুন করবে জানলে আমি তো বিয়ে করতুম না—
তারপর একটু থেমে বললে—আমাকে একটু জল দেবে? তোমার কথা ভাবলেই কেবল আমার জলতেষ্টা পায়, আমার গলা শুকিয়ে যায়—
নয়নতারা বললে—তুমি জল খাবে? দাঁড়াও, আমি তোমাকে জল এনে দিচ্ছি—
বলে কুঁজো থেকে জল এনে গেলাস মুখের কাছে নিয়ে গেল। বললে—মুখটা হাঁ করো,

আমি জল দিচ্ছি—হাঁ করো—

—না, জল খাবো না! খাবো না জল—

নয়নতারা বললে—তবে যে বললে তোমার জলতেষ্টা পাচ্ছে, তোমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে?

সদানন্দ বললে—হোক কষ্ট, আমার তেষ্টা পাক, তবু আমি জল খাবো না—

—কিন্তু জলতেষ্টা পেলে জল খাবে না কেন?

—ওগো আমার আর কতটুকু কষ্ট? কপিল পায়রাপোড়ার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বুঝি কষ্ট হয়নি? মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিকের কষ্টর কাছে আমার কষ্ট কতটুকু? আমার এ কষ্ট হওয়াই ভালো—হোক আমার কষ্ট—

—না না তুমি জল খেয়ে নাও—লক্ষ্মীটি খাও—

বলে নয়নতারা সদানন্দর চিবুকটা বাঁ হাতটা দিয়ে ধরলে। বললে—খাও জল, তোমার অসুখ ভালো হয়ে যাবে—

সদানন্দ মাথা নাড়তে লাগলো—আমি ভলো হবো না, আমি ভালো হতে চাই না—

নয়নতারা বললে—না, কথা শোন, আমার কথা শুনতে হয়, ভালো না হলে তুমি বাড়ি যাবে কী করে?

—আমি বাড়ি যাবো না, আমি এখানে থাকবো—

নয়নতারা বললে—ছিঃ, এখানে থাকতে নেই। তুম শিগ্‌গির ভালো হয়ে ওঠো, উঠে তোমার বাড়ি চলে যাও, জল খাও—

হঠাৎ পেছনে কী একটা ছায়ার আভাস পেছন ফিরে চাইতেই নয়নতারা দেখলে নিখিলেশ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—

নিখিলেশকে দেখেই নয়নতারা অবাক হয়ে গেছে। মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে—তুমি? তুমি এ সময়ে? তোমার অফিস নেই?

নিখিলেশ এ-কথার উত্তর দিলে না। আস্তে আস্তে আবার বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। নয়নতারা হাতের গেলাসটা রেখে পাশের ঘরে ঢুকতেই দেখলে নিখিলেশ বিছানার ওপর চুপ করে বসে আছে।

নয়নতারা আবার সেই আগেকার প্রশ্নটাই করলে—কী হলো? তোমার অফিস ছুটি হয়ে গেল নাকি?

নিখিলেশ শুধু বললে—না—

নয়নতারা বললে—তবে? তবে কি তোমার শরীর খারাপ হলো নাকি? দেখি, কপাল দেখি—

বলে কাছে এগিয়ে গিয়ে নিখিলেশের কপালে হাত দিতে গেল। নিখিলেশ নয়নতারার হাতটা নিজের হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে। বললে—না, আমার কিছু হয়নি।

নয়নতারা নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—হয়নি ভালোই হলো। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। তুমি তো কখনও এমন করে ছুটি নাও না—তা এদিকে কী কাণ্ড হয়ে গেছে জানো। আমি এদিকে মহামুশকিলে পড়ে গিয়েছি। ও-ঘরে কে, চিনতে পারলে? কথা বলছো না যে? চিনতে পেরেছ, না চিনতে পারো নি?

নিখিলেশ মাথা নাড়লে। বললে—চিনেছি—

—চিনতে পেরেছ? তাহলে বলো তো এখানে ও কী করে এল? বলো না, কী করে এল ও এখানে?

নিখিলেশ কোনও উত্তর দিলে না। যেমন চুপ করে ছিল তেমনি চুপ করেই রইল।

নয়নতারা বললে—আমি ন'টা চল্লিশের ট্রেন ধরতে স্টেশনে গেছি, দেখি ট্রেনটা তখন এসে গেছে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেখি প্লাটফরমের ওপর ভীষণ ভিড়। আমি উঁকি মেরে দেখি ও। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা, স্টেশন মাস্টার তো ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, আমিই বলে-কয়ে বাড়িতে নিয়ে এলুম ওকে—

নিখিলেশ এতক্ষণে কথা বললে। বললে—তা হাসপাতালে পাঠাচ্ছিল ওরা তাতে কী দোষ হচ্ছিল? হাসপাতালের চেয়ে কি বাড়িতে ভালো সেবা হবে?

নয়নতারা বললে—না, ভাবলুম হাসপাতালে তো ওর নিজের কেউ নেই, তাই...

নিখিলেশ বললে—কিন্তু তার জন্যে আজকে তোমার অফিসটা কামাই হলো তো?

—বা রে, আমার তো ছুটি পাওনা আছে।

—ছুটি পাওনা হলেই বা, কত কষ্টে আমি তোমার চাকরিটা যোগাড় করে দিয়েছি, বি-এ পাস করেও কত মেয়ে চাকরির জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তুমি এই রকম খবর না দিয়ে আজ অকারণ অফিস কামাই করলে, এটা কি ভালো হলো?

নয়নতারা বললে—তুমি এটাকে অকারণ বলছো?

—তা অকারণ নয় তো কী? রাস্তায়-ঘাটে এ-রকম কত লোকের অ্যাক্‌সিডেন্ট হচ্ছে, তুমি তাদের সকলকে বাড়িতে তুলে এনে সেবা করতে পারবে? সকলকে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে?

নয়নতারা কথাটা শুনে মনে যেন একটু কষ্ট পেলো। বললে—সকলের সঙ্গে তুমি ওর তুলনা করলে? সকলে আর ও কি এক হলো? চোখের সামনে ওকে ওই অবস্থায় দেখলুম আর তারপর কী করে চুপ করে থাকতে পারি বলো?

নিখিলেশ বললে—ঠিক আছে, অফিস-টপিস গিয়ে তাহলে আর তোমার দরকার নেই, তুমি তাহলে ওর সেবাই করো—

বলে নিখিলেশ উঠে পড়লো। বললে—আমি যাচ্ছি—

নয়নতারা বললে—কোথায় যাচ্ছো!

নিলিখেশ বললে—একটা কাজ আছে—

—কী কাজ আবার তোমার এখন? অফিস থেকে কি তুমি ছুটি নিয়ে এলে নাকি?

নিখিলেশ বললে—এখন বাজেট-তৈরির কাজ চলছে, এখন কি ছুটি পাওয়া যায়?

—তাহলে?

—টিফিনের সময় বেরিয়ে তোমার অফিসে গিয়েছিলুম তোমাকে বলতে যে আমি আজকে আটটা উনিশের ট্রেনে বাড়ি ফিরবো, তুমি আফিসে আমার জন্যে অপেক্ষা কোর না, একলাই বাড়ি চলে যেও। কিন্তু গিয়ে শুনি তুমি অফিসেই আসোনি—তাই খুব ভাবনা হলো। ভাবলুম এমন তো কখনও হয় না। মনে ভয়ও হলো হয়ত কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অফিসে গিয়ে বললুম আমার স্ত্রীর খুব অসুখ, আমি চললুম—

নয়নতারা বললে—আমার অসুখ হয়েছে এ সন্দেহটাই বা তোমার হলো কী করে? যাবার সময় তুমি দেখে গেছ আমি দিব্যি সুস্থ আছি—হঠাৎ আমার শরীর খারাপ হতে যাবেই বা কেন?

—কিন্তু তা কি বলা যায়? আগে তো কখনও তুমি অফিস কামাই করোনি, আমি কী করে জানবো যে বাড়িতে এই কাণ্ড বেধে গেছে—মিছিমিছি আমার অফিসে হাফ-ডে কামাই হলো আজ। অথচ এখন বাজেট-তৈরি চলছে—

—তা এখন কোথায় চললে তুমি?

নিখিলেশ বললে—দেখি কোথায় যাই, কোনও রকমে সময়টা কাটাতে হবে তো—

নয়নতারা বলে উঠলো—তা আজ যে হঠাৎ সময় কাটাবার জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে? এতদিন তো বাড়িতেই তোমার সময় কাটতো ভালো করে—

—সে তখন কাটতো তোমার সময় ছিল বলে। আজকে তো তোমার নিজেরই সময় নেই। আজ তো ও-ঘরে রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে! তোমার যে অনেক কাজ!

—তুমি আমাকে অত খোঁটা দিয়ে কথা বলছো কেন?

নিখিলেশ বললে—খোঁটা? খোঁটা তোমায় কখন দিলুম? আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, তোমার কাজ নেই?

নয়নতারা বললে—হাজার কাজ থাকলেও তোমার সঙ্গে কথা বলবার সময়ও আমার আছে। ওকে এ-বাড়িতে এনেছি বলে তুমি রাগ করছো কেন? একটা লোক বেঘোরে মারা যাক এইটেই কি তুমি চাও?

—আমি কি তাই বলেছি—আমাকে কি তুমি অত নীচ ভাবো?

নয়নতারা বললে—না, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার ওপর রাগ কোর না। ওকে তুমি চেনো না বলেই এত রাগ হচ্ছে তোমার, ওকে যদি তুমি চিনতে তাহলে বুঝতে পারতে ওর ওপর রাগ করা অন্যায়, বরং ওর ওপর দয়াই হওয়া উচিত সকলের—

নিখিলেশ বললে—আশ্চর্য, আজ তুমি কিনা ওর হয়ে সাফাই গাইছো, অথচ ওর জন্যেই তো আজ তোমার যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা। মনে নেই, একদিন ওরা তোমাকে কী অপমানটাই না করেছিল, তোমার শ্বশুরবাড়ির সেই সব অত্যাচারের কথা এত শিগ্‌গির তুমি ভুলে গেলে? এত ভুলো মন তোমার? যে ক'দিন তুমি ওদের বাড়ি ছিলে একদিনের জন্যেও কি তুমি শান্তি পেয়েছিলে? তোমার সেই কান্নাকাটির কথা কি আমি ভুলে গেছি মনে করো?

নয়নতারা বললে—তুমি যা বলছো সব সত্যি কথা, কিন্তু তার জন্যে ওর কিছু দোষ নেই, ও কী করবে? এই দেখ না, এখনও এই অবস্থায়ও 'কালীগঞ্জের বউ' 'কালীগঞ্জের বউ' বলে প্রলাপ বকছে! কালীগঞ্জের বউকে আমার বৌভাতের দিন ওর ঠাকুর্দাদা খুন করেছিল তা এখনও ও ভুলতে পারছেন না—

—তা ওর ঠাকুর্দাদা দোষ করেছিল বলে তার শাস্তি পাবে তুমি? কোনও ভদ্রলোক নিজের বউ-এর সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করে? এ-রকম ঘটনা কেউ কখনও শুনেছে? তুমি আবার সেই লোককে সাপোর্ট করছো?

নয়নতারা বললে—না, তুমি দেখছি সত্যিই আমার ওপর রাগ করেছ, নইলে সব জেনেও কেন ওকে তুমি গালাগালি দিচ্ছ?

—তা গালাগালি দেব না? আমি যদি সেদিন নবাবগঞ্জে থাকতুম তো আমি ওকে চাবুক মারতুম তা জানো?

—ছিঃ, কী বলছো তুমি? পাশেই ও রয়েছে, যদি শুনতে পায়? তোমার কি রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না? ওর ব্যবহারের জন্যে কি ও দায়ী?

—তা ও দায়ী না তো কে দায়ী?

—দায়ী ওর বাবা, ওর ঠাকুর্দাদা। দায়ী ওর পূর্বপুরুষ!

—তা ওর পূর্বপুরুষের জন্যে তুমি শাস্তি পাবে এ কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? এ কোন্ দেশের বিচার?

নয়নতারা বললে—তুমি চুপ করো বাপু, বড্ড চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছো তুমি। তুমি সব জেনে শুনেও এসব কথা কেন বলছো? ও তো আমাকে সব খুলেই বলেছিল। তার পরেও কি আমি ওকে দোষ দিতে পারি?

—তাহলে তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ি থাকলেই পারতে। সেখান থেকে কেন চলে আসতে গেলে?

নয়নতারা বললে—নাঃ, তুমি দেখছি আজকে আমার সঙ্গে ঝগড়া না করে আর ছাড়বে না।

নিখিলেশ বললে—তুমি আমার ঝগড়া করাটাই শুধু দেখলে, আর আমি যে তোমাকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করিয়ে চাকরি করে দিলুম, সেটা তো একবারও দেখলে না। তখন তো আমাকে বলেছিলে তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকের নামও কখনও মুখে আনবে না—

নয়নতারা বললে—ঠিক আছে, কথা থাক, আমি চা করে দিচ্ছি, চা খাও, আমিও চা খাবো, চা খেলে তোমার রাগ কমবে।

নিখিলেশ বললে—না, তুমি চা খাও, আমি খাবো না, আমি বেরোব—

নিখিলেশ বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু নয়নতারা পথ আটকে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

বললে—চা না খেয়ে তুমি যেতে পারবে না, অফিসে তো এই সময়ে একবার চা খাও তুমি, আমি গিরিকে বলছি চা করতে—

কথাটা বলে নয়নতারা চলে যাচ্ছিল কিন্তু নিখিলেশ বললে—শোন, একটা কথা শুনে যাও—

—কী?

—ওকে আর কতদিন এখানে রাখবে?

নয়নতারা কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—তার মানে তুমি কি চাও এই অসুস্থ মানুষটাকে এই অবস্থায় বাড়ি থেকে বার করে দিই?

নিখিলেশ বললে—আমি কি তাই বলেছি? তুমি আমার কথার উলটো মানে করছো কেন? আজ তো ওর জন্যে অফিস কামাই করলে, এখন থেকে কি রোজই অফিস কামাই করবে?

নয়নতারা বললে—অফিস কামাই না করলে বাড়িতে কে ওকে দেখবে? গিরিবালা? গিরিবালার ওপর ওর ভার ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো? শেষকালে যদি একটা কিছু হয় তখন ওই একলা বুড়ো মানুষ সামলাতে পারবে?

—তার চেয়ে হাসপাতালে পাঠালে হতো না! হাসপাতালে পাঠালে ক্ষতিটা কী? সেখানে ডাক্তার আছে, নার্স আছে, দেখাশোনা করবার লোকের অভাব নেই, তাই পাঠাও না—আর তাছাড়া, খরচের কথাটাও তো ভাবতে হয়, বাড়িতে ডাক্তার ডাকতেও তো টাকা লাগে, এখন মাসের শেষের দিকে...

নয়নতারা নিখিলেশের মুখের দিকে ভালো করে তাকালো। যে মানুষটা তার বিপদের দিনে তাকে বাঁচিয়েছে, তাকে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে প্রাইভেটে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা ছোটখাটো চাকরিও যোগাড় করে দিয়েছে, তার মনও কি আজকে এমন একটা তুচ্ছ ঘটনায় ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠলো নাকি!

নিখিলেশ আবার বললে—কথাটা যা বলেছি অন্যায় বলিনি, তুমি বরং একটু ভালো করে ভেবে দেখ—এখন কতদিনে ভদ্রলোক ভালো হয়ে উঠবেন তার তো ঠিক নেই, আর ভালো হবেন কিনা তারও ঠিক নেই—

নয়নতারা যেন ককিয়ে উঠলো। বললে—ওগো, ও-কথা বোল না তুমি, বরং বলো তাড়াতাড়ি ও ভালো হয়ে উঠুক—

—ভালো হয়ে উঠুক সে তো আমিও চাই, আমি কি চাই যে ভালো না হোক? কিন্তু তোমার কথা ভেবেই আমি কথাটা বলছি, তোমার অফিসের কথা ভেবেই বলছি। রোজ রোজ কামাই করা তো তোমার চলবে না, এখন যদি ভদ্রলোকের অনেকদিন লাগে সেরে উঠতে তখন কী করবে? ততদিন অফিস কামাই করবে?

নয়নতারা বললে—আমার তো ছুটি পাওনা আছে—ছুটি নিলে তো আর মাইনে কাটা যাবে না, না-হয় যতদিন ছুটি পাওনা আছে ততদিন ছুটি নেব—

—কিন্তু তারপর? তারপর যখন ছুটি পাওনা থাকবে না?

নয়নতারা বললে—ততদিন কি আর ও শুয়ে পড়ে থাকবে? দেখো তার আগেই ভালো হয়ে যাবে, ভালো হয়ে গেলেই আমি ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব—আর তা ছাড়া জ্ঞান হলেও নিজেই আর এখানে থাকতে চাইবে না, ওকে তুমি চেনো না। আমাকে দেখলেই ও এড়িয়ে যেতে চাইবে—

নিখিলেশ বললে—গেলেই ভালো। আমি তো চাই ও ভাল হয়ে উঠুক, ভালো হয়ে নিজের বাড়িতে যাক। যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তার তো এখানে থাকাটাই উচিত নয়—

—কিন্তু সে জ্ঞান এখন কি ওর আছে? জ্ঞান থাকলে কি আমি ওকে এ বাড়িতে আনতেই পারতুম?

—তা ডাক্তারবাবু কী বলছেন?

—ডাক্তারবাবু তো বলছেন সারতে সময় লাগবে। বলছেন অনেকদিন ধরে কোনও মানসিক শক্ পেয়ে পেয়ে নার্ভের চাপ পড়েছে, তা ছাড়া শরীরে নাকি রক্তও নেই এক ফোঁটা—

—রক্ত দিতে হলে সে তো আবার অনেক খরচের ধাক্কা।

নয়নতারার ভালো লাগলো না কথাটা। বললে—তুমি কেবল খরচের কথাটাই ভাবছো। একটা মানুষের জীবনের চেয়ে কি খরচটাই বড় হলো? তেমন যদি হয় তাহলে না হয় অফিস থেকে দু'চার শো টাকা যা পাওয়া যায় লোন নেব—

—লোন নেবে? লোন নিলে শোধ করতে হবে না? মাইনে থেকে মাসে-মাসে কেটে নেবে না?

নয়নতারা বললে—তা তো নেবেই। কিন্তু কত লোকের বাড়িতে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী থাকে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হয় না? অসুখ-বিসুখ হলে তাদের চিকিৎসার খরচ দিতে হয় না জামাইকে? মনে করে নাও না সেই রকমই একটা কিছু। মনে করে নাও না যে তোমার শ্বশুরবাড়ির কোনও নিকট-আত্মীয় বিপদে পড়ে তোমার বাড়িতে এসে উঠেছে—

—তা ও কি তোমার আত্মীয়? ওকে তুমি কি এখনও তোমার আত্মীয় বলে মনে করো?

নয়নতারা বললে—যাও, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারবো না, তোমার মুখে কি কোনও কিছু আটকায় না? তুমি বাজে কথা বলছো কেন?

নিখিলেশ বললে—আমি বাজে কথা বলছি? তুমি উটকো একটা বাইরের লোককে বাড়িতে এনে তুললে আর দোষ হয়ে গেল আমার? তাহলে দরকার নেই আমার কথা বলে, আমি চলি, পথ ছাড়ো—

নয়নতারা পথ ছাড়লো না। নিখিলেশের দু'কাঁধে দুটো হাত রেখে বললে—না, যেও না, যদি যাও তো চা খেয়ে যাও, নইলে বুঝবো তুমি আমার ওপর রাগ করেছ—

নিখিলেশ বলে উঠলো—তা চা খেলেই কি আমি আমার কথার জবাব পেয়ে যাবো?

নয়নতারা বললে—তোমার কথার জবাব তো দিলুম, আবার কোন্ কথার জবাব চাও তুমি? তুমি তো কেবল টাকা খরচের কথা ভাবছো। তা আমি যদি চাকরি না করতুম তো তুমি আমার খাওয়া-পরার ভার নিতে না? কত লোকের বউ তো চাকরি করে না, তা তারা কি তাদের বউদের খাওয়ায় না, পরায় না? অসুখ হলে ডাক্তার দেখায় না? এর বেলায় আমি না হয় আমার মাইনের টাকাটাই খরচ করলুম, সে টাকাটা তো আমার চাকরি করা

টাকা। সে-টাকাটাও কি আমি আমার ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবো না? বলো, চুপ করে রইলে কেন, এর জবাব দাও—

নিখিলেশ উত্তেজিত হয়ে নয়নতারার কথার কোনও জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে গিরিবালার গলার শব্দ শোনা গেল। গিরিবালা বাইরে থেকে ডাকলে—দিদিমণি—

নয়নতারা এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরে পেলে। নিখিলেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেও যেন তার পুরোন দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিল। হঠাৎ গিরিবালার ডাক শুনেই বললে—

—যাই—

গিরিবালা আবার বললে—ডাক্তারবাবু এসেছেন—

নয়নতারা চমকে উঠলো। নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললে—ওই ডাক্তারবাবু এসেছেন, সকালবেলা একবার এসেছিলেন, বিকেলবেলা আর একবার আসতে বলেছিলুম। তুমি যেন চলে যেও না, ডাক্তারবাবু চলে গেলেই আমি তোমাকে চা করে দেব, চা খেয়ে তবে যেও—

বলে তাড়াতাড়ি পাসের ঘরে চলে গেল। ডাক্তারবাবু তখন রোগীর ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

পেশেণ্ট কেমন আছে? তারপরে আর জ্ঞান ফিরেছিল?

নয়নতারা তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আপনি চলে যাবার পর প্রলাপ বকছিলেন, তারপর জল খেতে চাইলেন—

—আর ওষুধ?

—ওষুধ খাইয়েছি। যে বড়িগুলো খাওয়াতে বলেছিলেন ওটা এখনও কিনে আনা হয়নি, এইবার কিনতে পাঠাবো—

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করতে করতে বললেন—ওইগুলো এতক্ষণে খাওয়ানো উচিত ছিল, ওইগুলোই আসল ওষুধ, ভিটামিন। ম্যাল্‌নিউট্রিশনের জন্যেই এই রকম হয়েছে—

নয়নতারা বললে—আমি এখখুনি আনতে পাঠাচ্ছি—

—তাহলে পেশেণ্টের জ্ঞান হয়েছিল!

ডাক্তারবাবু যেন নিজের মনেই কথাগুলো বললেন। তারপর রোগীর পরীক্ষা শেষ হতেই বললেন—ওই ওষুধগুলো পেটে পড়লে আরো তাড়াতাড়ি রোগীর জ্ঞান ফিরে আসতো—

নয়নতারা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ভালো হতে আর কতদিন লাগবে ডাক্তারবাবু?

—বেশি দিন লাগবে না, তবে ওষুধটা আপনি তাড়াতাড়ি আনিয়ে নিন—

বলে বাইরে আসতেই নয়নতারা হাত-ধোবার জন্যে সাবান জল এগিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকে আলমারিটা খুললে। আলমারির ড্রয়ারের মধ্যেই নয়নতারার সংসার-খরচের টাকা থাকে। নয়নতারা টাকাগুলো গুনে দেখলে। মাসের শেষ। মাত্র কটা টাকা পড়ে রয়েছে। আটটা এক টাকার নোট নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়েছে। সকালবেলাও একবার আটটা টাকা দিয়েছিল। মিক্‌শ্চার কিনে আনতেও সাত-আট টাকা বেরিয়ে গেছে। অথচ আসল ওষুধগুলোই আনা হয়নি তখনও। সবগুলোই দামী দামী ভিটামিনের ওষুধ!

বাইরের উঠোনের ধারে ডাক্তারবাবু তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো মুছছিলেন। নয়নতারা কাছে গিয়ে টাকাগুলো দিতেই তিনি সেগুলো না গুনে পকেটে পুরে নিলেন।

তারপর বললেন—তাহলে কাল সকালের দিকে আমি আর একবার আসবো—আপনি ওই বড়িগুলো যেমন বলেছি তেমনি খাইয়ে দেবেন—

বলে তিনি রাস্তায় গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

ততক্ষণে গিরিবালা রান্নাঘরে গিয়ে চা করে ফেলেছে। দু'কাপ চা নিয়ে এসে নয়নতারার হাতে দিলে। নয়নতারা কাপ দুটো নিয়ে বললে—তোমাকে একবার দোকানে যেতে হবে গিরি, ওষুধের দোকানে—

বলে শোবার ঘরে গিয়ে দেখলে ফাঁকা, নিখিলেশ নেই। কোথায় গেল নিখিলেশ? চা না খেলেই চলে গেল! নয়নতারা চায়ের কাপ দুটো নিয়ে সেখানেই খানিকক্ষণ হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল। এমন না কখনও তো চলে যায় না।

বাইরে গিয়ে গিরিবালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—গিরি, দাদাবাবু কখন বেরিয়ে গেল?

গিরিবালা বললে—দাদাবাবু ঘরে নেই?

নিখিলেশ কখন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কেউই জানতে পারেনি। নয়নতারাও জানতে পারেনি, গিরিবালাও জানতে পারেনি। অথচ নয়নতারাকে বাদ দিয়ে নিখিলেশ এতদিনের মধ্যে একদিনও কোথাও বেরিয়েছে কি না সন্দেহ। অফিস যাবার সময় নিখিলেশ এক ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে। কারণ তার অফিস বসে আধ ঘণ্টা আগে, আর নয়নতারা বেরিয়েছে ন'টা চল্লিশের ট্রেনে। ফেরবার সময় প্রতিদিন নিখিলেশ নয়নতারার আফিসে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে নৈহাটিতে ফিরেছে। এতদিন ধরে এই নিয়মই চলে এসেছে। এই প্রথম আজকেই এর ব্যতিক্রম হলো, আজকেই এই প্রথম নিয়মভঙ্গ!

নয়নতারা চা'টা খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার বাইরের ঘরে এসে হাজির হলো। সে ঘরের বিছানার ওপর সদানন্দ তখন আঘোরে ঘুমোচ্ছে। সদানন্দ তখন জানতেও পারলে না যে কোথায় সে এসেছে। কোথায় কার বাড়িতে এসে সে কার সংসারের সব নিয়ম-শৃঙ্খলা একেবারে ছত্রভঙ্গ করে দিলে।

এমনি করেই হয়ত একটা সংসারের একটা বংশের ইতিহাস-ভুগোল সব কিছু একদিন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। একটা সামান্য তুচ্ছ কারণে মানুষের সঙ্গে মানুষের কিংবা একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের সম্পর্কে কনক্রীটে চিড় ধরে ফাটল গজায়। আর সেই ফাটলের ফাঁকে একটা অশ্বত্থের সর্বনাশা অঙ্কুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রথমে যখন সে অঙ্কুর অবস্থায় থাকে তখন কেউই টের পায় না। কেউই দেখতে পায় না। অতি নিঃশব্দে পাপের সেই বীজটি লোকচক্ষুর অন্তরালে তার আপন ক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকে। কালীগঞ্জের বউ এই রকমই একটা তুচ্ছ বীজ। কিন্তু সেই তুচ্ছ একটা বীজই যে এমন করে একটা মহীরুহে পরিণত হবে, নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বংশকে এমন করে ছিন্ন-ভিন্ন করবে তা সেদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। না কল্পনা করতে পেরেছেন কর্তাবাবু নিজে, না চৌধুরী মশাই। চৌধুরী মশাই-এর শ্বশুর কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ও কল্পনা করতে পারেননি। পারলে তাঁর একমাত্র প্রীতিলতাকে হয়ত এ-বংশে বিয়েই দিতেন না। আর কৃষ্ণনগরের কালীকান্ত ভট্টাচার্যও কল্পনা করতে পারেননি, নইলে তিনিই কি তাঁর একমাত্র সন্তান নয়নতারাকে এই বংশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে দিতেন।

নয়নতারা যেদিন নবাবগঞ্জের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে হাতের শাঁখা ভেঙে কালীকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তার খানিক আগেই বিপিনরা পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা ভয়ে-সঙ্কোচে পণ্ডিত মশাই-এর কাছে কিছুই ভাঙেনি।

পণ্ডিত মশাই জিজ্ঞেস করলেন—নয়নতারা কেমন আছে বিপিন?

বিপিন প্রামাণিক বললে—আজ্ঞে ভালো—

—আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বললাম—আপনি ভালো আছেন—

—আর বেয়াই-বেয়ান?

—আজ্ঞে তাঁরাও আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

—আর জামাই-বাবাজী? জামাই-বাবাজী কেমন আছেন?

সব শুনে কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই-এর মনটা প্রসন্ন হলো। যাক, নয়নতারা ভালো ঘরে ভালো বরে পড়েছে, এর চেয়ে সুখের খবর আর কী থাকতে পারে!

বললেন—আচ্ছা বিপিন, এবার তোমরা তাহলে বিশ্রাম করো গে যাও, তোমাদের খুব পরিশ্রম হয়েছে—যাও—আমার দেওয়া জিনিসগুলো সব পছন্দ হয়েছে তো?

—হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই, খুব পছন্দ হয়েছে। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো জিনিস দেখে। দই মিষ্টি খুব পছন্দ হয়েছে তাদের। গাঁয়ের লোক সব একেবারে পাড়া ঝেঁটিয়ে তত্ত্ব দেখতে এসেছিল—

—তা তোমাদের পেট ভরে খাইয়েছে দাইয়েছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব খাইয়েছেন। বেয়াই মশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব খাওয়ালেন—

—কী কী খাওয়ালেন?

—পোনা মাছ সরু বাসমতী চালের ভাত, পায়েস, আম, কাঁঠাল, কাঁচাগোল্লা—

কিন্তু কথা তাদের শেষ হলো না। কথা শেষ হবার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো নয়নতারা। কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই চোখের সামনে যেন ভূত দেখলেন।

—বাবা!

নয়নতারার গলা শুনে আর তার সেই চেহারা দেখে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন।

—এ কী মা, তুই? এ কী চেহারা হয়েছে তোর? তুই হঠাৎ চলে এলি যে?

একবার বিপিনদের দিকে চেয়ে দেখেন, আর একবার নয়নতারার দিকে।

—এই যে এই বিপিন এক্ষুনি বলছিল তুই ভালো আছিস, বেয়াই-বেয়ান সবাই ভালো আছে, তোরা খুব পেট ভরে খাইয়েছিস ওদের...

নয়নতারা চিৎকার করে উঠলো—সব মিথ্যে কথা বাবা, সব ওদের মিথ্যে কথা। আমি তোমার পাঠানো তত্ত্ব সব ছুঁড়ে টেনে মাটিতে ফেলে দিয়েছি—

—সে কী মা, কেন? কী হয়েছিল?

উত্তেজনায় বৃদ্ধ কালীকান্ত ভট্টাচার্যের হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস-ধড়াস শব্দ করতে লাগলো। মেয়ের চেহারা দেখে তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। বললেন—তোর এয়োতির চিহ্ন কোথায় গেল? তোর সিঁথির সিঁদুর, তোর হাতের শাঁখা? তোর হাতের চুড়ি? গলার হার?

—বাবা, সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সিঁথির সিঁদুরও মুছে ফেলেছি, হাতের শাঁখাও ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য তখন উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন। বললেন—তা আমার জামাই? জামাইবাবাজী কোথায়?

নয়নতারা বলে উঠলো—তোমার জামাই নেই বাবা, তোমার জামাই কোনও দিন ছিল না, কোনও দিন থাকবেও না—

—সে কী রে? কী বলছিস তুই? আমার জামাই নেই?

—না, তোমার জামাই বেয়াই বেয়ান কেউই নেই। মনে করে নাও তোমার মেয়ের কোনও দিন বিয়েই হয়নি। আমি ও-বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আ কখনও ও-বাড়িতে যাবোও না—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কৈলাস গোমস্তা বউমাকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। কিন্তু বেগতিক দেখে সে আর সেখানে দাঁড়ায়নি। নিঃশব্দে কখন সেখান থেকে সরে পড়েছে কেউই তা জানতে পারেনি।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য কী করবেন তখন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বললেন— তা সদানন্দ কোথায়? সে তোর সঙ্গে এল না কেন?

নয়নতারা বললে—তুমি তার কথা আর বোল না, তার নামও উচ্চারণ কোন না আমার সামনে, সে নেই—

নেই মানে? নেই মানে কী? অসুখ হয়েছে তার? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না রে। কবে তার অসুখ হলো, তাও তো জানতে পারলাম না। তার যে অসুখ হয়েছে, সে-কথাও তো আমাকে বেয়াই মশাই জানান নি। আমি এখন কী করি। তোর মা নেই, আমিই তোর বাবা-মা সব কিছু , আমাকে সব খুলে বলবি তো! আমি বুড়ো বলে কি আমি কিছুই বুঝি না?

নয়নতারা বললে— সে তোমার বুঝে দরকার নেই বাবা, আমার ব্যাপার আমিই বুঝবো, এবার থেকে আমি আর কোথাও যাবো না, তোমার কাছেই বরাবর থাকবো, তোমার কাছে থাকতেই আমি এসেছি—

—কিন্তু—কিন্তু—

এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না কালীকান্ত ভট্টাচার্য। সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশের ডাক পড়লো। বিপিনকে বললেন—একবার নিখিলেশকে খবর দাও তো বাবা, একবার তাকে ডাকো তো বাবা এখানে—

তারপর থেকেই পণ্ডিত মশাই যেন কেমন হয়ে গেলেন। নিখিলেশ তখনও চাকরিতে ঢোকেনি। বি-এ পাস করেছিল আগেই। তখন আর কিছু না পেয়ে আইন পড়ছিল। ছোটবেলা থেকেই স্বাধীন স্বভাবের ছেলে। বিধবা মা থাকতো কেষ্ট-নগরের বাড়িতে আর নিখিলেশ কেষ্টনগর থেকে পাস করে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতো। ছোটবেলায় স্বদেশী করেছে। মদের দোকানে পিকেটিং করে একবার কয়েকমাসের জন্যে অন্য সকলের সঙ্গে জেলও খেটেছে। কলকাতা থেকে যে লীডার কেষ্টনগরে এসেছে, নিখিলেশ তার পেছন-পেছন ঘুরেছে। যখন খদ্দর পরা পুলিসের চোখে অপরাধ ছিল, তখন সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে খদ্দরও পরেছে। মীটিং-এ ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে গরম গরম স্বদেশী বক্তৃতাও দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকার চিন্তাতে আর ওদিকে বেশিদিন থাকতে পারেনি। মাঝে মাঝে লেখা পড়ায় বাধা পেয়েছে। শেষে যখন থেকে মা মারা গেছে, তখন থেকে আর ওদিক মাড়ায়নি। দিনের বেলা চাকরি খোঁজা আর বিকেলের দিকে এক ঘণ্টার জন্যে আইন কলেজে গিয়ে বসেছে। আর বাকি সময়টা এখানে-ওখানে ছাত্র পড়িয়ে পেট চালিয়েছে।

যেদিন কালীকান্ত ভট্টাচার্য মারা গেলেন, সেদিন শ্মশান থেকে ফিরে এসেই নিখিলেশ বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে নয়নতারা—

নয়নতারা তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। একমাত্র অবলম্বন বাবাকে হারিয়ে ভবিষ্যৎ তখন তার কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে।

—কথাটা দুদিন পরে বললেও হতো। কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার টাকা নেই জানি, বিয়ে করে স্ত্রীকে ভরণপোষণ করবার মত সংস্থানও নেই আমার, তা-ও জানি। কিন্তু তুমি অমত কোরো না—

মনে আছে নয়নতারার সমস্ত মন সেদিন নিখিলেশের প্রস্তাবে বিষিয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল নিখিলেশ যেন তার বাবার মৃত্যুর জন্যেই এতদিন প্রতীক্ষা করছিল। যেন নয়নতারার

অসহায়তার সুযোগ খুঁজছিল সে। যেন নয়নতারার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসাটাই তার কাছে কাম্য ছিল।

তারপর একদিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়ে গেল। নিখিলেশ এল একদিন। জিজ্ঞেস করলে—তুমি কিছু ভেবেছ নয়নতারা?

নয়নতারার মন থেকে তখনও শোকের ছাপ মোছেনি।

জিজ্ঞেস করলে—কী ভাববো?

—আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলুম, সেই সম্বন্ধে?

—কী প্রস্তাব?

—আমি বলছি তুমি আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী হয়ে এসো—

কথাটা শুনে নয়নতারার প্রথমে মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তেই সে নিখিলেশকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অনেক কষ্টে সে তখন নিজেকে সামলে নিয়েছিল। তারপরই মনে পড়ল তার আশ্রয়ের কথা, তার জীবিকা-নির্বাহের কথা, তার নিজের ভরণপোষণের কথা। পরের মাস থেকে তো তাকে তার বাড়ি ভাড়া দিতে হবে, তার নিজের জন্যে চাল-ডাল-নুন-মশলা সবই কিনতে হবে—

নয়নতারার মুখ তুলে বললে—কিন্তু কী করে তা সম্ভব?

নিখিলেশ বললে—কেন তা সম্ভব নয়? তোমার একবার বিয়ে হয়ে গেছে বলে? আইনের কথা যদি বলো তো তাতে তো আর এখন আটকাবে না, এখন তো আইন পাস হয়ে গেছে। আর সংস্কার? সংস্কারের কথা তুমি বলতে পারো অবশ্য, কিন্তু সেদিক থেকেও তো আর আটকাবার কারণ নেই, কারণ সদানন্দবাবুর সঙ্গে তুমি একদিন রাত্রিবাসও তো করোনি—সে তো তুমি নিজের মুখেই আমাকে বলেছো—

সেদিন নিখিলেশের যুক্তির কাছে নয়নতারা হার মেনে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু হার মানাটা তার কাছে অত সহজ হয়নি। তখন তার চোখের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না, বোধ হয় বর্তমান বলেও কিছু ছিল না। শুধু ছিল একটা অতীত। তা সে-অতীতটাও ছিল এত ভয়ানক যে তা স্মরণ করতেও তার ভয় লাগতো। আসলে ভবিষ্যৎ তারই থাকে যার আশা থাকে। সেদিন নয়নতারার আশা বলতেও তো কিছু ছিল না।

কিন্তু একদিন কেন যে তার আশা হলো! হয়তো নিখিলেশ তাকে আশা দিলে বলেই তার আশা হলো। নইলে যার পায়ের তলা থেকে মাটিটা পর্যন্ত সরে গেছে, তার তো হতাশায় আত্মঘাতী হবারই কথা। শেষ পর্যন্ত একদিন নিখিলেশ তাকে কলকাতায় নিয়ে গেল। এখন মনে নেই কোন্ ঠিকানায় নিয়ে গিয়ে তুললো তাকে। কোন্ একটা অফিস। আগে থেকে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল নিখিলেশ। কথা থেকে নিখিলেশের তিনজন বন্ধু এল। কী সব করলে একজন অফিসের লোক। সে কী উত্তর দিয়েছিল তাও ভালো করে তার কানে ঢোকেনি। কী একটা কাগজে সই করতে বললে তারা। তারা যেমন বললে—তেমনি সই করলে সে। তারপর সবাই তাকে নিয়ে চলে গেল কালীঘাটের মন্দিরে।

মনে আছে একটু আড়ালে পেয়েই নিখিলেশ বলেছিল—তুমি কাঁদছো কেন? ওরা তোমার কান্না দেখে কী ভাবছে বলো তো?

নয়নতারা নিজেই তখন জানতো না যে কেন সে কাঁদছে। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখটা মুছতেই সিঁদুরে-জলে আঁচলটা লাল হয়ে উঠলো। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো। এ কী করলে সে! এ কেন সে করতে গেল! বিশ্বসংসারে কারো সামনে তার মুখ দেখাতে লজ্জা করতো। যখন নৈহাটিতে এই পাড়াতে নিখিলেশ বাড়ি ভাড়া করলে, তখন সারা দিন ঘরের ভেতরে কেবল বন্দী হয়ে থাকতো। কিন্তু যে সিঁথির সিঁদুর একদিন সে রাগে ঘেন্নায় নিজের

হাতেই সকলের সামনে মুছে ফেলেছিল আবার নৈহাটির বাড়ির ভেতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দিয়েই সেই সিঁদুর নিজের সিঁথিতে লাগিয়ে দিলে। এও তার জীবনের এক মর্মান্তিক পরিহাস। নিজের সিঁদুর পরা চেহারাটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো যেন আর একটা মুখ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা নজরে পড়তেই লজ্জায় ঘেন্নায় শাড়ির আঁচল দিয়ে সে নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে! তখন আর নিজের মুখ দেখতেও তার লজ্জা হলো। সে সেই অবস্থাতেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

সে-সব প্রথম দিককার কথা। তারপর আস্তে আস্তে কেমন যেন সব কিছু সহজ হয়ে এল। নিখিলেশই বলতে গেলে সব কিছু সহজ করে নিলে। মাঝে মাঝে নয়নতারাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বেড়িয়ে আনতো। আগে কখনও সে কলকাতা দেখেনি। কৃষ্ণনগরে মানুষ হয়ে একেবারে সোজা চলে গিয়েছিল নবাবগঞ্জে। সে আরও এক নিরিবিলি পাড়াগাঁ। কিন্তু সেদিন কে ভেবেছিল এমনি করে একদিন সে আবার কলকাতা দেখতে পাবে। কে ভাবতে পেরেছিল যে যে-পুরুষমানুষের সঙ্গে তার বাবা তার ভাগ্যকে জড়িয়ে দিয়েছিল, তার বদলে ঠিক সেই জায়গায় আর একজন পুরুষমানুষ এসে তাকে এমনি করে আর এক নতুন জীবনের আস্বাদ দেবে।

রাত্রে নিখিলেশের পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে এক-একদিন হঠাৎ একটা পুরোন মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানা থেকে উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতো।

নিখিলেশ টের পেলে জিজ্ঞেস করতো—কী হলো, তোমার ঘুম আসছে না বুঝি?

নয়নতারা বলতো—না—

নিখিলেশ বলতো—কেন ঘুম আসছে না? দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলে বুঝি?

নয়নতারা বলতো—হ্যাঁ—

তা ছাড়া আর কি বলবে সে! সারা দিন অফিস করে নিখিলেশ, তার ওপর আছে ডেলি প্যাসেঞ্জারি। সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে যায় সে আর সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। সমস্ত দিনটাই তখন একলা কাটতো নয়নতারার। বোসপাড়ার ছোট ভাড়াটে বাড়ির ভেতরে একলা বন্দী হয়ে থেকে কেবল আকাশ পাতাল করতো। তারপর যখন নিখিলেশ বাড়ি ফিরতো তখন বসতো নয়নতারাকে নিয়ে। কেষ্টনগরে থাকতে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েই তার পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নবাবগঞ্জে বিয়ে হবার আগেও নিখিলেশ পড়াতো। এবার নিখিলেশের স্ত্রী হয়ে এ বাড়িতে আসার পরও আবার পড়ানো শুরু হলো। অঙ্ক আর ইংরিজি, ইতিহাস আর বাংলা, কোনও বিষয়ই বাদ গেল না। নতুন করে আবার নয়নতারা নিখিলেশের ছাত্রী হয়ে উঠলো। সে এমন এক ছাত্রী যে যাকে দরকার হলে শাস্তি দেওয়াও যায় না আবার প্রশয় দেওয়াও যায় না। প্রশ্রয় দিলে ছাত্রীর লেখাপড়া মাথায় উঠবে। আবার শাস্তি দিলেও স্ত্রীর অহমিকাকে আঘাত দেওয়া হবে।

আর তার পরেই একদিন কলকাতায় গেল প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে। নিখিলেশের সে কী পরিশ্রম, সে কী শাস্তি। যেন যে-কোনও রকমে সে নয়নতারাকে মানুষ করে তুলবেই। নিখিলেশ কথায়-কথায় নয়নতারাকে বললো—পুরোন কথা সব ভুলে যাও, মনে করে নাও নতুন করে তোমার জীবনের আরম্ভ হলো—

এ-সব কথার উত্তরে নয়নতারা কিছু বলতো না। এ-সব কথার জবাবও দিত না সে। নিখিলেশ যা বলতো তা-ই করতে চেষ্টা করতো। যেন কলের পুতুল সে। নিখিলেশ দম দিয়ে তাকে ছেড়ে দিত আর সে কলের পুতুলের মত শুতো, ঘুমোতো, ভাবতো, হাসতো, নড়তো সবকিছু করতো। কিন্তু তার মধ্যেও কোনও প্রাণ ছিল না। মানুষ বলে যে এক ধরণের

জীব সংসারের প্রাণী হয়ে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সকলের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে বেঁচে থাকে, নয়নতারা যেন তা নয়। তার কাছে তার সব কিছু কাজই যেন করতে হয় তাই করা, না করলে একজন অখুশী হবে তাই হুকুম পালন করা।

সত্যিই নিখিলেশ তার জন্য কী-ই না করেছে। একদিন হঠাৎ এসে বললে জানো, তোমার একটা চাকরি হয়ে গেছে—

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল। বললে—চাকরি? আমি চাকরি করবো?

নিখিলেশ বললে—হ্যাঁ, তোমাকে দিয়ে সেই যে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেই চাকরিটা। গোড়াতেই দেড়শো টাকা দেবে, পাকা হয়ে গেলে আড়াই-শোর কাছাকাছি—

নয়নতারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বললে—কিন্তু আমি চাকরি করতে পারবো?

নিখিলেশ বললে—আরে চাকরির আবার হাতী ঘোড়া কি আছে, গভর্ণমেন্টের চাকরিতে তো কোনও কাজই হয় না। শুধু অফিসে গিয়ে হাজরে দিলেই হলো। তার ওপরে তুমি তো মেয়েমানুষ। বেটাছেলেরাই কোনও কাজ করে না, আর তুমি মেয়েমানুষ হয়ে কি কাজ করবে? রেকড সেকশানের কাজ, শুধু সারা দিনে দু-চারটে চিঠি নম্বর মিলিয়ে ফাইলে অ্যাটাচ্ করলেই সারা দিনের মত ছুটি—

—কিন্তু রোজ ট্রেনে যাতায়াত? ডেলি-প্যাসেঞ্জারি?

—সে সঙ্গে আমার দু'চারদিন যাতায়াত করতে করতেই তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। তোমার একটা মান্থলি টিকিট করে দেব, রোজ টিকিট কাটতেও হবে না তোমায়। আর নৈহাটি থেকে অসংখ্য ট্রেন, যখন-তখন যেতে পারবে, যখন-তখন আসতে পারবে, এক-একদিন তোমাকে অফিস থেকে নিয়ে বেরিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখে ফিরবো—

তখন কলকাতা সম্বন্ধে নয়নতারার কোনও ধারণাই ছিল না। সেই নবাবগঞ্জে একরকম, এই নৈহাটিতে আর এক রকম। অথচ সেটাও শ্বশুরবাড়ি, এটাও বলতে গেলে শ্বশুরবাড়ি। তবু দুটোর মধ্যে কী তফাৎ!

তারপর একদিন শুরু হলো চাকরি করা। প্রথম-প্রথম নিখিলেশই সঙ্গে করে রোজ নিয়ে যেত তাকে। মানুষের ভিড় দেখে তখন ভয় করতো তার। গিরিবালা তখন একলা সারাদিন বাড়ি পাহারা দিত আর তারা তার হাতে বাড়ি পাহারা দেবার ভার ছেড়ে দিয়ে অফিসে চলে যেত—

তখন থেকেই নয়নতারা অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। একেবারে অন্য মানুষ। নইলে যে-লোক নবাবগঞ্জে একদিন শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয়ে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারতো না, দুঃখের কথাগুলো বলবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে পাশের দিদিমার বাড়িতে যেত সেই মানুষই আবার মানুষের ভিড় ঠেলে কিনা অফিস করছে—এটা সে প্রথম প্রথম বিশ্বাসও করতে পারতো না।

প্রথম মাইনে পাওয়ার দিন নিখিলেশ বললে—চলো, আজ আর বাড়িতে খাবো না আমরা—

নয়নতারা বললে—বাড়িতে খাবে না মানে? কোথায় খাবে তাহলে?

নিখিলেশ বললে—সে তুমি জানো না, তোমার নৈহাটির বাজারের নোংরা হোটেল নয়, সে-সব দামী হোটেল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চারিদিক, সেখানে খেতে তোমার ভক্তি হবে—

নয়নতারা বললে—কিন্তু হোটেলেই বা খাবো কেন? আমি যে গিরিবালাকে রান্না করতে বলে এসেছি, সে যে ভাত কোলে করে বসে থাকবে, তাকে তো কিছু বলে আসিনি—

নিখিলেশ বোঝালে প্রথম মাইনের টাকাটা দিয়ে একটু উৎসব করা ভাল। এরপর থেকে আর খাবো না। কিন্তু আজকে তুমি মাইনে পেয়েছ, এ-টাকাটা সদ্ব্যয় করা ভালো। নয়নতারার নিজের ইচ্ছেয় কিছুই হয়নি জীবনে। নিখিলেশর চেষ্টাতেই যখন তার চাকরি হয়েছে, নিখিলেশের চেষ্টাতেই যখন সে লেখা-পড়া শিখে পাস করেছে, তখন তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। তা প্রথমে একটা সিনেমা দেখতে গেল দু'জনে। সিনেমা ভাঙবার পর ট্যাক্সি চড়ে কোথায় কোন্ পাড়ায় তাকে নিয়ে গেল নিখিলেশ। বিরাট একটা বাড়ির সদর দিয়ে ভেতর ঢুকলো দু'জনে। চারিদিকে কী-রকম একটা ভুরভুরে সুগন্ধ নাকে এসে লাগলো।

নয়নতারা চুপি চুপি নিখিলেশকে জিজ্ঞেস করলে—এ কীসের গন্ধ গো?

নিখিলেশ বললে—রান্নার, চপ্ কাটলেট পোলাও কালিয়া রান্নার গন্ধ, চলো না ভেতরে গিয়ে খেলে সব বুঝতে পারবে—

সত্যিই ভেতরে সে এক স্বপ্নের রাজত্ব। নয়নতারার মনে হলো সে যেন এক স্বপ্ন পুরীতে ঢুকেছে। সার সার টেবিলে কত মেয়ে কত পুরুষ বসে বসে খাচ্ছে। মাথায় পাগড়ি পরা সব লোক সবাইকে পরিবেশন করতে ব্যস্ত! একটা কোণে গিয়ে ফাঁকা টেবিলে বসলে দুজনে।

নয়নতারা বললে—তুমি আগে বললে না কেন এখানে আসবে, তাহলে একটু সেজে-গুজে ভদ্র হয়ে আসতুম, আমার লজ্জা করছে বড়—

নিখিলেশ বললে—তোমার ভালো শাড়ি ব্লাউজই বা কই যে সেজেগুজে আসবে—

নয়নতারারও মনে হলো সত্যিই তার কোনও ভালো শাড়িই নেই। অন্তত এই সব জায়গায় আসবার মত কাপড়-জামা তো তার নেই-ই।

নিখিলেশ বললে—শুধু কি শাড়ি, তোমার গয়না-টয়নাও তো কিছু নেই—সব তো তোমার সেই আগেকার শ্বশুরবাড়িতে। আসবার সময় তুমি তো সেগুলো নিয়ে এলেই পারতে—

নয়নতারা বললে—তাদের উপর যে আমার ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল বড্ড। যাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলুম তাদের দেওয়া জিনিস ছুঁতেও আমার ঘেন্না করলো যে—

—কিন্তু তোমার বাবার দেওয়া গয়নাগুলো? মাস্টারমশাইও তো তোমাকে কম গয়না দেননি। সেগুলো তো নিয়ে এলে পারতে, তাহলে এখন কত কাজ দিত! এখন সোনার দাম কত বলো তো? একশো ছত্রিশ টাকা ভরি, তা জানো? হয়ত দাম আরও বাড়বে—

নয়নতারার সব মনে পড়তে লাগলো। বললে—তখন কী আমার মাথার ঠিক ছিল? আমি যে আত্মহত্যা করিনি, সেইটেই তো আশ্চর্য! তুমি কল্পনা করতে পারবে না আমার সে কী কষ্ট! শ্বশুর হয়ে রাত্তিরে কখনও কেউ ছেলের বউ এর ঘরে ঢুকেছে? এ কথা কখনও কেউ কল্পনা করতে পারে? শুনলে ভাববে আমি বুঝি মিথ্যে কথা বলছি—

নিখিলেশ বললে—যাক্‌গে ও-সব কথা, ও সব ভুলে থাকাই ভালো—এখন খেয়ে নাও—

ততক্ষণে খাবার দিয়ে গিয়েছিল টেবিলে। কত রকমের কী-সব খাবার। নয়নতারা বললে—আমি চামচে দিয়ে খেতে পারবো না—হাত দিয়ে খাই—

—তা খাও, পরে তোমাকে বাড়িতে কাঁটা-চামচে দিয়ে খেতে শিখিয়ে দেব। এখন হাত দিয়ে খাও—

সেদিন সেই হোটেলের ঘরের ভেতরে নিখিলেশের সঙ্গে খেতে খেতে মনে হতে

লাগলো তার জীবনে যা ঘটেছে হয়ত তা ভালোর জন্যেই ঘটেছে। নইলে কি এই সব দেখতে পেত, এই সব খেতে পেত। অথচ নবাবগঞ্জের-শাশুড়িরও তো যথেষ্ট টাকা ছিল। বাবা তো তার শ্বশুরবাড়ির টাকা দেখেই ওখানে তার বিয়ে দিয়েছিল। অথচ সেখানে তো এ-সব ছিল না এই আলো এই জাঁক-জমক, এই ঐশ্বর্য।

নয়নতারা বললে—দেখ, এখানে খেয়ে আর কী-ই বা হলো, তার চেয়ে এর পরের মাস থেকে এই টাকাগুলো জমিয়ে শাড়ি কিনবে। আমরা বাড়ির ভেতরে কী খাচ্ছি সেটা তো কেউ আর দেখতে পায় না, কিন্তু শাড়ি-গয়না লোকে দেখতে পায়—

নিখিলেশ হঠাৎ বললে—দেখ, একদিন ছুটি নিয়ে ভাবছি আমি নবাবগঞ্জে যাবো—

—কেন? নবাবগঞ্জে যাবে কী করতে?

—তোমার গয়নাগুলো চেয়ে আনতে! এ কী আবদার নাকি? তখনকার দিনের আট-হাজার টাকার গয়না, এখন তার দাম কম করেও অন্তত বারো হাজার টাকা! বারো হাজার টাকা যদি এখন হাতে থাকতো তো তাহলে কী আমাদের ভাবনা? মাসে-মাসে কত টাকার বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি, তার বদলে নিজেদের একটা বাড়ি হয়ে যেত—

আর একদিনের কথাও মনে পড়লো নয়নতারার। বিয়ে করার পর সেদিন আর নৈহাটিতে ফিরলো না তারা। একটা রাত্রের জন্যে নিখিলেশের এক বন্ধু তাদের বাড়িতেই নেমন্তন্ন করলে এমন একটা শুভঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে। সে-ঘটনাটাকে বন্ধুর বদান্যতাও বলতে পারা যায়, আবার আনন্দপ্রকাশও বলা যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানেই রাতটা কাটাতে হলো। তারপর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ভোরের ট্রেন ধরে নৈহাটিতে আসা। শেয়ালদ' স্টেশনে যখন এসেছে তখন ট্রেনটা ছাড়ে-ছাড়ে। ট্রেনে উঠতে যাবার মুখেই মনে হলো পেছন থেকে 'নয়নতারা' বলে তাকে যেন কে ডাকলে—

তখন আর তাদের পেছন ফিরে দেখবার সময় নেই। ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। নিখিলেশ বলেছিল—কে যেন তোমার নাম ধরে ডাকলে না?

—আমাকে?

নয়নতারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আমাকে আবার কে ডাকবে? আর এখানে আমাকে চিনবেই বা কে?

তবু নয়নতারা চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফেলে-আসা প্লাটফরমের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। অসংখ্য লোকের ভিড় সেখানে। তাদের মধ্যে কে কোন্ লোকটা তাকে ডেকেছে, কেন ডেকেছে, কে জানতে পারবে? আর তা ছাড়া এ তো কেষ্টনগর নয়, নৈহাটিও নয়, এমন কি নবাবগঞ্জও নয়। আর সে তো ঘরের বাইরে বেরোনো মেয়েও নয় যে তাকে বাইরের লোকে চিনতে পারবে। তার ওপর সেটা কলকাতা শহর। কলকাতা শহরে কে কাকে চেনে!

ট্রেনটা প্লাটফরম ছাড়িয়ে তখন অনেক দূর চলে এসেছে। নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলে—কাউকে দেখতে পেলে?

নয়নতারা বললে—না না, আমাকে আবার এখানে কে ডাকবে, ভুল শুনেছ তুমি—

হঠাৎ সদর-দরজায় কড়া নাড়তেই নয়নতারার যেন চমক্ ভাঙলো। এতগুলো ফেলে আসা বছরের স্মৃতি-রোমন্থনে যেন হঠাৎ ছেদ পড়লো।

ভেতর থেকে দরজা খুলেই বললে—কে?

হয়ত নিখিলেশ বাড়ি ফিরেছে। বাইরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এখন বাড়িতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

বাইরে থেকে গিরিবালা বললে—আমি দিদিমণি—

দরজা খুলে দিতেই গিরিবালা ভেতরে ঢুকলো। নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—ওষুধগুলো পেয়েছো?

ওষুধের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে গিরিবালা বললে—একুশ টাকা দাম নিলে দিদিমণি—

একটু টাকা! একটা দিনের মধ্যেই এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল! একুশ টাকা থাকলে একটা নতুন শাড়ি হয়ে যেত তার। অথচ মানুষটার অসুখ যে খুব তাড়াতাড়ি সারবে তা তো নয়! কিন্তু যে-সব কথা ভাবলে এখন চলবে না। অসুখ তো নিখিলেশেরও হতে পারতো, অসুখ তো তার নিজেরও হতে পারতো। অসুখ হলে মানুষ কী করবে! অসুখের ওপর তো মানুষের হাত নেই।

ওষুধটা নিয়ে নয়নতারা সদানন্দর ঘরে ঢুকলো।

শুধু অসুখ নয়, হয়ত কোনও কিছুর ওপরেই মানুষের হাত নেই। হাত থাকলে কি চৌধুরী মশাইকেই নবাবগঞ্জের সমস্ত সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি করে সুলতানপুরে চলে যেতে হয়! প্রত্যেকটা সম্পত্তি, বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট পর্যন্ত একদিন একজন মানুষের কাছে তাঁর শরীরের রক্তের মত প্রিয় ছিল। বলতে গেলে নিজের রক্ত দিয়েই সম্পত্তির পত্তন করে গিয়েছিলেন কর্তাবাবু। চৌধুরী মশাইও সে সব কিছু-কিছু জানতেন। আর জানতেন বলেই নবাবগঞ্জ থেকে যখন শেষবারের মত চলে যাচ্ছিলেন তখন পা দুটো যেন কেমন কেঁপে উঠেছিল। তারপর বারোয়ারিতলার কাছে আসতেই চলতে গিয়ে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। মনে হলো কপিল পায়রাপোড়ার ঝুলন্ত পা দুটো যেন তাঁর মাথায় ঠেকে যাবে। ওই গাছের ডালেতেই একদিন কপিল পায়রাপোড়া গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

—কী হলো জামাইবাবু? কিছু ফেলে এলেন নাকি?

প্রকাশ ভাবলে হয়ত জামাইবাবু বাড়িতে কিছু ফেলে এসেছেন!

চৌধুরী মশাই বললেন—না, চলো, ঠিক আছে—

বলে আরো তাড়াতাড়ি পা ফেলে আগে আগে চলতে লাগলেন। নবাবগঞ্জ থেকে মবারকপুর, মবারকপুর থেকে সোজা হাঁটা রাস্তা। হাঁটা রাস্তাটা যেন হেঁটে হেঁটে অনন্ত কালে গিয়ে মিশেছে। এই রাস্তা দিয়েই একদিন মোগল-পাঠান-ইংরেজরা এসেছিল, আবার এই রাস্তা দিয়েই তারা চৌধুরী মশাই-এর মত সর্বস্ব খুইয়ে ইতিহাসের পাতায় ছাপার অক্ষরে ভিড়ে মুখ লুকিয়ে বেঁচেছে। চৌধুরী মশাইও যেন সেদিন নিজের মুখ লুকোতে পারলেই বাঁচেন। পাঠান-মোগল-ইংরেজদের মতই শেষবারের মত তিনি যেন সব কিছু লুটপাট করে পুঁটলি বেঁধে পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন।

কিন্তু তিনি কোথায় গিয়ে পালাবেন? কোথায় গিয়ে মুখ লুকোবেন? কপিল পায়রাপোড়া, ফটিক প্রামাণিক, মাণিক ঘোষ আর কালীগঞ্জের বউদের আত্মাদের হাত থেকে কেমন করে তিনি আত্মরক্ষা করবেন? সুলতানপুর তো পৃথিবীর বাইরে নয়। আর পৃথিবীর বাইরে হলেও জলে স্থলে-অন্তরীক্ষেও যে তাদের গতিবিধি। তুমি যদি জীবনকে এড়াতে চাও তো মৃত্যু যে তোমার জন্যে হাত বাড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে। আর মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করলেও তোমার সন্তান-সন্ততি তো রইল, তোমার বংশধররা তো রইল, তাদের কে বাঁচাবে? কপিল পায়রাপোড়া, ফটিক প্রামাণিক, মাণিক ঘোষ আর কালীগঞ্জের বউদের

তো মৃত্যু নেই। তারা যে জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে। তারা ইতিহাসের আদি যুগ থেকে রোম সাম্রাজ্যের পতন দেখেছে, মহেঞ্জোদারোর ধ্বংস দেখেছে, বংশানুক্রমে তারা পতন-অভ্যুদয়ের কারণ খতিয়ে দেখে আসছে। তাদের ফাঁকি দিতে পারবে এমন নরনারায়ণ চৌধুরী বুঝি এখনও জন্মায়নি—

নইলে জীবনের শেষটায় কেন এক গণ্ডুষ জলও পেলেন না চৌধুরী মশাই? কেন সুলতানপুরের অত বড় বাড়ির মধ্যে একখানা ঘরে বন্দী হয়ে থেকে মৃত্যুকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতেন? কেন ভাবতেন পৃথিবীর আর সবাই চিরকালের নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, কেবল তিনিই যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ বেঁচে থাকবেন?

নবাবগঞ্জের জমি-জমা-বসতবাড়ি যেমন রেল-বাজারের প্রাণকৃষ্ণ সা' মশাইকে বেচে দিয়েছিলেন, সুলতানপুরের জমি-জমাও তেমনি একদিন সকলের চোখের আড়ালে আর একজনকে বেচে দিলেন। তারপর সব টাকাগুলো ভাগলপুরের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে পাস-বই আর চেক-বইটা মাথার বালিশের তলায় রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকে যে-বংশ ধনে-মানে পরিপূর্ণ হয়ে একদিন সারা বাংলা দেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল, তাদের কেউ-কেউ মোগলের সঙ্গে হাত মেলাবার দায়ে ইংরেজদের কোপানলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার কেউ-কেউ অবস্থা-বৈগুণ্যে পড়ে একেবারে ভিখিরি হয়ে টিম-টিম করে তখনও কায়ক্লেশে কোনও রকমে কৌলিক মর্যাদা বজায় রেখে মাথা বাঁচিয়ে চলছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে মাথা বাঁচানোও দায় হয়ে উঠলো অনেকের পক্ষে। তখন সব চারদিকে নতুন-নতুন জমিদারির পত্তনি হচ্ছে। ইংরেজদের সূর্যাস্ত আইনের সুযোগ নিয়ে কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ যেমন হাতে বেনিয়ানগিরির টাকা পেয়ে সুলতানপুরে জমিদারি কিনেছিলেন, তেমনি হর্ষনাথ চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষও জমিদারি করেছিলেন কালীগঞ্জে। সেই সময়ই শুরু হয় সদানন্দর পূর্বপুরুষ নরনারায়ণ চৌধুরীর উত্থানের ইতিহাস। মুর্শিদাবাদ কিংবা জাহাঙ্গীরাবাদ কিংবা গৌড়বঙ্গের অন্য কোনও উৎখাত জমিদারের বংশধর ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বংশের পূর্বগৌরব উদ্ধার করার জন্যেই বোধ হয় নায়েবের চাকরি নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তারপর সুলতানপুরের আর এক ভূস্বামীর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে নিজের মর্যাদা দ্বিগুণ করতে মতলব করেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে এসেই ইতিহাস উল্টে গেল। কালীগঞ্জ আগেই গিয়েছিল, তারপর নবাবগঞ্জও গেল। এবার সুলতানপুরও বুঝি শেষ হয়ে যায়। সুলতানপুরের শেষ উত্তরাধিকারী হরনারায়ণ রায়চৌধুরীকে তখন আর কেউ চোখেই দেখতে পায় না। গঞ্জের একজন গোয়ালা প্রতিদিন এসে আধ সের দুধ দিয়ে যায়। আর মুদিখানার মালিকের লোক দিয়ে যায় একখানা এক পাউণ্ডের পাঁউরুটি।

চৌধুরী মশাই নিজেই সেই দুধটা একটা অ্যালুনিনিয়ামের কড়ায় জ্বাল দেন। তারপর আধখানা পাঁউরুটি সেই দুধে ডুবিয়ে সকালের আহারটা সারেন। আর আধখানা থাকে রাত্রের জন্যে। রাত্রেও ওই একই খাদ্য। তারপর ঘুম থেকে উঠে সাবান দিয়ে আবার কড়াটা মেজে ফেলেন। চৌধুরী মশাই কাউকেই বিশ্বাস করেন না পৃথিবীতে। সবাই তাঁর টাকার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে।

প্রকাশ প্রথম প্রথম আসতো। চৌধুরী মশাই দরজায় খিল দিতেন। বলতেন—তুমি বেরোও দিকি, তুমি বেরোও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

প্রকাশ তবু নড়তো না। বলতো—আজ্ঞে, আপনি কেন হাত পুড়িয়ে রান্না করছেন

জামাইবাবু, আপনি বুড়ো মানুষ, আমি বাড়ি থেকে আপনার খাবার রান্না করে আনতে পারি—

চৌধুরী মশাই বলতেন—তুমি থামো দিকিনি, তুমি আর কথা বলো না—

প্রকাশ বলতো—আজ্ঞে, আমি তো ভালো কথাই বলছি, আমার স্ত্রী থাকতে আমি নিজে থাকতে আপনার নিজের হাতে রান্না করা কি ভালো দেখায়?

—ভালো দেখায় কি না দেখায় তা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি আর আমার সামনে এসো না—বলে প্রকাশের মুখের ওপরেই চৌধুর মশাই দরজা বন্ধ করে দিতেন।

বন্ধ দরজার সামনে প্রকাশ খানকিক্ষণ চুপ করে নির্বোধের মত দাঁড়িতে থাকতো। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ির রাস্তার দিকে পা বাড়াতো। তার হাতে তখন একটা পয়সাও নেই। ছেলে-মেয়ে-বউ ভালো করে পেট ভরে খেতে পায় না। দিদি মারা যাওয়ার পর থেকেই তার অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের সামনেই নবাবগঞ্জে জমি-জমা বিক্রি হয়ে গেল, তার চোখের সামনেই সুলতানপুরের জমি-জমাও বিক্রি হয়ে গেল। সেই টাকাকড়ি সমস্ত কিছু ভাগলপুরের ব্যাঙ্কে গিয়ে জামাইবাবু জমা দিয়ে এলেন। সেখান থেকে সুদের টাকা আনতে জামাইবাবু রিকশায় উঠে একলা চলো যান আর পেট চালানোর মত খরচার টাকাটা তুলে নিয়ে আসেন। প্রকাশ দূরে দাঁড়িয়ে শুধু হাঁ করে দেখে।

মুদিখানার সামনে আসতেই অখিল ডাকে।

—কী রায় মশাই, কিছু হলো? জামাইবাবু কী বলেন?

প্রকাশ বললে—জামাইবাবুর আর নাম কোর না অখিল, একেবারে চশমখোর, খাঁটি চশমখোর—

—কেন? অত গালাগালি দিচ্ছ কেন?

প্রকাশ রায় বললে—গালাগালি দেব না, চশমখোর লোক না হলে নিজের হাতে দুধ জ্বাল দিয়ে খায়, তবু আমার বউ-এর হাতের রান্না খাবে না। তা তোমার পাঁউরুটির দাম পাচ্ছো তো ঠিক ঠিক?

অখিল বললে—একেবারে নগদ। এক হাতে পাঁউরুটি দিয়ে আসি, আর এক হাতে নগদ পয়সা। চৌধুরী মশাই বলেন—বাকিতে খাবো না কারো কাছে—

শুধু অখিল নয়। যে দুধ দিয়ে আসে সেই গয়লানী বউও নগদ-নগদ পয়সা পেয়ে যায় দুধের। এমন কি খুচরো পয়সা পর্যন্ত ভাঙিয়ে রাখেন চৌধুরী মশাই। যেন দাম বাকি না পড়ে।

অখিল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—তা এত কষ্ট করে নিজের হাতে রান্না করেন কেন বলো তো রায় মশাই?

প্রকাশ বলে—ওই যে, যদি টাকার লোভে আমরা বিষ খাইয়ে দিই!

বিষ? টাকার এত লোভ! যে শোনে সে অবাক হয়ে যায়। তারা কীর্তিপদ মুখুজ্জে মশাইকেও দেখেছে। তিনি তো এমন ছিলেন না। ওই প্রকাশের বউই তাঁর খাবার বরাবর রান্না করে দিয়েছে! একবারও তো বিষ খাইয়ে দেবার ভয় হয়নি তাঁর। তা ছাড়া তিনি কত লোককে কত দান-ধ্যান করেছেন। কত লোক মাসোহারা পেয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর জামাই হয়ে এ কেমন ব্যবহার! টাকা কি তোমার সঙ্গে যাবে বাপু? টাকা কি কখনও কারো সঙ্গে গেছে? চিরদিন তো কেউ সংসারে বাঁচতে আসেনি। তাহলে? একদিন তো এই এত টাকা সবই ফেলে যেতে হবে! কে খাবে তোমার টাকা? টাকার এত মায়া?

কিন্তু এ কথাগুলো যাঁর উদ্দেশ্যে বলা তাঁর কানে তোলবার সুযোগও হয় না কারো,

তাই তাঁর কানে যায়ও না। সুলতানপুরের মানুষ বহুদিন ধরে আশা করেছিল কীর্তিপদ মুখুজ্জে মশাই-এর মত একদিন চৌধুরী মশাইও তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন, দরকারে-অদরকারে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তা হলো না। কোথা থেকে কোন্ অঞ্চলের এক মানুষ এসে সুলতানপুরের সব জমিজমা কিনে নিয়ে সব কিছুর মালিক হয়ে বসলো। আর তাদের যে-দশা চলছিল সেই দশাই চলতে লাগলো।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটলো। অখিল প্রতিদিন যেমন পাঁউরুটি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসে সেদিনও তেমনি গিয়েছে।

গিয়ে দেখলে দরজা বন্ধ। অবশ্য এমনিতে ঘরের দরজা সাধারণত বন্ধই থাকে। সদরের গেট দিয়ে ঢুকে উঠোন পেরিয়ে একতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় সে। চৌধুরী মশাই যদি তখন জেগে থাকেন তো অখিলকে দেখে হাত বাড়িয়ে পাঁউরুটিটা নিয়ে পয়সাটা দিয়ে দেন। কিন্তু ক্বচিৎ কদাচিৎ ঘরের দরজা বন্ধ থাকে। অখিল গিয়ে ডাকে—চৌধুরী মশাই—

একবার ডাকতে-না-ডাকতেই চৌধুরী মশাই দরজা খুলে দিয়ে পাঁউরুটিটা নিয়ে নেন। তারপর গয়লানী বউ-এর বেলাতেও তাই। দুজনের পয়সা যেন আগের রাত্রে হিসেব করে গুনে বালিশের তলায় রেখে দেন।

এমনিই বরাবর চলে আসছে।

কিন্তু সেদিন অখিলের ডাকে ভেতর থেকে আর কেউ সাড়া দিলে না।

অখিল কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। এমন তো হয় না।

অখিল আবার ডাকলে—চৌধুরী মশাই, আমি অখিল, দরজা খুলুন—

তবু কারো সাড়া নেই। তবু দরজা খুললে না কেউ—

অখিল অন্য কোনও উপায় না পেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—চৌধুরী মশাই, ও চৌধুরী মশাই—

তবু কেউ সাড়া দিলে না। ততক্ষণে দুধ নিয়ে গয়লানী বউও এসে গেছে। তাকে কোনও দিন তেমন অপেক্ষা করতে হয় না। দুধের কড়াতে দুধ মেপে দিয়ে দাম নিয়ে তার চলে যাবার কথা।

সেও একবার ডাকলে—চৌধুরী মশাই—চৌধুরী মশাই, আমি দুধ এনেছি—

তবু কারো সাড়া না পেয়ে দুজনেই কেমন ভয় পেয়ে গেল। এমন তো হয় না। চৌধুরী মশাই তো তেমন ঘুম-কাতুরে মানুষ নন।

ততক্ষণে খবরটা এক কান থেকে আর এক কানে চলে গেছে। অশ্বিনী ভট্টাচার্যি ছুটে এসেছে। প্রকাশ খবরটা পেয়েই দৌড়ে এসে হাজির। সেও বার-দুই ডাকলে—জামাইবাবু, জামাইবাবু—

তবু ভেতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই।

তখন সকলেরই কেমন ভয় হয়ে গেল। জ্যান্ত মানুষ হলে কি কেউ এত ডাকাডাকিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারে!

প্রকাশ বললে—তোমরা সরো, আমি আলসে দিয়ে একবার ওধারের জানলার কাছে যাই, গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি—

সরু কার্নিশের ওপর পা ফেলে-ফেলে প্রকাশ জানলার দিকে যাবার আগেই দেখলে সার-সার ডেয়ো-পিঁপড়ে ভেতরের দিকে লক্ষ্য করে চলেছে। একেবারে অশেষ। কোত্থেকে বুঝি ওরা টের পায়। ওরা বুঝি মানুষের আগেই টের পেয়ে যায় কোথায় কোন্ মানুষের শরীর থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

অখিল বললে—খুব সাবধানে যাবেন রায় মশাই—পড়ে গেলে হাত-পা একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে—

কিন্তু না, প্রকাশ বেশি দূর যেতে পারলে না। কালো-কালো পিঁপড়েগুলো দেখে প্রকাশের ভয় করতে লাগলো। সে আবার ফিরে এল।

বললে—না গো, হলো না—পিঁপড়ে কামড়ে দেবে—

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি বলে উঠলো—তা হলে কী চৌধুরী মশাই-এর অসুখ হলো নাকি?

অখিল বললে—এই কালকেও তো পাঁউরুটি দিয়ে গেছি আমি, আমাকে পাঁউরুটির দাম দিয়েছেন উনি—

গয়লানী বউও বললে—আমিও তো দুধ দিয়ে গেছি, দাম নিয়ে গেছি—

প্রকাশ বললে—এক কাজ করো, দরজা ভাঙো—

অনেক কথার পর শেষ পর্যন্ত তাই-ই সাব্যস্ত হলো। ভাঙো, দরজাই ভাঙো—

তারপর শাবল এল, হাতুড়ি এল। তা-ই দরজার ওপর দুম্-দুম্ করে মারা হতে লাগলো। কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরদার তৈরি বাড়ি। কাঠ নয় তো যেন লোহা। শাবলের এক-একটা ঘায়ে কাঠ যেন কথা বলতে লাগলো। এক-একবার হাতুড়ির ঘা পড়ে আর অষ্টাদশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর মধ্য-দশক পর্যন্ত সমস্ত শাসক-শোষকের আত্মা আত্মা যেন একসঙ্গে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। তাদের বুক থেকে ঘন-ঘন যন্ত্রণার অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে—উঃ—উঃ।

যখন দরজাটা ভেঙে পড়ে গেল সবাই ভেতরে ঢুকে দেখল চৌধুরী মশাই তাঁর বিছানাটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন। আর জানলার ফাঁক দিয়ে দলে-দলে কালো পিঁপড়ে এসে তাঁর সর্বাঙ্গ অক্রমণ করেছে।

প্রতিদিনের মত সেদিনও লোকাল ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামলো। ট্রেনটাকে ভালো করে থামবার ফুরসুৎও কেউ দেয় না। ভালো করে থামবার আগেই সবাই নেমে পড়ে। সেই সকাল বেলা সবাই অফিস-কাছারিতে গেছে আর ছুটির পর দৌড়তে দৌড়তে শেয়ালদা স্টেশনে এসে ট্রেন ধরেছে। তখন কে আগে আগে বাড়ি ফিরতে পারে তারই যেন প্রতি-যোগিতা চলে। ট্রাম-রাস্তা থেকেই ছুটতে শুরু করে। এক-একবার মাথার ওপরের ঘড়িটা দেখে আর ছোটে।

নয়নতারা যখন অফিসে যেত তখন ফেরার সময় সঙ্গে থাকতো নিখিলেশ। তখন এত তাড়া ছিল না দুজনেরই। দুজনেই তখন অফিস থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে স্টেশনে আসতো। একটা ট্রেন যদি চলেই যায় তো ক্ষতি নেই, আর একটা ট্রেন আছে—

কিন্তু এখন অন্যরকম। এখন অফিস থেকে বেরিয়ে নয়নতারাকে সঙ্গে নেবার আর কোনও দায় নেই। এখন একলা-একলাই স্টেশনে এসে নিখিলেশকে ট্রেন ধরতে হয়, আবার একলাই ট্রেন থেকে নামতে হয়। তারপর রাস্তা দিয়ে একমনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি। অথচ যেন বাড়িতে না পৌঁছোতে পারলেই নিখিলেশ বাঁচে। যেন দেরি করে বাড়িতে পৌঁছে খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়তে পারলে সে নিষ্কৃতি পায়।

বাজারের কাছ দিয়ে যেতেই পেছনের দোকান থেকে কে যেন ডাকলে—ও নিখিলেশ-বাবু—নিখিলেশবাবু—

নিখিলেশ পেছন ফিরে দেখল একজন অচেনা লোক একটা সোনারুপোর দোকানের

ভেতর থেকে তাকে ডাকছে। ভদ্রলোককে চিনতে পারলে না আবার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম মনোহর দত্ত। আপনি চিনবেন না, কিন্তু আপনার স্ত্রী একটা সোনার হার বাঁধা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে, তার বদলে চারশো টাকা দিয়েছিলুম—

নিখিলেশ আকাশ থেকে পড়লো। নয়নতারা সোনার হার বাঁধা রেখে চারশো টাকা নিয়ে গেছে!

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলো—তা তিনি বলেছিলেন একমাসের মধ্যেই হারটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, প্রায় দু'মাস হতে চললো, তবু তিনি এলেন না—তাই আপনাকে কথাটা বলছি—

নিখিলেশ এ-কথার কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা, আপনি কিছু ভাববেন না—আমি নিজে একদিন এসে টাকা দিয়ে হারটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো—

বলে আবার বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

রাস্তায় চলতে চলতে নিখিলেশের মনে হলো তার বাড়িটা যেন আরো দূরে হলে ভালো হতো। ভালো হতো যদি বাড়িতে গিয়ে আবার নয়নতারার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে না হতো। কিন্তু কেন নয়নতারা এমন কাজ করতে গেল। আর যদি ডাক্তার-ওযুধের জন্যে নিজের হার বাঁধা দেওয়ার দরকারই হয়েছিল তো তার কাছে জিনিসটা সে লুকোল কেন? কেন তাকে একবার বললে না পর্যন্ত? বললে কি সে বাধা দিত কিম্বা বারণ করতো?

অফিসের লোকরা বলে—তোমার কী হলো হে? এ রকম মনমরা হয়ে যাচ্ছ কেন দিন দিন?

নিখিলেশ হাসবার চেষ্টা করতো। একটা আড়ষ্ট হাসি হেসে বলতো—কেন, আমার তো কিছু হয়নি—

সত্যিই যে নিখিলেশের কী হয়েছে তা কাউকে বলবার নয়। বললে লোকে মজা পাবে, বললে বরং লোকে হাসবে। মনে মনে বলবে, বেশ হয়েছে। অথচ বাইরে থেকে সবাই-ই তাকে হিংসে করে। হিংসে করে তার সৌভাগ্যের কথা ভেবে। সত্যিই তার সৌভাগ্য না তো কী? স্বামী-স্ত্রীতে উপায় করা ক'জনের ভাগ্যে জোটে! অফিসের বেশির ভাগ লোকই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সংসার চালাতে গিয়ে হাঁফিয়ে ওঠে। সকলের মুখেই এক কথা—নেই। বউ-ছেলে-মেয়ের খরচ যোগাতেই মাসের মাঝামাঝি সবাই ফতুর। তারপর আর বাড়িতে মাছ আসে না। জিনিসপত্তোরের, দাম নিয়ে যখন সবাই আলোচনা করে তখন নিখিলেশও কথা বলতে যায়। কিন্তু সবাই তাকে থামিয়ে দেয়। বলে—তুমি থামো হে, তুমি আর কথা বোল না—

নিখিলেশ বলে—কেন? আমি থামবো কেন? আমি কি সংসার করি না?

তারা বলে—তোমরা তো হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ দু'জনে মিলে রোজগার করেছো, তোমাদের কী ভাবনা?

নিখিলেশ হাসে। বলে—দু'জনে রোজগার করলেই কি সব সমস্যা মিটে গেল? টাকা ছাড়া কি মানুষের আর কোন সমস্যা নেই?

সবাই নিখিলেশের কথায় অবাক হয়ে যায়। টাকা ছাড়া আবার সমস্যাটা কী মানুষের? টাকাই তো সংসারে আসল জিনিস! আঢেল টাকা রোজকার করো, তারপর সেই টাকা ব্যাঙ্কে

পুরে রেখে দাও, তখন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে খাও দাও আর ফুর্তি করো।

নিখিলেশের অফিসের সকলের মুখে এই একই কথা। এতদিন নিখিলেশেরই কম-বেশি ওই সমস্যা ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে অনেকদিন নিখিলেশ নয়নতারাকে বলেছে—চলো না, কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকি—

নয়নতারা বলেছে—কেন? তোমার ক্ষিধে পেয়েছে নাকি?

নিখিলেশ বলেছে—কেন, তোমার ক্ষিধে পায়নি! তুমিও তো সেই কোন্ সকালে বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ!

নয়নতারা বলেছে—মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করে কী হবে? তার চেয়ে এইটুকু রাস্তা একটু কষ্ট করে চলো না, একেবারে বাড়িতে গিয়েই খাবো—

নিখিলেশ ভাবতো নয়নতারা সত্যিই বড় কৃপণ। দু'জনের মাইনের টাকা মিলিয়ে অনেকগুলো টাকাই তো হচ্ছে তাদের। নয়নতারা ততদিনে কিছু টাকাও জমিয়ে ফেলেছিল ব্যাঙ্কে। নয়নতারার ইচ্ছে ছিল একদিন কয়েক বছর পরে যখন আরো কিছু টাকা হবে তখন এই কলকাতা শহরে তারা একটা বাড়ি করবে। বেশ ছোট সাজানো-গোছানো একটা বাড়ি।

—বাড়ি!

বাড়ির নাম শুনেই চমকে উঠতো নিখিলেশ। বলতো—কলকাতায় বাড়ি করবে? তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? কলকাতায় জমির দাম কত জানো? দশ হাজার বারো হাজার করে কাঠা—বাড়ি অমনি করলেই হলো?

নয়নতারা বলতো—তুমি একটু কম করে খরচ করো, দেখবে ছোট মতন একটা বাড়ি হয়ে যাবেই আমাদের।

অথচ প্রথমে একটা গয়না কিনতে চায়নি সে। গয়নার লোভ তার অনেকদিন আগেই মিটে গিয়েছিল। নয়নতারা বলতো—গয়না পরে হাতী-ঘোড়া কী এমন হবে! হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেয়েই বা কি হবে? অথচ কলকাতায় যদি একটা বাড়ি হয় তো কত আরাম বলো তো! তখন আর ছুটে ছুটে প্রাণ বের করে রোজ ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতে হবে না। বাড়ি থেকে সকাল দশটায় বেরোব আর বাসে উঠে টপ্ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে অফিসে গিয়ে পৌঁছবো। আর মাসে মাসে এই এতগুলো টাকা ভাড়া গুনতে হবে না মিছিমিছি। সে টাকায় পেটে খেলে তবু বরং কাজ দেবে।

অথচ আশ্চর্য, সেই লোক হঠাৎ আজ নিজের হারটা পর্যন্ত বাঁধা রেখে দিল। একবার তাকে বললে না পর্যন্ত পাছে সে বারণ করে। নয়নতারার অত কষ্টে না খেয়ে জমানো টাকাগুলো সমস্ত খরচ করছে বাইরের আর একজনের চিকিৎসার জন্যে—

চলতে চলতে কী মনে হলো, নিখিলেশ আবার ফিরলো। অনেকখানি রাস্তা চলে গিয়েছিল নিখিলেশ। আবার ফিরে এসে সেই মনোহরবাবুর সোনা-রুপোর গয়নার দোকানের সামনে দাঁড়ালো।

মনোহর দত্ত নিখিলেশকে দেখে বললে—কি হলো? আবার ফিরলেন যে? কিছু বলবেন?

নিখিলেশ বললে—দেখুন হারটা কবে আমার স্ত্রী বাঁধা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন বলুন তো? কোন্ তারিখে? আপনার খাতাটা একবার বার করে দেখুন তো—

মনোহর দত্ত লোহার সিন্দুকের ভেতর থেকে একটা খেরো খাতা বার করলে। খাতার পাতা উল্টে উল্টে একটি জায়গায় এসে থামলো। বললে —এই যে, গেল মাসের চোদ্দ

তারিখে। উনি বলেছিলেন মাইনেটা পেয়েই হারটা ছাড়িয়ে নেবেন—

নিখিলেশ বললে—ঠিক আছে, আপনি কিছু ভাববেন না মনোহরবাবু, আমি যত শিগগির পারি হারটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো—বলে নিখিলেশ আবার বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। গানের ফাটা রেকর্ডের মত ঘুরে ঘুরে ওই একটা কথাই তার মনের গ্রামোফোনে বার বার বাজতে লাগলো—গেল মাসের চোদ্দ তারিখে! গেল মাসের চোদ্দ তারিখ...

এই পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে মানুষ আজ অনেক দূরে সরে এসেছে। আগে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা শুরু হতো আর সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হতো। কিন্তু যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে-পৃথিবীর সব কিছু বদলে গেল। ভুগোল বদলে গেল, ইতিহাস বদলে গেল, আর যাকে নিয়ে ভুগোল ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান সব কিছু, সেই মানুষই আমূল বদলে গিয়ে একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সুত্রতে জট বাধলো, বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা এসে মানুষকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে। অন্যদিকে তেমনি বিরোধ ঘটলো দেশের সঙ্গে দেশের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, কালোর সঙ্গে কালোর, সাদার সঙ্গে সাদার, ভাষার সঙ্গে ভাষার, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের। তারপর সেই বিরোধ এসে ঢুকলো পরিবারের ভেতরে। বিরোধ বাধলো পরিবারে, ভাইয়ে ভাইয়ে। শেষ সংঘাত বাধলো স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে বাঙলাদেশে এক ভুস্বামীর শেষ বংশধর বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার জন্যেই নৈহাটির এক মধ্যবিত্ত সংসারে এসে হাজির হয়েছিল। আর হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আর একজনদের সংসারে বিপর্যয় ডেকে আনলে।

এ কি কম বিপর্যয়! নইলে যে-নিখিলেশ একদিন ছোটবেলায় স্বদেশী করেছে, স্বদেশী ফ্ল্যাগ নিয়ে কেষ্টনগরে মিছিলের মওড়া নিয়েছে, পুলিসকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করেনি, অবস্থার চক্রে পড়ে তাকেই আবার একদিন একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি নিতে হয়েছে। তা হোক, চাকরি সকলকেই করতে হয়! চাকরি না করে সে করতোই বা কী! নিখিলেশের অনেক বন্ধু বান্ধব দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বড় বড় পোস্ট পেয়েছে। কেউ রাষ্ট্রমন্ত্রী, কেউ এম-এল-এ। আবার কেউ বা কিছুই হয়নি। বড় জোর ফুড-ডিপার্ট-মেন্টে একটা চাকরি পেয়েই খুশী থেকেছে। কিন্তু তার বেশি আর কী সে চেয়েছিল? সে কি চেয়েছিল সে একটা কেষ্ট-বিষ্টু কিছু হবে?

ঠিক এই সময়েই তার জীবনে এসে গেল নয়নতারা। তখন থেকে নয়নতারাকে ঘিরেই তার জীবন বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো। একটা ছোট বাড়ি, একটা ছোট সংসার আর ব্যাঙ্কে কিছু সংস্থান। সব মানুষের যা যা কাম্য থাকে সেইটুকুর বেশি আর কিছু নিখিলেশ তখন চাইতো না। প্রথম প্রথম যদিও বা একটু এধারে ওধারে বাজে খরচ করতো তাও তারা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু সমস্ত কিছু প্ল্যান গোলমাল করে দিলে সদানন্দ এসে। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত নিখিলেশের সমস্ত জীবন যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গেল।

অফিসের ভেতরে সেদিন কতক্ষণ কাজ করেছে নিখিলেশ তার খেয়াল ছিল না। যখন ঘড়ির দিকে নজর পড়েছে দেখলে সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে। খুব শীত পড়েছে।

হঠাৎ শীতেশ নিখিলেশকে দেখতে পেয়েছে। শীতেশ ভৌমিক! আপার ডিভিশন ক্লার্ক।

বিয়ে-থা করেনি। যা মাইনে পায় তার সবটাই দু'হাতে ফেলে ছড়িয়ে খরচ করে। সে নিখিলেশের কাছে এসে দাঁড়ালো।

—কী রে, তুই এখনও কাজ করছিস যে?

নিখিলেশ বললে—এই ভাই কিছু এরিয়ার পড়ে ছিল তাই...

শীতেশ বললে—তা তোর স্ত্রী? তোর জন্যে ওয়েট করবে না?

নিখিলেশ বললে—না, আমার স্ত্রী আজকে অফিসে আসেনি—

—অফিসে আসেনি? তাহলে শরীর খারাপ বুঝি? তা ক'টার ট্রেনে তুই বাড়ি যাবি?

নিখিলেশ বললে—ট্রেনের কি অভাব আছে? অনেক ট্রেন যে-কোনও একটাতে গেলেই হলো। অন্য দিন তো সময় পাই না তাই বাকি কাজগুলো আজকে তুলে ফেলছি—

শীতেশের কী হলো কে জানে। বললে—বড় শীত পড়েছে রে, চল্ না কোথাও গিয়ে একটু বসি, গা'টা গরম করি গিয়ে, যাবি?

গা-গরম করা মানেটা যে কী তা নিখিলেশ জানতো। শীতেশের যে সে-অভ্যেস আছে তা কম-বেশি অফিসের সবাই-ই জানে।

শীতেশ বললে—আরে অত ভাবছিস কেন? কাজ তো আছেই, কাজ তো লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকে কখনও বাড়ি-ছাড়া করতে নেই, ওঠ্ ওঠ্, আজকে তো আর তোর বউ নেই যে টের পাবে—

নিখিলেশের হঠাৎ মনে পড়লো বাড়িতে গেলেই সেই এক দৃশ্য ঃ ডাক্তার আর রোগ! নয়নতারার দেখাই হয়ত পাওয়া যাবে না। গিরিবালাকে ডেকে চুপি চুপি ভাত খেয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া। তারপর যদি নয়নতারা দেখতে পায় তো অবাক হয়ে যাবে। বলবে—ওমা, তুমি কখন এলে?

এই ঘটনাই প্রায় প্রতিদিন। প্রতিদিনই বলবে—জানো, ওর জ্বরটা এখনও ছাড়ছে না—

নিখিলেশ এ-কথার কোনও উত্তর দেবে না প্রথমে। এক-একদিন বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে —তা ওর জন্যে এত ভাবনা তোমাকে কে করতে বলেছিল? ওকে হাসপাতালে পাঠালেই পারতে, ওর জ্বরও সেরে যেত—

কিন্তু না, কথাটা বলতে গিয়েও নিখিলেশের মুখে আটকে যেত। বলতে ইচ্ছে হতো—ওর ভাবনাই যদি ভাববে তাহলে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলে কেন? কেন আমার জীবন এমন নষ্ট করে দিলে তুমি? আমাকে বিয়ে করবার জন্যে কে তোমার পায়ে ধরে সাধাসাধি করেছিল?

না, এসব কথা বলাও শোভা পায় না নিখিলেশের। তাই নিখিলেশ কিছুই বলতো না। আগেও যেমন মাইনের টাকাটা নয়নতারার হাতে দিত, সেবারও তাই দিলে।

নয়নতারা বললে—আমার আমার মাইনেটা?

নিখিলেশ বললে—তা তুমি তো আমাকে পে-অথরিটি দাওনি।

নয়নতারা বললে—আমার কি ছাই মনে ছিল? তুমি তো দেখছো আমার অফিসের কথা ভাববার সময় নেই, দিন-রাত কেবল রোগী নিয়ে ব্যস্ত, আমাকে তো মনে করিয়ে দেবে—

হঠাৎ শীতেশের কথায় নিখিলেশের যেন চমক ভাঙলো—কী হলো রে, অমন গুম্ মেরে বসে আছিস যে? নেশো হলো নাকি?

নিখিলেশ বললে—না—

—তাহলে—খা!

একটুখানি খেয়েই নিখিলিশের মাথাটা কেমন করছিল। যে-যন্ত্রণাটা এতদিন মনের মধ্যে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেটা যেন তখন খানিকটা কমলো।

শীতেশ বললে—আমি তো ভাই রোজ খাই। শীতকালে একটু খাওয়া ভালো। ডাক্তার খেতে বলেছে আমাকে—তুইও আর একটু খা—

বলে একজন ওয়েটারকে আর একটু আনতে বললে।

নিখিলেশ বললে—না ভাই, আর খাবো না।

—কেন, খেতে দোষ কী? এ খাওয়া তো পাপ নয় রে—

নিখিলেশ শীতেশের একটা হাত চেপে ধরলে। বললে—না ভাই, প্লিজ, আমি আর খেতে পারবো না, আমাকে বাড়ি যেতে হবে, সাড়ে ন'টার একটা ট্রেন আছে সেটা ধরতে হবে—

শীতেশ বললে—তা যাবি! আমি কি তোকে যেতে বারণ করছি? আমিও তো বাড়ি যাবো। সবাই-ই বাড়ি যাবে। এখানে কেউ কি সারারাত থাকতে এসেছে?

নিখিলেশ বললে—তা নয়, ভাবছি এককালে এই আমিই ভাই মদের দোকানে কতবার পিকেটিং করেছি, আর আমিই আজ সেই মদ খাচ্ছি—

শীতেশ হো হো করে হেসে উঠলো—আরে দূর, তুই কী বলছিস, আমি নিজেও তো একদিন মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছি। তখন মহাত্মা গান্ধী যা বলেছে তাই-ই করেছি। তুই জানিস, আমি নিজের হাতে চরকায় সুতো কেটেছি, সেই সুতোয় ধুতি-জামা তৈরি করে পরেছি। কিন্তু এখন তো ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গিয়েছে, এখন কী আর চরকা কাটি না খদ্দর পরি? এখন তো এই দ্যাখ না টেরিলিন ধরেছি, ট্রাইজার বুশ শার্ট পরি—

নিখিলেশ বললে—আমিও তো তাই—

শীতেশ বললে—শুধু তুই আমি কেন রে? এখন তো কেউই আর সে-সব কথা মানে না। যারা তখন মদ ছুঁতো না, তারা সবাই এখন খায়—

নিখিলেশ হঠাৎ বলে উঠলো—তুই আছিস বেশ, বিয়ে-টিয়ে করিসনি, বেশ ফ্রি। কাউকে কোনও জবাবাদিহিও করতে হয় না তোকে—

শীতেশ অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, কার কাছে তোকে জবাবদিহি করতে হয়? কীসের জন্যে জবাবদিহি করতে হয়?

নিখিলেশ এতদিন হলো বিয়ে করেছে। নিজের সম্বন্ধে কখনও কারো কাছে কোনও গল্প করেনি। গল্প করা প্রয়োজনও মনে করেনি। প্রতিদিন ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়তে দৌড়তে নয়নতারার অফিসে গেছে। নয়নতারাও তার অফিসের গেটের সামনে প্রতিদিন নিখিলেশের জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কিন্তু এখন অন্য রকম। এখন বাড়ি যাবার তাড়া বিশেষ নেই আর। যখন হোক গেলেই হলো। ততক্ষণ অফিসের ফাইল ক'টা ক্লিয়ার করার তাগিদ যেন তার কাছে হঠাৎ বড় জরুরী হয়ে উঠেছে।

—জবাবদিহি?

কথাটা মনে লাগলো নিখিলেশের। তাকেই তো বরাবর জবাবদিহি দিতে হয়েছে নয়নতারার কাছে। প্রতিটি পয়সা খরচের পর্যন্ত জবাবদিহি করতে হয়েছে নয়নতারার কাছে। অথচ এখন? এখন যে নিজে অন্য একজনের জন্যে অকারণে টাকা খরচ করে যাচ্ছে, তার বেলায়?

বললে—চল্ উঠি এবারে—

শীতেশ বললে—কই, আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না যে?

নিখিলেশ বললে—জবাব আর কী দেব। তুই তো বিয়ে করলি না। বিয়ে করলে বুঝেতে পারতিস।

—কেন, তোর বউ কি গয়না-টয়না চায় বুঝি খুব?

নিখিলেশ বললে—না না, গয়নাটয়না মোটেই চায় না, কলকাতায় শুধু একটা বাড়ি করতে চায়। কলকাতায় নিজস্ব একটা বাড়ি করার খুব শখ নয়নতারার—

বলে নিখিলেশ হঠাৎ উঠে পড়লো। বললে—না আর খাবে না, খেলে গাড়ির লোক সব জানতে পারবে—

—জানতে পারলে তো বয়ে গেল। আমার পাড়ার লোক তো সবাই জানে আমি মদ খাই। কে মদ খায় না শুনি? সবাই তো খায়? সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে খায় আর আমি বুক ফুলিয়ে খাই, এই যা তফাত। তারা তো মদ খাওয়ার চেয়েও আরো বড় বড় পাপ করছে—

নিখিলেশ বললে—কী পাপ?

—তুই তো জনিস সব, আমাকে আর কেন জিজ্ঞেস করছিস? আমাদের অফিসে দেখছিস না কত টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে কোম্পানি? সেটা পাপ নয়? পলিটিক্যাল-পার্টির ফাণ্ডে চাঁদা দিচ্ছে বলে তাই গভর্ণমেণ্টও কিছু বলছে না!! আর আমরা তো শুধু নিজের গাঁটের পয়সায় মদ খাচ্ছি, এটা আর এমন কি অপরাধ?

তখন বিল চুকিয়ে দিয়েছে শীতেশ। নিখিলেশ বাইরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—ও-সব বড় বড় কথা ভাই আমাদের আলোচনা করা শোভা পায় না। এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে, এরই মধ্যে আমাদের মরতে হবে। আমরা তো রামমোহন রায়ও নয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নয়, নেহাৎ হরিপদ কেরানী, কষ্টে-সৃষ্টে যদি কোনও দিন ধার-দেনা করে কলকাতায় একটা বাড়ি করতে পারি তাহলেই আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে—

—আয়, একটা পান খাই—

—পান কেন?

—তাহলে তোর নয়নতারা আর গন্ধ টের পাবে পাবে না—পান খেলে মুখের সব গন্ধ ঢেকে যায়—

নিখিলেশ নৈহাটির রাস্তায় চলতে চলতে ভাবছিল সত্যিই কেউ তার মুখের গন্ধ টের পাচ্ছে কিনা। না, তা পাচ্ছে না। পেলে গাড়িতেই সবাই টের পেত। গাড়িতেও অনেক চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে বাধ্য হয়ে কথাবার্তা বলতে হয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ এই মনোহর দত্তের কথায় যেন তার নেশা কেটে যাবার উপক্রম হলো। কেন নয়নতারা কথাটা একবার বললে না তাকে! কেন তার শখের সোনার হারটা মনোহর দত্তর দোকানে বাঁধা রাখতে গেল! নিখিলেশ টের পাবে বলে?

বাড়ির সামনে গিয়ে সে দরজার কড়া নাড়বে কিনা ভাবতে লাগলো। কড়া নাড়লেই যদি নয়নতারা দরজা খুলতে আসে! দরজা খুলে যদি তার মুখের গন্ধটা টের পায়? তখন?

গলিরাস্তার ধারেই বাড়িটা। পাশের জানালাটা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলে হয়। ভেতরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। জানালার নিচেকার পাল্লা দুটো বন্ধ। ভেতরে যেখানে ভদ্রলোক শুয়ে আছে সেইখানটা দেখতে গেলে জানলার ওপর থেকে উঁকি মারতে হয়।

নিখিলেশ এক কাণ্ড করে বসলো। এককোণ থেকে জানালার পাল্লার ওপর উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ভেতরে চেয়ে দেখলে তক্তোপোশটার ওপর ভদ্রলোক শুয়ে আছে। তার জ্ঞান আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। নিথর নিস্পন্দ মানুষটা। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আর তার মাথার কাছে জানালার দিকে পেছন ফিরে বসে নয়নতারা একমনে তার মাথায় আইস-ব্যাগ লাগিয়ে দিয়ে বসে আছে।

নিখিলেশ অনেক্ষণ ধরে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

আশ্চর্য! যে মানুষটা একদিন নয়নতারার ওপরে অত্যাচার-অপমানের শেষ রাখেনি, যে-মানুষটা একদিন নয়নতারার জীবনটা বিষিয়ে দিয়েছিল, যার জন্যে একদিন নয়নতারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া সব কিছু মুছে আবার কুমারী হয়ে উঠেছিল, সেই তাকেই কিনা এই অমানুষিক সেবা! এও কি এক ভাগ্যের পরিহাস নয়! এ কেমন করে সম্ভব হলো! এই লোকটাই জন্যেই তার অত সাধের সোনার হারটা পর্যন্ত স্যাকরার দোকানে বাঁধা রেখে দিতে নয়নতারার বাধলো না! নারী-চরিত্র কি এমনিই বিচিত্র জিনিস!

সেখানে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উঁকি মেরে দেখতে দেখতে নিখিলেশের নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো। এ কী করছে সে! তার নিজের বাড়ি, তার নিজের স্ত্রী, তবু নিজের বাড়ির ভেতরে চেয়ে দেখবার সাহস নেই তার। এ কী কম্প্লেক্স তার, এ কী তার ব্যবহার!

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি জানালা থেকে নেমে পড়লো। তারপর পাশের উঠোনের দিকের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের মনকে শক্ত করে নিলে সে। না, সে কিছুই অপরাধ করেনি। এমন কিছু করেনি যে যার জন্যে নিজের বাড়িতে ঢুকতে তার লজ্জা করবে।

হাত বাড়িয়ে দরজায় কড়াটা নাড়তে যাবে এমন সময় ভেতর থেকেই থেকেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। দেখা গেল গিরিবালা বেরোচ্ছে।

—গিরিবালা, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

গিরিবালা বললে—ওযুধ ফুরিয়ে গেছে, তাই ওযুধ আনতে—

তারপর কী ভেবে নিয়ে বললে—আপনি এখন খাবেন আপনাকে খাবার দিয়ে যাবো?

নিখিলেশ বললে—না, আমি অফিস থেকে খেয়ে এসেছি, খাবো না—তুমি যাও আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি—

বলে ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে কলঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আর তারপর চুপি-চুপি বিছানায় শুয়ে পড়ে লেপটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপা দিয়ে দিলে।

—দিদিমণি—দিদিমণি—

গিরিবালার গলার আওয়াজ পেয়ে নয়নতারা হাতের আইস-ব্যাগটা পাশে রেখে উঠলো। ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—কী গো, কী?

হাতের ওযুধটা বাড়িয়ে দিলে গিরিবালা।

—ও মা, তুমি কখন ওযুধ আনতে গেলে আমাকে তো বলে যাওনি কিছু—

গিরিবালা বললে—বাবু যে বাড়ি এল তাই আর তোমাকে ডাকিনি—

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল। বললে—বাবু? বাবু কখন এল? আমি তো টের পেলুম না, কখন এল বাবু?

আশ্চর্য! কিছুই টের পায়নি সে। ওযুধটা রেখে নয়নতারা তাড়াতাড়ি তার শোবার ঘরে ঢুকে দেখলে নিখিলেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল নিখিলেশের কাণ্ড দেখে। আগে যখন দুজনে অফিসে যেত তখন তো এত দেরি করে অফিস থেকে আসতো না!

নয়নতারা বললে—শুনছো—ওগো—

তবু কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

নয়নতারা আবার ডাকলে—ওগো শুনছো—

তারপরে বাইরে এসে গিরিবালার কাছে গেল। বললে—হ্যাঁ গো গিরিবালা, বাবু কি না খেয়েই শুয়ে পড়েছে নাকি?

গিরিবালা বললে—না দিদিমণি, আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, বাবু বললেন আজ কিছু খাবেন না, অফিস থেকেই খেয়ে এসেছেন—

—কী মুশকিল! ভাতগুলো নষ্ট হলো তো! বললে—ভাতগুলোতে জল ঢেলে রেখে দিও, কাল সকালে না হয় আমিই জল দেওয়া ভাত খাবো—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। তখন আর দাঁড়াবার সময়ও ছিল না তার। ওদিকে ওঘরে মানুষটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। মাথায় আইস-ব্যাগ দিতে দিতে উঠে এসেছে, আবার রোগীর কাছে এসে বসলো সে। এ ক'দিন যে কী বিপদের মধ্যে দিয়ে কাটছে তার ঠিক নেই। মানুষটার সমস্ত শরীর এই দু'মাসের মধ্যেই হাড়-সার হয়ে গিয়েছে!

—দিদিমণি!

নয়নতারা দরজার দিকে চেয়ে দেখলে গিরিবালা দাঁড়িয়ে।

—খাবে না?

ঘড়ির দিকে চাইতেই খেয়াল হলো রাত দশটা বেজে গেছে। কখন যে রাত দশটা বেজে গেল বুঝতেও পারেনি সে। বললে—তুমি তাহলে এসে এঁর মাথায় আইস-ব্যাগটা একটু ধরো তো, আমি তাড়াতাড়ি যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে আসি—

গিরিবালা এসে আইস-ব্যাগটা ধরতেই নয়নতারা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু খেতে বসেও নয়নতারা মনটাকে কিছুতেই ওই রোগীর ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে না। গিরিবালার হাতে মানুষটাকে ছেড়ে দিয়েও যেন শান্তি নেই তার। অর কতদিন এমন করে চলবে কে জানে! যে লোকটা এত অহঙ্কার করে তার ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে যে আবার এমন করে সেই তারই আশ্রয়ে এসে তারই কাছ থেকে সেবা পাবে এও বুঝি তার কপালে লেখা ছিল! অনেক দিন রাত্রে মানুষটা তার দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন বলতে চাইতো। অথচ সে কল্পনাও করতে পারতো না যে যার দিকে সে চেয়ে আছে সে নয়নতারা। নয়নতারাকে চিনতে পারলে সে কী করতো কে জানে! ডাক্তারবাবুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল নয়নতারা—আপনি কী রকম বুঝছেন ডাক্তার-বাবু? উনি সেরে উঠবেন তো?

ডাক্তারবাবু বলেছিল—আগের থেকে তা এখন ইমপ্রুভ করেছে। ওষুধগুলো ঠিক ঠিক খাইয়ে যাবেন, তহলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন—

নয়নতারা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু এখনও লোক চিনতে পারেন না কেন?

ডাক্তারবাবু বলেছিল—লোক চিনতে একটু সময় লাগবে। অত হাই-ফিভার থাকলে ব্রেনের ওপরেও তো তার অ্যাকশান হয়। আজকাল এই রকম রোগী অনেকগুলো পাচ্ছি। এই নতুন ধরনের টাইফয়েড আজকাল খুব হচ্ছে—

নয়নতারা বলেছিল—অনেকে বলেছিল হাসপাতালে পাঠাতে। আমি কিন্তু আপনার ভরসাতেই রেখেছি। কিছু বিপদ হবে না তো?

ডাক্তারবাবু বলেছিল—এতদিন যখন হাসপাতালে পাঠাননি তখন আর পাঠাবার দরকার নেই, ক্রাইসিসটা কেটে গেছে—

—দেখবেন ডাক্তারবাবু, আমার যেন মুখরক্ষা হয়। নইলে বড় বিপদে পড়বো।

ডাক্তরবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—ইনি আপানার কে হন?

নয়নতারা বলেছিল—আমার খুব বিশেষ আত্মীয়—শ্বশুরবাড়ির লোক—

এঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে কেউ নেই? বিয়ে হয়েছে এঁর?

নয়নতারা বলেছিল—হ্যাঁ—

—তা এঁর স্ত্রীকে খবর পাঠিয়েছেন? তারা কেউ এলে তো তবু আপনার কষ্টটা একটু কমতো। আপনি কতদিন একলা রাত জাগবেন এমন করে? মাসের পর মাস এমন করে রাত জাগলে শেষকালে আপনিও তো ভেঙে পড়বেন। এর পর যদি আপনি নিজে ভেঙে পড়েন তো তখন সব কিছু যে অচল হয়ে যাবে। তা ছাড়া মিস্টার ব্যানার্জীকে একটু সাহায্য করতে বলেন না কেন? তিনিও তো মাঝে মাঝে এক একদিন রাত জাগলে পারেন—

—তিনি তো সারাদিন অফিস করেন। সেই ভোরবেলা বেরিয়ে যান আর রাত্তির হয় ফিরতে, তাঁকেই বা কী করে বলি!

—তা হলে আপনার একটা নার্সের ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য তাতে খুবই খরচ পড়বে। আর একজন নার্সের দ্বারা তো হবেও না, দুজন নার্স দরকার। পালা করে ডিউটি করবে।

নয়নতারা বলেছিল—এতদিনই যখন নার্স না-রেখেই সব কিছু করতে পারলুম, তখন আর ক'টা দিনের জন্যে কেনই বা বাইরের লোক রাখা! আর তা ছাড়া আমি যে-রকম করে দেখাশোনা করবো সে-রকম করে কি আর মাইনে-করা নার্সরা করবে—

—তা ঠিক। তবে আপনি যা করছেন তা নিজের স্ত্রী তো দূরের কথা, কারো নিজের মা-ও তেমন করে করতে পারতো না।

কথাটা শুনে নয়নতারার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—অমন করে বলবেন না। শুধু বলুন, ওঁর যে কষ্টটা হচ্ছে তা যেন তাড়াতাড়ি লাঘব হয়—আমি ওঁর কষ্ট আর দেখতে পারছি না—

ডাক্তারবাবু বলেছিল—ওঁর যা হবার তা তো হচ্ছেই, কিন্তু তার জন্যে আপনার কষ্টটা কি তার চেয়ে কিছু কম হচ্ছে?

এর উত্তরে নয়নতারা কিছুই বলেনি। আর বলবার ছিলও না কিছু। মানুষটা রোগ থেকে সেরে উঠে যত তাড়াতাড়ি চলে যায় সেই প্রার্থনাই সে কেবল করতো ভগবানের কাছে। মানুষটা চলে গেলেই সে আবার আগেকার মত নিয়ম করে অফিসে যেতে পারবে, আবার নিখিলেশেরও দেখাশোনা করতে পারবে নিয়ম করে। অফিসে যাবার আগে যখন নিখিলেশ খেতে বসতো তখন মাঝে-মাঝে নয়নতারা কাছে এসে দাঁড়াতো। বলতো—এ কি, তুমি কিছু খেলে না যে?

নিখিলেশ বলতো—আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না—

নয়নতারা বলতো—বা রে, ভাবতে হবে না মানে? আমি ভাববো না তো কে ভাববে? তোমার তো ট্রেনের দেরি আছে এখনও—আর দুটো ভাত নাও—

কিন্তু নিখিলেশ তার আগেই জায়গা ছেড়ে উঠে পড়তো। নয়নতারা বলতো—এ রকম করে খেলে তোমার শরীর কী করে টিঁকবে বলো তো?

—না, আমার আর খিদে নেই—

বলে কারো কথা না শুনে সোজা অফিসে চলে যেত। এ-রকম প্রায়ই হতো। তখন অন্তত আর এ-রকম হবে না। সংসারের কত কাজ পড়ে আছে, কোনও দিকে দেখতে পারছে না নয়নতারা। বিছানার চাদর ছিঁড়ে গেছে, ঘরের দেয়ালে সিলিং এ ঝুল জমেছে, কোনও দিকে দেখবার সময় পাচ্ছে না সে। এবার মানুষটা ভালো হয়ে গেলে সে আবার সমস্ত দেখতে পারবে। আবার নিখিলেশের অফিস যাবার পর সে নিজেও অফিসে যাবে, আবার ফেরার সময় একসঙ্গে এক গাড়িতে অফিস থেকে ফিরবে।

—দিদিমণি, নতুন বাবু কেমন করছে—

গিরিবালার কথায় খেতে খেতে নয়নতারা খাবার ফেলে দিয়ে উঠলো। বললে—কী রকম করছেন?

গিরিবালা বললে—খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হলো, কেমন যেন ছট্‌ফট করছেন—

নয়নতারা বললে—তুমি খেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি—

বলে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে সোজা রোগীর ঘরে গিয়ে নয়নতারা দেখলে সদানন্দ মাথাটা বালিশের ওপর একবার এদিক একবার ওদিক করছে। এমন তো হয় না। নয়নতারার মনে হলো যেন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তার। যেন যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। সমস্ত শরীরটা যেন যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে উঠছে—

নয়নতারা সদানন্দর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলো—কষ্ট হচ্ছে তোমার? কী কষ্ট হচ্ছে তোমার বল আমাকে। ডাক্তারবাবুকে একবার ডাক্‌বো?

রাত বোধ হয় তখন দুটো। নিখিলেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ একটা ডাকা-ডাকিতে তার ঘুম ভেঙে গেছে। নিখিলেশ চোখ মেলে দেখলে সামনে নয়নতারা।

নয়নতারা তাকে ঠেলতে ঠেলতে বললে—ওগো, আমার খুব ভয় করছে, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

নিখিলেশের ঘুমের জড়তা তখনও কাটেনি। লেপটা সরিয়ে কোনও রকমে উঠে বসলো। কিন্তু তার চোখে-মুখে তখনও তন্দ্রার ঘোর। নয়নতারা বললে—ওগো, একটু ওঠো না—

নিখিলেশ উঠলো। বললে—কি করতে হবে?

নয়নতারা বললে—ও-ঘরে ও কেমন করছে—

নিখিলেশের চোখে যেটুকু জড়তা ছিল তাও কেটে গেল। বললে—তা আমি কী করবো?

নয়নতারা বললে—ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আসতে হবে। ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, ডাক্তারবাবুকে একবার না ডেকে পাঠালে আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার বড় ভয় করছে—

নিখিলেশ বললে—তাই ঠাণ্ডার মধ্যে কি ডাক্তারবাবু আসবেন? আর এই এত রাত্তিরে? কাল সকালে গেলে হয় না?

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমি যে ভালো বুঝছি না গো। রাতটা যদি না কাটে? ডাক্তারবাবু আমাকে বলে গেছেন যত রাত্তিরেই হোক তাঁকে ডাকলে তিনি আসবেন—

নিখিলেশ বললে—কিন্তু আমি কী করে যাই?

—তা তুমি না গেলে কে যাবে? বাড়ীতে তুমি ছাড়া আর কে আছে? গিরিবালা মেয়েমানুষ, এই রাত্তিরে কী তাকে বাইরে পাঠানো ভালো? আর একা আমি আছি, তা তুমি যদি বলো তো আমিই যাই—

নিখিলেশ বিরক্ত হয়ে গেল। একে সন্ধ্যেবেলা শীতেশের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে ওইটে খেয়েছে, তার ওপর শীতের ঠাণ্ডা, আর তারই ওপর অসময়ে ঘুম ভাঙানো। বললে এই জন্যেই তো তোমাকে বলেছিলুম ওকে পাসপাতালে পাঠাতে—

নয়নতারা রাগ করলে না নিখিলেশের কথা শুনে। বললে—দেখ, এখন সে-কথা তুলে লাভ নেই, আমি হয়ত ভুলই করেছি, কিন্তু তুমি কী চাও আমার ভুলের জন্যে একটা মানুষ মারা যাক্?

কথাটা বলতে গিয়ে নয়নতারা নিখিলেশের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ

যেন ধাক্কা খেয়ে পেছনে সরে এল। কী যেন একটা সন্দেহ হলো তার। বললে—তুমি মদ খেয়েছ?

নিখিলেশ কী বলবে বুঝতে পারলে না।

নয়নতারার সন্দেহ তখন কেটে গেছে। বললে—সে কী, তুমি মদ খেলে কী বলে? তুমি তো আগে মদ খেতে না? সত্যি বলো না, তুমি মদ খেয়েছ? সত্যি?

নিখিলেশের মুখে তখন আর কোনও জবাব নেই। তার অপরাধ ধরা পড়ে গেছে জেনে সে নতুন কিছু কৈফিয়ৎ খোঁজবার চেষ্টা করেও হতাশ হয়ে যেন হতবাক হয়ে গেছে।

নয়নতারা বললে—এদিকে আমি ভাবছি বুঝি অফিসের কাজের চাপে দেরি করে বাড়ি ফিরছো। তা আমি সঙ্গে থাকি না বলে তুমি এই রকম করে মদ খাবে? তুমি কি রোজই মদ খেয়ে বাড়ি ফেরো নাকি? আমি তো কিছুই জানতে পারিনি—রোজই মদ খাও তুমি?

নিখিলেশের বিবেক যেন কোথায় বাধলো। বললে—না, আজকেই শুধু খেয়েছি—

—কখখনো হতে পারে না, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ খাও, নইলে বাড়ি আসতে তোমার এত দেরি হয় কেন রোজ?

নিখিলেশ বললে—না, সত্যিই রোজ খাই না—

—তো হলে আজই বা খেলে কেন? যে-জিনিস খাও না তা হঠাৎ আজই বা খেতে গেলে কেন?

নিখিলেশ বললে—শীতেশ খুব করে ধরলে তাই—ও-ই পয়সা খরচ করে খাওয়ালে।

—তা শীতেশবাবু ধরলে আর তুমিও তাই খেলে? পয়সা খরচ না-ই বা হলো, কিন্তু তুমি কোন আক্কেলে ওই ছাই-পাঁশ খেলে তাই আমি জিজ্ঞেস করছি? তুমি ছেলেমানুষ নাকি যে তোমাকে ধরলে আর তুমিও খেলে? তোমার নিশ্চয়ই খেতে ইচ্ছে করেছিল?

নিখিলেশ আমতা-আমতা করতে লাগলো। বললে—আজ খেয়েছি বলে কি আমি রোজই খাবো? একদিন খেলে কী এমন দোষ হয়?

—মানুষ যখন নেশা করে তখন প্রথম প্রথম ওই একদিনই খায়! ওই একদিন একদিন করতে করতেই শেষকালে তার নেশা হয়ে যায়। তা জানো না?

তারপর যেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ পাশের ঘরের রোগীর কথাটা মনে পড়লো। বললে—আমি অফিসে যাচ্ছি না বলে তুমি মনে করেছ তোমার যা-ইচ্ছে-তাই করবে? এদিকে বাড়িতে এই বিপদ, আর ওদিকে তুমিও হয়েছ তেমনি। আমি একলা কোন্ দিক সামলাই বলো তো?

নিখিলেশ বললে—আমি তো তখনই বলেছিলুম ওকে হাসপাতালে পাঠাতে—

নয়নতারা বললে—তুমি আর কথা বোল না, কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার! বিপদের সময় কোথায় তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে তা নয় কোত্থেকে কার কথায় মদ গিলে এলে! অফিস থেকে সোজা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প না করে বাড়িতে আসতে পারো না? দেখ তো আমি এই দিনরাত রোগী নিয়ে পড়ে আছি, কত কাল ঘুমোতে পর্যন্ত পাইনি, ডাক্তারবাবু তো সেই কথাই বলছিলেন, বলছিলেন এ-রকম করে মাসের পর মাস না-ঘুমিয়ে কাটালে আমারও কোন্ দিন সিরিয়াস অসুখ হয়ে যাবে!

নিখিলেশ বললে—তা আমি কী করতে পারি বলো?

নয়নতারা বললে—তুমি? তুমি তো আমাকে একটু সাহায্য করলেও পারো।

—আমি তোমাকে সাহায্য করবো?

—তা করলে ক্ষতিটা কী? গিরিবালা বুড়ো মানুষ, একলা ও কি এত দিক সামলাতে পারে? আমারও শরীরে আর বইছে না। কোন্ দিন আমিও হয়ত বিছানায় শুয়ে পড়বো,

তখন যে কী হবে ভগবান জানে! তুমি তো বেশ নেশা করে আরামে ঘুমোচ্ছো, আর আমার কথাটা একবার ভাবো দিকিনি—

নিখিলেশ বললে—আমি ও-সব কথার জবাব দিতে চাই না, এখন কী করতে হবে তাই বলো—

—ডাক্তারবাবুকে গিয়ে এখুনি একবার ডেকে নিয়ে আসতে হবে। বলবে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ—

—এখন ক'টা বেজেছে?

—দু'টো।

—নিখিলেশ বললে—কাল ভোরবেলা গেলে হয় না?

—ভোরবেলা হলে তো আর তোমাকে বলতে আসতুম না, তখন তো গিরিবালাও যেতে পারতো, পারলে আমিও যেতুম। কিন্তু এই মাঝ রাত্তিরে কী করে যাই বলো? তোমার এতটুকু আক্কেল নেই? ডাক্তারবাবুই বা কী ভাববেন বলো তো? ভাববেন বাড়িতে পুরুষমানুষ থাকতে মিস্টার ব্যানার্জি কি না তার বউকে এত রাত্তিরে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে—

নিখিলেশ রেগে গেল। বললে—কিন্তু কে তোমাকে সাধ করে এই ঝঞ্ঝাট মাথায় তুলে নিতে বলেছিল বলো তো? আমরা তো বেশ সুখে-শান্তিতে ছিলুম। কোনও অশান্তি ছিল না আমাদের। তুমিও তো এই ঝঞ্ঝাট বাধালে—

নয়নতারা বললে—এখন আর সেই পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটবার সময় নেই—তুমি তাড়াতাড়ি একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে নাও, শেষকালে আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্দি বাধিয়ে বসবে—যাও—

নিখিলেশের তখন আর আপত্তি করবার সময় ছিল না। আলনা থেকে সোয়েটারটা নিয়ে গায়ে গলিয়ে নিলে। তারপর আলোয়ানটা জড়িয়ে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। পেছনে নয়নতারা দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে আবার রোগীর মাথায় আইস-ব্যাগ দিতে বসলো।

মানুষ সম্পত্তি যখন করে তখন পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করবে, এই আশা নিয়েই করে। কবেকার কোন্ আলীবর্দী খাঁ বা মীরজাফর খাঁর আমলের বংশ কোথা দিয়ে কেমন করে কত যুগ-পরিক্রমা করে হাজার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যে কে কোথায় ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছিল কেউ তা জানতো না। ঘটনাচক্রে হঠাৎ দেখলেও হয়ত তারা পরস্পরকে চিনতে পারতো না। কিন্তু সেই বৃহৎ মহীরুহের একটা ছোট শাখা একদিন নদীয়া জেলার একটা অখ্যাত গ্রামে কেমন করে আবার ইতিহাসের সমুদ্রে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করতে পেরেছিল, তাও চৌধুরী মশাই-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় তা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্নটা হলো সরকারী সেরেস্তার খাতায় এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে কার নাম লেখা হবে? কে সেই অইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী? কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়েরও কোনও পুত্র-সন্তান নেই। কন্যা-সন্তান ছিল একটা, তাও মারা গেছে। এবার জামাই হরনারায়ণ চৌধুরীও গেল। রইল শুধু সদানন্দ। সদানন্দ চৌধুরী। কিন্তু কোথায় সে? কে বলে দেবে তার সন্ধান? সে তো কবে থেকেই নিরুদ্দেশ! কিন্তু যদি বেঁচে থাকে সে? তাহলে তো সে একলাই এই দুই জমিদারের সম্পত্তির অধিকারী। সে যদি এখন হঠাৎ

এসে তার পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে বসে তখন কোথায় থাকবে প্রকাশ? প্রকাশ রায়?

প্রকাশ রায় আর দেরি করলে না। শুভস্য শীঘ্রং, কিন্তু অশুভস্য শুধু কালহরণং!

বউ ছেলে-মেয়েকে সে আগেই জামাইবাবুর বাড়িতে উঠিয়ে এনেছিল।

অশ্বিনী ভট্টাচার্যির চোখের সামনেই সে সমস্ত কিছুর মালিক সেজে বসলো। সুলতানপুরের লোক সবাই রাতারাতি ভক্ত হয়ে পড়লো প্রকাশ রায়ের। কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায় ঠিক যেমন করে বৈঠকখানা ঘরে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম-দরবার বসাতেন, প্রকাশ রায়ও ঠিক তেমনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম-দরবার বসাতে লাগলো। ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি যা কিছু তাতে হাত দেওয়া গেল না। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বললে—টাকা তো আপনাকে দিতে পারবো না, আপনিই যে হরনারায়ণ চৌধুরীর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী তার প্রমাণ চাই—

প্রকাশ বললে—প্রমাণ আর কী দেব বলুন, প্রমাণ গাঁয়ের লোক। তারাই প্রমাণ দেবে, তারাই বলবে চৌধুরী মশাই-এর কেউ নেই, তিনি আমার জামাইবাবু, আমি তাঁর সমস্ত গচ্ছিত টাকা-কড়ির আইনত ওয়ারিশন—

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বললে—তো বললে তো ব্যাঙ্ক শুনবে না, আপনি কোর্ট থেকে সাক্‌সেশান সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। তারা যদি আপনাকেই ওয়ারিশন বলে তো হরনারায়ণ চৌধুরীর সব টাকা-কড়ি আপনিই পাবেন—

বড় মুশকিলে পড়লো প্রকাশ রায়। এত বছরের এত সাধ যখন শেষ পর্যন্ত মিটলোই তখন সব কি এমন করে বানচাল হয়ে যাবে নাকি? একেবারে ঘাটে এসে তরী ডুববে?

ততদিনে তোষামুদের দল জুটে গেছে প্রকাশ রায়ের। অশ্বিনী ভট্টাচার্যের আর সে রাগ নেই। এখন সে অন্য মানুষ। সকাল হতে-না-হতে তারা এসে প্রকাশ রায়ের বৈঠকখানায় জোটে। ঢুকেই প্রকাশ রায়কে প্রণাম করে। জিজ্ঞেস করে রাত্রে রায় মশাই-এর ঘুম হয়েছে কি না। সবাই-ই প্রকাশ রায়-এর শুভাকাঙ্ক্ষী তখন। সবাই-ই বলে—শরীরটার দিকে একটু নজর দেবেন রায় মশাই, আপনার শরীর ভালো থাকলে তবে আমরা ভালো থাক্‌বো—

প্রকাশ রায় বলে—কিছু ভেবো না হে তোমরা, আমি তোমাদের সকলের ভালো করবো—

তারপর কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে ধোঁয়া টানতে টানতে বলে—আরে জামাইবাবুই যে সব কেস খারাপ করে দিয়ে গেল। জামাইবাবু যদি সব জমি-জমা বেচে না দিত তো দেখতে আমি তোমাদের সকলের খাজনা মকুব করে দিতুম।

ভীম বিশ্বাস জিজ্ঞেস করে—তা জমি-জমা সব বেচে দিতে গেলেন তিনি কার জন্যে? ছেলে নেই মেয়ে নেই বউ নেই, অত টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেলেন কার জন্যে? অত টাকার সুদ কে খাবে?

অশ্বিনী ভট্টাচার্য বলে—আপনার জন্যেই সব রেখে গেলেন রায় মশাই। আপনিই তো সারাজীবন ভগ্নিপতির সেবা করেছেন। এ সেই সেবার দাম—

—আরে রামঃ, আমি ওই টাকা ছোঁব? পরের টাকা ছুঁতে আমার বয়ে গেছে না। যার টাকা সে ফিরে এলেই তাকে ব্যাঙ্কের পাস-বই ফেলে দেব। বলবো—তোর টাকা তুই নে বাবা, আমাকে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দে—

ভীম বিশ্বাস বলে—তা এতদিন হয়ে গেল, আপনার ভাগ্নে কি আর ফিরবে রায় মশাই, ফিরলে এতদিন কবেই ফিরতো।

প্রকাশ বলে—না ফিরলে আর আমি কী করতে পারি বলো, আমি তো আর তাকে খুঁজতে কসুর করিনি। সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি যথাসাধ্যি করেছি আমার ভাগ্নের ভালোর জন্যে। ছোটবেলা থেকে তাকে আগলে আগলে মানুষ করেছি যাতে বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে বিগড়ে না যায়—

ভীম বিশ্বাস বললে—তা হলে মনে করে নিন ও-টাকা ভগবান আপনাকেই দিয়েছেন। ভগবান তো আপনাকে চেনেন, ভগবানের চোখে তো আপনি কোনও পাপ করেননি—

—পাপ?

পাপের নাম শুনেই প্রকাশ রায় ভয়ে লাফিয়ে ওঠে। বলে—ওরে বাবা রে, পাপ আবার করিনি? কত পাপ জীবনে করেছি কে জানে? মানুষ হয়ে জন্মানোই তো পাপ গো! দেখ না, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আজান্তে কত পিঁপড়ে মাড়িয়ে ফেলছি, পুকুরের মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি,কত মশা-মাছি মারছি, ওটা পাপ নয়?

—না না, ও পাপের কথা বলছিনে, ও-পাপ কে না করে রায় মশাই? যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরাও ও-রকম কত পাপ করেছেন!

প্রকাশ বলে—তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি মদ খাওয়াকে পাপ বলো তো মদ কখনও চোখেই দেখিনি, তো খাওয়া! মদের গন্ধ কখনও কখনও রাস্তায়-ঘাটে নাকে গেছে বটে, সে মিথ্যে কথা বলবো না। আর মেয়েমানুষ? তা মেয়েমানুষ মাত্রকেই আমি মা বলে ডাকি, সে তো তোমরা নিজেরাই জানো—

সবাই স্বীকার করে রায় মশাই-এর মত দেবতুল্য মানুষ ভাগলপুরে আর নেই।

প্রকাশ বললে—কিন্তু আমি একলা ভালো হলে হবে কি? সারা পৃথিবীর লোক যে সব খারাপ হয়ে গেল, সেইটেই যে আমার দুঃখ গো—

অশ্বিনী ভট্টাচর্যি বলে—ও-নিয়ে আর আপনি ভাববেন না রায় মশাই, ও ভাবতে গেলে মাঝখান থেকে আপনারই শরীর খারাপ হয়ে যাবে। এই যে আপনি আপনার ভাগ্নের কথা ভাবছেন, এ কেউ ভাবে? অন্য লোক হলে এতদিনে ভগ্নিপতির সম্পত্তি খেয়ে ফেলতো। আপনি বলেই তাই এখনও ভাগ্নের আসার পথ চেয়ে বসে আছেন—

ভীম বিশ্বাস বলে—আপনার ভাগ্নের তো বিয়েও হয়েছিল?

—আর আমিই তো বিয়ে দিয়েছিলুম তার। বেশ সদ্বংশ থেকে রূপসী মেয়ে দেখে ভাগ্নে-বউ করেছিলুম! কিন্তু এই যে বললুম, বেটা ছড় খেয়ে গেল—

—ছড় খেয়ে গেল মানে?

—ছড় খেয়ে গেল মানে চরিত্র নষ্ট করে ফেললে। মানুষের আসল জিনিস হলো চরিত্র! সেইটেই যদি নষ্ট হলো তো থাকলোটা কী? নিজের বউকে ফেলে রেখে কি না কলকাতায় চলে গেল। আগে একবার পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়ে ওই ভাগ্নেকেই জেলে পুরেছিল, তা জানো?

—কেন?

—আবার কেন? ওই চরিত্র। চরিত্রটি যার নষ্ট হয়েছে তার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই। আমি তো তাই জামাইবাবুকে বলতুম যে আপনার সব ভালো জামাইবাবু, শুধু আপনার ছেলেটি হয়েছে বেয়াড়া—

—তা তারপর কী হলো?

—তারপর সেই আমি! আমিই কলকাতায় গিয়ে পুলিসের কর্তাকে হাতে-পায়ে ধরে তবে আবার তাকে ছাড়িয়ে আনি। ওই ভাগ্নের জন্যে কি আমি কম করেছি হে? তা অত যে করলুম, সব আমার দিদির জন্যে। আমি যে ভাগলপুরে এসে আমার পিসেমশাইকে দেখবো,

কি বউ-ছেলে-মেয়ে দেখবো তার তো উপায় ছিল না তখন। এখানে আসতে চাইলেই দিদি কান্নাকটি করতো। বলতো—তুই চলে যাসনি প্রকাশ, তুই চলে গেলে আমার সদা গোল্লায় যাবে—তা যে গোল্লায় যাবে প্রতিজ্ঞা করে, তাকে কি ভগবানই বাঁচাতে পারে গো?

যারা রায় মশাই-এর বৈঠকখানায় আসে তারা আখেরের ভরসায় আসে। প্রকাশ রায় তা জানে। জানে বলেই সকলকে আশা দেয়। এমন ভরসা দেয় যাতে তারা রোজই আসে। আর ঠিক পিসেমশাইকে যেমন ভয়-ভক্তি করতো রায় মশাইকেও তারা ঠিক তেমনি ভয়-ভক্তি করে। নবাবগঞ্জে দিদির শ্বশুর কর্তাবাবুর খাতির দেখেছে, সুলতানপুরে পিসেমশাই-এরও খাতির দেখেছে। এতকাল পর নিজে লোকের কাছে সেই খাতির পেয়ে প্রকাশের খুব ভালো লাগতো।

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি জিজ্ঞেস করতো—তা ভাগ্নে-বউ-এর শেষকালে কী হলো রায় মশাই?

প্রকাশ বলতো—কী আবার হবে, যে-গাইগরু বিয়োবেও না দুধও দেবে না তাকে ঘরে বসে খড়-ভূষি খাওয়াবে এমন আহাম্মক কেউ আছে?

কথাটা শুনে ভীম বিশ্বাসও অবাক হতো, অশ্বিনী ভট্টাচার্যিও অবাক হতো। বৈঠকখানা ঘরে যে-যে থাকতো, তারা সবাই-ই অবাক হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করতো—তা সে-বউ এখন কোথায়? খবর-টবর কেউ রাখে না?

—কে আবার সেই অলক্ষুণে বউ-এর খবর রাখতে যাবে বলো তো? সেই বউ আসার পর থেকেই তো দিদি-জামাইবাবুর এই হাল হলো। নইলে নবাবগঞ্জের অত লাখ টাকার জমিদারি সাধ করে কেউ জলের দামে বেচে দেয়?

ভীম বিশ্বাস জিজ্ঞেস করতো—তা কত দামে বিক্রি হলো সেই জমিদারি?

প্রকাশ বলতো—লাখ তিনেক টাকা।

তিন লাখ! তিন লাখ টাকা হলো জলের দর! টাকার অঙ্কটা শুনে উপস্থিত শ্রোতারা সবাই চমকে উঠতো। নবাবগঞ্জের জমিদারি যদি তিন লাখ টাকা হয়, তাহলে সুলতানপুরের জমি-জমা কম করেও পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে নিশ্চয়ই। উপস্থিত শ্রোতারা একসঙ্গে হাজার টাকাই কখনও চোখে দেখেনি, আর এ তো লাখ লাখ টাকা। তার ওপর আছে সুদ। মাসে মাসে সে-টাকার সুদও তো জমছে। সেই সুদও তো পাবে রায় মশাই।

ভীম বিশ্বাস আর থাকতে পারতো না। জিজ্ঞেস করে ফেলতো—অত টাকার সুদ কত হবে রায় মশাই?

প্রকাশ রায় তাচ্ছিল্যের সুরে বলতো—কত আর হবে, হাজার আষ্টেকের কম হবে।

—মাসে মাসে?

—হ্যাঁ, মাসে মাসে।

সর্বনাশ! সবাই সুদের অঙ্ক শুনে আবার আকাশ থেকে পড়তো। মাসে আট হাজার করে সুদ! আসলে হাত পড়বে না, সুদটাও সব খরচ হবে না। সুদের থেকেও আবার কিছু কিছু মোটা অংশ মাসে মাসে আসলে গিয়ে জমা পড়বে। তারপর সেই টাকা পাহাড় হয়ে হয়ে ব্যাঙ্কের সিন্দুক ছাপিয়ে শেষকালে উপচে পড়বে। এর নামই বলে কপাল! কার টাকা কে ভোগ করে দেখ! নরনারায়ণ চৌধুরী প্রজা ঠেঙিয়ে টাকা জমিয়ে গেল, সেই টাকার সঙ্গে আবার যোগ হলো বেয়াই-এর টাকা। আবার একটা ছেলে ছিল ছেলের বউও ছিল, তারাও কে কোথায় চলে গেল, সকলের সব টাকা কিনা এসে রায় মশই-এর কপালে নাচলো!

—বুঝলেন রায় মশাই, আর জন্মে আপনি অনেক পুণ্যি করেছিলেন তাই এ-জন্মে এতগুলো টাকার মালিক হলেন। ধন্য আপনি রায় মশাই—আপনিই ধন্য—

বলে ভীম বিশ্বাস প্রকাশ রায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

প্রকাশ রায় পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলতো—পায়ের ধুলো নিচ্ছ নাও, কিন্তু আমার তো কোনও বাহাদুরি নেই হে এতে। তবে আমি শুধু চরিত্রটি ঠিক রেখেছি এই যা আমার কেরামতি। মদও খাইনি মেয়েমানুষও করিনি, আর কখনও মিছে কথাও বলিনি—মদ মেয়েমানুষ না করা আর মিছে না বলা, যদি ভালো কাজ হয় তো ভালো কাজ করেছি—

বলে আত্মতৃপ্তিতে মুখ দিয়ে গল্‌ গল্‌ করে তামাকের ধোঁয়া বার করতো।

কিন্তু সব মুশকিল করে দিলে ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সাকসেশন সার্টিফিকেট নিতে গেলেই তো কোর্টে যেতে হবে। তখন? তখন যদি বেরিয়ে পড়ে হরনারায়ণ চৌধুরীর এক ছেলে বেঁচে আছে! আর সে যদি মারা গিয়েও থাকে তো তার একটা বিয়ে হয়েছিল সে বউ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। নতুন আইনে ছেলে না থাকলে ছেলের বউই হবে শ্বশুরের সম্পত্তির ওয়ারিশন!

তা শেষকালে প্রকাশ উকিলের বাড়িতেও গেল। সব কিছু শুনলে উকিল। শুনে তারপর বললে—আপনার ভাগ্নে যদি বেঁচে থাকে তা হলে সব সম্পত্তি সেই ভাগ্নেই পাবে—

—ধরুন বেঁচে নেই। সন্নিসী হয়ে গেছে।

—ভাগ্নেকে যদি না পাওয়া যায় তা হলে সমস্ত ভাগ্নে বউ পাবে। এই রকম নতুন আইন হয়েছে এখন। তা তার কাছে গিয়ে একটা কাগজ লিখিয়ে নিয়ে আসুন না!

—কী লিখিয়ে আনবো?

—শুধু লিখিয়ে আনলে চলবে না। ভাগ্নে-বউকে একটু ভুজুং-ভাজুং দিয়ে একবার ভাগলপুরের কোর্টে নিয়ে আসুন, তারপর যা করবার আমি করবো। আপনার ভাগ্নে বউ কোথায়?

প্রকাশ রায় বললে—তা তো জানি না—বোধ হয় তার বাপের বাড়িতেই আছে।

—তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন আপনাদের?

প্রকাশ বললে—সম্পর্ক খুব ভালো নয়। শেষের দিকে জামাইবাবুর সঙ্গে ছেলের বউ এর খুব ঝগড়া হয়ে যায়। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়েছিল। ছেলের বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল, তারপর আর আসেনি—

উকিল বললে—ডিভোর্স হয়ে গেছে কিনা কিছু খবর রাখেন? বিবাহ-বিচ্ছেদ? এখন আবার এই নতুন আইনটা হয়েছে কিনা। যদি ডিভোর্স হয়ে থাকে তাহলে আপনি বেঁচে গেলেন—

প্রকাশ রায় বললে—আজ্ঞে তা তো কিছু খবর রাখিনি।

—তাহলে এবার খবরটা রাখুন। এতগুলো টাকার ব্যাপার, ইয়ার্কি নাকি! টাকার ওয়ারিশন হতে গেলে খোঁজখবর করতে হবে আপনাকেই। খুঁজে দেখুন আপনার ভাগ্নে-বউ আবার বিয়ে-টিয়ে করেছে কি না। আর ভাগ্নেও তো এখনও বেঁচে থাকতে পারে, তাকে খুঁজে বার করুন আগে, তা হলে সবই সুরাহা হয়ে যাবে। যদি বিবাগী হয়ে গিয়ে থাকে তো তাকে ধরে নিয়ে আসুন, তখন যা করবার আমি করে দেব'খন—

—কী করবেন তাকে দিয়ে?

—সে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবে যে সে টাকা চায় না। সেটা বলাতে পারবেন তাকে দিয়ে?

প্রকাশ বললে—খুব বলাতে পারবো। টাকার ওপরে তার কোনও লোভ-টোভ নেই কোনও কালে। ছোটবেলা থেকেই সে টাকা চায় না। অদ্ভুত ছেলে সে মশাই। বিয়ে করতেই চাইতো না তার আবার টাকা! আমরা তো তাকে জোর করে ধরে-করে সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলুম—

উকিল বললে—তা হলে তা ল্যাঠা চুকেই গেল। কিন্তু তাকে যদি না পান তো আপনার ভাগ্নে-বউকে তা হলে ভুজুং দিয়ে রাজি করাতে হবে—

প্রকাশ বললে—ওই একটা মুশকিল! ভাগ্নে-বউ একলা হলে আমি কিছু ভয় পেতুম না, যেমন করে হোক তাকে পটিয়ে ফেলতে পারতুম। কিন্তু তার পেছনে যে আবার একটা লোক আছে—

—লোক মানে?

—লোক মানে সে একটা বকাটে ছোকরা। তার নাম নিখিলেশ না কি।

—সে তার কে—

—কে আবার? কেউই না। বাবার ছাত্র। মেয়ের বিয়ের সময় কেনাকাটা-টাটা করা সে-ই সব করতো আর কি। সেই তো একদিন জামাইবাবুর কাছে এসেছিল বউ-এর গয়না-গাঁটি ফেরত চেয়ে নিতে। বুঝুন মশাই, বউ রাগ করে শ্বশুর-শাশুড়ীকে গালাগালি দিয়ে তেজ করে বাপের বাড়ি চলে গেল, এমন কি সিঁথির সিঁদুর মুছে হাতের শাঁখা পর্যন্ত ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে গেল, তারপর আবার কোন্ লজ্জায় গয়না চেয়ে পাঠায়?

—কত টাকার গয়না?

প্রকাশ বললে—তা বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির গয়না মিলিয়ে প্রায় একশো ভরি হবে।

উকিল সব শুনে বললে—যাক গে ও-সব কথা। তার ব্যাপার শুনে মনে হচ্ছে সে-বউ কি আর সম্পত্তির লোভ ছাড়বে! আপনি বরং ভাগ্নের খোঁজ করুন, টাকা-পয়সা-সম্পত্তির ওপর যখন তার লোভ নেই বলছেন, তখন মনে হচ্ছে আপনাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না—আমি আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দেব—

—তা হলে তাই যাই—

বলে উকিলের কাছ থেকে বাড়ি এসে সেইদিনই প্রকাশ রায় নবাবগঞ্জের পথে রওনা দিলে। কোথায় ভাগলপুর, আর কোথায় নবাবগঞ্জ। যদি নবাবগঞ্জে না পাওয়া যায় তখন আবার যেতে হবে কলকাতায়। আর কলকাতা ছাড়া গতি কী? বাঙালীর তো ওই একটাই জায়গা। যাবে আর সে কোথায়? পাপ করতে গেলেও সেই কলকাতা, পুণ্য করতে গেলেও তাই। ১৯৪৭ সালের পর থেকে যেন কলকাতার আকর্ষণ আরো বেড়েছে। একবার যদি জামাইবাবুর টাকাগুলো হাতাতে পারা যায় তো শেষ পর্যন্ত সুলতানপুরের বাড়িটা বেচে দিয়ে একবারে কলকাতায় চলে যাবে সে। এতদিন সে কালীঘাটের মানদা মাসির বাড়িতে গিয়ে উঠেছে, এবার থেকে উঠবে গিয়ে নিজের বাড়িতে। নিজে একটা মস্ত বাড়ি করবে কলকাতায়। একেবারে বড়-লোকদের পাড়ায়। আর কিনবে একখানা গাড়ি। সুদ থেকেই তো মাসে আট হাজার টাকা করে পকেটে আসবে। তখন কত খরচ করবে করো না, কত পরোটা আর ডিমের ডালনা খাবে খাও না। তবে এবার আর ধেনো নয় বাবা। ধেনো খেয়ে খেয়ে পেটের নাড়ি-ভুঁড়িতে মরচে ধরে গেছে। এবার বিলিতি। একেবারে খাস বিলিতি মাল ছাড়া আর কিছু ছোঁবে না সে।

ভাবতে ভাবতে প্রকাশ রায় ভাগলপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলো।

১৯৪৭ সালের পর সেই দশ বছর কেটে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে যেন পৃথিবীর মানচিত্র বদলেছে, পৃথিবীর মানুষের মনের মানচিত্রও যেন আগাগোড়া বদলে গেছে। অনেক নীল রঙ লাল হয়ে গেছে, অনেক লাল রং আবার নীল। লালের সঙ্গে নীলের বিরোধে মানুষে মানুষে ব্যবধানের পাঁচিল আরো উঁচু হয়ে একজনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্কের মধ্যে

আড়াল সৃষ্টি করেছে। বন্ধুত্বের চেয়ে শত্রুতার শক্তিতে মানুষ মানুষের কাছেই আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি এসে প্রকাশ রায় একদিন টাকার লোভে পৃথিবী পরিক্রমা করতে শুরু করলো। যে-টাকাকে সদানন্দ অত সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারলো, যে-টাকাকে প্রত্যাখান করে সে দাতব্য-ধর্মশালায় নিজের আশ্রয় খুঁজে নিলে সেই টাকার জন্যেই প্রকাশ রায় একদিন এক জেলা থেকে আর এক জেলায় হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলো। কোথায় সদানন্দ, সদানন্দ কোথায়? সদানন্দকে খুঁজে বার করতে না পারলে যেন সব সাধ, সব বাসনা, সব ভবিষ্যৎ রসাতলে চলে যাবে।

বেহারি পালমশাই বললে—কই না তো, সদানন্দ তো আর আসেনি এখানে—

সদানন্দকে খুঁজে বেড়াবার পেছনে প্রকাশ রায়ের এই আগ্রহের কারণটা কিন্তু কারো কাছে আর চাপা থাকলো না। বরোয়ারিতলার দোকানের মাচায় বসে যারা আড্ডা দেয় তারাও বললে—এখন কেন তাকে খুঁজছেন শালাবাবু? যখন সদা নিজে থেকেই ছোটমশাই-এর কাছে গিয়েছিল তখন তো আপনারা কেউই কিছু বলেননি? এখন বুঝি টাকার জন্যে সদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

প্রকাশ বললে—আরে না ভাই তা নয়। তার নিজের বাপের মৃত্যুর খবরটা তাকে দিতে হবে না? তার টাকার ওপর আমার কোনও লোভ নেই।

—এদিকে প্রাণকেষ্ট সা' মশাই-এর খবর শুনেছ শালাবাবু?

—কী খবর?

বেহারি পাল মশাই বললে—সা' মশাই হার্ট-ফেল করে মারা গেছেন হে। তোমার ভগ্নিপতির বাড়ি কেনার পরদিনই এই কাণ্ড হলো। ও-বাড়ি যে-ই কিনতো তারই ওই কাণ্ড হতো। আমি তখন কিনতে চেয়েছিলুম তা ছোটমশাই আমাকে বেচেননি, পাছে আমার ভালো হয়। এখন ভাবি ভালোই হয়েছে—আমি ও-বাড়ি কিনলে আমারও তো ওই হতো—

অনেকদিন পরে আবার নবাবগঞ্জে আসা। এককালে কত বছর প্রকাশ রায় এই নবাবগঞ্জে কাটিয়ে গেছে। এই নবাবগঞ্জের ধুলোর সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল। কখনও কেউ ভাবতেও পারেনি তখন যে একদিন সেই নবাবগঞ্জেরই এই দশা হবে। কল্পনাও করতে পারেনি যে এমন করে চৌধুরী-বংশ এত তাড়াতাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। প্রকাশ রায় সেই পুরোনো বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে ভালো করে। সমস্ত বাড়িটাতে কালের দাগ যেন দাগী হয়ে গেছে যেন দাগী হয়ে গেছে সেটা।

প্রকাশ রায় উঠলো। বললে—উঠি পাল মশাই, আবার অনেক দূর যেতে হবে—

—কোথায় যাবে এখন?

—কোথায় আর যাবো! দেখি সদাকে কোথায় পাওয়া যায়। যার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। জামাইবাবুর লাখ লাখ-টাকার সম্পত্তি, এখন সে যদি না আসে তো গভর্মেণ্টই তো সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে—

বেহারি পাল বললে—কেন? তা কেন? তুমিই সব পাবে! তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই চৌধুরী মশাই-এর—

—না পাল মশাই, টাকার ওপরে আমার অত লোভ নেই। টাকার লোভ যদিও বা আগে ছিল, এখন আর তাও নেই। টাকা থাকার পরিণাম তো চোখের সামনেই দেখলুম। অত টাকা থাকায় লাভটা কী হলো বলুন? শেষকালে তো মৃত্যুর সময়ে এক গণ্ডুষ জলও পেলেন না জামাইবাবু—

কথা শেষ করে প্রকাশ রায় উঠলো। কিন্তু ফয়সালা হলো না কিছুই। এখান থেকে কোথায় যাবে তাই-ই ভাবতে লাগলো যেতে যেতে। কলকাতা ছাড়া সে আর কোথায়ই

বা যাবে ভাগ্নেকে খুঁজতে! আর কলকাতা কি নবাবগঞ্জ যে সেখানে গেলেই সদানন্দকে খুঁজে বার করা যাবে? তা ছাড়া কলকাতাও তো আর এখন সে কলকাতা নেই। সে কলকাতা নাকি আরো জম-জমাট হয়েছে। উদ্বাস্তুদের ভিড়ে নাকি কলকাতার রাস্তায় হাঁটাও দায় হয়েছে। ট্রামে-বাসে আর দাঁড়াবার জায়গাও নাকি পাওয়া যায় না। আশে-পাশের সব জায়গায় নাকি তাদের ঝুপড়ি দোকান-ঘর উঠেছে।

হঠাৎ মানদা মাসির কথাটা মনে পড়ে গেল। মাসি বেঁচে আছে কি না তাই-ই বা কে জানে। আর সেই পুলিসের বড়বাবু। সেই বাতাসীর বাবু। তাকে তো সে সদার একটা ছবিও দিয়ে এসেছিল সেবার।

রেল বাজার থেকে প্রকাশ রায় আবার কলকাতার ট্রেনে চেপে বসলো।

নৈহাটির একটা বাড়ীর একটা ঘরে সদানন্দ তখন চোখ মেলে চাইলে। প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো দৃষ্টিটা। তারপর আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুলো।

মাথার বালিশটা মাথা থেকে সরে গিয়েছিল। নয়নতারা সেটা আবার মাথার নিচে ঠিক করিয়ে বসিয়ে দিলে। মাথায় নয়নতারার হাতের স্পর্শ লাগতেই সদানন্দের কেমন যেন চৈতন্য ফিরে এল।

মাথার ওপর চোখ দুটো যেন কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। সামনে নয়নতারাকে দেখে একদৃষ্টে সেই দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আবার চোখ বুঁজলো।

নয়নতারার মনে হলো মানুষটা বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে সে বাইরে চলে এল। সকালবেলা নিখিলেশ ভাত খেয়ে অফিসে গেছে। তারপর গিরি বালাকে রোগীর কাছে বসিয়ে নিজের কাপড় কাচা, চান করা সব কিছু তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে কোনও রকমে ভাত মুখে গুঁজে দিয়ে আবার রোগীর কাছে এসে গিরিবালাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। গিরিবালাও তো মানুষ। বুড়ো মানুষ, একলা সে-ই বা কত পারবে? রান্না করতে করতেই তাকে হয়ত ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ডাক্তারের বাড়ি ছুটতে হয়। আবার সেখানে থেকে এসেই ঘর ঝাঁট দেওয়া। কটা দিক সে দেখবে! সব চেয়ে বেশী মুসকিল হয়েছে নিখিলেশকে নিয়ে। আজকাল লাস্ট ট্রেনের আগে বাড়িই আসে না সে। জিজ্ঞেস করলে বলে—অফিসে কাজ পড়েছে—

অথচ আগেও তো নিখিলেশ অফিসে গিয়েছে। তখন যত কাজই থাকুক ঠিক ছুটির সময়ে নয়নতারার অফিসে এসে হাজির হতো। একদিনের জন্যেও তার এক মিনিট দেরি হয়নি। নয়নতারা বুঝতে পারে ও-মানুষটা যে এ-বাড়িতে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে, ও-মানুষটার জন্যে যে এতগুলো টাকা খরচ হচ্ছে, নয়নতারার অফিস কামাই হচ্ছে, এটা নিখিলেশের পছন্দ নয়। কিন্তু পুরুষ মানুষ এত অবুঝ কেন? এইটুকু বোঝে না কেউ যে, আজ না হয় ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা উচিত নয়, কিন্তু এককালে তো ওর সঙ্গে তার অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছিল। একটু ভদ্রতা, একটু সহানুভূতি দেখানোও কি অন্যায়! বাড়িতে কুকুর-বেড়াল পুষলেও তো মানুষ তাকে দুটো খেতে দেয়, অসুখ-বিসুখে তার সেবা করে। আর এতো তাও নয়, এ তো জল-জ্যান্ত একটা মানুষ! এর জন্যে এমন করে রাগ করতে আছে!

শুকনো কাপড়গুলো ঘরের আলনায় রেখে দিয়ে আবার নয়নতারা এ-ঘরে এল। আসতেই অবাক হয়ে গেল। দেখলে মানুষটা চোখ মেলে জেগে রয়েছে। নয়নতারা ঘরে

ঢুকতেই তার দিকে চেয়ে দেখলে।

আস্তে আস্তে তার কাছে এসে দাঁড়ালো নয়নতারা। মানুষটার দৃষ্টিও তাকে অনুসরণ করে তার মুখের ওপর পড়ে সেটা স্থির হয়ে রইল।

নয়নতারা মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করলে—কী দেখছো?

বোঝা গেল, কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে মানুষটার। নয়নতারা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী দেখছো তুমি অমন করে?

মানুষটা তবু তার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

—বলো কী দেখছো? আমার কথার জবাব দাও—

তবু কিছু কথা বলে না লোকটা। আশ্চর্য, অসুখ বুঝি এমনই জিনিস! সেই এতখানি দশাসই মানুষটা, যে তাকে দেখলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইতো, যে-লোকটা একদিন পরের অপরাধের দায়ে নিজের ওপর আঘাত করে মাথাটা রক্তাক্ত করে তুলেছিল, আজ অসুখে পড়ে সেই লোকটাই কেমন নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। আর নয়নতারার সেবা তাকে মাসের পর মাস নিঃশব্দে মুখ বুঁজে গ্রহণ করতে হচ্ছে। সে জানতেও পারেনি যে তার দায় নয়নতারার ওপর ছেড়ে দিয়ে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে। এরই নাম বুঝি অসুখ। এই জন্যেই বুঝি অসুখকে মানুষ এত ভয় করে। এই অসুখের কথা ভেবেই বুঝি মানুষ সংসার করে, ঘর বাঁধে, সন্তান কামনা করে।

—কী হলো, কী দেখছো বলো?

মানুষটার ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠলো। দু'চোখে অগাধ কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলো।

—তুমি কে?

নয়নতারা আরো নিচু হলো এবার। মানুষটার মুখের কাছকাছি মুখ নামিয়ে আনলো। বললে—আমি নয়নতারা—

হঠাৎ যেন মানুষটার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঠোঁটের একটা পাশ থর থর করে কেঁপে উঠলো।

—আমাকে চিনতে পেরেছ? নয়নতারাকে মনে পড়ে তোমার? আমি সেই নবাবগঞ্জের নয়নতারা! যাকে ফেলে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে! মনে পড়েছে?

মানুষটা তখনও একদৃষ্টে নয়নতারার দিকে চেয়ে আছে।

নয়নতারা জোরে জোরে বলতে লাগলো—এ আমার বাড়ি। তুমি ট্রেনে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। তাই আমি তোমাকে সেখান থেকে আমার বাড়িতে এনে তুলেছি, বুঝলে? তোমার খুব শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই তোমার জ্ঞান ছিল না। ডাক্তারবাবু বলেছেন তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। অমন করে চেয়ে চেয়ে কী দেখছো? অনেকদিন ধরে তুমি অসুখে ভুগছো কিনা, তাই তোমার শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে—কিছু ভেবো না—আমি তোমাকে ঠিক সারিয়ে তুলবো—

এতগুলো কথা মানুষটার কানে গেল কি না নয়নতারা বুঝতে পারলে না। নয়নতারার দিকে মানুষটা তখনও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শুধু চেয়েই দেখতে লাগলো।

নয়নতারা বুঝতে পারলে না মানুষটা তার কথা শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। মুখে-চোখে তেমন কোনও আভাসও পাওয়া গেল না।

একটু থেমে নয়নতারা আবার বললে—আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো?

সদানন্দ মাথা নাড়তে চেষ্টা করলে।

নয়নতারা বললে—আমাকে চিনতে পেরেছ তুমি? বলো, চিনতে পেরেছ?

সদানন্দ আবার মাথা নাড়লে। কী যেন বলতে চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু কিছু বলতে পারলে না।

নয়নতারা বললে—কিছু বলবে? তুমি কিছু বলবে আমাকে?

সদানন্দ অনেক চেষ্টা করে বললে—আমি...এখানে...কোথায়?

নয়নতারা বললে—এটা আমার বাড়ি, আমি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছি, তোমার খুব অসুখ হয়েছিল কিনা তাই...

—আমার অসুখ হয়েছিল?

—হ্যাঁ, তুমি ক'মাস ধরে আমার বাড়িতেই রয়েছ। তুমি ট্রেনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে, তাই তোমাকে দেখতে পেয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছি। এখন তুমি ভালো হয়ে গেছ, আর কোনও ভয় নেই—

কথাটা শুনে সদানন্দ যেন উসখুস করতে লাগলো। এপাশ-ওপাশ চারদিকে দেখতে লাগলো। যেন চিনতে চেষ্টা করতে লাগলো চারিদিকের পরিবেশ। চারিদিকের পরিবেশ দেখে তার যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। যেন তার ভালো লাগলো না এই শুয়ে থাকাটা। যেন উঠে বসতে চেষ্টা করতে গেল।

—ও কী করছো? উঠছো কেন? উঠছো কেন? শুয়ে থাকো।

নয়নতারা সদানন্দকে ধরে শুইয়ে রাখবার চেষ্টা করলে। দুর্বল শরীর সদানন্দর, পাখির পল্‌কা শরীরের মত।

নয়নতারা আবার বলে উঠলো—কেন উঠতে চেষ্টা করছো, উঠো না, পড়ে যাবে—

নয়নতারার কথায় সদানন্দ হতাশ হয়ে আবার নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়লো। অসহায় হয়ে শুধু নয়নতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন বলতে চাইলে—আমাকে ছেড়ে দাও তুমি, আমাকে মুক্তি দাও—

সেই আরো একবার যেমন করে কথাগুলো বলেছিল তেমনি করেই যেন কথাগুলো বলতে চাইলে সদানন্দ। নয়নতারা বুঝলো। কিন্তু-না-বোঝার ভান করে সদানন্দকে বলতে লাগলো—তুমি আগে ভালো হও, তারপরে চলে যেও, আমি তোমাকে এখানে আটকে রাখবো না, তুমি থাকতে চাইলেও আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেবো না—

সদানন্দ এবারে আবার কথা বললে। বললে—তুমি কেন...আমাকে এখানে আনলে?

নয়নতারা বললে—এখানে না আনলে তুমি কি বাঁচতে? তোমার যে খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। তুমি যে গাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে—

এর জবাবে সদানন্দ কিছু বললে না। নিজের হাত দুটো শুধু নিজের মাথায় ঘষতে লাগলো।

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—তোমার মাথা-ব্যথা করছে? আমি টিপে দেব?

কোনও জবাব না পেয়ে নয়নতারা নিজে থেকেই সদানন্দর কপালটা আস্তে আস্তে টিপতে গেল। কিন্তু সদানন্দ হাত দিয়ে নয়নতারার হাতটা সরিয়ে দিলে।

নয়নতারা বললে—এখনও দেখছি তোমার রাগ গেল না আমার ওপর! এখনও তুমি সে সব কথা ভুলতে পারোনি দেখছি! মাথা টিপে দিলে তোমার কী ক্ষতি হয়?

সদানন্দ স্পষ্ট গলায় বললে—না—

নয়নতারা বললে—না কেন? আমাকে এখনও ঘেন্না করো? আমি হাত দিলে কি তোমার গায়ে কাঁটা ফোটে?

সদানন্দ এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারলে না। নয়নতারার হাতে আত্মসমর্পণ করে যেন সে তৃপ্তি পেল। নয়নতারা একমনে তার মাথা টিপে দিতে লাগলো, আর সদানন্দ

নির্জীবের মত শুয়ে রইল চোখ বুঁজিয়ে। নয়নতারার মনে হলো মনুষটা যেন এতদিনের অসুস্থতার পর তার সেবায় একটু আরাম পাচ্ছে। দুপুরবেলা চারিদিকে সব চুপচাপ। দূরে স্টেশনে বুঝি কোনও ট্রেনের হুইস্‌ল্ বেজে উঠলো। কোথাকার ট্রেন কে জানে! হয়ত ওই ট্রেনটাই তার আগেকার শ্বশুরবাড়ি রেল-বাজারে যাবে। কিম্বা হয়ত ট্রেনটা রেল-বাজার থেকেই আসছে। কে জানে! রেল-বাজার! নামটা মনে পড়তেই মনটা অনেক দিনের পুরোন দিনগুলোর মধ্যে তলিয়ে গেল। আশ্চর্য! এমন যে হবে তা কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল? তার জীবন তো এতদিন অন্য খাতে বইছিল। অফিস করছিল, মাসকাবারি মাইনে ঘরে আনছিল। নিখিলেশের সঙ্গে নিজের জীবনটা জড়িয়ে ফেলে সে তো একেবারে অন্য মানুষই হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আবার তার পুরনো জীবনের ফেলে আসা মানুষটকে এমনভাবে কেন সে বাড়িতে এনে তুললো? ভগবান তার এ কী করলে? এখন একে নিয়ে সে কী করবে?

শাশুড়ী অনেক দিন বলেছে—দেখো বউমা, আমার খোকাকে তুমি যা ভাবছো ও তা নয়, ওর মত মায়া-দয়ার শরীর হয় না, সকলের জন্যে ওর মায়া, সকলের দুঃখে ও দুঃখ পায়, কেউ ওর পর নয়, সবাই ওর কাছে আপন—

আরো বলতো—শুধু অন্য সকলের থেকে একটু আলাদা, এই যা। পাড়ার আর দশজন ছেলেদের থেকে আলাদা। দেখছো না সবাই বারোয়ারিতলায় যাত্রা-থিয়েটার-কবিগান নিয়ে মেতে আছে, ও সেদিকে নেই, কোথায় মাঠে-ঘাটে-ক্ষেতে-খামারে একলা-একলা ঘুরে বেড়ায়। ছোটবেলায় প্রহ্লাদ চরিত্র যাত্রাগান হচ্ছে বার-বাড়িতে, আমার কাছে বসে ও গান শুনছে, শুনতে শুনতে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমার তো তখন থেকেই ভয় হতো ও ছেলে বড় হলে সন্নিসী না হয়ে যায় না—

তখন সদানন্দকে নয়নতারা অতটা ভালো করে চেনেনি। মনে হয়েছিল সে বলে—তা ছোটবেলা থেকেই যদি আপনার ছেলের সেই রকম মতিগতি তো সে ছেলের বিয়ে দিলেন কেন? তেমন ছেলের তো বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি আপনার—

কিন্তু শাশুড়ীর সামনে সেদিন নয়নতারা মুখ ফুটে এ-কথা বলতে পারেনি। শুধু মনে মনে শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপরই রাগ হয়েছিল তার। শাশুড়ী যত তার ছেলের গুণগান করতো তত তার রাগ হয়ে যেত শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর।

নয়নতারার মুখটা গম্ভীর হতে দেখলেই শাশুড়ী ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। বলতো—এখন বউমা তুমি খোকাকে ওই রকম দেখছো বটে, কিন্তু ওর আর একটু বয়েস হোক, তোমার কোলে একটা খোকা আসুক, তখন দেখবে তোমার ঘর থেকে ও আর নড়তে চাইবে না, পুরুষমানুষের তো স্বভাবই এই, তোমার শ্বশুরকেও তো দেখেছি বউমা, সবাই-ই ওই রকম—

কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো ততই যেন মানুষটার স্বভাব আরো তীক্ষ্ণ, আরো কঠোর হয়ে উঠতে লাগলো। তখন মানুষটার দিকে চেয়ে দেখতেও তার ভয় করতো।

আর আশ্চর্য সেই শাশুড়ী। সেই শাশুড়ীই যে আবার একদিন ওই রকম হয়ে যাবে তাও যেন কল্পনার বাইরে। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতে দেবে না। এ কি আবদার শাশুড়ীর! বেশ হয়েছে। ভালো হয়েছে। অমন বংশ যে নির্বংশ হয়ে গেছে খুব ভালো হয়েছে, নয়নতারা শুনে খুব খুশী হয়েছে। নিখিলেশ নিজে গয়নাগুলো চাইতে নবাবগঞ্জে গিয়ে সব শুনে এসেছে। সে বাড়ি নাকি এখন ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। হবে না! তার অভিশাপ কি মিথ্যে হবে নাকি!

হঠাৎ বাইরের সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

গিরিবালার এতক্ষণে সবে খাওয়া শেষ হয়েছে। রান্নাঘরের এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করে চৌবাচ্চায় হাত ধুচ্ছিল। এমন অসময়ে আবার কে এল তার বাড়িতে! নিখিলেশ অফিস কামাই করে বাড়ি চলে এল নাকি?

নয়নতারার কাছে এসে গিরিবালা বললে—দিদিমণি, আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে দেখ—

গিরিবালার পেছনে কে বুঝি দাঁড়িয়ে ছিল।

—আরে নয়নদি! তোমার অসুখ বলে ছুটি নিয়েছ, আর তুমি তো দিব্যি বসে আছো, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম—

—ওমা তুই!

হুড়মুড় করে উঠে পড়লো নয়নতারা। নইলে মালা একেবারে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তো হয়ত। নয়নতারা তাড়াতাড়ি তাকে তার নিজের শোবার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। কিন্তু সেইটুকুর মধ্যে মালা যা দেখবার তা দেখে নিয়েছে।

ঘরের ভেতরে বসে মালা বললে—ও কে নয়নদি? ও-ঘরে? কারোর অসুখ নাকি?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তুই হঠাৎ কী মনে করে?

মালা বললে—কী আবার মনে করে? এতদিন অফিসে যাচ্ছো না, আমরা সবাই ভেবে অস্থির। তুমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়েছ, আর আমি ভাববো না? তোমাকে একবার দেখতেও আসবো না?

—কিন্তু আজকে অফিস নেই তোর?

—ও মা, তা বুঝি জানো না, আজকে যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের থিয়েটার হচ্ছে। তাই আজকে হাফ-হলিডে হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা প্লে, সকাল-সকাল বাড়িতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে সবাই সেজেগুজে থিয়েটার দেখতে যাবে, আমি বললুম আমি থিয়েটার দেখবো না, আমি বরং নৈহাটিতে গিয়ে নয়নদিকে দেখে আসি—

—তুই এসেছিস ভালো করেছিস, এখন তোর জন্যে কী খাবার আনাই বল্?

—কী যে বলো তুমি নয়নদি, আমি তো এইমাত্র অফিসের ক্যান্টিন থেকে খেয়ে এলুম। খাওয়ার কথা থাক, তুমি তোমার কথা বলো, তোমার তো অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে অফিসে যাচ্ছো না কেন? কী হয়েছে তোমার? এদিকে আমি কিনা অত দূর থেকে দৌড়তে দৌড়তে তোমাকে দেখতে এলুম—

নয়নতারা বললে—আমার নিজের অসুখ ঠিক নয়, আমার বাড়িতে অসুখ ভাই, এ এমন অসুখ, কিছুতেই সারছে না, এতদিনে এবার মনে হচ্ছে যেন একটু সেরে উঠেছে—

মালা বললে—কার অসুখ, নয়নদি, উনি কে?

নয়নতারা বললে—উনি আমাদের এক আত্মীয়—ওঁর অসুখের জন্যেই তো আমার অফিস-কামাই, ওঁকে বাড়িতে একলা কার হাতে ফেলে অফিসে যাই বল?

—তোমার বাপের বাড়ির কেউ বুঝি?

নয়নতারা বললে—না, আমার শ্বশুরবাড়ির লোক—

—তোমার দেওর বুঝি?

—না দেওর নয়—

—তবে?

মালার বড় কৌতূহল। নয়নতারা সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললে—ওঁর কথা থাক, তুই অফিসের সব খবর-টবর বল্, কেতকীর খবর কী? নতুন কিছু গয়না গড়ালো আর?

বলে নয়নতারা আর মালা দু'জনেই হেসে উঠলো। কেতকী হাজরার গয়নার শখের

কথা অফিসময় সবাই জানে। টাকা হাতে পেলেই কেবল গয়না গড়াবে কেতকী।

—আর একটা খবর তোমাকে দিই নয়নদি, আমাদের ডেস্‌প্যাচ সেকশানের অরুণাদি, অরুণাদিকে চিনতে পারছো তো?

—কে? অরুণা বোস?

—না, অরুণা পাল, চল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, মনে নেই? ডেস্‌প্যাচ্ সেকশানের হেড-অ্যাসিস্টেন্ট্?

—হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি, তা তার কী হয়েছে?

—সেই অরুণাদি বিয়ে করছে!

নয়নতারা চম্‌কে উঠলো।

বললে—ও মা, সে কী রে? সে তো বুড়ি হয়েছে, চুল পেকে গেছে যে তার।

মালা বললে—তা সে যেমন বুড়ি, তেমনি বুড়ো বরও তার জুটেছে। কার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে জানো?

—কার সঙ্গে?

—অমাদের বাজেট সেকশানের বড়বাবুর সঙ্গে—

নয়নতারা আরো অবাক হয়ে গেল। বাজেট সেকশানের বড়বাবু আর-ডি-চ্যাটার্জি, রসিকদাস চট্টোপাধ্যায়। আগে একটা বিয়ে হয়েছিল বড়বাবুর, কিন্তু সে-বউ বিয়ের পরেই মারা গিয়েছিল, তারপর আর বিয়ে করেনি ভদ্রলোক।

নয়নতারা বললে—সে তো বুড়ো থুথুড়ো রে, তার সঙ্গে অরুণাদির বিয়ে? সে তো রিটায়ার করবে শিগগির, তাকে কী দেখে পছন্দ হলো অরুণাদি'র? টাকা?

মালা বললে—তা ছাড়া আর কী বলবো বলো! রিটায়ার করে অনেক পেনসন পাবে তো, পেনসন কমিউট্ করে কয়েক হাজার টাকা পাবে, সেই টাকার লোভ—আর অরুণাদিরও তো আর কেউ নেই,শেষকালে বুড়ো বর রিটায়ার করে বাড়িতে বসে রান্না করে দেবে, আর অরুণাদি অফিস করবে, ঠাকুর-চাকরের খরচটা বেঁচে যাবে—

নয়নতারা বললে—তাহলে শুধু টাকা! টাকার জন্যেই এই বয়েসে বিয়ে করতে গেল অরুণাদি? কিন্তু এতদিনই যদি বিয়ে না করে থাকতে পেরে থাকে তো আর বাকি জীবনটা থাকতে পারলে না?

মালা বললে—আরো কত মজার খবর আছে অফিসের, তোমায় কী বলবো নয়নদি। তুমি ছিলে না, তোমাকে এই সব খবর দেবার জন্যেই তো আরো এলাম।

গিরিবালা ততক্ষণে চা করে নিয়ে ঘরে এসেছে। সঙ্গে আবার মিষ্টি।

—ও মা, এসব আবার আনলে কেন নয়নদি! এ-রকম করলে কিন্তু আর আমি আসবো না তোমার কাছে, এই আমি উঠলুম।

বলে মালা উঠে দাঁড়ালো। নয়নতারা বললে—উঠছিস কেন, আমিও তো চা খাবো রে, আমারও তো চা খাওয়ার সময় হয়েছে, এই নে, খা—

মালা বসলো। তারপর চা খেতে খেতে বললে—এবার যাবো নয়নদি, তা তুমি তো বললে না কার অসুখ, ও ঘরে কে রয়েছে তা তো বললে না—

পাশের ঘরে শুয়ে সদানন্দর কানে এতক্ষণ সব কথাগুলো ভেসে আসছিল। সবে সেদিন সে একটু সুস্থ হয়েছে। নয়নতারা তাকে গরম জলে স্নান করিয়ে দিয়েছে। নয়নতারার গলাও শুনতে পাচ্ছিল সে, আর একজন মেয়ের গলাও শুনতে পাচ্ছিল। তার মনে হলো সে যেন সব বুঝতে পারছে। তার অবর্তমানে নয়নতারা নবাবগঞ্জ ছেড়ে কেন কেষ্টনগরে না গিয়ে এখানে এই নৈহাটিতে এসেছে তাও যেন বুঝতে পারছে।

ক'দিন থেকেই অল্প-অল্প একটা ধারণা হচ্ছিল তার। কিন্তু আজকে যেন আরো স্পষ্ট হলো জিনিসটা—

হঠাৎ মালা জিজ্ঞেস করলে—কবে তুমি অফিসে যাবে, নয়নদি? তোমার জন্যে যে আমরা সবাই হাঁ করে বসে আছি—

নয়নতারা বললে—আমি কী করে যাই তুই বল্, এই রুগীকে তাহলে কে দেখবে?

—তা ওঁর নিজের লোক কেউ নেই? ওঁর বিয়ে হয়নি? স্ত্রী ছেলে মেয়ে তাঁরা কোথায়?

—তাঁরা নেই—

মালা বললে—ও মা, কেউ নেই? তা তুমিই বা এত ঝক্কি ঘাড়ে নিতে গেলে কেন?

নয়নতারা বললে—সবাই তো তাই-ই বলে।

মালা বললে—তা বলবেই তো। তোমাদের তো ঝাড়া হাত পা। আপনি আর কোপ্‌নি! তুমি এ-সব পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে গেলে কেন নয়নদি—তোমাকে দেখে তো তাই অফিস-সুদ্ধু মেয়ে সবাই আমরা হিংসে করতুম।

সদানন্দর কেমন খারাপ লাগলো কথাগুলো শুনতে। তবে কি সে এ-বাড়িতে অবাঞ্ছিত। নয়নতারা তো আবার বিয়ে করেছে! বিয়ে করে সুখেই আছে। চাকরি করছে অফিসে। অফিসে যায়নি বলে অফিসের বন্ধুরা তার বাড়িতে পর্যন্ত খোঁজ নিতে এসেছে। এই অবস্থায় কেন সে এখানে আসতে গেল? কেন নয়নতারা তাকে বাড়িতে এনে তুললে? আর তুললোই যদি তাহলে সে জেনেশুনে কেন এখানে থাকবে? সে এখান থেকে চলে গেলেই তো আবার ওদের সংসারে শান্তি ফিরে আসে।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো সদানন্দ। এই ঘর, দেয়ালের গায়ে ঠেসান দেওয়া একটা আলমারি। তাতে কয়েকটা পুতুল। ঘরের মধ্যে দু'চারটে চেয়ার। আর একদিকে দেয়ালের তাকে ওষুধের শিশি জড়ো করা। কত ওষুধ খেয়েছে সে! তার অসুখের জন্যে কত টাকা খরচ হয়ে গেছে এদের!

—নিখিলেশবাবু কেমন আছেন রে!

—ওঁর কথা আর বলিসনি তুই, আমার ওপর ভীষণ রেগে গেছে জানিস?

—কেন?

—ওই যে আমি অফিসে যাচ্ছি না। অফিসে যাচ্ছি না বলে আমার মাইনে কাটা যাচ্ছে সেই জন্যে রাগ। টাকার লোকসান হচ্ছে বলে ওঁর যত রাগ। এ ক'দিন আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলছে না ভাই।

—তা নিখিলেশবাবুর দোষ কী নয়নদি, যে-কোনও স্বামীই তাই করতো। এত-গুলো টাকা লোকসান কি মুখের কথা! সে-টাকায় কতগুলো শাড়ি হয়ে যেত বলো তো?

নয়নতারা বললে—দূর, একজনের জীবনের চেয়ে কি শাড়িই বড় হলো নাকি?

—তা তো বুঝলুম, কিন্তু উনি তো তোমার নিজের কেউ নন। নিজের স্বামী হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল, কিন্তু উনি তো পর, মানে নিজের ছেলে-মেয়ে-স্বামী-ছাড়া মেয়েমানুষের কাছে আর সবাই-ই তো পর, বলো?

সদানন্দ আর থাকতে পারলে না। হ্যাঁ, সে তো পরই বটে। হাজারবার পর। এখন নয়নতারার কাছে সে আর নিজের লোক নয়। নিখিলেশবাবুকে বিয়ে করার পর থেকে সদানন্দ নয়নতারার চিরকালের মত পর হয়ে গেছে। সত্যিই তো, ওই মহিলা তো অন্যায় কথা কিছুই বলেনি। আজকের মানুষের কাছে পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই-ই পর বই-কি। নিজের বলতে তো শুধু নিজের স্বামী, নিজের ছেলে-মেয়ে এই সব। এ ছাড়া তো আর কেউ নিজের নয়। তাহলে কেন সে এখানে

থাকবে! সে এখানে থাকবে কেন? সে এখানে আছে বলেই তো নয়নতারা অফিসে যেতে পারছে না। তার জন্যেই নয়নতারার অফিসে মাইনে কাটা যাচ্ছে! যে-কোনও স্বামীই তো এতে স্ত্রীর ওপর রাগ করবে।

—জানিস, এই ওঁর জন্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।

—তাই নাকি? কত টাকা খরচ হলো সবসুদ্ধ?

—তা অনেক।

—নিখিলেশবাবুকে তো ভালো বলতে হবে নয়নদি। আমার কর্তা হলে তো রুগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন।

নয়নতারা—কিন্তু ওঁকে তো খরচের কথা কিছু বলিনি। উনি কিছুই জানেন না। উনি মনে করেছেন বড় জোর শ'খানেক কি শ'দেড়েক টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ভাই আজকাল ওষুধের কী গলাকাটা দাম হয়েছে! এক-একটা ইনজেকশানের অ্যাম্পিউলের দামই পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা করে। এক-একটা সামান্য ভিটামিনের বড়ি, তাও এক টাকা পাঁচ সিকে করে। তারপর ডাক্তারবাবু যতবার এসেছে ততবার আটটাকা করে ভিজিট দিতে হয়েছে—খরচ কী কম হলো? যে-কটা টাকা আমার জমেছিল সব ওঁর অসুখেই চলে গেল—

—তা সবসুদ্ধু কত খরচ হলো?

নয়নতারা বললে—তুই যেন কাউকে বলসিনি ভাই, উনি শুনলে ক্ষেপে যাবেন। উনি জানে শ'খানেক শ'দেড়েক, কিন্তু আমার নিজের কাছে ছিল তিনশো টাকা, সেটা সব খরচ হয়ে গেল। তারপর আর টাকা নেই। তখন কী করি! শেষকালে ভাই আমার গলার হারটা স্যাকরার দোকানে বাঁধা দিয়ে চারশো টাকা নিয়ে এসেছি—

মালা চম্‌কে উঠেছে। বললে—সে কী? ওমা, কী চমৎকার ডিজাইনের হারটা গড়িয়েছিলে তুমি, সেটা পরলে তোমায় খুব মানাতো, তুমি কিনা সেইটে বাঁধা দিলে?

—চুপ কর ভাই, অত চেঁচাসনি, শেষকালে আমার ঝি আবার শুনতে পাবে। কথাটা এখনও কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। দেখিস ভাই, অফিসে যেন কারো কানে না যায়—

সদানন্দ ঘরের বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। দরজা দিয়ে বাইরে উঠোনের একটা ফালি দেখা যায়। সেখানে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। বোধ হয় পাশের ঘরে ছাড়া কেউ কোথাও নেই। না, এখানে আর এক মুহূর্ত তার থাকা উচিত নয়। আস্তে আস্তে সদানন্দ উঠতে চেষ্টা করলে। মাথা যেন ঘুরতে লাগলো তার। অনেক কষ্টে তক্তপোশের ওপর উঠে বসতে গিয়েই ঘেমে নেয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করে উঠলো।

কিন্তু সে-সব ভাবলে চলবে না। পরের সংসারে বিপর্যয় অধিকার নেই তার। সত্যিই নয়নতারা আজ তার কাছে পর। সদানন্দর নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো। প্রথমে একটা হাত দিয়ে কোনও রকমে দেয়ালটা ধরলে সে। তারপর দেয়াল ধরে ধরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। কেউ কোথাও নেই। চারদিকে বেলা পড়ে এসেছে। মনে হলো সন্ধ্যে হবো-হবো। সামনের উঠোনটা ফাঁকা। আর একটু পরে অন্ধকার হয়ে গেলে কিছুই দেখা যাবে না। সদানন্দ বারান্দায় দেয়াল ধরে ধরে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামবার চেষ্টা করলে। উঠোনের ডান দিকেই দরজা। দরজাটা খুলে বাইরে বেরোলেই রাস্তা! একবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারলে আর কোনও ভাবনা নেই। অনেকদিন নয়নতারাকে সে ভুগিয়েছে। অনেক কষ্ট তাকে দিয়েছে, অনেক টাকা তার খরচ হয়ে গেছে তার জন্যে। এবার তাকে মুক্তি দেবে সে। সত্যিই তো, সে যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি তার কাছ থেকে সেবা নেবার অধিকারও তার নেই। জীবন যাকে প্রবঞ্চনা করেছে, জীবনের কাছে তার আকাঙ্খা করবার

কি কিছু থাকে! অথচ সেই জীবনকে সুন্দর করবার আকাঙ্খা নিয়েই তো সে একদিন গৃহত্যাগ করেছিল। সেদিন তো সে ভেবেছিল নিজের সকলকে পরিত্যাগ করলেই বাইরের সবাই তার নিজের হবে। সবাইকে আপন করবার ইচ্ছেতেই সে তো পথে বেরিয়ে পড়েছিল। এই কি সেই তার সকলকে নিজের করবার নমুনা! সবাইকে তো সে কেবল কষ্টই দিয়েছে, সকলেরই কাছে সে তো কেবল বোঝা হয়েই রয়েছে। একদিন সকলের বোঝা হবার ভয়ে সমরজিৎবাবু বাড়ি থেকেও সে এমনি করে নিঃশব্দে সরে এসেছিল। তারপর সেই পাঁড়েজী। ধর্মশালার পাঁড়েজীর কাছে সে বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা মুখে সে যা-ই বলুক না কেন! নিজের সংসার ছারখার করেছে বলে পরের সংসার ছারখার করবার অধিকার তাকে কে দিলে? না, এখান থেকে যদি সে কোনও রকমে কলকাতায় পৌঁছোতে পারে তাহলে পাঁড়েজীর কাছেও আর গিয়ে দাঁড়াবে না। পাঁড়েজীকে গিয়ে বলবে না যে আমাকে আশ্রয় দাও। পৃথিবীর কাউকে সে বলবে না —তুমি আমার আশ্রয়স্থল! আর যদি কোথাও থাকতেই হয় তো আশ্রয়ের প্রতিদানে কিছু কাজ করে দেবে সে।

কিন্তু কী কাজই বা করতে পারে সে! তার কাছ থেকে লোকে কী-ই বা চাইবে? টাকা? টাকা তার কোথায়? অথচ আজ যদি এই বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় কিছু টাকা সে দিয়ে যেতে পারতো, যদি বালিশের তলায় নয়নতারার সোনার হার বাঁধা রাখার চারশো টাকাও রেখে যেতে পারতো, তাহলেও সে নয়নতারার সংসারের কিছু সাশ্রয় করেছে বলে গর্ব বোধ করতে পারতো। কিন্তু তা নয়, সমরজিৎবাবুর বাড়িতে যেমন, পাঁড়েজীর ধর্মশালায় যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি সে গলগ্রহ। অথচ গলগ্রহই যদি সে হবে তাহলে নবাবগঞ্জ কী দোষ করেছিল! নবাবগঞ্জে তার পৈতৃক অর্থের ভারবাহী হয়ে জীবন কাটানোটা কেন তার কাছে অত অসহ্য মনে হয়েছিল!

মালা বললে—আজ তাহলে আসি নয়নদি, কলকাতায় ফিরতে আবার রাত হয়ে যাবে, তিনি আবার আমার দেরি দেখে ভাববেন, নার্ভাস মানুষ তো—

—কিন্তু আর একদিন আসিস ভাই, অনেকদিন পরে দেখা হলো, বেশ ভালো লাগলো—

মালা এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ালো। বললে—তুমি অফিসে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অফিসের আড্ডাটি জমছে না নয়নদি—

নয়নতারা বললে—এইবার মনে হচ্ছে যেতে পারবো, এখন ও-ঘরে উনি একটু ভালোর দিকে যাচ্ছেন, আজ তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন—

মালা কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাইরে দুম করে কী একটা শব্দ হলো। কিছু একটা ভারি জিনিস যেন কাছেই কোথাও পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা সচকিত হয়ে উঠলো। কী পড়লো! কোথায় পড়লো!

নয়নতারা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই দেখলে—সর্বনাশ!

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—গিরিবালা, ও গিরিবালা—কোথায় তুমি—

শব্দটা গিরিবালার কানেও গিয়েছিল। সে তখন রান্নাঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। দিদিমণি ডাকবার আগেই সে শব্দ শুনে উঠোনে বেরিয়ে এসেছে।

—ওমা এ কী?

মালাও দেখলে সদর দরজার ভেতরের দিকে উঠোনের ওপর একজন পুরুষ মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এই মানুষটাই তো একটু আগে ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। বাইরে কী করে এল?

কিন্তু নয়নতারার তখন আর জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি মানুষটার মুখের কাছে মুখ নিচু করে দেখতে চাইলে সে বেঁচে আছে না অজ্ঞান হয়ে গেছে!

গিরিবালাকে বললে—গিরিবালা, শিগ্‌গির এক ঘটি জল নিয়ে এসো, এ কী সর্বনাশ হলো!

গিরিবালা ঘটি করে জল নিয়ে এসেছে তখনি। সদানন্দর মাথায় চোখমুখে জল দিতে দিতে নয়নতারা বললে—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বলো দিকিনি গিরিবালা, মানুষটা যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, তুমি একবার দেখতেও পাওনি? এখন কী হবে? আর সদর দরজাটাই বা অমন হাট করে খোলা কেন?

গিরিবালা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বললে—আমি তো দরজা খুলিনি দিদিমণি, এখন তো দেখছি খোলা রয়েছে—

নয়নতারা রেগে গেল। বললে—তুমি খুলবে না তো কে আবার দরজা খুলে রাখতে যাবে? আর রুগী মানুষ বিছানা থেকে উঠে এতখানি হেঁটে এসেছে, তুমি একবার দেখতেও পেলে না? অনেকদিন পরে মালা এসেছে, আমি তার সঙ্গে একটু ও-ঘরে গল্প করছি, আর এরই মধ্যেই এই কাণ্ড! আমি তো কোনও দিন ওঁকে একলা ছেড়ে উঠি না, আজ একটু ও-ঘরে গেছি, আর তুমি ওঁর পাশে একটু বসতে পারলে না? আমি যে-কাজটা দেখবো না সেই কাজটাতেই কি গাফিলতি! আমি একলা ক'দিক দেখবো বলো তো? রান্নাঘরটা পরে ধুলে কী এমন ক্ষতি হতো শুনি?

গিরিবালা এর উত্তরে কী বলবে! মালাও যেন কেমন বিব্রত বোধ করতে লাগলো। সে এসেছিল একটু গল্প করতে। কিন্তু তার এই আসার ফলে যে সে নয়নদির সংসারে এত বড় একটা দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠবে তা সে কল্পণাও করতে পারেনি।

মালা বললে—কী হবে নয়নদি, আমার জন্যেই তো এই রকম হলো—

নয়নতারা বললে—তোর কী দোষ, গিরিবালাই তো যত কাণ্ড বাধালে! কেন, এখন রান্নাঘর না ধুলে চলতো না—

গিরিবালা বললে—সন্ধ্যে হয়ে গেল, তাই ভাবলুম—

—তুমি থামো, তোমাকে আর কথা বলতে হবে না—এখন তুমি ওদিকটা ধরো, আমি মাথার দিকটা ধরছি, ধরো, কোনও রকমে ঘরে নিয়ে চলো—

গিরিবালা নিচু হয়ে সদানন্দর নিচের দিকটা ধরলে। নয়নতারা সামনের দিকটা। সদানন্দর হাত দুটো দিয়ে নিজের গলাটা জড়িয়ে নিলে। তারপর গিরিবালাকে বললে—খুব সাবধান, সাবধানে তোল—

মালার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। সেও হাত লাগালে। সদানন্দর শরীরের মাঝখানটা ধরে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করলে।

ঠিক সেই সময়ে তিনজনেই অবাক হয়ে দেখলে খোলা সদর দরজার সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে নিখিলেশ।

আর নিখিলেশ নিজেও অবাক। অফিস থেকে বাড়ি আসার আগে প্রতিদিন সে যা কল্পনা করে আজকে একটু আগে বাড়ি আসার সময় সেই দৃশ্য দেখবে বলেই সে কল্পনা করেছিল। ভেবেছিল বাড়ি গিয়ে দেখবে রোগীর সামনে বসে নয়নতারা মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছে মাথা টিপে দিচ্ছে। কিম্বা থার্মোমিটারে রোগীর জ্বর পরীক্ষা করছে। নয়তো রোগীর সামনে চেয়ারে বসে বসে একদৃষ্টে তাকে পাহারা দিচ্ছে। এইরকম একটা-না-একটা রোজই তাকে দেখতে হয়।

কিন্তু এ অন্যরকম। নিখিলেশ দেখলে সদানন্দর দুটো হাত নয়নতারার গলায় জড়ানো, আর নয়নতারা তাকে জড়িয়ে ধরে পাঁজাকোলা করে তোলবার চেষ্টা করছে। আর তার সামনে গিরিবালা, আর তার মাঝখানে আর একজন। নয়নতারার অফিসের বন্ধু। তাকেও

চিনতে পারলে নিখিলেশ। এই মেয়েটাই অনেকবার গান শুনিয়ে গেছে তাদের।

ঠিক এই ঘটনার মধ্যে বাড়িতে ঢুকে পড়ে একজন অল্প-পরিচিত মহিলার সামনে নিখিলেশ যেন বিব্রত বোধ করলে।

নয়নতারা নিখিলেশকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলো—ও, তুমি এসে গেছ? ভালোই হয়েছে, একটু এদিকটা ধরো তো গো—

নিখিলেশের সমস্ত মন যেন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু এই অবস্থায় কোন রাগ প্রকাশ করা শোভা পায় না। তার শিক্ষা-দীক্ষায়-ভদ্রতায় বাধে। অথচ মানুষের ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে! নিখিলেশ জামার হাতা দু'টো গুটিয়ে নয়নতারাকে সাহায্য করতে এগোচ্ছিল।

কিন্তু সদানন্দ ঠিক সেই সেই সময়েই তার চোখ দুটো খুললো। বললে—আমাকে ধরতে হবে না, আমি নিজেই উঠতে পারবো—

বলে অনেক কষ্টে সকলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। তারপর আস্তে আস্তে সেখানেই উঠে দাঁড়ালো।

নয়নতারা সদানন্দর আত্মনির্ভরতার চেষ্টার ওপর আর ভরসা করতে পারলে না। সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুই হাতে ধরে ফেলেছে। পাছে সে পড়ে যায়। তারপর বললে—চলো, ঘরের দিকে চলো—

চারদিকে তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঝাপসা আলোয় সমস্ত কিছু অস্পষ্ট। নয়নতারা সদানন্দকে দুই হাত ধরে ধরে তাকে বারান্দায় ওঠালো। তারপরে ঘরের ভেতের নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলে।

আর উঠোনে দাঁড়িয়ে মালা, নিখিলেশ, গিরিবালা সেই দৃশ্য দেখতে লাগলো।

তারপর পৃথিবীর আর সব বাড়ির মত এ-বাড়িতেও রাত নেমে এলো। রাত নেমে এলো নৈহাটিতে। রাত নেমে এল নবাবগঞ্জে। রাত নেমে এল বউবাজারের সমরজিৎবাবুর বাড়িতে আর নেমে এল বড় বাজারের দাতব্য ধর্মশালায়। এ রাত পৃথিবীতে আগেও অনেকবার নেমে এসেছে, কিন্তু নৈহাটির এই বোসপাড়ার বাড়িতে বুঝি আগে কখনও এমন করে রাত নেমে আসেনি।

ক্লান্তিতে, দুর্বলতায়, অবসাদে সদানন্দ অনেকক্ষণ তার নিজের বিছানার ওপর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক পরেই কাদের কথাবার্তার শব্দে তার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। পাশে ঘর থেকেই কথাগুলো আসছিল। মনে হলো পাশের ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে তখন তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে।

নিখিলেশের গলারই তেজটা বেশি। সে বলছে—কেন, আমি কি তোমার জন্যে কিছুই করিনি? সেদিনের কথা মনে করে দেখ তো, যেদিন তুমি শ্বশুরবাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে কেষ্টনগরে এলে, মাথার সিঁদুর মুছে ফেলে বাবার কাছে এসে দাঁড়ালে, সেদিন কোথায় ছিল এই সদানন্দবাবু? সেদিন তো তার কোনও পাত্তা ছিল না। তোমার বুড়ো শ্বশুর যখন রাত্তিরে শোবার ঘরে ঢুকে তোমার সতীত্ব নষ্ট করতে চেয়েছিল তখনই বা কোথায় ছিল এই সদানন্দ? আমি সেদিন তোমাকে যদি না বাঁচাতুম তো কে তোমাকে বাঁচাতো শুনি? আমি যে সারাদিন অফিসে গাধার খাটুনির পর রাত জেগে তোমাকে পড়িয়েছি—তোমাকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করিয়েছি, তারপরে কত লোককে খোশামোদ করে কত লোকের পায়ে

তেল দিয়ে তোমাকে গভর্ণমেণ্ট সারভিস করে দিয়েছি, সে-সব তুমি একেবারে ভুলে গেলে?

নয়নতারা গলা শোনা গেল এবার। সে বললে—ওগো, তুমি চুপ করো এবার, ও-ঘর থেকে ও যদি শুনতে পায় তো সর্বনাশ হবে—

নিখিলেশ এবার আরো গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—হোক, সর্বনাশ হোক, আমি কাউকে ভয় করি নাকি? আমি তো জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি যে কাউকে আমি ভয় করতে যাবো—

নয়নতারা বললে—কিন্তু তুমি মদ খাওনি? তুমি মদ খাওয়া ধরলে কেন আগে তাই বলো? কার ওপর রাগ করে তুমি ওই বিষটা খেতে গেলে?

—খেয়েছি বেশ করেছি। আমার ভালো-মন্দ দেখবার যখন কেউ নেই, তখন আমি মদ খাবো না তো কী করবো? আমি তো রোজ মদ খাই—

—সে কী? তুমি রোজ খাও?

—হ্যাঁ খাই, রোজ খাই, আজকেও খেয়েছি। কিন্তু কেন খাবো না বলতে পারো?

—কিন্তু ও-সব ছাই-পাঁশ খেলে কি তুমি বাঁচবে? ওগুলো খাওয়া কি ভালো? ও খেলে তো শুনেছি শরীর খারাপ হয়, পক্ষাঘাত হয়, আরো কত কী হয়—

—তা আমার পক্ষাঘাত হলে কার কী? পক্ষাঘাত হলে আমার হবে, তাতে অন্য কারো তো কিছু ক্ষতি হবে না—

নয়নতারা বললে—ও-কথা বলো না গো, ও-কথা বললে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো! লোকের বাবা থাকে, মা থাকে, মাসি-খুড়ি-জেঠি-ভাই-বোন কত কী থাকে, আমার কি সে-সব কেউ আছে? তুমি অমন রাগ করলে আমি কী নিয়ে থাকবো বলো, কার মুখের দিকে চেয়ে কোন্ ভরসায় আমি থাকবো বলো?

—কেন, তোমার তো সব আছে। তোমার তো কোনও ভাবনা নেই—

—সে কী, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

—কেন, ও-ঘরে তোমার সদানন্দবাবু আছে—

নয়নতারা চমকে উঠলো। যেন কোনও অমঙ্গলের কথা তার কানে গেছে। বললে—ছিঃ, তুমি কি বলো তো, তোমার মুখে কি কোনও কথা আটকায় না!

—কেন আটকাবে? আমি তোমাকে যে দশভরি সোনার হার করিয়ে দিয়েছিলুম, সে হার তুমি সদানন্দবাবুর রোগ সারাবার জন্যে চারশো টাকায় বাঁধা রাখোনি?

ওদিক থেকে নয়নতারার আর কোন জবাব শোনা গেল না।

নিখিলেশ বললে—কী হলো, কথার জবাব দিচ্ছ না যে? বলো, জবাব দাও—আমি কি সাধ করে মদ খাই? সদানন্দবাবুর জন্যে তোমার লুকিয়ে হার বাঁধা দেওয়াতে দোষ হলো না, আর আমার মদ খাওয়াতেই বুঝি যত দোষ হলো, না?

সদানন্দ বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে সব শুনছিল। ও-ঘর থেকে থেকে স্পষ্ট তার কানে আসছিল কথাগুলো। কিন্তু নিখিলেশের কথার জবাবে নয়নতারার কোনও গলার আওয়াজ আর পাওয়া গেল না—

কিন্তু সদানন্দ যে ঘরের ভেতরে শুয়ে শুয়ে কী করবে তা সে বুঝতে পারলে না। কথাগুলো যত তার কানে আসছিল ততই তার নিজের ওপরেই ধিক্কার জন্মাচ্ছিল। চারদিকে গভীর নিশুতি। শুধু মাঝে মাঝে দূরের রেল স্টেশনের ইয়ার্ড থেকে ট্রেনের হুইসল্-এর শব্দ আসছে। নৈহাটি। এত জায়গা থাকতে সে কিনা এই নৈহাটিতে এসে আশ্রয় পেলে! কলকাতা যাতায়াতের পথে কতবার সে এখান দিয়ে ট্রেনে করে গেছে। কিন্তু তখনও কি একবারও ভেবেছে যে, একদিন সেই নৈহাটিতেই তাকে নামতে হবে, কিংবা এই নৈহাটিতেই

নয়নতারা তার সংসার পাতবে, এই নৈহাটিতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে আর নয়নতারা এমন করে তাকে তার নিজের বাড়িতে তুলে এনে তার নিজেরই জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে!

বিছানার মাথায় দিকে একটা অল্প-পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। সদানন্দর মনে হলো সেখান থেকেই শুয়ে শুয়ে সে চিৎকার করে ওদের ডাকে। চিৎকার করে ওদের ডেকে বলে—ওগো, তোমাদের সংসারে এসে আমি অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছি, এবার আমাকে তোমরা তোমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও, আমাকে তোমরা তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যেতে বলো, তাতে আমি বাঁচি আর না বাঁচি তোমরা অন্তত এই অশান্তি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচো—

সদানন্দ সেই বিছানার ওপর শুয়ে শুয়েই অনেকক্ষণ ধরে ছট্‌ফট করতে লাগলো। এই কয়েক ঘণ্টা আগেই তো এ-বাড়ি থেকে সে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু কেন সে তখন ধরা পড়ে গেল! দরজার খিলটা খুলে সে তো নিঃশব্দেই চলে যেতে চেয়েছিল। এমনভাবে চলে যেতে চেয়েছিল যাতে কেউ টের না পায়। কিন্তু কেন সে চলে যেতে পারলে না? কেন ধরা পড়ে গেল সকলের চোখে? কেন অমন করে তার মাথাটা ঘুরে গেল?

পাশের ঘরে হঠাৎ আবার নিখিলেশবাবুর গলা শোনা গেল—না না না, কিছুতেই না—

নয়নতারা বোধ হয় তখন কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে গলাটা বোধ হয় তার তখন ভারি হয়ে গেছে। ভারি গলাতেই সে বলে উঠলো—ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এমন করে আর চেঁচিও না তুমি—

নিখিলেশ বললে—কেন চেঁচাবো না? আমার নিজের বাড়িতে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো, আমি চেঁচাবো, গান গাইবো, হাসবো, কাঁদবো, তাতে কার কী বলবার আছে?

নয়নতারা বললে—তুমি এত রেগে যাচ্ছো কেন? আগে তো তোমার এত রাগ ছিল না—

নিখিলেশ বললে—তুমি আজকে আমার রাগটাই দেখলে, কিন্তু একবারও তো তুমি তোমার নিজের দোষটা দেখলে না—

—আমি তো বলছি দোষ করেছি, এবার হলো তো? এবার তোমার রাগ থামাও—

—তুমি দোষ স্বীকার করলেই বুঝি তোমার সাতখুন মাপ হয়ে গেল? তাহলে তো মানুষ খুন করে দোষ স্বীকার করলেই সবাই রেহাই পেয়ে যেত!

নয়নতারা বললে—ওগো, ও সব তর্ক এখন থাক। ওই নিয়ে আমি এই রাত তিনটের সময় তর্ক করতে চাই না তোমার সঙ্গে—

—তা কেন করবে? তাতে যে তোমার নিজের মুখেই কালি লাগবে! কিন্তু এখন কী হলো? এখন তো তোমার অফিসের বন্ধুরাও জেনে গেল। আমি না হয় মুখ বন্ধ করে রইলুম, কিন্তু তোমার বন্ধুদের মুখ চাপা দেবে কী করে? তারা তো জেনে গেল তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায় নেমে এসেছে—আর তার জন্যে কে দায়ী?

নয়নতারা বললে—দেখ, ওদের কথা তুমি বোল না, ওদের মন তোমার মত অত নীচ নয়—

—তার মানে?

—হ্যাঁ, তার মানে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। তোমার নিজের মনটা যেমন তুমি অন্য লোককেও সেইরকম মনে করো। একটা অসহায় অসুস্থ মানুষকে বাড়িতে এনে সেবা করেছি বলে তুমি আমাকে এমন যা-তা কথা শোনাবে!

নিখিলেশ বললে—কেন শোনাবো না? তোমার অফিসের বন্ধুদের জিজ্ঞেস কোর তো তারা কেউ নিজের স্বামী থাকতে বাইরের একটা উট্‌কো মানুষের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে সোনার হার বাঁধা দেয় কিনা—

নয়নতারা এবার ক্ষেপে উঠলো যেন। বললে—তুমি ওকে উট্‌কো লোক বললে? সব জেনেশুনেও তোমার মুখে ওই কথা বেরোল? একটু ভদ্র ভাষা বলতেও তুমি শেখোনি?

—তুমি আমাকে ভদ্রতা শিখোতে এসো না। তাহলে একদিন যে তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিল তার কাছে গিয়েই শুলে পারো, আমার কাছে এলে কেন? আমি কি তোমায় ডেকেছিলুম?

—তাহলে বেশ, তাই যদি তুমি চাও তাই-ই যাচ্ছি—

—হ্যাঁ যাও, আর জীবনে তাহলে আমার ঘরে কখনও এসো না—

নয়নতারা বলে উঠলো—তাহলে এও বলে রাখছি, আমিও আমার হার বাঁধা দিয়েছি বেশ করেছি—

নিখিলেশও বলে উঠলো—তাহলে আমিও বলছি, আমিও মদ খেয়েছি বেশ করেছি। এখন দেখছি সেদিন তোমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার ভুল হয়েছিল—

—তাই যদি ভাবো তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও না। এখন তো সে-পথও খোলা আছে। তাতে তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি—

—তা তো এখন বলবেই, এখন তোমার চাকরি হয়ে গেছে কিনা, এখন আর আমার পরোয়া করবে কেন? তোমার পাকা চাকরি, মোটা মাইনে পাচ্ছো, পেনসন পাবে রিটায়ার করলে, এখন আর আমার কথা মনে থাকবে কেন? মেয়েমানুষ জাতটাই এইরকম নেমকহারাম—আগে জানলে...

—চুপ করো, স্কাউন্ড্রেল কোথাকার, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না হয়।

নিখিলেশ রাগের মাথায় আরো কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সামনে যেন ভূত দেখে দুজনেই চম্‌কে উঠেছে। সদানন্দ তাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। একেবারে সশরীরে।

এটা মুহূর্ত শুধু নিজেকে সামলে নিতে নয়নতারার সময় লাগলো। কিন্তু তারপর একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে। বললে—এ কি, তুমি?

সদানন্দ দরজার দু'টো চৌকাট ধরে কোনও রকমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বললে—হ্যাঁ আমি—

—কিন্তু তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে! আমি তো তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এ-ঘরে এসেছি। তুমি আবার জাগলে কখন?

সদানন্দ বললে—আমি এতক্ষণ জেগেই ছিলুম। কিন্তু আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলুম না। আমি একটা কথা বলতে এসেছি শুধু—

নয়নতারা তখন পাগলের মতন অবস্থা। বললে—তা কথা বলার যদি দরকার ছিল তো আমাকে তুমি ডাকলেই পারতে। তুমি নিজে আসতে গেলে কী বলে? তোমার যে শরীর খারাপ! তুমি যদি অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে কী সব্বোনাশ হতো বলো দিকিনি এখুনি—চলো চলো তোমাকে শুইয়ে রেখে আসি—

বলে নয়নতারা সদানন্দর হাতটা ধরতে গেল।

সদানন্দ বললে—না, থাক্‌,—তার দরকার হবে না—

নয়নতারা সদানন্দর কথায় কান না দিয়ে সদানন্দকে ধরলে। কিন্তু সদানন্দ নয়নতারার

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললে—নিরিলেশবাবু, আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি—

ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর তখনো হয়ত কাটেনি নিখিলেশের। এক মুহূর্ত কোনও জবাব দিতে পারলে না সে।

সদানন্দ আবার বললে—জানি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন না, তবু আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য মনে করেই আমি ক্ষমা চাইছি—আমায় ক্ষমা করবেন তো?

নয়নতারা একবার সদানন্দর মুখের দিকে তাকাল, তারপর আর একবার নিখিলেশের মুখের দিকে। কিন্তু নিখিলেশ তখন অপরাধীর মতন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নয়নতারা সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—চলো, চলো যা বলবার আছে তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলবে চলো—

সদানন্দ সে-কথায় কান না দিয়ে নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললে—আপনি ক্ষমা না করলে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো না নিখিলেশবাবু। বলুন আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন!

এতক্ষণে নিখিলেশের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে পারলো। বললে—আপনি কী দোষ করেছেন যে আপনাকে ক্ষমা করতে যাবো?

—কী দোষ করেছি? তার চেয়ে জিজ্ঞেস করুন কী দোষ করিনি? নয়নতারা যে আজকে আপনার সঙ্গে এই খারাপ ব্যবহার করছে এ আমারই দোষ, নয়নতারা যে আপনাকে লুকিয়ে আমার চিকিৎসার জন্যে হার বাঁধা দিয়েছে সেও আমারই দোষ। এই আজ যে আমার জন্যে আপনাদের সংসারে এই অশান্তি হচ্ছে এও আমারই দোষ। আমি সব টের পেয়েছি নিখিলেশবাবু। কিন্তু কী করবো বলুন? সব দোষ ঘটে গেছে আমার অজ্ঞাতে। বিশ্বাস করুন, আমি সকলের ভালো করতেই চেয়েছিলুম। আমি যে একদিন নয়নতারাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম তাও নয়নতারার ভালোর জন্যেই, বিশ্বাস করুন, সে সব-কিছুই নয়নতারারই ভালোর জন্যে—

নিখিলেশ গম্ভীর গলায় বললে—অত ভালো করার চেষ্টা সেদিন না করলেই হয়তো ভালো করতেন সদানন্দবাবু, তা হলে আর আমাদের কপালে এই দুর্দশা হতো না—

—দুর্দশা!

নিখিলেশ বললে—হ্যাঁ, দুর্দশা না তো কী? নয়নতারার শ্বশুর যেদিন ওর সতীত্ব নাশ করতে ওর শোবার ঘরে ঢুকেছিল, তখন কোথায় ছিল আপনার এই ভালো করবার চেষ্টা? যেদিন কেষ্টনগরে নয়নতারার বাবা মেয়ের এই অবস্থা দেখে স্ট্রোক হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন, তখনই বা কোথায় ছিল আপনার এই ভালো করবার চেষ্টা?

নয়নতারা নিখিলেশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—ওগো তুমি কীসব যা-তা বলছো? দেখছো রুগী মানুষ, সবে অসুখ থেকে উঠেছে এখনও ভালো করে সারেনি—

নিখিলেশ নয়নতারাকে ধমক দিয়ে উঠলো! বললে—তুমি থামো, একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, যে নিজের স্ত্রীকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, যে নিজের স্ত্রীকে ওই রকম বদমায়েশ শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তার হয়ে তুমি ওকালতি করতে এসো না।

সদানন্দ বললে—না নিখিলেশবাবু, আপনি ভুল করছেন, আমি নয়নতারাকে কারো হাতে ফেলে রেখে পালাইনি, বরং চরম অপমানের হাত থেকেই নয়নতারাকে বাঁচিয়েছি—

—এই বুঝি আপনার নয়নতারাকে বাঁচাবার নমুনা?

—বাঁচানো আপনি কাকে বলেন? যারা বাইরে মানুষের চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করে,

আর ভেতরে পশুর মতন প্রকৃতি তাদের স্বরূপ চিনতে সুযোগ দেওয়া কি বাঁচানো নয়?

নিখিলেশ বললে—নিজের বাবা-মা'র সম্বন্ধে যদি এই-আপনার ধারণা তা হলে নয়নতারার মত মেয়েকে বউ করে কেন নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন?

সদানন্দ বললে—আপনি সব কথা জানেন না, তাই অমন কথা বলছেন। আমি তাদের চিনতে পেরেছিলাম বলেই বিয়ের দিন আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম, হিন্দু-বাঙালীদের বিয়েতে যে-নিয়ম মানা হয় আমার বিয়েতে তাও মানা হয়নি, নয়নতারার হয়ত মনে আছে নিয়মমত আমার গায়ে-হলুদও হয়নি।

নয়নতারা নিখিলেশের সামনে গিয়ে আবার মিনতি করতে লাগলো। বললে—ওগো, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কেন তুমি আর পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটছো?

তারপর সদানন্দর সামনে গিয়েও বলতে লাগলো—তুমি সবে একটু সেরে উঠেছ, এখন মাথা গরম কোর না, ওঁর কথা শুনো না তুমি। তুমি তোমার ঘরে চলো—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আর যদি কখনও তোমার সঙ্গে দেখা না হয় তাহলে আমার কথাগুলো কবে বলবো? কবে আর এমন সুযোগ পাবো? কবে আমি আবার নিখিলেশবাবুর কাছে ক্ষমা চাইবো?

নিখিলেশ বলে উঠলো—আপনি নয়নতারার যা করেছেন তা তো করছেনই, কিন্তু আমার যা ক্ষতি করেছেন, তার জন্যে আপনার ক্ষমা চাইবার অধিকার নেই—

নয়নতারা নিখিলেশকে ধমক দিলে। বললে—তুমি আবার ওই রকম করে কথা বলছো? রুগী মানুষের সঙ্গে কী-রকম করে কথা বলতে হয় তাও তুমি জানো না? কাল সকালবেলাও তো ও-কথাগুলো বলতে পারতে?

সদানন্দ বললে—না, কাল সকাল পর্যন্ত আমি আর থাকতে পারবো না, যা বলবার যা শোনবার তা আজকের মধ্যেই বলতে আর শুনতে হবে—

নিখিলেশ বললে—কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে আমি আর থাকতে দেবও না, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে আজকে এখনি চলে যান—

—কি বলছ তুমি?

নয়নতারা নিখিলেশের একেবারে মুখের সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালো। আবার বললে—তুমি যা-তা বলছো কেন? এই শরীরে উনি কোথায় যাবেন?

নিখিলেশ বলে উঠলো—সে যেখানে ওঁর খুশী সেখানে চলে যান, আমাদের বাড়িতে ওঁকে আর থাকতে হবে না, এখানে আমি আর থাকতে দেব না ওঁকে—

নয়নতারা বেঁকে দাঁড়ালো। বললে—না, উনি এখানে থাকবেন।

নিখিলেশ নয়নতারার কথায় প্রথমে একটু হতবাক হয়ে গেল। এমনভাবে নয়নতারা তার কথার প্রতিবাদ করবে তা সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে তারপরেই সে বলে উঠলো—না, তুমি থাকতে বললেও আমি ওঁকে থাকতে দেব না।

নয়নতারা বললে—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না তুমি কি বলছো। এত রাত্তিরে কেউ বাড়ির বাইরে যায়? আর উনি যাবেনই বা কোথায়?

নিখিলেশ বললে—কোথায় যাবেন তা আমার জানবার দরকার কী?

নয়নতারাও এবার একটু কঠোর হয়ে উঠলো। বললে—না, উনি যাবেন না—

—হ্যাঁ যাবেন।

নয়নতারা বললে—না, আমি বলছি উনি যাবেন না। উনি যেতে চাইলেও এই অবস্থায় আমি ওঁকে চলে যেতে দেব না।

সদানন্দ এবার এতক্ষণে কথা বললে—না, আমি এখানে আর থাকতে চাই না,

নিখিলেশবাবু আমাকে জোর করে ধরে রাখলেও না। আর আমি সজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এখানে আসতুমও না। কিন্তু যাবার আগে আপনার কথার জবাব না দিয়ে যাবো না, নইলে এখান থেকে চলে গিয়েও আমার মনে শান্তি থাকবে না। আপনি একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলেন আমি কেন নয়নতারাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করিনি, আপনি তো তা-ই জিজ্ঞেস করছিলেন?

নয়নতারা সদানন্দর সামনে এসে বললে—না, তোমাকে সে-সব কথা বলতে হবে না। আমি সব জানি—

সদানন্দ বললে—তুমি জানো কি না তা আমি জানি না। পৃথিবীর কোন মানুষই তা জানুক তাও আমি চাই না, আমি নিজেও কাউকে তা জানাতে চাই না।

নিখিলেশ বললে—সেইটেই তো স্বাভাবিক, নিজের পাপ কি কেউই নিজের মুখে প্রকাশ করে? সবাই তো তা চেপেই রাখতে চায়—

সদানন্দ কথা বলছিল আর ক্লান্তিতে হাঁফাচ্ছিল। বললে—আপনি ঠিকই বলছেন, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আলাদা, নয়নতারার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা ঠিক সে-ধরনের পাপ নয়। পাপটা আমার পূর্বপুরুষের।

নিখিলেশ বুঝতে পারলে না কথাটা। জিজ্ঞেস করলে—তা পূর্বপুরুষের পাপ সম্বন্ধে আপনি যদি এতই সচেতন তাহলে সেই পাপী পূর্বপুরুষকেই তো আপনি ত্যাগ করতে পারতেন—আপনি পূর্বপুরুষের পাপের জন্যে যখন বাড়ি ত্যাগ করলেন তখন। একলা না গিয়ে আপনার স্ত্রীকেও তো সঙ্গে নিতে পারতেন—ওই রকম শ্বশুর-শাশুড়ীর হেফাজতে নয়নতারাকে ফেলে রেখে নিজে কেন আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেলেন?

নয়নতারা লক্ষ্য করলে ক্লান্তিতে দুর্বলতায় সদানন্দর দম আটকে আসছে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে।

নিখিলেশের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তুমি কী বলো তো? এখন এই রাত্তির বেলা এই সব কথা না বললে কি তোমার চলতো না? দেখছো মানুষটার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে—

সদানন্দ নয়নতারার কথায় কান না দিয়ে নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললে—কেন চলে গেলুম জানেন? শুনতে চান?

নয়নতারা সদানন্দকে লক্ষ্য করে বললে—সে সব কথা ওকে বলতে হবে না—আবার তোমার জ্বর বাড়বে, আবার তুমি অসুখে পড়বে, সকালবেলা ডাক্তারবাবু এলে তখন আমাকেই বকাবকি শুরু করবেন, চলো তুমি তোমার ঘরে শোবে চলো—আমি তোমাকে শুইয়ে রেখে আসি—

নিখিলেশ বললে—কেন তুমি ওকে বলতে বাধা দিচ্ছ? যা বলতে চান উনি তা বলতে দাও না—

নয়নতারা বললে—উনি যা বলবেন তা আমি ভালো করেই জানি, আর বলতে হবে না—

নিখিলেশ বললে—কিন্তু তুমি জানলে কী হবে? আমি তো শুনি নি, আমাকে শুনতে দাও না—

নয়নতারা বলে উঠলো—না, তোমাকে শুনতে হবে না। তোমার সে-সব শুনে কী লাভ? আর তুমি শুনলেও তো তা বুঝতে পারবে না। তুমি যদি বুঝতে পারতে তাহলে আমার সঙ্গে আর এই রকম ব্যবহার করতে না—

—কেন, আমি তোমার সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করেছি?

—তুমি আবার বলছো কী রকম ব্যবহার করেছ? বলতে তোমার লজ্জা করছে না?

নিখিলেশ বললে—কী-রকম ব্যবহার করেছি বলো?

—বলবো সকলের সামনে?

—নিশ্চয়ই বলবে। আমি এমন কিছু করি না যার জন্যে আমাকে লজ্জা পেতে হবে।

—তা হলে কেন তুমি মদ খাও, বলো?

—মদ?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, মদ। তুমি নিজে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রোজ বাড়ি ফের আর অন্য লোককে দোষ দিচ্ছ বউকে ফেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে। তোমার লজ্জা করে না কথা বলতে! মদ খেয়ে বাড়ীতে আসাটা বুঝি দোষের নয়? আর বউকে বাড়িতে ফেলে চলে যাওয়াটাই বুঝি দোষের?

নিখিলেশ ধমকে উঠলো। বললে—তুমি থামো!

নয়নতারা গর্জে উঠলো। বললে—কেন থামবো? যখন কথাটা উঠেছে তখন ভালো করেই কথাটা উঠুক। কথাটা চিরকালের মত পরিষ্কার হয়ে যাক—। আমি কত কষ্ট করে টাকা জমাতুম ভবিষ্যতের জন্যে, আর তুমি সেই টাকা কিনা মদ খেয়ে নষ্ট করে দেবে?

নিখিলেশ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো—বাজে কথা বোল না, তুমি ভালো করেই জানো কেন আমি মদ খাওয়া ধরেছি—তুমি যদি নিজের হার বাঁধা না দিতে তো আমি কি কোনও দিন মদ খেতুম? এর আগে কি কোনও দিন মদ খেয়েছি? আগে তো প্রত্যেক দিন অফিস থেকে তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফিরেছি—তখন তুমি কোনও দিন আমাকে মদ খেতে দেখেছিলে?

নয়নতারা বললে—তা আমার হার কি আমি নিজের জন্যে বাঁধা রেখেছি? বাড়িতে কারো অসুখ হলে মানুষ কী করে? টাকা ধার করে না?

—কিন্তু আমাকে তুমি সে কথা কিছু জানিয়েছিলে? আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

নয়নতারা বললে—কেন তোমাকে জানাতে যাবো? তোমাকে জানালে কি তুমি রাজি হতে? টাকা খরচ হবে বলে তুমিই তো এঁকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলে। কেন, এঁর জন্যে টাকা খরচ হলে তোমার এত রাগ হয় কেন? ইনি কি এখানে থাকতে এসেছেন মনে করো?

নিখিলেশ রেগে গেল এবার। বললে—আবার বাজে কথা বলছো তুমি? আমি কখনও কি বলেছি যে সদানন্দবাবু এখানে থাকতে এসেছেন?

নয়নতারা বললে—কিন্তু তুমি তো তাই-ই মনে করেছিলে।

নিখিলেশ বললে—তোমার নিজের মনের মধ্যেই এই পাপ রয়েছে তাই তুমি অমন কথা বলতে পারলে!

—পাপ? আমার মনের মধ্যে পাপ আছে না তোমার মনের মধ্যে পাপ! যেদিন থেকে ওঁকে এ-বাড়িতে এনে তুলেছি সেই দিন থেকেই তো তুমি ওঁকে সহ্য করতে পারছো না—আমি কিছু বুঝতে পারি না মনে করছো?

—আমি কী সে-কথা কোনও দিন তোমাকে বলেছি?

নয়নতারা বললে—মুখে বলবে কেন? মুখে কী কেউ তা বলে? কাজ দিয়ে তা প্রমাণ করেছ!

—কাজ? আমার কাজে কোথায় প্রমাণ পেলে যে আমি ওঁকে সহ্য করতে পারছি না?

নয়নতারা এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে—তাহলে ওঁকে খাওয়াবার জন্যে ওষুধের নাম করে বিষ কিনে এনেছিলে কেন?

বিষ?

—হ্যাঁ, বিষ!

নিখিলেশের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে কোনও কথা বেরোল না। তারপর ঢোঁক গিলে বললে—কে বললে?

—প্রমাণ চাও?

কিন্তু নিখিলেশ সে-সম্বন্ধে প্রমাণ চায় কী চায় না সে কথা শোনবার আগেই নয়নতারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে পাশের ঘর থেকে একটা কী নিয়ে আবার ফিরে এল। ওষুধের শিশি নিখিলেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এটা তুমি কিনে আনোনি?

নিখিলেশ তখন বিমূঢ় হতবাক্!

—কী, কথা বলছো না যে? আমার কথার জবাব দাও? এটা তুমি কী জন্যে কিনে নিয়ে এসেছিলে, বলো?

নিখিলেশ তখনও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখ দিয়ে তখন একটা কথাও বেরোচ্ছে না।

—কী হলো? তুমিই তো এতক্ষণ প্রমাণ চাইছিলে, আমি এখন প্রমাণ দেখিয়ে দিলুম। এবার জবাব দাও—

একটু থেমে নয়নতারা আবার বলতে লাগলো—তা ভাগ্যিস এটা আমি এঁকে খাওয়াই নি, খাওয়ালে কী সর্বনাশ হতো বলো তো? এটা আমি এতদিন ফেলে দিই নি, রেখে দিয়েছিলুম একদিন আমার নিজের কাজে লাগবে বলে। কী সর্বনেশে লোক বলো তো তুমি? যদি না দেখেশুনে এটা আমি এঁকে খাইয়ে দিতুম? ভাগ্যিস আমি ডাক্তারবাবুকে এটা দেখালুম! ডাক্তারবাবুই তো দেখে বললে—এটা বিষ! বললে—এটা কোত্থেকে এল? কে আনলে? আমি ডাক্তারবাবুর কথার কোনও জবাব দিতে পারলুম না, মনে মনে তোমার মতি-গতি দেখে আমি শুধু শিউরে উঠলুম, ভাবলুম মানুষ এত নীচও হতে পারে। একটা কুকুর বেড়ালকে বিষ খাইয়ে মারতেও মানুষ দু'বার ভাবে। আর তুমি এত নীচ যে একটা নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে মারতে তোমার এতটুকু সঙ্কোচও হলো না—বিষের শিশিটা কিনতে গিয়ে তোমার হাত একবার কাঁপলোও না, তুমি কিনা এসে আমাকে এক কাপ জলের সঙ্গে এই ওষুধটা এঁকে খাইয়ে দিতে বললে?

সমস্ত আবহাওয়াটা তখন থম্‌থম করছে। এতক্ষণে যে কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে তা কেউই টের পায় নি। সদানন্দ নয়নতারার কাছে গিয়ে ওষুধের শিশিটা নিতে গেল। বললে—ওটা আমাকে দাও—

নয়নতারা হাতটা সরিয়ে নিলে। বললে—না, তুমি ওটা নিয়ে কী করবে?

সদানন্দ বললে—আমার দরকার আছে—

নয়নতারা বললে—না, দরকার আমারই আছে। আমি এটা রেখে দেব। আমার কাছেই থাক। যখন সব মানুষকে চিনে গেলুম তখন হয়ত আমারই একদিন এটা দরকার হতে পারে, সেদিনের জন্যে আমি এটা যত্ন করে রেখে দেব—

—দিদিমণি—

হঠাৎ গিরিবালার গলার আওয়াজে সবাই চমকে উঠেছে। নয়নতারা ঘরের দরজার দিকে চেয়ে দেখলে গিরিবালা দাঁড়িয়ে।

—কী গো, কিছু বলবে?

—ডাক্তারবাবু এসেছেন—

ডাক্তারবাবুর নাম শুনে নয়নতারা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো। অবাকও কম হলো না। এত রাত্রে ডাক্তারবাবু কেন? ডাক্তারবাবুকে তো এ সময়ে আসতে খবর দেওয়া হয় নি! তিনি হঠাৎ কেন আসতে গেলেন? তার তো সকাল বেলা আসার কথা, যেমন রোজ একবার করে আসেন।

কিন্তু ভালো করে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতেই নয়নতারার ভুল ভাঙলো। এ কী, সকাল হয়ে গেছে যে! তাড়াতাড়ি বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলে, ডাক্তারবাবু হাত ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

নয়নতারাকে দেখেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, আমার পেসেণ্ট আজকে কেমন আছে?

বউবাজারে সমরজিৎবাবুর বাড়িতে তখন আর এক নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে। বাইরে থেকে সমস্ত বাড়িটা তো বেশ শান্ত। কোথাও কিছু ব্যতিক্রম নেই। দিনের বেলায় কলকাতা শহরের চলমান সভ্যতার পালিশ গায়ে মেখে বেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এককালে বড়লোকের সম্পত্তি বলে সুনাম ছিল বাড়িটার। সে-সুনাম বুঝি তখন আরো বেড়েছে। কারণ আগেকার মালিক ছিলেন গৃহস্থ মানুষ, কারো সাতে-পাঁচে তিনি থাকতেন না। কলকাতা শহরের রাজনীতি সমাজনীতির স্রোতে গা-ও ভাসাতেন না। দেশ স্বাধীন হবার পর কে কত সুবিধে করে নিচ্ছে, কার কতখানি অসুবিধে হচ্ছে তা নিয়েও তিনি কখনও মাথা ঘামাতেন না। তাঁর মত ছিল, সকলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক, কারুর যেন কোনও অভিযোগ না থাকে, কেউ যেন কাউকে শোষণ না করে। আর যাদের টাকা আছে তারা যেন তাদের বাড়তি টাকা কিছু দাতব্য করে। যাদের আছে আর যাদের নেই তাদের লড়ালড়িতে যেন দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। এক কথায়, তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আওতায় মানুষ হওয়া একজন নিরীহ শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক।

শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকেরাই বোধ হয় এ যুগে সব চেয়ে কৃপার পাত্র। সত্যি বলতে কি, তাদের একূলও নেই ওকূলও নেই। তাদের সততাই তাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। তাদের সততাকে লোকে নির্বুদ্ধিতা বলে ধরে নেয়। যেহেতু তারা শান্তি প্রিয় তাই তারা কোনও বাদ-প্রতিবাদে যেতে চায় না।

জীবনে সমরজিৎবাবু একবারই দৃঢ় হয়েছিলেন। আর সেইবারেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। শান্তিপ্রিয় হওয়ার খেসারৎ তিনি ভালো করেই দিয়ে গেলেন। তাতে নিজের জীবনই যে শুধু তিনি বলি দিলেন তাই নয়, নিজের সহধর্মিণীর জীবনও চিরকালের মত বরবাদ করে দিয়ে গেলেন।

এ-বাড়ীর গিন্নী ছিলেন তিনিই। কিন্তু সমরজিৎবাবুর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর আর কোনও কর্তব্য রইল না। এ-বাড়ির গিন্নী হয়ে বসলো—মানদা মাসি।

প্রথম প্রথম সমরজিৎবাবুর স্ত্রী কিছু বলতে চাইতেন, কিন্তু মানদা মাসি থামিয়ে দিত। বলতো—তুমি চুপ করো না দিদি, তুমি বুড়ো মানুষ, পূজো-আচ্ছা নিয়ে থাকলেই পারো! তোমাকে সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে কে বলেছে?

সমরজিৎবাবু মারা যাবার পর থেকেই যেন এ-বাড়ির সব হালচাল একেবারে রাতা-রাতি বদলে গেল।

বাড়ির গিন্নী সব দেখেশুনে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলেন। এককালে কত সুখ ছিল কত প্রতিপত্তি ছিল। সে-সব স্মৃতি যেন তখনও চোখের ওপরেই ভাসতো।

একমাত্র মহেশই বলতে গেলে গিন্নীমার খোঁজখবর নিত তবু। দোতলায় একেবারে কোণের ঘরটায় তাঁকে ঠেলে দিয়েছে নতুন বউমা।

মহেশ এলে চুপি চুপি ডাকে—মা—

গিন্নীমা বলেন—কে?

—আমি মহেশ মা। আপনার খাওয়া হয়েছে?

গিন্নিমা জিজ্ঞেস করেন—বাড়িতে কারো শব্দ পাচ্ছিনে কেন রে? নতুন বউমা কোথায়?

মহেশ বলে—বড়বাবু নতুন বউদিকে নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে গেছে—

—ও—

এর বেশি আর কিছু বলেন না তিনি। এর বেশি বলবার প্রবৃত্তিও কখনও হয় না তাঁর। আগে হলে অন্তত একবার রান্নাঘরের দিকে যেতেন। কর্তা কী খাবেন না-খাবেন তার তদারকও করতেন একটু। ঘর থেকে দশবার বেরোতেন, তারপরে কর্তা গঙ্গাস্নান সেরে আসবার পর থেকে কাছে কাছে থাকতেন।

কিন্তু আসল মানুষ চলে গেলে বোধ হয় বাড়ির চেহারাটাই এমনি বদলে যায়। এ-বাড়ির চেহারাটাই তাই বোধ হয় আমূল বদলে গেছে।

—বউমা কী করছে?

—বউদির ঘরের দরজা বন্ধ। সকাল থেকেই খুলছে না।

—খায় নি?

মহেশ বললে—না।

গিন্নীমা বললে—একবার দরজা ঠেললিনে কেন?

মহেশ বলে—ওরে বাবা, তা হলেই হয়েছে। বউদির চেহারা দেখলেই আমার ভয় পায়, আমি ও-চেহারা আর দেখতে পারিনে—

গিন্নীমা বলেন—তা তুই-ই বা এ-বাড়িতে আর আছিস কেন? তোর বুঝি এত হেনস্থা ভাল লাগে?

—আমি?

মহেশ বলে—আমি চলে গেলে তখন শ্মশান জাগবে কে? শ্মশান জাগতেই তো বসে আছি! আপনি মরবেন, বৌদি মরবেন, তখন ফেলবে কে? তখন তো মড়া ফেলতে এই মহেশেরই ডাক পড়বে?

এ-সব পুরোনো কথা। এ-সব কথা শুনলে গিন্নিমার দুঃখও হয় না, ভাবান্তরও হয়না। আগে হতো। আগে চোখের জল মুছতেন আঁচলে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতেন। এই অগাধ সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য আর এই প্রাচুর্বের ধ্বংস কামনা করতেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকতে পারতেন না। নিচে থেকে মানদা মাসির গলার শব্দে তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তার জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে একাকার হয়ে যেত।

কিন্তু এ-বাড়িতে আসার পর থেকে সেই মানদা মাসিরই সুখ হয়েছে সব চেয়ে বেশি। মানদা মাসি ছোটবেলা থেকেই বড় কষ্টে মানুষ হয়েছে। কোথায় ছিল তার মা আর কোথায়ই বা ছিল তার বাবা, তার কোনও দিন হদিস মেলে নি। লোকের আত্মীয়স্বজন থাকে, তারাই সাধারণত ছোটবেলায় সকলকে মানুষ করে। তারপর একটু খুঁটে খেতে

শিখলেই তারা সরে দাঁড়ায়। তখন সবাই স্রোতের শ্যাওলার মত রাস্তায়-ঘাটে ভেসে ভেসে বেড়ায়। কলকাতার সমস্ত মানদা মাসিদের অতীত জীবনের ইতিহাস এই রকমই। তখন মানদা মাসি কালীঘাটের মন্দিরের সামনে ভিক্ষে করে বেড়াতো। একটা ছেঁড়া ময়লা ফ্রক পরে যাত্রীদের পেছন-পেছন আঠার মতন লেগে থাকতো। গলায় কান্নার সুর মিশিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতো। মন্দিরের সদর দরজা থেকে শুরু করে একবারে ট্রাম-রাস্তার মোড় পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে যেতো, আর গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডের মত একটা কথাই বার বার আবৃত্তি করতো—একটা পয়সা দাও বাবা, একটা পয়সা দাও বাবা—একটা পয়সা...

তখন বলতে গেলে ওইটেই সারাদিনের বুলি হয়ে গিয়েছিল মানদা মাসির। ঘুমোতে ঘুমোতে যদি কোনও দিন মাঝরাত্তিরে তার ঘুম ভেঙ্গে যেত তাহলেও ওই কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো—একটা পয়সা দাও বাবা—একটা পয়সা দাও বাবা...

তারপর একদিন ফ্রক ছেড়ে গায়ে শাড়ি উঠলো। আর তারপরে যা হয় তাই হলো। তখন আর ঘুরে ঘুরে পয়সা চাইতে হতো না। তখন বরং খাতির বেড়ে গেল মানদার। কালীঘাটের ধর্মশালা আর পাণ্ডাদের যাত্রী-নিবাসে পূণ্যার্থীরা ডেকে ডেকে আদর করে মানদাকে পয়সা দিতে লাগলো। একখানা শাড়ি থেকে দুখানা শাড়ি হলো তার তখন!

তখন আর রাস্তায় ঘুরতে হলো না মানদাকে। মন্দিরের পাণ্ডাদের বস্তিতে খোলার ঘর ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজন যাকে বলে একেবারে অনিবার্য হয়ে উঠলো। তখন মানদার দিনেও খদ্দের, রাত্তিরেও খদ্দের। এমন কি, এক একদিন সকাল দশটার সময়ও তার দরজায় খদ্দেরের ভিড় লেগে যেত।

সে এক স্বর্ণযুগ গেছে মানদা মাসির জীবনে!

কিন্তু সে আর কতদিন! বলতে গেলে ক'টা তো বছর মাত্র। কিন্তু সেই ক'টা বছরের মধ্যেই একবোরে আস্ত একটা বাড়ির মালিক হয়ে বসলো মানদা মাসি। একেবারে বাড়িউলি!

সেই অবস্থাই চলছিল এতদিন। সুখে-দুঃখে অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। কখনও টাকা কিছু জমতো, আবার হয়ত একদিন সব টাকা ফতুরও হয়ে যেত। যেত বেশির ভাগ ঘুঁষ দিতে গিয়ে। এ-ব্যবসায় ওই একটা দোষ। টাকা এলেও তাকে বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। চোলাই মদের কারবার সঙ্গে থাকে বলে যথাস্থানে ঘুঁষ দিতে হয়। সেই ঘুঁষের চাপ মাঝে মাঝে এত তীব্র হয়ে ওঠে যে তখন ইচ্ছে করে কারবার গুটিয়ে নিই।

তা ভাগ্য ভালো ছিল মানদা মাসির। ঠিক সেই সময়েই এল বাতাসী, আর এল বড়বাবু।

তখন থেকেই মানদার প্রধান কাজ হলো বাতাসীকে খুশী করা। কী করে বাবুকে খুশী করে তাকে বশ করতে হয় মানদা মাসি সে-সব বিদ্যে শিখিয়ে দিত বাতাসীকে।

বাতাসীর একটা গুণ ছিল যে মাসির কথাগুলো মন দিয়ে শুনতো।

মানদা মাসি বলতো—একটা কথা বলে রাখি বাছা—মন দিয়ে শোন, মন-পেরান দিয়ে বাবুর খাতির করবি বুঝলি, বাবু যদি মদ খেয়ে বমি করে দেয় তা তাতেও ঘেন্না করিস নি যেন। হাত পেতে সেই বমি তুলে নিবি, তবু মুখে রাগ দেখাতে পারবি না। সেই কথায় আছে না—মাটির বেড়ালই হোক, আর কাঠের বেড়ালই হোক ইঁদুর ধরতে পারলেই হলো—

আরো কত কথা শেখাতো বাতাসীকে। বলতো—পোড়া পেটের জন্যেই তো ভাত রে বাতাসী, নইলে ভাতের বয়ে গেছে পেট খুঁজতে—

বাতাসী বলতো—কিন্তু মাতাল হলে যে বড়বাবুর আর জ্ঞান থাকে না মাসি—

মানদা মাসি বলতো—তা না থাকুক, ভাতারে কি ভাত দেয় মা! ভাত দেয় গতরে গতর

যতদিন আছে তদ্দিন কামিয়ে নাও—তোমার গতর যখন থাকবে না তখন কেউ তোমায় দেখবে না—

তা বাতাসীর ভাগ্য ভালো ছিল বলতে হবে। তবে গতরের জোর কি ভাগ্যের জোর কে জানে, বড়বাবুর বাবু মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাসী একেবারে বউ হয়ে গিয়ে বড়বাবুর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। বাতাসী বললে—মাসি, তুমিও আমার সঙ্গে চলো—

মাসির কারবারেও তখন বেশ মন্দা চলেছে। সেই যে কলকাতায় বোমা পড়লো, তারপর শহর থেকে লোকজন পালাতে আরম্ভ করলো, তখন থেকেই মন্দা হয়েছিল। তারপর যেদিন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হলো তখন আর তার কারবার চলে না। এক-একদিন মেয়েদের হাঁড়ি চড়ে না পর্যন্ত। খদ্দের দূরের কথা, দরজা সামনে দিয়ে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত রাস্তা মাড়ায় না। অতদিনের বনেদী পাড়া, এককালে কত জাঁকজমক ছিল পাড়ার, কত ইজ্জৎ ছিল। তখন কারবারের এমন বাড়-বাড়ন্ত ছিল যে খদ্দেরে ভিড়ে মেয়েদের নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছিল না। সেই পাড়ারই তখন একেবারে মড়াখেগো দশা। এক-একদিন বউনিই হয় না, এমন আকাল।

সুতরাং বাতাসীর কথায় মানদা মাসির অবস্থাটা প্রায় সেই রকম হলো—পাগলা ভাত খাবি, না আঁচাবো কোথায়?

মানদা মাসি বললে—যেতে তো আমি তৈরি, কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে মা, পারবি?

—কী কাজ বলো না।

—বড়বাবু তো এখন বাপের সম্পত্তির মালিক হলো, আমাকে এখন কিছু টাকা পাইয়ে দিতে পারিস? আমি এমনি নোব না, ধার হিসেবে নেব, সুদ চাইলে সুদও দিতে পারি। তা বলবি তুই?

বাতাসী বললে—তোমার তো অনেক টাকা মাসি, তুমি আবার টাকা কী করবে?

—ওমা, তুই আমার টাকই দেখলি? আমার টাকা কোথায়? টাকা থাকলে আজ আমি এই বুড়ো বয়েসে তোর খোসামোদ করি? টাকা থাহলে আমি আজ এর-ওর দোরে হন্যে হয়ে বেড়াই?

—তা তোমার বাড়িতে ভালো ভালো মেয়ে রাখলেই পারো। ভালো মেয়ে রাখলেই বড়লোক খদ্দের আসবে।

—দূর পাগলী মেয়ে, ভালো মেয়ে যে রাখবো তাতেও তো টাকা লাগবে। ভালো মেয়ে কি এমনি অকাশ থেকে উড়ে আসে! তার জন্যে দালাল লাগাতে হয়। সে এ-সব বাজে দালালের কম্ম নয়। এর জন্যে বড় বড় সব দালাল লাগে, তাদের খাঁইও যে তেমনি। যে-পূজোর যে-নৈবিদ্যি তা তো তুই জানিস নে। এ কারবারে অনেক ল্যাঠা। ভালো দালাল না রাখলে ভালো মেয়ে তারা যোগাবে কেন? বাড়িটাও তেমনি একটা ভালো পাড়ায় নিয়ে যেতে হবে। ভালো মানুষের ছেলেরা কি আর আমার এই টিনের চালের বাড়িতে আসতে চায়? তা মতলোব আমি সব দিতে পারি, কিন্তু শুধু পিঠে খেলেই তো চলবে না, পিঠের ফোঁড় গুনবে কে?

কথাগুলো বুঝেছিল বাতাসী। বড়বাবুর কাছে যখন বাবার মৃত্যুর খবরটা এল তখনই বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে নিলে বাতাসী। মানদা মাসিও নিজের বাড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে এল।

বড়বাবু মানদা মাসিকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—তুমি? তুমি আবার কোথা যাবে?

বাতাসী বললে—মাসি আমার সঙ্গে যাবে—

বড়বাবু জিজ্ঞেস্ করলে—কেন?

বাতাসী বললে—না গেলে আমার দেখাশোনা করবে কে সেখানে?

বড়বাবু বললে—তোমাকে দেখবার কি লোকের অভাব আছে সেখানে? লোক না থাকে লোক রাখবো। মাসির অনেক কাজ, মাসির নিজের কাজ-কারবার কে দেখবে?

মাসি এতক্ষণে কথা বললে—কারবারের কথা আর বোল না বাবা, কারবার আমার ডকে উঠেছে—

—কেন?

—খদ্দের কোথায়? খদ্দেরই তো লক্ষ্মী আমার। এমন হাল হয়েছে কলকাতার, এ একেবারে লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড! মেয়েরা আমার সব উপোস করতে বসেছে!

—কেন? কেন?

—সে-সব বাবা তোমাকে পরে বলবো, এখন তো তোমার অত শোনবার সময় নেই। এখন তোমার নিজেরই কত ভাবনা, তার ওপরে আমার ভাবনা দিয়ে আর তোমার মাথা ভারি করতে চাই না—

তা সেই-ই হলো সূত্রপাত। সেইদিন থেকেই মানদা মাসি বড়বাবুর পেছেনে লেগে-পড়ে ছিল। শ্রাদ্ধ-শান্তি যেদিন চুকে গেল সেই দিন থেকেই মানদা মাসি বাতাসীকে বলতো—কী রে, বড়বাবুকে তুই বলেছিস?

বাতাসীর তখন সুখের শেষ নেই। এত বড় সংসারের গিন্নী। চাকর-বাকর, ঝি রাঁধুনী, এক গ্লাস জল পর্যন্ত নিজের হাতে গড়িয়ে খাবার দায় নেই। ঘুম থেকে ওঠবার আগেই মুখের কাছে চা এসে হাজির হয়। আর শোবার আগে যতক্ষণ না বড়বাবু বাড়ি ফেরে ততক্ষণ মানদা মাসি তার পা টিপে দেয়। এমন বিনা-পয়সার পা টেপবার লোক ক'টা বাড়ির বউ পেয়েছে?

মানদা মাসি বাতাসীর পা টিপে দেয় আর গল্প করে।

পা টিপতে টিপতে বলে—কী রে, আমার কথা বড়বাবুকে কিছু বলেছিলি?

বাতাসী চোখ বুঁজে বুঁজেই বলে—তোমার কথা আমি আর কী বলবো মাসি, তুমি নিজেই তো বলেছিলে।

মাসি বলে—আমি তো বলেই ছিলুম, কিন্তু তোকে তো সে-সব একবার মনে করিয়ে দিতে হয়! কাজের লোকের কী সব সময়ে সব কথা মনে থাকে?

বাতাসী বলে—তা আমারই কী কাজ নেই ভাবছো? আমারই কী সব কথা মনে থাকে?

মাসি বলে—তোর আবার কীসের কাজ রে? তোর কাজ করবার কত লোক রয়েছে, তুই একবার হুকুম কর না কোন কাজটা তোর করে দিতে হবে? যদি কেউ না করে তো আমি তাকে ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেব না—

বাতাসী বলে—তা এতই যদি তোমার ঝাঁটার জোর তো ওই মাগীটাকে বাড়ি থেকে বার করে দাও দিকিনি, দেখি তোমার কত ক্ষমতা?

—কোন মাগীটাকে? ওই বুড়ীকে?

—না, ওই ছুঁড়িকে।

মাসী বলে—ছুঁড়ির যে দেখাই পাইনে রে, ছুঁড়ি যে ঘর থেকেই বেরোয় না—

—তা কী এমন নন্দিনী যে ঘর থেকে একবার বেরুবেই না! বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর সবাই তো নবাব-নন্দিনীকে নিয়েই অস্থির, আমাকে আর কে দেখছে বলো না, আমার কথা আর কে ভাবছে?

মাসি বলে—তা বড়বাবুকে সে-কথা বললেই পারিস—

বাতাসী বলে—বড়বাবু আমার কথা শুনছে!

মাসি বলে—ওমা, তুই বলিস কী? বড়বাবু তোর জন্যে এত করে, তুই রাস্তায় পড়ে ছিলিস, বড়বাবু তোকে সেখান থেকে নিজের বাড়িতে এনে তুললে, সেই তুই-ই কিনা বড়বাবুর নামে এই বদনাম দিস?

তারপরে একটু থেমে বলে—ঠিক আছে, আমি আজকে ওই মহেশ বেটাকে বলছি, ওই মহেশ বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ওই মহেশটাই তো ছুঁড়ির ঘরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসে। ওকে তুই ছাড়াতে পারিস না?

বাতাসী বলে—ও এতদিনের লোক, ওকে কী করে ছাড়াই বলো দিকিনি—

মাসি বলে—ঠিক আছে, তুই না ছাড়াতে পারিস, আমি ছাড়াবো। আমি এখুনি গিয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছি—

বলে সত্যি-সত্যিই মাসি উঠলো। উঠে বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো এই মহেশ, মহেশ—

মানদা মাসির চিৎকারে সমস্ত বাড়িটা তখন গমগম করে উঠলো। দোতলা থেকে একতলা পর্যন্ত সমস্ত আবহাওয়া যেন বিষিয়ে উঠলো। মানদা মাসির চেঁচামেচিতে।

—কই, মহেশ কোথায়, মহেশ—

বাড়িতে আর ক'জনই বা লোক। দোতলার এক কোণের দিকে বাড়ির গিন্নী চুপ করে বসে ছিল। কথাটা তার কানেও গেল। কানে যেতেই মনটা বিষিয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। কর্তা চলে গেছেন, তিনি চলে গিয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু তাঁকে এ কোন্ নরকের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেলেন তিনি। তিনি হয়ত বুঝতেই পেরেছিলেন যে একদিন এমন হবে। তাই হয়ত খোকাকে সব সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর। গিন্নীর সামনে দেওয়ালের গায়ে সমরজিৎবাবুর একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল। সেই দিকে চেয়েই তিনি মনে মনে কী বলতে লাগলেন তা কেউ জানতে পারলে না।

—ঠাকুর, মহেশ কোথায় গেল?

ঠাকুর নিচের রান্নাঘরে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বললে—আমি তো দেখি নি মাসিমা—

—তুমি যদি দেখতেই না পাবে বাছা তো মাইনে নিচ্ছ কেন বসে বসে? বসন্ত কোথায় গেল? বসন্ত?

—সে বাজারে গেছে।

বাজারে গেছে! বাজারে যাবার আর সময় পেলে না হারামজাদা। যখন-তখন বাজারে যাওয়া তার আমি দেখাচ্ছি! কে তাকে বাজারে পাঠালে এখন? কে?

যেদিন থেকে মাসি আর নতুন বউমা এসেছে সেই দিন থেকেই এ-বাড়ির আদি বাসিন্দাদের কারো মনে সুখ নেই। আগে ঠাকুর-চাকর কাজ করেছে, তখন কোনও ঝামেলা ছিল না কারো। তারা এ-বাড়ির একজন হয়েই কাজ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কারোর গালাগালি খাবার দুর্ভোগ সইতে হয়নি কখনও।

ঠাকুর বললে—আজ্ঞে, মহেশ তাকে বাজারে পাঠিয়েছে—

—আমি মহেশকে দেখাচ্ছি—দেখাচ্ছি তার মজাটা—

কিন্তু সদর দরজার সামনে মহেশ তখন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ভদ্রলোক গ্রাম থেকে এসেছে। কলকাতায় বিশেষ কাউকেই চেনে না। অনেক কষ্টে ঠিকানা খুঁজে এই বউবাজারের গলির মধ্যে এসেছে।

মহেশ জিজ্ঞেস করলে—তা মানদা মাসি আপনার কে?

ভদ্রলোক বললে—কে আবার, কেউই না। আমি কালীঘাটে তার বাড়িতে গিয়ে শুনলুম মাসি এখন এখানে, তাই দেখা করতে এলুম। তুমি এ-বাড়ির কে?

—আমি এ বাড়িতে চাকরি করি। আপনি কে? আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক বললে—আমাকে মাসি চেনে, তুমি চিনতে পারবে না, আমি আসছি নবাবগগঞ্জ থেকে—

—নবাবগঞ্জ? নদীয়া জেলার নবাবগঞ্জ? আমি তো সেখানে গিয়েছি। রেল-বাজারে নেমে যেতে হয়।

—তুমি সেখানে গিয়েছ? কী করতে? তোমার দেশ নাকি?

মহেশ বললে—আমি গিয়েছিলুম সদানন্দবাবুর বাড়ির খোঁজখবর নিতে—

—সদানন্দবাবু? সদা? সে-ই তো আমার ভাগ্নে গো! আরে আমি তো তার খোঁজেই কলকাতায় এসেছি। সে কোথায়? আমার কাছে কিছু লুকিও না ভাই, আমি তার মামা, আমি হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছি আর সে কি না তোমাদের এখানে রয়েছে। তাজ্জব কাণ্ড তো! আমার নাম প্রকাশ। প্রকাশচন্দ্র রায়। আমার নাম বললেই চিনতে পারবে সে। তাকে একবার ডেকে দাও তো—ডেকে দাও—

মহেশ বললে—কিন্তু তিনি তো এখানে নেই—

—নেই? কোথায় গেল?

মহেশ একবার ভাবলে লোকটাকে দাদাবাবুর ঠিকানা দেবে কিনা। ভালো করে চেয়ে দেখলে ভদ্রলোকের চেহারার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমি তো নবাবগঞ্জ গিয়ে শুনে এসেছি দাদাবাবুর মা মারা গেছে, বাবা ছিল, তা তিনিও চলে গেছেন ভাগলপুরে। আমি যখন গিয়েছিলুম তখন তো নবাবগঞ্জে কেউ ছিল না—

প্রকাশ বললে—সদার বাবা তো ভাগলপুরে ছিলেন। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন, সেই তার বাপ মারা যাওয়ার খবরটাই তাকে দিতে এসেছি—

—কিন্তু দাদাবাবুর তো বিয়েও হয়েছিল শুনে এসেছি।

প্রকাশ বললে—বাঃ তুমি তো বেশ চালাক-চতুর লোক হে, তুমি তো তা হলে সব জানো দেখছি।

—তা জানবো না, দাদাবাবু তো সব বলেছে আমাদের।

প্রকাশ বললে—বেশ বেশ, বেশ চালাক ছেলে ভাই তুমি, এখন সদার ঠিকানাটা ভাই দাও দিকিনি আমাকে। তার বাবা মারা যাবার পর লাখ লাখ টাকা রেখে গেছে, সে সব এখন কে খাবে বল তো? তা খবরটা তাকে না দিলে সব টাকা যে গভর্ণমেন্টের পেটে যাবে, তাই অত কষ্ট করে তার খোঁজে আসা, নাহলে আমার আর কী, আমার কলা, তারই ভালো, সে মাঝখান থেকে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাবে—

মহেশ হাসলো। বললে—আজ্ঞে টাকার কথা বলছেন? টাকার লোভ তাঁর নেই—

প্রকাশ বললে—সদার টাকার লোভ নেই তা তুমি কেমন করে জানলে?

—আমি জানবো না, দাদাবাবু যে আমাদের এখানে ছিল আগে! আমার বাবু তো তাকে বাবুর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তো তা নিলেন না—

—তোমার বাবুর কত টাকা?

—বাবুরও যে দেশে অনেক জমি-জমা, তার ওপর কলকাতার এই বাড়ি, এ সব তো বাবুর নিজের। এই সবই বাবু দাদাবাবুকে উইল করে লিখে দিয়েছিলেন—

—তারপর?

—সেই টাকা নেবার ভয়েই তো দাদাবাবু এ-বাড়ি ছেড়ে একদিন পালিয়ে গেলেন।

প্রকাশ অবাক হয়ে গেল কথাগুলো শুনে। সদার মত আহাম্মক আর দুনিয়াতে কেউ আছে এটা কল্পনাই করতে পারলে না প্রকাশ। সদা টাকা চায় না, আর টাকাই কিনা সদার পেছনে পেছনে ধাওয়া করছে! হায়রে, প্রকাশকে তো কেউ টাকা নিতে বলে না। একেই বলে টাকা-কপালে ছেলে!

—আমার ভাগ্নেটার বরাবর ওই রকম স্বভাব ভাই। আহম্মকের এক-শেষ! টাকাকে কি অত অচ্ছেদ্দা করতে আছে? তুমিই বলো না, তুমি তো খুব চালাক-চতুর ছেলে। টাকা লক্ষ্মী তো, সেই লক্ষ্মীকে তুই অচ্ছেদ্দা করলি, তাহলে লক্ষ্মীও তো তোকে অচ্ছেদ্দা করবে, মা লক্ষ্মীকে কি অত অচ্ছেদ্দা করতে আছে? তুমিই বলো?

তারপর যে-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বললে—যাক গে, যে যা ভালো বোঝে করুক গে, তাতে তোমার আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ভাই। এখন সে কোথায় গেল সেইটে বলো দিকিনি। আমি তাকে কিচ্ছু বলবো না, শুধু তার বাপের টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়ে আমি ছুটি পেতে চাই ভাই। পরের টাকার ঝঞ্ঝাট নিয়ে আমার আর ভাল্লাগছে না...

মহেশ বললে—কিন্তু দাদাবাবু কাউকে বলতে বারণ করেছে যে—

—আরে আমি তো আর পর নই। আমি তো তার মামা। আমি তো তার ভালোর জন্যেই তাকে খুঁজছি। আমি তার বউকেও পর্যন্ত বলবো না। আমার ভাগ্নেটা এমন লক্ষ্মীছাড়া যে কী বলবো। নইলে শুনলাম তার বউটাও নাকি আবার বিয়ে করেছে—

—বউ আবার বিয়ে করেছে? কে বললে আপনাকে? আমি তো জানতুম না।

—আমি কি জানতুম? আমি কেষ্টনগর থেকে শুনে এসেছি। কেষ্টনগরে তো সদার শ্বশুরবাড়ি ছিল? যেই তার শ্বশুর মারা গেছে, আর বউটাও একটা ছোঁড়াকে বিয়ে করে তার সঙ্গে ভেগে পড়েছে। এখন সে-বউ নাকি সেই ছোঁড়ার সঙ্গে নৈহাটিতে থাকে—

মহেশ বললে—দাদাবাবু বড় ভালো লোক—

প্রকাশ বললে—ভালো লোক বলেই তো এত ঝঞ্ঝাট। ভালো লোক না হলে কারো বউ এমন করে পালায়? তুমিই বলো না! তা তার ঠিকানাটা কোথায় বলো তো, আমি একবার গিয়ে ধরি তাকে এখন—

মহেশ বললে—আপনি বড়বাজার চেনেন তো? পাথুরেপট্টি? সেইখানে একটা মস্ত বড় ধর্মশালা আছে, সেই ধর্মশালায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন—

হঠাৎ পেছন থেকে মানদা মাসি চিৎকার করলে—এই হারামজাদা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে, আর আমি যে চেঁচিয়ে গলা...

—মাসি!

প্রকাশ চিনতে পেরেছে। এই মাসির খোঁজেই সে কালীঘাট থেকে এখানে এসেছে।

মাসি কিন্তু চিনতে পারলে না। বললে—কে গো বাছা তুমি?

—আমাকে চিনতে পারছো না? আমি প্রকাশ গো! সেই প্রকাশ রায়। তোমাকে সেই আমার ভাগ্নের ছবি দিয়ে গিয়েছিলুম। মনে পড়ছে? সেই যে সেই বাতাসীর বাবুকে দেখাবে বলেছিলে! মনে পড়ছে না?

এতক্ষণে বুঝি চিনতে পারলে মাসি। বললে—তা তুমি আমার এখানকার ঠিকানা পেলে কী করে বাছা?

—কেন, বাসন্তী! তোমার কালীঘাটের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলুম। সে-ই তোমার ঠিকানা দিলে। তা তুমি তোমার অত ফলাও কারবার ছেড়ে এখেনে চলে এলে যে?

মাসি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে—তোমার ভাগ্নে কোথায়? তাকে খুঁজে পেলে?

—না, সেই তাকে খুঁজতেই তো এইচি। আমার সেই ভগ্নীপতি মারা গিয়েছে, জানো? আমার সেই বড়লোক ভগ্নীপতি! এদিকে আবার ভাগ্নেও নিরুদ্দেশ। তার বাপ আট লাখ টাকা রেখে গেছে, সেই খবরটা আমার ভাগ্নেকে দিতে এসেছি—

এতক্ষণে যেন একটু নরম হলো মানদা মাসি। বললে—আট লাখ টাকা?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে মাসি যেন একেবারে অন্য রকম মানুষ হয়ে গেল। সমস্ত মুখের চেহারাটাই বদলে গেল মাসির। বললে—তা বাবা, তুমি এ-রকম করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন, ভেতরে এসো, ভেতরে এসে বোস না। ওরে, এই মহেশ, তুই হারামজাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ভদ্দরলোকের ছেলেকে বাড়ির ভেতরে এনে বসাতে পারছিস নে?

তারপর প্রকাশের দিকে চেয়ে বললে—দেখেছ বাবা এদের আক্কেলখানা? তোমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে গল্প করছে, এসো বাবা এসো, ভেতরে এসো, ছিঃ ছিঃ—

বলে খপ্ করে প্রকাশের হাতখানা ধরে টানতে লাগলো। বললে—এই সব হারামজাদাদের নিয়ে হয়েছে আমার সংসার, যেদিকে দেখবো না সেই দিকেই চিত্তির!

প্রকাশকে টানতে টানতে মাসি একেবারে বাড়ির ভেতরের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললে—তোমার ভগ্নীপতি কত টাকা রেখে গেছে বললে?

প্রকাশ আবার বললে—আট লাখ টাকা, তা ছাড়া সোনা-রুপো-জড়োয়ার গয়না, বাসনপত্তোর, তারও দাম কম করে কয়েক হাজার টাকা—

—সবই তোমার সেই ভাগ্নের? আর কেউ ওয়ারিশন নেই?

—না। সদা যে আমার ভগ্নীপতির একই সন্তান—

—তা এখন যদি তোমার ভাগ্নেকে খুঁজে না পাও, তখন? তখন টাকাটা কে পাবে?

প্রকাশ বললে—তখন সব পাবো আমি—

পাশে দাঁড়িয়ে মহেশও সব শুনছিল। মাসি তার দিকে চেয়ে থমকে উঠলো—তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বেটার কোনও দিকে যদি খেয়াল থাকে। ভদ্দরলোক বাড়িতে এসেছে আর তুই ঠুটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস? যা, দৌড়ে চা-জলখাবার নিয়ে আয়, ঠাকুরকে বলবি চায়ের জল বসাতে, আর দোকান থেকে পাঁচ টাকার মিষ্টি আনবি, রাজভোগ, রাবড়ি যা ভালো-ভালো খাবার দেখবি নিয়ে আসবি—যা—

তারপর প্রকাশের দিকে চেয়ে বললে—তুমি একটু বোস বাবা। আমি মহেশকে টাকাটা বার করে দিই—আচ্ছা, তোমার ভাগ্নে বড় ভালো ছেলে ছিল, জানো একদিন তাকে ডেকে আমি তার চরণ-পূজো করেছিলুম—

বলে মাসি ভেতরে চলে যাচ্ছিল। প্রকাশ বলে—অত জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে না মাসি, আমি অত খেতে পারবো না—

মাসি বললে—খেতে পারবে না মানে? এই তো তোমাদের খাবার বয়েস গো আর এতদিন পরে এলে আমি তোমাকে না-খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি? তুমি বোস, আমি আসছি—

বলে মাসি ভেতরে চলে গেল। মাসির পেছনে-পেছনে মহেশও চলে গেল ভেতরে।

প্রকাশ উঠলো। মাসির খপ্পরে একবার পড়লে আর ছাড়া পাওয়া যাবে না। মাসি টাকার গন্ধ পেয়েছে। টাকার গন্ধ পেলে মাসিকে আটকানো দায়। সামনের রাস্তায় নেমে আর কোনও দিকে চেয়ে দেখলে না প্রকাশ। একেবারে বড়বাজারের পাথুরেপটির দিকে পা বাড়িয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চললো।

আস্তে আস্তে আবার রাত নেমে এল পৃথিবীতে। রাত নেমে এল বউবাজারে। বড়বাজারের পাথুরেপটিতেও রাত নেমে এল। আর রাত নেমে এল নৈহাটিতে নয়নতারার বাড়িতে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই গ্রহটিতে আগে আরো অনেক কোটি কোটি বার রাত নেমেসেছে, হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবার আগে আরো অনেকবারই রাত নামবে। কিন্তু এ-রাত যেন এক মহা স্মরণীয় রাত। নয়নতারার জীবনের আগেকার অনেক রাতের সঙ্গে যেন এর কোনও মিল নেই। সেই নরনরায়ণ চৌধুরীর অত সাধের পুত্রবধূর জীবনে এমন রাত যেন আগেও কখনও আসে নি।

অঘোর ঘুমের মধ্যে নয়নতারার মনে হলো ঘরের দরজায় যেন টোকা পড়লো একবার। প্রথম বারের টোকাটা অস্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয়বার টোকা পড়তেই নয়নতারা ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। পাশেই শুয়ে আছে নিখিলেশ। ঘুমে অচৈতন্য। নয়নতারা আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। এমন সময় কে আর দরজায় ধাক্কা দেবে!

কিন্তু দরজা খুলতেই দেখলে সদানন্দ।

—তুমি?

সদানন্দ বললে—আমি চলে যাচ্ছি—

নয়নতারা বললে—চলে যাচ্ছ? কিন্তু তুমি যে এখনও ভালো করে সেরে ওঠো নি।

সদানন্দ বললে—আমি না-সারলেও চলে যাবো। এখান থেকে আমাকে চলে যেতেই হবে, আর আমি একলাও এখান থেকে যাবে না, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো, তুমিও চলো—

নয়নতারা খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে সদানন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—কিন্তু—

কিন্তু যে-কথা সে বলতে চাইছিল তা আর মুখ দিয়ে বেরোল না তার। তার আগেই সদানন্দ বললে—তুমি যদি না-ই যাবে তো কেন তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে এনে তুলেছিলে?

—তখন যদি তোমাকে আমার বাড়িতে না আনতুম তা হলে যে তোমার বিপদ হতো!

সদানন্দ বললে—আমার বিপদ হলে তোমার কী? আমি তো তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলুম। তা হলে কেন তুমি আবার আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে?

নয়নতারা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এল। বললে—আমি তোমার সঙ্গে কখন সম্পর্ক পাতালুম?

—সম্পর্ক না পাতালে নিখিলেশবাবুকে লুকিয়ে কেন তুমি আমার অসুখ সারাবার জন্যে তোমার সোনার হার বাঁধা দিয়েছিলে? কেন সারা রাত জেগে জেগে আমার অসুখের সময় সেবা করেছিলে? নিখিলেশবাবু যখন ওষুধের নাম করে বিষ কিনে এনেছিলেন কেন তখন তুমি সে-বিষ আমাকে খাওয়ালে না? কেন তখন তোমার সন্দেহ হয়েছিল? কেন তুমি

ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলে? একেও কি সম্পর্ক পাতানো বলে না?

নয়নতারা বললে—আজকে তুমি এই কথা বলছো!

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আজকে আমার ভুল ভেঙেছে বলেই এই কথা বলছি—

—ক'বছর আগে তোমার এ-ভুল ভাঙলো না কেন? ক'বছর আগে ভুল ভাঙলে তো আমি কোনও কিছু না ভেবে তোমার সঙ্গেই চলে যেতে পারতুম। এতদিন পরে কেন এমন করে তোমার ভুল ভাঙলো? এখন যে বড় দেরি হয়ে গেছে—

সদানন্দ বললে—যত দেরিই হোক, তবু আমার তত বেশি দেরি হয় নি, এখনও অনেক সময় আছে। চলো, সকাল হয়ে গেলে সবাই আবার জেনে ফেলবে, রাত থাকতে থাকতেই চলো বেরিয়ে পড়ি—

নয়নতারা যেন ককিয়ে উঠলো। বললে—ওগো, তুমি অমন করে বোল না—

—কেন বলবো না?

—না, তুমি বুঝতে পারছো না, আর যে তা হয় না—

সদানন্দ বলে উঠলো—হয় হয়, তুমি ইচ্ছে করলেই হয়। তুমি যাবে না তাই বলো—

—ওগো তুমি চলে যেও না, তুমি থাকো। যে-যাই বলুক আমি তোমার কোনও কষ্ট কোনও অপমান হতে দেব না, তুমি থাকো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি থাকো—

সদানন্দ বললে—আর এখানে থাকা যে আমার চলে না নয়নতারা, আমাকে যে চলে যেতেই হবে—

—কেন? তোমাকে চলে যেতে হবে কেন? আমি তো আছি, আমি যখন থাকতে বলছি তখন তোমার থাকতে আপত্তি কী?

সদানন্দ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো—না—না—সে কিছুতেই হয় না—

বলে চলে যেতেই সদর দরজাটা তার মুখের ওপর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দূরের স্টেশন থেকে একটা ট্রেনের হুইশ্‌লের শব্দে মনে হলো যেন নিখিলেশ তাকে ডাকছে—ওগো, কী হলো, কী হলো তোমার? স্বপ্ন দেখলে নাকি?

নয়নতারা যেন এতক্ষণে বাস্তবে ফিরে এল। তারপর বিছানা থেকে উঠলো।

নিখিলেশ বললে—কী হলো? যাচ্ছো কোথায়?

নয়নতারা বললে—ও-ঘরে গিয়ে একবার দেখে আসি ও কেমন আছে—ঘুমের ওষুধটা ওকে খাওয়াতে ভুলে গিয়েছিলুম—

নিখিলেশ বললে—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি, ভোরবেলা গেলেই তো হতো—

নয়নতারা সে-কথার উত্তর না দিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে চলে গেল, নিখিলেশও বিছানা থেকে উঠে পেছন পেছন চললো।

কিন্তু পাশের ঘরে গিয়ে যা-দেখলে তাতে নয়নতারার আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। কোথায় গেল মানুষটা! বিছানা যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। ঘরের অন্য জিনিসগুলোও যেখানে থাকবার সেখানে রয়েছে শুধু সদানন্দই নেই। একবার কী যেন সন্দেহ হলো নয়নতারার। ঘরের বাইরে গিয়ে উঠোনের দরজাটাও লক্ষ্য করলে। দরজার খিল খোলা। তবে কি মানুষটা চলে গেল? এই অন্ধকারে এত রাত্রে অসুখ শরীর নিয়ে কোথা গেল সে!

হঠাৎ নিখিলেশের দিকে চেয়ে নয়নতারা বললে—এ নিশ্চয় তোমার কাজ—

নিখিলেশ বললে—আমার কী কাজ?

—তুমি নিশ্চয় তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তুমি সব পারো।

নিখিলেশ বললে—আমি সদানন্দবাবুকে তাড়িয়ে দেবো কেন?

নয়নতারা বললে—তুমি ছাড়া আর কে তাড়াবে তাকে? তুমিই তো তাকে খুন করবার মতলব করেছিলে। আমি তোমাকে খুব চিনে গেছি।

—কিন্তু গিরিবালাও তো কিছু জানতে পারে। তাকে একবার জিজ্ঞেস করো না—

—সে তোমার মত অত নীচ নয়, সে বুড়ো মানুষ সারাদিন খেটে-খুটে ঘুমোচ্ছে, সে কিছু জানলে আমাকে নিশ্চয়ই বলতো, এ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, এ তোমারই কাজ—

নিখিলেশ বললে—বিশ্বাস করো সত্যি বলছি আমি আর কিছু জানি না—

—তাহলে সে কোথায় গেল তাই বলো? তুমি কী বলতে চাও সে নিজের থেকে চলে গেছে? এত রাত্তিরে কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়? তাকে তো হঠাৎ ভুতে ধরে নি। এ নিশ্চয়ই তোমার কাজ—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

নিখিলেশ বলতে গেল—তুমি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছো নয়ন—শোন—

—না, তোমার কথা আমি শুনতে চাই না, তোমার মুখও আমি দেখতে চাই না—তুমি যাও, আমার সামনে থেকে তুমি বেরোও।

বলে নিখিলেশের মুখের ওপর নয়নতারা ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে। তারপর সদানন্দর খালি বিছানাটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

নিখিলেশ বাইরে থেকে ডাকতে লাগলো—নয়ন, দরজা খোল, দরজা খোল—

পাথুরেপটি খুঁজতে প্রকাশ রায়ের বেশি দেরি হলো না। বহু বছর ধরে কলকাতায় যাতায়াত করে করে কলকাতার অলি-গলি প্রকাশ রায়ের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। তখন বয়েস কম ছিল তার। দিদির পয়সায় প্রকাশ রায় কলকাতায় এসেছে, তারপর হাতের টাকা যখন ফুরিয়ে গিয়েছে তখন আবার খালি হাতে নবাবগঞ্জে ফিরে গিয়েছে। এ-সব অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তারপর একদিন দিদি মারা গিয়েছে, নবাবগঞ্জের আর সুলতানপুরের জমি-জমাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বলতে গেলে ভগ্নীপতি মারা যাওয়ার পর থেকে প্রকাশ রায়ের আশা-ভরসাও চলে গিয়েছে। এখন ভরসা একমাত্র সদানন্দ।

তা সদানন্দর সন্ধান যে এমনভাবে পাওয়া যাবে তা আগে ভাবতে পারে নি প্রকাশ। অথচ আগে কত খুঁজে বেড়িয়েছে সদানন্দকে। কোথায় কালীঘাট, কোথায় শেয়ালদহ, কোথায় বড়বাজার। যে-মানুষটা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে, সে তো কলকাতার বাইরেও চলে যেতে পারে। কলকাতার বাইরে চলে গেলে অবশ্য তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

মাসি জলখাবারের বন্দোবস্ত করেছিল প্রকাশের জন্যে। যেই শুনেছে সদানন্দ আট লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাবে আমনি আপ্যায়নের বহর বাড়িয়ে দিয়েছিল। বাবা, টাকা এমনই জিনিস রে! তোমার টাকা আছে সেই কথাটা শুনেই লোকে তোমায় খাতির করতে শুরু করবে! নইলে সুলতানপুর-সুদ্ধ লোক রাতারাতি তাকে এমন করে খাতির করছেই বা কেন?

বড়বাজারের কাছটায় এসে পড়তেই যেন ভিড়ে প্রকাশ রায়ের দম আটকে আসার অবস্থা হয়ে এল। প্রকাশ রায়ের মনে হলো বড়বাজারের ভিড় যেন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

একটা অশথ গাছের তলায় একটা আগাগোড়া সিঁদুর মাখানো মূর্তিকে ঘিরে তখন বেশ ধুপ-ধুনো দিয়ে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ঘটা করে পূজো হচ্ছে। কী ঠাকুর কে জানে! তবু প্রকাশ

রায় সেখানে দাঁড়িয়েই ঠাকুরটার উদ্দেশ্যে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলে। প্রণাম করতে তো আর পয়সা খরচ হয় না। আর ঠাকুর মানেই ঠাকুর। তা সে পাথরেরই হোক আর মাটিরই হোক।

বললে—হে ঠাকুর, হে ভগবান, আমার দিকে একটু দেখো তুমি, আমার দিকে একটু নেক-নজর দিও—আমার ভাগ্নেটা টাকা-কড়ি কিছু চায় না, তা না চাক্ গে, সে সন্নিসী মানুষ, তার টাকা না হলে চলে যায়, কিন্তু আমার যে বড় টাকার টানাটানি—আমার অভাবটা একটু মিটিয়ে দিও বাবা। আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাইনে বাবা, অন্য লোককে তুমি যা-খুশী দিও, আমি কিছু বলতে যাবো না, কিন্তু আমাকে বেশ মোটা-রকম টাকা দিও তুমি, টাকা পেলে আর কোনও দিন তোমায় বিরক্ত করবো না বাবা, তুমি তো জানো বাবা, আমার সংসারের অবস্থা।

হঠাৎ পেছনে একটা মোটর-গাড়ির ভোঁ বেজে উঠলো। প্রকাশ রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশে সরে এসেছে। কী বে-আক্কেলে সব লোক রে বাবা। গাড়ি চাপা দেবে নাকি। দেখছে ভগবানকে নমস্কার করছি, ঠিক সেই সময় পেছনে ভোঁ ভোঁ করছে! এ কোন্ যুগ এল রে বাবা যে ভগবানকে পর্যন্ত মানতে চায় না কেউ!

গাড়িটা চলে যেতেই প্রকাশ রায় আবার মনঃযোগ করবার চেষ্টা করলে। একটু যে মন দিয়ে ভগবানকে ডাকবো তারও উপায় নেই বড়বাজারে। বেছে বেছে সদা কি না এই হতচ্ছাড়া জায়গায় এসে উঠেছে।

প্রকাশ আবার ঠাকুরকে লক্ষ্য করে আট লাখ টাকার হিসেব দিতে লাগলো। সমস্ত টাকাটার সবটার হিসেব দিতে লাগলো—আট লাখ টাকার সবটা আমার চাই নে ঠাকুর, অত লোভ আমাকে দেখিও না তুমি! লোভ বড় খারাপ জিনিস ঠাকুর, কথায় আছে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আমার চার লাখ পেলেই কোনও রকমে চলে যাবে ঠাকুর। এক লাখ দিয়ে প্রথমে একটা বাড়ি করবো কলকাতায়, আর বাকি তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট রেখে দেব। তাতে আমার হাতে আসবে মাসে তিন হাজার টাকাতেই কোনও রকমে চালিয়ে নেব আমি ঠাকুর। বাকি চার লাখ টাকা সদা নিক। টাকা তিন হাজার আসলে তারই বাপের টাকা, আমি তো ফাউ ঠাকুর। আর সদার বউ? সে মাগীর কপালই খারাপ, মিছিমিছি বিয়ে করতে গেল। যদি আজ সে বিয়ে না করতো তো তার কপালেই এই টাকাটা ছিল। তা বিয়ে করেছে সে ভালো করেছে, আমারই ভালো হয়েছে! তুমি শুধু দেখো ঠাকুর, যেন আদ্দেক টাকাটা আমার হাতে আসে—

আট লাখের অর্ধেক হলো চার লাখ। প্রকাশ রায় আবার হিসেব করতে লাগল। অনেকবার হিসেব করেছে সে। যেদিন থেকে ভগ্নীপতি মারা গেছে সেই দিন থেকেই প্রকাশ হিসেব করে চলেছে।

বউ বলতো—অত হিসেব করছো কেন বার বার? তোমায় টাকা দেবে না কলা, ছাই দেবে—

প্রকাশ বলতো—তুমি চুপ করো তো! তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাকবে, সব কথায় তুমি কথা বলতে আসো কেন?

বউ বলতো—সারা জীবন তো তুমি কেবল টাকা-টাকা করে সকলের গায়ে তেল মাখিয়ে এসেছ, ক'টা টাকার মুখ দেখেছ তুমি শুনি?

প্রকাশ বলতো—এবার দেখ কী হয়! এবার শুধু বসে-বসে দেখ, কেবল বসে-বসে দেখে যাও। যদি কলকাতায় পেল্লায় বাড়ি না করি তো তুমি আমায় কুকুর বলে ডেকো—

—তা তোমার ভাগ্নে কি তোমায় টাকা দেবে ভেবেছ?

—দেবে না তো কী করবে সে এত টাকা? আমার ভাগ্নেকে আমি চিনি না, তুমি আমাকে চিনিয়ে দেবে? টাকা তার হাতের ময়লা তা জানো?

বউ বলতো—ওই টাকাই তোমাকে একদিন পথে বসাবে! এতদিন তোমার সঙ্গে ঘর করছি, তোমাকে আমি চিনি নে বলতে চাও?

প্রকাশ রেগে-মেগে আর কোনও কথা বলতো না। কেবল শেষকালে বলতো—মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি, ওই জন্যেই তো মেয়েমানুষের সঙ্গে আমি জীবনে কথা বলি না—

কথা বলি না বলতো বটে, কিন্তু এক মিনিট পরেই আবার কথাও বলতো। বলতো—তুমি কেবল আমার ওপর রাগই করতে পারো, কিন্তু টাকা আমি কার জন্যে চাইছি, আমার জন্যে টাকা চাইতে বয়ে গেছে। টাকা তো তোমাদের জন্যেই চাইছি, তাহলে টাকার ওপর যদি তোমার এতই বিরাগ তো আমার কাছে আর টাকা-টাকা কোর না এবার থেকে—

বউও রেগে যেত। বলতো—তা তোমার কাছে টাকা চাইবো না তো টাকা চাইবো কার কাছে শুনি? টাকা আমি রোজগার করতে বেরোব বলতে চাও? যদি রোজগার করতে বলো, তো এই বুড়ো বয়েসে তা-ও করতে পারি—

প্রকাশ রায় তখন খেতে বসেছিল। বউএর কথায় আর খেতে পারলে না। রাগে সেই ভাতের থালায় এক লাথি মেরে উঠে পড়লো। সমস্ত মেঝেময় তখন ভাত-ডাল-চচ্চড়ি একেবারে ছত্রখান। তারই ওপর ওপর পা দিয়ে মাড়িয়ে একেবারে কুয়োতলায় গিয়ে পা-হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলে যেত। বলতো—দুত্তোর টাকার নিকুচি করেছে—

বৈঠকখানা ঘরে তখন মোসায়েবের দল রায় মশাই-এর জন্যে হাঁ করে বসে থাকতো। রায় মশাই সেখানে গিয়ে বসতো। পিসেমশাই এর হুঁকোতে তখন তামাক সাজাই থাকতো। সেই হুঁকো তখন সে ভুডুক-ভুডুক করে টানতো।

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি জিজ্ঞেস করতো—সেবা হলো রায় মশাই?

প্রকাশ বলতো—হলো।

তারপর একটু থেমে ধোঁয়া ছেড়ে বলতো—সেবা হলে কী হবে, আমার মনে তো শান্তি নেই হে—

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো, বলতো—কেন, মনে শান্তি নেই কেন রায় মশাই?

প্রকাশ রায় বলতো—ওই যে টাকা! টাকা যে কী সব্বোনেশে জিনিস তোমরা কী করে জানবে? টাকা হোক তোমাদের, তখন বুঝবে টাকা কী সব্বোনেশে জিনিস! উঃ, জামাইবাবু আমার যে কী সব্বোনাশটাই করে গেল—

—কেন? চৌধুরী মশাই-এর কথা বলছেন? চৌধুরী মশাই আবার আপনার কী সব্বোনাশ করে গেলেন?

—সব্বোনাশ করে গেলেন না? এই লাখ-লাখ টাকা কি আমার ধাতে সয় হে? এই একটু আগে বউএর সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল। আগে আমার টাকা ছিল না বেশ ছিলুম, খাচ্ছিলুম দাচ্ছিলুম পেট ভরে ঘুমোচ্ছিলুম, টাকা আসার পর থেকে আর ঘুম আসে না হে, বিছানার ওপর সারা রাত কেবল এপাশ-ওপাশ করি। তাই বউ বলছিল, এ কী আমাদের সব্বোনাশ হলো! তার চেয়ে টাকাগুলো তুমি নিও না, গাঁয়ের দশজনকে বিলিয়ে দাও—

—বউমা বলছিলেন নাকি? তা দিন না রায় মশাই। আমাদের একটু টাকা বিলিয়ে দিন না, আমরা একটু টাকার মুখ দেখি—

প্রকাশ রায় বলতো—খবরদার খবরদার, টাকার নাম মুখে এনো না, সর্বোনাশ হয়ে যাবে তোমাদের—

ভীম বিশ্বাস বলতো—হোক সর্বোনাশ, যে সর্বোনাশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তার চেয়ে আর কত বেশি সর্বোনাশ হবে তাই দেখতে চাই আমরা—

প্রকাশ রায় বলতো—আরে, আমিও তো বউকে তাই বললুম। বললুম এত ঝঞ্ঝাট আর সইতে পারছি নে—টাকাগুলো সক্কলকে বিলিয়ে দিই—

—তা বউমা কী বললেন শুনে?

প্রকাশ রায় বলতো—বউ বললে তুমি জেনে-শুনে ভালোমানুষদের এই সর্বোনাশ করবে? আমরা নিজে যা ভুগছি তা ভুগছি, পরকে কেন আবার ভোগানো মিছিমিছি! জামাইবাবুর অবস্থা তো আমি নিজের চোখে দেখেছি কি না। এত টাকা হাতে আসার পর থেকেই জামাইবাবু যেন কেমন হয়ে গেল। তখন থেকে কেমন মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, পেটের ক্ষিধে চলে গেল, চোখের ঘুম উবে গেল। যে-মানুষ আমাকে ডেকে-ডেকে কথা বলতো, সেই মানুষই শেষকালে আবার আমাকে দেখলেই খেকিয়ে উঠতো—

—কেন রায় মশাই, ও-রকম কেন হতো?

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি বলতো—তা হোক রায় মশাই, আগে তো টাকা হোক আমাদের তার পরে যা-হয় হবে। একবার টাকা হলে তখন আমরা চোখ-কান-নাক বুঁজে না-হয় সব ঝঞ্ঝাট সহ্য করবো। আপনি কিছু-কিছু দিন আমাদের। টাকা হাতে পেলে আমার নিজের মেয়েটার বিয়ে দিতে পারি তাহলে—

ভীম বিশ্বাস বললে—আমিও তাহলে এক জোড়া বলদ কিনি, গেল মাসে আমার দুটো বলদই চুরি হয়ে গেল—

আশু চক্কোত্তি বললে—হ্যাঁ, আমিও তাহলে বাস্তুভিটের খড়ের চালটার ওপর টিন দিয়ে ফেলি—

প্রকাশ রায় বলতো—তা টাকা না হয় তোমাদের আমি মাথা পিছু দু'দশ হাজার করে দিয়ে দিলাম, কিন্তু শেষকালে যেন আবার আমাকে তোমরা দুষো না, তা বলে রাখছি—

—আজ্ঞে তা কেন দুষবো? আমাদের কপালে যা আছে তা তো আর কেউ খণ্ডাতে পারবে না—

প্রকাশ রায় বলতো—ঠিক আছে, তাহলে তাই-ই দেব। তাহলে অশ্বিনী, তুমি কত নেবে?

অশ্বিনী বলতো—আজ্ঞে, আমাকে যদি হাজার দশেক দেন তো খুব উব্‌কার হয় আমার—

প্রকাশ রায় বলতো—ঠিক আছে, তোমাকে দশ হাজারই দেব—

তারপর ভীম বিশ্বাসের দিকে ফিরে বলতো—তুমি? তোমার কত চাই?

ভীম বিশ্বাস বলতো—আজ্ঞে আমাকে আপনি যা দেবেন তা-ই নেব। আমার কাছে এক টাকাও যা, এক হাজার টাকাও তাই—

প্রকাশ বলতো—ঠিক আছে, তোমাকেও দশ হাজার দেব। যত হাল্কা হতে পারি ততই তো আমার ভালো রে বাবা—

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করতো—কবে দেবেন?

প্রকাশ বলতো—আরে, টাকা তো আমি এখনই দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার ভাগ্নে? সে আসুক আগে। সে না এলে তো আমি এ টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে পারছিনে—

—তা যদি আপনার ভাগ্নে না আসে?

—না আসে মানে? যেমন করে হোক তাকে এখানে ধরে আনতেই হবে। সে না এলে তাকে ছাড়বো কেন? সে না এলে গভর্মেন্ট যে সব টাকা বাজেয়াপ্ত করে নেবে—তাকে এখেনে পাকড়ে এনে তার হাতে টাকাটা তুলে দিয়ে তবে আমি খালাস পাবো, তার আগে নয়—

কথাটা শুনে আশেপাশের সকলের মুখ শুকিয়ে যেত। তবে আর টাকা পেয়েছে তারা! চৌধুরী মশাই-এর ছেলে এখানে এলে সব বানচাল হয়ে যাবে। আশ্চর্য! এতগুলো টাকা কিনা পরের হাতে চলে যাবে? তখন কি আর তাদের কেউ চিনতে পারবে?

যখন আসর ছেড়ে সবাই উঠতো তখন সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। তাহলে আর অশ্বিনী ভট্টাচার্যির মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাহলে আর ভীম বিশ্বাস একজোড়া বলদ কিনেছে, তাহলে আর আশু চক্কোত্তির বাড়ির খড়ের চালের ওপর টিন উঠেছে! ভগবানের মনে কী আছে তা ভগবানই জানে।

প্রকাশ রায় তখনও রাস্তার ঠাকুরটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে তাকে তার মনের বাসনাগুলো মনে মনে জানাচ্ছে। বলছে—মা, তোমার কাছে গলা ছেড়ে কিছু বলতে পারছি না, আশে-পাশে সব লোকজন রয়েছে। হাটের মধ্যে কি মনের কথা গলা ছেড়ে বলা যায়? তুমিই বলো মা? তুমিই বলো মা! কিন্তু লোকে তো বলে তুমি অন্তর্যামী, মনের কথা তোমাকে বলা বৃথা। তুমি তো সবই জানো মা, তুমি তো সবই বুঝতে পারো—

হঠাৎ পাশে একটা যাঁড় এসে দাঁড়াতেই প্রকাশ চমকে উঠেছে। চমকে উঠে আবার পাশে সরে দাঁড়ালো। আর একটু হলেই তাকে গুঁতিয়ে থেঁতো করে দিত। বললে—দূর, দূর, বেরো বেরো—

সবাই মিলে তাড়া দিতেই শিবের জীবটা সরে চলে গেল। আবার প্রকাশ হাত-জোড় করে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলে। বলতে লাগলো—এই দেখ, ঠাকুর, ভালো কাজে কত বাধা, দেখলে তো? একটু আগে একটা মটর-গাড়ি এসে চাপা দিচ্ছিল, এখন আবার এসেছে একটা যাঁড়। তোমাকে যে একটু মন দিয়ে ডাকবো তারও উপায় নেই। তা যাকগে বাজে কথা। কাজের কথাটা আগে ভাগে সেরে ফেলি। অনেক আশা করে এবার সদার খোঁজ পেয়েছি ঠাকুর? সেই কালীঘাটের মানদা মাসির বস্তি থেকে শুরু করে বউবাজারের বড়বাবুর বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছি। আবার এখন যাচ্ছি পাথুরেপটির মারোয়াড়ীদের ধর্মশালায়। সেখানে গিয়ে যেন সদার দেখা পাই। দেখো ঠাকুর, সদার যেন সুমতি হয়, সদা যেন টাকাটা আমাকে দিয়ে দেয়। সদার বাপের ওই আট লাখ টাকাটা পেলে আমার বড় উপকার হয় ঠাকুর...আমার বহুদিনের শখ আমি কলকাতায় একটা বাড়ি করবো, আর খাঁটি বিলিতি হুইস্কি খাবো, দিশী মাল খেয়ে আমার জিভে একেবারে মরচে পড়ে গেছে।

—রাজাবাবু, রাজাবাবু...

একটা ভিড়ের গোলমাল কানে আসতেই প্রকাশ রায় আবার একপাশে সরে দাঁড়ালো। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন ভিখিরি একজন লোককে ঘিরে ধরেছে। কাকে ঘিরে ধরেছে তা দেখা যায় না। কিন্তু সবাই মিলে গোল হয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে আর চেঁচাচ্ছে—রাজাবাবু, ও রাজাবাবু, ও রাজাবাবু, একটা পয়সা দাও—

লোকটা বোধ হয় পয়সা দিচ্ছে না। বলছে—আমার কাছে পয়সা নেই এখন—পয়সা নেই আমার কাছে—

তবু কেউ শুনছে না তার কথা। তারা একনাগাড়ে একই কথা বলে যাচ্ছে—রাজাবাবু, আমাকে একটা পয়সা—

বিচিত্র জায়গা এই বড়বাজার। দুশো বছর আগে এই বড়বাজার থেকেই প্রথম পয়সার

আমদানি-রফতানি শুরু। পয়সা দিয়েই বড়বাজারের পত্তন আর পয়সা দিয়েই এই বড়বাজারের পরিসমাপ্তি। যেদিন পৃথিবীতে পয়সার খেলা থাকবে না, সেদিন বড়বাজারও ধ্বংস হবে। সেদিন আর সবই থাকবে, শুধু বড়বাজারই থাকবে না। এই বড়বাজারে এলেই দেখা যাবে পয়সা কাকে বলে, পয়সার চাহিদা কত। এই বড়বাজারে এলেই বোঝা যায় যে পৃথিবীতে সব কিছু মিথ্যে, একমাত্র সত্যি হচ্ছে পয়সা। পয়সার দৌলতেই বড়বাজার আর বড়বাজারের দৌলতেই পয়সা। শুধু যে বড়লোকদেরই ভিড় এখানে তা নয়, ভিখিরিদেরও ভিড়। এখানে পয়সা আছে বলে যারা পয়সাওয়ালা লোক তারা যেমন এখানে আসে, যাদের পয়সা নেই তারাও এখানে আসে।

প্রকাশ রায়ের বড় ভালো লাগলো দৃশ্যটা দেখতে। কই তাকে তো কেউ পয়সার জন্যে ঘিরে ধরছে না। ওই লোকটাকেই বা ধরছে কেন। লোকটার পয়সা আছে এটা বোধ হয় সবাই জানে। পয়সাওয়ালা লোক বোধ হয়।

পয়সাওয়ালা লোকদের দেখতে প্রকাশ রায়ের বড় ভালো লাগে। পয়সাওয়ালা লোকদের কাছাকাছি থাকতেও তার বড় আনন্দ হয়।

প্রকাশ ভিড় ঠেলে লোকটার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। সদানন্দ না! ঠিক সদানন্দের মতন। কিন্তু যেন খুব রোগা হয়ে গেছে।

তখনও ভিখিরিদের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি সবাই চিৎকার করছে—রাজাবাবু, একটা পয়সা দাও—

সদানন্দর মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। সে হাত নেড়ে নেড়ে সকলকে বলছে—আজ আমার কাছে একটাও পয়সা নেই বাবা, তোমারা আজকে আমাকে ছেড়ে দাও, পরে তোমাদের পয়সা দেব আমি, পরে দেব—

সদানন্দও পয়সা দেবে না, তারাও ছাড়বে না! সে এক তুমুল টানাটানি কাণ্ড!

—এই সদা, সদা—

গোলমালের চোটে সদানন্দর কানে সে-শব্দ পৌঁছুলো না। সে তখনও ভিখিরিদের হাত থেকে ছাড়ান পাবার চেষ্টায় ছট্‌ফট করছে। সকলকে লক্ষ্য করে বার বার বলছে—আমাকে তোমরা এখন ছাড়ো ভাই, আমি এখন ফতুর, পরে দেব—

প্রকাশ রায় আরো ভিড় ঠেলে একেবারে সদানন্দর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—এই সদা, কোথায় যাচ্ছিস?

এতক্ষণে যেন সদানন্দর কানে গেল কথাটা। মুখ ফিরিয়ে প্রকাশ মামাকে দেখে চিনতে পারলে। বললে—প্রকাশ মামা? তুমি?

প্রকাশ মামা বললে—তুই এখানে? আর আমি যে এতকাল ধরে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে। তুই ধর্মশালায় কোথায় থাকিস্ আমাকে মহেশ বলে দিলে—

—মহেশ? তাকে তুমি চিনলে কী করে?

—সেখান থেকেই তো আসছি। তোকে খুঁজতে আমি সেই কালীঘাটে মানদা মাসির বস্তিতে গিয়েছিলুম। সে এক কাপ্তেন পাকড়েছে। পাকড়ে এখন পুলিসের বড়বাবুর সর্বোনাশ করবার মতলব করেছে, জানিস। মাগীর তো বরাবর টাকার খাঁই, তা তো তুই জানিস?

সদানন্দ বললে—আমি সে-সব কিছুই জানি না—

প্রকাশ মামা বললে—সে কি রে, তুই জানিস না মানে? মাসি যে বললে তুই তাকে চিনিস। তোকেও মাসি নাকি ভাল করে চেনে।

সদানন্দ বললে—সে ভুল করেছে—

—ভুল করেছে কী রে! মাসি কি ভুল করবার মানুষ যে ভুল করবে? মাসি যে বললে সে নাকি তোর চরণ-পূজো করেছিল?

চরণ-পূজো! এতক্ষণে মনে পড়লো। সেই কালীঘাটের রাস্তায় তাকে ধরে চরণ-পূজো করার ঘটনা।

প্রকাশ মামা আবার বললে—আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না মাসির কথা। মাসিটা একেবারে মিথ্যে কথার জাহাজ। সত্যিই তো, মাসি তোর চরণ-পূজো করতে যাবেই বা কেন, আর তুই-ই বা মাসিকে তোর চরণ-পূজো করতে দিবি কেন? সত্যিই তো!

সদানন্দ বললে—না মামা, মাসী আমার চরণ-পূজো করেছে—

—সে কী রে? মাসি তোর চরণ-পূজো করেছে? এত লোক থাকতে তোর চরণ-পূজো করলে কেন? কী মতলোবে?

সদানন্দ বললে—স্বপ্ন দেখেছিল—

—স্বপ্ন দেখেছিল মানে?

—স্বপ্ন দেখেছিল সে ঘুম থেকে উঠে যে-ব্রাহ্মণকে প্রথম দেখতে পাবে তার চরণ-পূজো করলে তার কোমরের বাত সেরে যাবে!

প্রকাশ মামা হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—মাগী তো কম মতলোববাজ নয়। তারপর? তারপর কী হলো?

—তারপর আর কী হবে! সেই বড়বাবু এসে পড়াতে সব ভেস্তে গেল!

—বড়বাবু? পুলিশের বড়বাবু? তারই মেয়েমানুষের বাড়িতে তুই গিয়েছিলি?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

—আরে তা সেই বড়বাবুকেই তো মাসি এখন পাকড়েছে। বাপ মারা যাবার পর বড়বাবু নিজের মেয়েমানুষকেও যে সেখানে নিয়ে গেছে। আমি যে গিয়ে সব দেখে এসেছি রে। এখন মাসির মুসকিল হয়েছে, তার অনেক টাকা চাই। আমার কাছে সেই টাকার গন্ধ পেয়ে একেবারে চেপে ধরেছিল, আমি জানতে পেরে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু মহেশ তার আগেই তোর ঠিকানাটা আমাকে বলে দিয়েছে। তা কোথায় আছিস তুই? কোন ধর্মশালায়? ভালোই হলো তোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল—

আজও মনে আছে সদানন্দর সেই সব দিনের কথাগুলো, সেই প্রকাশ মামার সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া আর তারপর আবার সেই ধর্মশালায় গিয়ে ওঠা। মানুষের জীবন সত্যিই বিচিত্র। কী ভাবে সে জীবন কাটাতে চেয়েছিল আর কী ভাবে শেষ পর্যন্ত তার জীবনটা কাটলো। আর প্রকাশ মামাই বা কী ভাবে টাকার জন্যে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

প্রকাশ মামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোর চেহারা এরকম হলো কেন রে? কোনও অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

—তা শরীরের দিকে একটু নজর না দিলে শরীর তো খারাপ হবেই। শরীরের আর দোষ কী রে! কিন্তু কেন এত কষ্ট করছিস বল্ তো? কার ওপরে তোর রাগ?

সদানন্দ এ কথার কোন জবাব দিলে না।

—তোকে একটা কথা বলা হয় নি। তুই বোধ হয় শুনিসও নি। দিদি জামাইবাবু সবাই মারা গেছেন, তা জানিস তো? দিদি অবশ্য আগেই মারা গিয়েছিলি—

সদানন্দ বললে—সে আমি মহেশের কাছে আগেই শুনেছিলুম—

—তুই মাইরি অদ্ভুত ছেলে! তোর মা'র মারা যাওয়ার খবর শুনলি অথচ একবার নবাবগঞ্জে গেলি না? জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করলি না?

সদানন্দ বললে—গিয়েছিলুম তো। কিন্তু বাবার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি তারপর আর সেখানে থাকতে ইচ্ছে হয় নি।

—তা তোর বাপ খারাপ ব্যবহার করলো সেইটেই তোর মনে লাগলো? আর তোর বউ যে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে কী ব্যবহার করলে তা শুনেছিস? তখন আমি তোকে খুঁজতে কলকাতায় ঘুরে মরছি তাই নিজের চোখে দেখতে পাই নি। তুই শুনলে তোরও রাগ হতো তোর বউ-এর ওপর—

সদানন্দ বললে—আমি জানি—

প্রকাশ মামা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী রে, তুই জানিস সব? কী করে জানলি? কে বললে?

—দিদিমা!

—দিদিমা? তোর আবার দিদিমা কে?

—বেহারি পাল মশাই-এর স্ত্রী। তাদের বাড়িতেই তো সে-রাত্রে ছিলুম।

প্রকাশ বললে—আসলে তোর বউটারই দোষ, বুঝলি? আমি রূপ দেখে তোর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ালুম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে মেয়েটা এত নচ্ছার তা কে জানতো! জানিস, তোর বউটা আবার ওদিকে একটা কাণ্ড করে বসেছে! আমি এখানে আসবার আগে তোর শ্বশুরবাড়ি কেষ্টনগরে গিয়ে সব শুনে অবাক! তোর বউ আবার একটা বিয়ে করেছে রে—শুনলুম এখন বরের সঙ্গে নাকি নৈহাটিতে বাসা করে আছে—

সদানন্দ এ কথার কোনও জবাব দিলে না।

প্রকাশ মামা বললে—তুই কিছু বলছিস না যে?

—কী আর বলবো!

প্রকাশ মামা বললে—তা তো বটে, তুই-ই বা কী বলবি! তোর বউ যদি বিয়ে করে তো তাতে তোরই বা বলবার কী আছে! যাকগে, তুই কিছু মন খারাপ করিস নি। বুঝলি, তুইও একটা বিয়ে করে ফ্যাল্, তোর ভাবনা কী! আমি তখনই জানি মেয়েদের অত রূপ ভালো নয়; রূপসী মেয়েদের জীবন কখনও সুখের হয় না, এ আমি বরাবর দেখে এসেছি!

তারপর যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। বললে—কই রে, আর কতদূর? আর কতদূর তোর ধর্মশালা?

সদানন্দ বললে—এই কাছেই—

প্রকাশ মামা বললে—উঃ, মাসির হাত থেকে যে ছাড়া পেয়েছি এই আমার রক্ষে—

—কেন?

—আরে, যেই শুনেছে তোর টাকা পাওয়ার কথা আর ওমনি আমাকে খাতির করতে আরম্ভ করেছে!

সদানন্দ বুঝতে পারলে না কথাটা। বললে—টাকা? আমার টাকা পাওয়ার কথা? আমার কীসের টাকা?

—হ্যাঁ, সেই কথা বলতেই তো তোর কাছে আসা রে! জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর তো তোর জন্যে আট লাখ টাকা রেখে গেছে। সে-সব টাকা তো তোর রে! তুই-ই তো জামাইবাবুর একমাত্র সন্তান, তুই পাবি না তো কে পাবে? তুই না থাকলে সে টাকা পেত তোর বউ। কিন্তু তোর বউ তো আবার বিয়ে করে ফেলেছে। সুতরাং ভালোই হয়েছে। তুই এখন সে টাকার একমাত্র মালিক, আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে সব কথা শুনে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। উকিলের কথামত তোর কাছে এসেছি, এখন তুই যা ইচ্ছে তাই কর—

সদানন্দ বললে—বাবার টাকা আমি নেব না—

প্রকাশ মামা বললে—কেন রে? বাবা না-হয় তোর দোষ করেছে, কিন্তু তোর বাবার টাকা কী দোষ করলে?

সদানন্দ বললে—না, ও টাকাও আমি নেব না—

—তা, কেন নিবি নে তা বলবি তো? ও তো তোর হক্কের টাকা! তুই না নিলে গভর্মেণ্ট নিয়ে নেবে। মিছিমিছি গভর্মেণ্টকে ও-টাকা দিয়ে তোর লাভ কী? গভর্মেণ্ট তো চোর। চোরকে খাইয়ে তোর কী উপকারটা হবে শুনি? আর যদি তুই নিজে না নিতে চাস তো আমাকে দিয়ে দে। আমি ছাপোষা মানুষ। আমার ছেলেমেয়ে নাবালক, এই বয়েসে দুটো টাকা হলে আমি তবু একটু আরাম করে খাই-দাই! আরাম করে যে-কটাদিন বাঁচি ঘুমোই, এখন আমার খেয়ে-দেয়ে-ঘুমিয়ে সুখ নেই, টাকা পেলে বুড়ো বয়েসে তাহলে আর আমাকে ভাবতে হয় না—জানিস, সংসারে টাকাই হলো আসল রে, টাকাই হলো বুকের বল—

ততক্ষণ ধর্মশালার কাছে এসে গিয়েছিল।

পাঁড়েজী খবর পেয়েই ছুটে এসেছে। সদানন্দকে দেখে হইচই বাধিয়ে দিলে। কতদিন আগে বাবুজী চলে গিয়েছিল, একটা খবর পর্যন্ত পায়নি সে। সবাই সদানন্দর খোঁজ নিয়েছে। কত লোক যে বাবুজীকে খোঁজ করতে এসেছিল তার ঠিক নেই।

—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার বাবুজী?

সদানন্দ সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—পাঁড়েজী, তোমার কাছে কিছু টাকা আছে?

—টাকা? টাকা কী করবেন? কত টাকা?

সদানন্দ বললে—দু'চার-পাঁচ-দশ যা থাকে দাও না—

পাঁড়েজী বললে—আবার বুঝি কেউ চেয়েছে?

প্রকাশ মামা এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। বললে—টাকা তো আমার কাছে আছে। কত টাকা তোর দরকার? আমাকে বল না—

সদানন্দ বললে—তুমি দিতে পারবে? তাহলে দাও? ওই ছেলেমেয়েগুলো অত করে চাইছিল, দিতে পারিনি—মনটা কেমন করছে—আমি তোমার টাকা আবার তোমাকে দিয়ে দেব—

যে-মানুষটা আট লাখ টাকার মালিক হতে যাচ্ছে তাকে টাকা দিতে প্রকাশ রায়ের কোনও ভয় নেই। তা ছাড়া একটু পরে সদানন্দর কাছেই তো তাকে হাত পাততে হবে। সুতরাং সদানন্দকে টাকা দিতে তার আপত্তি নেই। পকেট থেকে কটা টাকা সদানন্দর দিকে এগিয়ে দিতেই সে সেগুলো নিয়ে বেরোল—

পাঁড়েজী পেছন থেকে ডাকলে—বাবুজী, আবার কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি আসছি পাঁড়েজী, আমি এখুনি আসছি—বলে সদানন্দ বাইরে বেরিয়ে গেল।

পাঁড়েজী জিজ্ঞেস করলেন—আপনি বাবুজীর কে হন?

প্রকাশ বললে—ও আমার ভাগ্নে হয়, আমি ওর মামা। কিন্তু ও এ ধর্মশালায় এসে জুটলো কী করে?

পাঁড়েজী বললে—বাবুজী পাগল আছে বাবু। আমিই বাবুজীকে এখানে ডেকে এনেছি। বাবুজীর তো থাকবার কোনও জায়গা ছিল না। বাড়িওয়ালা বাবুজীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—

কিন্তু এত দিন পরে বাবুজী এসে টাকা নিয়ে আবার কোথায় চলে গেল বুঝতে পারলে না সে।

প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করলে—তা পাঁড়েজী, তুমি জানো বাবুজী কে? কোন বংশের

ছেলে? তুমি যে বাবুজীকে তোমার এখানে থাকতে দিলে, তা বাবুজীর কোনও খোঁজ-খবর কখনও নিয়েছ?

পাঁড়েজী বললে—না—

প্রকাশ বললে—যদি না জানো তো শুনে নাও। তোমার বাবুজী এখন আট লাখ টাকার মালিক, বুঝলে?

—আট লাখ রুপেয়া!

—হ্যাঁ, আট লাখ টাকা! ইচ্ছে হলে তোমার মালিকের এই ধর্মশালাটাও কিনে নিতে পারে! তোমাকে মাসকাবারি মাইনে দিয়ে চাকর রাখতে পারে! অথচ এই এখ্খুনি দেখলে তো, পকেটে একটা পয়সাও নেই বাবুর আমার কাছে টাকা ধার চেয়ে নিয়ে গেল—

পাঁড়েজী জিজ্ঞেস করলে—তা বাবুজী টাকা নিয়ে কোথায় গেল আবার?

—কোথায় আবার, ওই রাস্তায়। রাস্তায় কতকগুলো ভিখিরি ওকে ছেঁকে ধরেছিল তাদের ভিক্ষে দিতে গেল—আমি তো তাই তোমার বাবুজীকে দেশে নিয়ে যেতে এসেছি। যার অত টাকার সম্পত্তি, অত জমিদারী, সে কেন এখানে তোমার এই ধর্মশালায় পড়ে থাকবে! তা এখেনে ওর কী করে চলে? কে খেতে দেয়?

পাঁড়েজী বললে—ওই একটা চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিলুম, ছেলে পড়ানোর চাকরি, তাইতে চলে—

—সেই টাকায় চলে?

পাঁড়েজী বললে—চলবে কি করে? রাস্তায় আসবার সময় যে হাত পাতে তাকেই দিয়ে দেয়—শীতকালে একটা গায়ের চাদর কিনে দিয়েছিলুম তা সেটাও একদিন কোথাকার কোন্ কালীগঞ্জের বউকে দিয়ে দিলে—

—কালীগঞ্জের বউ?

—হ্যাঁ বাবু, একটা বুড়ি আছে, সে এখানকার খাটাল থেকে গোবর কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেয়ালে-দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে বেড়ায়, তাকে বাবুজী কালীগঞ্জের বউ বলে ডাকে—

আশ্চর্য! প্রকাশ মামা কথাটা শুনে আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—এইজন্যেই তোমার বাবুজী এত রোগা হয়ে গিয়েছে—

পাঁড়েজী বললে—রোগা তো হবেই, বাবুজী তো কিছু খায় না। এই তো ক'মাস আগে চলে গিয়েছিল, এতদিন পরে এল, এখন দেখছি আরো রোগা হয়ে গিয়েছে।

প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে—তা এতদিন কোথায় গিয়েছিল তা জানো?

—কে জানে কোথায় গিয়েছিল বাবুজী! দুদিনের জন্যে দেশে যাবে বলে গিয়েছিল, আর আজ তো আপনার সঙ্গে ফিরছে—

কিন্তু ওদিকে বড়বাজারের রাস্তার সেই ঠাকুরের সামনে তখনও ধুপ-ধুনোর ধোঁয়ার মধ্যে জোর-কদমে পূজো চলেছে। দর্শনার্থীর আর ভক্তের ভিড়ে তখন জায়গাটা আরো সরগরম। সরু গলি রাস্তা। পয়সার আমদানি-রফতানির যত ভিড়, তার চেয়ে ভিড় পয়সা চাওয়ার লোকের। পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন পয়সা চাইবার তাগিদে এখানে এসে জুটেছে। তাই এসে জুটেছে কারবারীরা, তাই জুটেছে বেকাররা, তাই জুটেছে পূজারীরা আর তাই এসে জুটেছে ভিখিরিরা। পৃথিবীর সমস্ত টাকা যেন এখানে এই বড়বাজারে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে।

ঠাকুরের সামনের লাল কাপড়টার ওপর অনেক খুচরো পয়সার পাহাড়।

সদানন্দ সেখানে গিয়ে একজনকে বললে—আমার এই দশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে দাও তো ভাই—

লোকটা চেনে সদানন্দকে। সবাই রাজাবাবু বলে ডাকে তা জানে।

বললে—আবার ওদের পয়সা দেবেন রাজাবাবু? কেন দেন?

সদানন্দ বললে—আমরা না দিলে ওদের কে দেবে বলো, ওদেরও তো খাওয়া-পরার দরকার হয়—

—না, রাজাবাবু, ওই পয়সা নিয়ে ওরা আবার বাটায় খাটায়। সুদখোর সব ওরা। চুরি-বাটপাড়ি করে, মদ খায়, গাঁজা ভাঙ্ খায়—

সদানন্দ বললে—তা থাক্, তখন পয়সা চাইছিল আমার কাছে, আমি দিতে পারি নি, এখন দাও, দিয়ে যাই—

নোটের ভাঙানি নিয়ে বাইরে যেতেই সবাই ছেঁকে ধরেছে—একটা পয়সা দাও রাজাবাবু, দাও একটা পয়সা—

সেই লোকগুলো এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। টের পেয়েই একেবারে সদানন্দর ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। চারদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে পয়সা পয়সা রব উঠলো। সবার মুখে ওই একটাই কথা। পয়সা আর পয়সা। সদানন্দর মনে হলো সেই কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক আর কালীগঞ্জের বউ যেন হাজার-হাজার মূর্তি ধরে তার সামনে হাত পেতে আছে—দাও দাও, আমাদের সব টাকা ফেরত দাও, যুগ-যুগ ধরে তোমার পূর্বপুরুষেরা যে আমাদের ঠকিয়ে এসেছে তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করো আজ—

সদানন্দও বোধ হয় তাদের মনের কথাগুলো বুঝতে পারতো। সদানন্দও বলতো—তোমাদের কিছু বলতে হবে না, তোমাদের ওপর যে-পাপ করেছে আমার বাবা-ঠাকুর্দাদা, সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি আজ রাস্তায় নেমেছি, যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না হবে ততদিন আমি এমনি করে তোমাদের পয়সা দিয়ে যাবো—নাও নাও, আমার কাছে যা আছে সব তোমরা নাও—

দশ টাকার নোটের ভাঙানি আর কতক্ষণ থাকে! এক মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল সব। পকেট ফাঁকা হয়ে গেল।

পেছন থেকে প্রকাশ মামার গলা শোনা গেল—কী রে, এখানে কী করছিস, কতক্ষণ তোর জন্যে বসে আছি আর তুই এখেনে...

বলতে বলতে হঠাৎ প্রকাশ মামা শিউরে উঠেছে—ও কী, তোর গা এত গরম কেন? জ্বর হলো নাকি, দেখি—

হ্যাঁ, সত্যিই জ্বর। জ্বরই তো। প্রকাশ মামা তাকে ধরে ধরে ধর্মশালার দিকে টেনে নিয়ে চললো।

অনেক দিন পরে আবার নয়নতারা অফিসে এসেছিল। নিখিলেশ আর একলা ছাড়তে ভরসা পায় নি তাকে। নৈহাটি থেকে একসঙ্গে দুজনে এসেছে। অদ্ভুত মেয়েমানুষের মন, আর অদ্ভুত সেই মনের গতি। যেন ঝড়ের মতন কেটে গিয়েছিল এই ক'টা মাস! কোথা থেকে কে একজন তাদের জীবন-ধারার মধ্যে এসে একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি করে দিয়ে আবার একদিন

নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম নয়নতারা নিখিলেশের সঙ্গে কথাই বলতো না। সারা দিন মুখ ভার করে থাকতো। তারপর বাইরের ঘরে যেখানে সদানন্দ শুতো সেই ঘরে বিছানার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়তো।

নিখিলেশ বলতো—তুমি এখানে শুচ্ছো কেন? ও-ঘরে শোবে না?

প্রথমে কোনও উত্তর দিত না নয়নতারা। তবু বার বার পীড়াপীড়ি করতো নিখিলেশ। বলতো—লক্ষ্মীটি ও-রকম করতে নেই, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, সে কথা ভেবে তুমি মন-খারাপ করে রয়েছ কেন? মানুষ কি অন্যায় করে না? আমি তো বলছি আমি অন্যায় করেছি। তুমি ওঠো, ও-ঘরে গিয়ে শোবে চলো। চলো—

বলে নয়নতারার হাত ধরে আস্তে আস্তে টানতো। কিন্তু নয়নতারা তার নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য পাশ ফিরে শুতো। নিখিলেশের কোনও কথায় আর জবাব দিত না সে। তখন আর কোনও উপায় না পেয়ে নিখিলেশ আবার তার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তো।

এমনি রোজ! রোজ-রোজই এমনি করে নিখিলেশ ডাকতে আসতো। সারা দিন সময় পেলেই বোঝাতে বসতো নয়নতারাকে। বলতো—এ রকম করে থাকলে যে শেষকালে একদিন অসুখ হবে তোমার, অসুখ হলে তখন কী করবে বলো তো? তখন তো আমাকেও অফিস কামাই করতে হবে—তখন সংসার কী করে চলবে বলো দিকিন? গিরিবালা বলছিল তুমি নাকি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছ? যদি সদানন্দবাবু চলে গিয়ে থাকেন তো আমি কী করবো বলো তো! আর যদি তুমি চাও তো আমি না-হয় নবাবগঞ্জে গিয়ে একবার দেখে আসতে পারি—

নয়নতারা নিখিলেশকে ঠেলে দিত, বলতো—তুমি যাও, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না—

সেদিন নিখিলেশ বললে—আচ্ছা আমি কালকে অফিসে না গিয়ে নবাবগঞ্জেই যাবো, কথা দিচ্ছি সেখানে গিয়ে দেখে আসবো তিনি কেমন আছেন, এখন হলো তো?

নয়নতারা এ-কথার উত্তর দিলে না।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই নিখিলেশ পরদিন ভোরের ট্রেনেই চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—আমি নবাবগঞ্জে যাচ্ছি বুঝলে, ফিরতে আমার একটু রাত হবে—

নিখিলেশ চলে গেল। সমস্ত দিনটা ঘরের ভেতরে নয়নতারা কেমন ছট্‌ফট করতে লাগলো। কিন্তু রাত দশটার ট্রেনে নিখিলেশ ফিরে এল হাসতে হাসতে।

নয়নতারা সমস্ত দিন খবরটা শোনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে ছিল। আসলে নিখিলেশ নবাবগঞ্জেও যায় নি, কোথাওই যায় নি। সারাদিন কলকাতায় ঘুরে বাড়িতে এসেই নয়নতারার কাছে গিয়ে বললে—শুনেছ, দেখা হলে—

নয়নতারা এতদিন পরে সহজদৃষ্টিতে চাইলে নিখিলেশের দিকে।

নিখিলেশ বললে—দেখে এলুম খুব আরামে আছেন সদানন্দবাবু, এই কদিনেই দেখলুম তাঁর চেহারা একেবারে খুব ভালো হয়ে গেছে।

নয়নতারার মুখ দিয়ে তখনও কোনও কথা বেরোচ্ছে না।

নিখিলেশ বলতে লাগলো—আমি তো সে বাড়িতে গিয়ে প্রথমে চিনতেই পারি নি। বাড়ির চেহারাই বদলে গিয়েছে একেবারে। মনে হলো বাড়ির ভেতরে কিছু কাণ্ড-টাণ্ড চলেছে, খুব ধুমধাম, ভেতর থেকে লুচি-ভাজার গন্ধ নাকে আসছে। আমাকে তো প্রথমে চিনতেই পারলেন না—

নয়নতারার মুখে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—তোমায় চিনতে পারলেন না?

নিখিলেশ বললে—না, শেষকালে যখন আমি বললুম আমি নয়নতারার স্বামী তখন খুব

খাতির-যত্ন করলেন, আমাকে খেয়ে যেতে বললেন, তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—নয়নতারা কেমন আছে?

শুনতে শুনতে নবাবগঞ্জ সম্বন্ধে নয়নতারার যেন আরো কথা শুনতে ইচ্ছে করতো। মনে হতো যেন নিখিলেশ নবাবগঞ্জ সম্বন্ধে যদি আরো কিছু খবর দেয়। আরো কিছু বলে। কিন্তু নিজের মুখে সেকথা জিজ্ঞেস করতে তার সঙ্কোচ হতো। আসলে সদানন্দ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করাই তো অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, পাপ। যখন নিখিলেশ অফিসে চলে যেত তখন যেন আর তার সময়ই কাটতে চাইতো না। বাড়িতে সংসারের কত রকম কাজ পড়ে থাকতো। গিরিবালা এক-এক সময় এসে জিজ্ঞেস করতো—দিদিমণি, খেয়ে নেবে না? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।

অথচ যে না-খেলেই ভালো হয়। শুধু খাওয়া নয়, কোনও কিছু কাজ না করলেই যেন সে বেঁচে যায়। আগে সংসারের উপর কত মায়া ছিল নয়নতারার। এই খাট-আলমারি-বাসন সমস্ত কিছু সে কত পছন্দ করে কিনেছে। নিখিলেশ আর সে মিলে দিনের পর দিন কলকাতায় গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। কিছুতেই যেন আর তার পছন্দ হয় না। দোকানদাররাও তার খুঁতখুঁতে পছন্দের বহর দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে। নিখিলেশও বলেছে—অত বাছাবাছি করলে চলে? যা হোক একটা কিনে নাও না—

নয়নতারা ঝাঁঝিয়ে উঠতো। বলতো—তুমি থামো তো, তুমি কেন বাড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছো? পছন্দ না হলে আমি জিনিস কিনবো কেন? আমার টাকা বুঝি সস্তা? দোকানদার তো তার জিনিস বিক্রি করতে পারলেই খুশী, কিন্তু আমি কেন তার কথায় কান দেব?

সে-সব দিনের কথাও মনে আছে নয়নতারার। সংসারের ওপর নিখিলেশের যত টান ছিল তার চেয়ে দশ গুন বেশি টান ছিল নয়নতারার। বলতে গেলে নয়নতারাই তখন নিখিলেশকে তাড়া দিত। একটা পয়সা বাজে খরচ করলে নিখিলেশকে কথা শোনাতো নয়নতারা। তখন নিখিলেশ কেউ না, নয়নতারাই ছিল সংসারের আসল মালিক। আর এখন যেন উল্টো হয়ে গেছে। এখন নিখিলেশকেই সব ব্যাপারে তাড়া দিতে হয় নয়নতারাকে। নিখিলেশ অফিসের পর সোজাসুজি হাতের কাছে যে ট্রেন পায় তাইতেই বাড়ি চলে আসে। এসে একেবারে সোজা নয়নতারার কাছে চলে যায়। বলে—কী হলো, আজ খেয়েছ?

নয়নতারা বলে—হ্যাঁ—

নিখিলেশ আবার জিজ্ঞেস করে—তাহলে কবে থেকে অফিসে যাবে?

এ কথার কোনও জবাব দিতে পারে না নয়নতারা। নিখিলেশও জবাবের জন্যে তেমন পীড়াপীড়ি করে না। তাদের সংসারের ওপর যে ধাক্কাটা গেছে তার পর থেকে একটু সাবধানে কথা বলে নিখিলেশ। নইলে শেষ পর্যন্ত ঝোঁকের মাথাতে নয়নতারা আবার কী করে বসে কে বলতে পারে!

এতদিন নিখিলেশ এসে বললে—একটা খবর আছে, জানো—

নয়নতারা মুখ তুলে চাইলে।

নিখিলেশ বললে—আজকে সদানন্দবাবুকে দেখলুম—

এতক্ষণে নয়নতারা আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারলে না! বললে—কোথায়?

—কলকাতায়। দেখলুম চেহারার মধ্যে খুব জৌলুস বেরিয়েছে আবার। খুব সাজগোজ। স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়ে গেছে এখন—

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করলেন নাকি?

নিখিলেশ বললে—না, জিজ্ঞেস করবার তো সময়ই হলো না, আমাকে তো তিনি দেখতে পান নি, আমিই তাঁকে দেখলুম একটা গাড়ির মধ্যে।

—গাড়ি?

নিখিলেশ বললে—হ্যাঁ, মটরগাড়ি। মনে হলো একটা নতুন গাড়ি কিনেছেন, গাড়িটা সোঁ করে পাশ দিয়ে চলে গেল পাশে দেখলুম একজন মহিলা বসে আছেন—

—মহিলা?

—হ্যাঁ, দেখতে খুব সুন্দরী মনে হলো, সিঁথিতে আবার সিঁদুর রয়েছে—

কথাটা শুনে নয়নতারা যেন খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল নিখিলেশের দিকে। কিছু বলবার ক্ষমতাও যেন তখন আর নেই তার।

নিখিলেশ তার সেই মুখের ভাব দেখে আরো কাছে সরে এল। বললে—দেখ, আসল জিনিস হচ্ছে টাকা। টাকা পেয়েই সব ভুলে গেলেন আর কি! মুখে তো আমরা কত বড় বড় আদর্শের কথা সবাই-ই বলি। এই আমারই কথা ধরো না। সদানন্দবাবুর মত কত আদর্শ এককালে তো আমারও ছিল। তুমি তো সবই জানো নয়ন তোমাকে তো সবই বলেছি। মদের দোকানে পিকেটিং-এর জন্যে পুলিসের কত লাঠির ঘা খেয়েছি। কিন্তু সেই আমিই তো এখন আবার চাকরি করছি। আর সে চাকরিও এমন কিছু কেষ্ট-বিষ্টুর চাকরি নয়। এখন কি আর আমি সেই আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছি? এখন কি আর সেই তখনকার মত খদ্দর পরি? এমন শুধু সস্তার প্রশ্ন, টেঁকসই এর প্রশ্ন। অথচ এককালে তো এসব কল্পনাও করতে পারতুম না—

কথাগুলো নিখিলেশ খুব সহজ সুরেই বলে গেল অবশ্য। কিন্তু সে জানতেও পারলে না সেই কথাগুলো নয়নতারার মনে কী গভীর কী স্থায়ী দাগ কেটে দিয়ে গেল।

নিখিলেশ সুযোগ বুঝে আবার বলতে লাগলো দেখ আমারও সদানন্দবাবুর জন্যে যে দুঃখ হতো না তা নয়। সত্যিই তো ভদ্রলোকের অত টাকা, অমন স্বাস্থ্য, বংশের একমাত্র সন্তান। আমি যদি ও রকম হতুম আর তোমার মত স্ত্রী পেতুম তো আমিই কি আর ওঁর মতন সংসার ছেড়ে বিবাগী হতুম? বিবাগী হতে বয়ে গেছে আমার! কবে পূর্বপুরুষ কী পাপ করে গেছে তা নিয়ে পৃথিবীতে কেউ মাথা ঘামায়? আসলে তো সবাই আমরা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আমরা জন্মাবার আগে ও পৃথিবী ছিল কি ছিল না তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামাই না। তেমনি আমি মারা যাবার পর এ পৃথিবী গোল্লায় যাবে না জাহান্নামে যাবে, তা নিয়েও কারো মাথা-ব্যাথা নেই। আসল হচ্ছে, কেবল আমি আমি আর আমি। আমি মনে করি যেদিন থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সেই-দিনই এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। আর যা-কিছু এই চারপাশের পৃথিবীতে রয়েছে সবই আমার সুখ-সুবিধার জন্যে। যেদিন আমার সুখ-সুবিধার সঙ্গে চারপাশের এই পৃথিবীর ক্লাশ্ বাধবে, সেইদিনই আমি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। এই-ই তো নিয়ম। সদানন্দবাবুও বোধ হয় এতদিন পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন, তাই এখন সোজা পথ ধরেছেন—

এমন করে রোজই একতরফা বক্তৃতা দিত নিখলেশ। সেদিন সকাল বেলাই বললে—চলো চলো নয়নতারা, অফিসে চলো, আর কার জন্যে তুমি এমন মন-মরা হয়ে থাকবে বলো। পৃথিবীতে কে কার? আমিও তোমার নই, তুমিও আমার কেউ নও। আজ যদি আমিই ধরো হঠাৎ মারা যাই, মারা যেতেও তো পারি, তখন তোমার কী অবস্থা হবে বলো তো? তখন তো এই চাকরিই তোমাকে বাঁচাবে? আর চাকরি মানেই নগদ টাকা! এই যে এতদিন তুমি কামাই করলে, কই, তোমার চাকরি কি গেল? রিটায়ার করবার দিনটা পর্যন্ত এই চাকরিটাই তোমার একমাত্র নিজের জিনিস, আর সব কিছু পর। তোমাকে যদি কেউ

বাঁচাতে পারে তো সে সদানন্দবাবু নয়, কেউই নয়,সে কেবল এই চাকরি! চাকরির ওপর কখনও রাগ করতে আছে? চলো আজকে তোমাকে আমি অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসি—চলো, আমার কথা শোন—

আশ্চর্য, যে মানুষ এতদিন তার উপরোধ-অনুরোধ শোনেনি, সেই মানুষই আবার হঠাৎ সেদিন উঠলো। উঠে সকালে স্নান সেরে নিলে। ভাত খেলে। কাচা শাড়ি-ব্লাউজ পরলে, চুল আঁচড়ালে, সিঁথিতে সিঁদুর দিলে। আর তারপর চটি পায়ে আবার সেই আগেকার মত নিখিলেশের সঙ্গে রাস্তায় বেরোল সত্যিই তো, চাকরিটাই তো তার সব। এই শাড়ি-ব্লাউজ-চটি পরে যে সে অফিসে যাচ্ছে, এই যে একটা অফিসের চেয়ারে তার আশ্রয় পাকা হয়ে আছে, এটা তো সম্ভব হয়েছে শুধু তার চাকরির জন্যেই! চাকরিটা না থাকলে তার কী হতো! চাকরি না থাকলে তাকে সারাদিন সেই চারটে দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে কাটাতে হতো। নিখিলেশের মাইনের টাকার ওপর নির্ভর করলে তো তারই দাসত্ব করতে হতো তাকে। সে যে স্বাধীন, সে যে একটা মানুষ তা উপলব্ধি করবার মত শক্তিও তো তার হতো না।

আর যদি সে এতদিন নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বাড়ির আদরের বউ হয়ে থাকতো, তাহলেই বা তার কী এমন অক্ষয় স্বর্গলাভ হতো! সেই তো শ্বশুর-শাশুড়ীর তাঁবে থেকে ঘোমটা দিয়ে সংসারের যাঁতাকলে পিষে রক্তাক্ত হয়ে রাত্রে স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে ঘুমোত আর বছরে বছরে সন্তানের জন্ম দিয়ে শ্বশুর-বংশ বৃদ্ধি করতো। এই তো শতকরা নিরানব্বই ভাগ মেয়েরেই বিধিলিপি। তার চেয়ে তো এ ভালো। এই সকালবেলা ট্রেনে করে অফিসে গিয়ে গল্প করা আর দু'চারটে কাজ সেরে আবার সন্ধ্যে-বেলা বাড়ি ফেরা। এর চেয়ে আর বেশি ভালো কী হতে পারে! এর চেয়ে আর কোন্ মেয়ে বেশি পায়!

সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেই পারলে না নয়নতারা। আবার সেই মালা বোস, সেই কেতকী হাজরা, আর সকলের ওপর সেই অরুণা পাল আর ডেসপ্যাচ সেকশনের বড়বাবু রসিকদাস চ্যাটার্জির প্রেমের গল্প। সমস্ত দিন অফিসখানা সেই তাদের প্রেমের গল্পের আলোচনাতেই গুলজার হয়ে রইল।

মালা বোস এল। কেতকী হাজরাও এল। মালা বললে—তুমি ছিলে না নয়নদি, আমাদের দিন আর কাটছিল না সত্যি—

আর শুধু কি অরুণাদির গল্প! আরো কত কেলেঙ্কারির গল্প যে এতদিন জমা হয়েছিল তার ঠিক নেই। নয়নতারাকে সব একে-একে শুনতে হলো। কে একটা নতুন সিফন শাড়ি কিনেছে, কে নতুন হার গড়িয়েছে, কার শাশুড়ীর বুড়ো বয়সে আবার একটা ছেলে হয়েছে, সব শুনতে হলো নয়নতারাকে। নয়নতারারও সে-সব খবর শুনতে বেশ ভালোও লাগলো। তারপর যখন গল্প বেশ জমে উঠেছে, হঠাৎ তখন হুঁশ হলো আর সবাই যে-যার কাজকর্ম ছেড়ে কখন উঠে পড়েছে। সকলকে ট্রাম-বাস ধরতে হবে। বাড়ি যাবার তাড়া তখন সকলেরই। তখন কোনও রকমে নিজের কোটরে গিয়ে আশ্রয় পেলেই যেন একটা রাত্রের জন্যে সবাই বাঁচে। তারপর কাল দিনেরবেলা আবার সবাই এসে এক জায়গায় জুটবে।

নিখিলেশ নিচের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সিঁড়ি দিয়ে দলে দলে সবাই হুড়-হুড় করে নামছে। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একজন মেয়ে। নিখিলেশ সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে একটা চেনা মুখই কেবল খুঁজতে লাগলো সকলের মুখের মধ্যে। প্রথম দিন। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো তার। নয়নতারাকে তার অফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে সে নিজের অফিসে চলে গিয়েছিল। সমস্ত দিন কাজে মন লাগে নি। কেবল ভেবেছে কতক্ষণে ছুটি হবে, কতক্ষণে বিকেল পাঁচটা বাজবে।

শীতেশ একটা কাজে এসেছিল। বললে—কী হে, আজ কখন বাড়ি যাবে?

নিখিলেশ বললে—আজ ভাই একটু তাড়া আছে!

শীতেশ বললে—আজকাল তোমার এত তাড়া থাকে কেন বলো তো? আগে তো এরকম তাড়া থাকতো না—

নিখিলেশ আর কী বলবে! বললে—না ভাই, বাড়িতে সত্যিই একটু কাজ আছে—

—কেন? গিন্নীর অসুখ এখনও ভালো হয় নি?

—আজকে ভাই গিন্নী প্রথম অফিসে এসেছে—

এতক্ষণে বুঝলো শীতেশ। সে ব্যাচিলার মানুষ, একলা, তার কোনও দায়-দায়িত্ব নেই কারো ওপর। বেপরোয়া, নির্বিবাদী জীবন। সারা জীবন টাকা কামাতে চেয়েছে আর ফুর্তি করতে চেয়েছে। পৃথিবীতে কার কী সুখ-দুঃখ তা বোঝবার দায়-দায়িত্ব নেই তার। চাকরিটা যতদিন আছে ততদিন আরাম করে বেঁচে নাও। আর তারপর? তারপরের কথা তার পরে ভাববো মশাই। আগে তো বর্তমান, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎই ভাববে।

কিন্তু নিখিলেশের তো অমন বেপরোয়া হলে চলে না। তাকে দশজনের মাথায় উঠতে হবে, আর দশজনের মাথার ওপরে উঠতে গেলে যা করতে হয় তাই করতে হবে। তা করতে গেলে লজ্জা পেলে চলবে না। সঙ্কোচ করলে চলবে না। লোকের পকেট কাটা ছাড়া আর যা-কিছু করতে হয় তা করতে সে পেছপাও হবে না।

—এই যে, এত দেরি হলো যে তোমার?

নয়নতারা তর-তর করে আর সকলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সামনে এসে বললে—কখন পাঁচটা বেজে গেছে খেয়াল ছিল না কারো—

নিখিলেশ বললে—কেন, এত গল্প কীসের?

—আমাদের সেই অরুণাদির কথা মনে আছে? তার সঙ্গে বাজেট-সেকশানের বড়বাবু আর-ডি চ্যাটার্জির বিয়ে!

—তাই নাকি? শেষ পর্যন্ত তোমাদের অরুণাদি তাহলে বিয়ে করলেন?

—সেই কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ। অফিসময় তাই নিয়ে খুব হইচই হচ্ছিল, সারাদিন কাজই হয় নি কারো।

বলে সমস্ত গল্পগুলো একে-একে বলতে লাগলো নয়নতারা। নিখিলেশের মনে হলো নয়নতারা যেন একদিনেই বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এই স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্যেই এতদিন চেষ্টা করে আসছিল নিখিলেশ। নয়নতারা তার পাশে পাশে চলেছে। ফুটপাথে রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। কলকাতায় অফিসের ছুটি-পাওয়া মানুষ কেমন করে বাড়ি যাবে তারই উদ্বেগ নিয়ে সবাই রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে—

নিখিলেশ বললে—চলো একটা ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করি—

নয়নতারা আপত্তি করলে। বললে—কেন আবার মিছিমিছি ট্যাক্সি করবে? তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো, সবাই তো হেঁটে যাচ্ছে—

এ সেই আগেকার নয়নতারা। যে নয়নতারা বাজে খরচ কমিয়ে তাদের দু'জনের সঞ্চয় বাড়িয়েছে, আর ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি আর সুখকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বর্তমানকে বঞ্চনা করেছে।

রাস্তায় ফুটপাথে চলতে চলতে নিখিলেশ বললে—দেখ আমি ভাবছি একটা ব্যবসা করবো—

—ব্যবসা? ব্যবসা করতে গেলে তো টাকা লাগবে! আমাদের টাকা কোথায়?

নিখিলেশ বললে—চাকরি করলে কোনও দিন কিছু হবে না, সারাজীবন কেবল ওই

চাকরিই করে যেতে হবে—তার চেয়ে ভাবছিলাম অফিসের পরে তো হাতে অনেক সময় থাকে, তখন সময় নষ্ট না করে বরং কিছু করলে হয়। আমাদের অফিসে অনেকে করছে—

—কী ব্যবসা করবে?

নিখিলেশ বললে—তা ভাবি নি কিছু, শুধু ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বলছি। দুদিন বাদে তো সংসার বড় হবে, তখন খরচ আরো বাড়বে, এখন থেকে যদি কিছু প্ল্যান না করা যায় তো তখন মুশকিল হবে। তুমি কী বলো?

নয়নতারা বললে—আমি আর কী বলবো!

নিখিলেশ বললে—তুমি যদি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য না করো তো আমি একলা কত করতে পারবো বলো! তুমি আমি দু'জন মিলে হাত লাগালে কাজটা বেশি এগোবে তা সে যে-কাজই হোক—

নয়নতারা বললে—আগে ঠিক করো তুমি কী ব্যবসা করবে তবে তো সাহায্য করবো। এমন এমন ব্যবসা করো যাতে অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভ হয়।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই। শেষকালে যদি দেখি ব্যবসাতে বেশি লাভ হচ্ছে তখন না হয় দু'জনে চাকরি ছেড়ে দেব। ভেবে দেখছি চাকরি চালিয়ে গেলে কোনও দিনই অভাব ঘুচবে না। আর এতদিন তো চাকরি করে দেখলুম, আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভাদুড়ী সাহেব, তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়েও তাঁর অভাব ঘোচে নি, প্রায়ই তো কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে লোন নিতে হয়।

ফুটপাথ দিয়ে অসংখ্য মানুষের চলমান স্রোতে আরো দু'জন মানুষ নিজেদের অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনি করে রোজ মাথা ঘামায়। একদিন নয়, দুদিন নয়, বহুদিন থেকেই এমনি মাথা ঘামিয়ে এসেছে। আজও আবার মাথা ঘামাচ্ছে। মাঝখানে শুধু কয়েক মাস নয়নতারা একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার সুস্থ হয়েছে, আবার স্বাভাবিক হয়েছে। আবার যেন বুঝতে শিখেছে যে সংসারে ভাবপ্রবণতার কোন দাম নেই। ওসব সংস্কার। যতক্ষণ মনের সংস্কারকে প্রাধান্য দেবে ততক্ষণ জীবনে কোনও উন্নতি নেই। প্রচুর টাকার মালিক হবার পর ওসব মানায়। আমরা সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ, আমাদের প্রধান কাজ হবে পয়সা উপায় করা আর পয়সা জমানো। সংসারে তো পয়সাটাই আসল, এই বোধটা যদি একবার মনের মধ্যে পাকা করে গেঁথে দিতে পারো, তখন আর ও-সব বাজে চিন্তা তোমাকে গ্রাস করতে পারবে না। দয়া-মায়া-মমতা-সহানুভূতি ও-সব ছাপানো বইতে পড়তে ভালো। তোমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তুমি দেখেছ তো তাদের কত টাকা! অত টাকা ছিল বলেই কর্তারা আরাম করে খেয়েছে পরেছে আর দুনিয়াকে ভোগ করেছে। কিন্তু তাদের ছেলেটার সেই বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না বলে অমন করে সব নষ্ট হয়ে গেল। নষ্ট করতে এক মিনিট লাগে, গড়াটাই শক্ত। আমরা যদি একটু বুদ্ধি-বিবেচনা করে চলি তো আমাদেরও একদিন ওইরকম আরাম হবে, জীবনকে ওইরকম ভোগ করতে পারবো। আগে তুমি ঠিক করে নাও তুমি ভোগ চাও না ত্যাগ চাও। যদি ভোগ চাও তো তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। দুহাতে টাকা জমাতে হবে। টাকার ওপরে মায়া থাকা চাই। পৃথিবীতে তো ভিখিরির শেষ নেই, তুমি যদি তাদের ওপর দয়া করে তোমার কষ্ট করে উপায় করা পয়সা দান করতে যাও তো দেখবে তোমার সব টাকা এক ফুঁ-এ ফুরিয়ে গেছে। টাকাকে ভালোবাসতে হবে, টাকাকে বিশ্বাস করতে হবে, টাকাকে আদর করতে হবে, তবে তো টাকাও তোমাকে ভালোবাসবে বিশ্বাস করবে আদর করবে। তোমার শ্বশুর কি কখনও বাজে-খরচ করেতো? করতো না। পৃথিবীতে যারা-যারা বড়লোক হয়েছে তারা কেউই কখনও বাজে খরচ করে নি। বাজে-খরচ কমাও দেখবে আমাদেরও অনেক টাকা জমবে। সেইজন্যেই

তো ইংরিজিতে একটা কথা আছে ঃ Don't trust money but put your money in trust—টাকা হাতে রাখলেই খরচ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখো দেখবে টাকা থাকবে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নয়নতারার কানের কাছে নিখিলেশ কথাগুলো বলতো। আর নয়নতারা মন দিয়ে সব শুনতো। বুঝতো, বুঝতে চেষ্টা করতো। অফিস থেকে বাড়িতে গিয়ে অফিসের কাপড়টা পাট করে আলমারির ভেতরে তুলে রাখতো! আবার পরের দিন আলমারি খুলে সেটা পরতো। এ তার বহুদিনের অভ্যেস। এই অভ্যেসটা আবার শুরু করে দিলে সে।

তার পরদিন ঠিক আবার সেই রকম। একদিন সদানন্দকে নিয়ে তাদের সংসারে যে উৎপাত শুরু হয়েছিল তা আবার মন থেকে মুছে গেল। আবার নয়নতারা ঠিক সময়মত অফিসে যেতে লাগলো। আবার ছুটির পর নিখিলেশ গিয়ে তাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতে লাগলো। একদিন যে তৃতীয় একটা মানুষকে নিয়ে তাদের মধ্যে এত সংঘাত বেধে গিয়েছিল তা আর কারো মনে রইল না।

নয়নতারা হঠাৎ এক-একদিন মনে করিয়ে দিত—কই, তুমি যে সেই ব্যবসা করবার কথা বলেছিলে, সে-সব তো কিছু করলে না?

নিখিলেশ বলতো—তোমার তো ঠিক মনে আছে দেখছি—

নয়নতারা বলতো—বাঃ রে, মনে থাকবে না? মালা বোসের স্বামী তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করছে, মালা বোসকে জানো তো?

—খুব জানি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। তা কীসের ব্যবসা?

—হোটেলের ব্যবসা। একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেয়েদের বোর্ডিং-হাউস করেছে। যে সব মেয়েরা চাকরি করে, যে-সব মেয়েদের কলকাতায় থাকবার জায়গা নেই, তাদের জন্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে—

—কটা ঘর?

—চারটে ঘর নিয়ে নাকি প্রথমে আরম্ভ করেছিল। তাতে জায়গা কুলোচ্ছিল না, এখন নাকি আর একটা মস্ত দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, তাতে শুনলুম অনেক টাকা আয় হচ্ছে এখন। এত টাকা হচ্ছে যে আর চাকরি করে দু'দিক দেখা সম্ভব হচ্ছে না—

—কত লাভ থাকে?

নয়নতারা বললে—মালা তো বললে—মাসে নাকি এখন এক হাজার দুহাজার টাকা আসছে। এর পরে যদি নিজেরা দেখতে পারে তাহলে লাভ বাড়বে। মালাও ভাবছে চাকরি ছাড়বে কি না—

নিখিলেশ বললে—তুমি একদিন বোর্ডিং হাউসটা গিয়ে দেখে এসো না—

তা একটা রবিবার দেখে নয়নতারা সত্যিই একদিন গেল। ভবানীপুরের একটা ভদ্রপাড়ায় বাড়িটা। দোতলা বাড়ি। আটখানা ঘর। মালার স্বামী ভদ্রলোকটি বেশ অমায়িক। নয়নতারার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই ভদ্রলোক হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন।

বললেন—দেখুন, আমরা তো দুজনেই চাকরি করি। চাকরি করতে করতে একদিন ভাবলুম চাকরি করে কেবল জীবন নষ্ট করছি। তখন থেকেই ভাবতে লাগলুম একটা কিছু করতে হবে—তা অনেক রকম কাজে হাত দিলুম, কিছুই হলো না, অনেকগুলো টাকা মাঝখান থেকে নষ্ট হয়ে গেল। শেষকালে এই মেয়েদের বোর্ডিং-হাউসের আইডিয়াটা এল—

মালা বললে—আমরা তো অফিসে গল্প ছাড়া আর কিছু করি না। ভাবছি এখেনে কাজ করলে তবু একটু কাজের কাজ করা হবে—

মালার স্বামী বললে—এখন অফিস থেকে এসে এরও কাজে নেশা লেগে গেছে—

মালা বললে—প্রথমে আমি চাকরিটা ছাড়বো না নয়নদি, মাস-কয়েকের ছুটি নেব প্রথম, তারপর একদিন রিজাইন দেব—

নয়নতারার বেশ লাগলো। নিখিলেশ কতদিন ধরে ব্যবসা করবার কথা ভাবছে। এই রকম ব্যবসা করলে মন্দ হয় না।

জিজ্ঞেস করলে—প্রথমে কত ক্যাপিটেল লেগেছিল?

মালার স্বামী বললে—বুঝতেই তো পারছেন আমাদের দুজনের চাকরিতে আর কত টাকাই বা জমতে পারে! হাজার পাঁচেক টাকার মত ব্যাঙ্কে জমা ছিল, তাই দিয়েই একদিন কাজ আরম্ভ করে দিলুম, তারপরেই এই...

বাড়িতে ফিরে এসে নিখিলেশকে বললে—দেখে এলুম—

নিখিলেশ সেই কথা শোনবার জন্যেই আগ্রহ করে বসে ছিল। বললে—কী রকম দেখলে?

নয়নতারা বললে—খুব ভালো। হাঙ্গামা কিছু নেই। আমিও পারি—

কত টাকা ক্যাপিটেল লেগেছিল প্রথমে?

—পাঁচ হাজার টাকা!

পাঁচ হাজার টাকা শুনে নিখিলেশের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাবে সে! ব্যাঙ্কের পাস-বইটা বের করে দেখলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামে বহুদিন আগে একটা জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। তাতে যে কত টাকা ছিল তা মনে ছিল না। পাস-বইটা খুলতেই জমার অঙ্কটা দেখে নিখিলেশ অবাক হয়ে গেল। মাত্র পাঁচটা টাকা পড়ে আছে। অথচ নিখিলেশের মনে আছে শেষের দিকে পাঁচশো টাকার মত জমা ছিল। সে-টাকা কে তুলে নিলে? আসলে টাকা-কড়ি ব্যাঙ্কের পাস-বই সবই তো নয়নতারার কাছে থাকতো।

নিখিলেশ নয়নতারার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—টাকা এত কমে গেল কী করে? নয়নতারা বললে—আমি তুলে নিয়েছি—

নিখিলেশের মুখটা আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—একেবারে পাঁচশো টাকাই তুলে নিয়েছ? আমার তো মনে আছে এতে পাঁচশো টাকাই ছিল—

নয়নতারা বললে—তখন দরকার হয়েছিল তাই তুলেছি—

—দেখ দিকিনি, তুমি এই রকম করে কত টাকা নষ্ট করেছ মিছিমিছি। কোথাকার কে, তার জন্যে সব টাকাটা তুমি এমনি করে জলে ফেলে দিলে? অথচ যার জন্যে তুমি এত করলে সে ওদিকে বেশ আরাম করে বউ নিয়ে ঘর-সংসার করছে। সে-টাকা থাকলে আজকে কত সুবিধে হতো বলো দিকিনি। বললে তা তুমি এখন আমার ওপর রাগ করবে—

নয়নতারা বললে—টাকা তো তুমি নিজেও কত নষ্ট করেছ—

নিখিলেশ প্রতিবাদ করে উঠলো—আমি? আমি আবার কবে টাকা নষ্ট করলুম?

নয়নতারা বললে—এখন যদি আমি সেই সব কথা তুলি তো তুমিও রাগ করবে। তুমি মদ খাও নি? মদ খেয়ে তুমি কত দিন কত টাকা নষ্ট করেছ বলো দিকিনি?

নিখিলেশ বললে—বাঃ, তুমি তো বেশ উল্টো চাপ দিতে পারো! আমি কি শখ করে মদ খেতে গেছি?

—তা শখ করে না তো কি! মদ তো শখেরই জিনিস। তুমি তো শখ করেই মদ খেয়ে টাকা উড়িয়েছে।

—তা তো তুমি বলবেই। দোষ করলে তুমি নিজে আর মাঝখান থেকে অপরাধী হলুম আমি, বেশ।

নয়নতারা বললে—তা তুমি কি ছেলেমানুষ যে শীতেশবাবু তোমার গলায় জোর কবে মদ ঢেলে দিলে, আর তুমিও খেয়ে ফেললে? মদের দাম কি কম নাকি? কত টাকা এমনি করে নষ্ট করেছ বল তো?

নিখিলেশ বললে—কিন্তু তুমি যদি একজন বাইরের মানুষকে বাড়িতে এনে না তুলতে তো আমি কি মদ খেতুম?

নয়নতারা বললে—তা আমি না-হয় একটা লোককে অসুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে টাকা নষ্ট করেছি, আর তুমি? তুমি ওই বিষগুলো কী বলে খেলে? দুটো জিনিস কি এক হলো?

নিখিলেশের হঠাৎ বোধহয় জ্ঞানোদয় হলো। সে এবার নিজেকে সামলে নিলে। বললে—যাক্ যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না। কপালে ছিল টাকা গচ্চা যাওয়া, গচ্চা গেছে। এখন যে বুঝতে পেরেছ এইটুকুই যথেষ্ট—এখন কী করা যায় তাই ভাবা যাক—

সেই কথা ভাবতে ভাবতেই দুজনের অনেক দিন চলে গেল। অফিসে যাওয়ার পথে শুধু পরামর্শ আর পরামর্শ। টাকার চুলচেরা হিসেব চলতে লাগলো। একটু খরচ কমাতে হবে। খরচ কমালেই টাকা জমে যাবে।

নয়নতারা বললে—আমি যত কম খরচে চালাই আর কোনও মেয়ে তেমন করে চালাতে পারবে না। আমাদের অফিসের বন্ধুরা সবাই আমার চেয়ে দামী-দামী শাড়ী পরে তা জানো?

নিখিলেশ বললে—তাহলে আমিই কী মনে করো দামী-দামী সুট্ পরি?

নয়নতারা বললে—তাহলে খরচ কমানোর কথা বলছো কেন আমাকে? আমি কি কোনও দিন একটা পয়সা বাজে-খরচ করেছি?

নিখিলেশ বললে—আঃ, তুমি রাগ করছো কেন? আমি কি সে-কথা বলেছি তোমাকে?

নয়নতারা বললে—কেন, তুমি নিজেও তো দেখেছ রাস্তায় মেয়েরা আজকাল কত দামী-দামী শাড়ি-ব্লাউজ-গয়না পরে যাচ্ছে। আর কারো বউ এমন কম খরচে সংসার চালাতে পারবে? আমি বাজি রাখতে পারি—

নিখিলেশ বললে—তুমি রাগ করছো কেন?

নয়নতারা বললে—তাহলে এবার থেকে সংসার খরচের হিসেব আমি আর রাখবো না; তুমিই রাখো—

পরামর্শ করতে করতে এমনি করে পরামর্শের নৌকো ঝগড়ার চোরাবালিতে গিয়ে আটকে যায়, তখন পরামর্শ আর বেশিদূর এগোয় না। অথচ এক ছাদের তলায় এক বাড়িতে দুজনে বসবাস করে, একই সঙ্গে দুজনে অফিসে যাতায়াত করে। কিন্তু ছট্ফট করে দু'জনেই। দু,জনেরই মনে হয় আরো বেশি টাকা হলে ভালো হয়, আরো বেশি টাকা হলে জীবনটা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়, সুখের হয়, আরামের হয়।

কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে আরো বেশি টাকা আয়ের সুরাহা হয় না।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে পৃথিবী যেন সেই টাকার খেলাতেই হঠাৎ উন্মাদ হয়ে উঠলো। আগে টাকা চাইতো কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়, টাকা চাইতো নরনারায়ণ চৌধুরীরা, টাকা চাইতো পুলিসের বড়বাবু সুশীল সামন্তেরা, আর তার সঙ্গে মুষ্টিমেয় কিছু লোক টাকা চাইতো। যেমন চাইতো মানদা মাসীরা আর প্রকাশ রায়েরা।

টাকার জন্যে নরনারায়ন চৌধুরীরা একদিন কালীগঞ্জের জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রীর সম্পত্তি যে গ্রাস করেছিলেন সেটা স্বাভাবিক। কারণ জমিদারে জমিদারে রেষারেষি আর প্রতিযোগিতার যুগ সেটা। তখন রাজা-মহারাজা-জমিদারের টাকার নেশা ছিল সমাজের ওপর-মহলের নেশা। তাতে প্রজাদের ক্ষতিবৃদ্ধির কথা উঠতো না। ওপরওয়ালারাই ছিল মুখ্য, প্রজারা গৌণ। প্রজাদের কাজ ছিল সহ্য করা। ওপর-ওয়ালাদের পীড়ন মাথা পেতে নেওয়া, আর সব অত্যাচার আর পীড়ন সহ্য করার পেছনে ছিল ধর্মের অনুশাসন। ধর্ম বলতো—ইহকালের ধর্মপথে থাকো তাহলে পরলোকে তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস হবে—

কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকরাও টাকা চেয়েছে। কিন্তু সে টাকা-চাওয়া তাদের নেহাৎ পেট চালাবার জন্যে। পেট চালাবার বাইরে যে টাকার ব্যবহার তা তারা জানতো না। তার স্বপ্নও তারা কখনও দেখতো না। তারা জানতো না যে সে টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে তা সুদে বাড়ে। জানতো না সুদের তা দিয়ে দিয়ে একশো টাকাকেই আবার এক-হাজার টাকা করা যায়! জানতো না সেই এক-হাজার টাকাকেই আবার একদিন আরো ভালো করে তা দিলে সেটা দশ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। তারা জানতো শুধু জমি, কিম্বা জানতো শুধু বাঁধা একটা চাকরি। সেটা পেলেই তোমাদের সব পাওয়া হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যেবেলা নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলায় বসে বসে রাত জেগে কবির লড়াই শোন, যাত্রার পালায় রাম সেজে অভিনয় করো কিম্বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাস খেলে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিয়ে রাতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও।

কিন্তু জানতে পারলো যুদ্ধের পর। ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন জানতে পারলো, ওই যাত্রা, কবির লড়াই, তাস খেলা ও-সব কিছু নয়। জানতে পারলো ওই রামায়ণ পাঠ, পরলোক-টোক কিছু নয়। আমরা যখন ওই সব নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম তখন অন্য লোকেরা বেশ কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। কেউ যুদ্ধের ঠিকেদারি করেছে, কেউ চালের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়েছে, কেউ বা ওষুধের ভেজাল দিয়েছে। সবাই চোখ মেলে দেখল তামাম দুনিয়াটার চেহারা রাতারাতি বদলে গিয়েছে। সবাই যে কখন কাজ গুছিয়ে নিয়েছে তা কেউ টের পায় নি। আগে একজন কপিল পায়রাপোড়া ছিল, তখন লক্ষ লক্ষ কপিল পায়রাপোড়া জন্মেছে। লক্ষ লক্ষ মানিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকরা কর্তাবাবুদের অত্যাচারে মাথা নোয়াবে না ঠিক করে ফেলেছে। তারা বলতে আরম্ভ করেছে—আমাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে, আমরাও বাঁচতে চাই, জমির ফসলের ভাগ চাই আমরা, জীবনধারণের জন্যে আমরা আরো টাকা চাই—

আর একদিকে কলকাতার অফিসের ক্লার্ক নিখিলেশ আর নয়নতারা, তারাও বলছে—আমরা আর গরীব হয়ে থাকবো না, আমাদের আরো টাকা চাই—

সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষও তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তখন বলতে শুরু করেছে—আমরা আরও একটা চাই—

এদিকে সদানন্দর তখন কোনও দিকে চেয়ে দেখবারও সময় নেই। সমস্ত কিছু দেখা যেন তার শেষ হয়ে গেছে। সেই কবে একদিন নবাবগঞ্জ থেকে সে তার জীবন-পরিক্রমা শুরু করেছিল, সেই তখনই সে দেখেছিল বাড়িতে কে একজন বিধবা বুড়ি আসে আর কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে বলে—আমার টাকা দাও, আমার টাকা চাই—

তারপর প্রকাশ মামার সঙ্গে যখন রাণাঘাটের রাধার বাড়িতে যেত, সেখানে গিয়েও দেখতো রাধা প্রকাশ মামাকে বলতো—আমার টাকা চাই—

আর তারপর সেই পুলিসের থানা। সেই সেখানেও তো টাকা। প্রকাশ মামা টাকা দিলে বলেই তো সেদিন সে ছাড়া পেলে!

সমস্ত সুলতানপুরময় হঠাৎ রটে গেল যে চৌধুরী মশাই-এর ছেলে এসেছে।

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি দৌড়তে দৌড়তে কাছারি বাড়িতে এসে হাজির। খবরটা ভীম বিশ্বাসও পেয়ে গিয়েছিল। আশু চক্কোত্তি তখন মাঠে গিয়েছিল। সেখান থেকেই সে একেবারে সোজা চলে এসেছে।

প্রকাশ রায় সদরবাড়িতেই সবাইকে ঠেকালো।

বললে—না বাপু এখন দেখা হবে না। এখন সদার শরীর খারাপ—

ভীম বিশ্বাস বললে—আমি তো তাকে বিরক্ত করবো না রায় মশাই, আমি শুধু একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখবো—

প্রকাশ রায় ধমকে উঠলো—চোখের দেখা দেখে কী হবে শুনি? সে কী বাঘ না, ভাল্লুক যে চোখে দেখবে? আমাদেরই মতন দুটো হাত দুটো পা, দেখবার কী আছে?

অশ্বিনী ভট্টাচার্যি বললে—তা আমাদের কথা বলেছেন তো তাঁকে আজ্ঞে? আমার মেয়ের বিয়ের কথা?

—বলেছি, বলেছি, সব বলেছি। সবাই টাকা পাবে। তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা, ভীম বিশ্বাসের টাকা, আশু চক্কোত্তির টাকা। সবাইকে টাকা দেওয়া হবে—

খুব পাহারা দিয়ে রাখতে হলো সদাকে। কেউ না ভালোমানুষ পেয়ে শেষকালে আবার কিছু লিখিয়ে নেয়। লিখিয়ে নিলেই হোলো। সদা যেমন ছেলে হয়ত সকলেরই অভাব-অভিযোগের কথা শুনে জল হয়ে গেল আর সামনে যাকে পেলে তাকেই সব টাকা দিয়ে দিলে।

প্রকাশ মামা সমস্ত দিনই সদানন্দকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখে। কোথাও বোরোতে দেয় না।

বলে—না রে, তোর টাকার কথা শুনে সুলতানপুরের লোক সবাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন হয়ত তোকে কিছু খাইয়ে-টাইয়ে দেবে।

সদানন্দ বুঝতে পারে না। বলে—কী খাইয়ে দেবে?

প্রকাশ মামা বলে—আরে কত কী খাইয়ে দিতে পারে তার কী ঠিক আছে? সুলতানপুরের মানুষ সব পারে। এদের তুই চিনিস না, এরা বিষও খাওয়াতে পারে—

বিষ?

—হ্যাঁ রে, বিষ! টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে। তোর টাকা হয়েছে এ তো এখানকার সবাই জেনে গেছে কি না!

তা সাবধানের মার নেই। যখন যেখানে সদানন্দকে নিয়ে যায় চারিদিকে পাহারা দিয়ে রাখে। একবার উকিলের কাছে, একবার কাছারিতে, একবার রেজিষ্ট্রি অফিসে। গভর্মেণ্টের টাকা পেতেও কী কম ঝঞ্ঝাট! সাক্‌সেশান সার্টিফিকেট নিতেও ক'দিন সময় নষ্ট হয়ে গেল।

প্রকাশ মামার সঙ্গে সদানন্দ বেরোয় আর প্রকাশ মামার সঙ্গেই বাড়ি ফিরে আসে। প্রকাশ মামার তখন নাইবার খাবার সময় নেই। তার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন ওঁৎ পেতে আছে। একবার গভর্মেণ্টের ঘর থেকে টাকাটা পেলে তবেই নিশ্চিন্দি।

কাগজপত্র সব আস্তে আস্তে যোগাড় হয়ে গেল। প্রকাশ মামা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলো—হে মা কালী, আর একটা দিন, আর একটা দিন বাঁচিয়ে রেখো মা, সব যেন ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যায়। টাকাটা পেলে আমি ঘটা করে তোমার পূজো দিয়ে দেব মা—

সব যখন চুকলো তখন প্রকাশ মামা সদানন্দর সামনে একটা কাগজ ফেলে দিয়ে বললে—এইবার এখেনে একটা সই করে দে তুই—

সদানন্দ কাগজটা দেখলে। ওপরে কত টাকার যেন স্ট্যাম্প লাগানো।

জিজ্ঞেস করলে—এটা কিসের কাগজ?

প্রকাশ মামা বললে—আরে এটা কিছু না, তুই যে আমাকে টাকাগুলো দিলি, তারই দানপত্র আর কী! এ-এমন কিছু হাতী-ঘোড়ার ব্যাপার নয়, এক মিনিটেই আমি ঠিক করে নেব। আমার উকিল ড্রাফট্ করে দিয়েছে—তোর কিছ্ছু ভাবনা নেই, শুধু তুই সইটা করে দে—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমি সই করবো কেন?

প্রকাশ মামা বললে—কেন, সই করতে তোর আপত্তিটা কী? তুই তো টাকাগুলো সব আমাকেই দিয়ে দিবি? তোর তো আর টাকার দরকার নেই রে—

সদানন্দ বললে—না, টাকার দরকার আছে আমার—

—সে কী রে? তোর আবার টাকার কিসের দরকার?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, টাকার দরকার আছে আমার—

প্রকাশ মামার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বার উপক্রম করেছে। সদানন্দর মুখের দিকে সে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, সত্যিই তোর টাকার দরকার? তুই তো বিয়েও করবি না, সংসারও করবি না, তোর এত টাকার দরকার কীসের?

ততক্ষণে চেক-পাসবই আরো অনান্য কাগজপত্র তৈরি হয়ে গেছে। সদানন্দ সেগুলো নিয়ে পকেটে পুরে ফেললে।

বললে—না প্রকাশ মামা, সংসার না-ই বা করলুম, আমার সত্যিই অনেক টাকার দরকার আছে—

—তা কত টাকার দরকার?

সদানন্দ বললে—সব টাকাটাই আমার দরকার...

বলে ব্যাঙ্ক থেকে রাস্তায় বেরিয়ে সোজা চলতে লাগলো। প্রকাশ মামার তখন পাগলের মত অবস্থা। সেও পেছন-পেছন চলতে চলতে বলতে লাগলো—ওরে, আমি যে তোর জন্যে এত করলুম, আমার কথা তুই একবার ভাববি না? আমি খবর না দিলে তো তুই টাকার কথা জানতেও পারতিস না—

কিন্তু সদানন্দ সে-কথায় কান দিলে না। সে যেমন যাচ্ছিল, তেমনিই চলতে লাগলো।

সেদিন শীতেশ বোস অন্য পরামর্শ দিলে।

নিখিলেশ ক'দিন ধরেই বলছিল ব্যবসা করবার কথা। অল্প মূলধনে একটা কিছু ব্যবসা না করলে চিরকাল এই কেরানীগিরি করেই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে।

নিখিলেশ একদিন শীতশকে বললে—ভাবছি মেয়েদের একটা বোর্ডিং হাউস করবো, ওতে খুব লাভ—

শীতেশ সব শুনে বললে—না হে, ওতে বেশি লাভ নেই। একটা ব্যবসায় খুব লাভ আছে যদি করত পারো!

—কীসের ব্যবসা!

শীতেশ বললে—মেয়েমানুষের ব্যবসা!

নিখিলেশ চমকে উঠেছে। বললে—সে কী সে আবার কী রকম ব্যবসা?

শীতেশ বললে—আজকাল শহরকে তো আর চিনলে না হে, কত লোকে কত ধান্ধায় চারদিকে ঘুরছে। পয়সা এখানে উড়ছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো—

নিখিলেশ বললে—মেয়েদের বোর্ডিং-হাউস তো অনেকে করেছে, আর নতুন কী ব্যবসা আছে?

শীতেশ বললে—ঠিক আছে, রবিবার দিন তোমার সময় আছে? আমার বাড়িতে আসতে পারবে?

—খুব পারবো।

—তাহলে তাই এসো। তোমাকে একেবারে, সরেজমিনে কারবারটা দেখিয়ে দেব—

পরের দিনই রবিবার। বিকেলবেলার দিকে নিখিলেশ বেরিয়ে পড়লো।

নয়নতারা জিজ্ঞেস করলে—কখন ফিরবে?

নিখিলেশ বললে—চেষ্টা করবো শিগ্‌গির ফিরতে—

বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। শীতেশ তৈরিই ছিল। নিখিলেশকে নিয়ে কালীঘাটের বাসে উঠলো। উঠে দু'খানা কালীঘাটের টিকিট কাটলো।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলে—কালীঘাটে কোথায় কোথায় যাচ্ছো? মন্দিরে নাকি?

শীতেশ বললে—আরে চলো না, ব্যবসা করতে নামছো, অত ভয় করলে চলে? ব্যবসার জন্যে মানুষ আজকাল জাহান্নামে যেতেও তৈরি, তা জানো?

একটা জায়গায় নেমে শীতেশ ভিড়ের মধ্যে হন হন করে চলতে লাগলো। নিখিলেশও চলতে লাগলো পেছন-পেছন। মানুষের ভিড়ে জায়গাটা তখন বেশ সরগরম হয়ে আছে। এদিকে আগে কখনও আসেনি নিখিলেশ।

একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে শীতেশ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। কয়েকজন মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেজেগুজে সেদিকে না চেয়ে শীতেশ ডাকতে লাগলো—মানদা মাসি আছো নাকি গো—ও মানদা মাসি—

নিখিলেশ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। চারদিকের আবহাওয়া দেখে তার অবাক লাগছিল তখন। এও তো একরকমের ব্যবসা। শীতেশকে বললে—চলো শীতেশ, চলে যাই—

শীতেশ বললে—না না, যেও না হে, ব্যাপারটা দেখেই যাও না। ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা। সংসারে টাকা উপায় করবার কত রকমের পথ আছে সেটা দেখা ভালো।

আসলে মানদা মাসির কপাল ভালো না নিখিলেশের কপাল ভালো তা কে বলতে পারে। কে বলতে পারে কোন যোগসূত্রে জড়িয়ে গিয়ে কার ভাল হয় আর কারই বা মন্দ হয়। নিখিলেশ সামান্য একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধোত্তর যুগের অসহিষ্ণু সমাজের একজন প্রতিনিধি সে। শুধু মোটা ভাত আর মোটা কাপড় পেলে তার চলবে না। সুস্থ স্বাভাবিক সহজ জীবনের শান্তিতে তার তৃপ্তি নেই। সে অল্প-পাওয়ার দুঃখকে অতিক্রম করবার জন্যে বেশি-পাওয়ার অশান্তি মাথায় তুলে নিতেও প্রস্তুত। ত্যাগের উপদেশ তার পক্ষে মৃত্যু, ভোগটাই তার কাছে চরম সত্য। ভোগের উপকরণ যোগাড় করতে সে জীবন বলি দিতেই পেছপাও নয়। তার ধারণা হলো ভোগই যদি না করতে পারলুম তো বেঁচে আছি কেন? আর ভোগ করতে গেলেই চাই টাকা? সেই টাকা যদি রাস্তার ধারের নর্দমাতেও পড়ে থাকে তো তা কুড়িয়ে নিতে আপত্তি করবো কেন? আসলে পুণ্যের টাকা আর পাপের টাকার মধ্যে তো কোনও তফাৎ নেই। টাকার গায়ে লেখাও থাকে না ওটা কীসের টাকা! সুতরাং টাকা চাই।

শীতেশ বোধ হয় ও-পাড়ার নিয়মিত যাত্রী। অন্তত তার হাবভাব দেখে নিখিলেশের

তাই-ই মনে হলো। বস্তিবাড়ির সবাই-ই তাকে চেনে। মানদা মাসির সঙ্গেও তার খুব ঘনিষ্ঠতা আছে তার নমুনাও পাওয়া গেল।

মানদা মাসি নিখিলেশকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে?

শীতেশ বললে—আমার বন্ধু আমরা এক অফিসে কাজ করি—

মানদা মাসি বললে—তা তো বুঝলুম, তা তোমার সঙ্গে কেন? একলা আসতে ভয় পায় বুঝি?

শীতেশ বললে—না, আরে তা না, সবারই কি আর আমার মত ক্যারেক্টার? তুমি ভাবো কী? কলকাতায় কি ভালো লোক নেই?

মানদা মাসি বললে—আমাকে আর ভালো লোক দেখিয়ো না বাবা। আমি সব দেখে নিয়েছি। ফরসা জামা-কাপড় পরা লোকও দেখলুম, আবার কুলি-কাবারি-মজুরদেরও দেখলুম। আমার কাছে সবাই লক্ষ্মী। খদ্দের মাত্তোরই হলো লক্ষ্মী। কারবার করতে যখন নেমেছি তখন অমন বাছ-বিচার করলে তো চলবে না আমার, আগে দেখবো তোমার ট্যাঁকে টাকা আছে কিনা! টাকা থাকলে তুমি ভালো আর টাকা না থাকলে তুমি খারাপ। সোজা কথা আমার কাছে—হ্যাঁ!

শীতেশ বললে—তা তুমি বলছিলে না তোমার টাকায় টান পড়েছে?

—টান তো পড়েছেই বাবা! টাকার আমার বড্ড টানাটানি পড়েছে—একদিন খদ্দেরের ভিড়ে আমার বাড়িতে কাগ-চিল বসতে পেত না, সেই আমার বাড়ির দিকে এখন শ্যাল-কুকুরেও ফিরে তাকায় না, এমনই হাল হয়েছে। মেয়েগুলো খেতে পাচ্ছে না পেট পুরে, দুঃখের কথা তোমাকে আর কী বলবো—

শীতেশ জিজ্ঞেস করলে—তা এ-রকম কেন হলো মাসি? কলকাতায় মানুষগুলোর ক্যারেকটার কি রাতারাতি সব ভালো হয়ে গেল? নাকি পুলিসের হয়রানি?

মানদা মাসি বললে—পুলিস তো আমার হাতে ! পুলিসের বড়বাবু তো আমার হাত-ধরা, তা তো তুমি জানো বাবা। সে হলে এক কথায় আমি সকলকে ঠাণ্ডা করে দিতুম। আসলে আমার টাকার অভাব হয়ে পড়েছে। আমি যদি এ-কারবারে কিছু টাকা ঢেলে সাহেব-পাড়ায় একটা বড় বাড়ি নিতে পারতুম তো আমার টাকা খায় কে? কিন্তু তা তো হচ্ছে না—

শীতেশ নিখিলেশকে দেখিয়ে বললে—সেই জন্যেই তো আমার বন্ধুকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি মাসি,-যে কোনও কারবারে এ টাকা খাটাতে চায়—

এতক্ষণে যেন মানদা মাসির হুঁশ হলো। নিখিলেশের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। বললে—কী কারবারে টাকা খাটাবেন?

বলে যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। বললে—তোমরা চা-টা কিছু খাবে বাবা?

নিখিলেশ বললে—না না, ব্যস্ত হতে হবে না। আপনার ব্যবসা কেন ভালো চলছে না তাই বলুন। এত লাভের ব্যবসাতে কিনা লোকসান হচ্ছে!

মানদা মাসি বললে—দুঃখের কথা বলবো কি বাবা, এ-ব্যবসায় আসলে লোকসান নেই, কিন্তু তবু লোকসান হচ্ছে আমার, হচ্ছে টাকার অভাবের জন্যে। টাকা যদি পেতুম কিছু তো দেখিয়ে দিতুম কাকে বলে ব্যবসা। এ-ব্যবসায় যদি হাজার দশেক টাকা ঢালতে পারতুম আমি তো আজ পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকতে পারতুম—

এতক্ষণে নিখিলেশ কথা বললে। বললে—দশ হাজার টাকা পেলে আপনি কী করবেন?

—কী করবো? তা হলে বলি শোন, আমি তাহলে সাহেব পাড়ায় পাঁচশো টাকায় একটা বাড়ি ভাড়া করবো প্রথমে। দু'খানা ঘর হলেই আমার আপাতত চলবে, আর দুটো মেয়ে।

তা সে মেয়ে আমি নিজে যোগাড় করবো, তার জন্যে ভাবনা নেই। আজকাল ভালো-ভালো ভদ্দর ঘরের মেয়ে এ-লাইনে নামতে চায়, কিন্তু আমার এই বস্তি-বাড়ি দেখে তারা আসতে চায় না, পিছিয়ে যায়। সাহেবপাড়ায় ব্যবসা করলে আমি ঘণ্টা পিছু রেট বেঁধে দেব। তখন এত পয়সা আসবে সে পয়সা রাখবার জায়গা থাকবে না আমার—

নিখিলেশ বললে—আর এ-কারবারে তো আপনার ট্যাক্স দিতে হয় না—

—ট্যাক্সো? কীসের ট্যাক্সো?

নিখিলেশ বললে—ইনকাম ট্যাক্সের কথা বলছি—

মানদা মাসি বললে—না বাবা, এতদিন কারবার করছি ট্যাক্সো-ফ্যাক্সো কখনও দিই নি, ট্যাক্সো আবার কাকে দেব? যাদের ট্যাক্সো দেব তারাই তো আমার খদ্দের বাবা, তা সেদিন একটা লোক এসেছিল, আমার বহুদিনের খদ্দের, সে এসে বলে গেল সে নাকি তার ভগ্নীপতির আট লাখ টাকা পাচ্ছে, ভাবলাম তাকে বসিয়ে খাতির-টাতির করে তাকে বলবো এ কারবারে কিছু ঢালতে, তা সে কিছু বলবার আগেই পালিয়ে গেল—

—পালিয়ে গেল মানে?

মানদা মাসি বললে—পালিয়ে গেল মানে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল! ভাবলে আমি তার টাকাগুলো বুঝি কেড়ে নেব। অবাক কাণ্ড বাবা, আমি তো বাবা, দেখে অবাক! ব্যবসা করতে গেলে টাকা নিতে হয় না? আমি তোমার টাকা খাটিয়ে যদি কারবার বাড়াতে পারি তো ক্ষেতিটা কী? সুদও দিতে পারি, আর নয়তো আধা-আধি বখ্‌রা। আদ্দেক বখ্‌রা যদি দিই তাহলে তো ফেলে-ছড়িয়ে মাসে মোটা লাভ থাকবে। তেমন করে মন দিয়ে দেখলে হিসেব ঠিকমত রাখলে এ-কারবারে তো লোকসান নেই বাবা। এতে সবটাই লাভ।

তারপর নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কত টাকা ঢালতে পারবে বলো তো বাবা ঠিক করে?

শীতেশ সে-কথাটা ঘুরিয়ে দিলে। বললে—তোমার সেই বড়বাবু কোথায় গেল? সেই পুলিসের বড়বাবু?

মাসি মুখ বাঁকালো। বললে—তাঁর কথা আর বোল না বাবা, আমি টাকার আশায় তার বাড়িতে গিয়েও ধর্না দিয়ে পড়েছিলুম। টাকার জন্যে আমি তার কী না করেছি। তার মেয়েমানুষের পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছি—

—তবু তোমায় টাকা দিলে না?

—না বাবা, তাই তো আমি মনের দুঃখে সেখান থেকে চলে এসেছি। আমার কপাল বাবা, সবই আমার কপাল! অথচ আমি কি টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতুম? আমি অমন বাপের জন্মিত্ নই বাবা! আমি বামুনের বংশের মেয়ে, গেরোয় পড়ে আমাকে আজ এই কারবার করতে হচ্ছে! কিন্তু তুমি তো জানো বাবা, আমি তোমাদের কখনও ঠকিয়েছি? কেউ বলতে পারে আমি কখনও মালের সঙ্গে এক ফোঁটা জল মিশিয়েছি!

তারপর আবার নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললে—তা তোমার মূলধন কত খাটাবে তা তো কই বললে না বাবা?

কিন্তু এ-কথার জবাব নিখিলেশকে দিতে হলো না। জবাব দিলে শীতেশ। বললে—টাকা তো এর অনেক আছে, এর বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে। কিন্তু ব্যবসায় নামবার আগে আট-ঘাট বেঁধে নামতে হবে তো। লোকসান যাতে না হয় সেটা তো আগে দেখতে হবে—

মাসি বললে—তোমায় তো আগেই বলেছি বাবা যে এ-কারবারে লোকসান বলে কিছু নেই। কলকাতা থেকে বিলিতি সাহেবরা এখন চলে গেছে, এখন দিশী সাহেবদের হাতে অনেক টাকা এসেছে। তাদের ছেলেরা এখন উড়তে শিখেছে, তেমন ভালো পাড়ায় একটা

বাড়ি নিতে পারলে তাদের কল্যাণে ফুলে ফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে উঠবে। সে-সব আমার ওপরে ছেড়ে দাও—আমি এতদিন এই কারবার করছি, আমি জানি না কত চালে কত খুদ!

শীতেশ উঠলো, বললে—ঠিক আছে মাসি, আমি আর একদিন আসবো, এখন আসি—

মাসি বললে—সে কী বাবা, তোমরা বসবে না?

নিখিলেশ বললে—না মাসি, দুপুরবেলা আর বসবো না। আর একদিন সন্ধ্যের ঝোঁকে বরং আসবে—কারবারের হাল্‌চাল্ তো সব জানা হলো, এখন এ ভাবুক—

মাসি দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে এল। বললে—ভাববার কিছু নেই বাবা, আজকাল এ-ব্যবসায় বড় বড় লোক সব নামছে, দেখছো না বাবা, চারদিকে পাড়ায়-পাড়ায় কত 'ম্যাসাজ ক্লিনিক' গজিয়ে উঠছে—

—ম্যাসাজ ক্লিনিক?

মাসি হেসে বললে—হ্যাঁ বাবা, ওই সব ইনরিজি নাম দিয়েছে। তা ইনরিজি নাম দিলে কী হবে, আসলে আমার ব্যবসাও যা ও-ও তো তাই বাবা, ইনরিজি নাম দিলে কি আর গায়ের গন্ধ যাবে?

ততক্ষণে রাস্তায় এসে পড়েছিল দু'জন। বাইরে এসেই শীতেশ বললে—কী রকম মনে হলো ব্রাদার?

নিখিলেশ হাসলো। বললে—ভাবছি শেষকালে কিনা এই কারবারে নামবো!

শীতেশ বললে—কেন? নামতে দোষ কী? আমার যদি ছেলে-মেয়ে বউ থাকতো তো আমি নিজেই এই ব্যবসাতে নামতুম। সত্যিই তো, চারদিকে এত 'ম্যাসাজ ক্লিনিক' হয়েছে তাকে তো কেউ খারাপ বলে না! টাকা হলে তখন কি আর তোমার গায়ে লেখা থাকবে যে এটা ম্যাসাজ ক্লিনিকের টাকা না লোহা-লক্কড়ের টাকা?

নিখিলেশ বললে—না, তা নয়। ভাবছি আমার গিন্নী শুনলে কী বলবে!

শীতেশ বললে—খবরদার, খবরদার এসব কথা তাকে বলো না হে। এ-সব ব্যাপার মেয়েদের বলতে নেই। আমি বিয়ে করিনি, কিন্তু বলতে পারি কোন্‌টা পরিবারকে বলতে আছে আর কোন্‌টা বলতে নেই—

—কিন্তু এতদিন-না-একদিন তো জানতে পারবেই।

—তুমি নিজে না বললে কী করে জানতে পারবে? মেয়েমানুষরা টাকা পেলেই খুশী! কোত্থেকে টাকা আসছে সে-কথা জানতে চাইবে না তারা।

নিখিলেশ বললে—আমার গিন্নী আবার সে-রকম নয় ভাই। ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল। এক একদিন আমার সঙ্গে এমন রাগারাগি করে যে কী বলবো! অথচ কলকাতায় তার বাড়ি করার খুব শখ। আমারও শখ, তারও শখ—

শীতেশ বললে—সকলেরই তাই।

নিখিলেশ বললে—কিন্তু কলকাতায় বাড়ি করতে গেলে টাকা খরচ তো কমাতে হবে। সেটা পারে না। নইলে এতদিনে আমার অনেক টাকা জমে যেত ভাই! ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বলে তো এখন আমাদের কিছুই নেই।

শীতেশ বললে—এখন থেকে জমাতে চেষ্টা করো তাহলে। তোমরা নেশা-ভাঙও করো না, কিছুই না, তাহলে দু'জনের মাইনের টাকাটা যায় কোথায়?

—সে ভাই একজনের অসুখে সব জমানো টাকা খরচ হয়ে গেল।

—অসুখ? কার? তোমাদের আবার কে আছে?

নিখিলেশ বললে—আমাদের নিজের কেউ না।

—নিজের কেউ না তো তার অসুখে তোমরা টাকা খরচ করতে গেলে কেন?

—সেও কপাল। আমার স্ত্রীকে বিয়ের সময় একটা সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছিলুম, সেটা পর্যন্ত বাঁধা পড়ে গেল, আর ছাড়াতে পারলাম না। খরচ যে কোথা দিয়ে কী ভাবে কী উপলক্ষে হয়ে যায় কিছুই বুঝতে পারি না। অথচ রোজ কালিয়া-পোলাও খাই তাও নয়। এখন আমি দোষ দিই গিন্নীকে, আর গিন্নী দোষ দেয় আমাকে। তাই তো ঠিক করেছি চাকরি করে কিছু হবে না—

ততক্ষণে শেয়ালদ' স্টেশনে এসে গিয়েছিল দুজন। শীতেশ বললে—আজকে একটু হবে নাকি?

নিখিলেশ বললে—না হে, ও-সব আর ছোঁব না—

—কেন? কী হলো আবার?

নিখিলেশ বললে—আমার স্ত্রী ঠাকুরের নাম করে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে জীবনে আর কখনও মদ-টদ যেন না ছুঁই—

শীতেশ বললে—এই জন্যেই তো আমি বিয়ে করি নি ভাই, বিয়ে করলে আমিও তোমার মত বউ-এর ভেড়ুয়া হয়ে যেতুম—

তারপর আর দাঁড়ালো না শীতেশ। সে তার নিজের গন্তব্যস্থানে চলে গেল।

বাড়িতে নয়নতারা নিখিলেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। নিখিলেশকে দেখেই—জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কিছু ঠিক করলে?

নিখিলেশ বললে—না—

—কেন? এতক্ষণ তা হলে কী করলে? কোথায় গেলে?

—গেলাম তো অনেক জায়গায়, কিন্তু আসলে তো টাকা! পাঁচ হাজার টাকা না হলে কোনও ব্যবসাতেই নামা যায় না। টাকাটা কোথায় পাবো?

কথাটা দুজনেরই জানা ছিল। টাকা না হলে যে কিছু হয় না এটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। তবু নিখিলেশের একটা ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত শীতেশ এমন একটা পথ বলে দিতে পারবে যাতে কম টাকা লাগে। শীতেশ কলকাতায় থাকে, কলকাতাতেই জন্মেছে, সে অনেক লোককে চেনে। এককালে শীতেশদের অবস্থা ভালো ছিল। ভাইরাও বড়লোক। কেবল সে-ই একলা আলাদা হয়ে আছে, আর চাকরি করে যা উপায় করে তা দু' হাতে উড়িয়ে দেয়। নিজে বড় হয়নি, বড় হতে তার ইচ্ছেও নেই।

নয়নতারা বললে—কিন্তু টাকা তো ধারও পাওয়া যায়—

নিখিলেশ বললে—তাও তো ভেবেছি, কিন্তু শেষকালে যদি ব্যবসাতে লোকসান যায়? তখন যে একুল-ওকুল দু'কুল যাবে! তার চেয়ে আগে বরং ভেবে-চিন্তে নামাই ভালো—

—তা হলে কীসের ব্যবসা করবে?

নিখিলেশ বললে—সে না-হয় ভেবে-চিন্তে একটা বার করা যাবে, কিন্তু টাকাটা কোথায় পাবো তাই আগে ভাবছি—

—ধরো আমার গয়নাগুলো যদি বেচে দিই তো কত টাকা আসবে?

—তুমি গয়না বেচে দেবে! যে গয়নাটা স্যাকরার দোকানে বাঁধা রয়েছে সেটাই তো এখনও ছাড়িয়ে আনা হলো না—

নয়নতারা বললে—টাকা হলে আবার গয়না হবে, কিন্তু এখন তো কাজে লাগুক, আমাদের অফিসের মালা বোসও তো প্রথমে গয়না বিক্রি করে দিয়েছিল। এখন আবার নতুন-গয়না কিনে নিয়েছে—

কিন্তু গয়না বলতে নয়নতারার আছেই বা কী? চার গাছা করে চুড়ি দু'হাতে আর একখানা সরু চেন-হার। সব মিলিয়ে বড় জোর তের-চোদ্দ ভরি। একশো দেড়শো টাকা করে সোনার ভরি। বেচলে দেড় হাজার টাকাও হয়ত পাওয়া যাবে না। অথচ বিয়ের সময় কত সোনা ছিল তার! শ্বশুর একটা হীরের সীতাহার দিয়ে তার মুখ দেখেছিল। শাশুড়ীও দিয়েছিল একজোড়া জড়োয়ার বালা। হীরে-পান্না সেট্ করা। আরো কত গয়না পেয়েছিল, তার কি আর হিসেব আছে! সেদিন কি নয়নতারা জানতো যে সে আবার বিয়ে করবে! আবার সংসার হবে তার! সে কি জানতো যে তাকে চাকরি করতে হবে কোনও দিন? নাকি জানতো যে পাঁচ হাজার টাকার জন্যে আবার একদিন তার গয়না বাঁধা দেবার দরকার হবে!

সকালবেলা নিখিলেশ ঘুম থেকে উঠতেই নয়নতারা বললে—আচ্ছা সেদিন তুমি নবাবগঞ্জে গেলে তো আমার গয়নাগুলো চাইলে না কেন?

নিখিলেশের মনে ছিল না। বললে—আমি নবাবগঞ্জে গেলুম! কবে?

—বাঃ, তোমার মনে নেই? তুমিই তো বললে তুমি নবাবগঞ্জে গিয়েছিলে। তোমাকে দেখে সে আমার কথা জিজ্ঞেস করলে—

এতক্ষণে মনে পড়লো নিখিলেশের। সে যে মিথ্যে কথা বলেছিল সেটা তার মনে ছিল না।

বললে—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলেই তো। জিজ্ঞেস করলে নয়নতারা কেমন আছে!

—তা তুমি কী বললে?

—কী আর বলবো! বললুম তুমি ভালো আছো!

—তারপর?

—তারপর আর কী! মনে হলো বাড়ির ভেতরে বোধ হয় লুচি-ভাজাটাজা হচ্ছে।

নয়নতারা বললে—তা তখন আমার গয়নার কথাটা তুললে না কেন? বললে না কেন যে নয়নতারার গয়নাগুলো দিন—

নিখিলেশ এর জবাবে কী বলবে তা বুঝতে পারলে না। একটু ভেবে নিয়ে তখনই বললে—সেটা আমি বলবো ভেবেছিলুম কিন্তু আবার ভাবলুম শেষে যদি কিছু অপমান করে। গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাবো?

নয়নতারা বললে—বা রে, ও তো আমারই জিনিস, আমার বিয়ের সময় ও-সব তো আমাকেই দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং ওটা তো আমারই প্রাপ্য!

নিখিলেশ বললে—দেখ, একবার গয়না চেয়ে আমি যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি, তার পর আর কোন্ সাহসে চাই? তাই আর আমি কিছু বললাম না, যেমন গিয়েছিলুম তেমনি আবার চলে এলুম—

নয়নতারা বললে—তা আমার গয়না চাইতে যদি তোমার এতই লজ্জা তো আমিই যাবো, আমি নিজে গিয়ে আমার গয়নাগুলো চেয়ে আনবো—

—তুমি যাবে?

নিখিলেশ মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। যদি সত্যি সত্যিই নয়নতারা নবাবগঞ্জে যাবার জন্যে জেদ ধরে, তখন?

নিখিলেশ বললে—ছি ছি, তুমি কেন যাবে? তুমি সেখানে গেলে লোকে কী বলবে বলো তো?

নয়নতারা বললে—লোকে যা ইচ্ছে বলুক গে, তাতে আমার কী এল গেল?

নিখিলেশ বললে—তবু, তুমি তো এককালে সে-বাড়ীর বউ ছিলে, আবার দ্বিতীয়-বার বিয়ে করছে, এ-সব দেখতে পেলে তারাই বা কী বলবে বলো দিকিনি! সে তো আর

কলকাতাও নয়, নৈহাটিও নয়, সে একেবারে অজ পাড়া-গাঁ, তারা যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে এতদিন কোথায় ছিলে, তখন কী বলবে? একদিন তুমিই তো সকলের সামনে বড় গলা করে শ্বশুর-শাশুড়ীকে কত কথা শুনিয়ে এসেছিলে, নিজের সিঁথির সিঁদুর ঘষে মুছে ফেলেছিলে, হাতের শাঁখা-নোয়াও ভেঙে ফেলেছিলে, এখন আবার তাদেরই কাছে মাথা নিচু করে হাত পাততে তোমার লজ্জা করবে না?

নয়নতারা বললে—হাত পাতার কথা বলছো কেন? আমি কি সেখানে দয়া ভিক্ষে করতে যাচ্ছি, আমার নিজের জিনিস চাইবো তাতে লজ্জা কী? আমি তো পরের জিনিস চাইছি না—

—না, তবু তারা ভাববে টাকার অভাবে তুমি তাদের কাছে মাথা নীচু করছো! ভাবলেই হলো। তাদের ভাবনা তো তুমি আটকাতে পারছো না—

নয়নতারা বললে—তারা যা খুশী ভাবুক। আর সত্যি কথা বলতে কী, টাকারও তো আমাদের দরকার। এই যে আজ নৈহাটি থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করছি, এখন কলকাতায় একটা বাড়ি থাকলে আমাদের কত সুবিধে হতো বলো দিকিনি। সে-গয়না-গুলো বেচলে তার দাম অন্তত কম করেও পঞ্চাশ হাজার টাকা তো বেকসুর হবে! আর সেই টাকা দিয়ে ছোটখাটো একটা বাড়ি কেনার পরও বাকি যা টাকা থাকবে তাই দিয়ে কোনও ব্যবসা-ট্যাবসাও তো করতে পারি আমরা। তারা বড়লোক, তাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকলেই বা কী আর গেলেই বা কী!

নিখিলেশ বললে—তা সদানন্দবাবু যখন আমাদের বাড়িতে ছিলেন তখন গায়নার কথাটা একবার তুললেই পারতে। তা হলে আর এখন তোমাকে সেগুলো চাইতে সেখানে যেতে হতো না—

—আমার মনে ছিল না তখন। তুমি অমায় মনে করিয়ে দিলেই পারতে!

নিখিলেশ বললে—আমি তোমায় গয়নার কথা মনে করিয়ে দেব! তাহলেই হয়েছে। তখন তোমার যা মেজাজ, তোমার মুখ দেখতেই তো আমার ভয় হতো।

—কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই, একটা রোগী মানুষকে একটু সেবা করবো না বলতে চাও? মরো-মরো লোকটাকে বাঁচিয়ে তুলেছি, সেইটেই আমার মস্ত অপরাধ হলো?

নিখিলেশ বললে—থাক থাক, সে-সব পুরোন কথা আর না তোলাই ভালো, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, ল্যাঠা চুকে গেছে। এখন ও নিয়ে আর তেতো করার দরকার নেই—

নয়নতারা বললে—না, তেতো করছি না। কিন্তু আমি নবাবগঞ্জে যাবোই। কাল ছুটে আছে, কালই ভোরবেলার ট্রেনে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। তারপরে আবার দুপুরবেলার ট্রেনে ফিরে আসবো। বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করবো। ওরা যদি খেয়ে যেতেও বলে তো তুমি যেন আবার রাজি হয়ে যেও না। যাদের বাড়ি একদিন ঘেন্নায় ছেড়ে এসেছি তাদের বাড়িতে জলগ্রহণ করাও পাপ—

তারপর গিরিবালাকে ডেকে নয়নতারা বলে দিলে—গিরিবালা, আমরা কালই ভোরের ট্রেনে বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে আর সকাল-সকাল উনুনে আঁচ দিতে হবে না, আমরা বাইরেই চা খাবো। তুমি বেলা হলে ধীরে-সুস্থে নিজের চা করে নিও। আমরা বিকেলে বাড়ি এসে ভাত খাবো—

নিখিলেশ আপত্তি করতে গেল। বললে—কালকে না-ই বা গেলে—পরে না-হয় কোনও দিন যাওয়া যাবে'খন, এত তাড়াতাড়ি কীসের—

নয়নতারা বললে—না, আমি কালকেই যাবো, তোমাকে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠিয়ে দেব—

বড় মুশকিলে পড়লো নিখিলেশ। নয়নতারা যে-রকম জেদী মেয়ে, সে যখন একবার নবাবগঞ্জে যাবো বলে মন করেছে তখন সে যাবেই। তাকে আর ঠেকানো যাবে না। কেন যে সেদিন নিখিলেশ মিথ্যে করে বলতে গিয়েছিল যে সে নবাবগঞ্জে গিয়েছিল! তখন যদি জানতো যে নয়নতারা একদিন তার সেই কথা বিশ্বাস করে নিজেই নবাবগঞ্জে যেতে চাইবে, তাহলে কি অমন করে মিথ্যে কথা বলে নয়নতারার মন ফেরাতে চাইতো!

ভোর তখনও হয়নি ভালো করে। চারিদিকে বেশ অন্ধকার। নয়নতারা নিখিলেশকে ঠেলতে লাগলো—ওগো, ওঠো-ওঠো—দেরি হয়ে যাবে—ওঠো—

নিখিলেশ আর শুয়ে থাকতে পারলে না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। কিন্তু তার বড় ভয় করতে লাগলো। নবাবগঞ্জে গিয়ে সে কী দেখবে কে জানে! সদানন্দবাবু যদি শেষ পর্যন্ত সেখানে না থাকে! যদি সেখানে কেউই না থাকে, তখন?

ততক্ষণে ট্রেন আসবার সময় হয়ে যাচ্ছিল। নয়নতারার সঙ্গে নিখিলেশও সেই অস্পষ্ট অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিলে।

সেই ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইতিহাস ভূগোল সব কিছুই আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল। সব চেয়ে বদলে গিয়েছিল কলকাতা শহরটা। দু'শো বছরের জঞ্জাল কি সহজে পরিষ্কার হয়! কিন্তু তবু যতটুকু পরিষ্কার হবার হয়ত তা হয়েছিল। কিন্তু নবাবগঞ্জে তার কিছুই হয় নি। তখনও রেল-বাজারে ট্রেন এসে থামলেই সামনে কয়েকটা রিক্‌শা দাঁড়িয়ে থাকে খদ্দেরের আশায়। রিক্‌শার খদ্দের তেমন হয় না। হলেও কাছাকাছি তার পরিধি।

কিন্তু নবাবগঞ্জের খদ্দের বড় একটা থাকে না। থাকে কালে-ভদ্রে। নবাবগঞ্জে রিক্‌শা ছড়ার লোক তেমন নেই। নবাবগঞ্জ তখনও সেই আগেকার মোগল আমলেই আটকে ছিল, আগে বাস যেমন চলতো তেমনি তখনও চলতো। কিন্তু সে-বাস নবাবগঞ্জ ছুঁয়ে যেত না। নবাবগঞ্জের পাশ দিয়ে সোজা চলে যেত একেবারে বাজিত-পুরের দিকে। কারো অসুখ হলে যেতে হবে সেই রেল-বাজারে। ছেলেরা লেখাপড়া করবে তাও যেতে হবে রেল-বাজারের ইস্কুলে-কলেজে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও নবাবগঞ্জ তাই তখনও একটা পাণ্ডব-বর্জিত দেশ হয়েই বিরাজ করছিল।

বারোয়ারিতলার নিতাই হালদারের দোকানের মাচায় বসে তখনও সেই আগেকার মত তাস খেলা চলে। বেহারি পালের মুদিখানার সামনে তখনও খদ্দেররা তেল-হলুদ-মশলা-কোরোসিন তেলের সওদা করে।

হঠাৎ পরমেশ মৌলিকের নজর পড়ল। রিক্‌শায় কারা যায়!

রিক্‌শাওয়ালাকে উদ্দেশ্য করেই পরমেশ মৌলিক জিজ্ঞেস করলে—কোথাকার যাত্রী গো?

রিক্‌শাওয়ালা জবাব দিলে—নবাবগঞ্জের—

—নবাবগঞ্জে কাদের বাড়ি?

—চৌধুরীবাড়ি।

চৌধুরীবাড়ির নাম শুনেই সবাই অবাক। চৌধুরীবাড়ি তো ভূতের বাড়ি। ছোটমশাই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কবে সুলতানপুর চলে গিয়েছিল সে-খবর কি এরা জানে না? আর সেই চৌধুরী মশাইও তো কবে মারা গেছেন। শালাবাবু এসে সে খবরও একদিন দিয়ে গিয়েছিল।

তাহলে এরা এতদিন পরে কার খোঁজ নিতে এসেছে!

নিতাই হালদার, গোপাল ষাট, কেদার, তারাও এবারে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। রিক্‌শার সামনে পর্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। ভেতরে মেয়েছেলের আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছে।

গোপাল ষাট বললে—ভেতরে কারা?

রিক্‌শার ভেতরে বসে নিখিলেশ বললে—দেখেছ, কী কাণ্ড! এদের সব কিছু জানা চাই, না জানলে এরা ছাড়বে না—

বলে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে নিজের মুখ বাড়ালো নিখিলেশ। জিজ্ঞেস করলে—চৌধুরীবাড়িতে কেউ নেই?

পরমেশ মৌলিক সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

—আমরা আসছি নৈহাটি থেকে। এখানে সদানন্দবাবু আছেন?

নিতাই হালদার, গোপাল ষাট আরো অবাক। এই তো ক'দিন আগে শালাবাবু এসে সদার খোঁজ করেছিল। আবার এরা তার খোঁজে এসেছে কেন? এদেরও কি টাকার লোভ?

নয়নতারা বললে—কই, তুমি যে বলেছিলে সে নবাবগঞ্জে থাকে, তুমি এসে তার সঙ্গে দেখা করেছ?

সমস্ত ব্যাপারটা যেন নয়নতারার কাছে কেমন গোলমেলে মনে হলো।

নিখিলেশ কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। তারপরে বললে—বোধ হয় সদানন্দবাবু কোথাও চলে গিয়েছেন। আমি যখন এসেছিলুম সেদিন তো ছিলেন—

পরমেশ মৌলিক বললে—সে তো আজ ক'বছর হলো নিরুদ্দেশ মশাই, অনেক বছর গাঁয়ে আসে নি, আপনারা কি নতুন এলেন নাকি?

সে কথার জবাব না দিয়ে নিখিলেশ রিক্‌শাওয়ালাকে বললে—চলো চলো রিক্‌শাওয়ালা, তুমি চলো—

কিন্তু নয়নতারা বললে—না, যাবে না, থামাও—

বলে নয়নতারা নিজেই রিক্‌শা থেকে নেমে পড়লো হঠাৎ। নেমে একেবারে নিতাই হালদারের দোকানের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো।

বললে—সদানন্দবাবু কি এখানে থাকেন না?

নিতাই হালদার তখন যেন সামনে ভূত দেখেছে! এ সেই সদানন্দর বউ না? পরমেশ মৌলিকও চিনতে পেরেছে। বিস্ময়ে কৌতূহলে সকলের মুখ-চোখ তখন হাঁ হয়ে গেছে। সেদিনকার বউরানীকে যে হঠাৎ এই পরিবেশে দেখতে পাবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কারোর মুখ দিয়ে তখন আর কোনও কথা বেরোচ্ছে না।

ওদিকে বেহারি পাল মশাইও তার দোকান থেকে মুখখানা দেখে চিনতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ছুটে গিয়েছে গিন্নীর কাছে।

—ওগো, কোথায় গেলে তুমি? কারা এসেছে দেখে যাও—

সমস্ত বারোয়ারিতলায় তখন যেন একেবারে বিদ্যুৎ খেলে গেছে। এমনিতে নবাবগঞ্জ শান্ত-শিষ্ট জায়গা। তাদের জীবনে কোথাও কোনও বৈচিত্র্য থাকে না। চমকে ওঠবার মত ঘটনা ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঘটে। সকালে সূর্য আকাশে উঠতে হয় বলেই ওঠে, আর সন্ধ্যে হয় বলেই যেন তা ডোবে। সদার বউকে সশরীরে এমনভাবে বারোয়ারিতলার মধ্যে দেখা যাবে তা ভাবাই যায় নি। সঙ্গে সঙ্গে তাসের সাহেব-টেক্কা-বিবি তাদের মাথায় উঠেছে। তার বদলে একেবারে জলজ্যান্ত-সাহেব বিবি তাদের সামনে এসে উদয় হয়েছে যেন।

—কেন, চৌধুরীদের কেউ নেই বাড়িতে?

চৌধুরীদের বাড়িটা বারোয়ারিতলা থেকেই দেখা যাচ্ছিল। সামনে বন-জঙ্গল, বাড়ির গায়ে অশত্থ গাছ জন্মে ছায়া করে রেখেছে। যেন ভূতের বাড়ির চেহারা নিয়েছে সেটা।

নিতাই হালদার বললে—আজ্ঞে, তাঁরা মারা গেছেন, ছোটমশাই-এর গিন্নীও মারা গেছেন, ছোট মশাইও ভাগলপুরে মারা গেছেন, আর তাঁর ছেলে সদা, সদানন্দ, সেও তো নিরুদ্দেশ—

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল। বললে—নিরুদ্দেশ! এখানে নেই? তবে যে শুনেছিলুম তিনি এখন এখানে থাকেন—

—আপনি ভুল শুনেছেন, কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে ভুল শুনিয়েছে। সে তো বহুকাল নিরুদ্দেশ! একবার শুধু গাঁয়ে এসেছিল, তাও সে আজ অনেক দিন হয়ে গেল। তারপরে রেল-বাজারের প্রাণকেষ্ট সা'মশাই এ-বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরও তা সহ্য হলো না। কেনার দুদিন পরেই অপঘাতে মারা গেছেন। এখন তো এ-বাড়ি একরকম বেওয়ারিশই পড়ে আছে—

কথাগুলো শুনে নয়নতারা হঠাৎ নিখিলেশের দিকে ফিরলো। বললে—কই, তুমি যে বলেছিলে বাড়ির চেহারা নতুন হয়ে গেছে—

নিখিলেশ আমতা আমতা করতে লাগলো। হয়ত ভেবেচিন্তে একটা কিছু জবাব দিত, কিন্তু তার আগেই তাকে বাঁচিয়ে দিলে বেহারি পালমশাইএর বউ।

খবরটা পেয়ে বেহারি পালের বউ ঘোমটা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'বউমা' বলে ডাকতে ডাকতে একেবারে সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল। নয়নতারাও সামনে যেতেই বেহারি পালের বউ তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

—ওমা, কতদিন পরে তুমি এলে বউমা!

নয়নতারা বললে—আপনি কেমন আছেন দিদিমা—

দিদিমা তখন নয়নতারাকে টানতে টানতে একেবারে বাড়ির অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। নিখিলেশ বাইরে রিক্‌শাতে বসে রইল।

বাড়িতে ভেতরে গিয়ে দিদিমা অনেক কথা উজাড় করে দিতে লাগলো। কথা বলতে বলতে দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার। বেহারি পালের ছেলেমেয়ে কিছু নেই। নয়নতারা যখন নবাবগঞ্জে বউ হয়ে এসেছিল তখন তাকে নিজের মেয়ের মত করেই ভালাবেসেছিল বেহারি পালের বউ। সে আজ এতদিন পরে ফিরে এসেছে এ আনন্দ যেন রাখবার জায়গা নেই তার। নয়নতারা বললে—এদের বাড়িতে কেউ নেই কেন দিদিমা?

দিদিমা বললে—আর কে থাকবে বউমা? থাকবার আছেটা কে! তুমিও চলে গেলে আর সেই থেকেই ভাঙন শুরু হলো। সেই থেকে ওটা ভূতের বাড়ি হয়ে পড়ে আছে—

নয়নতারা আর কী বলবে এ-কথার জবাবে। সে যে সদানন্দর কাছ থেকে তার গয়নাগুলো চাইতে এসেছিল তা আর মুখ ফুটে বলা হলো না।

নয়নতারা বললে—আমি তাহলে আসি দিদিমা—

দিদিমা বললে—সে কি বউমা, এতদিন পরে এলে আর এমনি হুট্ করে এসেই চলে যাবে?

—না, আমার সঙ্গে লোক আছে, রিক্‌শায় বসে আছে, আমার আবার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। যেতে হবে সেই নৈহাটিতে, ঝিকে রান্না করে রাখতে বলে এসেছি—

—নৈহাটি? কেন বউমা, নৈহাটিতে আবার কে আছে তোমার?

নয়নতারা বললে—নৈহাটিতেই তো এখন থাকি আমি দিদিমা। বিয়ে করার পর তো

আমি নৈহাটিতেই আছি। আমরা দুজনে কলকাতায় চাকরি করি আর ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি নৈহাটি থেকে—

কথাটা শুনে দিদিমা যেন কেমন আকাশ থেকে পড়লো। নয়নতারার মুখের দিকে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। সত্যিই তো, নয়নতারার সিঁথিতে সিঁদুর উঠেছে। হাতে আবার নোয়া। অথচ...

নয়নতারা তখন আর বসলো না। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সোজা একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ালো। নিখিলেশ তখন চুপ করে রিক্শাটার ওপর বসেছিল। নয়নতারা রিক্শায় উঠেই সোজাসুজি বলে উঠলো—তুমি আমাকে সব মিথ্যে কথা বলেছিলে? বলো, কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে? এখানে তো কেউ থাকে না! সে-ও তো এখানে নেই। তাহলে কেন তুমি বলেছিলে যে বাড়ি নতুন করে সারিয়েছে, বাড়িতে খুব ধুম-ধাম চলেছে, ভেতর থেকে লুচি-ভাজার গন্ধ আসছে! আমাকে ভোলাবার জন্যে বলেছিলে? বলো? কথা বলছো না কেন, জবাব দাও—

রিক্শাটা আবার তখন সেই বরোয়ারিতলার পথ দিয়ে রেল-বাজারের দিকে চলতে আরম্ভ করেছে।

নয়নতারা বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলে—বলো, কেন তুমি আমাকে অমন করে ঠকিয়েছিলে? সে ভালো থাকলে আমি খুশী হবো বলে, না আমাকে তুমি ওই বলে ভোলাতে চেয়েছিলে, বলো? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? জবাব দাও?

রিক্শাওয়ালা তখন ধুলো-কাদার মধ্যে প্রাণপণে রিক্শাটা টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

নয়নতারা আবার বলতে লাগলো—বলো, জবাব দাও, এতদিন তুমি তাহলে আমাকে যা-কিছু বলে এসেছ সবই মিথ্যে? সমস্ত মিথ্যে কথা? কিন্তু আমি এতদিন সরল মনে তোমার সব মিথ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করেছিলুম যে। তুমি এত মিথ্যেবাদী?

নয়নতারা আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, তুমি জবাব দিচ্ছ না যে?

নিখিলেশ বললে—দেখ, আমি তোমাকে মিথ্যে বলি নি, আমি যা শুনেছিলুম তাই-ই তোমাকে বলেছি, আমি একটু বাড়িয়েও বলি নি, কমিয়েও বলি নি—

নয়নতারা বললে—আবার তুমি মিথ্যে কথা বলছো? নিজের দোষ স্বীকার করতে তোমার এত লজ্জা? তুমি কী মনে করো কী? তুমিই একমাত্র চালাক আর সবাই বোকা? তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে ওই কথাগুলো বললে আমি সদানন্দবাবুর ওপরে খুব চটে যাবো, না? ভেবেছিলে আমার মন ওর দিকে আর ঢলবে না, না? কিন্তু তুমি একবারও তো ভাবলে না যে তা কখনও সম্ভব হতে পারে না! আশ্চর্য, সে আর তুমি? তার সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করো? সে মানুষ নয় তা জানো, সে একজন দেবতা, তোমার মত জানোয়ার পশু নয় সে—

এমন কী নৈহাটিতে ফিরে এসেও নয়নতারার রাগ গেল না। যতক্ষণ ট্রেনে ছিল সমস্ত রাস্তায় একটা কথাও বললে না নয়নতারা। আস্তে আস্তে নিখিলেশ নয়নতারার মনটা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে সবে মাত্র একটু সফল হয়েছিল। অনেক মিথ্যে কথা অনেক স্তোকবাক্য বলে মাত্র একটু শান্ত করেছিল নয়নতারাকে, তাও বিগড়ে গেল একদিনের মধ্যে।

শীতেশ সেদিন বললে—কী হে, আবার মন-মরা কেন? আবার কী হলো?

নিখিলেশ বললে—কিছু ভালো লাগছে না ভাই—

শীতেশ বরাবর বেপরোয়া মানুষ। বললে—মনকে প্রশ্রয় দিও না ভাই, মনকে একটু প্রশ্রয় দিয়েছ কী ওমনি সে-বেটা পেয়ে বসবে। সেই জন্যেই তো আমি মদ খাই হে। মদ খেলেই মন বাছাধন একেবারে জব্দ!

তারপর খানিক পরে আবার বললে—জানো, সেদিন মানদা মাসি তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল—বলছিল আর একদিন তোমাকে নিয়ে যেতে—

নিখিলেশ বললে—আমি গিয়ে আর কী করবো ভাই, টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার সেখানে গিয়ে কী লাভ?

শীতেশ বললে—টাকা লোন নাও, ধার করো।

নিখিলেশ বললে—ধার শুধবো কী করে? ধার নিতে ভয় করে যে আমার। শেষ-কালে দেনার দায়ে একুল ওকুল দু'কুল যাবে যে।

—সে কী হে? কারবার করতে গেলে ধার না নিলে চলে? কে না ধার নেয়? টাটা ধার নেয় না? বিড়লা ধার নেয় না। এদিকে বড়লোক হবার ইচ্ছে আছে, ওদিকে আবার ধার নিতেও ভয়। ওকেই তো বলে মিড্‌ল-ক্লাস মেণ্টালিটি! যদি বলো তো কম সুদে টাকা তোমাকে ধার পাইয়ে দিতে পারি আমি—

নিখিলেশ বললে—না ভাই, ওদিকে তুমি আমাকে লোভ দেখিও না—

সত্যিই তো, মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলে নিখিলেশ। টাকা ধার করে সে পথে বসবে নাকি! এককালে দেশ-সেবা করবে বলে জীবন আরম্ভ করেছিল, তারপর কোথা দিয়ে কোন্ পাকে-চক্রে পড়ে এখন কেরানীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আগেকার জীবনের সেই বড় বড় স্বপ্ন কোথায় চলে গেল! এখন আর সেই আদর্শবাদ নেই, সেই উদারতাও নেই তার। আগে কত দিকে চাঁদা দিয়ে টাকা বিলিয়ে দিয়েছে। মানুষের উপকার করবার সেই অলীক বিলাসিতাও কখন মন থেকে উবে গিয়েছে। এখন মনে হয় সবাই শুধু স্বার্থপর। আর সকলেই যখন স্বার্থপর তাহলে সে-ই বা স্বার্থপর না হবে কেন?

অফিস থেকে বেরিয়েও বাড়ি ফেরার আর কোনও তাড়া থাকে না তার। আগে ছুটতে ছুটতে যেতে হতো নয়নতারার অফিসে। যতক্ষণ না নিখিলেশ গিয়ে পৌঁছত ততক্ষণ নয়নতারা অফিসের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন আবার নয়নতারা অফিসে আসা বন্ধ করেছে। এখন থেকে আর সে চাকরি করবে না বলেছে।

বলেছে—আমার চাকরি করবারও দরকার নেই, আর আমার টাকারও দরকার নেই। তুমি যখন আমাকে বিয়ে করেছ তখন আমাকে খাওয়ানো-পরানোর সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

নিখিলেশ বলেছে—আমি তো বলছি আমাকে তুমি ক্ষমা করো—

নয়নতারা বলেছে তুমি আমার যা ক্ষতি করেছ এর পরে তোমার ক্ষমা চাইতে লজ্জা করে না? তুমি মনে করেছ তুমি একটার পর একটা দোষ করে যাবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করবো? দোষ করারও একটা সীমা থাকে মানুষের। তুমি কি সে সীমা রেখেছো যে তোমাকে আমি ক্ষমা করবো? আর ক্ষমা করবার কথা উঠছেই বা কেন? আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রাখারই বা কী দরকার? আমাকে তুমি ছেড়ে দাও না—

—ছেড়ে দেব মানে?

—হ্যাঁ ছেড়ে দাও। আজকাল তো সে-আইনও হয়েছে। আর তুমি যদি ছাড়তে না পারো তো আমিই না হয় তোমাকে ছেড়ে চলে যাই।

—কোথায়? কোথায় যাবে তুমি?

—আমার যেখানে খুশি আমি চলে যাবো, তোমাকে তা বলবো কেন? আমার অনেক সাধ ছিল আমি সংসার করবো। কিন্তু ভগবানের যখন তা ইচ্ছে নয়, তখন আর মিছিমিছি

সে চেষ্টা কেন? আজকাল তো কত মেয়ে বিয়ে না করে একলা রয়েছে, আমিও না হয় সেই রকম একলা-একলাই জীবন কাটিয়ে দেব। মনে করে নেব আমার কেউ নেই—

নিখিলেশ বলেছে—না না, ও-সব কাণ্ড করতে যেও না, লোকে হাসাহাসি করবে—

—তুমি থামো, লোকের হাসিটা বড় না মানুষের জীবনটা বড়? বাইরের লোক কী বললে না-বললে তা নিয়ে ভাবতে আমার বয়ে গেছে—। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে!

নিখিলেশ কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে গেছে। বলেছে—শোন, শোন, ও-সব নিয়ে আর ভেবো না, যত ভাববে তত মাথা গরম হয়ে যাবে—

নয়নতারা তার হাতখানা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। বলেছে—সরো তুমি, তোমার মুখ দেখলেও আমার ঘেন্না হয়—

বলে আর সারাদিন কথা বলে নি নিখিলেশের সঙ্গে। অফিসে যাবার আগে নিখিলেশ রোজ গিরিবালাকে বলে আসতো—তুমি একটু নজরে রেখো গিরিবালা, দিদিমণি যেন কোথাও বেরিয়ে না যায়—

বলে আসতো বটে, কিন্তু অফিসে বেরিয়েও নিখিলেশের মনে স্বস্তি ছিল না। অফিসে কাজ করতে করতেও কেবল বাড়ির কথা মনে পড়তো। যদি সত্যি-সত্যিই নয়নতারা কোথাও চলে যায়!

এক বাড়িতে এক ছাদের তলায় বাস করা অথচ কারোর সঙ্গে কারো বাক্যালাপ নেই। এ-রকম অবস্থা কতদিন সহ্য করা যায়! নিখিলেশের যেন দম আটকে আসতো।

এক-এক সময় নয়নতারার সামনে গিয়ে দাঁড়াতো। বলতো—কী হলো? এখনও কথা বলবে না?

সেদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ কোথায় একটা শব্দ হতেই নিখিলেশের কেমন সন্দেহ হলো। মনে হলো পাশের ঘরের খিল খুলে যেন নয়নতারা বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পাসের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দেখলে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু না, নিখিলেশ বাইরে থেকে কান পেতে শুনলে নয়নতারা ভেতরেই আছে, ঘুমোচ্ছে। মিছিমিছি ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। আবার গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো। আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। কিন্তু সারা রাত আর ঘুম এলো না তার। কতদিন এ রকম করে চালানো যায়! কতদিন বাড়িতে কথা না বলে মানুষ বাঁচতে পারে? একদিন কত স্বপ্ন ছিল দুজনের। স্বপ্ন ছিল চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করবে দুজনে। ব্যবসা করে টাকা জমিয়ে বড়লোক হবে। তারপরে সেই টাকায় কলকাতায় একটা নিজস্ব বাড়ি করবে, গাড়ি করবে, মানুষের সমাজের দশজনের মাথায় উঠবে। দশজনের মাথায় উঠে নিজেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেই সমস্ত স্বপ্ন সেই দিন থেকে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল। অথচ কেন যে চুরমার হয়ে গেল তা কেউ বুঝতে পারলে না, বুঝতে চাইলেও না। কেবল পরস্পরকে দোষারোপ করে পরস্পরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলো।

মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের স্বপ্ন হয়ত এমনি করেই সামান্য কারণে ভেঙে যায়। সামান্য কারণেই যেমন আশায় আনন্দে একদিন উত্তাল হয়ে ওঠে, তেমনি আবার সামান্য কারণেই একদিন হতাশার অন্ধকার অতলে তলিয়েও যায়।

তুমি কখনও সুখ পাও নি, স্বাচ্ছন্দ্য পাও নি, সচ্ছলতাও পাও নি। কিন্তু সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখতে তো তোমায় কেউ বারণ করতে পারে না। তাই সাধ তোমার অগাধ।

কিন্তু স্বপ্ন যদি তোমার সার্থক না হয় তো হতাশ হওয়াই তো তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। সংসারে সবাই তো যিশুখৃষ্ট হয়ে জন্মায় নি, তথাগত বুদ্ধদেব হবার জন্যেও জন্মায় নি। তেমনি সংসারে সদানন্দ হয়েও কেউ জন্মায় না। জীবনে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-হতাশা সমস্ত কিছুকেই যে সমান ভাবে গ্রহণ করতে পারে তারই নাম তো সদানন্দ। সুখে থাকলেও সে সদানন্দ, দুঃখে থাকলেও সে সদানন্দ। টাকা থাকলেও সে সদানন্দ, টাকার অভাব থাকলেও সে সদানন্দ। কর্তাবাবু কি আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন তাঁর নাতি সারা-জীবন সদানন্দ থাকবে তাই তার নাম রেখেছিলেন সদানন্দ।

তারিণী চক্রবর্তী তখন বাতে পঙ্গু। চলতে ফিরতে পারেন না। তবু এসেছেন বারোয়ারিতলায়। বেহারি পাল মশাইও এসেছে। কে আসে নি? বহু বছর পরে যেন নবাবগঞ্জে আবার উৎসব লেগে গেছে।

আগের দিন থেকেই আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছোটমশাই-এর ছেলে এতদিন পরে গ্রামে এসেছে। গ্রামে আগেও একবার এসেছিল সে। কিন্তু এবার এ অন্যরকম আসা। এবার যে-যত পারো খাও নিতাই হালদার, কেদার সরকার, গোপাল ষাট, পরমেশ মৌলিক কেউ বাদ নেই। ছোটমশাই-এর শ্রাদ্ধের খাওয়াটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। সেজন্যে অনেকেরই আফসোস ছিল এতদিন। এবার তাও মিটলো। কর্তাবাবুর নাতি বাপের সম্পত্তি পেয়েছে, লাখ-লাখ টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছে! কিন্তু তবু গ্রামের কথা ভোলে নি।

প্রকাশ মামা সেই যে সুলতানপুর থেকে তার পেছু নিয়েছিল তার পর থেকে আর তার সঙ্গ ছাড়ে নি। তার মুখে কেবল একটাই কথা। সে কেবল একটা কথাই বলে চলেছে—সব টাকাটা তুই নিয়ে নিলি সদা?

সদানন্দ বলেছে—না, সবটা নেব না, তোমাকে দশটা টাকা দেব—

—দশ টাকা মাত্তোর? কেন?

সদানন্দ বললে—দশটা টাকা সেই ধর্মশালাতে তোমার কাছ থেকে নিয়ে ছিলুম, সেই টাকাটা।

প্রকাশ মামার মুখটা কালো হলে গেল। বললে—দশটা টাকা নিয়ে আমি কী করবো? তুই পেলি আট লাখ টাকা আর আমি মাত্তোর দশ টাকা? অন্ততঃ চার লাখ আমাকে দে! আমি যে চার লাখ টাকার হিসেব করে রেখে দিয়েছি। চার লাখ টাকার কমে যে আমার কিছুতেই হবে না রে—

সেই সুলতানপুরে ট্রেনে ওঠবার সময় থেকে কেবল এই টাকার কথা নিয়েই সদানন্দর কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। কিন্তু সদানন্দ নির্বিকার। টাকার জন্যে এ-রকম ভিখিরিপনা সদানন্দর কাছে নতুন নয়। ছোটবেলা থেকে এ-সব দেখতে দেখতে তার কাছে এ-জিনিস পুরোন হয়ে গেছে। সেই ছোটবেলাকার কর্তাবাবু, সেই চৌধুরী মশাই, সেই কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক থেকে আরম্ভ করে এই প্রকাশ মামা পর্যন্ত সবাই এই টাকারই যন্ত্র। টাকার জন্যেই এদের সৃষ্টি, আর টাকার সৃষ্টিও বোধ হয় এদের জন্যেই। এই টাকার জন্যেই একদিন কপিল পায়রা-পোড়া, মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক আর কালীগঞ্জের বউকে প্রাণ দিতে হয়েছে, এই টাকার জন্যেই প্রকাশ মামা আজ তার পেছু নিয়েছে।

বৈষয়িক কাজ তো সোজা কাজ নয়। টাকার নিয়মটাই বোধ হয় সেই জন্যে জটিল। কোর্ট থেকে সাক্‌সেশান সার্টিফিকেট নেওয়া, তারপর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, তারও অনেক ঝঞ্ঝাট আছে। প্রকাশ মামা এ-সব ব্যাপারে ওস্তাদ লোক। সদানন্দর কোনও অসুবিধে হতে দিলে না। কিন্তু টাকাটা হাতে পাবার পর থেকেই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সদানন্দ যেন কেমন হয়ে গেল। একেবারে অন্য মানুষ।

প্রকাশ মামা বলতে লাগলো—কই রে, আমার ভাগের টাকাটা আমাকে দে—

সদানন্দ বললে—তোমার কীসের ভাগের টাকা?

প্রকাশ মামা আকাশ থেকে পড়লো যেন। বললো—বা রে, আমার ভাগের টাকা নেই? আমি তোকে কলকাতা থেকে ডেকে নিয়ে এলুম, তোর টাকার খবরটা দিলুম। আমি খবরটা না দিলে তুই টাকার কথা কী জানতে পারতিস?

কিন্তু সদানন্দ তখন প্রকাশ মামার সে-কথায় কান দিলে না। টাকাটা নিয়ে সোজা চলে গেছে কলকাতায়। প্রকাশ মামাও পেছন-পেছন গেছে।

সদানন্দ বলে—তুমি কেন আর আসছো প্রকাশ মামা?

প্রকাশ মামা বললে—সে কী রে, আমার ভাগের টাকা যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ তো আসতেই হবে। ভাগের টাকা না-পেলে আমি বাড়িতে গিয়ে বউ-এর কাছে মুখ দেখাবো কী করে?

সদানন্দ বললে—কিন্তু টাকাটা তো তোমার নয় প্রকাশ মামা, টাকাটা তো আমার—

তা যেমন তোর টাকা, তেমনি তো আমিও ওর কিছু ভাগ পাবো—আমার ভাগের টাকাটা দে আমি চলে যাচ্ছি। তোর সঙ্গে আমি কেন মিছি মিছি ঘুরবো—

কিন্তু সদানন্দর কোনও দিকে কান নেই। একদিন নবাবগঞ্জ থেকে যখন প্রথম জীবন পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিল তখনই মানুষ চিনে ফেলেছিল সে। কর্তাবাবুকে চিনেছিল, চৌধুরী মশাইকে চিনেছিল, কালীগঞ্জের বউকে চিনেছিল, রাধাকে চিনেছিল। চিনেছিল প্রকাশ মামাকে। আর শুধু তাদেরই বা কেন, নবাবগঞ্জের সব মানুষকেই চিনে ফেলেছিল সে। তারপর কলকাতার মানদা মাসি থেকে সুরু করে সমরজিৎবাবু কাউকেই চিনতে বাকি ছিল না তার। তারপর সমরজিৎবাবুর বাড়ির সেই পুত্রবধূটি। তারপর ছিল মহেশ, ছিল কত লোক। যে-লোকটা রাস্তায় তার পকেট থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছিল তার কথাও তার মনে ছিল। এই সব মানুষ নিয়েই তো এই পৃথিবী। যে-পৃথিবীর মানুষকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে একজনের পর একজন অবতারের আবির্ভাব হয়েছে, একজনের পর একজন মহাপুরুষ হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই পৃথিবীর মানুষের এই অধঃপতন কেন? কেন এত অবক্ষয়? আজ আর সদানন্দর কোনও সংশয় নেই। কী উদ্দেশ্য সাধন করতে সদানন্দ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল সেটা এই পরিস্থিতিতে গৌণ হয়ে গেছে। আজকে এমন আবদার সে করবে না যে সে নিজে ভালো আর সবাই মন্দ। ভালো-মন্দর বিচার করার ভার অনির্দেশ্য এক মহাকালের কাছে ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যারা তার শুভাকাঙ্খী, যারা তার চলন্ত পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করতে চেয়েছিল তাদের সে মনে রাখবে। মনে রাখার নিদর্শন সে তাদের সকলকে দিয়ে যাবে তার এই অযাচিত অর্থের ভাগ দিয়ে।

বউবাজারের সেই বাড়িটার কাছে আসতেই প্রকাশ মামা বললে—ওরে বাবা, ও বাড়িতে আমি যাবো না—

—কেন?

—না, ও বাড়িতে মানদা মাসি আছে, মাসি টাকার গন্ধ পেয়েছে, আমাকে পেলে আর ছাড়বে না, গিলে খাবে—

কিন্তু সদানন্দর না-গেলে চলবে না, প্রকাশ মামা রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—ওরে সদা, তুইও ওখানে যাসনে, মাগী তোর টাকাগুলো সব নিয়ে নেবে—

বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়তেই মহেশ বেরিয়ে এল। সদানন্দকে দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। এই ক'মাসের মধ্যেই দাদাবাবুর এ কী চেহারা! কত সুন্দর দেখাচ্ছে!

—কাকীমা কোথায় মহেশ?

মহেশের চোখ ছল্-ছল্ করে উঠলো।

সদানন্দ বললে—কী হলো, কাকীমা ভালো আছেন তো?

মহেশ বললে—বেঁচে আছেন, এই পর্যন্ত দাদাবাবু—

সদানন্দ বললে—আমার একটা কাজ আছে তাঁর কাছে। দেখ, একদিন এই বাড়িতে কাকাবাবু-কাকীমার কাছে অনেক আদর পেয়েছিলুম তা তো তুমি জানো। সেদিন যে আমি এ-বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলুম তার জন্যে দায়ী আমি নই মহেশ—

মহেশ বুঝতে পারলে না কথাগুলো। বললে—হ্যাঁ, তা আপনাকে তো বাবু অত করে থাকতে বলেছিলেন—

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, তবু থাকতে পারি নি। কাকাবাবুর দেওয়া সমস্ত সম্পত্তি আমি নিতে রাজি হই নি। কেন নিতে রাজি হই নি জানো?

—না।

—তোমাদের বাড়ির বউদিদিমণির কথা ভেবে। তাঁর ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে চাই নি। তা আজকে আমি অনেক টাকার মালিক হয়েছি মহেশ, অনেক অনেক টাকা। এত টাকা আমার কোনও কাজে লাগবে না। তার থেকে কিছু টাকা আমি তাঁর নাম করে কাকীমার হাতে দিয়ে যেতে চাই—

বউদিদিমণির নামে?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, তিনি তো কারো সামনে বেরোন না, কাকীমার হাতে দিলে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে পৌঁছোবে!

মহেশ বললে—কিন্তু বউদিদিমণি তো আর নেই—

—নেই মানে?

বলতে গিয়ে যেন মহেশের গলা আটকে গেল। একটু ধরা গলায় বললে—তিনি মারা গেছেন দাদাবাবু!

—মারা গেছেন? কবে?

—এই তো দু'মাস হলো। বিয়ে হওয়া এস্তোক্ তো জীবনে কখনও শান্তি পান নি তিনি—একদিন নিজের হাতেই নিজের প্রাণটা নিয়ে এলেন। আমরা কেউই জানতে পারি নি দাদাবাবু, যখন জানতে পারলুম দেখলুম তিনি আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছেন—

সদানন্দ শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। অথচ বাঁচার কত শখ ছিল তাঁর। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত সচেতন ছিলেন! সেই চিঠিটার কথাও মনে পড়লো সদানন্দর! অনেক রাত্রে দরজার তলার ফাঁক দিয়ে সেদিন চিঠিটা তার ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সদানন্দ চৌধুরী বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে গেলেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিরঙ্কুশ হয়ে যাবে।

—সেই থেকে মা-ও শয্যেশায়ী হয়ে পড়েছে। বাবু থাকলে তবু একটা কথা বলবার লোক থাকতো তাঁর। বড়দাদাবাবু তো আর মা'র নিজের ছেলে নয়, তা তো আপনি জানেন, ছোটবেলায় এই বড়দাদাবাবুকে বাবু পুষ্যি নিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন নিজের ছেলে নেই, পুষ্যি ছেলেই নিজের ছেলের মত বাপ-মাকে দেখবে, তাই ছোটবেলাতেই ওঁর মেয়ের সঙ্গে বড়দাদাবাবুর বিয়ে দিয়েছিলেন—

সমস্তই জানতো সদানন্দ। সমস্তই তার মনে পড়তে লাগলো। হাতের মুঠোর মধ্যে টাকাগুলো তখনও কাঁটার মতন বিঁধছিল। এই কয়েক হাজার টাকা সে যার ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করতে এসেছিল সে-ই কিনা নিজে থেকেই চলে গেল।

—আর ওই রাক্ষুসীকে ঘরে এনে তুলেছে বড়দাদাবাবু! সে-ই তো যত নষ্টের গোড়া! কিন্তু আমি তো কিছু বলতে পারি না। আমি পর। আমি বললেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। তাই ভাবি ওই যদ্দিন মা আছেন তদ্দিন আমিও আছি দাদাবাবু, তারপর আমিও এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো—এখানে থাকতে আর আমার ভালো লাগে না—

—কী রে, এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

হঠাৎ যেন সদানন্দর সম্বিৎ ফিরে এল। প্রকাশ মামাকে দেখে মনে পড়লো সে কখন রাস্তার মোড়ের কাছে এসে পড়েছে। মহেশের সঙ্গে কথা বলা কখন যে শেষ হয়েছে তা তার খেয়ালই ছিল না।

—মাসিকে দেখলি? মাসিকে ওখানে দেখলি নাকি?

সদানন্দ অন্যমনস্ক ছিল। তখনও তার মাথার ভেতরে মহেশের কথাগুলো তোলপাড় করছিল।

বললে মাসি কে?

প্রকাশ মামা বললে—মাসিকে চিনিস না? সেই কালীঘাটের বস্তির বাড়িউলী মানদা মাসি, তোকে ধরে তোর চরণপূজো করেছিল রে। সেই মানদা মাসি তো ও বাড়িতে রয়েছে বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা দুয়ে নেবে বলে। সেই ভয়েই তো আমি তোর সঙ্গে গেলুম না? তা তোর কাছে টাকা চাইলে না মাসি?

—কীসের টাকা?

প্রকাশ মামা রেগে গেল। বললে—তুই এত কী ভাবছিস বল্ দিকিনি? কী এত আকাশ-পাতাল ভাবছিস? তুই খুলে বল তো এখন কোথায় যাবি? আমি তো আর হাঁটতে পারছি না। সেই সুলতানপুর থেকে বেরিয়ে এত টো-টো করে ঘুরতে পারা যায়? এখন কোথায় যাবি তাই ঠিক করে বল্ তো আমাকে—

সদানন্দ বললে—তোমাকে আমার সঙ্গে ঘুরতে হবে না আর মামা। তুমি আমার সঙ্গে এলেই বা কেন?

—বা রে, তুই তো তাজ্জব কথা বললি? আমি তোর সঙ্গে ঘুরছি কেন? তা আমার ভাগের টাকাগুলো দিয়ে দে, আমি চলে যাচ্ছি—

সদানন্দ বললে—তোমাকে আমি টাকা দেব না মামা।

—তা টাকা দিবি না তো এতগুলো টাকা নিয়ে তুই করবি কী? তোর চাল-চুলো মাগ-ছেলে কিছু তো নেই, এত টাকা তোর কী হবে?

সদানন্দ বললে—কী হবে তার জবাব আমি তোমাকে দেব না। আমি এখন নবাবগঞ্জে যাবো—

—নবাবগঞ্জে? নবাবগঞ্জে আবার কী করতে যাবি? সেখানে আবার কে আছে তোর? সে-বাড়ি তো জামাইবাবু প্রাণকেষ্ট সা'কে বিক্রি করে দিয়েছে—

—তা হোক, আমার ইচ্ছে আমি নবাবগঞ্জে যাবো, তোমার তাতে কী?

বলে সদানন্দ শেয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে এই নবাবগঞ্জে এসেছিল, প্রকাশ মামাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

নবাবগঞ্জের খাওয়া-দাওয়ার বহর দেখে প্রকাশ মামা সদানন্দর কাছে এসে বললে—এ সব কী করছিস রে তুই? নাঃ, দেখছি শেষ পর্যন্ত টাকাগুলো তুই নয়-ছয় করে ফেলবি। শেষকালে তুই এই ভূত-ভোজন করাচ্ছিস—

তা প্রকাশ মামা যা ভয় করেছিল সদানন্দ তা-ই করলে। তারিণী চক্রবর্তী, বেহারি পাল তো ছিলই, গ্রামের আরো যত গণ্যমান্য লোক ছিল সদানন্দ তাদের সকলকে বারোয়ারিতলায় ডাকিয়ে আনলে। তারপর তাদের সামনে সদানন্দ যা প্রস্তাব করলে তাতে প্রকাশ মামা আরো অবাক।

সে এক রীতিমত নাটক বটে। নবাবগঞ্জে হাসপাতাল করে দেবে সদানন্দ, ইস্কুল করে দেবে। খরচের সমস্ত টাকা দেবে সদানন্দ।

সদানন্দ বললে—এ আমার টাকা নয় জ্যাঠামশাই, এ আপনাদেরই। আপনাদের মনে আছে বোধ হয় আমার ঠাকুরর্দাদার অত্যাচারে এই বটগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল কপিল পায়রাপোড়া। আপনারা জানেন কালীগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রীকে ঠকিয়ে আমার ঠাকুর্দাদা এই জমিদারি করেছিলেন—তা আপনারা জানুন আর না-জানুন আমি সব জানি। আমি আজ আপনাদের যে-টাকা দিলুম এ সেই টাকা। এ আপনাদেরই টাকা আপনাদেরই দিলুম। এ-টাকা আমার নেবার কোনও অধিকার নেই—

পাশে প্রকাশ মামা ছিল। তার তখন পাগল হতে শুধু বাকি।

বললে—সব টাকা তুই এদের দিয়ে দিলি?

তারিণী চক্রবর্তী বললে—আমি তখনই জানতুম বাবা, যে তোমার মত ছেলে হয় না, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকো বাবা—আমি তোমাকে এই আর্শীবাদ করি—

সদানন্দ বললে—অমন আশীর্বাদ আমাকে করবেন না জ্যাঠামশাই, বেশিদিন বাঁচার চেয়ে যেন বেশি ভালো কাজ করতে পারি এই আর্শীর্বাদ করলে আমি মাথায় তুলে নেব—ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি নবাবগঞ্জের ছেলেরা ছ'ক্রোশ দূরে রেল-বাজারের স্কুলে-কলেজে পড়তে যায়, একটা হাসপাতাল নেই যে নবাবগঞ্জের লোকদের চিকিৎসা হয়। আমার বাবা বা ঠাকুরর্দাদা তা করে দিতে পারতেন, কিন্তু করেননি। অতচ এ টাকা তো আপনাদেরই টাকা জ্যাঠামশাই। আপনাদের ঠকিয়েই তো এত টাকা তাঁদের সিন্দুকে জমেছিল। তাঁরা এই টাকার জন্যে কাউকে ঠকিয়েছেন, কাউকে জমি থেকে উৎখাত করেছেন। আবার কাউকে বা বংশী ঢালীদের দিয়ে খুনও করিয়েছেন। টাকার জোরে তাঁরা আপনাদের কিছু কথা বলতে দেননি, তেমনি পুলিসের মুখও টাকা দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছেন...

বলতে বলতে সদানন্দ আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলো। সে বলতে লাগলো—আমি যখন বিয়ের দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম তখন আপনারা সবাই আমাকে পাগল বলেছিলেন। সবাই যা করেছে তার বিরুদ্ধে গেলেই বুঝি পাগলামি করা হয়? তেমনি ফুলশয্যার দিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাইনি, সেও কি তাহলে পাগলামি? অথচ সেদিন তো সবাই আপনারা আমাকে পাগলই বলেছিলেন। এই তো আমার পাশে এখন প্রকাশ মামা বসে আছে, একে আপনারা জিজ্ঞেস করুন এরা আমাকে পাগল বলেছে কি না? কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে কেন গ্রহণ করিনি সে প্রশ্ন কি কখনও আপনাদের মনে জেগেছে? তা জাগেনি, কারণ আপনারা ধরে নিয়েছিলেন আমি পাগল। সবাই যা করে তা না-করার নামই আপনাদের কাছে পাগলামি। আসলে আমি চাইনি যে আমাদের বংশ বৃদ্ধি হোক, আমি চাইনি যে অত্যাচারীর সংখ্যা বাড়ুক। আমি চেয়েছিলুম যে কালীগঞ্জের বউএর অভিশাপ সত্যি হোক, কালীগঞ্জের জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী কর্তাবাবুকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল তা ফলুক। আপনারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন যে সে অভিশাপ ফলেছে, কারণ আপনারা হয়ত জানেন না যে আমার স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে, আর আমি জীবনে কখনও বিয়ে করতে পারবোও না, কারণ বিয়ে করলে কালীগঞ্জের বউএর অভিশাপ মিথ্যে হয়ে যাবে। সে অভিশাপ যাতে

মিথ্যে হয়ে না যায় সেইজন্যেই আমি বিয়ে করবো না। উত্তরাধিকারসূত্রে এত টাকা পাওয়ার পরও না—

বেহারি পাল আর থাকতে পারলে না। বললে—ধন্য ছেলে বাবা তুমি—তুমি ধন্য—

সদানন্দ বললে—না দাদামশাই, আমাকে অত প্রশংসা করলে চলবে না। আপনাদের ওপর এই কাজের ভার দিয়ে গেলুম। আপনারাও দেখা-শোনা সব করবেন। আমি কলকাতায় গিয়ে গভর্নমেন্টের দফতরে গিয়েও এর জন্যে যা করা দরকার তা করবো। চার লাখ টাকা আমার বরাদ্দ। দু'লাখ টাকা হাসপাতাল করার জন্যে আর দু'লাখ টাকা দেব স্কুল-কলেজ করবার জন্যে। এর জন্যে যে কমিটি হবে তাতে আপনারাই থাকবেন, আপনারাই হবেন কর্তা, মাথার ওপর থাকবে শুধু সরকার। আমি চাই এতদিন নবাবগঞ্জের লোক যে কষ্ট পেয়ে এসেছে, সে কষ্ট দূর হোক—আমি চাই নবাবগঞ্জের ছেলে-মেয়েরা যেন স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে মানুষ হয়, নবাবগঞ্জের লোকেরা অসুখ-বিসুখে যেন হাসপাতালে ডাক্তারের সেবা পায়, ওষুধ-বিষুধ পায়—

ততক্ষণে বারোয়ারিতলায় ভিড় আরো বেড়ে গেছে। যারা ক্ষেত-খামারে কাজ করছিল তারাও এতক্ষণে এসে জুটলো।

একজন জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে গো এখানে?

পাশের একজন বললে—এখানে ইস্কুল কলেজ হবে, হাসপাতাল হবে—চৌধুরী মশাই-এর ছেলে চার লাখ টাকা দিয়ে এখানে সব কিছু করে দেবে—

সে এক রাজসূয় যজ্ঞের মত ধুমধাম শুরু হয়ে গেল চারদিকে। নবাবগঞ্জের কপালে এত সুখ হবে তা যেন কেউ কল্পনাই করতে পারছে না। একপাশে কেদার বসে আছে, নিতাই হালদার, গোপাল যাট সবাই বসে আছে। তারাও শুনছিল। তাদের কাছেও এ যেন এক অভাবনীয় ঘটনা। একদিন এই সদানন্দর বউ-ই চৌধুরীদের বার-বাড়িতে যে কেলেঙ্কারি করেছিল, তা দেখতেও সেদিন এমনি ভিড় হয়েছিল। কিন্তু তখন এমন আনন্দ হয়নি আজকের মত। বাহাদুর ছেলে বটে হে। লাখ-লাখ টাকার লোভ এমন করে ছেড়ে দিতে পারলে তো।

বেহারি পাল তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে চলে এল। বললে—কই, ওগো শুনছো—

গিন্নী সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এল। বললে—কী হলো, এসেছে?

বেহারি পাল—না, সে এল না—

—তা বললে না কেন দিদিমা একবার ডাকছে?

—বলেছিলুম। তা বললে সময় নেই। বললে এখান থেকে আরো অন্য অনেক জায়গায় যেতে হবে আবার।

—তা কী বললে সদা?

বেহারি পাল বললে—জানো, একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে উঠেছে সদা—

—কী রকম?

—আহা, শুনলেও গর্ব হয়। বাপের আর দাদামশাই-এর অনেক টাকা পেয়েছে তো। সেই টাকাগুলো সব গাঁয়ের কাজে দিয়ে গেল। বললে—এসব আপনাদেরই টাকা, আপনাদেরই ভালোর জন্যে খরচ করবো এখানে। একটা ইস্কুল একটা কলেজ আর একটা হাসপাতাল করে দেবে বললে। গাঁয়ের ছেলেদের লেখাপড়া করার অসুবিধে, অসুখ-বিসুখ হলে দেখবার কেউ নেই—

বেহারি পালের বউএর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। বললে—তা তুমি একবার

তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারলে না? আমি একবার তাকে চোখের দেখা দেখতুম। তা নয়নতারার কথা সে জানে? কিছু বললে সে?

বেহারি পাল বললে—সে জানে। নয়নতারা আবার বিয়ে করেছে তাও জানে! তার বউ-এর কথাও তো সকলের সামনে দাঁড়িয়েই বললে।

—তা বললে না কেন যে, নয়নতারা তাকে খুঁজতে এসেছিল?

বেহারি পাল বললে—তাকে কি একলা পেলুম যে, তার সঙ্গে কথা বলবো? সেই চৌধুরী মশাই-এর শালাবাবু সে তো সব সময়ে তাকে আগলে-আগলে রয়েছে একলা যে বাড়িতে তাকে নিয়ে আসবো, নিরিবিলিতে দুটো কথা বলবো তারও তো উপায় নেই। সে তো খুব রাগারাগি করছে—

—কেন গো? রাগারাগি করছে কেন?

বেহারি পাল বললে—রাগারাগি করবে না? সে তো টাকাগুলো মারবার মতলব করেছিল, মারতে পারলে না বলে এখন গজরাচ্ছে। এই যেচার লাখ টাকা গাঁয়ের লোকের ভালোর জন্যে সদা দিলে এটা তো তার ভালো লাগলো না—

হায় রে, টাকা দান করা আর সেই টাকার সদ্ব্যবহার হওয়া সে এক জিনিস নয় তা যদি সদানন্দ জানতো! সংসারে যারা সদানন্দ হয়ে জন্মায় তারা বোধ হয় তা জানতে পারেও না। সদানন্দরা যখন দান করে তখন তার ভালো-মন্দ খতিয়ে না-দেখেই দান করে। খতিয়ে দেখে কারা? যারা রাজনীতি করে। কিন্তু সদানন্দরা যে শুধু বিদ্রোহ করতেই জানে, রাজনীতি করবার জন্যে তো সংসারে প্রকাশ মামারাই আছে!

তাই প্রকাশ মামা তখনও সদানন্দর পেছন পেছন চলেছে। তখনও তার পেছু ছাড়েনি সে। নবাবগঞ্জ থেকে হেঁটে গিয়ে দুজনে বাসে উঠেছে। তখনও তার মুখে ওই একই কথা—হ্যাঁ রে, টাকাগুলো তুই এইভাবে নয়-ছয় করে ফেলবি? জামাইবাবু কত করে টাকা উপায় করে গিয়েছিল, আর সে টাকা দিয়ে তুই এই ভূত-ভোজন করাবি।

সদানন্দ বললে—তুমি আমার সঙ্গে কেন ঘুরছো মামা? তোমাকে তো আমি বলেছি টাকা তুমি পাবে না—

প্রকাশ মামা বললে—কেন পাবো না? নবাবগঞ্জের ওই ছোটলোকগুলোকে অতগুলো টাকা দিতে পারলি আর আমি তোর মামা হই, আমাকে দিতে পারবি না? আমি তোর কেউই নয় রে? ছোটবেলা থেকে তোকে আমি কত আদর করেছি, কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছি, সব তুই একদম ভুলে মেরে দিলি?

সদানন্দ বললে—তোমাকে আমি টাকা দেব না, আমি রাধাকে টাকা দেব।

—রাধা!

—হ্যাঁ, যাকে তুমি তার বাড়ি থেকে ফুসলে নিয়ে এসে রাণাঘাটের বাজারের বস্তিতে রেখেছিলে।

—সে-সব কথা তুই জানলি কি করে?

সদানন্দ বললে—আমি একদিন রাধার বাড়িতে গিয়েছিলুম, তখন সে আমাকে সব বলেছে। তাকে আমি কিছু টাকা দিয়ে যাবো।

প্রকাশ মামা হেসে উঠলো হো হো করে। বললে—কিন্তু তাকে আর তুই খুঁজে পাবি কী করে রে?

—কেন? রাণাঘাটে গিয়ে?

প্রকাশ মামা বললে—আরে সে তো মারা গেছে কবে। কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। বরঞ্চ তার টাকাগুলো তুই আমাকে দে। আমাকে দিলেই তাকে দেওয়া হয়ে যাবে!

কথাগুলো বলে এত জোরে হেসে উঠলো যে, মনে হলো প্রকাশ মামা যেন মৃত্যুকেও ব্যঙ্গ করছে। প্রকাশ মামার কাছে চিরকাল জন্ম-মৃত্যু সব কিছুই ব্যাঙ্গের জিনিস। জীবনটাই প্রকাশ মামার কাছে একটা প্রহসন। প্রকাশ মামার কাছে একটা জিনিসই কেবল সত্যি, তা হলো টাকা। টাকাই প্রকাশ মামা সারা জীবন চেয়েছে, আর সেই টাকাটাই প্রকাশ মামা পায়নি। পায়নি বলে টাকাটাকেই সারা জীবন ভজনা করে চলেছে।

ক'দিন ধরে পরিশ্রম হচ্ছিল খুব। কোথায় সেই কোর্ট, কোথায় ব্যাঙ্ক, আর কোথায় উকিল মুহুরি, ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, নবাবগঞ্জ। কোথায় কখন ঘুমিয়েছে, কোথায় কী খেয়েছে, কিছুরই কিছু ঠিক ছিল না। কখন যে সদানন্দ কোথায় যাবে তারও কোনও ঠিক নেই। অথচ অতগুলো টাকা পেয়েছে, তাকে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। যাকে হাতের কাছে পাবে তাকেই হয়তো টাকাগুলো বিলিয়ে দেবে। অথচ হায় রে পোড়া কপাল, পাশেই এত বড় একটা অভাবী লোক রয়েছে তার দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না সদানন্দ।

ভাবতে ভাবতে প্রকাশ মামা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসেছে। কোথায় গেল সদানন্দ! সদানন্দ কোথায় গেল!

মনে আছে সদানন্দর সঙ্গে সে রেলবাজার স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল। তারপর চলন্ত ট্রেনের দোলানিতে কখন সে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানতে পারেনি। ট্রেনটা তখনও চলছে। আশেপাশের লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখল সে। সবাই রয়েছে, শুধু সে-ই নেই।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, আমার পাশে ফর্সা লম্বা মতন এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন বলতে পারেন?

কেউ বলতে পারলে না। যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত, কে আর খবর রাখতে যাবে পরের ব্যাপার। বললে—না মশাই, আমি দেখিনি—

কিন্তু একজন ভদ্রলোক দেখেছিলে। বললে—আপনার পাশে বসে ছিলেন তো? লম্বা ফর্সা গায়ের রং? হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি তো একটা স্টেশন আসতেই নেমে গেলেন—

—কোন্ ইস্টিশানে নেবে গেলেন? কোন্ ইস্টিশানে বলুন তো?

ভদ্রলোক বললে—তা তো মনে নেই—

প্রকাশ মামার মনে হলো পরের স্টেশনেই সে নেমে যাবে। কিন্তু সেখানে নেমেই বা কী হবে? কোথায় খুঁজবে তাকে? তার চেয়ে কলকাতায় চলে যাওয়াই ভালো। কলকাতায় গিয়ে বরং সেই ধর্মশালায় গিয়ে খোঁজ নেবে। যেখানেই সদা যাক, শেষ পর্যন্ত সেই ধর্মশালাতে তো তাকে যেতেই হবে।

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে আর কোথাও দাঁড়ালো না প্রকাশ মামা। একটা ট্রাম ধরে সোজা একেবারে বড়বাজারে গিয়ে নামলো। বড়বাজারের ট্রামরাস্তায় নেমে সেখান থেকে সোজা পাথুরেপটির ধর্মশালাতে—

—পাঁড়েজী, পাঁড়েজী—

বলে ডাকতে ডাকতে প্রকাশ মামা একেবারে ধর্মশালার ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো। পাঁড়েজী বেরিয়ে এসে বললে—বাবুজী এসেছে?

প্রকাশ মামা বললে—আমি আগে এসে পড়লুম, পরে বাবুজী আসবে—

—কেন, বাবুজী কোথায় গেল?

প্রকাশ মামা বললে—আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে বাবুজী পরে আসবে বললে—তা আমি তোমার এখানে ক'দিন থাকবো পাঁড়েজী। আমাকে তুমি চিনতে পেরেছ তো? আমি সেই তোমার বাবুজীর মামা, আমার নাম প্রকাশ মামা। কী করবো বলো, ভাগ্নেকে ফেলে তো আমি চলে যেতে পারি নে!

পাঁড়েজী বললে—তা থাকুন না, আমার তো ঘর খালি রয়েছে, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি—

প্রকাশ মামা বললে—শুধু থাকতে দিলে তো চলবে না পাঁড়েজী, আমাকে একটু খেতেও দিও, আমি খাবো আর কোথায় বলো। তোমার কাছেই যা হোক দুটি খাবো—

—ঠিক আছে—

বলে পাঁড়েজী চলে গেল। কিন্তু প্রকাশ মামার মনে মনে কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সদা এখানে আসবে তো! কিন্তু যদি না আসে? যদি অতগুলো টাকা কাউকে দিয়ে দেয়? মরতে কেন সে অমন করে ঘুমিয়ে পড়েছিল ট্রেনের মধ্যে! ঠিক ওই সময়েই কি ঘুমিয়ে পড়তে হয় রে! আর এক ঘণ্টা জেগে থাকলে তো এই সর্বনাশটা তার হতো না!

প্রকাশ মামা মনে মনে আবার মা-কালীকে ডাকলে—মা, একটু দেখো মা, আমি বড় দুঃখী ছাপোষা মানুষ। আমার ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে সংসার। আমি তোমাকে যে হিসেবটা দিয়েছি তা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মা। এক লাখ দিয়ে আমি একটা বাড়ি করবো, আর বাকি থাকলো তিন লাখ। সেই তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট রেখে দেব, তার থেকে হাজার তিনেক টাকার মতন সুদ আসবে মাসে। তখন সেই টাকার সুদ খাবো—আর, আর একটা কথা—দিশী মাল আর খাবো না মা। আমি শুধু হুইস্কি খাবো। দিশী খেয়ে খেয়ে আমার জিভে মরচে পড়ে গেছে মা, একেবারে মরচে পড়ে গেছে...

নৈহাটির বাড়িতে তখন নয়নতারা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে! সে সিদ্ধান্ত আর বদলাবে না সে। যে-মানুষ তার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে, যে-মানুষ তাকে পদে পদে ঠকিয়েছে, তার সঙ্গে আর কোনও মতে সে সংসার করবে না।

নিখিলেশ সকাল-বেলাই যথারীতি অফিসে চলে গিয়েছিল। বহুদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। না হোক, তাতে নয়নতারার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আর সে এখানে থাকবে না। এখানে থাকা মানেই তো নিজেকে বিক্রি করে দেওয়া। তার চেয়ে এখান থেকে চলে গিয়ে সে মালাদের বোর্ডিং হাউসে গিয়ে উঠবে। জায়গা হয়ত নেই সেখানে। কিন্তু মালা তার বন্ধু, একটা জায়গা সে তাকে করে দেবেই।

কয়েকটা কাপড় সে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে নিলে। আর কিছু তার সঙ্গে নেবার দরকার নেই। অফিস থেকে মাইনে নিয়ে বাকি জিনিসগুলো সে সময়মত কিনে নেবে। কীসের জন্যে এমন মানুষের সঙ্গে এখানে থাকা!

গিরিবালাকে ডেকে নয়নতারা বললে—গিরিবালা শোন, তুমি তোমার মেয়ের কাছে একটু যাবে বলছিলে না, আজকে যেতে পারো, আজকে আমার কোনও কাজ নেই, তুমি সন্ধ্যেবেলা এলেই আমার চলবে—

গিরিবালা খুব খুশী। তার মেয়ে অন্য একজনের বাড়িতে কাজ করে। বেশ কিছু দূরে। অনেক দিন মেয়েকে দেখেনি সে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে গিরিবালা চলে গেল। নয়নতারা সদর দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর শাড়িটাও বদলে নিলে। আর একটু পরেই

সে বেরিয়ে যাবে। গিয়ে স্টেশন থেকে দুটোর ট্রেন ধরবে। সেখান থেকে একেবারে কলকাতায়।

দরজাটা অবশ্য খোলা পড়ে থাকবে। হয়ত চোর-ডাকাত ঢুকবে। তা ঢুকুক। এ সংসারে যখন সে আর থাকছে না তখন এখানে চুরি হলেই বা কী আর ডাকাতি হলেই বা কী! তার বয়ে গেল। একদিন নিখিলেশের জন্যে সে অনেক করেছে। তার যখন কোনও প্রতিদান সে পায়নি তখন আর তার নিখিলেশের জন্যে মায়া কীসের!

গিরিবালা অনেকক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছে। নয়নতারা একটা ব্যাগের ভেতর কাপড়ের বাণ্ডিলটা পুরে নিয়ে উঠলো। তারপর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। মাথার ওপরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। নয়নতারার মনের ভেতরেও সেই ঝাঁঝের ছোঁয়াচ এসে উত্তাল হয়ে উঠলো। যাক্, সমস্ত রসাতলে যাক, যাক্, আর কোনও শৃঙ্খল নেই তার কোথাও। গিরিবালা এসে হয়ত অবাক হয়ে যাবে। তারপর নিখিলেশ এসেও আরো অবাক হয়ে যাবে সব শুনে!

একটা চিঠি অবশ্য লিখে রেখে গেলে হতো। কিন্তু না, কেন লিখতে যাবে, কাকে লিখতে যাবে? নিখিলেশকে? নিখিলেশ তার কে? কেউ না—

হঠাৎ বাইরে দরজার কড়া নড়ে উঠলো। এই অসময়ে আবার কে এল! গিরিবালা নাকি? গিরিবালা হয়ত কোনও জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। সেটা নিতে এসেছে!

—কে? গিরিবালা?

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দিতেই অবাক হয়ে গেছে নয়নতারা। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সদানন্দ!

সদানন্দকে হঠাৎ দেখে নয়নতারা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোতে পারলো না।

কিন্তু সদানন্দ নিজেই আগে কথা বললে—বড় অসময়ে এসে পড়েছি আমি—

তারপর নয়নতারার শাড়ি সাজগোজ দেখে কী একটা অনুমান করলে। বললে—

তুমিও কোথাও বেরোচ্ছিলে নাকি?

তবু নয়নতারার মুখে কোনও কথা নেই। হাতের কাপড়ের ব্যাগটা সে তখন লুকোতে ব্যস্ত।

সদানন্দ আবার জিজ্ঞেস করলে—আমি সকালবেলার ট্রেনেই আসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু রেল-বাজার থেকে সে ট্রেনটা ধরতে পারিনি। তা তুমি বুঝি আজকে অফিসে যাওনি?

নয়নতারা পেছন ফিরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে—এসো, ভেতরে এসো—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—নিখিলেশবাবু? নিখিলেশবাবু কোথায়?

—তাঁর আসতে একটু দেরি আছে—তুমি এসো—

বলে নয়নতারা সোজা নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। সদানন্দকেও যেতে হলো তার পেছন পেছন। সদানন্দকে একটা চেয়ারে বসতে বলে নয়নতারা একটু দূরে আলমারিটার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললে—তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে—তোমার শরীর কেমন আছে?

সদানন্দ বললে—ভালো—

নয়নতারা বললে—কই, তুমি বসছো না যে, বোস, এই চেয়ারটাতে বোস—

সদানন্দ বললে—আমি বসতে আসিনি, শুধু দুটো কথা বলে চলে যাবো।

নয়নতারা বললে—এতদূর থেকে এসেছো, একটু বসবে না?

সদানন্দ বললে—কিন্তু তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে—

নয়নতারা বললে—আমি না বসলে বুঝি তোমার বসতে নেই! আচ্ছা এই আমি বসছি, হলো তো! এবার তুমি বোস—

সদানন্দ এবার বসলো। বললে—সত্যি বলছি আমি তোমার এখানে বসবো বলে আসিনি! আর তা ছাড়া...

নয়নতারা বললে—তা ছাড়া কী? বলতে বলতে থেমে গেলে যে?

সদানন্দ বললে—তা ছাড়া এখন এখানে বসবার অধিকারও তো আমার নেই—

নয়নতারা স্বীকার করলে—তা অবশ্য নেই। কিন্তু এককালে তো সে অধিকার ছিল।

সদানন্দ বললে—তা হয়ত ছিল—

—আবার 'হয়ত' বলছো কেন? এককালে আমাকে সাত পাকে বেঁধে তুমি তো আমার ওপর তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলে!

সদানন্দ বললে—সে-সব পুরোন কথা এখন কেন আবার তুলছো?

নয়নতারা বললে—ঠিক বলেছ, তবে তুমি অধিকারের কথা তুললে বলেই আমায় এত কথা বলতে হলো।

সদানন্দ বললে—এতদিন পরেও দেখছি তুমি কিছু ভুলে যাওনি—

নয়নতারা বললে—পুরুষমানুষ হলে অবশ্য ভুলেই যেতুম। কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, ভুলবো কী করে বলো!

সদানন্দ বললে—আমি কিন্তু ভুলে যাইনি, পুরুষমানুষ হলেও আমি কিছুই ভুলতে পারিনি—

নয়নতারা বললে—তুমি মহানুভব, মহাপুরুষ, তোমার সঙ্গে কার তুলনা!

সদানন্দ বললে—শেষকালে তুমিও আমাকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে, আমাকে ভুল বুঝলে?

নয়নতারা বললে—ছিঃ, এত কাণ্ডের পরেও আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা?

সদানন্দ সে-কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা জিজ্ঞেস করলে—নিখিলেশবাবু কোথায়?

নয়নতারা বললে—দেখছি তুমি আমার কথা এড়িয়ে যেতে চাইছো!

—এড়াচ্ছি না, শুধু জিজ্ঞেস করছি নিখিলেশবাবু কোথায়?

—একবার তো বলেছি সে অফিসে গেছে, তার অফিস থেকে আসতে দেরি হবে, তবু আবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? অফিসে যারা যায় তারা কী দুপুরবেলা বাড়ি থাকে। তুমি কী তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছ?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও আমার দরকার ছিল। তোমার সঙ্গেও আমার দরকার।

নয়নতারা বললে—তা তাঁর সঙ্গে দরকার থাকলে ভোরবেলা এলেই পারতে—

—তা তো আসতে পারতুম। কিন্তু ওই যে বললুম, যেখানে গিয়েছিলুম সেখানে একটু দেরি হয়ে গেল বলে আগের ট্রেনটা ধরতে পারলুম না। ভেবেছিলুম তোমাদের কারো সঙ্গে দেখা হবে না। কারণ আমি জানতুম তুমিও অফিসে যাও—

—তাহলে এ সময়ে আসতে গেলে কেন?

—ভেবেছিলুম, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো, তার চেয়ে তোমার বাড়িতে এসে তোমার ঝি-এর হাতে একটা চিঠি লিখে রেখে দিয়ে চলে যাবো।

—চিঠি?

—হ্যাঁ, একটা চিঠিতে সব কিছু কথা লিখে রেখে চলে যাবার ইচ্ছেই ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নয়নতারা বললে—দেখা হয়ে খুবই খারাপ হলো না?

সদানন্দ বললে—কেন, খারাপ কেন হতে যাবে?

নয়নতারা বললে—দেখা না হলে আমার মুখ দেখবার দায় এড়াতে পারতে—

সদানন্দ বললে—অমন করে কথা বলছো কেন? তোমার মুখ দেখতে কী আমার ভালো লাগে না?

—ভালো লাগে? সত্যিই বলছো ভালো লাগে?

সদানন্দ বললে—থাক, ও-সব কথা থাক।

নয়নতারা বললে—না, ও-সব কথা থাকবে কেন? বলো আমার মুখ দেখতে তোমার ভালো লাগে কিনা। বলো—

সদানন্দ বললে—ও-কথা বার বার জিজ্ঞেস করো না—

—কেন, জিজ্ঞেস করলে দোষ কী?

সদানন্দ বললে—না, জিজ্ঞেস করতে নেই—

নয়নতারা বললে—কেন জিজ্ঞেস করতে নেই? আমার বিয়ে হয়ে গেছে বলে?

সদানন্দ বললে—আমার এ-সব কথা বলতে ভালো লাগছে না। তুমি তো জানো আমার জীবনটাই অভিশপ্ত।

নয়নতারা বললে—তার জন্যে তো তুমি নিজেই দায়ী।

সদানন্দ বললে—না, তুমি ভুল বলছো। তুমি সব জেনেও আমাকেই দোষী করছো। আমি কী স্বাভাবিক হতে চাইনি? আমি কী আর পাঁচজনের মত বিয়ে করে সুখে সংসার করতে চাইনি? আমি কী চাইনি যে আর সবাই যেমন সুখ-দুঃখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, পাপ-পূণ্য ভালো-মন্দ নিয়ে সংসার করে, তেমনি আমিও করি? আমি তো তাই-ই চেয়েছিলুম।

নয়নতারা বললে—তাই করলেই তো ভালো হতো, তাহলে আমার জীবনটা আর এমন করে নষ্ট হয়ে যেত না—

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—নষ্ট? তোমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে?

—নষ্ট হয়নি?

—কেন, তুমি তো আমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়ে বেঁচেছ। তুমি আমার চেয়ে ভালো স্বামী পেয়েছ, তিনি তোমায় লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো চাকরি করিয়ে দিয়েছেন। তুমি তো বেশ সুখেই কাটাচ্ছো। তোমার জীবন নষ্টটা হলো কোথায়? বরং আমার স্ত্রী হয়ে থাকলে তো সেই শ্বশুর-শাশুড়ীর তাঁবে থেকে সারাদিন ঘোমটায় মুখ ঢেকে কাটাতে হতো, সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে পেতে না। এমন করে স্বাধীন ভাবে রাস্তায়-ঘাটে-ট্রেনে যখন যেখানে খুশী ঘুরতেও পারতে না। বিয়ে করে তুমি বেশ ভালোই আছো—

নয়নতারা চোখ দু'টো ছল-ছল করে উঠলো।

বললে—বাইরে থেকে সবাই তাই-ই ভাবে—

সদানন্দ বললে—তুমি ঠিকই বলেছ নয়নতারা, বাইরে থেকে যা দেখি সেটা মোটেই আসল দেখা নয়। কিন্তু সংসারে সবাই সবাইকে আমরা বাইরে থেকে দেখেই তো বিচার করি। তাই তো আমি সকলের চোখে পাগল। তোমার মত স্ত্রী পেয়েও আমি তোমার সঙ্গে সংসার-ধর্ম করলুম না, এও বাইরের লোকের কাছে একরকম পাগলামিই বই কী।

নয়নতারা এ-কথার জবাবে কিছুই বললে না, শুধু চুপ করে রইল।

সদানন্দ বললে—কিন্তু বাইরের লোকে যা-ই বলুক, আজ তোমাকেই আমি জিজ্ঞেস করি, তুমিও কি আমাকে তা-ই বলবে? আমার এ-সব কাজকে কি তুমিও পাগলামি বলবে?

তবু নয়নতারা কোনও উত্তর দিলে না।

সদানন্দ বলতে লাগলো—বলো, জবাব দাও? অমন করে চুপ করে থেকো না, একটা কিছু বলো তুমি!

নয়নতারা বললে—আমি কী বলবো?

সদানন্দ বললে—কেন, বলতে পারো না কেন কপিল পায়রাপোড়া গলায় দড়ি দিয়ে মরে? কেন মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক চৌধুরীদের অত্যাচারে পাগল হয়ে যায়? কেন আমাদের ফুলশয্যার রাত্রে কালীগঞ্জের বউ খুন হয়ে যায়? কী দোষ করেছিল তারা? কার সুখ-শান্তির পথে তারা কাঁটা হয়েছিল? তাদের সর্বনাশের জন্যে কারা দায়ী? কে তার দায়ভাগ নেবে? কে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে?

নয়নতারা এতক্ষণে কথা বললে। জিজ্ঞেস করলে—তা এত লোক থাকতে অন্যের পাপের দায় তুমি নিতে যাবে কেন?

সদানন্দ বললে—তা আমি যদি না নিই তো কে সে দায় নেবে?

—কেন, আর কেউ নেই? মাথার ওপর তো ভগবান আছেন। তিনি তো সব দেখছেন, তিনিই তার বিচার করবেন।

—কিন্তু তুমি কি বলতে চাও ভগবানের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকবো? তাহলে তোমার সেই ভগবান আমাদের বুদ্ধিই বা দিয়েছেন কেন? বিচার শক্তি দিয়েছেন কেন?

নয়নতারা বললে—ওই যাঃ দেখেছ, কথা বলতে বলতে একেবারে ভুলে গিয়েছি, তুমি বোস, তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি—

সদানন্দ বললে—না, তার দরকার নেই, একদিন এখানে এসে তোমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করে গিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমি নিখিলেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। তিনি যখন নেই, তখন আর কী করবো, আর একদিন বরং আসবো, এখন আমি যাই—

বলে সদানন্দ উঠে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু নয়নতারা উঠতে দিলে না। জোর করে বসিয়ে দিলে। বললে—না, তুমি বোস, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

—কথা? আমার সঙ্গে?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কথা বলার এমন সুযোগ হয়ত আর কোনও দিন কখনও আসবে না। আর ঠিক এমন দিনে তুমি এসেছ যখন আমিও অফিসে যাইনি, বাড়িতে একলা রয়েছি—

সদানন্দ বললে—সত্যিই তো, অফিসে যাওনিই বা কেন?

নয়নতারা বললে—সেই কথা বলবার জন্যেই তো আমি তোমাকে বসতে বলছি, জানো, আমি আর কোনও দিন অফিসে যাবোও না—

—সে কী? অফিসে যাবে না কেন?

নয়নতারা বললে—আর তা ছাড়া তুমি একটু পরে এলে হয়ত আমার সঙ্গে তোমার দেখাও হতো না—আমি এ-বাড়ি ছেড়ে এখুনি চলেই যাচ্ছিলুম। এই দেখো, আমার কটা কাপড়-ব্লাউজ এই ব্যাগটায় পুরে নিয়ে বাড়ি থেকে এখুনি বেরিয়েই যাচ্ছিলুম। উঠোনে নেমে সবে সদর-দরজাটা খুলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় তোমার কড়া নড়ে উঠলো—এমন কি আমি চলে যাবো বলে আমার ঝিকে পর্যন্ত বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি, তা জানো—

সদানন্দ বললে—কেন? কোথায় যাচ্ছিলে?

নয়নতারা বললে—জানি না কোথায় যাচ্ছিলুম, এখন আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে নরকে যেতেও আমার আপত্তি নেই, এর চেয়ে নরকও বুঝি আমার কাছে ঢের ভালো—

সদানন্দ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—হঠাৎ তোমার মনের অবস্থা এ-রকম হলোই বা কেন?

নয়নতারা বললে—তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, সব তোমার জন্যে।

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমি কী দোষ করলুম? তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও বিরোধ বাধে এমন কিছু করবার কল্পনাও তো আমি কখনও করিনি। আমি যখন ট্রেনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম তখন তুমি নিজেই তো আমাকে এখানে তোমার বাড়িতে এনে তুলেছিলে। তখন আমার জ্ঞান থাকলে আমি কিছুতেই আসতুম না। রাস্তায় বরং মরে পড়ে থাকতুম তবু তোমার এখানে আসতুম না—

নয়নতারা বললে—তা আমি জানি। তুমি বরাবর আমাকে ঘেন্না করো তাও আমার অজানা নয়—

সদানন্দ বললে—না, সেজন্যে নয়, আমি চেয়েছিলুম তুমি সুখী হও। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ফলে তোমার কপালে যে কষ্টভোগ হয়েছিল, সে-সব আমি নবাবগঞ্জের দিদিমার কাছে আগেই শুনেছিলুম—

—তা তুমি কি আগে জানতে যে আমার আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সদানন্দ বললে—না, সেটা জানলুম তোমার এখানে রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে। তোমরা পাশের ঘরে যা-সব কথা বলতে সব আমার কানে আসতো। তোমাদের কথাবার্তা শুনেই আমি জানতে পেরেছিলুম নিখিলেশবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তিনি তোমাকে চাকরি করে দিয়েছেন, তুমি আমার জন্যে তোমার গলার হার বাঁধা দিয়ে আমার চিকিৎসার খরচ চালাচ্ছো—

—আমার বিয়ের কথা শুনে কি তোমার খুব কষ্ট হয়েছিল?

সদানন্দ বললে—না, বরং শুনে আনন্দই হয়েছিল।

—আনন্দ হয়েছিল?

—হ্যাঁ, তা আনন্দ হবে না? আমি তোমাকে স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে না পারলেও অন্য একজন কেউ তোমাকে সেই মর্যাদা দিয়েছে এ জানতে পারলে আনন্দ হবে না?

কথাগুলো শুনে নয়নতারা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। সে মুখটা নিচু করে নিলে। বললে—না, তোমার ধারণা ভুল!

—ভুল?

—হ্যাঁ, তুমি জানো না তাই ও-কথা বলছো। জানলে আর বলতে না। স্ত্রীর মর্যাদা পাওয়া আমার কপালে নেই।

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল! জিজ্ঞেস করলে—কেন নিখিলেশবাবু তো বেশ ভালো লোক। তিনি নিজে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, পরীক্ষায় পাস করিয়েছেন, পাস করে তোমাকে চাকরি করে দিয়েছেন। তিনি তোমার জন্যে যা করেছেন তা ক'জন স্বামী করে? সেদিক থেকে তিনি তো আমার চেয়ে তোমার অনেক ভালো স্বামী—

নয়নতারা বললে—না, তুমি জানো না ও যা-কিছু করেছে সব ওর নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে। আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, আমাকে একজামিনে পাস করিয়ে চাকরি করে দিয়েছে, আমাকে বিয়ে করেছে. সবই করেছে বটে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সব ওর নিজের স্বার্থে—

সদানন্দ বললে—কেন, এতে নিখিলেশবাবুর স্বার্থটা কী?

—স্বার্থ টাকা?

—টাকা!

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, আমি আগে জানতুম না। আগে বুঝতে পারিনি। বুঝলুম তোমাকে এ-বাড়িতে নিয়ে আসবার পর। তোমাকে দেখে ওর মনে প্রথমেই টাকা খরচের কথাটা উঠলো। প্রথমেই বললে—তোমাকে হাসপাতাকে পাঠিয়ে দিলুম না কেন। আচ্ছা, তুমিই বলো তো, মানুষের প্রাণটা বড়, না টাকা বড়? ও কী করে বলতে পারলে তোমাকে হাসপাতালে পাঠাবার কথা? হাসপাতালে পাঠালে কি তুমি বাঁচতে? সেখানে মাইনে করা নার্স দিয়ে কি তোমার সত্যিকারের সেবা হতো?

তারপর একটু থেমে বললে—তারপর যখন তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে আমার অফিস কামাই করতে হলো তখন ওর সে কী রাগ! রাগ কেন বুঝতে পারলে তো?

—না।

—রাগ এইজন্যে যে আমার মাইনে কাটা যাচ্ছে। আসলে আমার টাকাটার ওপরেই ওর যত লোভ, আমার ওপরে ওর লোভ নেই। জিনিসটা যত দেখতে লাগলুম ততই আমার খারাপ লাগতে লাগলো। মনে হলো তাহলে এতদিন আমি যা-কিছু ভেবেছি সব ভুল। মনে হলো আমি এমন একটা লোকের হাতে পড়লুম যে আমাকে টাকা উপায়ের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তোমার অসুখের সময় কিছু টাকা খরচ হয়েছিল বলে আমার সঙ্গে কিছুদিন কথাই বলেনি, এত রাগ হেয়েছিল ওর! শেষে একদিন ও বলে গেল ও নবাবগঞ্জে যাবে—

—নবাবগঞ্জে? কেন?

—আমার গয়নাগুলো তোমার কাছ থেকে চেয়ে আনবে বলে।

—তোমার গয়না?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আসলে সব মিথ্যে কথা। ওই করে মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভোলাতে চেয়েছিল। আসলে টাকার ওপরেই ওর যত লোভ তা জানো! ও তো জানতো আমার বিয়ের সময় আমি কত গয়না পেয়েছিলুম! তাই আমাকে পেয়ে ওর লোভ মেটেনি, ওই গয়নাগুলো পেলে তবে ওর মনে শান্তি হতো। এতদিনে বুঝতে পারলুম যে আমার গয়নাগুলোর ওপরই ওর যত লোভ ছিল—

সদানন্দ চুপ করে রইল। নয়নতারা বললে—কই, তুমি কিছু কথা বলছো না যে?

সদানন্দ বললে—আমি এ-ব্যাপারে কী বলবো!

—কিন্তু তুমিই তো এখুনি বলছিলে আমি খুব সুখে আছি। এখন আমার সুখের নমুনা শুনলে তো! আমি যে এখানে কত সুখে আছি তা তো জানতে পারলে? এর পরেও তুমি বলবে আমি সুখে আছি? আর তারপর নবাবগঞ্জ থেকে এসে ও কি বললে জানো?

—নিখিলেশবাবু কি সত্যি-সত্যিই নবাবগঞ্জ গিয়েছিলেন নাকি?

নয়নতারা বললে—না, আসলে যায় নি তো! কিন্তু মিছিমিছি কোথা থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললে নবাবগঞ্জে গিয়েছিলি। এসে বললে যে তুমি নাকি আবার বিয়ে করেছ! আর এমনই আমার পোড়া কপাল যে আমিও ওর সে-কথা বিশ্বাস করলুম।

—বিশ্বাস করলে?

—না বিশ্বাস করে করবো কী বলো? আমিও যে তখন সন্দেহের দোলায় দুলছি। তুমি

হঠাৎ আমাদের বাড়ি থেকে না বলে চলে যাওয়ার পর থেকে আমার যে সে মনের কী অবস্থা তা যদি তুমি জানতে! তোমার খবর জানবার জন্যে আমি যে তখন কী ছট্‌ফট্ করছি! অসুখ শরীর নিয়ে তুমি চলে গেলে, আর আমার ভাবনা হবে না? কেন তুমি অমন করে আমাকে না-জানিয়ে চলে গেলে বলো তো? আমাকে বলে গেলে তোমার কী এমন ক্ষতিটা হতো? আমি কি তোমাকে জোর করে ধরে রাখতুম? না তোমায় জোর করে ধরে রাখবার অধিকার আমার আছে! আমি তোমার কে বলো না যে আমার কথা তুমি রাখতে যাবে?

সদানন্দ কথার মধ্যেখানে হঠাৎ বললে—কটা বাজলো? কই, নিখিলেশবাবু তো এখনও আসছেন না!

নয়নতারা বললে—না আসুক গে। না এলেই তো ভালো। তার আসতে যত দেরি হয় ততই তো ভালো। একবারে না এলে আরোই ভালো—ওর মুখ দেখতেও আজকাল আমার ঘেন্না হয় তা জানো! অথচ আগে আমি অতটা বুঝতে পারি নি! বুঝতে পারলুম নবাবগঞ্জে গিয়ে।

—তুমিও নবাবগঞ্জে গিয়েছিলে? কেন? কী করতে?

—তবে সত্যি কথা শুনবে? তোমাকে দেখতে। ভাবলুম দেখেই আসি না গিয়ে তুমি কেমন বিয়ে করলে! তোমার বউ কেমন দেখতে হলো! যখন দেখলুম সব ওর মিথ্যে কথা সেই থেকে আর ওর সঙ্গে কথা বলি নি। কথাও বলি নি, অফিসেও যাই নি। কীসের জন্যে চাকরি করবো? কার জন্যে চাকরি করবো? আর চাকরিই যদি করতে হয় তো আমি মেসে থেকে চাকরি করবো, মেয়েদির বোর্ডিং-এ থেকে চাকরি করবো। আমার চাকরির টাকাতে ও মদ খাবে তা আমি আর কিছুতেই সহ্য করবো না। তা এই জন্যেই তো আমি এখুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলুম, তুমি এসে না পড়লে এতেক্ষণে আমি হয়ত কলকাতায় পৌঁছে যেতুম—

তারপর হঠাৎ সদানন্দর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে—তা তুমি যখন এসেই পড়েছ তো তোমাকেই জিজ্ঞেস করি, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

—কী, বলো?

—কিন্তু তোমাকে বলতে আমার বড় ভয় করছে!

—কী কথা, বলোই না?

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সদানন্দ বুঝতে পারলে না। বললে—কোথায়?

—যেখানে তুমি যাবে, সেখানেই আমি যাবো। তোমার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে পারলে আমি বেঁচে যাই, আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না। এ-বাড়ি আমার কাছে এখন বিষ হয়ে গেছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট আমার কাছে এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, এখানে আর একদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো, সত্যি। এর থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো। আমাকে তুমি নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে?

সদানন্দ এ কথার কিছু জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

নয়নতারা এবার আরো কাছে ঝুঁকে এল। বললে—কই, তুমি কিছু কথা বলছো না যে? আমি সঙ্গে থাকলে কি তোমার খুব খারাপ লাগবে? সত্যি বলছি, আমি তোমার বোঝা হয়ে থাকবো না, তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো, দরকার হলে তুমি না হয় অন্য ঘরে শোবে, আর আমি শোব অন্য ঘরে। রাত্তিরে না-হয় কেউ কারো মুখই দেখবো না, তাতে তুমি রাজি তো? বলো তুমি রাজি?

সদানন্দ এবারও কোনও কথা বললে না।

নয়নতারা বললে—দেখ, আমি চলে যাবো বলে আমার ঝিকে পর্যন্ত অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, আর আমার সঙ্গে কিছু নেবারও নেই। এ-বাড়ির একটা জিনিসও আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই না। অথচ এর অনেক জিনিস আমার নিজের টাকায় কেনা। একদিন এসব জিনিসের ওপর অনেক মায়া ছিল আমার। একদিন সাধ ছিল কলকাতায় একটা বাড়ি করবো, বেশ মনের মতন বাড়ি। কিন্তু সে-সব শখ এখন ঘুচে গেছে আমার—এখন মনে হয় আমি এতদিন যা-কিছু করেছি সব ভুল করে করেছি। তা সে যাক গে, পুরোন কথা এখন আর না ভাবাই ভালো। এখন না হয় আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো। তুমি যদি বলো তো আমার চাকরিটাও আমি ছেড়ে দিতে পারি—

তারপর হঠাৎ যেন আবার নয়নতারার খেয়াল হলো। বললে—কই, তুমি কিছু বলছো না যে? আমিই কেবল বক্‌বক করে মরছি। তুমি কি আমাকে সঙ্গে নেবে?

সদানন্দ বললে—তার চেয়ে আমি বরং উঠি, নিখিলেশবাবু তো এখনও এলেন না।

নয়নতারা বললে—তুমি বুঝি চাও সে এখন এসে পড়ুক।

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

নয়নতারা বললে—কেন? কেন তুমি চাও সে আসুক! তাই যদি চাও তাহলে তুমি বরং এখানে থাকো, আমিই যাই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

সদানন্দ বললে—কিন্তু তুমি না-ই বা গেলে!

নয়নতারা বললে—তুমি বলছো কী? তুমি কি চাও আমি ওই মিথ্যে-বাদীটার সঙ্গে সংসার করি? তোমার যদি আমার মত অবস্থা হতো তো তুমিই কি এখানে থাকতে পারতে? কোনও মানুষ তা পারে? আমি বলে তাই এতদিন পেরেছি। অন্য কোনও মেয়ে হলে পারতো না, এ তোমায় আমি বাজি রেখে বলতে পারি—

বলে নয়নতারা কাপড়ের ব্যাগটা আবার হাতে তুলে নিলে। বললে—তাহলে তুমি যাবে না তো? সত্যিই যাবে না?

সদানন্দ কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

—তাহলে তুমি থাকো, আমি যাই, এখুনি একটা ট্রেন আছে কলকাতার!

বলে নয়নতারা যাবার জন্যে পা বাড়াত গেল।

সদানন্দ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তাহলে আমাকেও উঠতে হয়। তুমি চলে গেলে আমি একলা কী করে এ-বাড়িতে বসে থাকি!

নয়নতারা বললে—তা একলা বসে থাকতে তোমায় কে বলেছে? আমি তো বলছি তুমি চলো। আমি তো বলছি তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানেই যেতে রাজি। নবাবগঞ্জে যেতে বললে আমি না-হয় নবাবগঞ্জেই যাবো—তুমি বললে আমি। আমার চাকরিটাও ছেড়ে দিতে পারি তা জানো! চলো, চলতো চলো, দেরি করলে হয়তো কেউ আবার এসে পড়তে পারে—

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হতেই নয়নতারার মুখটা কেমন যেন ভয়ে শুকিয়ে গেল। নিজের মনেই যেন বলে উঠল—এমন সময় আবার কে এল?

সদানন্দ যেন এতেক্ষণে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে মনে হলো। বললে—বোধ হয় নিখিলেশবাবু এলেন—

কথাটা শুনে নয়নতারা আরো মন-মরা হয়ে গেল। যদি সত্যিই নিখিলেশ হয়! অথচ গিরিবালা বাড়িতে নেই। তাকে নিজে গিয়েই দরজা খুলে দিতে হবে! নয়নতারা উঠোন পেরিয়ে সদর দরজাটা খুলতে গিয়েও একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

তারপর বললে—কে?

—আমি দিদিমণি! আমি?

গিরিবালার গলা। গলাটা শুনেই নয়নতারা দরজার খিলটা খুলে দিলে।

—কী হলো? তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এল যে?

গিরিবালা ভেতরে ঢুকে বললে—মেয়ে ভালো আছে দেখলুম তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম দিদিমণি, ভাবলুম তুমি একলা আছো বাড়িতে—

নয়নতারা বললে—তা মেয়ের কাছে আরো একটু থাকলে না কেন? আমি তো তোমাকে বলেই ছিলুন, আজকে আমার তেমন কোনও তাড়া নেই, তুমি দেরি করে এলেই পারতে—

সদানন্দ ঘরটার ভেতরে বসে বসে সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। হঠাৎ আবার নয়নতারার কথা কানে এল—তাহলে যখন এসে গেছ তখন আমার একটা কাজ করো দিকিন উনুনে তাড়াতাড়ি আগুন দিয়ে দুজনের একটু চা করে দাও—

সদানন্দর তখন আর একলা বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। তার কেবল মনে হচ্ছিল নিখিলেশবাবু এসে পড়লেই যেন ভালো হয়। এদের স্বামী-স্ত্রীর মন-কষাকষির মধ্যে সে কেন মাথা গলাবে! নিজের সংসার নেই বলে পরের সংসারকে কেন সে ভাঙতে যাবে! কেন পরের ক্ষতিসাধনের কারণ হবে!

কিন্তু তখন কি সদানন্দ জানত যে যাদের ভালো করার জন্যে তার এত প্রচেষ্টা, যাদের মঙ্গল করার ব্রত নিয়ে সে এতদিন জীবন প্রদক্ষিণ করে এসেছে, তারাই একদিন তার সমস্ত স্বার্থত্যাগকে পরিহাস করবে? তার এতদিনকার সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধন সকলের সমবেত চেষ্টায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে? কত বুদ্ধ, কত চৈতন্য, কত মহম্মদ, কত নানক আরো কত মহাপুরুষ এসে কত জীবন দিয়ে কত সত্যই তো প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, কিন্তু ক্ষণকালের জৌলুসের চোখ-ধাঁধানো আলোয় কখন যে এই চিরকালের সত্যটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তা কি কেউ টের পেয়েছে!

তা হয়ত সদানন্দর সেই শিক্ষারও দরকার ছিল! দরকার ছিল তার এই মোহ-ভঙ্গের! নইলে যে-মানুষ সব কিছু ত্যাগ করবার শক্তি অর্জন করেছে সে কেন নৈহাটির একটা অখ্যাত বাড়িতে আবার ফিরে আসতে গেল? কীসের লোভে? কার আকর্ষণে?

আর সদানন্দ যদি এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে নৈহাটিতে না-ই আসতো সে আসামী হতো কী করে? আর সদানন্দ একজন আসামী হয়েছিল বলেই তো এ-উপন্যাসের অবতারণা।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

সমাজের মধ্যবিত্ত আর অল্পবিত্ত মানুষের মন তখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যেখান থেকে বেশি দূরে আর কারোর নজর যায় না। তাদের কাছের জিনিস নিয়েই তারা তখন উদ্‌ভ্রান্ত। তখন তাদের সামনে ছোটই বড় হয়ে উঠেছে, আর বড়ই হয়ে উঠেছে ছোট। সমসাময়িককেই তারা চিরকালের বলে তারস্বরে ঘোষণা করতে শুরু করেছে আর চিরকালের কথাটা তখন আর কারো মাথায় ঢুকছে না। দেশের নতুন সংবিধান তখন চালু হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে শুধু পাওনা-গণ্ডার কথাটাই সবিস্তারে লেখা হয়েছে, মানুষের কর্তব্য বলেও যে একটা জিনিস আছে কোথাও সেটার কোনও উল্লেখ নেই তাতে। সেখানে লেখা আছে আজ থেকে সব মানুষের খাওয়া-পরার দায়টা আমরা নিলাম। কাউকে বেকার থাকতে দেব না, সকলকে আমরা লেখাপড়া শেখাবো, সকলের জন্যে একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় দেবার দায়িত্বটা আমাদের। সুখী সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলবার সংকল্পের কথাটাও আমরা

পাকা খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখে গেলাম। কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না। গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের জয় আমরা ঘোষণা করছি, আজ এই ঘোষণাই আমাদের ভবিষ্যতের বংশধরদের রক্ষাকবচ হোক।

কিন্তু একটা কথা শুধু তাঁরা সেখানে লিখতে ভুলে গেলেন যে মানুষকে তার বদলে কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। লিখতে ভুলে গেলেন যে দেশের মানুষেরও কিছু দায়িত্ব আছে। আর তা লেখা নেই বলেই সরকারের কী করা উচিত সেটা সবাই জানতে পারলে, কিন্তু দেশের লোকেদের কী করা উচিত তা আর কেউ জানতে পারলে না। জানতে পারলে না যে মানুষকেও সৎ হতে হবে, মানুষকেও মানুষ হতে হবে। জানতে পারলে না বলেই চৌধুরী মশাই-এর ফেলে যাওয়া সম্পত্তির ভাগের ওপর প্রকাশ মামার অত লোভ। তাই সাহেব পাড়ায় 'ম্যাসাজ ক্লিনিক' খোলবার জন্যে বাতাসীকে মানদা মাসির অত খোশামোদ! তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা কিছু ব্যবসা করে বড়লোক হবার জন্যে নিখিলেশের অত অস্থিরতা।

প্রতিদিনের মত সেদিনও নিখিলেশ অফিস থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু চারদিকে বড় বড় বাড়ি দেখেই তার মনটা কেমন বিষিয়ে গেল। এরকম প্রতিদিন তার মন বিষিয়ে যায়। মনে হয় সকলেরই সব কিছু হলো, শুধু আমার কিছু হলো না। আমিই চিরকাল কেরানী রয়ে গেলাম। রাস্তা দিয়ে একটা চকচকে ঝকঝকে নতুন গাড়ি দেখলে কেবল একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকে সে। নিখিলেশের কেবল মনে হতো আমরা হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা করে মরছি আর ওরা কেমন বেশ আরাম করে গাড়ি চড়ে চলেছে!

সেদিন আর এক কাণ্ড হলো। পাশ দিয়ে একটা গাড়ি যেতেই দেখলে পাশের কে একটা লোক গাড়ির গায়ে পচ্ করে একদলা পানের পিক ফেলে দিলে। গাড়ির মালিক লোকটা কিছুই জানতে পারলে না। গাড়িটা যেমন চলছিল তেমনি সামনের দিকে চলতে লাগলো। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত নিখিলেশ সেই দাগটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। ক্রিম রং-এর গাড়ির গায়ে পানের লাল পিকের দাগ। বাড়িতে গিয়ে ধুতে হবে। বেশ হয়েছে!

যে লোকটা পানের পিক ফেলেছিল তার দিকেও এবারে চেয়ে দেখলে নিখিলেশ। বেশ নির্বিকার কিন্তু লোকটা। গাড়ির গায়ে পানের পিক ফেলে যেন সে মহা কীর্তি করেছে এমনি একটা উল্লাস তার মুখেচোখে।

লোকটা নিখিলেশের দিকে চেয়ে নিজে থেকেই বলে উঠলো—এরাই মশাই ক্যাপিট্যালিস্ট, এরাই দেশের আসল শত্রু—

নিখিলেশ উত্তরে কিছু বললে না। লোকটা যেমন চলছিল তেমনি চলতে চলতে আবার ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু নিখিলেশের মন থেকে ঘটনাটা অত সহজে মুছলো না।

নিখিলেশের মনে হলো, সত্যিই তো! এরাই তো পুঁজিবাদী। এই গাড়ির মালিকরা। নিখিলেশ নিজে কত পুলিসের লাঠি খেয়েছে, কতবার জেল খেটেছে, কতবার মদের দোকানে পিকেটিং করেছে, খদ্দর পরেছে, ইংরেজ বেটাদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে কত কী করেছে, আর সেই সাহেবরা যখন সত্যিসত্যিই চলে গেল তখন মাঝখান থেকে লুঠতে লাগলো কিনা অন্য লোকরা। যারা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে মজা লুঠতো, দেশ স্বাধীন হবার পরেও সেই তারাই আবার মজা লুঠতে লাগলো। এ কেমন বিচার! এর নাম কি স্বাধীন হওয়া?

নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যখন বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে যাবে তখন মনে হলো বাড়ির ভেতের যেন কাদের গলা শোনা যাচ্ছে। এ সময়ে বাড়িতে আবার কে এল! যেন পুরুষমানুষের গলার আওয়াজ মনে হচ্ছে!

তাড়াতাড়ি দরজার কড়াটা নাড়লে। দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে।

নিখিলেশ বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে—গিরিবালা, ও গিরিবালা—

নিখিলেশ বুঝতে পারলে তার কড়া নাড়ার পরই ঘরের ভেতরের কথাবার্তার শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। তাহলে কি নয়নতারা রোজই এই রকম করে! এই কারণেই অফিস-কামাই করে নাকি নয়নতারা!

ভেতর থেকে গিরিলালার গলা শোনা গেল—কে?

—আমি, দরজা খোল।

গিরিবালা দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশ ভেতরে ঢুকে রোজকার মত নিঃশব্দে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। এই ক'দিন এমনি করেই সে রোজ অফিস থেকে এসেছে আর নিঃশব্দে নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। তারপর নয়নতারা খেলে কি খেলে না, নিখিলেশই বা খেলে কি খেলে না তা নিয়ে দু'জনের কেউ মাথা ঘামায় নি। যেন নেহাৎ এক বাড়িতে থাকতে হয় তাই থাকা, এক সংসারে খেতে হয় তাই খাওয়া। তার বেশি আর কিছ নয়।

কিন্তু সেদিন প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো। নিখিলেশ উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই সেই মানুষটার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হলো।

—নমস্কার!

আশ্চর্য, তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করে আবার তাকেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নমস্কার করছে! এত বড় নির্লজ্জ মানুষ তো নিখিলেশ জীবনে আর কখনও দেখে নি!

বললে—আপনি? আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

সদানন্দ বললে—আমি অনেকক্ষণ এসেছি, সেই দুপুরবেলা। আপনার দেখা করবার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছি—

নিখিলেশ বললে—কিন্তু আপনি তো জানতেন আমি দুপুরবেলা অফিসে থাকি, দুপুরবেলা আমরা দু'জনেই অফিসে থাকি—

সদানন্দ বললে—তা জানতুম। তবু এসেছিলুম, কারণ আগেকার ট্রেনটা ধরতে পারিনি। দেরিতে এলেও আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে আমি যেতুম না—

নিখিলেশ বললে—আসলে যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, তার সঙ্গে দেখা যখন হয়ে গেল তখন আর আমার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলেন কেন? আমি তো আপনার কেউ না—

সদানন্দ বাধা দিয়ে বললে—ও-কথা বলবেন না। আপনার স্ত্রী আর আপনি আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই যে আমার দরকার—

নিখিলেশ বললে—বলুন, আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার?

নয়নতারা বললে—তুমি মুখ-হাত-পা ধুয়ে এসে বোস না। তুমি এখন অফিস থেকে এলে, এত তাড়াহুড়ো করবার কী আছে?

সদানন্দও বললে—হ্যাঁ আপনি এত দূর থেকে এলেন, একটু বিশ্রাম করে নিন, আমি বরং অপেক্ষা করছি—

নিখিলেশ বললে—না, আমার বিশ্রামের দরকার নেই, আপনি কী বলবেন বলুন! আপনার কী এমন জরুরী কাজ যে যে-সময়ে আমি বাড়িতে থাকি না বেছে বেছে ঠিক সেই সময়েই এসেছেন?

সদানন্দ বললে—আপনি অকারণে আমার ওপরে রাগ করছেন!

নিখিলেশ বললে—তা রাগ করা কি আমার অন্যায় হয়েছে? আপনি কেন এই অসময়ে আমাদের বাড়িতে এলেন? আপনি তো রবিবার দেখে আসতে পারতেন, যেদিন, ছুটির দিন, তা না এসে আজকে এলেন কেন? আপনার সঙ্গে নয়নতারার এমন কিসের সম্পর্ক যে এখনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন?

সদানন্দ বললে—এই আমার শেষ আসা নিখিলেশবাবু, এর পরে আমি আর কখনও আসবো না—

নিখিলেশ বলে—তা আমার অনুপস্থিতিতে আপনার কি পরস্ত্রীর কাছে আসা ঠিক হয়েছে?

এতক্ষণে নয়নতারা কথা বললে। বললে—তুমি চুপ করো, উনি এসেছেন বেশ করেছেন, দরকার হলে আবার আসবেন—

নিখিলেশও গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—না, আমি বলছি আসবেন না আমি আসতে দেব না—

নয়নতারা বলে উঠলো—তুমি আসতে না-দেবার কে? এ-বাড়ি আমারও বাড়ি! তুমি যদি ওঁকে আসতে না দাও আমি আসতে দেব ওঁকে, দেখি তুমি কী করতে পারো!

—তার মানে? তুমি আমার কথার ওপরে কথা বলো? এত দূর তোমার সাহস?

নয়নতারা বলে উঠলো—তোমারই বা এমন কী সাহস যে আমাকে তুমি চোখ রাঙাচ্ছো তুমি কি মনে করো তোমাকে বিয়ে করেছি বলে আমি তোমার ঝি? তুমি যা বলবে তাই-ই আমাকে শুনতে হবে?

—খবরদার বলছি আমার সঙ্গে অমন করে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে এসো না—

নয়নতারা বললে—তোমার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে আমার বয়ে গেছে! মানুষের সঙ্গেই মানুষ ঝগড়া করে, তুমি কি একটা মানুষ?

নিখিলেশ এ-কথার উত্তর না দিয়ে সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—আসুন সদানন্দবাবু, আমার সঙ্গে যে-কথা বলবার আছে তা আমার ঘরে এসে বলুন, এখানে কথা বলা যাবে না—

বলে সদানন্দর হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

নয়নতারা রাস্তা আটকে দাঁড়ালো। বললে—কেন তোমার ঘরে যাবে ও? যা বলবার এখানে আমার ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে বলবে, এখানে দাঁড়িয়েই ওর কথা তোমায় শুনতে হবে—

সদানন্দ নয়নতারার দিকে চাইলে। বললে—নিখিলেশবাবুর ঘরেই যাই না, তাতে তোমার কী আপত্তি? এতক্ষণ তো তোমার ঘরেই বসেছিলুম, এতক্ষণ তো তোমার সঙ্গেই কথা বললুম! তোমাকে যে-কথাগুলো বলেছি সেই কথাগুলোই ওঁকে ওঁর ঘরে বসেই বলি না—

নিখিলেশ বললে—আসুন আসুন—সব ব্যাপারে ওর কথা শুনতে হবে তার কী মানে আছে—

নয়নতারা বললে—তাহলে আমিও সেখানে থাকবো, আমার আড়ালে আমার বিরুদ্ধে কোনও কথা আমি বলতে দেব না—

বলে সেও দু'জনের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

নিখিলেশ সদানন্দকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েই বললে—দেখুন সদানন্দবাবু, আপনি হয়ত জানেন না, আমি আপনার মত বড়লোকের ঘরের ছেলে নই। প্রথম জীবনে স্বদেশী করেছি, ভেবেছিলুম দেশের কাজ করেই সারা জীবন কাটাবো, কিন্তু দিনকাল বদলে গেল।

আমরা যারা একসঙ্গে জেল খেটেছি তাদের মধ্যে কত লোক কত বড় হয়ে গেল। কেউ পেলে নুনের কনট্র্যাক্ট, কেউ পেলে ভালো চাকরি। আবার কেউ বা জেল-খাটার জন্যে পেলে ফরেন সারভিস। সবাই বড় বড় বাড়ি করে ফেললে কলকাতায়, তারা রাস্তা দিয়ে বড় বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায়, আমাকে দেখলে এখন চিনতেই পারে না। তাদের মধ্যে আমিই কেবল এখনও সেই গরীবই রয়ে গেলাম। আমার কিছুই হলো না। এমন সময়ে নয়নতারাকে বিয়ে করতে হলো। ভাবলুম দু'জনে চাকরি করবো। একজনের মাইনের টাকা জমিয়ে কলকাতায় একটা ছোটখাটো বাড়ি করবো। তারপরে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবো, যেমন আমার আগেকার বন্ধুরা কাটায়।

নয়নতারা মাঝখানে বলে উঠলো—এই সব কথা বলার জন্যেই তুমি ওঁকে তোমার ঘরে ডেকে নিয়ে এলে নাকি?

নিখিলেশ বললে—আমাকে বলতে দাও না সবটা—

সদানন্দ বললে—এ-সব কথা আমি জানি নিখিলেশবাবু, আমাকে কেন এ-সব কথা বলছেন?

নিখিলেশ বললে—আপনাকে এই জন্যে বলছি যে, আপনি আমার সমস্ত অশান্তির মূল—

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি?

—হ্যাঁ, আপনিই আমাদের সমস্ত অশান্তির জন্য দায়ী।

—কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না আমি আপনাদের অশান্তির জন্য কেন দায়ী হলুম!

নিখিলেশ বললে—আপনি যেদিন থেকে আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকলেন সেই দিন থেকেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরলো। যে ক'টা টাকা আমরা জমিয়েছিলুম সব নষ্ট হয়ে গেল। একটা সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছিলুম নয়নতারাকে, তাও আপনার অসুখের সময় হাত-ছাড়া হয়ে গেল। এখন আর আমাদের জমানো টাকা বলে কিছু নেই—

সদানন্দ শুনে খানিক চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমি স্বীকার করছি আমি দোষ করেছি। জ্ঞাতসারে নয়, অজ্ঞাতসারে আমি সব কিছুর জন্যে অপরাধী—

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই নিখিলেশ আবার বললে—আপনি যদি সত্যিই নিজেকে অপরাধী মনে করেন তো এখন তার প্রতিকারও আপনার হাতে—

সদানন্দ বললে—বলুন কী করলে তার প্রতিকার হবে?

—তাহলে নয়নতারার যে-সব গয়না আপনাদের কাছে ছিল সেগুলো অন্তত ফেরত দিন—অন্তত...

নয়নতারা হঠাৎ বলে উঠলো—না, চাই না আমার গয়না, তুমি কিছুতেই গয়নাগুলো দিও না ওকে, ও ওই গয়নাগুলোর লোভেই আমাকে বিয়ে করেছে তা জানো? গয়না-গুলোর ওপরেই ওর যত লোভ—

—কী? তোমার গয়নার ওপরে আমার লোভ?

নয়নতারা বলে উঠলো—হ্যাঁ, লোভই তো। তুমি মনে করেছ আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাবো? তুমি গয়নাগুলো আনতে নবাবগঞ্জে যাও নি?

—গিয়েছিলুম সে কি আমার জন্যে? সেই গয়না বিক্রি করে যখন টাকা হতো সে টাকা কি আমি নিজের নামে ব্যাঙ্কে রাখতুম?

সদানন্দ দু'জনের মধ্যস্থতা করবার জন্যে বললে—দেখুন নিখিলেশবাবু, সে-সব তো

অনেক দিন আগেকার ঘটনা, আমি সে-সব দেখিও নি, আর দেখলেও তা আমার মনে নেই। আপনি যদি বলেন সেই গয়নার কত দাম হতে পারে তো এখন আমি তা দিতে পারি—

নয়নতারা বাধা দিয়ে বললে—না, তা দিতে হবে না। সে-গয়না সে-টাকা আমি কিছুই নেব না—

নিখিলেশ বললে—কেন নেবে না? তোমার গয়না, তার ওপরে তো তোমার অধিকার আছে, নেবে না কেন?

—আমি যদি না নিই তো তোমার কী? আমার গয়নার ওপর তোমার অত লোভ কেন?

নিখিলেশ বললে—লোভের কথা বার বার বলছো কেন?

—তা বলবো না?

নিখিলেশ বললে—না, কেন বলবে? কেন? তোমার গয়না কি আমার গয়না নয়? তুমি আমি কি আলাদা?

নয়নতারা বলে উঠলো—নিশ্চয়ই আলাদা, আলাদা না হলে আমার গলার হার বাঁধা দিয়েছিলুম বলে কেন তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে?

নিখিলেশ রেগে উঠলো। বললে—কেন তুমি আবার সেই সব কথা তুলছো?

নয়নতারা বললে—তুলবোই তো। তুমি ভেবেছ আমাকে বিয়ে করেছ বলে তুমি আমার মাথা কিনে নিয়েছ? আমি কি তোমার মাইনে-করা ঝি যে আমাকে তুমি যা বলবে তাই সহ্য করবো?

—থামো, চুপ করো!

নয়নতারাও গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—কেন চুপ করবো? তোমার ভয়ে? তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাও? তুমি ভেবেছ আমি তোমার চোখ-রাঙানিতে ভয় পাবো?

নিখিলেশ সদানন্দর দিকে চাইলে। বললে—সদানন্দবাবু, কেন আপনি এলেন বলুন তো? কেন আপনি আমাদের মধ্যে এসে এমন করে আমাদের সংসার বিষিয়ে দিলেন? আপনি নিজের চোখেই সব কিছু দেখলেন তো! আপনি যেদিন থেকে আমাদের এখানে এসে উঠেছিলেন সেই থেকেই এই রকম শুরু হয়েছে, তার আগে আমরা কত সুখে ছিলুম। আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি দয়া করে আর আসবেন না। দয়া করে আপনি এখন চলে যান, আমাদের বাঁচতে দিন—

সদানন্দ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নয়নতারা বলে উঠলো—কেন তুমি ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি বলছি উনি যাবেন না, উনি চলে গেলে আমিও এখানে আর থাকবো না—

নয়নতারা কোনও কথার উত্তর না দিয়ে নিখিলেশ সদানন্দর দিকে চাইলে। বললে—আপনি উঠুন সদানন্দবাবু, দোহাই আপনার, আপনি উঠুন—

নয়নতারা বললে—না, উনি উঠবেন না—

—নিশ্চয়ই উঠবেন। আপনি উঠুন সদানন্দবাবু—

নয়নতারা বললে—কিছুতেই উঠবেন না, আমি ওঁকে উঠতে দেব না—

নিখিলেশ বললে—তোমার জোর নাকি?

বলে নিখিলেশ সদানন্দবাবুর হাত ধরলে। বললে—দোহাই আপনার, আপনি উঠুন—

কিন্তু সদানন্দ তখন নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে কিন্তু আমার কথা তো কিছু বলা হলো না—

—সে আর বলতে হবে না আপনাকে, আপনি এখন যান—

সদানন্দ তখন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নিখিলেশ বললে—দেরি করছেন কেন, আপনি যান—আসুন—

নয়নতারা বলে উঠলো—তাহলে আমিও এ-বাড়িতে থাকবো না, আমিও চলে যাবো—

নিখিলেশ তখন সদানন্দকে ঠেলতে ঠেলতে উঠোন দিয়ে সদর-দরজার বাইরে ঠেলে দিয়েছে। বললে—দেখছেন তো আমি কী অবস্থার মধ্যে বেঁচে আছি—এর পরও আপনি এখানে আসবেন?

পেছন থেকে নয়নতারা দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—তুমি পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, আমিও যাবো—

কিন্তু তার আগেই নিখিলেশ সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়েছে। দিয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়নতারা বললে—তুমি সরো—আমি বাইরে যাবো—সরো—

নিখিলেশ গলা চড়িয়ে বললে—না—

—আমি আর কিছুতেই থাকবো না এ বাড়িতে—আমিও চলে যাবো—সরো বলছি—

নিখিলেশ তখনও তেমনি করে পথ আটকে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—না, কিছুতেই সরবো না—দেখি তুমি কী করে যাও—

বড়বাজার তখন আরো জম-জমাট। দেশের অবস্থা ভালো হোক আর মন্দই হোক বড়-বাজারের বাড়-বাড়ন্ত যেন কখনও কমতে নেই। বড়বাজারের মানুষ যেন কিছুতেই দমে না। উৎসবে ব্যসনে রাজদ্বারে শ্মশানে বড়বাজার চিরকালের জন্যে সকলের অন্তরঙ্গ বান্ধব। প্রকাশ মামা বেশিক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নয়। বিশেষকরে বড়বাজারের হট্টগোলের মধ্যে ধর্মশালার একটা অন্ধকার ঘরের কোণে প্রকাশ মামার মত মানুষ কী বেশিক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে পারে! আগেও প্রকাশ মামা কলকাতায় এসেছে বড়বাজারে। কিন্তু সে তো টাকা ওড়াতে। তখন নবাবগঞ্জই ছিল প্রকাশ মামার বড়বাজার। সেই নবাবগঞ্জের বড়বাজারে টাকা আয় করে তা খরচ করতে আসতো কলকাতার এই বড়বাজারে। এটা ছিল প্রকাশ মামার টাকা ওড়াবার বড়বাজার। বলতে গেলে প্রকাশ মামার কাছে সমস্ত কলকাতা শহরটাই ছিল তার বড়বাজার। রাতটা কাটাতো মানদা মাসির কালীঘাটের বস্তি-বাড়িতে। আর দিনটা কাটতো এই বড়বাজারে। এখানে কোন্ দোকানে খাঁটি সিদ্ধির সরবৎ পাওয়া যায়, কোন গলির মধ্যে কার কোন্ কোটরে চোলাই মদ পাওয়া যায়, সে-সব ছিল প্রকাশ মামার নখ-দর্পণে!

আহা প্রকাশ মামার কত সাধের কলকাতা! জামাইবাবু মারা যাবার পর থেকে কত স্বপ্ন দেখে এসেছে প্রকাশ মামা। বরাবর মনে মনে চার লাখ-টাকার স্বপ্ন দেখে এসেছে। স্বপ্ন দেখেছে কলকাতায় একখানা বাড়ির। আর স্বপ্ন দেখেছে বিলিতি হুইস্কির। জীবনে বিলিতি হুইস্কি খাওয়ার বড় সাধ ছিল প্রকাশ মামার। যতদিন দিদি বেঁচেছিল ততদিন পেট পুরে বিলিতি হুইস্কি খেয়েছে। কিন্তু দিদি মারা যাওয়ার পর থেকে আর খাওয়ার পয়সা জোটেনি। দিশী হুইস্কি দু'একবার খেয়ে দেখেছে সে, কিন্তু সে ধেনো মদের মতন। তাতে নেশা হয় না, বরং নেশাটা কেটে যায়।

পাঁড়েজী দেখতে পেয়েছে। বললে—কোথায় যাচ্ছেন মামাবাবু?

প্রকাশ মামা কথাটা কী করে বলবে বুঝতে পরলে না। বললে—আমার ভাগ্নে তো এল না পাঁড়েজী, কোথায় গেল বলো তো? এখনও এল না কেন?

পাঁড়েজী কী করে জানবে কেন বাবুজী এল না!

প্রকাশ মামা বললে—অথচ জানো, একসঙ্গেই আমরা রেল-বাজার থেকে ট্রেনে উঠলুম, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আর তারই ফাঁকে কোথায় কোন্ ইস্টিশানে সদা নেমে গেল টেরই পেলুম না।

একটু থেমে বললে—তা কোথায় গেল বল তো সে? কোথায় যেতে পারে?

পাঁড়েজী বললে—তা কী করে বলবো হুজুর—

প্রকাশ মামা বললে—তা তো বটেই, তুমিই বা কী করে বলবে? আসলে আমারই দোষ, পোড়া চোখে কী ঠিক সেই সময়েই ঘুম আসতে হয়? শালা ঘুমেরও কী একটা সময়-অসময় নেই রে? জানো আমার এমন রাগ হচ্ছে নিজের ওপর, মনে হচ্ছে নিজের গালে নিজে কষে চড় মারি—

—আপনি অত ভাবছেন কেন? এসে যাবেন ঠিক, দু'দিন একটু সবুর করুন না।

প্রকাশ মামা অস্থির হয়ে উঠলো। বললে—তুমি বুঝছো না পাঁড়েজী, তুমি বুঝতে পারবেও না। আমার মতন অবস্থা তোমার হলে তুমি বুঝতে পারতে। একটা দু'টো টাকা তো নয়, চার-চার লাখ টাকা আমার ভাগ্নে খোলামকুচির মত উড়িয়ে দিলে—

—চার লাখ টাকা? বাবুজী উড়িয়ে দিলে?

—হ্যাঁ পাঁড়েজী, তবে আর বলছি কি তোমাকে, একেবারে খোলামকুচির মত উড়িয়ে দিলে গো, তবু আমাকে একটা পয়সা পর্যন্ত দিলে না।

পাঁড়েজী এসব কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে—অত টাকা কোত্থেকে পেলে বাবুজী?

প্রকাশ মামা বললে—তুমি কিছু বুঝবে না, তোমাকে বলে কিছু লাভ নেই। আট লাখ রুপিয়া তোমার বাবুজী হাতে পেয়েছিল, সেই টাকাটা কেউ গাঁয়ের ছোটলোক-গুলোকে দেয়?

—কেন দিলে?

—দেখ পাঁড়েজী, তুমি বিচক্ষণ লোক তাই ওই কথা বললে। পৃথিবীর সব বিচক্ষণ লোকই ওই কথা বলবে। আমিও তাই তোমার বাবুজীকে বললুম যে কেন ওদের দিচ্ছিস? ওরা ছোটলোক, ওরা টাকার মর্ম কী বুঝবে? কিন্তু সদা তবু শুনলে না, বললে—ওদের টাকা আমি ওদেরই দিচ্ছি। শোন একবার ভাগ্নের কথা! বাপের টাকা তুই আইনত পেয়েছিস, ও-টাকা তোর হক্কের টাকা। কিন্তু ওদের ও টাকা কী কাজে লাগবে? ওরা হুইস্কি খেতেও জানে না, মেয়েমানুষও পুষবে না, ওরা টাকা-গুলো নিয়ে নয়-ছয় করে ফেলবে। তা আমার কথা তো শুনলে না, চার লাখ টাকা ওদের দিয়ে দিলে—বললে গাঁয়ের লোকের জন্যে হাসপাতাল হবে, ইস্কুল হবে, কলেজ হবে—

—চার লাখ রুপিয়া?

প্রকাশ মামা বললে—তবে আর বলছি কী! অথচ দেখ আমি ছাপোষা মানুষ, মাগ-ছেলে-মেয়ে আছে আমার, তার ওপর বুঝলে আমার আবার নোশাভাঙ্ করার সামান্য বদ্ অভ্যেস আছে, আমাকেও তো তার থেকে কিছু দিবি তুই! আমি তোর গরীব মামা, আমার কথা তুই একেবারে ভুলে গেলি রে? এত বড় নেমকহারাম তুই? বলো পাঁড়েজী, তুমি নিজেই বলো, এটা নেমকহারামী হলো না? তুমি তো বিচক্ষণ লোক, তুমিই বলো—

পাঁড়েজী কী বলবে বুঝতে পারলে না।

প্রকাশ মামা বলল—আমার কী ভয় হচ্ছে জানো পাঁড়েজী, ভয় হচ্ছে, বাকী যে চার

লাখ টাকা সঙ্গে রয়েছে সেটা আবার কাউকে না দিয়ে দেয়—

পাঁড়েজী বললে—বাবুজী তা দিতে পারে, বাবুজীর কাছে টাকা থাকলে যাকে সামনে পাবে তাকেই দিয়ে দেবে।

প্রকাশ মামা আরো ভয় পেয়ে গেল। বললে—তাই নাকি? তবে তো সব্বোনাশ—

—হ্যাঁ বাবুজী, আমি একবার একটা গায়ে দেবার শাল কিনে দিয়েছিলুম, সেটা বাবুজী একটা বুড়িকে দিয়ে দিলে—

—কে বুড়িটা?

—সে বাবুজী একটা বস্তির বুড়ি, খাটালে থাকে, ঘুঁটে বিক্রি করে বেড়ায়—

প্রকাশ মামা বললে—ইস, তাহলে তো সব্বোনাশ পাঁড়েজী। এখনও যে হাতে চার লাখ টাকা রয়েছে—

—নগদ চার লাখ টাকা?

প্রকাশ মামা বললে—না, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, কিন্তু চেক্ কেটে দিলেই হলো, চেক-বই তো তার সঙ্গেই রয়েছে।

আর ভাবতে পারলে না প্রকাশ মামা। যতই ভাবছিল ততই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। এতদিন ধরে ভাগ্নেটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে শেষকালে কিনা একটা অপোগণ্ড হয়ে গেল সদা। ছোটবেলা থেকে কত মেয়ে-মানুষের বাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে, ভেবেছিল একাদিন না-একদিন সে মানুষ হবে!

বেরোবার সময় বললে—আমি আসছি পাঁড়েজী, আমি এসে ভাত খাবো—

—তা এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছেন?

প্রকাশ মামা বললে—বেশি দেরি হবে না, আমি যাবো আর আসবো। একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছি, আমি যাবে আর আসবো—এসে ভাত খাবো—

—যদি বাবুজী তার মধ্যে এসে পড়ে তো আমি কী বলবো?

—বলবে আপনার মামা এসেছে। এসে আপনার জন্যে বসে আছে। আমি না-আসা পর্যন্ত যেন তাকে ছেড়ো না। বুঝলে? আমি যাবো আর আসবো—

বলে দু'পায়ে জুতোজোড়া গলিয়ে হন-হন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। বড়বাজারের ঘিঞ্জি রাস্তা। তার ওপর গিজ্-গিজ্ করছে লোক। চলতে গেলে লোকের গায়ে ধাক্কা লেগে যায়। যেন দুনিয়ার সব লোক এখানে এসে হাজির হয়েছে। রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে ভেতরের পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা বার করে একবার দেখলে। গোটা কয়েক টাকা রয়েছে তখনও। ওতেই এখানকার মত কাজ চলে যাবে তার। তারপর সদা এলে টাকা চেয়ে নিলেই চলবে।

—ও দাদা, শুনুন!

একটা বখাটে গোছের লোককে দেখে প্রকাশ মামা তাকেই ডাকলে। দেখে বোঝা যায় লোকটা মাল-টাল খায়।

থতমত খেয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। বললে—কী?

প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বলতে পারেন মশাই শুঁড়ি-খানাটা কোন্ জায়গায়?

—শুঁড়িখানা?

প্রকাশ মামা বললে—হ্যাঁ, শুঁড়িখানা—

লোকটার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে প্রকাশ মামা আরো বিশদ করে বুঝিয়ে বললে—মানে মদের দোকান, দিশি মদের দোকান। আমি আগে অনেকবার এসেছি, এবার দিনের বেলা কিনা তাই চিনতে পারছি না, আগে রাত্তিরে এসেছিলুম তো—

লোকটা খানিকক্ষণ প্রকাশ মামার দিকে কী রকম কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললে—আমি জানি না—

বলে হন্-হন্ করে যেদিকে যাচ্ছিল তেমনি আবার চলতে লাগলো।

প্রকাশ মামা লোকটার দিকে হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। আশ্চর্য তো! মদের নাম শুনেই এমন ঘেন্না! কেন, মদ কি খাবার জিনিস নয়। মদের নাম করে কী এমন অন্যায়টা করেছি!

মনে বড় আঘাত লাগলো প্রকাশ মামার। না, এমন বেআদপি সহ্য করলে চলবে না। লোকটা যেদিকে যাচ্ছিল প্রকাশ মামা সেইদিকেই দৌড়তে দৌড়তে চললো—ও মশাই, শুনুন শুনুন—

লোকটার কাছে যেতেই লোকটা শুনতে পেয়েছে। পেছন ফিরে দাঁড়ালো লোকটা।

প্রকাশ মামা বললে—আপনি যে কট্‌মট্ করে চাইলেন আমার দিকে, আমি কী করেছি আপনার?

লোকটা আরো হতবাক!

কিন্তু প্রকাশ মামা ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—বলুন, আমি কী করেছি আপনার? আমি তো শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি শুঁড়িখানাটা কোথায়! তা আপনার গয়ে কি ওমনি ফোসকা পড়ে গেছে? মদ কি এত ঘেন্নার জিনিস সে আপনি আমার দিকে অমন কট্‌মট্ করে চাইলেন?

লোকটা বললে—তা আমি কি মাতাল যে তুমি আমার কাছে শুঁড়িখানার হদিস জানতে চাইছো?

প্রকাশ মামা চটে গেল। বললে—খবরদার বলছি তুই-তোকারি কোর না, ভালো হবে না—

লোকটা বললে—মাতালকে আবার তুই-তোকারি করবো না তো কি আপনি-আজ্ঞে করবো নাকি?

—তার মানে? আমি মাতাল? আমি মদ খেয়েছি?

লোকটা বললে—তা মাতাল নয় তো শুঁড়িখানার খবর জানতে চাইছো কী করতে শুনি? ঠাকুর-পুজো করতে?

প্রকাশ মামা শাসিয়ে উঠলো—খবরদার বলছি, মাতাল বোল না আমাকে—

—মাতাল বলেছি বেশ করেছি, মাতালকে মাতাল বলবো না তো কী বলবো? শ্বশুর বলবো? সেটা ভালো হবে?

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেছে প্রকাশ মামা। একেবারে লোকটার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু আশেপাশের কয়েকজন লোক হাঁ হাঁ করে একেবারে ছুটে এল, এসেই প্রকাশ মামার হাতটা ধরে ফেলেছে। কী হলো মশাই, কী হলো? মুখ থাকতে হাতাহাতি কেন?

প্রকাশ মামা একটু জোর পেলে। বললে—দেখুন না মশাই, আমাকে শুধু-মুধু মাতাল বললে—

—কেন, উনি মাতাল বলতে গেলেন কেন? আপনি কি মদ খেয়েছেন?

প্রকাশ মামা বললে—রামঃ, আমি মদ খেতে যাবো কোন্ দুঃখে মশাই? এই তো আমি হাঁ করছি আপনাদের সামনে আপনারা শুঁকুন গন্ধ শুঁকুন—

বলে সকলের সামনে হাঁ করে বললে—কী? মদের মন্ধ পেলেন আমার মুখে? পেলেন গন্ধ?

কেউ 'হাঁ' কিছুই বললে না। প্রকাশ মামা আবার বললে—দোষের মধ্যে আমি শুধু ওকে জিজ্ঞেস করেছি এখানে শুঁড়িখানাটা কোন্ দিকে। তা সেটা জিজ্ঞেস করাই আমার দোষ হয়ে গেল?

একজন বললে—তা আপনি শুড়িখানার খোঁজ নিতেই বা গেলেন কেন? আপনি কি মদ খান?

প্রকাশ মামা বললে—আপনারাও তো দেখছি তেমনি লোক মশাই, শুঁড়িখানার কথা জিজ্ঞেস করলেই ওমনি মদ খাওয়া হয়ে গেল? আমার আত্মীয়দের মদের দোকান থাকতে পারে না? আমরা তো মশাই জাতে শুঁড়ি, জাত-ব্যবসা করবো তাতেও দোষ? আমাদের সাত পুরুষের মদের কারবার। এই মদের কারবার করেই আমার ঠাকুর্দা সে-যুগে রায়-বাহাদুর হয়েছিল তা জানেন? আমার কাকা মদের কারবার থেকে দু'লাখ টাকা দিয়েছিল দেশবন্ধু সি আর দাশের হাতে, সেই টাকায় এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। মদের টাকা দেশসেবার কাজে লাগাতে দোষ নেই আর মদ খেলেই দোষ?

অকাট্য যুক্তি সব। লোকগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রকাশ মামা আর দাঁড়ালো না সেখানে। সকলের মুখে জুতো মেরে অন্য দিকে চলে গেল। দেশ স্বাধীন হয়েছে না কলা হয়েছে! নিজের পয়সায় মদ কিনে খাবো তারও স্বাধীনতা নেই তখন দেশ স্বাধীন হয়ে লাভটা কী হলো?

কিন্তু বড়বাজারে চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে সেই দোকানটা পাওয়া গেল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু সেই কড়া রোদের মধ্যেও দোকানে খদ্দেরের কমতি নেই। ভিড় ঠেলে একেবারে সামনের দিকে টাকাটা হাত বাড়িয়ে ধরে বললে—দেখি একটা দু'নম্বর পাঁট—

বোতলটা নিয়ে পাশের একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর আয়েস করে বসলো প্রকাশ মামা। তারপর কোঁচার খুঁট দিয়ে মালটা ছেঁকে গেলাসে ঢালতে লাগলো। তারপর কাঁচা পেঁয়াজকুচো আর ভিজেছোলা চিবোতে চিবোতে গেলাসটায় আলতো করে চুমুক দিলে। আঃ, প্রকাশ মামার মনে হলো—যেন সমস্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেল। হোক দিশী মাল, কিন্তু মালটা খাঁটি—

একটা পাঁটে ঠিক যেন শানালো না। আর তা ছাড়া এত ঝামেলা, এত ঝঞ্ঝাটের পর কি এক পাঁটে শানায়? জিভটা ভিজোতেই সবটা শেষ হয়ে গেল। এবার একটা ছোট বোতল নিয়ে নিলে। তখন একটু গরম হলো শরীরটা। পকেটে তখন আরো কয়েকটা টাকা রয়েছে। প্রকাশ মামা আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—আর একটা ছোট দেখি দাদা—

আবার কাঁচা পেঁয়াজকুচো আর ভিজেছোলা খেতে খেতে বেশ মৌজ হলো যখন তখন বেঞ্চি ছেড়ে উঠলো।

সকলকে বললে—সরো সরো—হাটো ভাই, হাটো—

মাতাল দেখে সব মাতালই রাস্তা করে দিলে। মাতালরাই মাতালদের চেনে। প্রকাশ মামার মেজাজ তখন তর্ হয়ে এসেছে। তখন আর খারাপ লাগছে না কিছুই, খারাপ লাগছে না কাউকেই। সবাই ভালো, সবাই গুড! মাথার ওপর কড়া সূর্যটাকেও যেন তখন চাঁদ বলে মনে হলো। বেশ স্নিগ্ধ, বেশ নীল।

—এই রিক্‌শাওয়ালা! রিক্‌শাওয়ালা!

রিক্‌শাওয়ালাটা দৌড়ে কাছে এল রিক্‌শাটা নিয়ে।

বললে—কাঁহা যায়গা বাবুজী?

প্রকাশ মামা বললে—না বাবা, কোথাও যাবো না। শুধু বসবো তোমার রিক্‌শার ওপর—তুমি রিক্‌শাটা রাখো।

রিক্‌শাটা সামনে নামিয়ে রাখতেই প্রকাশ মামা তার ওপর উঠে বসলো। রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শাটা টানতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ মামা বাধা দিল। বললে—আরে, টানতা হ্যায় কেঁও। টেনো না, এমনি দাঁড়িয়ে থাকো—

রিক্‌শাওয়ালা জীবনে এমন খদ্দের কখনও দেখেনি। সে রিক্‌শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর সওয়ারি রিক্‌শার ওপর চুপ করে বসে থাকবে, এ কখনও সম্ভব?

কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। বড়বাজারে কারণে-অকারণেই লোক জড়ো হয়।

সবাই জিজ্ঞেস করলে—ও মশাই, আপনি যাবেন কোথায়?

প্রকাশমামা বললে—কোথাও যাবো না—

—কোথাও যাবেন না তো এমনি করে রিক্‌শার ওপর বসে থাকবেন?

—হ্যাঁ, আমি এখানে বসে থাকবো, বসে বসে ঘুমোব। তাতে তোমাদের কী?

একজন ততক্ষণে গন্ধ পেয়ে গেছে। বলে উঠলো—ওরে মাতাল রে, লোকটা মাতাল—

—কী বললে? আমি মাতাল?

—তা আপনি ওখানে বসে থাকবেন কেন? হয় আপনি কোথাও যান, না-হয় রিক্‌শা থেকে নেমে পড়ুন। আর ঘুমোতে হয় তো বাড়িতে গিয়ে ঘুমোন—

প্রকাশ মামা বললে—না, আমার ইচ্ছে আমি এই চাঁদের আলোর তলায় ঘুমোব—

তখন লোকগুলো ক্ষেপে উঠলো। সবাই হাত ধরে টানলে—এই শালা নাম—নাম শালা—

—না আমি নামবো না।

—তবে রে মাতাল—

বলে সবাই মিলে—প্রকাশ মামাকে ধরে নামিয়ে দিলে। প্রকাশ মামার যেন তখন একটু চৈতন্য হয়েছে। চারদিকে এত ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—কে? কে তোমরা?

একজন তার মাথায় চাঁটি মারলে।

—আরে মারছো কেন?

আরো একজন সুবিধে পেয়ে পেছন থেকে জামা ধরে টানতে লাগলো। সামনে পেছনে যে-যেখান থেকে পারছে ঠেলে দিচ্ছে। প্রকাশ মামা এদিকে চায় তো ওদিক থেকে ঠেলে। ওদিকে চায় তো এদিক থেকে ঠেলে।

না, নেশাটা জমতে দিলে না শালারা। প্রকাশ মামা অন্য দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সব দিকেই লোক গিজ্ গিজ্ করছে।

শেষকালে একটা ফাঁক দেখে মরীয়া হয়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সবাই পেছন-পেছন তাড়া করে গেল। তখন প্রকাশ মামা প্রাণপণে দৌড়তে লাগলো—

পেছনে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—চোর—চোর—

'চোর-চোর' শুনে আরো কিছু লোক এসে জুটলো। বড়বাজারে ভিড় জমাবার লোকের অভাব নেই। সেখানে সবাই কাজের লোক, আবার সবাই বেকার।

দৌড়তে দৌড়তে একটা বড় রাস্তার ওপর পড়তেই হঠাৎ 'হাঁ-হাঁ-হাঁ' চিৎকার উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মাল-বোঝাই লরীর ব্রেক কষার কর্কশ শব্দ!

—কী হলো মশাই, কী হলো?

আশেপাশে যারা কর্মব্যস্ত মানুষ ঘোরাঘুরি করছিল তাদের সকলের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সবাই আঁতকে উঠেছে এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায়। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ গলির ভেতর থেকে লোকটা অমন দৌড়ে বেরোলই বা কেন? বড় রাস্তায় বেরোবার সময় চারদিকে দেখেশুনে বেরোতে হয় তো!

যারা পেছন থেকে এতক্ষণ তাড়া করছিল তারা আর এগোল না। এখনি আবার পুলিস-পাহারাওয়ালা আসবে। তখন সাক্ষী হতে বলবে, চাক্ষুষ সাক্ষদের জবানবন্দি নেবে। অত ঝঞ্ঝাটে যেতে আছে! তার চেয়ে সসম্মানে কেটে পড়াই ভালো।

—নিয়তি মশাই নিয়তি! একেই বলে নিয়তি!

প্রকাশ মামা তখন লরীর তলায় পড়ে কার কাছে নিঃশব্দে তার আর্জি জানাচ্ছে কে জানে? মা-কালী না মা-মঙ্গলচণ্ডী কার কাছে হুইস্কি খাবার প্রার্থনা জানিয়ে তার শেষ সাধ নিবেদন করছে তাই বা কে জানে! ইহকাল পরকাল কোনও কাল বলে যদি কোথাও কিছু থাকে তো প্রকাশ মামার সাধ কি তারা কেউ মেটাতে পারবে? কেউ কি কোনও দিন প্রকাশ মামাদের খাঁই মেটাতে পেরেছে! প্রকাশ মামার দিদি তা মেটাতে পারেনি, প্রকাশ মামার জামাইবাবুও তা মেটাতে পারেনি, তারপর তার ভাগ্নেও তা মেটাতে পারলে না।

জায়গাটা তখন টাটকা রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে। সমস্ত লোকের পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাশে পিচের রাস্তার ওপর যেন রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

নৈহাটির বাড়ির মধ্যে তখন আর এক দৃশ্য। আসলে এ দৃশ্য নয়, দৃশান্তর। একটু আগেই যে-বাড়িতে ঝড় বয়ে গেছে তার সামান্যতম চিহ্নও তখন আর কোথাও নেই। সমস্ত বাড়িটা তখন স্তব্ধ। নয়নতারা খেয়েছে কি খায় নি সে-খবর রাখবার দরকার নেই যেন নিখিলেশের। নয়নতারার চোখ-মুখের চেহারা দেখে তার সঙ্গে কথা বলতেও তার ভয় হয়েছে। এত বড় দুর্যোগ যে নিখিলেশ শেষ পর্যন্ত সামলাতে পেরেছে এইটেই যথেষ্ট।

এই সব কাণ্ড দেখে গিরিবালাও যেন কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

নিখিলেশ তখনও নিজের খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। কোথাও কোনও দিকে আর কোনও আশার চিহ্ন নেই। কেউ আর তার নেই। সে এই বিরাট পৃথিবীতে একলা। একলাই তাকে তার এই শরীরটার মত এই সংসারটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে, প্রতিদিন তাকে অফিসে যেতে হবে, প্রতি মাসে তাকে তার মাসকাবারি গোনাগুন্তি মাইনের টাকাটা নিয়ে আসতে হবে। কেউ আর তাকে সাহায্য করবে না। নয়নতারা চাকরি করবে না আর। নয়নতারা তার মাইনের টাকা বাড়িতে এনে তার সংসারে সাচ্ছল্য বাড়াতে আর সাহায্য করবে না।

তাহলে? তাহলে কী করবে সে? যা করে সে এতদিন চালাচ্ছে তেমনি করেই শেষ দিন পর্যন্ত চলবে? তারপর একদিন যখন রিটায়ার করবে, তখন শুরু হবে তার পেনশন। এখন যে-অবস্থা তার চলছে, সে-অবস্থা তখন আরো খারাপ হবে। তখন কী করে শেষ-জীবনটা চলবে তার?

এ-কথা বহুদিন ধরেই ভাবছিল নিখিলেশ। কিন্তু আজকের ঘটনার পর ভাবনাটা যেন আরো জটিল হয়ে উঠলো। সত্যিই যদি শেষ পর্যন্ত নয়নতারা সদানন্দবাবুর সঙ্গে চলে যেত তাহলে কী হতো? আর তা ছাড়া আজ না-হয় নিখিলেশ নয়নতারাকে কোনও রকমে বাড়িতে আটকে রাখতে পেরেছে, কিন্তু কাল? কাল যখন নিখিলেশ অফিসে চলে যাবে,

তখন যদি আবার সদানন্দবাবু আসে? আর নয়নতারা যদি তার সঙ্গে চলে যায়, তখন কে তাকে আটকাবে? কে তাকে ধরে রাখবে? চিরকাল তো কেউ অফিস কামাই করে বউকে পাহারা দিতে পারে না! আর, আর একটা উপায় আছে অবশ্য। নয়নতারার ঘরের বাইরে থেকে তার দরজায় তালা লাগিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা-ই কী সম্ভব? নয়নতারাই কী সেই রকম মেয়ে যে সেটা মাথা পেতে সহ্য করবে?

নিখিলেশের মনে হলো আজ রাতে আর তার ঘুম আসবে না।

কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো ঘরের আলোটা তখনও জ্বলছে। উত্তেজনায় উদ্বেগে সে আলোটা নিবোতেও ভুলে গিয়েছিল। বিছানা থেকে উঠলো নিখিলেশ। আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিয়েই সে বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়বে, ঘুমোবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে।

কিন্তু টেবিলের ওপর নজর পড়তেই দেখলে কার যেন একটা ব্যাগ পড়ে রয়েছে সেখানে। লম্বা-চওড়া একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ।

নিখিলেশ ব্যাগটা হাত তুলে নিলে। এটা কার?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সদানন্দবাবুর হাতে তো সে এটা দেখেছিল। সে-ই ফেলে গেছে নাকি? হয়ত ভুল করে ফেলে গেছে। অত কাণ্ডের মধ্যে এটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।

ব্যাগের মুখটা সে খুলে দেখলে। তেমন কিছু নেই ভেতরে। নিখিলেশ ভেবেছিল হয়ত টাকা-কড়ি আছে কিছু। কিন্তু ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতেই কী একটা ভাঁজ-করা কাগজ বেরোল। ভাঁজটা খুলতেই দেখলে একটা চিঠি। আর তার সঙ্গে একটা চেক্। ক্রসড্ চেক্।

নিখিলেশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত শিরাগুলোর ভেতরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এ কীসের চিঠি! কার চিঠি!

কিন্তু চিঠির ওপরেই নিখিলেশ আর নয়নতারার নাম দেখে আরো অবাক হয়ে গেল। বেশ স্পষ্ট অক্ষরে শিরোনামায় লেখা রয়েছে নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নয়নতারার নাম।

তার নিচের লাইনে লেখা রয়েছে—

"নিখিলেশবাবু, আজকে আমি যে-কথা বলতে এসেছিলুম তা মুখে বলতে পারবো না বলে এই চিঠিতে লিখে এনেছি। একদিন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি নয়নতারাকে স্ত্রীর মর্যাদা কেন দিইনি। কেন দিইনি তা আমি আপনাদের মুখে জানিয়েছিলুম। কিন্তু যুক্তিটাই তো জীবনে বড় কথা নয়। যুক্তির ওপরে আর একটা কথা আছে যা যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে। আমি আপনাদের সংসারের অভাব অনটনের কথা নিজের চোখে দেখে এসেছি। সে অভাব-অনটন আমি দূর করতে পারবো এমন অহঙ্কার আমার নেই। কিন্তু তবু সে অভাব দূর করবার আশায় আমার সামান্য প্রচেষ্টা এই সঙ্গে জুড়ে দিলাম। জানি আপনাদের চাহিদা মোটানো আমার সাধ্যাতীত, তবু এই সামান্য দান গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হবো। আমাকে খুঁজে বার করে কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা করবেন না, কারণ এখন থেকে আমি চেনা জানা সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবো এই মনস্থ করেছি। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। ইতি—"

চিঠিটা পড়ে শেষ করার পর চেক্টার দিকে আবার দেখলে নিখিলেশ। চার লাখ টাকা।

নিখিলেশের মনে হলো সে হয়ত পড়ে যাবে। হাত-পা তার অবশ হয়ে আসছে। চিঠিটা নিয়ে সে বিছানার ওপরে গিয়ে বসলো। আবার পড়তে লাগলো চিঠিটা। আবার পড়তে লাগলো চেকের অঙ্কটা একবার শুধু একটু সন্দেহ হলো সে ভুল দেখছে না তো! সে জেগে আছে তো ঠিক! একে একে বারকয়েক সে চিঠি আর চেকটা পড়লো। তারপর মনে

হলো সদানন্দবাবুর উপর সে সত্যিই অবিচার করেছে। যে-মানুষ এত ভালো এত উদার তার সঙ্গে সত্যিই সে খারাপ ব্যবহার করেছে।

তাড়াতাড়ি ঘর থেরে বেরিয়ে পাশের দরজা ঠেলতে লাগলো নিখিলেশ—নয়নতারা—নয়নতারা—ওঠো—ওঠো—

ভেতর থেকে কোনও সাড়া না-পাওয়ার নিখিলেশ আবার ডাকলে—নয়নতারা, নয়নতারা, দরজা খোল, এই দেখ সদানন্দবাবু কী চিঠি লিখে রেখে গেছেন—

আগে হলে হয়ত নয়নতারা দরজা খুলতো না। কিন্তু সদানন্দবাবুর চিঠির কথা শুনে নয়নতারা দরজার খিল খুলে দিলে। বললে—কী বলছো তুমি?

নিখিলেশ হাতের চিঠি আর তার সঙ্গে লাগানো চেকটা নয়নতারার দিকে বাড়িয়ে ধরলে। বললে—এই দেখ সদানন্দবাবু তোমার আর আমার নামে কী চিঠি লিখে রেখে গেছেন—

নয়নতারা চিঠিটা হাতে নিয়ে মনে মনে পড়তে লাগলো। চেক্‌টাও দেখলে মন দিয়ে খানিকক্ষণ ধরে। পড়তে পড়তে যেন খানিকক্ষণের জন্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর নিখিলেশের দিকে মুখ তুলে চাইলে। চোখ দু'টো তখন তার ছল্-ছল্ করছে।

নিখিলশে বললে—একটা ব্যাগের মধ্যে এইটে পড়ে ছিল। আমি প্রথমে দেখতে পাইনি, আলো নেবাতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর এই ব্যাগটা পড়ে আছে। তার ভেতরে এইটে ছিল...

নয়নতারার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। নিখিলেশও যেন এই ঘটনায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত হিসেব যেন হঠাৎ তাদের দু'জনের কাছেই বেহিসেব হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। যে-অঙ্ক দিয়ে সংসারী মানুষ সংসারের সব কিছুর মূল্যায়ন করে সেই গোড়ার অঙ্কতেই যেন তাদের গরমিল হয়ে গেছে হঠাৎ! একঘণ্টা আগে যে-বিপর্যয়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে তারা চরম সর্বনাশের জন্যে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, টাকার প্রলেপ লাগিয়ে সদানন্দ যেন তাদের সেই সমস্ত বিপর্যয় সমস্ত ক্ষত নিরাময় করে দিয়েছে।

নিখিলেশ বললে—অথচ দেখ, এখন ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে, আমি সদানন্দবাবুর সঙ্গে কী অভদ্র ব্যবহারই না করেছি—

তারপর হঠাৎ তার কী মনে হলো। বললে—একটু দাঁড়াও, দৌড়ে গেলে হয়ত এখনও স্টেশনে তাঁকে ধরতে পারা যাবে—

নয়নতারা বললে—তুমি এখন স্টেশনে যাবে নাকি?

নিখিলেশ ততক্ষণে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে-যেতে বললে—সত্যি বলছি আমি ভাবতে পারিনি, মানুষ এত ভালো এতে পারে। দেখি যদি তাঁকে ধরে আনতে পারি—

নয়নতারা পেছন থেকে একবার শুধু বললে—আমি যাবো তোমার সঙ্গে?

নিখিলেশ বললে—না, তুমি আর কেন মিছিমিছি এত রাত্তিরে কষ্ট করবে—

নয়নতারা বললে—তাহলে তুমি গিয়ে তাকে বোল আমি তাকে আসতে বলেছি, বোল সে না এলে আমি রাগ করবো।

নিখিলেশের আর তখন কোনও দিকে জ্ঞান নেই। রাস্তাটা ধরে সোজা স্টেশনের দিকে জোরে জোরে চলতে লাগলো। কিন্তু তাকে বেশি দূর আর যেতে হলো না। রাণাঘাট লোক্যালটা তখন হু-হু করে স্টেশনে এসে পৌঁছুলো আর আধ মিনিট থেমেই প্ল্যাটফরমের সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে তুলে নিয়ে আবার কলকাতার দিকে রওনা দিলে।

তবু নিখিলেশ স্টেশনের প্ল্যাটফরম লক্ষ্য করে চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত নিখিলেশ প্ল্যাটফরমে গিয়ে একবার খুঁজে দেখবে সদানন্দবাবু আছে কি না।

কিন্তু নিখিলেশ জানতো না যে, যে-মানুষ এমন করে নিজের সর্বস্ব পরকে দিয়ে নিঃস্ব হতে পারে তাকে ফিরিয়ে আনে এমন ক্ষমতা ভূ-ভারতে কারো নেই। এমন কি নিখিলেশ বা নয়নতারা কারো বিধাতা পুরুষেরই তখন এমন সাধ্য নেই যে তাকে আবার তাদের এই ভাঙা সংসারের মাথায় এনে প্রতিষ্ঠা দেয়।

কিন্তু ওদিকে রাণাঘাট লোক্যালের একটা কামরার এক কোণে বসে তখন সদানন্দ জানালার বাইরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে আর নিজের মনে এক অনির্দেশ্য আবাঙ্‌মনসোগোচর বিশ্ব-নিয়ন্তার কাছে একটা প্রার্থনাই শুধু করে চলেছে। সে বলছে—আমি জেনেছি তুমি আছো, এই বিশ্ব-সৃষ্টির অনাদি-অনন্ত স্বরূপ হয়ে তুমি আমাদের অন্তরেই বিরাজ করছো। তাই আজ তোমাকেই আমি জানিয়ে গেলাম আমার শেষ প্রার্থনা। তোমাকে জানিয়েই আমার ঊর্ধতন পিতৃপুরুষের সমস্ত পাপের প্রায়চিত্ত করে গেলাম। লোকে জানুক আমি পাগল, লোকে বলুক আমি নির্বোধ। তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই। আজ আমি সমস্ত লাভ-ক্ষতির বাইরে সমস্ত দেনা-পাওনার সীমান্ত অতিক্রম করে সুদূর নির্বাসনে আশ্রয় নিতে চলেছি। আজ আমার নিজের জন্যে আর কিছু কাম্য নেই। শুধু কামনা করি মানুষ সৎ হোক, মানুষ সুখী হোক, মানুষের মঙ্গল হোক, মানুষের শুভ হোক। আর আমি কিছু চাই না।

আর এদিকে নিখিলেশ তখন নৈহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপরে একে-একে প্রত্যেকটা লোকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা মুখকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে চলেছে। কই, কোথায় গেল সেই মানুষটা! সেই মহানুভব মহৎ মানুষটাকে খুঁজে বার করা তার কাছে যেন তখন একান্ত অপরিহার্য!

আর নয়নতারাও সেই বোসপাড়ার বাড়িটার সদর-দরজার সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে শবরীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে!

কিন্তু যার জন্যে নিখিলেশ আর নয়নতারার এই উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা সে-মানুষটা তখন আরো দূরে আরো অনেক দূরের পথে চলতে শুরু করেছে। তার মনে তখন আর কোনও ক্ষোভ নেই, আর কোনও খেদ নেই। এবার সে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, এবার আর কারো কোনও দুঃখ থাকবে না, নবাবগঞ্জ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে, নবাবগঞ্জের লোক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে, নয়নতারার সংসারের সমস্ত আর্থিক কষ্ট দূর হবে। সবাই সুখী হবে, সকলের মঙ্গল হবে, সকলের শুভ হবে...শুভায় ভবতু...

অন্তরা

এই হলো সদানন্দ চৌধুরীর অতীত। এই অতীত-জীবন নিয়েই সেদিন নিজের কাহিনী লিখতে শুরু করেছিল সদানন্দ চৌধুরী। সদানন্দ জানতো তার এ জীবন অকিঞ্চিৎকর। জীবনে সে নিজের জন্যে কখনও কিছুই কামনা করেনি। শুধু কামনা করেছিল সকলে সৎ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। সকলের সততা সুখ আর মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই সে নিজের জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতে চেয়েছিল। কোথায় সেই সুলতানপুর, কোথায় সেই নৈহাটি আর কোথায় সেই কলকাতা, আর কোথায় এই চৌবেড়িয়া। এই চৌবেড়িয়ার গণ্ডগ্রামে অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই একদিন সে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিল। ভেবেছিল নিজেকে অস্বীকার করে, নিজেকে বিলুপ্ত করেই সে নিজের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। ঊর্ধ্বতন। পূর্বপুরুষের সমস্ত পাপ-পূণ্যের দায় থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে।

কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে তার সব কিছু মনে পড়ে যেত। মনে পড়ে যেত সেই কর্তাবাবুকে, সেই দুর্গা পিসিকে। মনে পড়ে যেত প্রকাশ মামাকে। সেই বেহারি পাল, সেই কপিল পায়রাপোড়া, সেই মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক আর কৈলাস গোমস্তা মশাইকে। অজ্ঞাতবাসে এলে তার মন কখনও পড়ে থাকতো ধর্মশালার সেই পাঁড়েজীর কাছে, আবার কখনও বউবাজারের সেই নিঃসঙ্গ বউটির কাছে। আর পড়ে থাকতো নিখিলেশ আর নয়নতারার কাছে। মনে হতো, সকলে ভালো থাকুক, সকলের মঙ্গল হোক। সকলের অভাব অনটন দূর হোক। নবাবগঞ্জের মানুষ এবার লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, ব্যাধি থেকে তাদের মুক্তি হোক, তাদের সব শোক-তাপ দূর হোক।

কতদিন হরি মুহুরি জিজ্ঞেস করেছে—আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাদের কথা বলেন মাস্টারবাবু? কাদের নাম করেন? তারা আপনার কে?

সদানন্দ অবাক হয়ে যেত। বলতো—কেন? কাদের নাম করি?

—নয়নতারার নাম করেন আপনি! তা নয়নতারা কে? আপনার মা নাকি?

সদানন্দ এ-কথার কিছু উত্তর দিত না। হরি মুহুরি বলতো—আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গানও করেন আপনি—

—গান?

—হ্যাঁ, আপনার গলায় বেশ সুর আছে। হরু ঠাকুরের কবির গান কোথা থেকে শিখলেন? এককালে কবির দলে ছিলেন নাকি?

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—কী গান গাই?

হরি মুহুরি হাসতো। —বলতো—ওই যে কী যেন গানটা?

বলে সমস্ত গানটাই মুখস্থ বলে যেত—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।
শ্যামের পিরিত গরল মিশ্রিত।
কারো মুখে যদি শুনিতাম...

সদানন্দ শুধরে দিত। বলতো 'শ্যামের পিরিত' নয় মুহুরি মশাই কথাটা হচ্ছে 'টাকার পিরিত'। 'টাকার পিরিত গরল মিশ্রিত কারো মুখে যদি শুনিতাম...'

—কেন? টাকার পিরিত কেন?

সদানন্দ বলতো—হ্যাঁ মুহুরি মশাই, আমি যদি ও-গান লিখতুম তো 'শ্যামের পিরিত' না লিখে 'টাকার পিরিত' লিখতুম। সংসারে সবাই টাকাকে যত ভালবাসে আর কিছুকে তত ভালাবাসে না। পৃথিবীর মানুষের কাছে শুধু ওই একটা জিনিসই সত্যি, আর সব কিছু মিথ্যে—

হরি মুহুরি মাস্টারবাবুর কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। সদানন্দ বলতো—কথাটা হয়ত খুব খারাপ শোনাবে কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে কেবল ওই টাকার খেলাই দেখে এসেছি মুহুরি মশাই, দেখে দেখে আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়ে গেছে—

—তা সে যেন হলো, কিন্তু ওরা কারা? ওই আর যাদের নাম করেন আপনি?

—আর কাদের নাম করি?

সদানন্দর আবার সব মনে পড়ে যেত। মুখ-চোখ কেমন গম্ভীর হয়ে যেত শোনবার সঙ্গে সঙ্গে। আবার ভুলে যাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু তবু কি ভোলা যায়? চৌবেড়িয়ায় রসিক পাল মশাই তাকে যে কী চোখে দেখেছিলেন কে জানে! তিনি বুঝেছিলেন এ মানুষটি ঠিক সাধারণ কেউ নয়। তাঁর অতিথি-শালায় কত লোক আসতো যেতো, সেখানে সদানন্দকেও তিনি তাদের সঙ্গে পরম আদরে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আদর বোধ হয়

সদানন্দের কপালে ছিল না। খাওয়া-পরার কোনও বিলাসিতাই স্পর্শ করতো না তাকে। স্কুল উঠে যাবার পরেও সদানন্দকেও ছাড়তে চাইলেন না তিনি। ছেলে ফকির পালকে বলে দিয়েছিলেন—মাস্টার যতদিন থাকতে চাইবে ততদিন ওকে তোমরা এখানে রেখে দেবে, বুঝলে!

সত্যিই তো, কোথায়ই বা সদানন্দ যাবে! যাবার কোনও জায়গাও তো তার ছিল না। ভোরবেলা নদীতে গিয়ে স্নান করে আসার পর অন্য সকলের সঙ্গে তারও জল-যোগে ব্যবস্থা থাকতো। কোনও দিন সদানন্দ খেত, কোনও দিন বা খেত না। পৃথিবীতে কখন কোথায় কী ঘটছে তা চৌবেড়িয়াতে বসে জানাও যেত না। শুধু পূর্ব দিকে সূর্য উঠতো আর পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবতো। ঠিক এই সময়েই একদিন সদানন্দ হরি মুহুরি মশাইকে বলেছিল—আমাকে একটা খাতা আর দোয়াত-কলম দিতে পারেন মুহুরি মশাই?

—কেন? খাতা-দোয়াত-কলম কী করবেন?

সদানন্দ বলেছিল—বসে তো আছি, তাই একটু আঁকি-বুকি করতাম আর কি?

মাস্টারবাবুর নামে সেই খাতা আর দোয়াত-কলমের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। সদানন্দ সেই দিন থেকেই বসে বসে লিখতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমেই আরম্ভ করেছিল এইভাবে—"আমি অতি সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষের কথা আজকালকার ক্ষমতালোভী মানুষেরা শুনিবে কিনা জানি না। ক্ষমতা পাইবার লোভে যখন আজকাল যে কোনও অন্যায় আচরণ করিতে প্রস্তুত সেই সময় আমার মত সাধারণ মানুষের কাহিণী শুনিবার লোক নাই জানিয়াও আমি আমার এই জীবনী লিখিতে বসিয়াছি। এই অবিশ্বাসীর যুগেও আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোথাও-না কোথাও একজন বিশ্বাসী প্রাণ মানুষ আছে। সে-মানুষ এখনও সততা এবং সত্যবাদিতাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে এবং বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। এই তিন শক্তিকে যে বিশ্বাস করে না তাহার জন্য এ কাহিনী নয়। তারা আমার এ কাহিনী না পড়িলেও আমি দুঃখ করিব না। ঈশ্বর যদি একজন যীশুখৃষ্টের জন্য হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে আমার মত নগণ্য লোক একজন সৎ পাঠকের জন্য লক্ষ লক্ষ বছর অনায়াসেই অপেক্ষা করিতে পারিবে।"

এমনি আরম্ভ করে অনেক দূর এগিয়েছিল। আর তারপরেই এসে হাজির হয়েছিল এই হাজারি বেলিফ্। কী অদ্ভুত এই লোকটা! কোর্ট-কাছারির মানুষেরা বোধ হয় এমনিই হয়। প্রকাশ মামাও একদিন তার সঙ্গ ছাড়তে চায়নি। পেছনে লেগে ছিল আঠার মত। অথচ প্রকাশ মামা তো কোর্টের বেলিফ্ ছিল না এর মত।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কত দিন এই চাকরি করছেন আপনি?

লোকটা বললে—তা কি মনে আছে মশাই, সেই ছোটবেলা থেকেই তো এ-লাইনে আছি! এতকাল কত লোকের সর্বনাশ করেছি তারই কি ঠিক আছে! কত হাজার হাজার লোকের ভিটে-মাটি চাঁটি করেছি, কত হাজার হাজার লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে আমার জন্যে। হাজারি বেলিফ্‌কে দেখলে তাই তো সবাই শিউরে ওঠে—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—তা শিউরে উঠবে না? কাছারির বেলিফ্ তো কখনও কারো ভালো করে না মশাই। আমার বাপ-মা তো তাই জেনেশুনেই আমার নাম রেখেছিল-হাজারি! এই যেমন আপনি, আপনি তো বেশ চৌবেড়িয়ায় নিশ্চিন্তে খাচ্ছিলেন-দাচ্ছিলেন, হঠাৎ শনির মত হাজারি বেলিফ্ এসে আপনার কাছে, হাজির হলো। হাজারি বেলিফ্ যাকে একবার ছুঁয়েছে তার আর কোনও কালে নিস্তার নেই—

সদানন্দ বললে—তাহলে আমারও নিস্তার নেই?

হাজারি বেলিফ্ বললে—নিস্তার থাকবে কী করে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে তা তো জানেন? আপনি লুকিয়ে অধর্ম করবেন আর ভাবছেন হাজারি বেলিফের হাত থেকে নিস্তার পাবেন? তাহলে জজ-ব্যারেস্টার-উকিল-মুহুরি কোর্ট-কাছারি আছে কী করতে? তাদের পেট চলবে কী করে? তারা কি বসে বসে ঘাস কাটছে বলতে চান? এই যে আমাদের দেশের যত বড় বড় লোক দেখছেন সবাই উকিল-ব্যারিস্টার। মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে সি আর দাশ, সুভাষ বোস, সবাই উকিল। উকিল-মুহুরি না হলে দেশ চালানো যায়? দেশে যত লোক আছে তাদের সব্বাইকে একদিন না একদিন কোর্টে আসতেই হবে, তাদের হাত থেকে পালিয়ে আপনি যাবেন কোথায়?

তারপর কথা থামিয়ে হঠাৎ বললে—কী মশাই, আর কতদূর নিয়ে যাবেন আমাকে? আর তো পারছি না।

কিন্তু সদানন্দ সে-কথার উত্তর দিলে না। হাজারি বেলিফের কথাগুলোই সে ভাবতে লাগলো। সকলকেই কি তাহলে একদিন কোর্টে যেতে হবে? কোর্টে গিয়ে নিজের পাপ-পুণ্যের জবাবদিহি করতে হবে? এতদিন তো বেশ ছিল সে। নিজের মনের অন্তস্তলে নিজের কৃত কর্মের প্রশান্তির মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির সন্তোষ নিয়ে অজ্ঞাতবাস করছিল। সে ভাবতো নবাবগঞ্জের মানুষ এই পনেরো বছরে গ্রামের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তার তৈরী করে দেওয়া হাসপাতালে নবাবগঞ্জের মানুষরা অসুখে ওষুধ পাচ্ছে সেবা পাচ্ছে। নয়নতারার সংসারে শান্তি এসেছে, সাচ্ছল্য এসেছে, তারা সুখী হয়েছে। তার নিজের বলতে যথাসর্বস্ব যা ছিল সব কিছু দিয়ে সে সকলকে সুখী করতে পেরেছে এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কী থাকতে পারে! তবু কিনা তাকে বিচারালয়ে যেতে হবে!

—কী মশাই? আর কত দূর? কথা বলছেন না যে?

সত্যিই তো, একদিন তো সকলকেই বিচারশালায় গিয়ে বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। একদিন সকলকে সেই বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে হয় মানব-জন্ম পেয়ে আমি কী কী করেছি। কিন্তু সেখানকার জন্যেও তো সদানন্দর বক্তব্য আছে। সদানন্দ সেখানে গিয়ে বলবে—আমার সমস্ত অর্থ আমি সকলকে দান করে দিয়েছি, আমার নিজের কোনও লোভ নিজের কোনও কামনাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, আমি এমন কোনও কাজ করিনি যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে আমার লজ্জা হবে! আমি নিষ্পাপ, আমি নিষ্কলুষ!

হাজারি বেলিফ্ আবার বললে—আমি আর হাঁটতে পারছি না মশাই, আমি এই এখানে বসে পড়লুম—

জীবন-প্রদক্ষিণ কি অত সোজা! একদিন যে যাত্রা তার অনাদিকাল থেকে শুরু হয়েছিল, আবার শুরু থেকে সেই জীবন পরিক্রমা করা কি আজ অত সোজা নাকি! শুরু থেকে আবার সেই একই যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া।

হাজারি বেলিফ সত্যিই সেখানে বসে পড়লো। নৌকো থেকে নেমে সেই যে দু'জনে হাঁটতে শুরু করেছিল সে-হাঁটা যেন তাদের আর শেষ হয় না। পথে অনেক গ্রাম পড়েছে, অনেক হাট, অনেক গঞ্জ অতিক্রম করে এসে তবে পড়বে বাসডিপো। সেখান থেকে বাসে উঠে তবে যেতে হবে কলকাতায়। তারপর ভাগলপুর। ভাগলপুর থেকে ফিরে আবার কলকাতায়। তারপর সেই কলকাতা থেকে ট্রেনে উঠে তবে যেতে হবে নবাবগঞ্জ!

সদানন্দ বললে—চলুন চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। প্রথম সুলতানপুরে যাবো—তারপর সেখান থেকে যাবো নবাবগঞ্জ—

হাজারি বেলিফ্ বললে—ও-সব জায়গা দেখে আর কী করবেন মশাই? মিছিমিছি কষ্টই সার হবে। পুলিস কি আর মিছে কথা বলতে গেছে আপনার নামে? মিছে কথা বলে তাদের লাভ কী?

—কিন্তু আপনি যে বলছেন আমি আমার বাবাকে খুন করেছি—

হাজারি বেলিফ্ বললে—হ্যাঁ, আপনি নিজেই নিজের বাপকে খুন করেছেন আর তবু বলছেন খুন করেছেন কিনা জানেন না? তাহলে তিনশো দুই ধারার চার্জ হলো কেন আপনার নামে? পুলিস কি মিথ্যে কথা বলছে?

হঠাৎ হাজারি বেলিফ্ বললে—তার চেয়ে মশাই একটা কাজ করুন না, আমাকে গোটা পাঁচেক টাক দিয়ে দিন না—

—কেন ? আপনাকে পাঁচ টাকা দিলে কী হবে?

—আমি কোর্টে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ে দেব যে আসামীকে খুঁজে পেলুম না।

সদানন্দ বললে—কিন্তু আপনি তো আমাকে খুঁজে পেয়েছেন—

হাজারি বললে—খুঁজে পেলেও আমি গিয়ে বলবো খুঁজে পাইনি—এরকম তো আমরা হামেশাই করি মশাই। এরকম না করলে আমাদের পেট চলে? কী বলছেন আপনি? মাইনে তো পাই মাত্তোর তিরিশ টাকা, এই সব উপরি পেয়েই তো আমাদের সংসার চলছে। নইলে এই মাগ গি-গণ্ডার বাজারে মেয়ের বিয়ে, লোক-লৌকিকতা কী করে সব কিছু করছি? ঘুঁষ নিয়েই তো পেয়াদা-পেসকারদের সংসার চলে—। তা পাঁচটা টাকা পেলে আপনিও বাঁচেন, আমিও বাঁচি—

হাজারি যত না কাজ করে তার চেয়ে কথা বলে বেশি। আসামীর খোঁজে একবার গেছে নবাবগঞ্জে, সেখান থেকে গেছে সুলতানপুরে, তারপর গেছে নৈহাটিতে। নৈহাটি থেকে কলকাতার ধর্মশালাতে। যেখানে যেখানে সদানন্দ চৌধুরীকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানেই সে গেছে। কোর্টের পেয়াদা, এইটেই তার কাজ—এই আসামীদের সমন ধরিয়ে দেওয়া। তার সঙ্গে কিছুই থাকে না বলতে গেলে। থাকবার মধ্যে থাকে শুধু একটা পুঁটলি। পুঁটলির মধ্যে থাকে একখানা ধুতি আর একখানা গামছা। আর থাকে দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম। সাজ-সরঞ্জাম মানে একখানা ধারালো ক্ষুর আর ক্ষুর শান দেবার একটা পাথর। আর কিছু না। গাছতলা পেলে তো গাছতলা, আর নয় তো কোনও হাটের অটচালা। আর খাওয়া? কোর্টের পেয়াদাকে কে আর জামাই-আদর করে খাওয়াবে! কোর্টের পেয়াদা কি কারো কাছে সুখের খবর দেয়? কোর্টের পেয়াদা মানেই তো ঝামেলা!

সদানন্দও ভাবছিল যেতে যেতে। কী এমন সে করেছে! সংসারের সকলের সুখ, সকলের সমৃদ্ধি, সকলের শুভ-কামনাই তো সে চিরকাল করে এসেছে। সকলের শেষে যেদিন নৈহাটি থেকে চলে এসেছে সেদিন সে তো একেবারে যাকে বলে নিঃস্ব। নয়নতারাকে বিয়ে করে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি বলে তার ওপর যে অন্যায় সে করেছিল তার প্রায়শ্চিত্তও তো সে সেদিন করে এসেছে টাকা দিয়ে। শুধু একটা মাত্র কামনাই সে করেছিল সেদিন যে নয়নতারা যেন সুখে থাকে। সেইজন্যেই তো সে প্রথমেই লিখেছিল—এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন বিশ্বাসী-প্রাণ মানুষ আছে। সে মানুষ এখনও সততা এবং সত্যবাদিতাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে, বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে।

নয়নতারার বাড়ি থেকে চলে আসার সময় ট্রেনে বসে তার ইষ্টদেবতার উদ্দেশে সেই শ্লোকটা বারে-বারে সে আবৃত্তি করেছিল ঃ

সর্বেহত্র সুখীনঃ সন্তু।
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ ॥
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তি
মা কশ্চিৎ দুঃখং আপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ সকলে সুখী হোক, সকলে ব্যাধি-মুক্ত হোক, সকলে শান্তি পাক, সকলের দুঃখ দূর হোক। এই একটি কামনাই তো সারা-জীবন সে করে এসেছে। এই কামনার জন্যেই তো সে নিজের পিতা-পিতামহের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, এই কামনার জন্যেই তো সে মা'র মনে কষ্ট দিয়েছে, এই কামনার জন্যেই তো সে সমরজিৎবাবুর মনে দুঃখ দিয়েছে। এই কামনার জন্যেই তো সে পৃথিবীর সমস্ত বিলাস-বৈভব থেকে দূরে থেকেছে। নইলে বাস্তব-জগতে কীসের অভাব ছিল তার! ইচ্ছে করলে সে তো ভোগের শিখরে বসে সমস্ত বিলাসের উপকরণের সাহায্যে ষোড়শ উপচারে নিজের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়কে পরিতুষ্ট করতে পারতো। তা না করে সে নবাবগঞ্জকে সোনার দেশে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সেখানে বিরাট কলেজ হয়েছে। মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় যে আশীর্বাদ সেই জ্ঞানের আশীর্বাদ পাবার পথ সে দেখিয়ে দিয়েছে। আজ নবাবগঞ্জের ছেলেমেয়েদের আর জল-কাদা মাড়িয়ে ছ'ক্রোশ দূরে পড়তে যেতে হয় না। নবাবগঞ্জ এখন স্বর্গে পরিণত হয়েছে। যে-কাজ তার পিতা-পিতামহের করার কথা, সদানন্দই সেই কাজ সমাধা করে দিয়ে এসেছে। সেখানে হাসপাতাল হয়েছে, সেই হাসপাতালে আজ শুধু নবাবগঞ্জ কেন, আশেপাশের সব গ্রামের লোকের বিনামূল্যে চিকিৎসা হচ্ছে। নবাবগঞ্জের কোনও কপিল পায়রা পোড়াকে আর অভাবে-অনটনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে না। মানিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকদেরও আর অর্থাভাবে পাগল হয়ে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না। এ সব কাজ তো সদানন্দই করেছে।

আর নয়নতারা? নয়নতারার সর্বনাশই বা সে কী এমন করেছে?

হাজারি বেলিফ একটা গাছতলায় বসে তখন নিজের দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছে। বেশ ধারালো ক্ষুরটা তার। একটা ছোট আয়নার ওপর নিজের মুখটার প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে আপন মনে দাড়ি কামিয়ে যাচ্ছে সে।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা হাজারিবাবু? নয়নতারার আমি কী সর্বনাশ করেছি?

হাজারি বেলিফ্ বললে—তা আমি কী জানি মশাই, আমার সমন ধরিয়ে দেওয়ার কাজ, আমি আপনাকে সমন ধরিয়ে দিয়ে খালাস, আপনি নয়নতারার কী সর্বনাশ করেছেন তা আপনিই জানেন—পুলিস যখন চালান লিখেছে তখন কি আর না-জেনে-শুনে লিখেছে? নয়নতারা তো আপনার বউ-এর নাম—

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

হাজারি ক্ষুর চালাতে চালাতে একটু থেমে নিয়ে বললে—তা আপনার বউ রইল সেখানে, আর আপনিই বা চৌবেড়েতে একলা-একলা পরের অন্নদাস হয়ে রয়েছেন কেন? বউ-এর সঙ্গে আপনার বনিবনাই বা হলো না কেন? কী করেছিল আপনার বউ?

সদানন্দ বললে—সে তো অনেক কথা। সব কথা কি আর এইটুকু সময়ে বলা যায়?

হাজারি বললে—তা আমাকে না বলুন জেরার সময় হাকিমের সামনে তো সবই বলতে হবে। বউকে আপনি ত্যাগ করলেন কেন এটা যদি হাকিম জিজ্ঞাসা করেন, এর জবাব কী দেবেন? তা বউ কি আপনার কালোকুচ্ছিৎ?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে? নষ্ট?

—না, তাও নয়। খুব সুন্দর দেখতে। আর স্বভাব-চরিত্রও তার খুব ভালো।

—দেখতেও সুন্দর আর স্বভাব-চরিত্রও ভালো? তাহলে তাকে ছাড়লেন কেন মশাই? তাহলে তো আপনারই দোষ। তাহলে খেতে-পড়তে পাচ্ছে না বলে হয়ত আপনার বউ খোরপোষের জন্যে হাকিমের কাছে আর্জি পেশ করেছে—আপনি যখন অগ্নি সাক্ষী রেখে তাকে বিয়ে করেছেন তখন তাকে খাওয়ানো-পরনোর দায়িত্ব তো আপনারই।

সদানন্দ বললে—না, তা নয় আমার বউ আবার আর একজনকে বিয়ে করেছে—

—আবার বিয়ে করেছে? কেন?

সদানন্দ বললে—আমি তাকে নিয়ে ঘর করিনি বলে।

হাজারি অবাক হয়ে গেল। বললে—তাই বলুন, বিয়ে করলেন আর ঘর করলেন না, সে বউ তো আর একটা বিয়ে করবেই। তা তারপর?

বলে আবার একমনে দাড়ি কামাতে লাগলো। দাড়ি কামানো থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তারপর কী হলো?

সদানন্দ বললে—তারপর তাদের খুব অভাব-অনটন চলতে লাগলো—

হাজারি বেলিফ জিজ্ঞেস করলে—কেন? তার বরটা কী করে?

সদানন্দ বললে—একটা ছোটখাটো চাকরি করে। বউও চাকরি করে একটা অফিসে—

—তা উপ্‌রি কিছু আছে সে-চাকরিতে? মানে ঘুঁষ-টুষ?

সদানন্দ বললে—তা জানি না।

হাজারি বললে—ঘুঁষ না থাক, ওভার-টাইম?

—তাও জানি না। বোধ হয় নেই।

হাজারি বললে—ঘুঁষ কি ওভার-টাইম একটা কিছু না থাকলে আজকাল ছোট চাকরিতে লোকে সংসার চালাবে কী করে!

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? দু'জনের চাকরিতেও সংসার চলবে না?

হাজারি বললে—আপনি আছেন কোথায় মশাই? চাল ডালের দর কত জানেন? থাকেন তো পরের বাড়িতে, জিনিস-পত্তোরের দামের হিসেব তো আর রাখতে হয় না আপনাকে!

বলে দাঁড়িয়ে উঠলো হাজারি। হাজারি বেলিফ্ কোর্টের পেয়াদাগিরি করে করে কেমন যেন ছট্‌ফটে স্বভাবের মানুষ হয়ে গেছে। কোথাও চুপ করে যেমন বসে থাকতেও জানে না, তেমনি আবার যেখানে সেখানে একফালি জায়গা পেলে ঘুমিয়ে পড়তেও পারে। ঘুম থেকে ধড়ফড় করে হঠাৎ উঠে বসে। বলে—কী মশাই, আপনি পালিয়ে যাননি তো? আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

সদানন্দ বলে—পালিয়ে আর যাবো কোথায় হাজারিবাবু?

হাজারি বেলিফ্ বললে—পালাবার জায়গার কি অভাব আছে মশাই, আমার কত আসামী পালিয়ে গেছে—। তা আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন না-ই বা কেন বলুন তো? আমাকে পাঁচটা টাকা দিলেই তো আপনি পালাতে পারেন, আমি হাকিমকে গিয়ে সোজা বলবো আপনাকে খুঁজে পাই নি। আজ পনেরো বছর তো এমনি করেই চালালুম, আরো না-হয় কয়েক বছর চালাবো। আর তার বদলে আমাকে শুধু মাঝে-মাঝে কিছু টাকা দিয়ে যাবেন, তাতে আমারও কিছু সুরাহা হবে।—ব্যাস্—

সদানন্দ বললে—কিন্তু তাহলে তো পৃথিবীতে পাপীর শাস্তি হবে না—পৃথিবী যে পাপে একেবারে ভরে যাবে—

হাজারি বেলিফ্ বললে—পাপ-পুণ্যের কথা রেখে দিন, ও-সব ইস্কুলের কেতাবে লেখা থাকে। সব পাপী যদি ধরাই পড়বে তাহলে উকিল মুহুরি পেশকার কী খাবে শুনি? তাদেরও

তো চলা চাই। আরে মশাই সেই জন্যেই তো আমাদের কোর্টে আশি হাজার মামলা এখনও ঝুলছে—

—আশি হাজার?

হাজারি বেলিফ্ বললে—হ্যাঁ, আসামীরা আমাদের কিছু কিছু করে দেয় তাই আমরাও সমন ঝুলিয়ে রাখি। এই রকম যত ঝুলবে তত উকিল-মুহুরি-পেশকারদের পকেট ভরবে। ফয়শালা হয়ে গেলেই তো আমাদের লোকসান। তাই তো বলছি আপনিও মশাই পালিয়ে যান—

সদানন্দ বললে—না হাজারিবাবু, আমি পালাবো না। আমি যদি দেখি যে সত্যিই পাপ করেছি তো হাকিম আমাকে যে শাস্তিই দিক আমি তা মাথা পেতে নেব—

হাজার অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? আপনি দোষ স্বীকার করবেন? আপনি হলফ্-নামা করে বলবেন আপনি আপনার বাবাকে খুন করেছেন?

—হ্যাঁ, যদি সত্যিই খুন করে থাকি তো তা বলবো!

—আপনি বলবেন যে আপনি আপনার বউকে খেতে পরতে দেননি, তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

—তা সত্যি হলে তাও বলবো।

—আপনি বলবেন যে আপনার গাঁয়ের লোকদের ভিটে-মাটি চাঁটি করেছেন?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, তাও বলবো। যদি আমি সত্যিই দেখি যে পৃথিবীর একজন মানুষেরও আমি ক্ষতি করেছি তো আমি তার জন্যে ফাঁসি যেতেও তৈরি—

কথাগুলো শুনে হাজারি বেলিফের চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। বললে—আপনি মশাই দেখছি আসল শয়তান। আর মশাই, তা যদি বলেন তো সংসারে কে পাপী নয় বলুন? আমরা তো সবাই পাপী, সবাই আসামী! আপনি, আমি, আমাদের কোর্টের উকিল মুহুরি পেশকার, হাকিম, কে আসামী নয়?

সদানন্দ বুঝতে পারলে না? হাজারি আবার বলতে লাগলো—পৃথিবীর সবাই আসামী মশাই, সবাই আমরা আসামী। এই যে আমি, আমি তো কোর্টের বেলিফ্, আমিই কি আমার ডিউটি করি? আমি তো ঘুঁষ নিই। তা আমার কথা না-হয় ছেড়েই দিন, আমাদের কোর্টের উকিল-মোক্তার মুহুরি-পেশকার এমন কি আমাদের কোর্টের হাকিম সাহেবরা, তারাও পর্যন্ত তাদের ডিউটি করে না! আর আপনার কথাই ধরুন না কেন, আপনিও তো একজনকে বিয়ে করেছিলেন, আপনিই কি কখনও স্বামীর ডিউটি করেছিলেন? সংসারে মশাই কেউই নিজের নিজের ডিউটি করে না। আজকাল বাবা বাবার টিউটি করে না, মা মা'র ডিউটি করে না, ছেলেও ছেলের ডিউটি করে না। ডিউটি করলে কি কেউ আসামী হয়! ডিউটি করি না বলেই তো আমরা সবাই আসামী—ডিউটি যদি সবাই করতো তো এ পৃথিবী তো তাহলে স্বর্গ হয়ে যেতো, আমাদের কোর্টের উকিল-মুহুরি-পেশকার-হাকিম, কাউকে তাহলে আর করে খেতে হতো না—

সদানন্দ বললে—না হাজারিবাবু, অন্য কেউ তার কর্তব্য করে কি না আমি জানি না, আমি তা জানতে চাইও না। কিন্তু আমি সারা জীবন আমার যা-যা কর্তব্য সব পালন করে এসেছি—

—বলছেন কী? তাহলে আপনি কী বলতে চান আপনি দেবতা?

সদানন্দ বললে—না, তা কেন বলবো, আমি মানুষ, মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের যা কর্তব্য তা করেছি। আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, ন্যায়ের সমর্থন করেছি, যেখানে প্রতিবাদ করে ফল হয়নি সেখানে বিদ্রোহ করেছি, সারা জীবন তাই সকলে আমাকে পাগল বলেছে—

হাজারি বললে—তা হতে পারে। আপনি পাগলই বটে। আমি তো মশাই এই তিরিশ বছর কোর্টের পেয়াদাগিরি করছি, এমন আসামী আমি আমার জীবনে দেখিনি—

হঠাৎ সদানন্দ বললে—এখানে নামুন, এই ভাগলপুর এসে গেছে—

ট্রেন থামতেই সদানন্দ নামলো। হাজারি বেলিফও পেছন-পেছন নামলো। ভাগলপুর স্টেশনে নেমে সুলতানপুরে যেতে হবে। সেই সুলতানপুর। চৌধুরী মশাই শেষ জীবনটা এই সুলতানপুরেই কটিয়েছিলেন। এতদিন পরে আসা এ যেন আসা নয়, আবির্ভাব সদানন্দ চৌধুরীর পুনরাবির্ভাব!

সদানন্দ বললে—হাজারিবাবু, একটা কথা, এখানে কাউকে বলবেন না যে আমার নাম সদানন্দ চৌধুরী, বলবেন না, যে আমি হরনারায়ণ চৌধুরীর বংশধর—

হাজারি বললে—ঠিক আছে—

বহু দিন আগে প্রকাশ মামাই তাকে সঙ্গে করে শেষ এখানে নিয়ে এসেছিল। তখনই মানুষগুলোকে চিনতে পেরেছিল সদানন্দ। সুলতানপুরের সবাই-ই ছিল যেন এক-একজন প্রকাশ মামা। সবাই-ই যেন টাকা-টাকা করে অস্থির। কারো মেয়ের বিয়ে কারো ছাদের টিন, কারো খামারের বলদ। অভাব থাকলেও তাদের অভাব, অভাব না-থাকলেও তাদের অভাব। টাকার গন্ধ পেলেই তারা ছেঁকে ধরবে। যতদিন চৌধুরী মশাই বেঁচে ছিল ততদিন তাকে ছেঁকে ধরেছে। তারপর যখন চৌধুরী মশাই মারা গেল তখন ছেঁকে ধরেছে প্রকাশ মামাকে। ভেবেছে প্রকাশ মামাই তার পিসেমশাই-এর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। প্রতিদিন সকাল থেকে সবাই তার মোসায়েবি করেছে। কিন্তু যেদিন জানতে পারলে চৌধুরী মশাই-এর ছেলেই সমস্ত টাকার উত্তরাধিকারী, সেই থেকে সদানন্দকেই তারা ছেঁকে ধরেছে টাকার জন্যে।

সুলতানপুরে নতুন মুখ দেখে সবাই কৌতুহলী হয়ে উঠলো—কোথায় যাবেন আপনারা?

সদানন্দ বললে—এখানে প্রকাশ রায় বলে একজন ছিলেন, তিনি আছেন?

—প্রকাশ রায়? আজ্ঞে না, তিনি তো নেই।

—নেই মানে? তিনি এখানে থাকেন না আর?

লোকটা বললে—আগে থাকতেন, সে অনেক কাল আগে। প্রায় পনেরো বছর আগে। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।

—মারা গেছেন? কী করে মারা গেছেন?

দেখতে দেখতে তখন চারদিক থেকে আরো অনেক বেকার লোক জুটে গেছে। তারাও কথা শুনছিল এতক্ষণ। তাদের মধ্যে একজন লোক হলে উঠলো—সে অনেক কাণ্ড মশাই, প্রকাশ রায়ের এক ভাগ্নে ছিল, সেই ভাগ্নেটাই যত নষ্টের গোড়া। এক নম্বরের শয়তান ছিল সে—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—তার ভাগ্নে? কী নাম তার?

লোকটা বললে—তার নাম সদানন্দ চৌধুরী। একেবারে বখাটে ছেলে যাকে বলে। সে তার নিজের বাপকে পর্যন্ত খুন, করেছে, তা প্রকাশ রায় তো দুরের কথা।

সদানন্দ বললে—সে কোথায় এখন?

সকলেই বললে—কোথায় আর থাকবে সে, খুন করে গা-ঢাকা দিয়েছে। সে তো আজ পনেরো বচ্ছর আগের কথা, পুলিস তাকে অনেক ধরতে চেষ্টা করেছিল মশাই, কিন্তু সেই যে গা-ঢাকা দিলে তারপর আর কেউ তার খোঁজ পায়নি—

—ছেলে হয়ে বাবাকে সে খুন করেছিল? এ কখনও সম্ভব?

বুড়ো-বুড়ো কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা সবাই-ই নাকি প্রত্যক্ষদর্শী।

সকলেই সমর্থন করলে কথাগুলো। বললে—টাকা মশাই টাকা! টাকা এমনই জিনিস মশাই ; বাপের অনেক টাকা ছিল তো। বাপ না মরলে তো আর ছেলে সে টাকাগুলো হাতাতে পারে না। আট লাখ টাকার লোভ কি ছাড়া সোজা? কলিযুগ মশাই, ঘোর কলিযুগ! রায় মশাই সকলেই কথা দিয়েছিল যে, টাকাটা পেলে সুলতানপুরের সকলকে কিছু কিছু দেবে। কিন্তু ওই যে সদানন্দ, ও এসেই সব ভণ্ডুল করে দিলে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে সদানন্দর মনে হলো সে যেন রূপকথা শুনছে। বললে—তাহলে প্রকাশ রায় ভালো লোক বলছেন?

সবাই বললে—রায় মশাই-এর তুল্য লোক হয় না মশাই। একেবারে দেবতুল্য লোক। অথচ ওই ভাগ্নের জন্যে রায় মশাই একদিন কী-ই না করেছে। নিজে পাত্রী পছন্দ করে তার বিয়ে দিয়েছে। সারা জীবন নিজের ছেলে-মেয়ে-বউ কাউকে দেখেনি, কেবল ওই ভাগ্নে কীসে মানুষ হয় সেই চেষ্টাই করেছে। কিন্তু সে-ভাগ্নেটাও যে একটা আস্ত অপোগণ্ড। নিজের বউটা পর্যন্ত তার অত্যাচারে বাপের-বাড়ি চলে গেল। শেষে যখন শুনলে যে দাদামশাই-এর সম্পত্তিও বাপের হাতে এসেছে, তখন আর থাকতে পারলে না—একদিন রাত্তিরে বাপ ঘুমোচ্ছিল, তখন বাপকে খুন করে—কিন্তু রায় মশাই দেখতে পেয়ে তাকে ধরে ফেললে—

—তারপর?

তারপরের ঘটনাও সবাই বলে গেল। এমন ভাবে বলে গেল যেন তারা সবাই ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে। সে একেবারে নিখুঁত বর্ণনা সব। কেমন করে চৌধুরী মশাই-এর অপঘাতে মৃত্যু হলো, কেমন করে রায় মশাই পুলিসকে খবর দেবার জন্যে থানায় গেল, সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলো তারা।

যারা আসল খুনী হয় তারা নাকি এমনি করেই গা-ঢাকা দেয়। বাপের সব টাকা ছিল ব্যাঙ্কে, সেই টাকাটা পর্যন্ত কালেক্টারিতে ঘুঁষ দিয়ে তুলে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিল। এদিকে পুলিসও খুঁজছে তাকে, ওদিকে রায় মশাইও খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে তাকে পাওয়া গেল কলকাতার এক ধর্মশালাতে।

প্রকাশ রায় সদানন্দকে সামনে পেয়েই একেবারে চেপে ধরলে।

বললে—তুই জামাইবাবুকে খুন করেছিস!

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

প্রকাশ বললে—কেন খুন করতে গেলি? জামাইবাবু কী দোষ করেছিল?

সদানন্দ বললে—বেশ করেছি খুন করেছি, অমন বাপকে আগে খুন করলেই ভালো হতো—

প্রকাশ বললে—কিন্তু হাজার হোক, জামাইবাবু তো তোর নিজের বাপ। নিজের বাবাকে খুন করতে তোর হাত একটুও কাঁপলো না রে? তুই কি ভেবেছিস নরকেও তোর ঠাঁই হবে? তোর যে মহাপাতক হবে রে—

সদানন্দ বললে—আমি স্বর্গ নরক মানি না।

—স্বর্গ নরক না মানিস ভগবান তো মানিস?

সদানন্দ বললে—না, ভগবানও আমি মানি না। ভগবান বলে কেউ নেই, কিছু নেই। ও-সব তোমাদের বানানো কথা, আজগুবী—

—তা কেন তুই জামাইবাবুকে খুন করলি তাই বল্?

সদানন্দ বললে—টাকার জন্যে—

—টাকাই তোর কাছে এত বড় হলো? এত টাকা তুই কী করবি?

সদানন্দ বললে—লোকে টাকা পেলে যা করে আমিও তাই-ই করবো। আমি টাকা দিয়ে মদ খাবো, মেয়েমানুষ রাখবো, ফুর্তি করবো, ওড়াবো।

প্রকাশ বললে—তা আমি গাঁয়ের লোককে বলেছি ওই টাকা দিয়ে গাঁয়ের লোকের দুঃখ ঘোচাবো, তাদের অভাব মেটাবো—

সদানন্দ বললে—গাঁয়ের লোকেরা টাকার মর্ম কী বুঝবে, তারা তো ছোটলোক, তারা জীবন কখনও এত টাকা দেখেছে যে তাদের টাকা দেবে তুমি?

তখন প্রকাশ মামা বললে—তা আমি না হয় মামা হয়ে তোকে রেহাই দিলুম, কিন্তু পুলিস? পুলিস তো তোর পেছনে লেগে আছে, তোর নামে হুলিয়াও বেরিয়েছে, তাদের হাত থেকে তুই পালাবি কী করে?

সদানন্দ বললে—পুলিসকে আমি চিনি। ঘুঁষ দিলেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে—

প্রকাশ বললে—কিন্তু আমি? আমার মুখ বন্ধ করবি কী করে?

সদানন্দ বললে—তুমি যদি টাকা চাও তো তোমাকেও টাকা দিতে পারি। তুমি কত টাকা নেবে বলো?

প্রকাশ বললে—তুই কি আমাকে এত নীচ মনে করিস? টাকা দিয়ে তুই আমার মুখ বন্ধ করতে চাস?

সদানন্দ বললে—টাকা দিয়ে কার মুখ বন্ধ করা না যায় শুনি? তুমি তো কোন্ ছার মামা—

কিন্তু প্রকাশ রায় তেমনি পাত্রই নয় যে টাকার বদলে মিথ্যে বলে চালাবে। তা যদি রায় মশাই চাইতো তবে জীবনে কোনও দিন তার টাকার অভাব থাকতো না। তার নিজের বউ-ছেলে-মেয়ের দিকে না তাকিয়ে যাকে সে প্রাণের চেয়ে ভালবালতো সেই ভাগ্নেই যখন তাকে টাকা দেখাতে লাগলেন তখন তার মনে বড় কষ্ট হলো মশাই। হায় রে টাকা! টাকা সংসারে এমনই জিনিস। নিজের বাপকে খুন করতেও যার বাধে না, সেই টাকার ওপরে রায় মশাই-এর তখন ঘেন্না হয়ে গেল। সে তখন ভাবলে অমন ভাগ্নের মুখ সে আর দেখবে না। বলে ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসছে, পেছন পেছন সদানন্দও রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাস্তায় এসে বললে—কোথায় যাচ্ছো?

রায় মশাই বললে—কোথায় যাচ্ছি তা তোর শুনে দরকার কী?

সদানন্দ বললে—আমি জানি তুমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছো!

রায় মশাই বললে—তোর ফাঁসি হলে তবে আমার শান্তি হয়। তুই টাকার জন্যে তোর বাপকে খুন করেছিস, এর পর তোর মুখদর্শন করাও পাপ—

সদানন্দ বললে—বুঝেছি, তুমি থানায় যাচ্ছো—

রায় মশাই বললে—তুই তোর বোঝা নিয়ে থাক, আমি তা নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না—

বলে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই সদানন্দ রায় মশাইকে এক ধাক্কা দিয়েছে। ধাক্কা খেয়ে রায় মশাই রাস্তার ওপরেই পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই একটা চলন্ত লরী এসে তাকে একেবারে চেপটে দিয়েছে। যখন লোকজন জড়ো হলো তখন রায় মশাই-এর শরীরে আর প্রাণের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। রক্তে একেবারে জায়গাটা ভেসে গিয়েছে—

সমস্ত কাহিনীটা শুনে সদানন্দ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন করেই কি সমস্ত ঘটনাটাকে বিকৃত করতে হয়! এই-ই কি পৃথিবী! পাশে হাজারি বিলিফ্ নিঃশব্দে সব কিছু শুনছিল। এতক্ষণে তার মুখে যেন হাসি ফুটে উঠলো। জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছে

সদানন্দ। সে আঘাত যতটা এসেছে বাইরে থেকে তার হাজারগুণ আঘাত এসেছে তার নিজের ভেতর থেকে। এই ভেতরের আঘাতেই এতদিন বাইরের সমস্ত কিছুর প্রভাব থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। নিজের চারিদিকে আচ্ছাদন দিয়েই ভেবেছিল সে আত্মরক্ষা করবার সহজ পথটা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সেই আচ্ছাদনের কোন্ অদৃশ্য ফুটো দিয়ে কবে যে সে একেবারে নিরাবরণ হয়ে গেছে তা সে টের পায়নি। তাহলে এই-ই কি তার আসল স্বরূপ! আজকের সুলতানপুরের মানুষের কাছে এই-ই কি তার সঠিক পরিচয়!

হাজারি বেলিফ্ হঠাৎ উঠলো—আসুন মশাই, চলে আসুন—

কিন্তু সদানন্দ সে-কথা শুনলে না। জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কথা আপনারা কোত্থেকে শুনেছেন? এ-সব কি সত্যি কথা?

লোকটা বললে—এ-সব কথা তো খবরের কাগজেই বেরিয়েছে মশাই, আপনারা পড়েননি? খবরের কাগজে কি মিথ্যা কথা ছাপা হয় বলতে চান? আসলে তো মশাই টাকা। টাকার কাছে ছেলে-বাপ-মামা-ভাগ্নে কিছু নেই, তা তো জানেন—

রাস্তায় চলতে চলতে সদানন্দের মনে হলো, কই, সুতানপুরের মানুষ একজনও তো কেউ বললে না চৌধুরী মশাই-এর ছেলের মহৎ লক্ষ্য ছিল, চৌধুরী মশাই-এর ছেলের ত্যাগের সাধনা ছিল, চৌধুরী মশাই-এর ছেলে উদার-প্রাণ ছিল। একজনও তো কেউ বললে না টাকা সে নিয়েছে পরকে আপন করার জন্যে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে-টাকা সে পেয়েছে সে-টাকার এক কপর্দকও সে নিজের জীবন ধারণের জন্যে গ্রহণ করেনি তা তো কেউই বললে না। অথচ কত অবলীলায় প্রকাশ মামা এদের কাছে মহাপ্রাণ হয়ে উঠেছে! তার অজ্ঞাতবাসের এই পনেরো বছরের মধ্যে মিথ্যেটাই কি মুখে-মুখে এমন সত্যে পরিণত হয়ে গেছে যে, প্রতিবাদ করলেও তারা খবরের কাগজের দোহাই দেবে!

কোথায় সেই চৌবেড়িয়া, আর কোথায় এই সুলতানপুর। এই সুলতানপুর থেকেই আবার নবাবগঞ্জ। সদানন্দকে যেন আবার নতুন করে তার সমস্ত কর্মের পুনর্বিচার করতে হচ্ছে। এতদিন তাহলে যা সে বিশ্বাস করে এসেছে, তা সমস্তই কি তবে ভুল বিশ্বাস! তার সমস্ত পরিশ্রম কি তবে পণ্ডশ্রম!

রেল বাজার থেকে নেমে আবার সেই ছ' ক্রোশ পথ! কখন সুলতানপুর থেকে বেরিয়ে চল্লিশ ঘণ্টা রাস্তায় কাটিয়ে আবার ট্রেনে উঠে রেল-বাজারে নেমেছিল সেদিকে খেয়াল ছিল না সদানন্দর। তার মধ্যে হাজারি বেলিফ্, শেয়ালদ' স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাড়ি কামিয়ে নিয়েছে, চান করেছে। আবার ট্রেনে উঠেছে। তারপর রেল-বাজারে এসে নেমেছে।

—আর কত দূর মশাই? আমি যে আর পারছি নে?

সদানন্দ বললে—এবার একবার যাবো নবাবগঞ্জে—

—তা নবাবগঞ্জ হলেই শেষ তো?

সদানন্দ বললে—না, নবাবগঞ্জটা দেখে একবার যাবো নৈহাটিতে—

—নৈহাটিতে কেন?

—নৈহাটিতে আমার স্ত্রী আছে।

হাজারি বেলিফ্ বললে—আপনার আবার স্ত্রী কোথায়? সে স্ত্রীকে তো আপনি ত্যাগ করেছেন—

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ ত্যাগ করেছি বটে, কিন্তু আপনি যে বলছেন সেই স্ত্রী আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে! আমি শুধু একবার নৈহাটিতে জানতে যাবো সে কেন আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, আমার বিরুদ্ধে কী তার অভিযোগ আমি তার কী ক্ষতি করেছি—

হাজারি বেলিফ্ বললে—কিন্তু অন্যায় একটা কিছু করেছেন আপনি নিশ্চয়ই, নইলে

কেউ কি কারো মিথ্যে মিথ্যে দোষ দেয়? আপনি তো দেখলেন সুনতানপুরের লোক কী বললে! সবাই তো বললে আপনিই আপনার বাপকে খুন করেছেন—

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, তা তো দেখলুম—

—তবে? তবে কেন আপনার নামে সবাই মিথ্যে মিথ্যে বলতে যাবে বলুন। একজন বললে তবু না-হয় একটা তার মানে ছিল, দেশসুদ্ধ লোক আপনার নামে নালিশ করছে কেন? আপনি কি বলতে চান মশাই যে সবাই খারাপ আর একলা আপনিই ভালো, আপনিই একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির? আপনি মশাই আমাকে কি তেমন বোকা পেয়েছেন যে আপনি যা বললেন তাই-ই আমি বিশ্বাস করবো—

সদানন্দ বললে—না হাজারিবাবু, তবু আমি নিজের চোখে একবার সব কিছু দেখতে চাই—আমাকে আর কিছু সময় দিন। শেষ বিচারের আগে আমি একবার দেখে যেতে চাই যে, আমি যা কিছু করেছি তা ভুল করেছি না ঠিক করেছি—

মুবারকপুরের কাছে আসতেই হঠাৎ সদানন্দ দেখলে নবাবগঞ্জের দিক থেকে দলে-দলে লোকজন পালিয়ে আসছে।

সদানন্দদের দেখে তারা বললে—কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

সদানন্দ বললে—নবাবগঞ্জে—

লোকগুলো বললে—যাবেন না ওদিকে, যাবেন না মশাই, গুলি চলছে নবাবগঞ্জে—

—গুলি? গুলি চলছে কেন? আপনারা কারা?

লোকগুলো বললে—আমরা ভেণ্ডার, নবাবগঞ্জের হাটে সওদা করতে গিয়েছিলুম, এখন প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছি। ওই দেখুন আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন?

সদানন্দ দূর আকাশের দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে দেখলে সেদিকটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে। কেন? আগুন জ্বলছে কেন?

—সি-আর-পি পুলিস গুলি চালিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে—

—কেন? কী হয়েছে ওখানে?

—ছেলেদের ইস্কুলে বোমা পড়েছে, তারা হরতাল করেছে। ছেলেরা পড়বে না—

সদানন্দ চম্‌কে উঠলো। তারই দেওয়া টাকায় স্কুল হয়েছে। সেই স্কুলেই হরতাল হয়েছে নাকি? কেন, কীসের হরতাল?

কিন্তু সদানন্দর কথার উত্তর দেবার তখন সময় নেই কারো। পেছনে আর একদল লোক বড় বড় ঝাঁকা নিয়ে আসছিল। তারাও পালাচ্ছে। উত্তরটা তারাই দিলে। বললে—হাসপাতাল, ইস্কুল, কলেজ সব পুড়ছে মশাই—সব পুড়ছে—

—হাসপাতালও পুড়ছে? তাহলে রুগীরা কী করছে? ডাক্তাররা?

—আরে মশাই, রুগীরা কি হাসপাতালে ওষুধ পায় নাকি যে, হাসপাতালে রুগীরা থাকবে? ডাক্তাররা তো ওষুধ বিক্রি করে ফাঁক করে দিচ্ছে। নবাবগঞ্জের কেউ হাসপাতালে যায় না, ছেলে-মেয়েরাও কেউ লেখাপড়া করে না নবাবগঞ্জে—

সদাননন্দর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—তা, এ-রকম হলো কেন বলতে পারো?

লোকগুলো বললে—যত নষ্টের গোড়া নবাবগঞ্জের চৌধুরী মশাই-এর ছেলে। সেই ছেলেই তো নবাবগঞ্জের এই সব্বোনাশটা করে গেছে—। আগে মশাই আমরা বেশ ছিলুম, এখানে আমাদের কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না, যেদিন থেকে ইস্কুল কলেজ আর হাসপাতাল হয়েছে সেই দিন থেকেই এই উট্‌কো ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে, সেই চৌধুরী মশাই-এর ছেলেই এখানকার সব্বোনাশটা করে গেছে—

তাদের কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে একটা বোমা-ফাটার শব্দ হলো। লোকগুলো যদিও বা আরো কিছু বলতো, তখন আর বললে না। সোজা রেল-বাজারের দিকে চলতে লাগলো। হাট-বার। হাটের লোক সওদা করতে এসেছিল, সব যে-যার দিকে ছিট্‌কে পালাতে লাগলো। কিন্তু বোমা কেন? সদানন্দ সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই ধোঁয়ার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। সত্যিই তো, বোমা কেন?

হাজারি বেলিফ্ বললে—আমি মশাই ওদিকে আর যাবো না, শেষকালে কি গুলি খেয়ে মরবো নাকি?

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার যে গিয়ে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার গিয়ে দেখতুম স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল করে দিয়ে দেশের লোকের কী ক্ষতিটা আমি করেছি—

—তা আপনি মশাই লোকের উপকার করতে গেলেনই বা কেন? আপনার কীসের মাথার দায় পড়েছিল?

সদানন্দ বললে—উপকার করবো না? পরোপকার করা তো মানুষের ধর্ম।

হাজারি বেলিফ্ বললে—ইস্, আপনার তো ফাঁসি হওয়া উচিত মশাই, আপনি করেছেন কী?

—কেন? ফাঁসি হওয়া উচিত কেন?

—ফাঁসি হবে না? পরের উপকার করতে গেলেন আপনি কী বলে? দেখুন তো, লোকগুলো বেশ ছিল, মাঝখান থেকে আপনি তাদের এই সর্বনাশটা করলেন! তারা আপনার কী ক্ষতি করেছিল যে তাদের আপনি ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল করে দিলেন?

হঠাৎ আবার বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেই হাজারি বেলিফ্ একেবারে দশ হাত পেছিয়ে গেছে। বললে—না মশাই, আমি আর এগোচ্ছি না, আপনি ফিরে চলুন—

সদানন্দও আর এগোল না। সদানন্দও ফিরলো। কিন্তু এরকম কেন হলো? স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল করে দিয়ে সে নবাবগঞ্জের মানুষদের কী এমন ক্ষতি করেছে, সেটা দেখতে তার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল—

কিন্তু হাজারি বেলিফ্ বললে—না মশাই, আপনার যদি দেখতেই ইচ্ছে হয় তো আপনি আমায় পাঁচটা টাকা দিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যান, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছিনে—

সদানন্দ আর কী করবে। সেও আবার উল্টো-পথে রেল-বাজরের দিকে চলতে লাগলো।

নৈহাটির বাজারের স্যাকরা মনোহর দত্ত নিজের দোকানে বসে তখন সোনার গয়না কেনা-বেচা করছিল। হঠাৎ শো-কেসের ওপার থেকে কে যেন একজন বুড়ো মানুষ তাকে লক্ষ্য করে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?

মনোহর দত্ত ভালো করে চেয়ে দেখলে সেদিকে। একজন বুড়োমানুষ, মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ। তার পাশে আর একজন বুড়ো মানুষ। কিন্তু তার দাড়ি-গোঁফ সদ্য কামানো।

—বলুন, কী বলবেন?

—আচ্ছা, বলতে পারেন, এখানকার বোসপাড়ার নিখিলেশ ব্যানার্জি কোথায় গেছেন?

—নিখিলেশ ব্যানার্জি? কলিকাতার অফিসে চাকরি করতেন তো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, তাঁর বাড়ি থেকেই আমরা আসছি। সে-বাড়িতে এখন দেখলুম কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী নয়নতারা ব্যানার্জী, তিনিও কলকাতার একটা অফিসে চাকরি করতেন, তাঁকেও বাড়িতে পেলাম না। অন্য ভাড়াটেরা রয়েছে, তারাও কিছু বলতে পারলেন না কোথায় গেছেন তাঁরা—

মনোহর দত্ত বললে—তারা তো অনেক দিন আগেই নৈহাটি ছেড়ে চলে গেছে। সে প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। তারা তো এখন কলকাতায় থাকে। থিয়েটার রোডে বিরাট বাড়ি করে উঠে গেছে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

সদানন্দ বললে—নবাবগঞ্জ বলে একটা গ্রাম থেকে—

মনোহর দত্ত বললে—ও, তা তাদের অবস্থা এখন খুব ভালো হয়ে গেছে মশাই, এককালে তাদের খুবই দুরবস্থা ছিল, তারপর হঠাৎ একদিন কোথাকার লটারিতে চার-পাঁচ লাখ টাকা পেয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি অবস্থা পালটে গেল—

—লটারিতে টাকা পেয়েছিল?

মনোহর দত্ত বললে—কপাল মশাই, সবই কপাল! শুনলুম এখানকার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছে। সেখানে থিয়েটার রোডে নাকি একটা বাড়ি করেছে—

সদানন্দ বললে—থিয়েটার রোডে? বাড়ির নম্বর কত?

মনোহর বললে—তা জানি নে মশাই, থিয়েটার রোডে গিয়ে পাড়ার লোকদের জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন—বড়লোকদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজতে কখনও অসুবিধে হয় না—

তা বলে! সদানন্দ আর সেখানে দাঁড়ালো না। আস্তে আস্তে আবার যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই আবার উল্টোদিকে চলতে লাগলো। আবার স্টেশনের দিকে। পনেরো বছর আগে একদিন এই নৈহাটিতে কতবার এসেছে সে। পনেরো বছর আগে একদিন এই রাস্তা দিয়েই সে এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। নিজের যাবতীয় অর্থ, নিজের যাবতীয় শুভেচ্ছা সমস্ত নিঃশেষ করে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল এইখানে, এই বোসপাড়ার বাড়িটার দু'জন লোকের হাতে। তাদের সংসারের সাচ্ছল্য আর সমৃদ্ধি কামনা করে, তাদের পরস্পরের প্রীতি আর সৌহার্দ্য অটুট থাকার প্রার্থনা করে সে এই রাস্তা দিয়েই চলে গিয়েছিল। সদানন্দ কল্পনাও করেনি যে আবার তাকে একদিন এই নৈহাটিতে ফিরে আসতে হবে। শুধু নৈহাটি কেন, সুলতানপুর, নবাবগঞ্জ কোনও জায়গাতেই ফিরে আসবার পরিকল্পনা ছিল না তার। এই হাজারি বেলিফ্ না এলে হয়ত এখানে আর কখনও আসতোও না সে।

—কী হলো মশাই? আবার কোথায় যাচ্ছেন?

পেছনে হাজারি বেলিফ্ হাঁফাতে হাঁফাতে আসছিল। সে আর হাঁটতে পারছিল না তখন। বললে—আপনার সঙ্গে বেরিয়ে তো মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।

সদানন্দ বললে—আর বেশি দূর নয় হাজারিবাবু, আর একটা জায়গা দেখলেই আমার সব দেখা হয়ে যাবে। আমি জানতে চাই, আমি দোষী না নির্দোষ—

হাজির বললে—আপনি তো দেখছি মহা-আহাম্মক মানুষ। আমি এই তিরিশ বছর ধরে অনেক সমন ধরিয়ে এসেছি, কিন্তু আপনার মত এমন আসামী তো আমার বাপের জন্মেও দেখিনি—। তার চেয়ে আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিন না মশাই, আমি মুক্তি পেয়ে যাই! আমার এত টানা-হ্যাঁচড়া আর ভাল্লাগছে না মশাই—

কিন্তু সদানন্দর কানে যেন কথাটা ঢুকলো না। থিয়েটার রোডে বাড়ি করেছে! ভালোই করেছে নয়নতারা। এখানে ভাড়াটে বাড়িতে থাকার চেয়ে কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি করে ভালোই করেছে তারা। হয়ত আর নিখিলেশবাবুকে চাকরি করতে হচ্ছে না। নয়নতারাকেও হয়ত আর চাকরি করতে হচ্ছে না টাকার জন্যে। হয়ত মনে মনে তারা সদানন্দর ওপর কৃতজ্ঞ! টাকাটা তো সে নিজে তাদের হাতে তুলে দেয়নি। একটা ব্যাগের মধ্যে চিঠির সঙ্গে

চেকটা রেখে দিয়ে চলে এসেছিল। চেকটা পাবার পর কি নিখিলেশবাবু চমকে উঠেছিল! মনে কি আনন্দ হয়েছিল টাকাগুলো পেয়ে! অতগুলো টাকা অচমকা পেয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের আনন্দ হওয়াই তো উচিত। আর তা ছাড়া ওদের সংসারের অশান্তির মূল কারণটাই তো ছিল টাকা। আর শুধু ওদের কেন, পৃথিবীর সমস্ত সংসারের অশান্তির মূলেই তো ওই টাকা! টাকার অভাব ছিল বলেই তো ওরা নয়নতারার বিয়ের সময়কার গয়নাগুলো ফিরিয়ে নিতে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিল! হয়ত ওদের মত পৃথিবীর সমস্ত মানুষই টাকা চায়। আর নয়নতারার দোষ কী, কিম্বা নিখিলেশবাবুরই বা দোষ কোথায়! সেই কর্তাবাবুই কি টাকা চায়নি? যাদের বেশি আছে তারাও টাকা চায়, যাদের কিছুই নেই তারাও টাকা চায়।

হাজারি বেলিফ্ বললে—আবার এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

সদানন্দ বললে—সেই যে থিয়েটার রোডে!

হাজারি বেলিফ্ বললে—আপনার জন্যে তো আর পারা গেল না মশাই। এমন অদ্ভুত আসামী তো আমি দেখেনি! কোথায় চৌবেড়ে থেকে বেরিয়ে কাঁহা-কাঁহা ঘুরলুম বলুন তো!

সদানন্দ বললে—এইবারই শেষ হাজারিবাবু, এর পরে আপনাকে আর ঘোরাবো না। হাজারি বেলিফ্ তখন আর চলতে পারে না। বললে—আর কেন মিছিমিছি আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। আপনারই যত দোষ মশাই, আপনিই তো যত গণ্ডগোল বাধিয়েছেন—

—কেন?

হাজারি বললে—আপনি তো কারোর সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারলেন না। পৃথিবীর সবাই-ই তো বেশ তালে তাল মিলিয়ে চলেছে—তার সঙ্গে আপনিও তাল দিলে পারতেন। তাহলে আর এই আপনার নামে হুলিয়া বেরোত না।

কলকাতার রাস্তায় তখন ভিড়ের বন্যা বয়ে চলেছে। সদানন্দ ভিড়ের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে চলছিল। এতকাল পরে কলকাতায় ফিরে আসা। পনেরো বছর আগের ফেলে আসা সেই শহর। সদানন্দের চোখে শহরের এ চেহারা যেন নতুন মনে হলো। চিরকালের সেই উদার আকাশের তলায় এ শহরের মানুষগুলো যেন আরো রক্তহীন আরো বিবর্ণ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আকাশটাই বা এত ধূসর হলো কী করে? আগে তো এরকম ছিল না। চারিদিকে লজ্জাহীন দারিদ্র্য যেন হাঁ করে রয়েছে। কয়েকটা গোটা পরিবার রাস্তার যাত্রীদের করুণার ওপর আত্মসমর্পণ করে তাদের ঘর-সংসার পেতে বসেছে। এরা কারা? কোত্থেকে এখানে এল?

সদানন্দ বললে—আপনার কাছে একটা টাকা হবে হাজারিবাবু?

হাজারি বেলিফ চমকে লাফিয়ে উঠেছে। বললে—টাকা?

—হ্যাঁ, আমার কাছে আর টাকা নেই, ওদের কিছু দিতুম, দেখছেন না কীরকম অভাব ওদের!

হাজারি বেলিফ বললে—আপনি রাখুন মশাই, আপনার নামে কোর্টের হুলিয়া ঝুলছে আর আপনি ওদের দেবেন ভিক্ষে! আপনাকে কে ভিক্ষে দেয় তার ঠিক নেই! এই জন্যেই তো মশাই আপনার এত হেনস্থা!

সদানন্দ বললে—কিন্তু ওদের দেখে যে মায়া হচ্ছে বড়—

—মায়া? আপনার মায়া হচ্ছে? ওই দয়া-মায়াই তো পাপ। ওই পাপ করেই তো আপনি গেলেন!

সদানন্দ বললে—দয়া-মায়া পাপ? আপনি বলছেন কী? দয়া-মায়া ভালবাসা-স্নেহ মমতা পাপ, এ-কথা কে বললে?

হাজারি বেলিফ বললে—চলে আসুন, চলে আসুন, এখানে দাঁড়াবেন না, দাঁড়ালেই সবাই

পয়সা চাইবে। আজকাল সব মানুষ কেবল পয়সা-পয়সা করে ভিখিরি হয়ে গেছে—

সদানন্দ চারদিকে চেয়ে দেখলে। একশো জোড়া হাত তাদের ঘিরে ধরেছে। সকলের মুখে-চোখে কঙ্কালের ছাপ। হাজারি বেলিফ সদানন্দর হাত ধরে টানতে লাগলো। টেনে বাইরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু যেদিকেই যায় সেদিকেই ভিখিরিদের ভিড়।

হাজারি তাড়া দিতে লাগলো। বললে—চলে আসুন, শিগগির চলে আসুন—

সদানন্দ বললে—এরা কারা হাজারিবাবু? এর তো আগে এখানে ছিল না—আগে শুধু বড়বাজারেই থাকতো এরা। ভিক্ষের জন্যে সেখানে আমাকে সবাই 'রাজাবাবু' বলে ডাকতো—

হাজারি বেলিফ বললে—এরা সব মানুষ মশাই, মানুষ—

সদানন্দ বললে—আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন! এরা মানুষ তা কী আমি জানি না? কিন্তু দু'টো হাত আর দু'টো চোখ যাদের আছে তারাই কী মানুষ?

হাজারি বেলিফ বলে উঠলো—আরে মশাই, আজকাল এরাই কলকাতাময় ছড়িয়ে আছে। এদের জ্বালায় রাস্তায় হাঁটতে পারবেন না, যেখানে যাবেন সেখানেই এরা। এদের দিকে মোটে চোখ দেবেন না, একবার চোখ দিলেই এরা পেয়ে বসবে—আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন—

সদানন্দও চেয়ে দেখলে, সত্যিই তাই। পনেরো বছরে এ শহরের শেষ পর্যন্ত এই হাল হয়েছে! মানুষগুলোরও এই হাল! অথচ আগে তো এমন ছিল না। এরা সবাই রাস্তায় কিলবিল করছে কেন?

হাজারি বললে—বাড়িতে যে এদের থাকবার ঘর নেই, তাই রাস্তায় কিলবিল করছে!

—তা বাড়িতে এদের ঘর নেই-ই বা কেন?

—ঘর থাকবে কী ঘরে? বছর বছর মানুষের ছেলে হলে তো আর সেই অনুযায়ী ঘর বাড়ানো যায় না। ছেলে তৈরী করতে তো কারো পয়সা লাগে না, কিন্তু ঘর তৈরি করতে যে পয়সা লাগে মশাই। আপনি চলে আসুন, ও-সব ভাবতে গেলে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে—

সদানন্দ বললে—তাহলে ওদের কী হবে?

—থামুন মশাই, যত বাজে কথার জবাব দিতে পারি নে আমি। আপনি আসবেন তো আসুন, নইলে আমি এই চললুম—

কিন্তু হাজারি বেলিফ চলে যাবে বললেই কী চলে যেতে পারে! যেদিন সদানন্দ পৃথিবীতে জন্মেছে সেই দিনটি থেকেই যে সে তার সঙ্গে নিয়েছে। সেইদিন থেকেই সে বার-বার সদানন্দকে জানিয়ে এসেছে কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়। ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান দেবার যিনি বিধাতা তিনি তো সমস্ত মানুষেরই সৃষ্টিকর্তা। একদিন কর্তাবাবু যখন জন্মেছিলেন সেদিন তাঁর পেছনেও তিনি এই রকম হাজারি বেলিফদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধেও সমন পাঠিয়েছিলেন হাজারি বেলিফের হাত দিয়ে। কিন্তু হাজারি বেলিফের হাত দু' টাকা চার টাকা ঘুঁষ দিয়ে তিনি সে-সময় ঠেকিয়ে রেখে-ছিলেন। আর শুধু কর্তাবাবুই বা কেন? ছোট মশাই সুলতানপুরের মুখুজ্জে মশাই থেকে শুরু করে সবাই-ই তো ছিলেন আসামী। আসামী হলেও তাঁদের কাউকেই আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। হাজারি বেলিফকে ঘুঁষ দিয়ে দিয়ে তাঁরা বরাবর বিচারককে এড়িয়ে গেছেন। কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক আর কালীগঞ্জের বউরা তাঁদের বিষ-নিঃশ্বাসে নিঃশেষ হয়ে গেছে তবু কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার জন্যে কখনও জবাবদিহি করতে হয়নি। আর জবাবদিহি করতে হয়নি বলেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কপিল পায়রাপোড়া,

মানিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিক আর কালীগঞ্জের বউরা আজ আবার এখানে এসে জন্ম নিয়েছে। আর পনেরো বছর পরে তাদের বংশধররা আজ এই কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় কিল্‌বিল্‌ করে ঘুরছে বেড়াচ্ছে। আজকের কর্তাবাবু, আর আজকের ছোট মশাইদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এমন সদানন্দ আবার কবে জন্মগ্রহণ করবে!

হঠাৎ যেন সমস্ত কলকাতাময় একটা শোরগোল পড়ে গেল। এসেছে, এসেছে! তোমার সব সাবধান, তোমরা সব হুঁশিয়ার! আসামী এসে পড়েছে! পনেরো বছর আগে যে একদিন আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে আবার এসেছে। তোমরা সব পাপ ঢাকা দিয়ে রাখো, সব ঘা লুকিয়ে ফেলো। সে দেখতে পেলে আবার অনর্থ বাধাবে। বার তার ফুলশয্যার রাত্রে শোবার ঘর থেকে পালিয়ে যাবে, আবার নয়নতারাদের ওপর চরম প্রতিশোধ নেবে, আবার কাচের দোয়াতদানিটা নিয়ে নিজের কপালের ওপর ঠাঁই-ঠাঁই করে আঘাত করবে, আবার রক্তে মুখ ভেসে যাবে, আবার নয়নতারা সে রক্ত দেখে অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

আজকের কর্তাবাবুরা আবার চিৎকার করে উঠলো—দীনু—দীনু—

দীনু সামনে আসতেই কর্তাবাবু বলে উঠলেন—বংশী ঢালী কোথায়? বংশী ঢালীকে একবার ডাকো তো দীনু—

বংশী এসেই হুজুরকে পেন্নাম করলে। বললে—বলুন কর্তাবাবু কী কাজ, নিজের জান দিয়ে আমি আপনার কাজ করে দেব—

কর্তাবাবু বললেন—খুব সাবধানে করতে হবে কিন্তু বংশী, কেউ যেন জানতে না পারে—

বংশী বললে—অগে কি কখনও অসাবধান হয়েছি যে আপনি ও-কথা বলছেন?

কর্তাবাবু বললেন—ওরে, তা বলছি নে, আবার একটা ঝামেলা হয়েছে, সেই ঝামেলাটা তোকে কাটাতে হবে—

বংশী বললে—বলুন না, কাকে খতম করবো?

কর্তাবাবু বললেন—এই এখুনি খবর পেলুম। সেবার জানিস তো খোকার বিয়ের পরদিন কালীগঞ্জের বউ এসেছিল?

বংশী বললে—খুব মনে আছে হুজুর, আমি তাকে খতম করে দিয়েছিলুম, কেউ কি সে খবর টের পেয়েছিল?

—না, তা পয়িনি। সেই জন্যেই তো তোকে এবার আবার ডেকেছি।

—তা বলুন না হুজুর, এবার কাকে খতম করতে হবে? আবার কে এসেছে?

বড় বিশ্বাসী কর্মচারী এই বংশী ঢালীরা। সেই কর্তাবাবুর অনেক আগেকার আমলেও এরা ছিল, এই এতদিন পরেও এরা আছে। জমিদারি উঠে গেল, ইজিপ্ট, আফ্রিকা, এশিয়ার সব দেশ থেকে কর্তাবাবুরা সবাই চলে গেল, সব দেশ আবার স্বাধীন হয়ে গেল, গণতন্ত্র চালু হয়ে গেল, কিন্তু রয়ে গেল সেই আয়-আদায় আর সঙ্গে রয়ে গেল কর্তাবাবুদের সেই দাপট। আর তার সঙ্গে রয়ে গেল এই বংশী ঢালীরা। সত্যিই বড় বিশ্বাসী কর্মচারী এই বংশী ঢালীরা। সুখশান্তির দিনে তারা খেতে পাচ্ছে কি উপোস করে মরছে তা দেখবার দায় ছিল না কর্তাবাবুদের, এখনও তাঁদের সে দায় নেই। কিন্তু বিপদের দিনে এখনও তারাই ভরসা। তারাই বরাবর বুক দিয়ে বাঁচায় কর্তাবাবুদের। এবারও তাই বংশী ঢালীদের ডাক পড়েছে দরবারে।

—বলুন হুজুর, এবার কাকে খতম করতে হবে? কে এসেছে?

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই টেবিলের টেলিফোনের বাজনাটা বেজে উঠলো।

কর্তাবাবু রিসিভারটা তুলেই বললেন—কে?

—চীফ-মিনিস্টার বলছেন?

কর্তাবাবু বললেন—হ্যাঁ, কী হলো? মিসেস ব্যানার্জি নাকি?

ওধার থেকে মিসেস ব্যানার্জির মিহিগলার কৃতজ্ঞ সম্মতির হাসি ভেসে এল।

—আজকে আমার এখানে আপনার আসবার কথা, আমি একবার রিমাইণ্ড করে দিচ্ছি, প্রথমের জন্মদিন, মনে আছে তো মিস্টার সেন?

কর্তাবাবু বললেন—শিওর, প্রথমের জন্মদিন, আমার মনেই ছিল না একেবারে। মনে করিয়ে দিলে ভালো করেছেন। সত্যি কী চমৎকার নাম রেখেছেন! প্রথম!

মিসেস ব্যানার্জি বললে—প্রথম নামটা সত্যিই পছন্দ হয়েছে আপনার?

—সত্যিই বড় বিউটিফুল নাম। এমন অরিজিন্যাল নাম কে দিলে মিসেস ব্যানার্জি?

মিসেস ব্যানার্জি বললে—ও—

—মিস্টার ব্যানার্জ? তাই নাকি? নাঃ ওঁর তো দেখছি ইমাজিনেশান আছে খুব!

—তা আপনার আর সময় নষ্ট করবো না মিস্টার সেন। মিসেস সেনকে নিয়ে আসবেন কিন্তু। সকলকেই আজকে আসতে বলেছি, মিস্টার নবিকভ্‌ও আসছেন—

—আর মিস্টার হেন্‌ডারসন?

—হ্যাঁ, মিস্টার হেন্‌ডারসনকেও বলেছি। সেদিক থেকে আমি কোনও ভুল করতে পারি?

—ও-কে।

শুধু চিফ-মিনিস্টার নয়, সকলেই এক-এক করে টেলিফোন পেতে লাগলেন। কর্তাবাবুকে বাদ দিলে যেমন চলে না, তেমনি প্রাণকৃষ্ণ সা'কেও বাদ দিতে পারা যায় না। তারিণী চক্রবর্তী, বেহারি পাল তারাও নবাবগঞ্জের গন্যমান্য লোক। নবাবগঞ্জের প্রজার বাড়িতে বিয়ে-অন্নপ্রাশন হলে গ্রামের যাঁরা মাথা তাঁদের ডাকতেই হবে। নইলে খোসামোদের সিঁড়ি বেয়ে ইজ্জতের শিখরে ওঠা যায় না। আর ইজ্জতের শিখরে ওঠার প্রধান ধাপই হচ্ছে পার্টি দেওয়া। ইজ্জতই যদি না পেলাম তো শুধু ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? আর শুধু তো বাড়ি-গাড়ি বাবুর্চি-খানসামা নিয়ে পেট ভরে না! পদ্মশ্রীটা আজকাল বড় মামুলী হয়ে গেছে। পদ্মবিভূষণ না হোক, পদ্মভূষণটা অন্ততঃ পেতে হবে। তার পরে প্রথম না-হয় এখন ছোট আছে। এই সবে বারো বছরে পড়লো। কিন্তু চিরকাল তো আর ছেলেমানুষ থাকবে না সে। একদিন প্রথম আরো বড় হবে। কলকাতায় থাকলে তো সে মানুষ হবে না। আরো পাঁচজন বখাটে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে একই স্কুলে লেখাপড়া করলে সেও তাদের মত বখাটে হয়ে যাবে। এখন থেকেই তার ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত। হয় রাশিয়া না-হয় আমেরিকাতে তাকে পাঠাতে হবে। সুতরাং এমব্যাসিগুলোকে হাতে রাখা দরকার।

মিস্টার নবিকভ্‌ টেলিফোন-রিসিভারটা তুলে নিলেন—হ্যালো—

ওধার থেকে মিহি হাসির মত মিষ্টি গলায় আওয়াজ এল—আমি মিসেস ব্যানার্জি স্পিকিং—গুড মর্নিং মিস্টার নবিকভ্‌, আজকে সন্ধ্যার কথা মনে আছে তো! আমার প্রথমের জন্মদিন, বার্থ-ডে, আমি একবার রিমাইণ্ড করে দিচ্ছি—

—ও শিওর শিওর। প্রথমের বার্থ-ডে!

মিসেস ব্যানার্জি বললে—আসা চাই কিন্তু, মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, ভুলবেন না—

—প্রথম মানে কী মিসেস ব্যানার্জি? আপনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি!

মিসেস ব্যানার্জি বললে—প্রথম মানে ফার্স্ট—

—ভেরি গুড নেম! বলে ডিপ্লোম্যাটিক হাসি হাসতে লাগলেন মিস্টার নবিকভ্‌।

এর পরে মিস্টার হেনডারসন। মিস্টার হেন্‌ডারসন ক্যালকাটায় পোস্টিং হবার আগে আমেরিকার এ্যামবাসাডার হয়ে ওয়েস্ট-এশিয়ায় ছিলেন। বলতে গেলে থার্ড-ওয়ার্লড সম্বন্ধে তিনি স্পেশ্যালিস্ট। প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র। ক্যালকাটায় পোস্টিং হবার আগে ভালো করে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। তিনি সেখানে জেনেই এসেছেন বাঙ্গালীরা ভারি শ্রুড অথচ ইমোশানাল। একবার যদি তুমি ওদের ককটেল পার্টিতে ডাকো তো ওরা বর্তে যাবে। ফ্ল্যাটারির রাজা ওরা। কিন্তু বাইরে সবাই ওরা এমন সেজে থাকে যেন কত ইনটেলেকচুয়্যাল। আসলে সবাই ফুলিশ্‌। একবার যদি ওদের আমেরিকা টুর করাবার লোভ দেখাও তো যেন হাতে চাঁদ পাবে। ওরা তোমাকে মাথায় নিয়ে নাচবে।

হেন্‌ডারসন জিজ্ঞেস করেছিল—ওরা যদি পার্টিতে মেনন্তন্ন করে তো যাবো?

—শিওর, সাদা চামড়া, বিশেষ করে আমেরিকানদের ওপর ওদের একটা উইকনেস আছে!

মিস্টার হেন্‌ডারসন বলেছিল—কিন্তু আমি শুনেছিলুম, ওরা নাকি একটু রাশিয়া ঘেঁষা?

—রাবিশ! বরং বলতে পারো টাকা-ঘেঁষা। আসলে সব বাঙালীই এক-একজন পোয়েট, পোয়েটেরা কি পলিটিক্স বোঝে? বোঝে? বোঝে শুধু হুজুগ। নিজের কেরিয়ারের জন্যে ওরা সব কিছু করতে পারে—ওই বাঙালীরা—

আসবার আগে ওয়াশিংটন থেকে হেন্‌ডারসনকে সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে ক্যালকাটায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর শুধু ওয়াশিংটন কেন, মস্কো থেকেও মিস্টার নবিকভকে সব কিছু পাখীপড়া করে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এখানে আসবার পর থেকে দু'জনেই বাঙালী-সমাজে মিশতে আরম্ভ করেছিল। সেই সূত্রেই মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ।

আসলে একটুখানি শুধু হচ্ছে। ইচ্ছে আর টাকা ওই দুটো মূলধন থাকলে, তুমি ইচ্ছের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ইজ্জতের শিখরে গিয়ে উঠতে পারবে।

এর পরে পুলিস কমিশনার।

—হ্যাল্লো!

—মিস্টার সামন্ত আমি মিসেস ব্যানার্জি বলছি। আজকে আসছেন তো?

—মিস্টার সামন্ত বললেন—নিশ্চয়ই। প্রথমের বার্থ-অ্যানিভার্সারি, আর আমি যাবো না? বলছেন কী আপনি?

—তাহলে একটা অনুরোধ করবো মিস্টার সামন্ত। আমার লোক্যাল থানার ওসি'কে যদি একবার বলে দেন, বাড়ির সামনে কয়েকজন কনস্টেবল-এর বন্দোবস্ত করতে।

—ও-কে, আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।

এমনি করে সমস্ত নবাবগঞ্জের তাবৎ ভি-আই-পি'দের ডাকা হয়েছিল। আবার সেদিন সকলকে মনে করিয়েও দেওয়া হলো। কর্তাবাবুর বাড়ির কাজে সবাইকে আসতেই হবে। তাতে যারা আসবে তাদেরও ইজ্জৎ বাড়বে, আর যার বাড়িতে আসবে তাদেরও ইজ্জৎ বাড়বে।

কিন্তু কালীগঞ্জের বউ কেন বিনা নিমন্ত্রণে আসতে গেল?

কর্তাবাবু কৈলাস গোমস্তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কৈলাস, তুমি কি কালীগঞ্জের বউকে নেমন্তন্ন করেছিল নাকি?

কৈলাস বললে—আজ্ঞে না—

—তা নেমন্তন্ন না করলে সে এখন এ-বাড়িতে আসে কেন? কোন্‌ সাহসে আসে?

কৈলাস বললে—আজ্ঞে নতুন বউ-এর মুখ দেখতে এসেছে—

—তা নতুন-বউএর মুখ দেখতে কি আজকেই আসতে হয়? যা হোক, যখন এসে গেছে

তখন আর তাড়িয়ে দেবার দরকার নেই? কিন্তু বেশিক্ষণ যেন না থাকে—

কৈলাস গোমস্তা চলে যাবার পরেও যেন কর্তাবাবু শান্ত থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো সেরেস্তার পাশের যে চোর-কুঠুরিটা আছে সেখান থেকে যেন একটা অস্ফুট শব্দ হলো। বংশী ঢালী এতটুকু ভুল করে ফেলে তাহলে সব কিছু যেন আজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সব যেন পণ্ড হয়ে যাবে। অথচ আজকের উৎসবে এত লোক এসেছে, এরা যদি কেউ দেখে ফেলে! চিফ মিনিস্টার মিস্টার সেন এসেছে, আমেরিকার অ্যামব্যাসাডার মিস্টার হেন্‌ডারসন এসেছে, এসেছে রাশিয়ার অ্যামব্যাসাডার মিস্টার নবিকভ্‌, এসেছে কলকাতার পুলিস কমিশনার মিস্টার সামন্ত। আসতে কারো বাকি নেই। বাইরের রাস্তায় গাড়ির লাইন পড়ে গেছে। মিস্টার ব্যানার্জির ছেলের আজ বার্থ-ডে। মিসেস ব্যানার্জির প্রথম সন্তান। আজকে সে বারো বছরে পড়লো। প্রথমই আজকে সকলের লক্ষ্য। সকলের উপহারগুলো বিরাট একটা টেবিলের ওপর জড়ো হয়েছে। সবগুলো উপহার সেখানে ধরছে না। অনেকগুলো উপচেও পড়ছে। কিন্তু তবু উপহারের যেন শেষ নেই।

হঠাৎ কে যেন একজন কাছে এল। মিস্টার ব্যানার্জী তখন কাজে ব্যস্ত। কাজ এমন কিছু নয়। কাজ করবার তাঁর লোকের অভাবও নেই। হোটেলকে কনট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছে। খাওয়ার বন্দাবস্ত সব কিছু করছে ওরাই। তারা কেটারিং এক্সপার্ট।

—ব্যানার্জি সাহেব কোথায়?

আর দোতলার একটা হল-এর ভেতর কক্‌টেল-এর ব্যবস্থা। সেখানে ট্রে কোলে করা বয় আর ওয়েটারদের আনাগোনা। অনেকের সঙ্গে আছে সিগারেট-ঢালা একটা ট্রে। তারা সামনে দিয়ে গেলে ইচ্ছে করলে তুমি একটা সিগারেট তুলে নিতে পারো। মিস্টার সেন-এর অনেক কাজ। সোজা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে চলে এসেছেন। তাঁকে ঘিরেই যত মানুষের ভিড়। সকলের হাতেই গেলাস। একটা গেলাস খালি-না হতেই আবার একটা ভর্তি গেলাস নিয়ে দাঁড়ায় বেয়ারা। কালো গেলাস তারা খালি রাখতে দেবে না।

লোকটা তখন নিচেয় সব জায়গায় ঘুরছে। জিজ্ঞেস করছে—ব্যানার্জি সাহেব কোথায় রে?

একজন বেয়ারা হন-হন করে কোথায় যাচ্ছিল। সে বললে—ব্যানার্জি সাহেব কোথায় তা আমি কি জানি? ওপরে গিয়ে দ্যাখ না—

বাজে কথা বলবার কি কারো আজ সময় আছে! আজ যারা এ-বাড়িতে এসেছে তাদের তদ্বির-তদারক করতে এতটুকু ত্রুটি হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে! গেটের বাইরে পাহারার ব্যাবস্থা আছে! আজকের অতিথি-অভ্যাগতরা সবাই ভি-আই-পি। তারা আগেও অনেকবার এ-বড়িতে এসেছে, আবার আজকেও এসেছে।

কর্তাবাবু ছেলেকে ডেকে পাঠালেন।

চৌধুরী মশাই আসতেই কর্তাবাবু বললেন—খোকা কোথায়?

চৌধুরী মশাই বললেন—নিচেই আছে সে—

কর্তাবাবু বললেন—খোকাকে একটু নজরে রাখবে, যেন আবার পালাতে না পারে। গায়ে-হলুদের দিন যেমন পালিয়েছিল তেমনি যেন না করে—একটু দেখো—

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ নজর রাখা হচ্ছে, প্রকাশ পেছনে-পেছনে রয়েছে—

—খোকাকে খাইয়ে দাইয়ে একেবারে বউমার ঘরে ঢুকেয়ে দেবে। যখন দেখবে যে খোকা ভেতর থেকে খিল দিয়েছে, তখন আমাকে এসে বলে যাবে—

আজ এখানেও সেই রকম। কর্তাবাবু সকাল থেকেই হুকুম দিয়েছেন। নজর রাখো ভালো

করে। চিফ মিনিস্টার আসবে, ফরেন অ্যামবাসাডাররা আসবে, পুলিস কমিশনার আসবে। তাদের যেন কোনও অযত্ন না হয়, তাদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। মিস্টার ব্যানার্জি সকাল থেকেই ব্যস্ত। শুধু টাকা খরচ করলেই তো কাজ হয় না, চারিদিকে নজর রাখা চাই। যেন কোনও ভাবে বাজে লোক ঢুকে না পড়ে।

দোতলার হলঘরের ভেতর মিস্টার সেন বলেন—না, না, আর দেবেন না, আর দেবেন না আমাকে—

মিসেস সেন বললে—আমিও আর বেশি নেব না মিসেস ব্যানার্জি—

—না না, একটু স্ন্যাকস নিন—

বলে মিসেস ব্যানার্জি দু'জনকেই আর একটা পেগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু চিফ মিনিস্টার হাতটা পিছিয়ে নিলেন। বললেন—না না, আমাকে আবার এখনি একবার রাইটার্স বিল্ডিং -এ ফিরে যেতে হবে—

মিসেস ব্যানার্জি বললে—কেন, এখন আবার রাইটার্সে যাবেন কেন?

মিস্টার সেন বললেন—আর বলেন কেন, এই এখানে আসবার একটু আগেই ফোন এল নদীয়া ডিসট্রিক্টে খুব গণ্ডগোল চলেছে—

—নদীয়া? নদীয়ার কোন্ জায়গায়? কী গণ্ডগোল?

—সেখানে স্কুল-কলেজের ছেলেরা বিল্ডিং-এ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাসপাতাল ছিল একটা সেখানে, শুনেছি তাতেও নাকি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—

—কেন, কী হয়েছিল?

মিস্টার সেন বললেন—ওই যা সব জায়গায় হচ্ছে, আজকাল কেউ তো কারো ডিউটি করছে না। এক ভদ্রলোক লাখ-লাখ টাকা খরচ করে পনেরো বছর আগে সেখানে স্কুল কলেজ আর হাসপাতাল করে দিয়েছিল, সেই সব পুড়িয়ে দিচ্ছে, গ্রামের লোক সব পালিয়ে আসছে—সি-আর-পি পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন গিয়ে আর একবার খবর নেব টেলিফোনে—

—জায়গাটা কোথায়? নাম কী জায়গাটার?

—নবাবগঞ্জ!

আর এদিকে সমস্ত নবাবগঞ্জটাকেই কেউ যেন আরো বড় আকারে এই কলকাতায় এনে বসিয়ে দিয়েছে! এখানেও বাইরে সেই পরমেশ মৌলিকের মত কাছারি-বাড়িতে হিসেবের খাতা নিয়ে বসে থাকে মানদা মাসি। সকালবেলা মানদা মাসির কোনও কাজ থাকে না। এই পার্ক স্ট্রীটের পাড়ায় এই বাড়িটা আরো বড় দশটা বাড়ির মতই আরো একটা। অন্য বাড়িগুলোর সঙ্গে এ বাড়ির চেহারায় কোনও পার্থক্য নেই। এ-পাড়ার সব বাড়িগুলোই বড়। মানদা মাসির বয়স আরো পনেরো বছর বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পনেরো বছরের অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। এই বয়েসে মাসি সত্যিই অনেক দেখলো। কালীঘাটের মন্দিরের রাস্তায় যে ভিখিরি মেয়েটা একদিন তীর্থযাত্রীদের পেছনে পেছনে ভিক্ষে করে বেড়িয়েছে, তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একদিন আবার গায়ে গয়নাও উঠেছিল যে-মেয়েটার, সেই মেয়েটাই আবার একদিন কালীঘাটের গলিতে একটা ছোট খোলার ঘরে আরম্ভ করে দিয়েছিল এই ব্যবসা।

কিন্তু মানুষের উচ্চাভিলাষ থাকলে যে একদিন মানুষ কোথায় উঠতে পারে এই পার্ক স্ট্রীটের বাড়িটাই তার প্রমাণ। এইজন্যে মানদা মাসি কত লোককে কত খোশামোদ করেছে।

একটা একটা করে মানদা মাসি পয়সা জমিয়েছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ভবিষ্যতের অভাবের কথা ভেবে নয়, আসলে ভবিষ্যতের প্রাচুর্যের কথা ভেবেই। সেই খোলার বস্তির ঘরের ভেতরে শুয়ে শুয়ে মানদা-মাসি স্বপ্ন দেখতো কবে সেই খোলার বাড়িটা এতদিন পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত হবে। মেয়েরা সেজেগুজে সোফার-ওপর বসে থাকবে। আর বড় গাড়ি এসে দাঁড়াবে সামনে। সেই গাড়ি থেকে বড় বড় লোকের ছেলেরা নামবে আর তাদের গা থেকে ভুর ভুর করে বিলিতি আতরের গন্ধ বেরোবে।

আর সেই জন্যেই মানদা মাসি কত খোশামোদ করেছে বাতাসীকে। বাতাসীর পা পর্যন্ত টিপে দিতে কসুর করেনি মানদা মাসি। ভেবেছিল বাতাসী অন্তত বড়বাবুকে বলে একটা টাকা পাওয়ার সুরাহা করে দেবে। হাজার হোক পুলিসের বড়বাবু তো!

কিন্তু কপাল! আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। সেই-বাতাসীর শেষকালে কী না হলো? ওরই নাম হলো কপাল। সেই বড়বাবু শেষকালে চাকরিতে আরো বড় হলো। বড়বাবুর বাপ মরে গেল। কত চাকর বাকর। সেই বাতাসীরই আবার কত খোয়াব শেষকালে। এক গেলাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খেতে হতো না তাকে। বড়বাবুর যখন আরো পয়সা হলো তখন মটরগাড়ি করে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেত। এমন কী একটা সতীন ছিল সেও একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরলো।

ওরই নাম হলো কপাল। কোথায় ছিল কোন্ বস্তিতে, আর কার হাতে পড়ে একে-বারে রাতারাতি রাজরাণী হয়ে গেল।

আর মানদা মাসি!

মানদা মাসি তখনও যে-কে সেই। তার তখনও সেই আগেকার দুর্দশা। তখনও সেই খোলার ঘরে বস্তিতে দিশী মেয়ে আর দিশী মাল নিয়ে কারবার করে তাকে পেট চালাতে হয়।

ঠিক সেই সময়ে একদিন একটা অফিসের কেরানী এক বন্ধুকে নিয়ে এসে হাজির হলো। তার নামটাও আজ আর তেমন মনে নেই। শীতেশ না কী যেন নাম ছিল তার।

শীতেশ বললে—আমার এক বন্ধুকে এনেছি মাসি—

—বন্ধু? বন্ধুকে এনেছ তো ভালোই করেছ, তা কার ঘরে বসবে তোমরা?

শীতেশ বললে—বসতে আসিনি মাসি আজকে। আমার এই বন্ধু ব্যবসা করতে চায়, তা আমি বলেছি তোমার ব্যবসা-বুদ্ধি খুব আছে, তোমার এ ব্যবসায় লাভ-লোকসান কী সেই সব শুনতে চায়। একে একটু বুঝিয়ে বল তো তুমি—

মাসি জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কী বাবা?

ছেলেটা লাজুক খুব। বললে—আমার নাম নিখিলেশ, নিখিলেশ ব্যানার্জী।

বেশ নামটা। নামটা মনে ছিল মাসির। কিন্তু খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলে টাকা তার তেমন নেই। ধার-ধোর করে বড়জোর হাজার পাঁচেক টাকা তুলতে পারে। অর্থাৎ বাজিয়ে দেখতে চাইছিল কোন্ কারবারে কত লাভ। মেয়েদের বোর্ডিং-হাউস করলেই বা কত লাভ, আর এই ব্যবসাতেই বা কত। হিসেবপত্র করে মাসি সেদিন প্রমাণ করিয়ে দিয়েছিল যে তেমন করে সাহেব পাড়ায় এই ব্যবসা করলে টাকায় দশগুণ লাভ। মানে এক টাকায় দশ টাকা।

কথাটা শুনে ছেলেরা চলে গিয়েছিল। মাসি ভেবেছিল আর আসবে না তারা, আর এ-পথ মাড়াবে না।

কিন্তু আশ্চর্য! সত্যিই, আশ্চর্য না আশ্চর্য!

তার তিন মাস পরেই একদিন সেই খোলার বস্তির সামনে সদর রাস্তায় একটা মস্ত

গাড়ি এসে হাজির। বলতে গেলে গাড়ি করে সে-পাড়ায় কোনও লোক আসতো না। কালীঘাটের খদ্দেররা সবাই-ই ছোটলোক।

কিন্তু তখন মাসি কল্পনা করতেও পরেনি। গাড়ির ড্রাইভার এসে খবর নিলে, মানদা মাসি নামে ইঁহা কোই হ্যায়?

মানদা মাসি বললে—হ্যাঁ বাছা, আমারই নাম মানদা।

ড্রাইভার বললে—সাহেব আপনাকে একবার ডাকছে—

—সায়েব ? কে সায়েব? কোথায় তোমার সায়েব?

—গাড়িমে। বলে বড় রাস্তায় গাড়িটা দেখিয়ে দিলে ড্রাইভার।

মানদা মাসি তখনও বুঝতে পারেনি। তার কাছে আবার গাড়িতে কে আসতে যাবে! তখন বেশ অন্ধকার চারিদিকে। গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তার ওপর গাড়িটার কাছে গিয়েও চিনতে পারেনি।

—আমায় চিনতে পারছো মাসি?

মানদা মাসি বার-বার করে চেহারাটা দেখেও চিনতে পারলে না।

—চিনতে পারলে না? শীতেশকে মনে আছে? সেই রোগা লম্বা মতন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা সে কোথায় বাবা?

—সে মরে গেছে। একদিন হার্ট-ফেল করে মরে গেছে। তা আমি অনেক দিন আগে তার সঙ্গে তোমার এখানে এসেছিলুম। আমার নাম নিখিলেশ। নিখিলেশ ব্যানার্জি। এখন মনে পড়েছে তো?

অনেক কষ্টে মনে পড়লো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সেই যারা একদিন অফিসে কেরানী-গিরি করতো, তাদের এ-রকম গাড়ি হলো কী করে সেটা বুঝতে পারলে না।

—তুমি আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবে মাসি?

মানদা মাসি বললে—কোথায়?

—যেখানে হোক, এখানে বসে কথা হবে না, একটা নিরিবিলি কোনও জায়গায় বসে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই। যে-ব্যবসার কথা বলেছিলুম সেই ব্যবসা সম্বন্ধেই পরামর্শ করতে চাই—আমার সঙ্গে একবার চলো না এখন।

তা, সেই হলো সূত্রপাত। যে-মানুষটার কাছে একদিন পাঁচ হাজার টাকাও ছিল না, সেই মানুষটাই একদিন এক কথায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করে দিলে। আর তারপরেই পার্ক স্ট্রীটের পাড়ায় একদিন গড়ে উঠলো এই 'গ্রীন-পার্ক'। গ্রীন-পার্কে দিনের বেলা কিছু ব্যতিক্রম বোঝবার উপায় নেই। আশে-পাশের আরো দশটা অফিস-বাড়ির মত এর চেহারা। কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকেই এ-বাড়ি যেন নেশা করে। নেশায় একেবারে টলতে থাকে। তখন নানা রং-বেরংএর গাড়ি এসে সামনের রাস্তায় দাঁড়ায়। তখন বড় বড় গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা লিফট দিয়ে ওপরে উঠে আসে। দরজার মুখে দরোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের প্রথমে হাজির হতে হয় ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার যেমন যেমন হুকুম দেয় তেমনি হুকুম তামিল হয়। কেউ চায় কালো, কেউ চায় ফর্সা, কেউ চায় নেপালী, কেউ চায় কাশ্মীরী, আবার কেউ চায় মেমসাহেব। ইংলিশ জার্মান ফ্রেঞ্চ মেমসাহেব। সব জাতের মেয়েমানুষের ব্যবস্থা আছে 'গ্রীন-পার্কে'।

কিন্তু সকলের আড়ালে থাকে মানদা মাসি। মানদা মাসিই বলতে গেলে এই 'গ্রীন-পার্কে'র চাবিকাটি। আসলে বস্তির ব্যবস্থা আর এই পার্ক স্ট্রীটের ব্যবসায় কোনও তফাৎ নেই। সেই কালীঘাটের মেয়েদেরই সাজ-পোশাক পরিয়ে পরিয়ে কড়া ইলেকট্রিক আলোর তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেই তাদের আবার তখন অন্য রকম চেহারা হয়ে যায়। আগে যাদের

রেট ছিল এক টাকা, তারাই এখানে এসে ঘণ্টায় একশো টাকা দর হাঁকে। তারাই কেউ চীনে মেয়ে সাজে, কেউ কাশ্মিরী, কেউ বা মেমসাহেব।

এ ছাড়া যদি অন্য কিছু চাও তাও পাবে। বেঁটে লম্বা রোগা পাতলা, এক-একজন ভদ্রলোকের ছেলের এক-এক রকম পছন্দ। কাঠের পার্টিশান দেওয়া সব ঘর। আব্রুর ব্যবস্থা ভালো। কারো সঙ্গে কারো দেখা হবার ভয় নেই। ফেল কড়ি মাখো তেল। বাঁধা মেয়াদ সকলের। তারপর তোমার মেয়াদ ফুরোলেই তোমার ঘর খালি করে দিতে হবে।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্যাশ টাকা নিয়ে এসে ম্যানেজার জমা করে মানদা মাসির কাছে। এক-একদিন জমে তিন হাজার, এক-একদিন চার হাজার। পাঁচ হাজারে গিয়েও এক-একদিন ঠেকে। পালে-পার্বণে বাড়ে। যেমন দুর্গা-পূজো। দুর্গা-পূজো আর বড়দিনেই 'গ্রীন-পার্কে'র মরসুম। তখন আবার কলকাতার বাইরে থেকেও লোক আসে। সোজা দিল্লী বোম্বাই থেকে লোক আকাশ দিয়ে উড়ে এসে নামে কলকাতায়। তখন মানদা মাসির আর নাইবার খাবার সময় থাকে না। অত টাকার হিসেব কি সোজা কথা!

কিন্তু টাকা বড় নচ্ছার জিনিস। বিশেষ করে ক্যাশ টাকা। ক্যাশ টাকার হিসেব যদি যখনকার তখন নগদ-নগদ না করা যায় তো সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই সাহেবকে বলা আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যেয় মানদা মাসি নিজের গাড়ি করে নিজের হাতে একেবারে ব্যানার্জি সাহেবের কাছে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে।

ব্যানার্জি সাহেব অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে ওই টাকার জন্যে। হিসেবের খাতাটাও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। কারবারের আধা-আধি বখরার পাই-পয়সাটাও পর্যন্ত সব বুঝিয়ে দিতে হয় সাহেবকে। এমন কি মদের বিল পর্যন্ত।

সেদিন হঠাৎ টেলিফোন এল—কোথায়? মাসি কোথায়?

গলা শুনেই ম্যানেজার বুঝতে পারে। সোজা লাইনটা একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

মাসি লাইনটা পেয়ে বলে—হ্যালো—

ওদিক থেকে সাহেবের গলার শব্দ আসে—কিছু টাকা দরকার ছিল, এই হাজার পাঁচেকের মত।

—এক্ষুনি?

সাহেব বলে—হ্যাঁ, এখানে পার্টি বসে আছে—এখন কত কালেকশান হয়েছে?

—তিন হাজারের মত হয়েছে।

—ঠিক আছে, এখন তিন হাজারের মত হলেই চলবে। আমি বসে আছি—

সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার নিজে ব্যানার্জি সাহেবের বাড়িতে গিয়ে টাকা দিয়ে আসে। ব্যানার্জি সাহেবের সামনে তখন কে একজন বসে ছিল। ভারি সম্ভ্রান্ত চেহারা। ম্যানেজার চলে যেতেই টাকাটা নিয়ে সোজা ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলেন মিস্টার ব্যানার্জি।

ভদ্রলোক টাকাটা পকেটে পুরতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি ছাড়লেন না। বললেন—না মিস্টার সামন্ত, টাকাটা গুনে নিন, প্লিজ—

মিস্টার সামন্ত বললেন—সে কী, আপনি যখন দিচ্ছেন তখন...

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন—তা হোক, আপনি আমার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু বিজনেস ইজ বিজনেস—

অগত্যা মিস্টার সামন্ত টাকাগুলো এক-একটা করে গুনে নিয়ে উঠলেন। বললেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে—ও কে—একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা পোর্টিকো। তাঁর গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এল। দারোয়ান গেট খুলে দিতেই গাড়িটা

ধোঁয়া ছেড়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

নয়নতারা তখনও জেগে ছিল। নিখিলেশ ঘরে ঢুকতেই বললে—কী হলো, চলে গেছে!

নিখিলেশ বললে—হ্যাঁ আপদ গেছে, তিন হাজারের কম ছাড়লে না। বললে খুব টানাটানি চলছে। আর আমিও ভাবলুম পুলিসকে চটিয়ে লাভ নেই—

নয়নতারা বললে—যাক গে শুয়ে পড়ো, কালকে আবার পার্টি আছে—

ঘরের আলো নিভে গেল। সমস্ত নবাবগঞ্জ ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও কর্তাবাবুর চোখে ঘুম নেই। হর্ষনাথ চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। বংশী ঢালী তার কাজ নিঃশব্দে সমাধা করেছে। আর কোনও ভাবনা নেই। কাল প্রথমেই পার্টিতে চিফ মিনিস্টার মিস্টার সেনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, ইউ-এস-এর মিস্টার হেন্ডারসনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, মসকোর মিস্টার নাভিককেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে, সকলেই মিসেসদের নিয়ে আসবে। নবাবগঞ্জের কাউকেই আর মেনন্তন্ন করতে বাকি নেই। যত ভি-আই-পি আছে সবাইকেই। এমন কি একটু আগেই যে লোকটা তিন হাজার টাকা নিয়ে চলে গেল সেই মিস্টার সামন্তও মিসেস সামন্তকে নিয়ে আসবে!

হঠাৎ চৌধুরী মশাই এল।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কে?

চৌধুরী মশাই বললেই—আমি—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর? খোকা পালায়নি তো?

—না, খাওয়া-দাওয়ার পর বউমার ঘরে শুতে ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা চলে এসেছি—

কর্তাবাবু তাতেও নিশ্চিন্ত হলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়েছে কিনা তাই বলো না, খিল দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন কর্তাবাবু। আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। একদিন নিখিলেশ মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিল। পুলিসের লাঠি খেয়েছিল। অনেক দিন ধরে অনেক দুঃখ ছিল তার। দেশ স্বাধীন হবার পর সকলের সব কিছু হলো, শুধু তারই কিছু হলো না। এবার সে-দুঃখ গেল। এবার আর কোনও দুঃখ নেই। এবার কর্তাবাবুর নাতি তার ফুলশয্যার রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়েছে। এবার নতুন বউমার রূপ দেখে সে ভুলে যাবে। এবার নরনারায়ণ চৌধুরী তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশপরম্পরায় অমর হয়ে থাকবেন, অনন্তকাল ধরে নিজের রক্তের ধারার মধ্যে অখণ্ড পরমায়ু লাভ করবেন। তিনি অক্ষয়, অব্যয় অজর-অমর হয়ে বিরাজ করবেন।

কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে তাঁর বংশধর তার ফুলসজ্জায় শোবার ঘরের দরজা সবার দৃষ্টির অগোচরে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উন্মুক্ত আকাশের তলায় একদিন আবার তার কন্টকশয্যাও পাতবে। তখনও তিনি জানতেন না যে বহুকাল পরে একদিন তার পৌত্র থিয়েটার রোডের একটা নতুন বাড়িতে এসে নতুন করে আবার তার ফুলশয্যা পাতবে। হ্যাঁ, ফুলশয্যাই তো। নয়নতারার থিয়েটার রোডের বাড়িতে ফুলশয্যার আয়োজনই তো হয়েছিল। যত ছিল মদের আর খাবারের আয়োজন, ফুলের আয়োজনও তার চেয়ে কিছু কম ছিল না।

সেই সেদিন কলকাতার আর এক প্রান্ত থেকে তখন নরনারায়ণ চৌধুরীর বংশধর ঠিক তেমনি করেই হেঁটে আসছে। সঙ্গে হাজারি বেলিফ। হাজারি বেলিফ শেয়ালদ' স্টেশনে নেমেই তাড়াতাড়ি পোঁটলা থেকে ক্ষুর বার করে দাড়িটা কামিয়ে নিয়েছে!

কিন্তু যত দক্ষিণে এগোতে লাগলো ততই সুন্দর সুন্দর রাস্তা, ততই বড় বড় বাড়ি। এদিকে আর কোথাও ভিখিরির উৎপাত নেই। এদিকে আর বড়বাজারের শেয়ালদার মত চিৎকার কোলাহল নেই।

সদানন্দ বললে—এদিকটা তো বেশ নিরিবিলি হাজারিবাবু, এদিকে তো আর ভিখিরির উৎপাত নেই—

হাজারি বললে—কী বলছেন মশাই, এদিকে ভিখিরি নেই? এ-পাড়ায় যত ভিখিরি আছে তত ভিখিরি দুনিয়াতে নেই, তা জানেন?

—তাই নাকি?

আরে মশাই এরা যে হচ্ছে অন্য রকমের ভিখিরি!

সদানন্দ বললে—তার মানে?

—আমি কোর্টের বেলিফ, আমি যে এদের সবাইকে চিনি। এদের নামেও যে হুলিয়া আছে।

—তাই নাকি। তা এদের তুমি সমন ধরাও না কেন?

হাজারি বললে—কেন সমন ধরাবো মশাই? তাহলে আমার পেট চলবে কী করে? এরা যে আমাকে দু-চার পাঁচ টাকা করে ঘুঁষ দেয়, আর আমিও কোর্টে গিয়ে রিপোর্ট দিই আসামী বেপাত্তা। তাতে এরাও বাঁচে আমিও বাঁচি। আর সঙ্গে সঙ্গে হাকিম পেসকার উকিল মোক্তার অ্যাটর্নী পেয়াদা সবাই-ই বাঁচে—

সদানন্দ বললে—তা তুমি কী করে জানলে এরাও ভিক্ষে করে?

হাজারি বললে—তা জানবো না? এদের বাড়িতে যে আমাকে রোজ আসতে হয়। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি মশাই এরা জাত-ভিখিরি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এরা ও-পাড়ার লোকেদের মত পয়সা ভিক্ষে করে না। এদের অল্প পয়সাতে পেট ভরে না তাই এরা লাখ-লাখ টাকা ভিক্ষে চায়। এরা বাড়ি ভিক্ষে করে, গাড়ি ভিক্ষে করে, মেয়েমানুষ ভিক্ষে করে, পারমিট লাইসেন্স আর পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ ভিক্ষে করে, এরা কি ভাবছেন ওদের মতন ছোটলোক ভিখিরি?

তারপর পাশের একটা বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এই যে দেখছেন বাড়িটা, এটাও একটা ভিখিরির বাড়ি, এর নাম 'গ্রীন পার্ক'—

—'গ্রীন পার্ক' মানে?

—এখানে টাকা আর মেয়েমানুষের ভিক্ষে চলে। এর ভেতরে গেলে দেখবেন সার-সার সব ঘর। এটা হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেবের নিজের ভিক্ষের জায়গা। এখানে মেয়েমানুয লেলিয়ে দিয়ে নিজে টাকা ভিক্ষে করতে আসে ব্যানার্জি সাহেব। আসলে ব্যানার্জি সাহেবই এর মালিক কিন্তু দেখাশোনা করে সব মানদা মাসি—

—মানদা মাসি! নরনারায়ণ চৌধুরীর বংশধর চমকে উঠলো। নামটা যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকলো। মানদা মাসি যে তার চরণপূজো করেছিল, সে এখানে এল? কেন এখানে এল কী করে?

—আসুন, আসুন মশাই এখান থেকে।

সদানন্দ তবু ছাড়লে না। বললে—কেন চলে আসবো, আপনি আগে বলুন এখানে কী হয়?

হাজারি বেলিফ বললে—মশাই আপনার সঙ্গে আমি আর তক্কো করতে পারবো না, তার চেয়ে আমাকে না-হয় তিনটে টাকা দিন, আমি চলে যাচ্ছি—আমার কাজ নেই সমন ধরিয়ে—

বলে আগে আগে চলতে লাগলো। সদানন্দও চলতে লাগলো পেছন পেছন। আরো এগিয়ে গিয়ে আর একটা রাস্তা। তারপরে আরো একটা। তারপরে আবার আর একটা বড় রাস্তা। চলতে চলতে যেন সারা বিশ্বটাই তারা প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

হাজারি বেলিফ বললে—আর তো হাঁটতে পারছিনে মশাই, আর কত দূর—?

সদানন্দ বললে—এইবার এসে গেছি, এই তো সামনেই—

সামনেই একটা জায়গায় গাড়ির ভিড় আছে এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত। একটা বাড়ির সামনে অনেকগুলো আলো জ্বলছে। রাস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে আলোয় আলো হয়ে গেছে। ওই-ই তো থিয়েটার রোড। এই-ই বোধ হয় নয়নতারার বাড়ি।

গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সদানন্দ। অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে একজন দারোয়ান। আশেপাশে আরো অনেক লোক। সব রাস্তার লোক মজা দেখতে দাঁড়িয়েছে।

সদানন্দ সামনে যেতেই দারোয়ানটা হাটিয়ে দিলে—এধার থেকে সরে যাও, হাটো, সব হাটো, দূর হাটো—

হাজারি বেলিফও পেছনে ছিল। সেও সরে দাঁড়ালো। পাশের একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে—এ কার বাড়ি ভাই? কোন্ সাহেবের বাড়ি এটা?

রাস্তায় একটু ভিড় দেখলেই যারা দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা তাদেরই দলের। সেও বোধ হয় মজা দেখতেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—এটা তো ব্যানার্জি সাহেবের বাড়ি—

ব্যানার্জি সাহেবের বাড়ি কথাটা কানে যেতেই সদানন্দ একটু সচেতন হয়ে উঠলো। তা হলে এই-ই নয়নতারার বাড়ি! সদানন্দ চারিদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। এত বড় বাড়ি! এত বিলাস, এত ঐশ্বর্য! সদানন্দ মনে মনে খুশি হলো। ভালোই হয়েছে। নয়নতারার তা হলে আর কোনও অভাব অনটন নেই। এখন সচ্ছল সংসার। কিন্তু এ কীসের উৎসব এ-বাড়িতে? এত অতিথি অভ্যাগত কীসের আকর্ষণে?

সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় না। কেউ ভেতরে যেতে দেবে না তাকে। আজকে এ-বাড়ির ভেতরে তার জন্যে প্রবেশ নিষেধ। তবু একবার নয়নতারার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো। একটু শুধু দেখা করে যেত। একটু শুধু জিজ্ঞেস করে যেত কেমন আছে সে? কী তার সর্বনাশ করেছে সে! জীবনের সর্বস্ব দিয়ে কী অপরাধ সে করেছে তার কাছে! নইলে তার বিরুদ্ধে এই অযৌক্তিক অভিযোগ!

হঠাৎ দারোয়ানটা হইহই করে উঠলো।

—হটো, হটো সব, হটো ইহাঁসে—

একটা রুল নিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে এল। ভিড় সরতেই একটা গাড়ি সোঁ-সোঁ করে একেবারে ভেতরের বাগানের দিকে ঢুকে গেল। বাইরের আলোর রেশ গাড়ির ভেতরে পড়তেই সদানন্দ দেখলে সেখানে একজন মহিলা বসে আছে। মানদা মাসি না? পনেরো বছর পরে দেখা, কিন্তু তবু চিনেত কষ্ট হলো না। এখন মাথার চুলগুলো একটু সাদা হয়ে গেছে, আর শাড়িটাও দামী ফরসা। গাড়ির পেছনে হেলান দিয়ে রাণীর মত বসে আছে। এত টাকা হলো কী করে তার? আর নয়নতারার বাড়িতেই বা কী করতে এল? নয়নতারার সঙ্গে মানদা মাসির সম্পর্ক কীসের? তাকে দেখেই দারোয়ান স্যালিউট করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গি করলে। এ কী হলো! কালীঘাটের বস্তির খোলার বাড়ির সেই দ্রারিদ্র্য থেকে কীসের সিঁড়ি

বেয়ে এখানে এই থিয়েটার রোডের ইজ্জতের শিখরে উঠে এসেছে সে? কীসের দৌলতে?

সঙ্গে সঙ্গে তখন আর একটা গাড়ি।

সদানন্দ অন্যমনস্ক ছিল। দারোয়ানের তাড়া খেয়ে আবার পাশে সরে এল। এ কে?

পাশ থেকে কে একজন বলে উঠলো—পুলিস কমিশনার সাহেব—

কিন্তু সদানন্দ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলে এ সেই সমরজিৎবাবুর ছেলে! সেই মহেশের বড়দাদাবাবু! এরা সব এ-বাড়িতে এল কেন? এর কি সবাই নয়নতারাকে চেনে? নয়নতারার সঙ্গে এদের কীসের সম্পর্ক?

সদানন্দর চোখের সামনে দিয়েই গাড়িগুলো একে-একে ভেতরে ঢুকতে লাগলো। আর তার মনে হতে লাগলো সে যেন সেই পনেরো বছর আগেকার সেই নবাবগঞ্জের নিজেদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি সমারোহে, তেমনি জৌলুস। সেদিন তার বিয়ে। বিরাট একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে সদর দরজার মাথায়। আশে-পাশের সমস্ত গ্রামের লোকজন দল বেঁধে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছে।

হাজারি বেলিফ দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী হচ্ছে দারোয়ানজী?

দারোয়ানের তখন বলবার সময় নেই। সে তখন গন্যমান্য অতিথি-অভ্যাগতদের সেলাম করতেই ব্যস্ত।

পাশে দাঁড়ানো একটা লোক বললে—পার্টি হচ্ছে—

—কীসের পার্টি?

—ছেলের জন্মদিন।

ছেলের জন্মদিন! কথাটা শুনেই সদানন্দর খুব ভালো লাগলো। ভাবতে ভালো লাগলো নয়নতারা সুখী হয়েছে, নয়নতারার সংসার করার সাধ মিটেছে। যে-সংসার সদানন্দ তাকে দিতে পারেনি সেই সংসার তাকে নিখিলেশ দিয়েছে। সদানন্দর বদলে নিখিলেশ নয়নতারার সব সাধ পূর্ণ করেছে। তা করুক, যে-কেউ একজন যে নয়নতারাকে খুশী করেছে তাতেই সদানন্দ খুশী।

হাজারি বেলিফ বললে—আপনি যে কেন দাড়ি কামান না মশাই তা বলতে পারি না। ওই দাড়ি কামান না বলেই তো আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি তো সেইজন্যেই সব সময়ে পোঁটলার মধ্যে দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বেরুই—

এবার হঠাৎ আর একটা বিরাট লম্বা গাড়ি এল। এমব্যাসির গাড়ি। ভেতরে যিনি বসে আছেন তিনি সাহেব। আর তাঁর পাশে তাঁর মেমসাহেব। শুধু সেই গাড়িখানাই নয়, আরো অনেক সাহেব-মেমসাহেব এলো। সদানন্দর মনে হলো নয়নতারা তার ছেলের জন্মদিনে সত্যিই অনেক জাঁকজমকের আয়োজন করেছে। কিন্তু সেই 'গ্রীনপার্ক'! কার টাকায় আজকের এই উৎসব? এ কি তার দেওয়া উপার্জনের টাকা! 'গ্রীন পার্কে'র টাকা যদি না হবে তবে এ বাড়িতে সেই মানদা মাসি আসবে কেন? মানদা মাসির সঙ্গে এ-বাড়ির কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠবে কেন?

সমস্ত জিনিসিটাই কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হলো সদানন্দর কাছে। যে-কলকাতায় এত ভিখিরি, যে-কলকাতায় এত অভাব, এত অভিযোগ সে-কলকাতায় ছেলের জন্মদিনের উৎসবে এত ঘটা কেন? এত অপব্যয়, এত অপচয় কেন?

এক-একটা করে গাড়ি আসছে দারোয়ানজী সেলাম করছে গাড়ির আরোহীদের। আর দর্শকরা গেটের দু-পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যটা আঁচ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের বিলাসবাহুল্য বাইরের লোকের কাছে প্রদর্শনী করবার জন্যেই কী সেদিন নয়নতারাকে অত টাকা দিয়েছিল সদানন্দ? সদানন্দ কী তার দেওয়া

অর্থের এই ব্যবহারই আশা করেছিল নয়নতারার কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে নবাবগঞ্জের সেই দূর থেকে দেখা দৃশ্যটার কথাও মনে পড়ল সদানন্দর। এ কী হলো! মানুষ মানুষ হোক এই নিত্যই তো সে করেছিল সেদিন। কখনও তো সে বলেনি যে আমার ইচ্ছে অনুযায়ীই তোমাদের এই সমাজ চলুক। অর্থটাকে উপকরণ মাত্র হিসাবেই তো মনে করেছিল সে। চেয়েছিল সেই উপকরণ ভাঙিয়ে মানুষের জীবনধারণের সমস্যাই শুধু মিটুক। উপকরণটাই প্রধান হোক এটা তো সে চায়নি। অর্থের অভাবের জন্যে মানুষের সমস্ত সৎ প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই সকলের অভিযোগ ছিল। করো চাই বিদ্যা, কারো চাই মুক্তি কারো চাই সেবা। আবার কারো চাই জ্ঞান। এই সমস্ত কিছু অধিগত করবার জন্যেই তো চাই অর্থ! যেমন অন্ন! অন্ন তো ভক্ষণ করবার জন্যেই! অন্ন গলাধঃকরণেই তো অন্নের আসল উপযোগিতা। কিন্তু তা না করে যদি কেউ তার শরীরে অন্ন মাখে তা হলেই তো তাকে উচ্ছিষ্ট হওয়া বলে! নবাবগঞ্জে তার দেওয়া অর্থ যেমন সমস্ত গ্রামকে উচ্ছিষ্ট করেছে, নয়নতারার বাড়িতেও যে তাই! এখানেও যেন মনে হচ্ছে নয়নতারার ঐশ্বর্য নয়নতারাকে উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে! কিন্তু এই-ই কী সদানন্দ চেয়েছিল?

সদানন্দ যত ভাবলো ততই তার কষ্ট হতে লাগলো।

হাজারি বেলিফ বললে—কী ভাবছেন মশাই? চলুন চলুন, দেখা তো হলো, এবার চলুন, চলে যাই—

সদানন্দ বললে—কিন্তু নয়নতারার সঙ্গে দেখা না করে যাই কী করে?

—কিন্তু দারোয়ান তো আমাদের ঢুকতে দেবে না। দেখছেন না কলকাতার সব বড় বড় লোক আসছে, এখানে আমাদের মত গরীব লোকদের ঢুকতে দেবে কেন? আপনি তো আবার দাড়িটাও কামাননি—

সদানন্দ বললে—তা হোক, তবু আমি ঢুকবো, নয়নতারার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাবোই না।

—কিন্তু যদি ঢুকতে না দেয়?

সদানন্দ বললে—আপনি আমার পেছন পেছন থাকুন, আমি যেমন করে হোক ভেতরে ঢুকবোই। আমার নাম শুনলে নয়নতারা কিছুতেই আপত্তি করবে না, একবারের জন্যে সে দেখা করবেই—

হাজারি বললে—তা হলে ওই দিকের গেটে চলুন—ওই দিকটা দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করি একটু—

বলে হাজারি বেলিফ সামনে এগিয়ে গেল।

নবাবগঞ্জে তখনও বারোয়ারিতলার নিতাই হালদারের দোকানে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। বহুদিন আগে ওইখানে মাচার ওপর বসে একদিন সবাই দল বেঁধে তাস খেলেছে। কিন্তু এখন তাদের বয়েস হয়েছে। সে-যুগের মানুষ তারা, আজকের নতুন যুগের মানুষের কাছে তারা একেবারে অচেনা। এই পনেরো বছরে যারা নবাবগঞ্জে জন্মেছে তাদের অতীতও নেই, বর্তমানও নেই, হয়ত ভবিষ্যৎ নেই তাদের। কিন্তু তারা দেখছে যাদের হাতে তাদের মানুষ হবার ভার পড়েছে তারা নির্বিকার। নিয়ম করে মাইনে না পেলেই তারা মিছিল করে। তারা আকাশে ডান হাতের ঘুঁষি তুলে স্লোগান দেয়। আর যখন সকালবেলা স্কুলে কলেজে যায় তখন সেখানে তাদের পড়াবার বোঝাবার লোক কেউ নেই। আর তারপর যেদিন পরীক্ষায় বসে সেদিন অসহায় হয়ে পাশে বসা বন্ধুর খাতার দিকে চেয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার অক্ষম চেষ্টা করে।

কিন্তু কে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবে?

মানুষের ইতিহাসে এক-একটা যুগ যখন সমাজ-সংসারের প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে প্রবঞ্চনা করেই বুঝি একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আর সেই প্রবঞ্চনার প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেই তখন সবাই অত্মহননের পথ ধরে। এ-যুগটাও বোধ হয় তেমনি। প্রবঞ্চনা করতে করতে যখন ধরা পড়ে যাবার উপক্রম হয় তখন হাতের কাছের নিজের থালা-বাসনটাও ভেঙে চুরমার করে দিয়ে মানুষ তার অভাবের ক্ষোভ মেটায়। জিনিস কম পড়লেই তো ফাঁকিতে সেটা পূরণ করতে ইচ্ছে হয়। এখানেও তাই হয়েছে। এই ফাঁকির কারবারে কেউ আর এখন কারো চেয়ে কম যায় না। নবাবগঞ্জের মানুষ এখন ফাঁকির প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কলেজে পড়লেই যদি পাস করে বিদ্বান হওয়া যায় তো পাসই করবো। আর পাস করলেই যদি চাকরি পাওয়া যায় তো তাই-ই করবো। সোজা পথে পাস না করতে পারি তো ফাঁকি দিয়ে টুকে পাস করবো।

সূত্রপাতটা এখানেই হয়েছিল। তার পরে এরই ছোঁয়াচ লাগলো হাসপাতালে। রোগীদের ওষুধ দিলে তো ডাক্তারদের কিছু লাভ নেই, অথচ সেই ওষুধ বাইরে বেচলে বরং নগদ লাভ। পনেরো বছর আগে যখন নবাবগঞ্জে প্রথম হাসপাতাল শুরু হলো তখন যা-ছিল আশীর্বাদ তাই-ই এখন হয়ে উঠেছে অভিশাপ!

এই অভিশাপই সেদিন হঠাৎ বুঝি বারুদ হয়ে ফেটে উঠলো।

কোথা থেকে যে দল বেঁধে কারা সব লুকিয়ে লুকিয়ে এসে জড়ো হয়েছিল তা আগে কেউ জানতে পারেনি। যখন জানলো তখন সেই অভিশাপের আগুন স্কুল আর কলেজ বড়ি থেকে ছড়িয়ে একেবারে হাসপাতাল-বাড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। নবাবগঞ্জ যখন পুড়ে ছারখার হচ্ছে তখন দশ ক্রোশ দূরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছে। কিন্তু হাতের কাছে ছিল চৌকিদার। তার ওপরে ছিল পাঁচ ক্রোশ দূরের থানা। থানা থেকে ডি এস পি, তারপর ডি এস পি থেকে এস পি।

বারোয়ারিতলায় তখন হাট বসেছিল। কলকাতা থেকে ভেণ্ডার এসেছিল দলে-দলে। তারা রেল-বাজারের ইস্টিশানে নেমে যথানিয়মে সোজা চলে এসেছে নবাবগঞ্জে। নবাবগঞ্জ থেকে পাঁচ-সিকে দরের ট্যাঁড়স কিনে নিয়ে গিয়ে কোলে মার্কেটে আড়াই টাকা দরে বেচবে। শুধু ট্যাঁড়সই নয়, কুমড়ো, বেগুন, ডাঁটা, লাউ সব কিছু এখান থেকে চলে গিয়ে উঠবে শহরের বাজারে। তখন হাটও চলছিল বেশ। কিন্তু হঠাৎ হই-চই-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আগুনের ধোঁয়া এসে নাকে লাগলো সকলের। যে-যার বাড়ি থেকে বাইরে ছুটে এল। কী হয়েছে গো? কী হয়েছে এখানে?

বেহারি পাল তখন আরো বুড়ো হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষ চোখে ভালো দেখতে পায় না। তাড়াতাড়ি আবার দোকানে ফিরে গেল। বললে—দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দাও কৈলাস, ইস্কুলবাড়িতে আগুন লেগেছে—

যেন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করলেই আগুনকে ঠেকানো যাবে।

কিন্তু খানিক পরেই আবার খবর এল হাসপাতালে আগুন লেগেছে। তা হলে কী হবে? ও কৈলাস, ও পরমেশ, ও দীনু—

যার আছে তারই ভাবনা। যার নেই তার ভাবনাও নেই। বেহারি পালের অবস্থা তখন

আরো ভালো। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, শুধু বুড়ো আর বুড়ি। তার বাড়িটার সামনেই হাসপাতালটা! অত বড় চৌধুরীদের বাড়িটা তখন হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল। এককালে কত জমজমাট ছিল ওই বাড়ি। শেষকালে হাসপাতাল হবার পর থেকে আরো জমজমাট হয়েছিল জায়গাটা।

কৈলাস দোকান বন্ধ করে দিয়ে বললে—আমিও একবার বাড়ির দিকে যাই পাল মশাই, আমার বাড়ির খড়ের চাল—

তা খড়ের চাল তো সকলেরই। পাকা বাড়িই যদি আগুনে পুড়তে পারে তো খড়ের চাল তো এক মিনিটের তোয়াক্কা।

ভেণ্ডারবা তখন খালি ঝাঁকা নিকে পালাতে অরম্ভ করেছে। পরমেশ মৌলিকও আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা পেলে না। অগুনটা যে কোন্ দিকে মোড় ঘুরবে তা বলা যাচ্ছে না। যতক্ষণ বেলা ছিল ততক্ষণ তবু এদিকে-ওদিকে চোখে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর অন্ধকার নেমে আসতেই সব ঝাপসা। আগুনের হলকার দাপটে কাছের মানুষকেও তখন যেন বীভৎস মনে হয়, ভয় করে।

ডাক্তারবাবু তখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সাইকেল নিয়ে।

বেহারি পাল দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছে। চিৎকার করে ডাকলে—ও ডাক্তারবাবু, কোথায় চললেন?

ডাক্তারবাবু শহরের মানুষ। এখানে পয়সা উপায় করবার জন্যে চাকরি নিয়েছিল। কিন্তু ফ্যামিলি ছিল শহরে। সেখান থেকে সাইকেলে রোজ যাতায়াত করতো। তখন বিপদ দেখে আবার সাইকেলে চেপে শহরের দিকে রওনা দিলে। বললে—আপনারাও পালান পাল মশাই, বাঁচতে চান তো পালান—

বেহারি পাল বললে—কিন্তু আমার যে বাড়ি এখানে ডাক্তারবাবু, আমি কোথায় পালাবো—

কিন্তু সে-কথা আর কে শোনে! আর কেই বা তার উত্তর দেয়! কিম্বা হয়ত ডাক্তার বাবু একটা কিছু উত্তর দিলে, কিন্তু তা আর কারো কানে গেল না।

আর শুধু কি ডাক্তারবাবু, যারা ইস্কুল কলেজের মাস্টার তারাও তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

তাদেরও একজনকে চিনতে পারলে বেহারি পাল। বললে—ও তারক, তারক, আগুন কে লাগালে?

তারক মাস্টার যত না ইস্কুলে পড়ায় তার চেয়ে প্রাইভেটে ছেলে পড়ায় বেশি। এক-একটা ছেলেকে পাস করাতে একশো টাকা করে রেট করে দিয়েছে। তার কোচিং ইস্কুলে পড়লে সবাই পাস।

সেও ছুটছে। বললে—নকশাল—

—নকশাল মানে?

মানে আর বলা হলো না। তারক মাস্টার তখন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই তারক মাস্টার কোচিং স্কুল করে আশি বিঘে জমি, বউ-এর পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না, আর দোতলা পাকা বাড়ি করে ফেলেছিল নবাবগঞ্জে।

কিন্তু ওদিক থেকে কারা যেন দৌড়তে দৌড়তে ছুটে আসছে। রাত্রের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত তাদের গতিবিধি। ওদিক থেকে এদিকে যায় আবার এদিক থেকে ওদিকে। বেহারি পাল একবার বাড়ির ভেতরে যায় আর আর-একবার বাইরে আসে। তার পাটের আড়তে যদি একবার আগুন লাগে তা হলে কী হবে!

গিন্নী ভালো করে চোখে দেখতে পায় না। কাছে এসে বললে—ওগো, দাঁড়িয়ে কী দেখছো, পুড়ে মরবে নাকি?

বেহারি পাল মশাই বললে—দশ হাজার টাকার পাট রয়েছে যে আড়তে, সেটার কী হবে?

গিন্নী বললে—তা তোমার পাট আগে না জীবন আগে?

বেহারি পাল মশাই বললে—তা হলে চলো—

—হ্যাঁ চলো, সদা যে আমাদের এমন সব্বোনাশ করবে তা কে জানতো! কে যে ওকে ইস্কুল-হাসপাতাল করতে বলেছিল এখেনে কে জানে, আমি তখনই জানতুম কাজটা ও ভালো করলে না—এ দেশের লোকের ভালো করবার জন্যে কে ওকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল!

—পালান, পালান, সি আর পি আসছে, সি আর পি আসছে, সি আর পি আসছে—

বলতে বলতে কার যেন তীরের মত অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিশ ক্রোশ দূরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যখন খবর গেল তখন নবাবগঞ্জের যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। সিনেমা দেখে বাড়িতে আসবার আগেই অনেকবার খোঁজাখুঁজি পড়েছে। কেউ জানে না কোথায় গেছেন তিনি। এস পি অনেকবার টেলিফোন করেছে।

—নবাবগঞ্জ? সে কোথায়?

এস পি বললে—সে এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূরে। কলকাতা থেকে আরো পুলিস ফোর্স আনতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় টেলিফোন করা হলো। চিফ-মিনিস্টার মিস্টার সেন তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ সেরে উঠে পড়েছেন। এমন সময় টেলিফোন এল। টেলিফোন ধরেছে পি-এ।

পি-এ বললে এখন তো তিনি বাইরে যাচ্ছেন—কাল দিনের বেলা রিং করবেন—

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—কিন্তু খুব আর্জেন্ট দরকার, এখনি সি আর পি পাঠাতে হবে নবাবগঞ্জে—সমস্ত নবাবগঞ্জ জ্বলছে। সবাই বাড়ি ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে—

শেষ পর্যন্ত মিস্টার সেন টেলিফোন ধরলেন। বললেন—হঠাৎ আগুন লাগাবার কারণটাই বা কী?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—কারণ আমি নিজে স্পটে গিয়ে ইন্‌ভেস্টিগেট করছি। তার আগে আমার এখুনি সি আর পি ফোর্স চাই। লোকাল পুলিস পাঠানো হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে না তার কিছু করতে পারবে—

মিস্টার সেন বললেন—ঠিক অছে, আমি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, আপনি আজ রাত্রের মধ্যেই রিপোর্ট দেবেন, যত রাতই হোক—

বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর পি-একে বললেন—আমি একবার থিয়েটার রোডে যাচ্ছি। মিসেস ব্যানার্জির বাড়িতে। টেলিফোন এলে আমাকে সেখানে রিং করবেন—

বলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

থিয়েটার রোডের মিসেস ব্যানার্জির বাড়িতে যখন মিস্টার সেন পৌঁছলেন তখন সেখানে অনেকেই পৌঁছে গেছে। উপলক্ষটা যা-ই হোক, সামাজিক মেলা-মেশাটাই হলো আসল। আর এই সব মেলামেশাতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এমনি

করেই এই শহরের আরো অনেক লোক ক্ষমতার স্বর্গে উঠে চিরস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। এমনি করেই সে-যুগে কেউ রায়সাহেব হয়েছে, কেউ বা রায়বাহাদুর হয়েছে। আর একবার ওসব হলে সে-গৌরব বংশানুক্রমিক ভাবে তোমার উত্তরাধিকারীদের ওপরেও বর্তাবে। অবশ্য সেই ব্রিটিশ আমল এখন আর নেই। না থাক, তাতে কোনও ক্ষতিও হয়নি। আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে মানুষের সেই স্তর-বিভাগ এখনও বজায় রেখেছি। আমরা গণতন্ত্রের উপাসক হয়েও মানুষে-মানুষে বৈষম্যকে অস্বীকার করিনি। রায়সাহেব রায়বাহাদুরের বদলে আমরা পদ্মশ্রী-পদ্ম-ভূষণ প্রবর্তন করেছি। কিন্তু সেই বৈষম্যের বেড়াজাল ভেদ করে সকলের মাথায় ওঠা কি সোজা? সেই জন্যেই তো আমি এখানে বাড়ি করেছি, এই থিয়েটার রোডে। যাতে তোমরা আমাকে নিজের স্তরে প্রমোশন দাও। আর সেই জন্যেই তো নৈহাটির মধ্যবিত্ত পরিবেশ ছেড়ে এখানে এলুম। এখানে না এলে কি তোমরাই আমার পার্টিতে আসতে? নইলে তো টালিগঞ্জ-যাদবপুর-শ্যামবাজার-বাগবাজারের মত সাধারণ মানুষরাও তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্মদিনের পার্টিতে সেখানে তোমাদের নেমন্তন্ন করতো। তখন?

মালা বোস তখন থেকেই আছে। বলতে গেলে নয়নতারার উত্থানের ইতিহাসের শুরু থেকেই। সেও আজ এসেছে। একদিন একসঙ্গে এক অফিসে পাশাপাশি বসে চাকরি করেছে। নয়নতারার যখন এ-পাড়ায় বসতি শুরু তখন থেকেই যাতায়াত। এই এখানে বাড়ি করার সময়েও অনেক দিন এসেছে। বাড়ির প্ল্যান থেকে শুরু করে গৃহ-প্রবেশ আর তারপর নয়নদি'র এই সন্তান হওয়া—সবই সে দেখেছে। তারপর এখানে যতবার পার্টি হয়েছে ততবার মালাকেও নেমন্তন্ন করেছে নয়নতারা। আর মালাও প্রত্যেকবার এসে কয়েকখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছে। মালার বড় শখ শহরের গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা। এক-একজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে আর সে কৃতার্থ হয়ে গেছে। তার সব চেয়ে বেশী লোভ মিনিস্টারদের সঙ্গে পরিচয় করতে।

—তুই একটা গান গা ভাই!

—গান?

গান মালা গায় বটে, কিন্তু আজকের মত এত বড় পার্টিতে গান গাওয়া সোজা নাকি? মালার কেমন ভয় করছিল। কদিন থেকেই জিজ্ঞেস করছিল—কে কে আসবে?

নয়নতারা বলেছিল—সবাই আসবে—

—সবাই মানে? যারা বরাবর আসে?

নয়নতারা বলেছিল—না, এবার ফরেন এমব্যাসির লোকদের নেমন্তন্ন করেছি। মিস্টার হেন্ডারসন আসছে, মিস্টার নবিকভ্ আসছে—

—আর!

—আর মিস্টার সেন—

—মিস্টার সেন কে?

—আমাদের চিফ-মিনিস্টার!

—সত্যি বলছো তুমি?

—সত্যি বলছি না কি মিথ্যে বলছি? সবাই জোড়ায়-জোড়ায় আসবে, দেখিস! এবারও কক্‌টেল। এবার ভালো ড্রিঙ্কস-এর ব্যবস্থা আছে—

মালা বলেছিল—আমি ও-সব খাবো না নয়নদি, আমার বড্ড মাথা গুলোয়।

নয়নতারা বলেছিল—প্রথম প্রথম একটু ও-রকম সকলেরই হয়, প্রথম-প্রথম আমারও

হতো, দু-চার দিন খেলেই দেখবি তখন কেমন ভালো লাগবে।

—কিন্তু সবাই দেখতে পাবে যে!

—কেউ দেখতে পাবে না। আমি তো কোল্ড ড্রিঙ্ক-এর সঙ্গে একটু করে জিন মিশিয়ে দেব। সবাই ভাববে তুই কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিস—

নয়নতারার পার্টিতে বরাবরই সেই নিয়ম। মেয়েরা সফ্‌ট ড্রিঙ্ক খায়, কিন্তু তার সঙ্গে একটু জিন মেশানো থাকে। যখন পার্টি শেষ হয় তখন বাড়িতে ফিরে গিয়ে বড় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। তখন মনে হয় কালকের সন্ধ্যেটা বড় আনন্দে কেটেছে।

মালা সেদিনও এসেছিল। স্বামী মিস্টার বোসও এসেছিল। এতগুলো ভি আই পি এখানে আসবে, এ সুযোগ ছাড়বার নয়। এতে তাদের বোর্ডিং হাউসেরও ইজ্জৎ বাড়বে। কলকাতা শহরে ব্যবসা করতে গেলে কত রকম বিপদ-আপদ আসে। তা কি বলা যায়? তখন পরিচয়ের জের টেনে অনেক সুবিধে আদায় করা চলে।

হঠাৎ মিস্টার সেন এসে গেলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ-মিনিস্টার। গাড়ি থেকে নামার সময় থেকেই হাতজোড় করে নমস্কারের পালা শুরু হয়েছিল। একেবারে সেই দারোয়ান থেকে শুরু করে বেয়ারা, বাবুর্চি ডিঙিয়ে শেষ-মেশ গৃহস্বামী পর্যন্ত।

—নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার—

মিসেস ব্যানার্জি ছিল একেবারে দোতলার হলঘরে। তখন মালা বোস গান ধরে দিয়েছে। গলা কেঁপে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার যোগাড়। কী যে গাইবে তা-ই ঠিক করতে পারছিল না। নয়নতারা বললে—গা না তুই, যে কোনও একটা গান—

—রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবো? কাল একটা নতুন রবীন্দ্র-সংগীত শিখেছি নয়নদি—

—বেশ তো, তা গা না। রবীন্দ্র সংগীত তো সাহেবরা খুব পছন্দ করে। টেগোর-সঙ্ বললে সাত খুন মাপ—গা তুই, আরম্ভ করে দে—

হারমোনিয়ামটা সে তার নিজের বাড়ি থেকেই নিয়ে এসেছিল। গান গাওয়া তো তেমন অভ্যেস নেই। তবু সময় পেলেই মাঝে মাঝে প্যাঁ-পোঁ করেছে।

মালা গাইতে লাগল—

ও নিঠুর, আরো কী বাণ তোমার তূণে আছে—

মালার স্বামী যেন কেমন বিব্রত বোধ করলে। এ কী গান আরম্ভ করলে মালা! মিসেস ব্যানার্জি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকেই বললে—এ কী গান আরম্ভ করলে মালা, আজকে আপনার ছেলের জন্মদিন, আনন্দের দিন...অন্য গান গাইতে বলুন ওকে মিসেস ব্যানার্জি—

মিসেস ব্যানার্জি বললে—তাতে কী হয়েছে মিস্টার বোস! এও তো টেগোর-সঙ—

মালা তখন চোখ বুঁজিয়ে গাইছে—

ও নিঠুর, আরো কী বাণ তোমার তূণে আছে
তুমি মর্মে আমায় হিয়ার কাছে।

মিস্টার হেন্ডারসন আর মিসেস লেন্ডারসন গায়িকার দিকে চেয়ে গান শুনছিলেন। দুজনের হাতেই গেলাস। মিসেস ব্যানার্জির নজর পড়লো সেদিকে। দেখলে গ্লাস খালি। সঙ্গে সঙ্গে কাছে গিয়ে বেয়ারার কাছ থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে তাদের দিলে।

মিসেস হেন্ডারসন হেসে গেলাসটা নিলে।

বললে—টেগোর-সঙ—

—হ্যাঁ, কেমন লাগছে আপনার?

—ভেরি গুড্।

বলে আবার গায়িকার দিকে ফিরে গান শুনতে লাগলো।

মালা বোস উৎসাহ পেয়ে তখন গেয়ে চলেছে—

আমি পালিয়ে থাকি মুদি আঁখি
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি—

—এ কী মিসেস নবিকভ, আরনার গ্লাস খালি যেন? নিন আর একটা নিন—

মিস্টার আর মিসেস নভিকভ্ দুজনেই আবার গ্লাস নিলেন। দুজনেই গান শুনছিলেন একমনে। আর শুধু কি তাঁরা? সকলের দিকেই নজর দিতে হচ্ছে নয়নতারাকে। মিস্টার ব্যানার্জি আজকে এই উৎসবের হোস্ট। তারও নজর সব দিকে। মিস্টার আর মিসেস সামন্তও এসেছেন। এই আগের রাত্রেই এ-বাড়িতে এসে তিনি যে তিন হাজার টাকা ঘুঁষ নিয়ে গেছেন তার ক্ষীণতম চিহ্নটুকু পর্যন্তও আজ আর তাঁর মুখে নেই। বড় আনন্দ পাচ্ছেন গান শুনে।

হঠাৎ মিস্টার আর মিসেস সেন ঘরে ঢুকতেই মিসেস ব্যানার্জি এগিয়ে গেল।

বললে—নমস্কার, নমস্কার! এত দেরি হলো যে আপনার?

সস্ত্রীক অ্যামব্যাসাডাররাও এগিয়ে এলেন। সবায়ের লক্ষ্য তখন তাঁদের দুজনের দিকে। এতক্ষণ যে-গান শোনবার জন্যে তাঁদের মনোযোগের শেষ ছিল না, এখন মিস্টার সেনের আবির্ভাবে যে তাঁদের সব ধ্যান ছারখার হয়ে গেল।

সবারই ওই এক প্রশ্ন—এত দেরি হলো যে?

মিস্টার সেন সকলকেই ওই এক উত্তর দিলেন—হঠাৎ একটা ট্রাঙ্ক-কল এসেছিল—

ট্রাঙ্ক-কল! মিসেস ব্যানার্জি একটা বেয়ারাকে একেবারে সঙ্গে করে ধরে এনেছে। সামনে তার ট্রে ধরা। তাতে সার সার গেলাস সাজানো। আর একজনের ট্রে-তে স্ন্যাক্স।

—নিন্ মিসেস সেন—নিন—

মিস্টার সামন্ত এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই মিস্টার সেন একটু পাশে সরে দাঁড়ালেন। গলাটা নামিয়ে মিস্টার সেন বললেন—নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এখুনি টেলিফোন করেছিলেন—

তারপরে দুজনে কী কথা হলো কে জানে! সে-সব কেউ শুনতে পেলে না। কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়। অন্যদিকে মিসেস ব্যানার্জির ব্যস্ততা তখন আরো বেড়ে গিয়েছে। একবার একজনের কাছে যায়, আবার সেখান থেকে আর একজনের কাছে গিয়ে হাজির হয়। সব দিকে তার নজর রাখতে হবে। এই যে আজ তার বাড়িতে এত অতিথি, এত মান্যগণ্য অভ্যাগত, এ সবই মিসেস ব্যানার্জির বহুদিনের কলা-কৌশলের ফল। আর পনেরো বছরের অক্লান্ত সাধনায় ইজ্জতের এই শিখরে এসে উঠেছে সে। এককালে অনেক লাঞ্ছনা অনেক গঞ্জনা তাকে মাথা পেতে সহ্য করতে হয়েছে। নবাবগঞ্জের শ্বশুরবাড়িতে তার অপমানের শেষ ছিল না। আজ এতদিন পরে তার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সে, এ কী তার কম গৌরব! সেদিনকার সব লাঞ্ছনার যন্ত্রণা যে সে আজকের ককটেলের প্রলেপ দিয়ে মুছে দিতে পেরেছে, এইটুকুই কী কম! আজকে তাকে দেখে কে বলবে এই নয়নতারাই সেদিনকার সেই অসহায় নয়নতারা! যেদিন নবাবগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়ির সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তাদের মুখের ওপর দিয়ে সে মাথা উঁচু করে সদম্ভে চলে আসতে পেরেছিল, সেদিন কী কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে আবার একদিন মিসেস ব্যানার্জি হয়ে তার এই থিয়েটার রোডের বাড়িতে সে ককটেল পার্টি দিতে পারবে! আজকের এরা এই গণ্যমান্য অতিথিরা সেদিনকার নয়নতারাকে দেখেনি। দেখলেও হয়ত চিনতে পারতো না। কিম্বা যে-নয়নতারা নৈহাটি স্টেশন থেকে পায়ে চটি গলিয়ে ডেলি-পাসেঞ্জারি করতো তাকেও তো

এখন এখানে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। কিন্তু এও তো তার একদিনে হয়নি। এখানে উঠতেই কী তাকে কম অধ্যবসায় করতে হয়েছে! এর পেছনে কত অপব্যয়, কত তোষামোদের খেসারত দিতে হয়েছে তাকে তা এরা কেউ জানে না। আর জানে না বলেই আজ তার সব কৃচ্ছ্রসাধন সার্থক, সব প্রতারণা সুন্দর। আজ কলকাতার অভিজাত সমাজে তাই মিসেস ব্যানার্জীর এত মর্যাদা!

মালা বোস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনগুলো তখন আবার গাইছে—

আমি পালিয়ে থাকি মুদি আঁখি
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে
ও নিঠুর, আরো কী বাণ তোমার তূণে আছে—

মানদা মাসি এবার মিসেস ব্যানার্জির পাশে এসে দাঁড়ালো। বললে—দিদি তোমাকে একবার বাইরে কে ডাকছে—

—আমাকে? ডাকছে? কে ডাকছে? কোথায়?

—ওই যে আবদুল বলছে—

—কোথায় আবদুল? আবদুলকে আমার কাছে ডাকো তো!

মানদা মাসি গিয়ে বলতেই আবদুল এল। বললে—মধু বলছিল মেমসায়েবকে একজন কে ডাকছে—

—আমাকে ডাকছে? কে? নাম কী? আমাকে কী করতে ডাকছে? তুই মধুকে ডাক। মধুকে ডেকে দে আমার কাছে—

মিসেস ব্যানার্জি আবার তখন অন্যদিকে ছুটে গেছে। মিসেস সামন্ত একলা-একলা দাঁড়িয়ে আছে। একলা থাকা ভালো নয়। মিসেস সামন্তর কাছে গিয়ে বললে—একলা দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন, আসুন—

বলে তাকে একদল মেয়ের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে সকলের সঙ্গে। এই হচ্ছে মিসেস সামন্ত আর এই হচ্ছে মিসেস সিনহা, ইনি মিসেস দীক্ষিত ইনি হচ্ছেন...

তারপর পাশের দিকে চেয়ে বললে—এই যে মিস্টার সামন্ত, আপনি সব পাচ্ছেন তো ঠিক? টিকিয়া কাবাব নিয়েছেন?

—নিয়েছি নিয়েছি, খুব ভালো হয়েছে—

—প্লিজ চেয়ে চেয়ে নেবেন, আমি একলা সব দিকে দেখতে পচ্ছি না—

আর ওদিকে তখন পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সদানন্দ ওপরে উঠছে। সঙ্গে হাজারি বেলিফ। সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকেও কেউ-কেউ নিচেয় নামছে। সকলেরই ব্যস্ততা। কারো দিকে কারো চেয়ে দেখবার সময় নেই। অসংখ্য লোক এসেছে বাড়িতে আর অসংখ্য তাদের অনুচর। অনুচরদের অবশ্য বাইরের রাস্তায় গাড়িতে বসে থাকবার কথা। কিন্তু তাদের মধ্যে কারো কারো ভেতরে আসবারও দরকার হয়। তাদেরই একজনকে ডাকলে সদানন্দ। বললে—হ্যাঁ ভাই, ওপরে ব্যানার্জি সাহেবের বউকে একবার ডেকে দিতে পারো?

—মেমসায়েব?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, মেমসাহেব।

লোকটা বললে—ওই ওপরে মধুকে গিয়ে বলুন—

মধু! মধু আবার কে? কিন্তু সে-সব কথা শোনবার সময় নেই তখন বেয়ারাটার। তার কাজ আছে অনেক। থিয়েটার রোডের বাড়ির বেয়ারাদের কারো বাজে কথা বলবার সময়ই নেই। সে যেমন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল তেমনি নেমে চলে গেল।

ওপরে তখন আরো অচেনা লোকের আনাগোনা। সদানন্দ চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এ কী সাজ-সরঞ্জাম নয়নতারার বাড়ির! জীবনে সদানন্দ এমন সাজানো বাড়ি দেখেনি। নয়নতারার সেই নৈহাটির ভাড়াটে বাড়ির চেহারাটাও মনে পড়লো। সে-বাড়ি আর এ-বাড়ি! এ কী মেঝে, এ কী দেয়াল, এ কী আলো!

সদানন্দ আর একজনকে ধরলো। বললে—শোন, তোমাদের মেমসাহেবকে একবার ডেকে দিতে পারো?

—মেমসাহেব? ডেকে দিচ্ছি—

—তোমার নাম কি মধু?

বেয়ারাটা বললে—না, আমি মধুকে বলে দিচ্ছি—

বলে কোথায় উধাও হয়ে গেল এক নিমেষে। সদানন্দ বুঝতে পারলে সত্যিই এ-বাড়ির সবাই ব্যস্ত। নয়নতারার ছেলের আজ জন্মদিন। সদানন্দও নয়নতারার ছেলেকে আশীর্বাদ করবে। এত লোক এসেছে নয়নতারার ছেলেকে আশীর্বাদ করতে আর সদানন্দই বা কেন বাদ পড়ে যাবে?

কিন্তু কোথায় কী? কেউ আর মেমসাহেবকে খবর দিলে না। সত্যিই তো, খবর দিলেই বা কী! নয়নতারা নিজেও তো ব্যস্ত এত লোককে সে আজ নেমন্তন্ন করেছে। তাদের দিকেই তো আগে নজর দিতে হবে তাকে! সদানন্দ তো আজ এখানে অনাহূত। সদানন্দ তো আজ এখানে অনাবশ্যক!

বারান্দাটা পেরিয়ে একটু উত্তর দিকে যেতেই অনেক লোকের গলার শব্দ কানে আসতে লাগালো। কেউ যেন ভেতরে মেয়েলি-গলায় গান গাইছে গানের কথাগুলো অস্পষ্ট কানে আসতে লাগলো।

আমি পালিয়ে থাকি মুদি আঁখি
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।

সামনেই একটা বিরাট হলঘর। লোকজনের জটলা সেখানেই। সদানন্দ আস্তে আস্তে একটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কাচ-বন্ধ জানলা। কিন্তু কাচের ভেতর দিয়ে সদানন্দ উঁকি দিয়ে দেখলে। এত লোক! সকলের হাতেই গ্লাস। কী যেন খাচ্ছে সবাই। মাঝে-মাঝে সবাই-ই গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। হয়ত মদই হবে, কিম্বা হয়ত মদ নয়। হঠাৎ নজর পড়ে গেল নয়নতারার ওপর। অনেক দিন পরে দেখলে তাকে। পনেরো বছর পরে! কিন্তু কই, নয়নতারা তো এই পনেরো বছর পরেও একটুকু বদলায়নি। যেন বয়েস আরো অনেক কমে গেছে তার! আর কত সেজেছে! নড়ছে-চড়ছে, সকলের সঙ্গে ঘুরে কথা বলছে আর কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচলটা খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। শুধু তার শাড়ি নয়, নিজেকেও যেন আর সামলাতে পারছে না সে। তবে কি নয়নতারাও ওদের মত মদ খেয়েছে নাকি!

হঠাৎ দেখলে সেই মানদা মাসি! গাড়িতে করে ঢুকতে দেখেছিল যাকে। সেই মানদা মাসি কী যেন বললে নয়নতারাকে। কথাটা শুনেই নয়নতারা ঘুরে দাঁড়ালো। বললে—আমাকে? ডাকছে? কে ডাকছে? কোথায়?

—ওই যে আবদুল বলছে।

—কোথায় আবদুল? ডাকো তো আমার কাছে—

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলবার কি সময় আছে নয়নতারার! কথাটা বলতে বলতে আবার অন্য দিকে চলে গেল। সদানন্দ হঠাৎ সেই সমরজিৎবাবুর ছেলে সুশীল সামন্তকে দেখতে পেলে, সেই মহেশ যাকে বড়দাদাবাবু বলতো। আর তার ওদিকে একটা ছোট বেদীর ওপরে বসে গান গাইছে এক মহিলা—

মারকে তোমার ভয় করেছি বলে
তাইতো এমন হৃদয় ওঠে জ্বলে—

ভেতরে তখন নিখিলেশ দৌড়তে দৌড়তে মিস্টার সেনের কাছে এসেছে।

—আপনার টেলিফোন মিস্টার সেন!

—টেলিফোন! চিফ-মিনিস্টারের ভাব দেখেই বোঝা গেল তিনি যেন এই টেলি-ফোনটার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। নদীয়ার ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কথা দিয়েছিল রিপোর্ট দেবে। সি আর পি এতক্ষণে পাঠানো হয়েছে নিশ্চয়ই। মিস্টার সেন হাতের ঘড়িটা দেখলেন। যেতে আর কতক্ষণ লাগবে! বড় জোর দু'ঘণ্টা।

—হ্যালো!

ওদিকে তখন আগুনের শিখায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। লোক্যাল পুলিস গিয়েছিল কিন্তু তারা কিছু করতে না পেরে ফিরে চলে এসেছে। নিতাই হালদার দোকানের জিনিসপত্র কিছুই বার করতে পারেনি। একদিন কত আড্ডা দিয়েছে সবাই ওই দোকানের মাচার ওপর বসে আজ সেই আগুনের হলকা লেগে সেটাও মড় মড় করে ভেঙে পড়লো! হঠাৎ সেই মড় মড় শব্দ শুনে যেন কারা গলা ফাঁটিয়ে হেসে উঠলো হো-হো করে। যেন তাদের বড় আনন্দ হয়েছে। গ্রামের লোকের যদি সর্বনাশ হয় তো কাদের এত আনন্দ! তারা কারা? কারা এত হাসছে! সমস্ত সর্বনাশ ছাপিয়ে কাদের উল্লাসের ধ্বনি এমন করে সমস্ত অঞ্চল এত উচ্চকিত করছে। কে! কে ওরা?

অন্ধকারের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে যারা এতক্ষণ ছোটাছুটি করছিল, রাত বাড়তেই তারা আবার বুক ফুলিয়ে সকলের সামনে দাপাদাপি করতে শুরু করেছে। এতদিন আমরা অনেক অনেক সহ্য করেছি। একদিন কর্তাবাবুদের ভয়ে মাথা তুলতে পারিনি আমরা। এক কথায় আমরা বাড়ি-ঘর-জমি-খামার সব ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে বসেছি, আমরা গলায় দড়ি দিয়েছি, পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। বংশী ঢালীর কুড়ুল আমাদের মাথায় পড়েছে। আমরা তবু সব মুখ বুজে সহ্য করেছি। এবার পাশর দান উল্‌টে গেছে। এবার আমরা বেঁচে উঠেছি। যে-গ্রামে একদিন কেউ আমাদের দিকে এতটুকু সহানুভূতি দেখায়নি, আমাদের চোখের জলে কারোর বুক ভেজেনি, কর্তাবাবুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা কড়ে আঙুল উঁচিয়েও কেউ প্রতিবাদ জানায়নি, আজ সেই গ্রামের সকলকেই তার সমস্ত প্রতিশোধ সুদে আসলে মাথায় তুলে নিতে হবে। শুধু এ-গ্রামের নয়। এ-গ্রামের পাশের গ্রাম, তার পাশের পাশের গ্রাম, তারপরে সারা বাঙলা দেশ অতিক্রম করে সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা আমাদের কর্তাবাবুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব।

বেহারি পালের সামনে দিয়েই কারা যেন তখন দৌড়ে যাচ্ছিল। বেহারি পাল ভয় পেয়ে গেল। কে রে তোরা? কারা? কারা ছুটে যাচ্ছিস?

লোকগুলো দাঁড়িয়ে গেল। তাদের মুখের দিকে চেয়েই বেহারি পালের মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে উঠলো। বেহারি পালের মনে হলো যেন কপিল পায়রাপোড়া তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

—কপিল, তুই?

কে একজন পাশ থেকে আরো জোরে হেসে উঠলো। বেহারী পাল তার দিকে চাইতেই সে বলে উঠলো—আমাকে চিনতে পারছেন পাল মশাই?

—কে তুই?

—আমি মানিক ঘোষ। আর আমার পাশে এই যে একে দেখছেন, এ হলো ফটিক প্রামাণিক—

বেহারি পাল সেখানেই মাথা ঘুরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল।

সমস্ত বাড়িটার চোখে তখন কক্‌টেল আরো কুটিল নেশার ঘোর ঘনিয়ে এনেছে। নয়নতারার বুঝি একটু তখন সময় হলো। একটু সামান্য ফুরসৎ। এই ফুরসৎটুকুর মধ্যে যা বলবার বলে নাও। আমার সময় নেই বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলবার।

—কোথায়? কে ডাকছে আমাকে? কে?

মধু বললে—এই যে, ইনি—

হলঘরের চড়া আলোর আওতা থেকে এসে প্রথম বাইরে একটু অস্বস্তি লেগেছিল। তারপর সামনে খোঁচা-খোঁচা গোফ-দাড়ি-ভর্তি মুখখানার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল নয়নতারা। এ লোকটা আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন? ডেকরেটারের লোক নাকি? টাকা চাইতে এসেছে?

নয়নতারা তার কাছে গিয়ে বললে—এখন কোনও পেমেন্ট হবে না—এখন পেমেন্ট নিতে এলে কেন?

কথাটা বলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। বললে ও, তুমি!

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আবার এলুম—

—কিন্তু—

সদানন্দ বললে—তুমি খুব ব্যস্ত—

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, আমার প্রথমের জন্মদিন তো, তাই—

—প্রথম মানে?

—আমার ছেলে!

সদানন্দ বললে—ও, খুব ভালো। আমাকে তুমি অবশ্য আসতে বলোনি, তবু আমিও আশীর্বাদ করছি তোমার ছেলেকে। সে সুখী হোক্—

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল, সদানন্দ, কিন্তু নয়নতারার তখন ওদিকে অনেক তাড়া। বললে—আজকে সবাই এসেছে ও-ঘরে, আমি ছাড়া আর তো কেউ দেখবার নেই? তা তুমি আর একদিন অসতে পারো না? ঠিক আজকেই তুমি এলে?

সদানন্দ বললে—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল—

নয়নতারা বললে—বললে আজকেই?

—হ্যাঁ, এখনই। আর হয়ত কখনও সময় পাবো না আমি। হয়ত আর কখনও আমাদের দেখাও হবে না।

নয়নতারাও বললে—তা কাল যে-কোনও সময়ে তুমি একবার এসো না, যে-কোনও সময়। আমি সব সময়েই থাকবো। তখন হাতে অনেক সময় থাকবে। বেশ নিরি-বিলিতে কথা বলা যাবে—

—না, কাল তো সময় হবে না আমার, আজই আমার শেষ আসা।

নয়নতারা বললে—তা কাল না-আসতে পারো, পরশুই এসো—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আজ আমার জন্যে তুমি একটুকু সময়ও দিতে পারো না?

নয়নতারা বললে—তুমি দেখছো তো আমার অবস্থা, চিফ-মিনিস্টার এসেছেন, ফরেন অ্যামবাসাডাররা এসেছেন, পুলিস কমিশনার এসেছে, আরো কত লোক সব এসেছে, সবাই গণ্যমান্য লোক। তাঁদের দেখা-শোনা করতে তো সেই একলা আমিই—

সদানন্দ বললে—তাঁরা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বড় লোক, তাঁদের দিকটাই তো তোমার আগে দেখা উচিত—

নয়নতারা বললে—তুমি অমন করে কথা বলছো কেন? মনে হচ্ছে তুমি যেন রাগ করলে!

সদানন্দ বললে—রাগ? আমি রাগ করলে কার কী এসে যায়! রাগের কথা হচ্ছে না, শুধু বলো তুমি কী সুখী হয়েছ? কারণ, বলতে গেলে তোমার সুখের জন্যেই আমি আমার সর্বস্ব একদিন তোমাকে দিয়ে গিয়েছিলুম—

নয়নতারা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। বললে—বলছি তো ও-সব কথা বলবার সময় নেই এখন, তবু তুমি সেই কথাই আরম্ভ করলে। পরে একদিন এসো না, তখন ওই কথা বলবো—

নয়নতারার মুখে-চোখে যেন বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো। সদানন্দ এখান থেকে চলে গেলেই যেন যে বাঁচে। আজকে এখানে সদানন্দর উপস্থিতি যেন সে চাইছে না।

—কিন্তু তুমি সুখী হয়েছ কী না শুধু সেই কথাটুকু বলবারও তোমার সময় নেই আজ?

হঠাৎ ওদিক থেকে মিস্টার সেন এসে পড়তেই কথার মধ্যে বাধা পড়লো। মিস্টার সেন কাছে আসতেই নয়নতারার চোখে মুখে আবার আনন্দের ছাপ ফুটে উঠলো।

—মিসেস ব্যানার্জী আপনি এখানে? আমি চলি—

নয়নতারা চমকে উঠলো। বললে—সে কী, আপনি এখনই যাবেন?

মিস্টার সেন বললেন—এখনই টেলিফোনে কথা হলো, নদীয়া জেলায় খুব ট্রাবল শুরু হয়েছে—ফায়ারিং হয়ে গেছে অনেকগুলো ক্যাজুয়্যালটি, আমাকে এখুনি আর একবার রাইটার্সে যেতে হবে—

—নদীয়া ডিসট্রিক্টে? কোথায়?

—ওই যে বললুম নবাবগঞ্জ! নবাবগঞ্জ থেকে এখন আশেপাশের গ্রামেও নাকি গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ছে শুনলুম—

সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার আর থাকতে পারলে না। বললে—নবাবগঞ্জ?

এতক্ষণে চিফ-মিনিস্টার সদানন্দর দিকে চেয়ে দেখলেন। আগে যেন তিনি তাকে দেখতেই পাননি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ মুখে, এ লোকটা আবার কে?

সদানন্দ বললে—নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীকে আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন কী? তিনিই ওখানকার সব চেয়ে বড় কালপ্রিট।

অবাক হয়ে গেলেন মিস্টার সেন। লোকটা বলে কী?

—হ্যাঁ, সেই নরনারায়ণ চৌধুরীর জন্যেই ওখানে আজ যত অশান্তি। ওখানকার কপিল পায়রাপোড়া ওর জন্যেই গলায় দড়ি দিয়েছিল। মানিক ঘোষ পাগল হয়ে গিয়েছিল, ফটিক প্রামাণিক ওর জন্যেই রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, ওকে কী আপনারা ধরেছেন?

চিফ-মিনিস্টার আরো অবাক। সদানন্দকে কিছু না বলে মিসেস ব্যানার্জির দিকে চেয়ে বললেন—এ লোকটা কে?

মিসেস ব্যানার্জি বললে—ও কেউ না, আপনি ওদিকে চলুন ওদিকে চলুন—বলে মিস্টার সেনকে নিয়ে হলঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু চলতে চলতে খানিক দূর যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ কানে এল। যেন অমানুষিক যন্ত্রণায় কেউ ছাদ-ফাটা চীৎকার করে উঠলো।

দু'জনেই পেছন ফিরে তাকালেন। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে চমকে উঠেছেন দু'জনেই। দেখলেন লোকটা পাশের একটা লোককে এক হাত দিয়ে ধরে উন্মাদের মত একটা ক্ষুর দিয়ে মারাত্মক আঘাত করে চলেছে। আর লোকটার আর্তনাদে সমস্ত বাড়িটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠছে।

চিৎকার শুনে তখন হলঘরের ভেতর থেকে সবাই ছুটে এসেছে। কী হলো? কে আর্তনাদ করে উঠলো? আজকে তো মিসেস ব্যানার্জির ছেলের জন্মদিন। এই শুভ দিনে কান্না কেন? চীৎকার কেন? আর্তনাদ কেন? মিস্টার আর মিসেস হেন্ডারসন, মিস্টার আর মিসেস নবিকভ, মিস্টার আর মিসেস সামন্ত, মানদা মাসি, মালা বোস সবাই ছুটে এসেছে। কী হলো ওখানে? কী হলো?

বারান্দাটা তখন ভিড়ে ভিড়। সবাই দেখলে জায়গাটা রক্তে রক্তে একেবারে ভেসে গেছে। একটা ময়লা জামা পরা লোক হাতে ক্ষুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। ক্ষুরটায় রক্ত মাখা। আর তারই পাশে একটা লোক মুমূর্ষ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে।

মিস্টার সেন লোকটার হাত ধরে ফেলেছেন। সবাই উত্তেজিত! মিস্টার ব্যানার্জিও কাণ্ড দেখে অবাক। লোকটাকে যেন চিনতে পারলে সে।

মিস্টার সামন্ত কাছে আসতেই মিস্টার সেন তার হাত ছেড়ে দিলেন।

—তুমি ওই লোকটাকে খুন করেছ?

সদানন্দ স্থির দৃষ্টিতে মিস্টার সামন্তর মুখের দিকে চাইলে। বললে—হ্যাঁ!

—তোমার নাম কী?

সদানন্দ বললে—আমার নাম বললে চিনবেন না—

—তবু নামটা বলো।

—আমার নাম সদানন্দ চৌধুরী।

—কোথায় থাক তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?

—নবাবগঞ্জে।

—নবাবগঞ্জ? নদীয়া ডিসট্রিক্টের নবাবগঞ্জ? তোমার বাবার নাম?

—আমার বাবার নাম হরনারায়ণ চৌধুরী।

—আর ও কে?

সদানন্দ বললে—ওর নামও সদানন্দ চৌধুরী।

—সে কী? একই নাম তোমাদের দু'জনের?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, ও আর আমি একই। ও আমারই ছায়া। সারা জীবন ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, সারা জীবন ও আমাকে জ্বালিয়েছে। আমার বিবেকের মত ও কেবল আমাকে সারা জীবন যন্ত্রণা দিয়েই এসেছে। ওর সঙ্গেই আজ আমি এখানে এসেছি! ও-ই আমাকে এখানে আনলে। এখানে না এলে আমাকে আজকের এই সমস্ত কিছু দেখতে হতো না। আমি এতদিন বেশ ছিলুম, আমার তো কোনও কষ্টই ছিল না। কিন্তু কেন ও

আমাকে এসব দেখালে। না দেখালে আমি তো জানতেও পারতুম না কিছু। আমি তো বরং জানতুম নবাবগঞ্জের লোক সুখে আছে। তারা হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাচ্ছে, ডাক্তারের সেবা পাচ্ছে, তারা স্কুলে-কলেজে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে। আমি জানতেও পারতুম না যে থিয়েটার রোডে নয়নতারার ছেলের জন্মদিনে এত মদের ফোয়ারা ছুটেছে, আমি তো জানতে পারতুম না আমারই টাকায় মোটা দরে 'গ্রীন পার্কে' মেয়েমানুষের মাংস বিক্রি হচ্ছে...

বলতে বলতে সদানন্দর যেন দম ফুরিয়ে এল। সে হাঁপাতে লাগলো।

তারপর একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো—আমাকে আপনারা অ্যারেস্ট করুন। দয়া করে আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করুন। আমি স্বীকার করছি আমি ওকে খুন করেছি আমি স্বীকার করছি আমি আসামী।

মিস্টার সামন্ত তখন সদানন্দর হাতটা চেপে ধরে আছে। জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এখানে তুমি আসতে গেলে কেন? এখানে মিসেস ব্যানার্জির বাড়িতে তুমি কিসের জন্যে এলে? এখানে কিসের কাজ তোমার? এখানে কে তোমাকে আসতে বলেছিল?

সদানন্দ বললে—সে-কথা আপনারা মিসেস ব্যানার্জিকেই জিজ্ঞেস করুন—

—কী মিসেস ব্যানার্জি, আপনি একে চেনেন?

মিস্টার ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—না না মিস্টার সামন্ত, আমরা তো কেউ চিনি না। ও কে? এখানে এলো কেন? আমার তো ওকে আসতেও বলিনি।

সদানন্দ বলে উঠলো—হ্যাঁ, ওরা সত্যি কথাই বলেছেন, ওঁরা কেউই আমাকে এখানে আসতে বলেননি। আমি ওঁদের কেউই না। আমার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। এই লোকটাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। এই-ই আমাকে এখানে এনে এই সব দেখালে! সেই জন্যেই আমি একে খুন করেছি—! আমি আপনাকে অনুনয় করে বলছি আমাকে অ্যারেস্ট করুণ আপনারা। আমি আসামী।

—কিন্তু এই সামান্য কারণেই ওকে খুন করলে?

সদানন্দ বললে—আপনারা একে সামান্য কারণ বলছেন? জানেন এ লোকটা আমার কত বড় ক্ষতি করেছে? এই লোকটাই আমাকে দেখালে সত্যবাদিতা পাপ, এই লোকটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে যে মানুষকে বিশ্বাস করা অন্যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে বিদ্রোহ কার পাগলামি। আসলে বিশ্বাস করুন ওর কথাই ঠিক, আমিই পাপ করেছি। মানুষকে বিশ্বাস করে আমি পাপ করেছি, মানুষকে ভালোবেসে আমি পাপ করেছি মানুষকে দয়া করে আমি পাপ করেছি। আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি এখন প্রস্তুত, আপনারা আমাকে গ্রেফতার করুন, আমাকে ফাঁসি দিন, আমি আসামী—

মিস্টার সামন্ত পাশের দিকে কাদের ইঙ্গিত করতেই তারা এসে সদানন্দকে গ্রেফতার করতে গেল। কিন্তু তার আগেই নয়নতারা হঠাৎ সদানন্দর সামনে গিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর দু'টো হাত দু'দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মিস্টার সামন্তর দিকে চেয়ে বললে—একে অ্যারেস্ট করবেন না মিস্টার সামন্ত।

সবাই অবাক হয়ে গেল। মিসেস ব্যানার্জি এ কী বলছেন!

—সে কী মিসেস ব্যানার্জি, আপনি কেন বাধা দিচ্ছেন? এ তো একটা অ্যান্টি-সোশ্যাল, এ তো একটা ভ্যাগাবণ্ড—

নয়নতারা বললে—প্লিজ মিস্টার সামন্ত, ওকে অ্যারেস্ট করবে না, ওর কোনও দোষ নেই—কোনও দোষ নেই ওর।

—ওর কোনও দোষ নেই তো তবে দোষ কার?

উত্তরটা দিলে সদানন্দ। বললে—সব দোষ আমার, আমাকে আপনি অ্যারেস্ট করুন, আমাকে আপনি ফাঁসি দিন, আমিই আসামী, আমি মানুষকে বিশ্বাস করেছিলুম, আমি মানুষকে ভালবেসেছিলুম, আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলুম, আমি নিজের টাকা মানুষের উপকারের জন্যে পরকে দান করে দিয়েছিলুম। আজকের মানুষের চোখে এর চেয়ে বড় পাপ আর নেই। সেই বড় পাপই আমি করেছিলুম—

কথাটা বলে নয়নতারাকে ঠেলে দিয়ে সদানন্দ নিয়ে মিস্টার সামন্তর দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলে।

কিন্তু নয়নতারা তখনও সকলের দিকে চেয়ে অনুনয়-বিনয় করে বলে চলেছে—না মিস্টার সামন্ত, আপনি একে ছেড়ে দিন, আপনারা ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, এর জন্যে যত টাকা খরচ হয় সব আমি দেব, একে ছেড়ে দেবার জন্যে আমি আমার সব কিছু দিতে প্রস্তুত—বলুন আপনারা কী চান, কত টাকা চান?

কিন্তু সদানন্দ তার কথা অগ্রাহ্য করে বলতে লাগলো—না না, নয়নতারার কোনও কথা সত্যি নয়, নয়নতারা আমার কেউ নয়, আমিও নয়নতারার কেউ নই, আমার একমাত্র পরিচয় আমি আসামী, আমি মানুষকে বিশ্বাস করেছিলুম, আমি মানুষকে ভালবেসেছিলুম আমি মানুষের শুভকামনা করেছিলুম। আমি চেয়েছিলুম মানুষ সুখী হোক, আমি চেয়েছিলুম মানুষের মঙ্গল হোক, কিন্তু আজ এই পনেরো বছরে জানলুম মানুষকে বিশ্বাস করা, মানুষকে ভালবাসা, মানুষের শুভকামনা করা পাপ, আমি তাই আজ পাপী, আমি তাই আজ অপরাধী, আমি তাই আজ আসামী, আমাকে আপনারা আমার পাপের শাস্তি দিন, আমাকে ফাঁসি দিন—

বলে নয়নতারাকে ঠেলে দিয়ে এবার সদানন্দ নিজেই এগিয়ে চললো। পুলিসের লোক তাকে ধরে নিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চলতে লাগলো।

মিস্টার সেন তখনও হতবাক। বললেন—মিসেস ব্যানার্জি, সত্যি বলুন তো ও কে?

নয়নতারা তখন আর সহ্য করতে পারলে না। বলে উঠলো—ওকে আপনারা শাস্তি দেবেন না মিস্টার সেন—শাস্তি দেবেন না। আপনি নিজে একটু বুঝিয়ে বলুন—

—কিন্তু সত্যি বলুন তো, উনি কে আপনার?

—উনি আমার স্বামী—

‘স্বামী’ বলবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবেশের আবহাওয়ায় যেন একটা বিদ্যুৎ-চমক খেলে গেল।

মিস্টার ব্যানার্জি এতক্ষণ কিছু বলেননি। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার নয়নতারার হাতটা ধরে টান দিতে গেলেন।

বললেন—করছো কী তুমি? কী পাগলামি করছো?

কিন্তু তার আগেই নয়নতারা সেই মেঝের ওপরই সোজা অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। চোখের জলে তার মুখের গালের ম্যাক্স-ফ্যাক্টার ধুয়ে মুছে ভেসে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তখনও যেন তার কানে বাজতে লাগলো সদানন্দর বলা শেষ কথাগুলো—আমি আসামী, আমি মানুষকে বিশ্বাস করেছিলুম, আমি মানুষকে ভালবেসেছিলুম, আমি মানুষের শুভ কামনা করেছিলুম, আমি চেয়েছিলুম মানুষ সুখী হোক, আমি চেয়েছিলুম মানুষের মঙ্গল হোক। কিন্তু আজ এই পনের বছর পরে জানলুম মানুষকে বিশ্বাস করা, মানুষকে ভালবাসা, মানুষের শুভ কামনা করা পাপ, আমি তাই আজ পাপী, আমি তাই আজ অপরাধী, আমি তাই আজ আসামী, আমাকে আপনারা আমার পাপের শাস্তি দিন, আমাকে আপনারা ফাঁসি দিন—

সেদিন যারা সেখানে ছিল সবাই তখন স্তম্ভিত হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মালা বোসের গাওয়া সেই গানটা তখনও যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল—

ও নিষ্ঠুর আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে—

তারপর? তা তারপরের পরেও তো একটা তারপর থাকতে পারে। সেই তারপরের কথাটাই বলি। আজ থেকে এক হাজার ন'শো তিয়াত্তর বছর আগে সেদিনের সেই মানুষের পৃথিবী যেমন আর এক সদানন্দকে সমসাময়িক সমাজ থেকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করেছিল, এত কাল পরে আজকের মানুষের পৃথিবীও তার আর উত্তরসূরী আসামীকে শাস্তি দিয়ে নিজেদের নিরাপদ মনে করে নিশ্চিন্ত হলো। কর্তাবাবু, চৌধুরী মশাই আর প্রকাশ মামার পৃথিবী আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠলো আর এক নতুন আশ্বাসে, আবার নবাবগঞ্জের স্কুলে-কলেজে-হাসপাতালে নতুন উদ্যমে আর এক অরাজকতার বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ আর ফটিক প্রামাণিকের দল কর্তাবাবুদের করুণার ওপর আত্মসমর্পণ করে অস্তিত্ব বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টায় ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো। ‘গ্রীন পার্কে’ আরো চড়া দরে নারীদেহের বেচা-কেনা হতে লাগলো। থিয়েটার রোডের বাড়িগুলোতে আবার কক্‌টেল পার্টির আসরে জমায়েত হতে লাগলো কলকাতার গণ্য-মান্য মানুষের দল। এক হাজার ন'শো তিয়াত্তর বছর আগে সব কিছু যেমন চলছিল, এতদিন পরেও আবার ঠিক তেমনি চলতে লাগলো সব কিছু। কোনও কিছুরই পরিবর্তন হলো না। কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ থেকে তখনও একজনের ক্ষীণ কণ্ঠ তার ভালোবাসার একমাত্র সাবধান বাণী শুনিয়ে যেতে লাগলো। সে-বাণী কেউ বা হয়ত শুনলো, আবার কেউ বা হয়ত শুনতে পেলে না, কিন্তু সেই নিপীড়িত লাঞ্ছিত আসামীর বলার আর তবু বিরাম হলো না কোনও দিন। সে-কণ্ঠ যুগ যুগ ধরে কেবল বলেই চললো—তোমারা সৎ হও, তোমরা সুখী হও, তোমরা মানুষকে বিশ্বাস করো, তোমরা মানুষকে ভালোবাসো, তোমাদের কল্যাণ হোক, তোমাদের শুভ হোক, তোমাদের জয় হোক—

সর্বেহত্র সুখীনঃ সন্তু
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তি
মা কশ্চিৎ দুঃখং আপ্লুয়াৎ।

॥ উপন্যাস সমাপ্ত ॥

॥ ১৮ই মার্চ ১৯৭৩ ॥